বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ

তৃতীয় খণ্ড

ভারতীয় দর্শন গ্রন্থমালা

বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ

তৃতীয় খণ্ড

বেদান্ত-তত্ত্বসমীক্ষা

—লেখক—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ,

"আশুতোষ" সংস্কৃতাধ্যাপক

ডাঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, এম্-এ, পি-এইচ্-ডী,

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার,

কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, বিদ্যাবাচস্পতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৫·০০ টাকা

উৎসর্গ

শৈশবে মাতা-পিতৃহীন অবোধ শিশুকে বুকে করিয়া পিতার আদরে
ও মাতার স্নেহে যাঁহারা লালন-পালন করিয়াছিলেন,
আমার সেই পরমারাধ্য জ্যেষ্ঠতাতদেব স্বর্গীয়
তারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য ও তদীয় সহধর্ম্মিণী,
আমার বড় মা, সতীলোকবাসিনী
৺শ্যামাসুন্দরী দেবীর
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে
দীনের তিলাঞ্জলি।

অকৃতী সন্তান—**আশুতোষ**

মুখবন্ধ

৺সদাশিবের অপার করুণায় বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদের তৃতীয় খণ্ড—বেদান্ত-তত্ত্বসমীক্ষা প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে তুলনামূলক আলোচনার পদ্ধতিতে বেদান্ততত্ত্ব বিচারিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রধানতঃ বেদান্ততত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াই আলোচ্য বিচারের ধারা প্রসারলাভ করিলেও, অপরাপর ভারতীয় দর্শনের—ন্যায়, বৌদ্ধ প্রভৃতি আলোচনাও ইহাতে যথেষ্ট আছে। গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদটি বেদান্তবাদ ও বৌদ্ধবাদের তুলনার দৃষ্টিতেই লিখিত হইয়াছে। অদ্বৈতবেদান্তোক্ত নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, অনির্বাচ্য-মায়াবাদ, জগন্মিথ্যাত্ববাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে শ্রীরামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক, মাধবমুকুন্দ, বল্লভাচার্য প্রভৃতির আক্রমণ তীব্রতর গতিবেগ লাভ করিয়াছে। সম্প্রদায়ক্রমে ঐ বিতর্কশৈলী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ফলে, 'শাস্ত্রং শস্ত্রপ্রঘন-পিশুনম্' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐসকল তর্ককুলিশ বিরুদ্ধ মতবাদের খণ্ডনে শ্রীহর্ষ, চিৎসুখাচার্য, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি অদ্বৈতাচার্যগণও অসামান্য মনীষার পরিচয় দিয়াছেন এবং ন্যায়দীপ্ত বিবিধ অনুমান ও হেত্বাভাস (fallacies) প্রভৃতি উদ্‌ভাবন করতঃ প্রতিপক্ষের যুক্তিজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। সেই তর্কমহোদধির বিভিন্ন বিচিত্র বীচিমালার সহিত প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণের পরিচিতি সাধনই এই "বেদান্ত-তত্ত্বসমীক্ষা" রচনার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থের প্রাথমিক পরিচয়ে যেসকল বিচারধারা প্রথম পাঠার্থীর পক্ষে দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে গ্রন্থমধ্যে যোজনা করা হইয়াছে। "অবিদ্যা" ও "জগন্মিথ্যাত্বে"র আলোচনায়ই ঐ প্রকার পন্থা বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছে। নিবন্ধের আদ্যন্ত বিচারধারাই মৌলিক গ্রন্থরাজির ভিত্তিতে প্রবর্তিত হইয়াছে। চিৎসুখী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ন্যায়ামৃত প্রভৃতির যুক্তিলহরীর মর্ম উপলব্ধি করা, ন্যায়োক্ত অনুমান-প্রক্রিয়া ও হেত্বাভাস প্রভৃতির সহিত যাঁহাদের সম্যক্ পরিচয় নাই তাঁহাদের পক্ষে দুরূহ হইবে মনে করিয়াই বিতর্কের অংশবিশেষ ছোট অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, এই পুস্তকের

প্রথমবারের পাঠে তাঁহারা ঐ সকল অংশ যথাসম্ভব বাদ দিয়া পড়িবেন। তাহা হইলে তর্ক ও যুক্তির জটিলতা হ্রাস পাইবে এবং আলোচনার মর্মোপলব্ধিও সহজসাধ্য হইবে। তর্কের সূত্রে গ্রথিত এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু দুরধিগম্য। খণ্ডন-মণ্ডনের দুর্গম পথে বিচরণ করিতে গিয়া এই দীন লেখক কতদূর কৃতাকার্য হইয়াছেন, সেই বিবেচনার ভার সুধীমণ্ডলীর উপরে রহিল।

প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে কলিকাতার হাটখোলার জমিদার আমার অগ্রজতুল্য শ্রীযুক্ত বাবু রুক্মিণীনাথ দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের আদেশে, বঙ্গমাতার সুসন্তান, বাঙ্গালীর গর্ব ও গৌরব অধুনা শিবলোকবাসী ডাঃ ৺শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে ও আগ্রহে বাংলা ভাষায় "ভারতীয় দর্শন-গ্রন্থমালা" লিখিতে প্রবৃত্ত হই। বেদান্তদর্শনের সহিত বাংলার শিক্ষিত সমাজের নাড়ীর যোগ অত্যধিক, ইহা বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃ বেদান্তদর্শন লিখিতে আরম্ভ করি। আমার পুঁজি অতিনগণ্য। কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়নকালে প্রাতঃস্মরণীয় সর্বশাস্ত্রার্থদর্শী মহামহোপাধ্যায় ৺লক্ষণ শাস্ত্রি দ্রাবিড় মহাশয়ের চরণপ্রান্তে বসিয়া বেদান্তের পাঠ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহার উপদেশই মূলধন করিয়া ৺শ্রীশ্রীগুরুমূর্তি স্মরণ-করতঃ বেদান্তদর্শনের দুর্গম অরণ্যে বিচরণ করিতে প্রয়াস পাই। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বুঝিলাম, এই অরণ্য অতি গভীর এবং কণ্টকসঙ্কুল। এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পথ পাইব কিনা, তাহা কৃপাময় শ্রীগুরুই জানেন। এই পথে যতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি তাহা শ্রীশ্রীগুরুদেবেরই দয়ায়, আমার বুদ্ধিবলে নহে।

এই পুস্তকের ১ম খণ্ডে "বেদান্তচিন্তার ইতিবৃত্ত" প্রতীচ্য দর্শনের ইতিহাসের পদ্ধতি অনুসরণে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং বিগত ইং ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উহা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায়, বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে উহার পুনর্মুদ্রণ চলিতেছে। দ্বিতীয় খণ্ডে "বেদান্তপ্রমাণ-পরিক্রমা" নামে বেদান্তের প্রমাণ-রহস্য (Epistemology or Theory of Knowledge) বিচারিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থও ইং ১৯৪৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে 'বেদান্ত-তত্ত্বসমীক্ষা' (Comparative Metaphysics) নামে বেদান্তদর্শনের তৃতীয় খণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

হইল এবং এই তিনখণ্ডে আমাদের আরব্ধ বেদান্তদর্শন সমাপ্ত হইল। এই তৃতীয় খণ্ডে (১) ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, (২) সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, (৩) জীব, (৪) সৃষ্টি ও স্রষ্টা, (৫) অবিদ্যা, (৬) জগন্মিথ্যা ও (৭) শঙ্করবেদান্ত এবং বৌদ্ধমতের তুলনা, এই সাতটি পরিচ্ছেদ আছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশে অত্যধিক বিলম্ব হইয়াছে, সেইজন্য আমি পাঠক-মণ্ডলীর ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি এবং প্রসঙ্গতঃ নিবেদন করিতেছি যে, এই বিলম্বের জন্য লেখক সম্পূর্ণ দায়ী নহেন। লেখক দরিদ্র অধ্যাপক। তাহার পক্ষে নিজব্যয়ে এইরূপ বিপুলায়তন গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণামূলক এইপ্রকার গ্রন্থমালা প্রকাশের পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, আমার ন্যায় নিঃস্ব লেখকগণের গ্রন্থপ্রকাশের তাহাই একমাত্র ভরসা। বঙ্গজননীর বরপুত্র ডাঃ ৺শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালপ্রয়াণে সমগ্র বাংলার, বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, সেই ক্ষতির বেদনা বিশ্ববিদ্যালয়কে অত্যন্ত পীড়িত করিয়াছে। সেইজন্য ও অপরাপর বিবিধ কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশের পবিত্র ব্রতেও সাময়িক শিথিলতা দেখা দেয়। ইহা দেখিয়া লেখক পুস্তকপ্রকাশের ভরসা না পাওয়ায় হতাশ হইয়া পড়েন। এইরূপ সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বৈজ্ঞানিকবরেণ্য ডাঃ ৺জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষের গুরুদায়িত্ব বহন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন; এবং গ্রন্থকারকে বেদান্তদর্শনের তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহারই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হই। গ্রন্থের লেখা যখন শেষ হইল, তখন সুধী-শিরোমণি ডাঃ ৺জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষের কার্যভার পরিত্যাগ করতঃ স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনসংস্থায় অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগদান করেন। তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারিরূপে বিজ্ঞবরেণ্য অধ্যাপকপ্রবর ডাঃ শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত মহাশয় উপাধ্যক্ষপদে বৃত হন। শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্ত মহাশয় উপাধ্যক্ষরূপে যোগদান করিয়া অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত আমার এই গ্রন্থ প্রকাশের সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমাকে অপরিশোধ্য ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহার আগ্রহে এই গ্রন্থমালা লিখিতে প্রবৃত্ত হই, ভারতগৌরব স্বর্গীয় সেই ৺শ্যামাপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায়কে এই গ্রন্থ প্রকাশের দিনে ব্যথিতহৃদয়ে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতেছি। যিনি এই ৩য় খণ্ড প্রকাশের প্রাথমিক ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সুধীবর ৺জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও আজ ইহলোকে নাই। তাঁহাকেও এই গ্রন্থ দেখাইতে পারিলাম না, এই দুঃখ মৃত্যুপর্যন্ত আমার সঙ্গী হইবে। আমার প্রতি ডাঃ ঘোষ মহাশয়ের অযাচিত করুণার কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া, তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের অনাবিল শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

যে সকল সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা অধীর আগ্রহে এই গ্রন্থের জন্য এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছেন, পত্রাদি লিখিয়া গ্রন্থের সমাপ্তি সম্পর্কে খোঁজখবর লইয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রুফ্ সংশোধনে আমি অপটু। ফলে, গ্রন্থের নানা স্থলে ভুল রহিয়া গেল। সেইজন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

এই গ্রন্থ লিখিতেও আমি বহু গ্রন্থকারের প্রভূত প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাঠ করিয়াছি এবং স্থানবিশেষে সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছি। এইজন্য তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমার অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। বিশেষভাবে এই গ্রন্থে মঃ মঃ ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বেদান্ত ফেলোসিপের লেক্চার হইতে, মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায়দর্শনের অনুবাদ, টিপ্পনী প্রভৃতি হইতে, মঃ মঃ ডাঃ ৺যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের অদ্বৈতসিদ্ধি ও ন্যায়ামৃতের অনুবাদ, তাৎপর্য প্রভৃতি হইতে প্রভূত সাহায্য পাইয়াছি। সেই সকল স্থলের পাদটীকায় উহা উল্লেখ করিয়াছি। আজ গ্রন্থ প্রকাশের দিনে ঐ সকল বাণীমূর্তি অধ্যাপকগণের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই, প্রিয় পাঠকমণ্ডলী আমার বেদান্তদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডকে যেরূপ প্রীতিস্নিগ্ধদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, এই তৃতীয় খণ্ডকেও সেই দৃষ্টিতে দেখিলে আমি আমার সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

আমার কন্যাস্থানীয়া ছাত্রী অধ্যাপিকা শ্রীমতী ঝর্ণা ভট্টাচার্য এম্ এ, আমার এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট বা শব্দসূচি প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমার প্রভূত

শ্রমের লাঘব করিয়াছেন, সেইজন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক শুভাশীর্বাদ জানাইতেছি।

শ্যামবাজার পুরাণ প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কালিদাস মুন্সী মহাশয়, তদীয় কৃতীপুত্র শ্রীমান্ অরুণকুমার মুন্সী ও কর্মচারিবৃন্দ এই গ্রন্থ প্রকাশে সর্বদা আমার সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন, আমার অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করিতেছি। ইতি—

রবীন্দ্র-জয়ন্তী-তিথি
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮ সাল,
৮ই মে, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

বেদান্ত-তত্ত্বসমীক্ষার

বিষয়-সূচি

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীব

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীব ১৬৪—২৫০ পৃষ্ঠা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বেদান্ত দর্শন—অদ্বৈতবাদ

তৃতীয় খণ্ড

বেদান্ত-তত্ত্বসমীক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

পরমাত্মা বা পরব্রহ্মজিজ্ঞাসাই বেদান্তের চরম ও পরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে নির্মলচেতা পথিককে "মননের" দীর্ঘ বন্ধুর পথ পর্যটন করিয়া, আত্মা বা ব্রহ্ম কিরূপ, এই জটিল প্রশ্নেরই সমাধান করিতে হয়। সংস্কৃত-সাহিত্যে দেহ, মনঃ, প্রাণ, বুদ্ধি, জীব (individual), ব্রহ্ম (The universal Soul) প্রভৃতি বিবিধ অর্থে "আত্মন্" শব্দের ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। "অহং" বা "আমি" এইরূপে সকলেই "আত্মা"কে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষ কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বাদ দিয়া উৎপন্ন হয় না; এইজন্যই ঐহিকসর্বস্ব চার্বাক দার্শনিকগণ স্বীয় দেহকেই আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে দেহাবসানের সঙ্গে আত্মারও অবসান হয়। আত্মা নিত্য নহে, অনিত্য। পরলোক, স্বর্গ, নরক, অপবর্গ প্রভৃতির এইমতে কোনই মূল্য নাই। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" ইহাই জীবনের মূলসূত্র বলিয়া বুঝিয়া, দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা সম্পাদনই চার্বাক সম্প্রদায় নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ বলিয়া মনে করেন। সুজলা, শস্যশ্যামলা সুন্দরী ধরিত্রীর বিবিধ সুখভোগকে হেলায় ছাড়িয়া, পারত্রিক কল্যাণের ব্যর্থ আশায়, শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের ক্লেশকর যোগ, ধ্যান প্রভৃতির অনুশীলনে যত্নবান হওয়া নিতান্তই মূর্খতা নহে কি? শ্রুতিমধুর, আপাতসুখকর এই মত, জনচিত্তে সহজেই রেখাপাত করে। এইজন্যই আলোচ্য চার্বাকমত "লোকায়ত" (লোক-সমাজে আয়ত বা বিস্তৃত) এই নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে কর্মচঞ্চল মানবসমাজকে চার্বাকের ভাবেই অনুপ্রাণিত দেখা যায়; ঐহিকসর্বস্ব

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই বেদান্তের চরম লক্ষ্য

শিশ্নোদরপরায়ণ লোকের সংখ্যাই জগতে অত্যধিক। "বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ" আজ কপোত জুটিয়াছে, কপোতকেই ভোজন করা যাউক, কাল ময়ূর জুটিতে পারে এই আশায়, করায়ত্ত কপোতকে পরিত্যাগ করা, ধ্রুবকে ছাড়িয়া অধ্রুবের পিছনে ধাবিত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নহে। চার্বাকের এই জীবন-দর্শন চিন্তাজগতে এক দুর্বার আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং ক্রমশঃ নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করে। কোন কোন চার্বাক দেহকেই আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহারা স্থূল দেহকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতিকে অথবা ইহাদের সমষ্টিকে আত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ দর্শনের ভিত্তিহিসাবে ইঁহারা বৈদিক উক্তিও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। পণ্ডিত সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁহার 'বেদান্তসার' নামক বেদান্তগ্রন্থে বিভিন্ন চার্বাক মতের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[১] ঐ পরিচয়মূলে সুধী দেখিতে পাইবেন যে, দেহাত্মবাদের ন্যায় ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, মন আত্মবাদ, প্রাণ আত্মবাদ, বুদ্ধি আত্মবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন আত্মবাদ চার্বাক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসারলাভ করিয়াছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজেও চার্বাকপন্থী দার্শনিকের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। চার্বাক জড় ভূত চতুষ্টয় (ক্ষিতি অপ্‌ তেজঃ মরুৎ) ব্যতীত চৈতন্যের মৌলিক সত্তা স্বীকার করেন নাই; মৌলিক ভূত চতুষ্টয়ের বিচিত্র সংযোগ এবং সন্ধানের ফলে মদের উপাদান গুড় ও অম্লরস প্রভৃতিতে মদশক্তির আবির্ভাবের ন্যায়, ভূতসমষ্টিতে চৈতন্য আবির্ভূত হয়—'কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়তে' এই বলিয়া, 'ভূত চৈতন্যবাদ' গ্রহণ করিয়াছেন। টিণ্ডল্‌-হাক্সলী (Tyndal Huxley) প্রমুখ কোন কোন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকও জড়

১। (ক) অন্যশ্চার্বাকঃ স বা এষঃ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ (তৈত্তিরীয় উপঃ, ২য় বল্লী ১ম অনুবাক ১ম মন্ত্র) ইতি শ্রুতেঃ গৌরোঽহমিত্যাদ্যনুভবাচ্চ দেহ আত্মেতি বদতি।

(খ) অন্যস্তু চার্বাকঃ "অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ (তৈঃ উপঃ, ২য় বল্লী, ৩য় অনুবাক) ইত্যাদিশ্রুতের্মনসি সুপ্তে প্রাণাদেরভাবাৎ অহং সংকল্পবান্‌, অহং বিকল্পবা-নিত্যাদ্যনুভবাচ্চ মন আত্মেতি বদতি।

(গ) অপরশ্চার্বাকঃ "তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমুপেত্য উচুঃ (ছান্দোগ্য ৫ম অঃ ১ম খণ্ড ৭ম মন্ত্র) ইত্যাদিশ্রুতেঃ ইন্দ্রিয়াণামভাবে শরীরচালনাভাবাৎ কাণোঽহং বধিরোঽ-হমিত্যাদ্যনুভবাচ্চ ইন্দ্রিয়াণি আত্মেতি বদতি।

হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়া, জড়ই বিশ্বের চরম ও পরমতত্ত্ব এইরূপ অভিমত সমর্থন করিয়া, জড়বাদী আখ্যা লাভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য মনস্তাত্ত্বিকগণ (Western Psychologists) মন আত্মবাদ সমর্থন করিয়াছেন; মনের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন নাই। মনকেই তাঁহারা আত্মার স্থানে বসাইয়া, জ্ঞান, ইচ্ছা, চিন্তা, চেষ্টা প্রভৃতি বিভিন্ন মনোভাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে মন জড়। মনোব্যাপার স্বতঃ উৎসারিত হয় না। মনোযন্ত্রকেও চালনা করিতে হয়। চিদানন্দঘন আত্মাই জড় দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের চালক এবং ভাসক। আত্মা কর্তৃক সঞ্চালিত না হইলে, জড় মন স্বেচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না। আত্মচেতনার অভাবে দেহযন্ত্র যেমন বিকল, বিবশ হইয়া থাকে, আত্মপ্রেরণার অভাবে মনোযন্ত্রও সেইরূপ অচল ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। চিন্ময় স্বপ্রকাশ আত্মা মনের গুহায় বিরাজ করিয়া মনকে সতত জাগরূক এবং কর্মচঞ্চল রাখে। আত্মার প্রেরণা ব্যতীত জড় মন-আত্মবাদও যে দেহাত্মবাদের ন্যায়ই অচল, তাহা আমরা আলোচ্য চার্বাকমতের খণ্ডন প্রসঙ্গে বিচার করিয়া দেখাইব।

প্রসঙ্গতঃ ইহাও এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ভারতীয় দর্শন-চিন্তার ইতিহাসে আর এক শ্রেণীর দার্শনিকের পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁহারা আত্মবাদকেই আদৌ মানিতে প্রস্তুত নহেন। শাশ্বত আত্মবাদের পরিবর্তে মহাযানিক বৌদ্ধপণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ চিরচঞ্চল বিজ্ঞানপ্রবাহকে, কেহ বা শূন্যবাদ বা নৈরাত্ম্যবাদকেই সমর্থন করিয়া থাকেন। আত্মা বলিয়া কিছুই নাই, এইরূপ মতই নৈরাত্ম্যবাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় এই মতের পরিপোষক। লঙ্কাবতারসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে আলোচ্য নৈরাত্ম্যবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহামনীষী বৌদ্ধতার্কিক নাগার্জুন তাঁহার মাধ্যমিক কারিকায় নানাপ্রকার যুক্তিজালের অবতারণা করিয়া, এই মত সমর্থন করিয়াছেন।[১] নব্যন্যায়গুরু মথুরানাথ তর্কবাগীশ উদয়নকৃত আত্মতত্ত্ববিবেকের টীকায় নৈরাত্ম্য-বাদের বিবরণপ্রসঙ্গে শূন্যবাদী বৌদ্ধের সিদ্ধান্তে নৈরাত্ম্যদর্শনই যে মুক্তির কারণ

আত্মার নাস্তিত্ববাদ বা নৈরাত্ম্যবাদ

১। নাগার্জুনের মাধ্যমিক কারিকার আত্মপরীক্ষাপ্রকরণ দ্রষ্টব্য। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত ধর্মকীর্তি প্রমাণবার্তিক গ্রন্থে বৌদ্ধসিদ্ধান্তে নৈরাত্ম্যদৃষ্টিকেই সম্যগ্‌দৃষ্টি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্তিক ১ম পরিঃ ২৭৩ কাঃ দ্রষ্টব্য।

তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন।[১] ইহা হইতে এইমত যে একসময়ে নাগার্জুন প্রভৃতির মনীষার আলোকে আলোকিত হইয়া বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধতার্কিকগণ তাঁহাদের প্রতিপাদ্য আত্মার নাস্তিত্ব সাধন করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত অনুমানের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "আত্মা নাই যেহেতু আত্মার জন্ম নাই, যাহা জন্মে না, তাহা নাই, যেমন শশকের (খরগোসের) শৃঙ্গ"—নাস্তি আত্মা অজাতত্বাৎ শশবিষাণবৎ। ন্যায়বার্তিক, ৩য় অঃ ১ম আঃ ১সূঃ; এই অনুমানে আত্মার নাস্তিত্ব সাধ্য বা প্রতিপাদ্য, অজাতত্ব বা জন্মরাহিত্য হেতু এবং শশ-শৃঙ্গ দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আত্মার নিত্যতাবাদী আস্তিক দার্শনিকগণ শাশ্বত বিভু আত্মার উৎপত্তি বা জন্ম স্বীকার করেন না। শশ-শৃঙ্গেরও উৎপত্তি নাই। শশ-শৃঙ্গ অলীক ইহা সুধীমাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং যাহা কস্মিন্ কালেও জন্মেনা, তাহা একেবারেই নাই; উহা অলীক। অজ আত্মাও ফলে অলীকই হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাই শশ-শৃঙ্গের দৃষ্টান্ত উপন্যাস করিয়া শূন্যবাদী বৌদ্ধ প্রদর্শিত অনুমানের সাহায্যে উপপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উল্লিখিত অনুমানের প্রতিপাদ্য আত্মার নাস্তিত্ব খণ্ডন করিতে গিয়া, উদ্দ্যোতকর তাঁহার ন্যায়বার্তিকে বলিয়াছেন যে, শূন্যবাদীর অনুমানে "আত্মা নাই" ইহাই হইল প্রতিজ্ঞা। এইরূপ প্রতিজ্ঞাই আত্মা যে শশশৃঙ্গের ন্যায় একেবারে অলীক নহে, তাহা বুঝাইয়া দেয়। আত্মা একেবারেই অলীক হইলে "আত্মা নাই" এইরূপ প্রতিজ্ঞাই উপপাদন করা চলেনা। কেননা, যে-বস্তু কোন দেশে কোন কালেই নাই, বা থাকে না, যাহা অলীক, তাহার অভাব-বোধেরও উদয় হয়না। অভাব-বোধে যেই বস্তুর অভাববুদ্ধি হয়, সেই বস্তুর (অভাবের প্রতিযোগীর) জ্ঞানও যে অন্যতম কারণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? পুস্তক না চিনিলে পুস্তকের অভাব বুঝা যায় কি? এই অবস্থায় আত্মা একেবারেই অলীক হইলে, "আত্মা নাই" এইরূপ আত্মার অভাব-বোধের উদয় হইবে

বৌদ্ধোক্ত নৈরাত্ম্যবাদের সাধক অনুমান ও তাহার খণ্ডন

১। বৌদ্ধৈ র্নৈরাত্ম্যজ্ঞানস্যৈব মোক্ষহেতুত্বোপগমাৎ।
তদুক্তম্—নৈরাত্ম্যদৃষ্টিং মোক্ষস্য হেতুং কেচন মন্বতে।
আত্মতত্ত্বধিয়ন্ত্বন্যে ন্যায়বেদানুসারিণঃ॥
আত্মতত্ত্ববিবেকের মাথুরী টীকা

কিরূপে? "আত্মা নাই" এইরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারাই আত্মা বলিয়া যে একটি তত্ত্ব আছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। আত্মাকে শশ-শৃঙ্গের ন্যায় অলীক বলা চলে না। ইহার উত্তরে শূন্যবাদী বলেন যে, শশ-শৃঙ্গ যে অলীক, ইহা সকলেই (প্রতিবাদীও) স্বীকার করেন। শশ-শৃঙ্গ বস্তুতঃ অলীক হইলেও, "শশকের শৃঙ্গ নাই" এইরূপ শশকের শৃঙ্গের অভাব-বোধের উদয় হইতে তো কোন বাধা দেখা যায় না। শশ-শৃঙ্গ কোন দেশে কোন কালেই নাই বা থাকেনা। কোথায়ও শশ-শৃঙ্গের সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া, 'শশ-শৃঙ্গং নাস্তি' এইরূপ উক্তিদ্বারা কোন নির্দিষ্ট দেশে বা কালে যে শশ-শৃঙ্গের অভাব বুঝাইয়া থাকে, তাহা নহে। এই অভাব আত্যন্তিক এবং সর্বকালীন। অলীক শশ-শৃঙ্গের এইরূপ অভাব-বোধ সম্ভবপর হইলে, "আত্মা নাই" এইরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারা অলীক আত্মার আত্যন্তিক অভাব-বোধের উদয় হইতেই বা বাধা কি? শূন্যবাদীর এইরূপ কথার উত্তরে উদ্দ্যোতকর বলেন যে, নৈরাত্ম্যবাদী তাঁহার অনুমানে আত্মার নাস্তিত্ব সাধনে শশ-শৃঙ্গকে যে দৃষ্টান্ত হিসাবে উপন্যাস করিয়াছেন, তাহা এক্ষেত্রে অসঙ্গত হইয়াছে। কেননা, "শশশৃঙ্গং নাস্তি" এই কথার দ্বারা গো প্রভৃতি প্রাণীর ন্যায় খরগোসের শৃঙ্গ নাই, (খরগোসে শৃঙ্গবত্তার অভাব) ইহাই বুঝা যায়। শশ-শৃঙ্গ নামে কোন বস্তু নাই, এইরূপ বুঝায় না। শশ-শৃঙ্গ অত্যন্ত অসৎ এবং অলীক ইহা কে না জানে? শশ-শৃঙ্গরূপ অলীক দ্রব্যের নিষেধ হয় না, হইতে পারেনা। গরু, মহিষ প্রভৃতি প্রাণীর যেমন শৃঙ্গ আছে, খরগোসের সেইরূপ শৃঙ্গ নাই, ইহাই শুধু "শশ-শৃঙ্গং নাস্তি" এইরূপ উক্তির তাৎপর্য বলিয়া জানিবে। শূন্যবাদীর মতানুসারে আত্মা অত্যন্ত অসৎ বা অলীক হইলে, অলীক আত্মার অভাব-বোধ কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না, নিষেধেরও সেক্ষেত্রে কোন অর্থ থাকেনা। এইজন্যই অভাব-বিশেষজ্ঞ নৈয়ায়িকগণ অলীকবস্তুর (অলীক-প্রতিযোগিক) অভাব স্বীকার করেন না। ন্যায়ের দৃষ্টিতে "আত্মা নাই" কথার দ্বারা ক্ষেত্র বিশেষে আত্মার সাময়িক অভাবই সূচিত হইয়া থাকে। সর্বদেশে সর্বকালে আত্মার নাস্তিত্ব বুঝায় না। ফলে, শূন্যবাদীর প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ আত্মা বলিয়া কোন তত্ত্ব না থাকিলে, আত্মা আকাশকুসুমের ন্যায় একেবারেই অলীক হইলে, ঐরূপ অলীক আত্মাকে আশ্রয় করিয়া "নাস্তিত্বের" অনুমান করাই চলে না। কারণ, সর্বপ্রকার অনুমানেই সাধ্যের আধার, আশ্রয় বা পক্ষ প্রসিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অনুমানের সাধ্যের আধার বা পক্ষ অসিদ্ধ

হইলে, অনুমান যে সেক্ষেত্রে "আশ্রয়াসিদ্ধি" নামক হেত্বাভাস-দোষ-দুষ্ট হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। আকাশকুসুম অলীক বস্তু। ঐ অলীক আকাশকুসুমকে আশ্রয় বা পক্ষ করিয়া "আকাশকুসুমং সুরভি" আকাশকুসুমে গন্ধ আছে, এইরূপ অনুমান যেমন "আশ্রয়াসিদ্ধি" নামক হেত্বাভাস কলুষিত, অলীক আত্মাকে আশ্রয় করিয়া শূন্যবাদী বৌদ্ধের প্রদর্শিত "আত্মা নাস্তি" এইরূপে আত্মার নাস্তিত্ব অনুমানও সেইরূপ 'আশ্রয়াসিদ্ধি' বা পক্ষাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস-কলুষিত হইতে বাধ্য। তারপর, আলোচ্য অনুমানে অজাতত্ব বা জন্মরাহিত্যকে যে আত্মার নাস্তিত্বসাধনে হেতুরূপে উপন্যাস করা হইয়াছে, সেখানে প্রশ্ন এই যে, "আত্মার জন্ম নাই" এই কথাদ্বারা বৌদ্ধ কি বুঝিতেছেন ? অভিনব দেহের সহিত আত্মার প্রাথমিক সম্বন্ধকেই আত্মার জন্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। দেহ প্রভৃতির ন্যায় আত্মার মুখ্য জন্ম না থাকিলেও, শরীর-সম্পর্ক-নিবন্ধন গৌণজন্ম যে আছে, তাহা সুধী দার্শনিক অস্বীকার করিতে পারেন না। যদি "জন্মরাহিত্য" কথার দ্বারা আলোচ্য ক্ষেত্রে শূন্যবাদী আত্মার "মুখ্য জন্ম নাই", ইহাই বুঝাইতে চাহেন, তবে সেক্ষেত্রেও ঐরূপ হেতুদ্বারা "আত্মা নাস্তি" আত্মা অলীক, ইহা কিছুতেই বুঝা যায় না। যে পদার্থ জন্মে না, তাহাই নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিই গ্রহণ করিতে পারেন না। পদার্থ দুইপ্রকার নিত্য এবং অনিত্য। নিত্য পদার্থ কদাচ জন্মে না। অনিত্য বিশ্বপ্রপঞ্চই লীলাময়ী ধরিত্রীর বুকে জন্মলাভ করে। এই অবস্থায় "আত্মার জন্ম নাই" এই কথার দ্বারা আত্মা যে জনন-মরণশীল দেহ প্রভৃতির ন্যায় অনিত্য ভাববস্তু নহে, ইহাই সূচিত হইয়া থাকে। আত্মার নাস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। অজাতত্ব বা জন্মরাহিত্য কোন পদার্থেরই নাস্তিত্বের সাধক হয় না। ফলে, আত্মার নাস্তিত্বসাধনে বৌদ্ধোক্ত "জন্মরাহিত্য" হেতু, প্রকৃত হেতু নহে ; ইহা হেত্বাভাস।

জীবিত ব্যক্তিমাত্রেরই শরীর নিরাত্মক বা আত্ম-বিহীন; যেহেতু জীবিত ব্যক্তির শরীরের সত্তা আছে। যাহা সৎ তাহাই বৌদ্ধসিদ্ধান্তে ক্ষণস্থায়ীও বটে, নিরাত্মকও বটে। বস্তুমাত্রই এই দৃষ্টিতে নিরাত্মক, জীবিত ব্যক্তির শরীরও সুতরাং নিরাত্মকই হইবে ; জীবিতব্যক্তির শরীরে আত্মা বলিয়া কিছুই নাই।[১] এইরূপ অনুমান-প্রয়োগের সাহায্যে যে সকল বৌদ্ধাচার্য "নৈরাত্ম্যবাদ" (আত্মা

১। অপরে তু জীবচ্ছরীরং নিরাত্মকত্বেন পক্ষয়িত্বা সত্ত্বাদিত্যেবমাদিকং হেতুং ব্রুবতে।
—ন্যায়বার্তিক, ৩ অঃ, ১ আঃ ১ সূত্র

নাস্তি এইরূপ) সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে চাহেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিতে গিয়া উদ্দ্যোতকর তাঁহার ন্যায়বার্তিকে বলিয়াছেন যে, জীবিতব্যক্তির শরীরে আত্মা নাই, এই কথা দ্বারা আত্মার নাস্তিত্ব প্রমাণ করা চলে না ; গৃহে ঘট নাই বলিলে যেমন গৃহ ছাড়া অন্য কোথায়ও ঘটের অস্তিত্ব বুঝা যায়, সেইরূপ "শরীরে" আত্মা নাই" ইহা দ্বারা শরীর ব্যতীত অন্য কোথায়ও আত্মার অস্তিত্বই প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। কোন স্থানে আত্মা না থাকিলে, অর্থাৎ কোন পদার্থ আত্মযুক্ত (সাত্মক) না লইলে, কোন বস্তুকে "নিরাত্মক" বলাও চলে না। নিরর্থক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে, "আত্মন্" শব্দের যে ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সকলই অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় আত্মন্ শব্দের কোনই অর্থ বা প্রতিপাদ্য নাই, ইহা কোন সুধীই স্বীকার করিতে পারেন না।

নৈরাত্ম্যবাদ প্রকৃত বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে

প্রকৃত রহস্য এই যে, কোন কোন বৌদ্ধপণ্ডিত বৌদ্ধসিদ্ধান্তে "আত্মা নাই" এইরূপ "নৈরাত্ম্যবাদ" প্রচারের চেষ্টা করিলেও, উহাকে যথার্থ বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্বিবাদে গ্রহণ করা যায় না। অভিনিবেশ সহকারে বৌদ্ধদর্শন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধশাস্ত্রে রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার, এই পাঁচটিকে "স্কন্ধ" নামে অভিহিত করিয়া, এই রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধকেই আত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সংসারী জীবের বিবিধ দুঃখই বৌদ্ধসিদ্ধান্তে "স্কন্ধ" আখ্যা লাভ করিয়াছে।[১] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরস প্রভৃতি বিষয় এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের নাম (ক) "রূপ স্কন্ধ"; (খ) "বিজ্ঞান স্কন্ধ" প্রধানতঃ দুই প্রকার, আলয়বিজ্ঞান এবং প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, "অহম্" "অহম্" এইপ্রকার বিজ্ঞানপ্রবাহকে আলয়বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। নীলরূপ প্রভৃতির ভাসক বিজ্ঞানপ্রবাহের নাম প্রবৃত্তিবিজ্ঞান[২]।

১। দুঃখং সংসারিণঃ স্কন্ধাস্তে চ পঞ্চ প্রকীর্তিতাঃ।
বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ।
মাধবাচার্য-কর্তৃক সর্বদর্শন সংগ্রহে উদ্ধৃত
বৌদ্ধ-কারিকা।

২। তত্র আলয়বিজ্ঞানং নাম অহমাস্পদং বিজ্ঞানং নীলাদ্যুল্লেখি চ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানম্। যথোক্তম্ :—

তৎ স্যাদালয়বিজ্ঞানং যদ্ভবেদহমাস্পদম্।
তৎ স্যাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং যন্নীলাদিকমুল্লিখে দিতি।
সর্বদর্শন সংগ্রহ—বৌদ্ধদর্শন।

এই উভয়প্রকার বিজ্ঞানপ্রবাহই "বিজ্ঞানস্কন্ধ" বলিয়া পরিচিত। আলোচ্য রূপস্কন্ধ এবং বিজ্ঞানস্কন্ধের সম্বন্ধবশতঃ যে সুখদুঃখাদি বেদনা প্রবাহের সৃষ্টি হয়, তাহাকে বলে (গ) "বেদনাস্কন্ধ"। গৌঃ এই প্রকার সংজ্ঞাশব্দযুক্ত বিজ্ঞানপ্রবাহের নাম (ঘ) "সংজ্ঞাস্কন্ধ" এবং পূর্বোক্ত "বেদনাস্কন্ধ"-জন্য রাগ, দ্বেষ, মদ, মান, অভিমান, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতির নাম (ঙ) "সংস্কার স্কন্ধ"[১]। এই স্কন্ধ পঞ্চকই আত্মা। আলোচ্য পঞ্চস্কন্ধের সমুদায়-ব্যতীত আত্মা বলিয়া কোন ভিন্ন তত্ত্ব নাই। আত্ম-সম্পর্কে ইহাই প্রাচীন মহাযানিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। মহাকবি মাঘ তাঁহার শিশুপালবধ নামক মহাকাব্যে বৌদ্ধোক্ত এই পঞ্চস্কন্ধবাদের উল্লেখ করিয়াছেন।[২] ইহা হইতে "স্কন্ধবাদ" যে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। এই "স্কন্ধবাদে" রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান প্রভৃতিকেই যে ঠিক "আত্মা" বলা হইয়াছে, তাহা নহে। হে ভদন্ত, আমি রূপ নহি, আমি বেদনা নহি, আমি সংজ্ঞা নহি, সংস্কার বা বিজ্ঞানও নহি;[৩] ন্যায়বার্তিকে উদ্দ্যোতকর কর্তৃক উদ্ধৃত ঐরূপ বৌদ্ধ উক্তি হইতে বৌদ্ধসিদ্ধান্তেও আত্মা যে রূপ, বেদনা প্রভৃতি পঞ্চস্কন্ধের অতীত—কোন দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব, ইহাই স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। "আত্মা নাই" ইহা বুঝা যায় না। আত্মা নাই, আলোচ্য বৌদ্ধ উক্তির ইহাই মর্ম হইলে, সোজাসুজি আত্মা নাই, তুমি নাই,

১। তত্র রূপ্যন্তে এভির্বিষয়া ইতি রূপ্যন্ত ইতি চ ব্যুৎপত্ত্যা সবিষয়াণি ইন্দ্রিয়াণি রূপস্কন্ধঃ। আলয়বিজ্ঞান-প্রবৃত্তিবিজ্ঞানপ্রবাহো বিজ্ঞানস্কন্ধঃ। প্রাগুক্তস্কন্ধদ্বয়সম্বন্ধজন্যঃ সুখাদিপ্রত্যয়প্রবাহো বেদনাস্কন্ধঃ। গৌরিত্যাদি শব্দোল্লেখি সবিজ্ঞানপ্রবাহঃ সংজ্ঞাস্কন্ধঃ। বেদনাস্কন্ধনিবন্ধনা রাগদ্বেষাদয়ঃ ক্লেশা উপক্লেশাশ্চ মদমানাদয়ঃ ধর্মাধর্মৌ চ সংস্কারস্কন্ধঃ।

সর্বদর্শন সংগ্রহ—বৌদ্ধদর্শন।

২। সর্বকার্যশরীরেষু মুক্তাঙ্গ স্কন্ধপঞ্চকম্।
সৌগতানামিবাত্মান্যো নাস্তি মন্ত্রো মহীভৃতাম্॥

শিশুপালবধ—২।২৮,

৩। নাস্ত্যাত্মেতি চৈবং ব্রুবাণঃ সিদ্ধান্তং বাধতে। কথমিতি? রূপং ভদন্ত নাহম্, বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো বিজ্ঞানং ভদন্ত নাহম্, এবমেতদ্‌ভিক্ষো রূপং ন ত্বং বেদনা সংস্কারো বিজ্ঞানং বা ন ত্বমিতি! (আত্মা সম্পর্কে ভিক্ষু ভদন্তের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বুদ্ধ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই উদ্দ্যোতকর ন্যায়বার্তিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন।)

—ন্যায়বার্তিক ৩।১।১সূঃ;

আমি নাই, এইভাবেই আত্মার নাস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা স্বাভাবিক হইত। আমি রূপ নহি, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা বা সংস্কার নহি, এইরূপে আত্মার বিশেষ ভাবের নিষেধ সেরূপ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইত। রূপাদি পঞ্চস্কন্ধের কোন একটি স্কন্ধই আত্মা নহে। আলোচ্য পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিই আত্মা। ইহাই "আমি রূপ নহি" "বেদনা নহি" এই সকল নিষেধ উক্তির মর্ম হইলে, বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তেও আত্মার অস্তিত্বই নামান্তরে মানিয়া লওয়া হয় না কি? যে-সকল বৌদ্ধ তার্কিক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; নৈরাত্ম্যবাদই বৌদ্ধের সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃত বৌদ্ধসিদ্ধান্তের অপলাপই করিয়া থাকেন। "নাস্তি আত্মেতি চৈবং ব্রুবাণঃ সিদ্ধান্তং বাধতে।" বুদ্ধদেব "আত্মা নাই" এমন কথা তাঁহার দর্শনে কোথায়ও স্পষ্টতঃ বলেন নাই। পক্ষান্তরে "সর্বাভিসময়সূত্র" নামক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে আত্মার নাস্তিত্ববাদীকে মিথ্যাজ্ঞানী বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন—যশ্চাত্মা নাস্তীতি ব্রূতে স মিথ্যাদৃষ্টিকো ভবতীতি সূত্রম্। পালিভাষায় লিখিত পোট্‌ঠপাদসূত্ত নামক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় যে, আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে ভিক্ষু পোট্‌ঠপাদের প্রশ্নের উত্তরে আত্মার স্বরূপ অতি দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই বুদ্ধদেব আত্ম-সম্পর্কে কোন প্রশ্নেরই কোনরূপ উত্তর প্রদান করেন নাই। 'আত্মা আছে' ইহাও বলেন নাই, 'আত্মা নাই' ইহাও বলেন নাই। বুদ্ধদেব মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। ইহা হইতে বুদ্ধদেবের মতে আত্মা নাই, নৈরাত্ম্যবাদই তাঁহার অভিপ্রেত, এইরূপ বুঝিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বুদ্ধদেবের মতে আত্মা না থাকিলে, তিনি জিজ্ঞাসু পোট্‌ঠপাদকে "আত্মা তোমার পক্ষে দুর্জ্ঞেয়" এইরূপ উত্তর দিবেন কেন? আত্মা বলিয়া কিছু নাই, এইরূপই সোজাসুজি বলিতে পারিতেন। আত্মার প্রশ্নে মৌনাবলম্বনের অর্থই এই যে, আত্মা অবাঙ্-মনসগোচর অতি গহনতত্ত্ব। 'বোধি'র সাহায্যেই কেবল আত্মাকে জানিতে পারা যায়; ভাষায় আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করা চলে না; আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া অপরকে বুঝানও যায় না। পালিভাষায় লিখিত কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে ইহাও দেখা যায় যে, "আত্মা আছে" বলিলেও ভগবান্ বুদ্ধ হাঁ বলিয়াছেন। "আত্মা নাই" বলিলেও, বুদ্ধদেব হাঁ বলিয়াছেন। ইহা হইতে শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধসম্প্রদায় মনে করেন যে, বুদ্ধদেবের মতে আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, আত্মা সৎও নহে,

অসৎও নহে।[১] শেষ পর্যন্ত কিছুই নাই, মহাশূন্যতাই চরম তত্ত্ব। আলোচ্য মাধ্যমিক শূন্যবাদের সমালোচনা করিতে গিয়া মহানৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, ইহা বড়ই বিরুদ্ধ কথা। আত্মার অস্তিত্ব নাই বলিলে আত্মার নাস্তিত্বই ("আত্মা নাই" ইহাই) সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে নাস্তিত্ব নাই বলিলে, অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। এই অবস্থায় আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, ইহা কিরূপে বলা যায়? আত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে, জ্ঞানেরও কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জগতে চৈতন্যের অস্তিত্ব আছে। বিশ্ব কেবল জড়েরই বিলাস নহে। জড় জগতের অন্তরালে জড়ের ভাসক চৈতন্য না থাকিলে, জড়বস্তু কিছুতেই প্রকাশিত হইতে পারিত না। জগতে কেবল গভীর অন্ধকারই বিরাজ করিত "জগদান্ধ্যং প্রসজ্যেত", ইহা কোন বুদ্ধিমান্ দার্শনিকই অস্বীকার করিতে পারেন না। জগতে চৈতন্যই একমাত্র আলোক—সেই আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়াই জড় জগতের বিকাশ হইয়াছে। জড়ের ভাসক সেই চৈতন্যের যিনি আধার বা আশ্রয় ন্যায়মতে তিনিই আত্মা। অহম্ বা আমি এইরূপে সকলেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। আমি ইহা জানিতেছি (অহম্ ইদম্ জানামি), ইহা দেখিতেছি এইরূপ, সর্বজনীন যে অনুভূতি দেখা যায়, সেখানে 'আমি জ্ঞাতা,' 'ইহা' জ্ঞেয়। জ্ঞান-ক্রিয়া জ্ঞাতা আমি এবং জ্ঞেয়বিষয়ের মধ্যে একপ্রকার যোগ সংঘটন করিয়া, জ্ঞেয় বস্তুটিকে জ্ঞাতা আমির নিকট প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা হইতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যে বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। যাহা অহংপ্রত্যয়গম্য তাহাই আত্মা। এইরূপ আত্মার সম্পর্কে, 'আমি নাই', কিংবা আমি আমি কি না? এইরূপ ভ্রম বা সংশয় কোন স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিরই কখনও উদয় হইতে দেখা যায় না।

আত্মা অহংপ্রত্যয়-গম্য, আত্মার নাস্তিত্বের প্রশ্নই আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত করে

১। বুদ্ধৈরাত্মা নবা নাত্মা কশ্চিদিত্যপি দর্শিতম্।

নাগার্জুনকৃত মাধ্যমিক কারিকা, ১২৭ পৃষ্ঠা;

আত্মনোঽস্তিত্বনাস্তিত্বে ন কথঞ্চিচ্চ সিধ্যতঃ।

তং বিনাস্তিত্বনাস্তিত্বে ক্লেশানাং সিধ্যতঃ কথম্॥

নাগার্জুনকৃত মাধ্যমিক কারিকা, ১৬৩ পৃষ্ঠা;

সুতরাং এই আত্ম-দর্শন যে অভ্রান্ত, এ বিষয়ে কোন সুধী দার্শনিকেরই কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। তুমি বিশ্বের তাবদ্ বস্তুকেই নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতে পার, কিন্তু "আমি নাই" আমার আত্মা নাই, এইরূপে তোমার নিজ আত্মার অস্তিত্ব তো তুমি কোনমতেই বিলোপ করিতে পার না। কেননা, তুমি নিজেই যে তোমার আত্মা। তুমি নিজে তোমার আত্মাকে বিলোপ করিবে কিরূপে[১]? এই আত্মা স্বতঃ প্রমাণ, ইহা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন প্রমাণের প্রশ্নও নিরর্থক। কারণ, যিনি আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণের প্রশ্ন করিবেন, তিনি নিজেই যে আত্মা। প্রশ্নকারী নিজে না থাকিয়া তো আর প্রশ্ন করিতে পারিবেন না। বাদী না থাকিলে বাদ প্রতিবাদ চলে না। আত্মা না থাকিলে প্রমাণের প্রমাণত্বও সম্ভবপর হয় না। ন প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি—ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ৪১-৪২ পৃষ্ঠা। প্রমাতা বা অনুভবিতা বলিয়া কিছু না থাকিলে, প্রমা বা অনুভবের কোনই মূল্য থাকে না। এই অবস্থায় আত্ম-সম্পর্কে কোনরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে গেলে, জ্ঞাতা আত্মার অস্তিত্ব পূর্বেই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। জ্ঞাতা না থাকিলে প্রমাণের উপন্যাস করিবে কে? প্রমাণের প্রয়োগ যাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সেই অহংপ্রত্যয়গম্য আত্মা যে স্বতঃসিদ্ধ (প্রমাণাধীন সিদ্ধ নহে), ইহা না মানিয়া উপায় নাই।[২] তারপর, চৈতন্যের অস্তিত্ব সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যিনি নিজের জ্ঞানের অস্তিত্বই মানেন না, তিনি কিছুই জানেন না, বুঝিতেও পারেন না। তিনি তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিবেন কিরূপে? "ইহা আমার কল্যাণ-

---

১। (ক) 'অহ' মিত্যসন্দিগ্ধাবিপর্যস্তাপরোক্ষানুভব সিদ্ধ ইতি ন জিজ্ঞাসাস্পদম্। নহি জাতু কশ্চিদত্র সন্দিগ্ধে অহং বা নাহং বেতি। ন চ বিপর্যস্যতি নাহমেবেতি।

অধ্যাস ভাষ্য-ভামতী ৫ পৃঃ নির্ণয় সাগর সং;

(খ) সর্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্ব প্রসিদ্ধিঃ।

সর্বোহ্যাত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি, ন নাহমস্মীতি।

যদি হি নাত্মাস্তিত্ব প্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ, সর্বোলোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ।

ব্রহ্মসূত্র শংভাষ্য, ১।১।১।

২। ন চ প্রমাতৃত্ব মন্তরেণ প্রমাণ প্রবৃত্তিরস্তি ইত্যাদি

অধ্যাস ভাষ্য ও ভামতী দ্রষ্টব্য ১।১।১।

কর" এইরূপ (ইষ্টসাধনতার) জ্ঞান ব্যতীত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কোন বিষয়ে কোনরূপ প্রবৃত্তি বা চেষ্টারই উদয় হইতে দেখা যায় না। জীবের সর্ববিধ চেষ্টার মূলেই আছে তাঁহার আত্ম-প্রীতির দীপ্ত চেতনা। আত্মা না থাকিলে প্রীতি হইবে কাহার? স্বীয় কল্যাণবুদ্ধি না থাকিলে চেষ্টাই বা জন্মিবে কেন? সুতরাং ইষ্টসাধনতা জ্ঞানই যে জীবের প্রবৃত্তির মূল, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ঐ জ্ঞানের যাহা আশ্রয়, নৈয়ায়িক বলেন যে, তাহাই জ্ঞাতা বা আত্মা। জ্ঞাতা ন্যায়মতে আত্মারই নামান্তর। জ্ঞান মানিলেই জ্ঞানের আশ্রয়ও অবশ্য মানিতে হইবে। ন্যায়ের সিদ্ধান্তে জ্ঞান গুণ পদার্থ। গুণ পদার্থ কোন দ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞান আছে কিন্তু তাহার আশ্রয় নাই, ইহা অসম্ভব কথা। আত্মার নাস্তিত্বের সাধক কোনরূপ সুদৃঢ় প্রমাণ নাই; পক্ষান্তরে, আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে কাহারও কোনরূপ ভ্রম বা সংশয় নাই। সুতরাং অহং প্রত্যয়গম্য আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য[1]। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব পরস্পর-বিরুদ্ধ। ইহাদের একটি অপ্রমাণ হইলেই, অপরটি প্রমাণসিদ্ধ হইবে। "আত্মা নাই" এইরূপ নৈরাত্ম্যবাদীর সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না থাকায়, আত্মার অস্তিত্ব যে প্রমাণিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আত্মা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক হইলে, ঐ অলীক আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কিছুই বৌদ্ধতার্কিকগণ সাধন করিতে পারিবেন না। কেননা, সেক্ষেত্রে তাঁহাদের নাস্তিত্বের অনুমানে অনুমানের পক্ষ (সাধ্যের আধার বা আশ্রয়) আত্মা অলীক হওয়ায়, অনুমান যে "আশ্রয়াসিদ্ধি" নামক হেত্বাভাস হইবে, ইহা আমরা পূর্বেই (৫ পৃষ্ঠায়) আলোচনা করিয়াছি।

অহংপ্রত্যয়গম্য আত্মার অস্তিত্ব সর্ববাদিসিদ্ধ হইলেও, "আত্মা আছে" এই প্রশ্নের উত্তরেও বুদ্ধদেব যেমন হ্যাঁ বলিয়াছেন, "আত্মা নাই" এইরূপ প্রশ্নের উত্তরেও তিনি অনুরূপভাবেই হ্যাঁ বলিয়াছেন, এইরূপে যে কোন-কোন বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায়, ইহার তাৎপর্য এইরূপই বুঝিতে হইবে যে, আত্মতত্ত্ব অতি

১। অস্তি আত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ।

—সাংখ্যসূত্র ৬।১ এবং উক্ত সূত্রের বিজ্ঞান ভিক্ষু-কৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

দুর্জ্ঞেয়; আত্মতত্ত্ব বুঝিবার অধিকার সকলের সমান নহে। যাঁহার যতটুকু গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, সে ততটুকুই গ্রহণ করে; এবং সত্যদর্শী গুরু শিষ্যের গ্রহণ করিবার অধিকার বুঝিয়াই, শিষ্যকে আত্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। অধ্যাত্ম-বিষ্যার আকর উপনিষদেও বিভিন্ন অধিকারীর জন্য ভিন্নপ্রকার আত্মোপদেশ দেওয়ার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগুরুর একই বাণী স্বীয় বুদ্ধির তারতম্যানুসারে ভিন্নরুচি শিষ্য ভিন্নভাবে গ্রহণ করিবেন, ইহাও বিচিত্র নহে। এইজন্য অধ্যাত্মরাজ্যেও নানা সম্প্রদায় এবং প্রস্থান ভেদের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। বৌদ্ধের সম্প্রদায়-ভেদ-সম্পর্কেও এই একই কথা শুনা যায়।[১] তর্কের সাহায্যে আত্মার যথার্থরূপ জানিতে পারা যায় না, বোধি বা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়। এই মহাসত্যই বুদ্ধদেব পুনঃ পুনঃ উপদেশের দ্বারা তাঁহার শিষ্যগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নির্বাণ লাভের জন্য কঠোর তপস্যার, অষ্টাঙ্গযোগমার্গ বৈরাগ্য প্রভৃতির উপদেশ দিয়াছেন। আত্মা না থাকিলে ঐ নির্বাণ কাহার হইবে? কিরূপেই বা ঐ নির্বাণ মানবের কল্যাণ সাধন করিবে? তাঁহার কঠোর তপশ্চর্যা প্রভৃতি সার্থক হইবে? বুদ্ধদেবের নির্বাণের বাণীও আত্মার অস্তিত্বই সমর্থন করে। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী না হইলে, বুদ্ধকথিত জন্মান্তরবাদের উপদেশ সম্পূর্ণই অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায় না কি? বুদ্ধদেবের অপর নাম তথাগত। তাঁহার এই তথাগত নাম হইতেই তিনি যে বহু জন্ম-জন্মান্তর পরিভ্রমণ করিয়া বুদ্ধত্বে উপনীত হইয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। বোধিদ্রুম তলে সম্বোধিলাভ

১। দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ॥
সর্বদর্শন সংগ্রহে উদ্ধৃত
বোধিচিত্ত বিবরণের কারিকা।

ভগবান্ বুদ্ধের একই উপদেশকে স্বীয় অদৃষ্ট ও ধীশক্তির তারতম্যানুসারে বিভিন্ন শিষ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়া নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। নানাবিধ মত ও পথ আশ্রয় করিয়াছেন।

করিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেব "অনেক জাতি সংসারং"[১] এইরূপ যে গাথাটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে জন্মান্তরবাদের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়।[২] প্রসিদ্ধ বৌদ্ধজাতক-গ্রন্থে তথাগত বুদ্ধের পূর্ব পূর্ব জন্মের বিবিধ বিচিত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। অনাদি জন্মান্তর ধারার উচ্ছেদের জন্যই বৌদ্ধশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ-যোগমার্গ প্রভৃতির উপদেশ করা হইয়াছে। ইহা হইতে আত্মার অস্তিত্বই যে বৌদ্ধের অভিপ্রেত, 'নৈরাত্ম্যবাদ' অভিলষিত নহে, একথা স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়।

আত্মা আছে ইহা প্রমাণিত হইলেও, সেই আত্মা কি দেহ? না ইন্দ্রিয়? না প্রাণ? না বুদ্ধি? না দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সমষ্টি? না বৌদ্ধোক্ত (রূপ বেদনা প্রমুখ পঞ্চবিধ) স্কন্ধ সমষ্টি? না চিরচঞ্চল ক্ষণিক আলয় বিজ্ঞান প্রবাহই আত্মা? দ্বিতীয়তঃ এই আত্মা নিত্য, না অনিত্য? এক না বহু? সগুণ না নির্গুণ? ভূমা, অণু, না দেহপরিমাণ? আত্ম-সম্পর্কে এইরূপ পরস্পরবিরোধী বিবিধ প্রশ্ন অনুসন্ধিৎসুর চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। আমরা এই আলোচনায় দর্শনের আলোকবর্তিকার সাহায্যে ঐসকল জটিল প্রশ্নের সমাধান-পথের ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিব।

জরাবগ্গো

১। অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিস্সং,
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক, দিট্‌ঠো'সি পুন গেহং ন কাহসি,
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং,
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা।

এই গাথাটি বৌদ্ধদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ ধম্মপদে উল্লিখিত আছে।

২। ধম্মপদের ২৪ অধ্যায়—মনুজস্স পমত্তচারিণ ইত্যাদি গাথায়ও বৌদ্ধমতে জন্মান্তরবাদের অতিস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গাথাটি নিম্নে দেওয়া গেল :—

তণ্হাবগ্গো

মনুজস্স পমত্তচারিনো তণ্হা বড্ঢতি মালুবা বিয়,
সো প্লবতি হুরাহুরং ফলমিচ্ছং'ব বনস্মিং বানরো।
যং এসা সহতী জম্মী তণ্হা লোকে বিসত্তিকা,
সোকা তস্স পবড্ঢন্তি অভিবড্ঢং'ব বীরণং।

প্রথমতঃ চার্বাকের দেহাত্মবাদ এবং ভূতচৈতন্যবাদের কথাই আলোচনা করা যাইতেছে। এই চার্বাক মতও অতিশয় প্রাচীন। শুনা যায় যে, দেবগুরু বৃহস্পতি দৈত্যগণের বুদ্ধি কলুষিত করিবার উদ্দেশ্যে এই মত প্রবর্তিত করেন। বৃহস্পতির সূত্রই চার্বাক-দর্শনের সূত্রগ্রন্থ[১]। পরবর্তী চার্বাক পণ্ডিতগণের প্রতিভার অবদানে এই মত বিশেষ পুষ্টিলাভ করে এবং এই মতের উচ্ছেদ কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান রত্নাকর উপনিষৎ প্রভৃতিতে চার্বাকমতের অনুকূল উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। "অন্নরসের দ্বারা পরিপুষ্ট এই দেহই পুরুষ বা আত্মা"। ভূতবর্গ হইতে চৈতন্যোজ্জ্বল পুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে; পরিণামে ভূতবর্গ বিনষ্ট হইলে ঐ পুরুষও বিলয়প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর তাহার আর কোনরূপ সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না[২]। উপনিষদের এইপ্রকার আলোচনা হইতে দেহাত্মবাদ যে অতি প্রাচীনকালেই সুগঠিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উপনিষদে এই সকল প্রতিপক্ষ মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই আলোচিত হইয়াছে। উপনিষদের এই খণ্ডন প্রচেষ্টা দ্বারা এই মতের বলিষ্ঠতাই সূচিত হয়। চার্বাকের মতে ভূমি, জল, বায়ু ও অগ্নি এই চারপ্রকার জড়ভূতই মৌলিকতত্ত্ব; চৈতন্য মৌলিকতত্ত্ব নহে। জীবজগতে যে চৈতন্যের আভাস পাওয়া যায়, তাহা আলোচ্য চতুর্বিধ জড়ভূত হইতেই অবস্থাবিশেষে, ভূত-চতুষ্টয়ের বিচিত্র সন্ধান বা মিলনের ফলে, উৎপন্ন হইয়া থাকে।[৩] দৃষ্টান্ত স্বরূপে চার্বাক বলেন যে, গুড়, অম্লরস প্রভৃতি মিলিত হইয়া মদিরায়

চার্বাকোক্ত দেহাত্মবাদ বা ভূত চৈতন্যবাদ

১। এই বার্হস্পত্য সূত্র এখন পাওয়া যায় না। পরবর্তী দার্শনিক আচার্যগণের গ্রন্থে কতিপয় বিক্ষিপ্ত বৃহস্পতিসূত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল সূত্রই এই মতের উপজীব্য।

২। (ক) স বা এষঃ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ, তৈত্তিরীয়, ২ বল্লী, ১ অনুঃ, ১ম মন্ত্র,

(খ) বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি। ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তীতি। বৃহদাঃ ২।৪।১২

৩। পৃথিব্যপ্‌তেজো বায়ুরিতি তত্ত্বানি, তৎসমুদায়ে শরীরেন্দ্রিয়বিষয়সংজ্ঞাঃ, তেভ্যশ্চৈতন্যম্। বৃহস্পতি-সূত্র।

*স্বপ্রকাশ চৈতন্যের কথা দূরে থাকুক, জড় দেহ হইতে কিংবা দেহের উপাদান

পরিণত হইলে, তাহাতে যেমন মদশক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ বিচিত্র সন্ধানের ফলে উক্ত ভূতচতুষ্টয় দেহাকারে পরিণত হইলে, তাহাতে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে।* জড় ভূতবর্গ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেন বলিয়া, চার্বাক পণ্ডিতগণ 'ভূতচৈতন্যবাদী' বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকেন। ভূতচৈতন্যবাদ ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি কোন দর্শনেরই অনুমোদন লাভ করে নাই। ঐ সকল দার্শনিক আচার্যগণ ভূতচৈতন্যবাদ তাঁহাদের দর্শনে অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া, খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, জড় ও চৈতন্য দুই জগতে আলোক অন্ধকারের ন্যায় পাশাপাশি বিরাজ করে; তন্মধ্যে জড় নিজকে প্রকাশ করিতে পারে না। জড়ের প্রকাশের জন্য জড়কে চৈতন্যেরই শরণ লইতে হয়, জড়তত্ত্ব সুতরাং চৈতন্য সাপেক্ষতত্ত্ব; চৈতন্য কিন্তু জড়নিরপেক্ষ মৌলিকতত্ত্ব। চৈতন্য জড়োদ্‌ভূত নহে, জড়ের ইহা ধর্মও নহে। চৈতন্য চেতন আত্মার ধর্ম। চৈতন্যই সাংখ্যোক্ত পুরুষ, অদ্বৈত বেদান্তের পরম ব্রহ্ম। ন্যায়সিদ্ধান্তে চৈতন্য যেমন চেতন আত্মার ধর্ম, ইচ্ছা, প্রযত্ন, সুখ দুঃখ প্রভৃতিও সেইরূপ আত্মারই ধর্ম। জড় অন্তঃকরণের ধর্ম নহে। ন্যায়ের এই অভিমত সমর্থন করিতে গিয়া ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, আত্মাই কেবল জানে, কোন্ বস্তুটি তাহার সুখের উৎস, কোন্‌টি তাহার দুঃখের নিদান। চেতন আত্মা যে বস্তুটিকে তাহার সুখের সাধন বলিয়া মনে করে, তাহাকে করায়ত্ত করিবার প্রবল ইচ্ছায় চঞ্চল হইয়া, আত্মা ঐ বিষয়-সম্পর্কে উদ্যমশীল হইয়া থাকে। যাহা দুঃখের আকর বলিয়া বোঝে, বিদ্বেষবশতঃ তাহা পরিহারের উদ্দেশ্যেও আত্মার চেষ্টার অন্ত নাই। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের ইচ্ছার বিকাশ

* মহাভূত হইতে প্রাণ, অপাণ প্রভৃতি শরীরচারী বায়ুর এবং চক্ষু, কর্ণ প্রমুখ ইন্দ্রিয়বর্গেরও যে উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না, তাহা বৌদ্ধতার্কিক ধর্মকীর্তি তৎকৃত 'প্রমাণবার্তিকে' এবং মনোরথনন্দী উক্ত প্রমাণবার্তিকে টীকায় অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন :—

প্রাণাপানেন্দ্রিয়ধিয়াং দেহাদেব ন কেবলাৎ।
সজাতিনিরপেক্ষাণাং জন্ম জন্মপরিগ্রহে॥ প্রমাণবার্তিক, ১ম পরিঃ ৩৭ কারিকা।

যদি মহাভুতেভ্য এব কেবলেভ্যঃ প্রাণাদীনাং জন্মগ্রহস্তদা সর্বস্মাদ্ ভবেয়ুরিতি সর্বং প্রাণিময়ং জগৎ স্যাৎ। প্রমাণবার্তিকের মনোরথনন্দি-কৃত টীকা ১।৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

হইলেই, ঐ ইচ্ছাবশতঃ আত্মাতে প্রযত্নমূলক প্রবৃত্তির উদয় হইতে দেখা যায়। আত্মপ্রবৃত্তির ফলেই শরীরে কর্মপ্রচেষ্টা পরিস্ফুট হয়। এই চেষ্টা শারীরিক হইলেও ইহার মূলে আত্মাই বিরাজ করে। অভীষ্টপ্রাপ্তির শুভেচ্ছা এবং অনিষ্টের প্রতি প্রবলতর বিদ্বেষ আত্মারই গুণ (ধর্ম)। ঐরূপ গুণবশতঃ ইষ্টের প্রতি আকর্ষণ ও অনিষ্ট পরিহারের প্রচেষ্টা মানব হৃদয়ে জন্ম লাভ করে। ঐরূপ জ্ঞান মূলে না থাকিলে কাহারই কোন বস্তুর প্রতি ঐ প্রকার ইচ্ছা বা দ্বেষ জন্মিতে পারে না। একের ঐরূপ জ্ঞানোদয় হইলে, তজ্জন্য অপরের ঐরূপ ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি জন্মে না। শ্যাম কোন বস্তুকে তাহার সুখের উৎস বলিয়া বুঝিল, আর শ্যামের ঐরূপ জ্ঞানোদয়ের ফলে রামের উহা পাইবার ইচ্ছা হইল, ইহা অসম্ভব কথা। জ্ঞান, ইচ্ছা, চেষ্টা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির এক আত্মার সহিত সম্বন্ধ এবং উহাদের এককর্তৃকত্ব এবং একাশ্রয়ত্বই যুক্তিসিদ্ধ। আত্মাই জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতির আশ্রয় হইলে, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি যে আত্মারই ধর্ম, আত্মারই গুণ, জড় দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ প্রভৃতির ধর্ম বা গুণ নহে, ইহাও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।[১] বাৎস্যায়নের অভিমত সমর্থন করিতে গিয়া বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের টীকাকার উদ্দ্যোতকর তাঁহার ন্যায়বার্তিকে বলিয়াছেন—ইচ্ছা প্রভৃতির মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এখন কথা এই যে, এই ইচ্ছা প্রভৃতি যদি মনের গুণ হয়, তবে আত্মা তাহা কোনমতেই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কেননা, একের ইচ্ছা অপরের প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। রামের ইচ্ছা রামই প্রত্যক্ষ করিতে পারে, শ্যাম তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। তারপর, ইচ্ছা প্রভৃতি মনের গুণ হইলে, উহাদের প্রত্যক্ষও সম্ভবপর হয় না। কারণ, মনঃ অতিশয় সূক্ষ্ম, অণু এবং অতীন্দ্রিয়। মনের সমস্ত গুণই সুতরাং অতীন্দ্রিয়। মনোগত ইচ্ছাদি গুণও ফলে অতীন্দ্রিয়ই হইবে। ঐরূপ অতীন্দ্রিয় ইচ্ছা প্রভৃতি মনোগুণের প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের প্রত্যক্ষতা উপপাদনের জন্য ইচ্ছা প্রভৃতি গুণও যে জ্ঞানের ন্যায় আত্মারই ধর্ম, জড় মনের গুণ বা ধর্ম নহে, এই সিদ্ধান্তই অবশ্য স্বীকার্য। ইচ্ছা প্রভৃতি যে আত্মারই ধর্ম, জড় অন্তঃকরণের ধর্ম নহে, ইহা ন্যায়ভাষ্যকার

১। ন্যায়সূত্র—বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ৩।২।৩৪ সূত্র।

অনুমানের সাহায্যেও উপপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের জন্য যে ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতি নিজ আত্মাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করিয়াই অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অন্য সমস্ত আত্মাও আমার আত্মার ন্যায়ই ইচ্ছা প্রযত্ন প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি জড়ের ধর্ম নহে। চেতন আত্মারই ধর্ম। নৈয়ায়িকের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভূতচৈতন্যবাদীর বক্তব্য এই যে, নৈয়ায়িক ভূত চৈতন্যবাদের খণ্ডনে যাহা বলিয়াছেন তাহা দ্বারাও ভূতচৈতন্যবাদই সমর্থিত হইতেছে। ইষ্টের প্রতি অনুরাগ এবং অনিষ্টের প্রতি বিদ্বেষ প্রাণিমাত্রেরই স্বাভাবিক। জীবনের গতিপথে মানুষের যাহা সুখসাধন তাহা গ্রহণ করিবার জন্যই মানুষ উদ্যমশীল হয়, যাহা অশুভকর তাহা পরিহার করিবার জন্যও সে চেষ্টা করে। এই উদ্যম বা চেষ্টা শরীরেরই ধর্ম, শরীরেই ইহা পরিস্ফুট হয়। এইরূপ শারীরিক উদ্যমের মূলে আছে, ইষ্টলাভের প্রবল ইচ্ছা ও অনিষ্টের প্রতি বিতৃষ্ণা। এই ইচ্ছা ও দ্বেষের মূল জ্ঞান। কার্য ও কারণ একই আধারে অবস্থান করে, ইহাই নিয়ম। এই নিয়ম প্রতিবাদী নৈয়ায়িকও স্বীকার করিয়া থাকেন। এই নিয়ম অনুসারে বিচার করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, চেষ্টা বা উদ্যম যখন শরীরে আছে এবং শরীরের ধর্ম, তখন ঐ উদ্যমের মূল ইচ্ছা, দ্বেষ এবং উহার কারণ জ্ঞানও অবশ্য শরীরেরই ধর্ম হইবে, শরীরেই উহা থাকিবে। ফলে, ভূতচৈতন্যবাদই আসিয়া দাঁড়াইবে।[১] পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, এই চার প্রকার মহাভূত দেহাকারে পরিণত হইলে, তাহাতেই চৈতন্য বা জ্ঞান নামক গুণবিশেষের আবির্ভাব হয়। এইরূপে দেহের চৈতন্য স্বীকার করিলেও শেষ পর্য্যন্ত ভূতচৈতন্যবাদই সমর্থিত হয়। শরীরের প্রচেষ্টার মূল যে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি তাহা কেবল শরীরে নহে, শরীরের সংগঠক পরমাণুতেও কল্পনা করিতে হইবে। শরীরের সংগঠক চতুর্বিধ পরমাণুতে প্রবৃত্তি বা চেষ্টা না দেখা দিলে, ঐ সকল পরমাণু পুঞ্জীভূত হইয়া শরীর উৎপাদন করিবে কিরূপে? শরীরের অবয়ব সমূহের মধ্যে যে বিলক্ষণ বা বিশেষ সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার ফলে শরীরে চেতনার সঞ্চার হয়, প্রাণিশরীর

১। ন্যায়ভাষ্য, ৩য় অঃ ২ আঃ ৩৬ সূত্র দ্রষ্টব্য।

ব্যতীত অন্য কোথায়ও (ঘট প্রভৃতি দ্রব্যে) তাহা দেখা যায় না। এইজন্যই ঘট প্রভৃতি দ্রব্যকে চেতন বলিয়াও গ্রহণ করা চলে না। পরমাণুসমূহ যে সময়ে শরীর উৎপাদন করে না, তখন তাহাতে নিবৃত্তিও অনুমিত হয়। পূর্বোক্তরূপ প্রবৃত্তিবিশেষের অভাবই নিবৃত্তি। শরীরারম্ভক পরমাণুসমূহে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সিদ্ধ হইলে, তাহাদ্বারা শরীরের সংগঠক পরমাণুপুঞ্জে ঐ প্রবৃত্তির কারণ ইচ্ছা এবং নিবৃত্তির কারণ দ্বেষও সিদ্ধ হয়। সুতরাং ঐ পরমাণুসমূহে চৈতন্য সিদ্ধ হইলে ভূত-চৈতন্যই সিদ্ধ হয় নাকি ?[১] ভূত-চৈতন্যবাদীর এইরূপ উত্তরের প্রত্যুত্তরে নৈয়ায়িক বলেন—

আলোচ্য ভূতচৈতন্যবাদের খণ্ডন

শরীরের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বা কর্মবিরতি দেখিয়া, জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি শরীরেরই ধর্ম বলিয়া ভূতচৈতন্যবাদী যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। শরীরের যেরূপ কর্মপ্রবৃত্তি ও কর্মবিরতিরূপ ক্রিয়া আছে, সেইরূপ কাঠুরিয়া কাঠ কাটিবার জন্য ঐ যে কুঠারখানি চালনা করিতেছে, ঐ যে গাড়ীখানি চলিতেছে এবং থামিতেছে, তাহাতেও আলোচ্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ক্রিয়া দেখা যাইতেছে। ফলে, ভূতচৈতন্যবাদীর যুক্তি অনুসারে এখানে কুঠার প্রভৃতিতেও ইচ্ছা চেতনা প্রভৃতির যোগ কল্পনা করিয়া, কুঠার প্রভৃতিকেও শরীরের ন্যায়ই চেতন বলিয়া সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়। ভূতচৈতন্যবাদী কুঠার, গাড়ী প্রভৃতিকে শরীরের ন্যায় চেতন বলিয়া স্বীকার করিবেন কি ?[২] নৈয়ায়িকের এইরূপ আপত্তির সমাধানে ভূতচৈতন্যবাদী বলেন যে, ইচ্ছা, চেতনা প্রভৃতি গুণ শরীরেরই ধর্ম ; শরীরের সংগঠক পরমাণুসমূহের একপ্রকার বিশেষ সংযোগের ফলে শরীরেই ইচ্ছা, প্রবৃত্তি জন্মে ; কুঠার, গাড়ী প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ক্রিয়া থাকিলেও, তাহাতে ইচ্ছা, চেতনা

১। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশকৃত ন্যায়দর্শনের টিপ্পনী, ৩য় অঃ, ২য় আঃ, ৩৬ সূত্রঃ, দ্রষ্টব্য।

২। পরশ্বাদিষ্বারম্ভনিবৃত্তিদর্শনাৎ। ন্যায়সূত্র, ৩।২।৩৬,

আরম্ভনিবৃত্তিদর্শনাদিচ্ছাদ্বেষজ্ঞানৈর্যোগ ইতি

প্রাপ্তং পরশ্বাদেঃ করণস্যারম্ভনিবৃত্তিদর্শনাচ্চৈতন্যমিতি।

বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ৩।২।৩৬।

প্রভৃতির সঞ্চার হইবে না। ভূতচৈতন্যবাদীর দ্বিতীয় কথা এই যে, কুঠার প্রভৃতিতে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ক্রিয়া দেখা যাইতেছে, তাহা তো কুঠার প্রভৃতির স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি নহে, পরতন্ত্র প্রবৃত্তি; কুঠার প্রভৃতির প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি চালকের ইচ্ছায় উৎপন্ন হয়। এইজন্যই কুঠার প্রভৃতিতে চেতনার যোগ কল্পনা করা যায় না, কুঠার প্রভৃতিকে শরীরের ন্যায় চেতন বলাও চলে না।

ভূতচৈতন্যবাদীর এইরূপ সমাধানের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িক বলেন যে, কুঠার প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি আছে, কিন্তু ইচ্ছা বা চেতনা নাই, তাহা দ্বারা নিঃসন্দেহে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ক্রিয়া ইচ্ছা চেতনা প্রভৃতি গুণের ব্যভিচারী, অর্থাৎ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি থাকিলেও ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ নাও থাকিতে পারে। এই অবস্থায় ভূতচৈতন্যবাদীর সিদ্ধান্তে শরীরের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিরূপ ক্রিয়াকে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের সাধনে যে হেতুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা যথার্থ হেতু নহে, হেত্বাভাস। তারপর, কুঠার প্রভৃতির প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি স্বতন্ত্র নহে, চলকের ইচ্ছাতন্ত্র, এইজন্য কুঠার প্রভৃতির শরীরের ন্যায় চেতনা কল্পনা করা যায় না বলিয়া ভূতচৈতন্যবাদী যাহা বলিয়াছেন, সে সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, কুঠারের পরতন্ত্র (চালকের ইচ্ছাতন্ত্র) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সকলেরই প্রত্যক্ষগম্য। ঐরূপ পরতন্ত্র প্রবৃত্তি, নিবৃত্তির মূল ইচ্ছা ও দ্বেষ কুঠার প্রভৃতিতে থাকে না। চালকেই ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি থাকে, ইহা ভূতচৈতন্যবাদীও স্বীকার করিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ক্রিয়া এবং তাহার মূল ইচ্ছা ও দ্বেষ প্রভৃতির একাধারে থাকিবার যে নিয়ম আছে, তাহা অবশ্য ভঙ্গ হয়। ফলে, শরীরের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দেখিয়া, শরীরে ইচ্ছা চেতনা গুণের যোগও সমর্থন করা চলে না। এই ক্ষেত্রেও শরীরের ইচ্ছাদিগুণ-সাধনে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ হেতু হেত্বাভাসই হইবে।

আর এক কথা, জড়বাদী জড়ের কোথায়ও কোনরূপ স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি দেখিয়াছেন কি? জড়ের প্রবৃত্তি সকল ক্ষেত্রেই তো চেতনের ইচ্ছাতন্ত্র। চেতনের ইচ্ছা এবং বিদ্বেষবশতঃই অচেতন শরীর এবং কুঠার প্রভৃতিতে কর্মপ্রবৃত্তি ও কর্মবিরতির উদয় হয়। চেতন এ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রযোজক শরীর ও কুঠার প্রভৃতি প্রযোজ্য। চেতনের ইচ্ছা ও বিদ্বেষ-

বশতঃ যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে, তাহা শরীর এবং কুঠার প্রভৃতিতেই থাকে। অন্য কোথায়ও থাকে না। ইচ্ছা ও বিদ্বেষ চেতনেই থাকে, অন্যত্র থাকে না। যে বস্তু (কুঠার প্রভৃতি) ইচ্ছা জন্য ক্রিয়ার আধার হয়, তাহা ইচ্ছা প্রভৃতির আধার বা আশ্রয় হয় না। কুঠার প্রভৃতিই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। এই দৃষ্টান্তবলে শরীরও ইচ্ছাদির আধার নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। ইচ্ছাদির আধার না হইলে শরীর যে চেতনারও আধার হইবে না, তাহাও সহজেই অনুধাবন করা যায়।

ভূতচৈতন্যবাদী লীলাময়ী বিশ্বপ্রকৃতির উপাদান পার্থিব, জলীয়, তৈজস এবং বায়বীয় এই চারপ্রকার পরমাণুতেই সূক্ষ্মভাবে চৈতন্যযোগ স্বীকার করিয়াছেন। ইহা আমরা ভূতচৈতন্যবাদীর শরীরের চৈতন্যযোগের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি। বিশ্বের উপাদান চতুর্বিধ পরমাণুতেই চেতনা যোগ থাকিলে, ভৌতিক ভূতমাত্রেই যে চেতনা থাকিবে, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা চলিবে না। এই অবস্থায় চৈতন্য কেবল শরীরেরই ধর্ম, কুঠার প্রভৃতির উহা ধর্ম নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূলে ভূতচৈতন্যবাদীর বক্তব্য কি তাহা বলা আবশ্যক।

ভূতচৈতন্যবাদী ভৌতিক পদার্থের মৌলিক উপাদান পরমাণুতে চৈতন্য-যোগ স্বীকার করায়, তাঁহার মতে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি সর্বভূতেরই ধর্ম হইবে, সর্বভূতেই জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি জন্মিবে। "পৃথিব্যাদি ভূতের যে সমস্ত ধর্ম তাহা সমস্ত পৃথিব্যাদিভূতেই থাকে, যেমন গুরুত্বাদি। পৃথিবী ও জলে যে গুরুত্ব আছে, তাহা সমস্ত পৃথিবী ও সমস্ত জলেই আছে। জ্ঞান ও ইচ্ছাদি যদি পৃথিব্যাদি ভূতেরই ধর্ম হয়, তাহা হইলে সর্বভূতেরই ধর্ম হইবে। কিন্তু ঘটাদি দ্রব্যে জ্ঞানাদি নাই, ভূতচৈতন্যবাদীও ঘটাদিদ্রব্যে জ্ঞানাদি স্বীকার করেন নাই। সুতরাং জ্ঞানাদি ভূতধর্ম হইতে পারে না। জ্ঞানাদি ভূতধর্ম হইলে গুরুত্বাদি গুণের ন্যায় ঐ জ্ঞানাদিরও সার্বত্রিকত্ব নিয়মের আপত্তি হয়। কিন্তু ঐ নিয়ম ভূতচৈতন্যবাদীও স্বীকার করেন না"।[১] ইহার উত্তরে ভূতচৈতন্যবাদী বলেন যে, "জ্ঞানাদি ভূতধর্ম হইলে তাহা সর্বভূতেরই ধর্ম হইবে, ইহার কোন প্রমাণ নাই। যেমন গুড় তণ্ডুলাদি দ্রব্য

১। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনূদিত ন্যায় দর্শন, ৩৷২৷৩৭ সূত্রের

বিশেষ বিলক্ষণ সংযোগবশতঃ দ্রব্যান্তরে পরিণত হইলে তাহাতেই মদশক্তি বা মাদকতা জন্মে, তদ্রূপ পার্থিবাদি পরমাণু বিশেষ বিলক্ষণসংযোগ বশতঃ শরীরাকারে পরিণত হইলে তাহাতেই জ্ঞানাদি জন্মে। শরীরারম্ভক পরমাণু বিশেষের বিলক্ষণ সংযোগ বিশেষই জ্ঞানাদির উৎপাদক। সুতরাং ঘটাদিদ্রব্যে জ্ঞানাদির উৎপত্তি হইতে পারে না। শরীরাকারে পরিণত ভূতবিশেষেই জ্ঞানাদির উৎপত্তি হওয়ায় জ্ঞানাদি ঐ ভূতবিশেষেরই ধর্ম, ভূতমাত্রের ধর্ম নহে"।[১] ভূতচৈতন্যবাদীর এইরূপ সমাধানের বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, চেতনাকে যে দেহের ধর্ম বলা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই দেহের সামান্য ধর্ম নহে, রূপাদির ন্যায় দেহের বিশেষ ধর্মই হইবে। দেহের বিশেষ ধর্ম রূপ প্রভৃতি যে পর্যন্ত দেহ থাকে, সেই পর্যন্তই বর্তমান থাকে, দেহ কদাচ রূপবিহীন হয় না। রূপহীন দেহ অসম্ভব কল্পনা। চেতনা কিন্তু রূপ প্রভৃতি দেহের বিশেষ গুণের ন্যায় যতকাল দেহ থাকে ততকালই থাকে না। মৃত শরীরে ভূত মাত্রেরই বিশেষ ধর্ম রূপ থাকে, কিন্তু চেতনা থাকে না। ফলে, চেতনাকে রূপ প্রভৃতির ন্যায় দেহের বিশেষ ধর্মও বলা চলে না। চেতনা যে দেহের বিশেষ ধর্ম হইতে পারে না, তাহা অনুমানপ্রয়োগের সাহায্যেও প্রতিপাদন করা যায়—চৈতন্য (পক্ষ) দেহের বিশেষ গুণ বা ধর্ম নহে (সাধ্য), যে হেতু চৈতন্য যতকাল দেহ থাকে ততকালই থাকে না।[২] তারপর দেহের বিশেষ গুণ রূপ প্রভৃতি এবং চৈতন্যের মধ্যে আরও যে পার্থক্য আছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্যক। দেহের ধর্ম

১। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনূদিত ন্যায়দর্শন, ৩।২।৩৭ সূঃ টিপ্পনী।

২। (ক) জ্ঞানং ন দেহবিশেষগুণঃ অযাবদ্দেহভাবিত্বাৎ। কল্পতরু ; ৩।৩।৫৪।

(খ) যদি দেহভাবে ভাবাদ্দেহধর্মত্বমাত্মধর্মাণাং মন্যেত, তদা দেহভাবেঽপ্যভাবাদতদ্ধর্মত্বমেবৈষাং কিং ন মন্যেত? দেহধর্মবৈলক্ষণ্যাৎ। যে হি দেহধর্মা রূপাদয়স্তে যাবদ্দেহং ভবন্তি। প্রাণচেষ্টাদয়স্তু সত্যপি দেহে মৃতাবস্থায়াং ন ভবন্তি। দেহধর্মাশ্চ রূপাদয়ঃ পরৈরপ্যুপলভ্যন্তে নত্বাত্মধর্মাশ্চৈতন্যস্মৃত্যাদয়ঃ। ব্রঃ সূঃ শাঙ্করভাষ্য, ৩।৩।৫৪।

(গ) চৈতন্যাদির্যদি শরীরগুণঃ ততোঽনেন বিশেষগুণেন ভবিতব্যম্, ন তু সংখ্যা-পরিমাণ-সংযোগাদিবৎ সামান্যগুণেন। তথা চ যে ভূতবিশেষগুণাস্তে যাবদ্ভূত-ভাবিনো দৃষ্টা যথা রূপাদয়ঃ। নহ্যস্তি সংভবঃ ভূতঞ্চ রূপাদিরহিতঞ্চেতি। তস্মাদ্ভূত-বিশেষগুণরূপাদিবৈধর্ম্যান্ন চৈতন্যং শরীরগুণঃ। ভামতী, ৩।৪।৫৪ সূঃ।

রূপকে দেহী নিজে যেমন প্রত্যক্ষ করে, অপরেও সেইরূপ প্রত্যক্ষ করে। জ্ঞানকে শুধু যাঁহার জ্ঞান জন্মে, সেই প্রত্যক্ষ করে, অপরে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেনা, অনুমান করে। শ্যামের দেহের রূপ শ্যাম যেমন প্রত্যক্ষ করে, রামও সেইরূপ প্রত্যক্ষ করে। শ্যামের জ্ঞান কিন্তু শ্যামেরই কেবল প্রত্যক্ষগোচর হয়, রাম তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। শ্যামের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া অনুমানই কেবল করিতে পারে। অপরে প্রত্যক্ষ করিতে পারেনা বলিয়াই চেতনার ন্যায় ইচ্ছা স্মৃতি প্রভৃতিও যে দেহের বিশেষ ধর্ম হইতে পারেনা তাহাও অনায়াসেই অনুমান করা যায়।[১] আর এক কথা এই—ভূতচৈতন্যবাদীর মতে দেহের বিশেষ গুণ বা ধর্ম চৈতন্যের স্বরূপ কি, তাহাও বিচার করা আবশ্যক। চৈতন্য যখন এইমতে জড় দেহের ধর্ম, তখন তাহাও যে জড়ই হইবে, ভূতচৈতন্যবাদীর স্বীকৃত চতুর্বিধ মহাভূতের অন্তর্গতই হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? মহাভূতের পরিণাম রূপ যেমন পৃথিবী প্রভৃতি চারপ্রকার মহাভূত হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে, দেহের সংগঠক মহাভূতের পরিণাম চৈতন্যও সেইরূপ ভূতবিশেষই হইবে, মহাভূত হইতে অতিরিক্ত কিছু হইবেনা। কারণ, দেহের ধর্ম চৈতন্যকে পৃথিবী প্রভৃতি চারপ্রকার মহাভূতের অতিরিক্ত কিছু বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলে, ভূতচৈতন্যবাদীর নিজের প্রতিজ্ঞাই ভঙ্গ হয় নাকি? জড় ভূতের ধর্ম রূপ প্রভৃতি যেমন দৃশ্যই বটে দ্রষ্টা নহে, ভাস্যই বটে, ভাসক নহে, জড় দেহের ধর্ম চৈতন্যও সেইরূপ প্রকাশ্যই বটে, প্রকাশক নহে। আচার্য শঙ্করের ভাষায় অহম্ শব্দপ্রতিপাদ্য অহমাকার চৈতন্যই জ্ঞাতা বিষয়ী, যুষ্মৎপদগম্য জড় জগৎ চৈতন্যের বিষয়। বিষয় কদাচ বিষয়ী হইতে পারে না। বিষয়ী এবং বিষয় আলোক অন্ধকারের মতই বিরুদ্ধস্বভাব। জড়ের পরিণাম দেহের গুণ চৈতন্য ভাসক বিষয়ী হইবে কিরূপে? জড় পরিণাম রূপ কদাচ রূপকে বিষয় করে না, রূপবিজ্ঞানই রূপকে বিষয় করে। এই বিষয়ী রূপবিজ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় রূপ হইতে ভিন্ন তত্ত্ব। জড় পরিণাম চৈতন্যও সেইরূপ ভূত-ভৌতিক কোন বস্তুকেই বিষয় করতে

১। বিমতাঃ, (ইচ্ছাস্মৃত্যাদয়ঃ) ন দেবদত্তদেহবিশেষগুণাঃ, গুণত্বে সতি দেবদত্তেতরপ্রত্যক্ষরহিতত্বাৎ। বেদান্তকল্পতরু, ৩৩৫৪।

পারেনা। বাহ্য, আধ্যাত্মিক, ভূত-ভৌতিক সমস্ত বস্তুই আত্ম-চৈতন্যের বিষয় হয়। সুতরাং বলিতেই হইবে যে—চৈতন্য ভূত বা ভৌতিক কোন পদার্থেরই ধর্ম নহে, বিষয়ের ভাসক চৈতন্য স্বতন্ত্রতত্ত্ব।[১] চৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশ, এবং বিশ্বের তাবদ্ বস্তুর ইহা প্রকাশক। স্বপ্রকাশত্বই চৈতন্যের একমাত্র পরিচয়। বিষয়ী চৈতন্য কর্তৃক প্রকাশিত হওয়াই ভূত ভৌতিক বস্তুর স্বভাব। এই অবস্থায় নিখিল বিষয়ের ভাসক চৈতন্যকে জড়ভূতের পরিণাম বলিয়া ব্যাখ্যা করা চলে কি ?

শরীর থাকিলেই (শরীরাবচ্ছেদেই) চৈতন্যের উপলব্ধি হয়, শরীর না থাকিলে হয় না, সুতরাং অগ্নির ধর্ম উষ্ণতার ন্যায় চৈতন্য শরীরেরই ধর্ম, স্বতন্ত্র কোন মৌলিকতত্ত্ব নহে। যে সকল দার্শনিক চৈতন্যকে মৌলিক স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতেও শরীরেই (শরীরাবচ্ছেদেই) প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য, ইচ্ছা প্রভৃতির উপলব্ধি হইয়া থাকে, শরীরের বাহিরে অন্য কোথায়ও ঐসকল গুণের উপলব্ধি হয় না। ফলে, চৈতন্য, ইচ্ছা, প্রাণ, চেষ্টা প্রভৃতি যে শরীরেরই ধর্ম হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ?[২] ভূতচৈতন্যবাদীর এইরূপ যুক্তিরও কোন মূল্য নাই। প্রদীপ প্রভৃতি উপকরণ থাকিলে তবেই ঘটপ্রভৃতি বস্তুর উপলব্ধি ঘটে, আলোকের অভাব ঘটিলে বস্তুর উপলব্ধি হয়না। এই অবস্থায় ভূতচৈতন্যবাদী তাঁহার পূর্বোক্ত

১। (ক) ন হি ভূতভৌতিকধর্মেণ সতা চৈতন্যেন ভূতভৌতিকানি বিষয়ীক্রিয়েরন্। ন হি রূপাদিভিঃ স্বরূপং পররূপং বা বিষয়ীক্রিয়তে। বিষয়ীক্রিয়ন্তে তু বাহ্যাধ্যাত্মিকানি ভূতভৌতিকানি চৈতন্যেন। অতশ্চ যথৈবাস্যাঃ ভূতভৌতিকবিষয়ায়া উপলব্ধের্ভাবোঽভ্যুপগম্যতে, এবং ব্যতিরেকোঽপ্যস্যাস্তেভ্যোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। শং ভাষ্য, ৩।৩।৫৪।

(খ) যথাহি ভূতপরিণামভেদোরূপাদির্নতু ভূতচতুষ্টয়াদর্থান্তরমেবং ভূতপরিণামভেদ এব চৈতন্যং ন তু ভূতেভ্যোঽর্থান্তরং, যেন 'পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরিতি তত্ত্বানি' ইতি প্রতিজ্ঞা ব্যাঘাতঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ভামতী, ৩।৩।৫৪ সূত্র।

২। এক আত্মন শরীরে ভাবাৎ। ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৫৩। যদ্ধি যস্মিন্ সতি ভবত্যসতি চ ন ভবতি তত্তদ্ধর্মত্বেনাধ্যবসীয়তে, যথা অগ্নিধর্মাবৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ। প্রাণচেষ্টাচৈতন্যস্মৃত্যাদয়শ্চ আত্মধর্মত্বেনাভিমতা আত্মবাদিনা। তেঽপ্যন্তরেব দেহ উপলভ্যমানাবহিশ্চানুপলভ্যমানা অসিদ্ধে দেহব্যতিরিক্তে ধর্মিণি দেহধর্মা এব ভবিতুমর্হন্তি।

শং ভাষ্য, ৩।৩।৫৩

যুক্তি অনুসরণ করিয়া উপলব্ধিকে প্রদীপের ধর্ম অবশ্যই বলিবেন না। তাহা যদি না বলেন, তবে শরীর থাকিলেই বস্তুর উপলব্ধি হয়, না থাকিলে হয় না, এইরূপ যুক্তিবলে চৈতন্যকে দেহের ধর্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন কিরূপে? আলোচ্য যুক্তির দ্বারা তিনি শরীরকে প্রদীপ প্রভৃতির ন্যায় চৈতন্যের উপলব্ধির অন্যতম উপকরণমাত্রই বলিতে পারেন। স্বপ্ন-অবস্থায় শরীরের যখন কোনরূপ ক্রিয়া থাকে না তখন নানাপ্রকার স্বপ্ন-জ্ঞানের উদয় সকলেরই হইয়া থাকে। ফলে, দেহকে উপলব্ধির অন্যতম প্রধান কারণরূপেও ভূতচৈতন্যবাদী গণনা করিতে পারেন না।[১] দ্বিতীয়তঃ দেহের চৈতন্য উপপাদনের জন্য ভূতচৈতন্যবাদী দেহের সংগঠক প্রত্যেক পরমাণুরই দেহের ন্যায় চেতনা স্বীকার করিতে বাধ্য। প্রত্যেক পরমাণুরই চেতনাযোগ স্বীকার করায়, প্রত্যেকটি পরমাণুই স্বতন্ত্র চেতন হইবে, এবং একই দেহে অসংখ্য স্বতন্ত্র চেতনের সমাবেশ ভূতচৈতন্যবাদে অনিবার্য হইয়া পড়িবে। একদেহে এক জ্ঞাতা চেতন আত্মাই বিরাজ করে। লোকেও সেইরূপই অনুভব করে। একই শরীরে কোটি কোটি স্বতন্ত্র চেতনের সমাবেশের কল্পনায় কোনও প্রমাণ নাই, ঐরূপ পরিকল্পনা অনুভব বিরুদ্ধও বটে। একই দেহে অসংখ্য স্বতন্ত্র চেতনের সমাবেশ স্বীকার করিলে, শরীরের কর্মক্ষমতার বিলোপ প্রভৃতি অশেষ দুর্গতি যে অবশ্যম্ভাবী,[২]

১। যত্তূক্তং শরীরে ভাবাচ্ছরীরধর্ম উপলব্ধিরিতি, তদ্বর্ণিতেন প্রকারেণ প্রত্যুক্তম্। অপি চ, সৎসু প্রদীপাদিষ্বুপকরণেষু উপলব্ধির্ভবতি, অসৎসু চ ন ভবতি। নচৈতাবতা প্রদীপাদি ধর্ম এবোপলব্ধির্ভবতি। এবং সতি দেহে উপলব্ধির্ভবতি, অসতি চ ন ভবতীতি ন দেহধর্মো ভবিতুমর্হতি; উপকরণত্বমাত্রেণাপি প্রদীপাদিবদ্দেহোপ-যোগোপপত্তেঃ। ন চাত্যন্তং দেহস্যোপলব্ধাবুপযোগোঽপি দৃশ্যতে; নিশ্চেষ্টেঽপ্যস্মিন্ দেহে স্বপ্নে নানাবিধোপলব্ধিদর্শনাৎ। তস্মাৎ অনবদ্যং দেহব্যতিরিক্তস্য আত্মনোঽস্তিত্বম্।

ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ৩।৩।৫৪;

২। মদশক্তিঃ প্রতি মদিরাবয়বং মাত্রয়াবতিষ্ঠতে তদ্বদ্দেহেঽপি চৈতন্যং তদবয়বেষ্বপি মাত্রয়া ভবেৎ। তথাচৈকস্মিন্ দেহে বহবশ্চেতয়েরন্। ন চ বহূনাং চেতনানামন্যোন্যাভি-প্রায়ানুবিধানসংভব ইতি একপাশনিবদ্ধা ইব বহবো হি বিহঙ্গমাঃ বিরুদ্ধাদিক্রিয়াভিমুখাঃ সমর্থা অপি ন হস্তমাত্রমপি দেশমতিপতিতুমুৎসহন্তে। এবং শরীরমপি ন কিঞ্চিৎ কর্তুমুৎসহতে।

ভামতী, ৩।৩।৫৪;

তাহা আমরা চার্বাকোক্ত দেহাত্মবাদের খণ্ডনে পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। ভূতচৈতন্যবাদে কর্মফল ভোগের ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতির উপপাদন অসম্ভব হয়। এইজন্যই দেহাত্মবাদ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণ-আত্মবাদ, মন-আত্মবাদ প্রভৃতি কোনপ্রকার ভূতচৈতন্যবাদই যে গ্রহণযোগ্য নহে,* তাহা আমরা আমাদের ক্রমিক আলোচনায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

চার্বাক মতের আলোচনা ও ঐ মতের খণ্ডন

চার্বাকমতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা "চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ", বৃহস্পতিসূত্র। দেহের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে কোনরূপ প্রমাণ নাই। "গৌরোঽহং জানামি", 'গৌরবর্ণ আমি জানিতেছি' এইরূপ অনুভবের দ্বারা চেতনা ও রূপ যে একই দেহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তাহা অতি স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। রূপ শরীরের ধর্ম, শরীরই রূপের আধার, রূপের সহিত একই আধারে অবস্থিত চেতনাও যে সুতরাং শরীরেরই ধর্ম তাহাতে সন্দেহ কি? যে-ব্যক্তির দেহ স্থূল, তিনিই বলেন "আমি স্থূল", যিনি কৃশকায় তিনি বোঝেন আমি কৃশ। এক্ষেত্রে স্থূল এবং কৃশ দেহকেই যে আমি বা আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। দেহ এবং আত্মা ভিন্ন হইলে, ঐ প্রকার অভেদবোধ কোনমতেই ব্যাখ্যা করা চলে না। তারপর, আমি কৃশ, আমি স্থূল, এইরূপ অনুভবের ন্যায়, আমার শরীর কৃশ, আমার শরীর স্থূল, এইপ্রকার প্রত্যক্ষেরও সকলেরই উদয় হইতে দেখা যায়। পূর্বোক্ত অনুভবের ফলে যেমন দেহকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ আমার শরীর কৃশ, এই জাতীয় প্রত্যক্ষের বলে আত্মা যে দেহ নহে, দেহ হইতে অতিরিক্ত কিছু ইহাও সাব্যস্ত হয়। আমার বাড়ী, আমার পুত্র পরিজন, আমার পুস্তক, এই সকল ক্ষেত্রে যেমন আমার বাড়ী, পুত্র, পরিজন প্রভৃতি আমা

*ভূতচৈতন্যবাদ যে গ্রহণ যোগ্য নহে, তাহা বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মকীর্তি তদীয় প্রমাণ-বার্তিকের ১ম পরিচ্ছেদে 'ভূতচৈতন্যমতনিরাসঃ' প্রকরণে এবং মনোরথনন্দী প্রমাণ-বার্তিকের টীকায় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, সুধী পাঠক সেই আলোচনা দেখিবেন।

হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝা যায়। সেইরূপ আমার শরীরও যে আমি নহি, আমা হইতে ভিন্ন, এই রহস্যই আলোচ্য প্রত্যক্ষে সূচিত হয়। একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া, চার্বাক উল্লিখিত উভয় প্রকার আত্ম-প্রত্যক্ষের মধ্যে কোন্ প্রত্যক্ষটিকে সত্য বলিবেন? যদি তিনি "আমি স্থূল" "আমি কৃশ" এই দেহাত্মবাদের অনুকূল প্রত্যক্ষকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভিপ্রেত দেহাত্মবাদ উপপাদন করিতে চাহেন, তবে আমি প্রতিবাদী সেক্ষেত্রে "আমার দেহ কৃশ" এই জাতীয় প্রত্যক্ষকে যথার্থ হিসাবে উপন্যাস করিয়া, আত্মা যে শরীর নহে, শরীর প্রভৃতি হইতে ভিন্ন কিছু, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিব। ফলে, চার্বাকোক্ত দেহাত্মবাদ অচল হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ "গৌরোঽহং জানামি" এইরূপ প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে চেতনাকে রূপের ন্যায় শরীরের ধর্ম বলিয়া চার্বাক যে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন; সেখানেও প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, গৌরবর্ণ আমি জানিতেছি, এই প্রকার প্রত্যক্ষের ন্যায় অন্ধ আমি, বধির আমি জানিতেছি, "অন্ধোঽহং বধিরোঽহং জানামি" এইরূপও শত শত প্রত্যক্ষের উদয় হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় রূপ দেহের ধর্ম বলিয়া "গৌরোঽহং জানামি" এই প্রত্যক্ষবলে দেহকে যদি আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর হয়, তবে অন্ধত্ব, বধিরতা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ধর্ম দেখিয়া "অন্ধোঽহং জানামি," "বধিরোঽহং জানামি", এই প্রকার প্রত্যক্ষমূলে ইন্দ্রিয়কেই বা আত্মা বলিতে বাধা কি? সেক্ষেত্রে আত্মা কি দেহ, না ইন্দ্রিয়? এইরূপ সন্দেহই আসিয়া পড়িবে, চার্বাকোক্ত দেহাত্মবাদ প্রমাণিত হইবে না। মাধবাচার্য তাঁহার সর্বদর্শনসংগ্রহে চার্বাক-মতের বর্ণনায় "আমার দেহ" এইরূপ দেহ ও আত্মার ভেদ-বুদ্ধিকে "রাহুর শির"[১] এইরূপ অভেদে ভেদ কল্পনার ন্যায় মিথ্যাবুদ্ধি বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন। পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, 'আমি কৃশ' এইরূপ অভেদ প্রত্যক্ষের ন্যায় 'আমার দেহ কৃশ' এইপ্রকার দেহ এবং আত্মার ভেদও সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় আলোচ্য ভেদবুদ্ধির মিথ্যাত্ব নিশ্চয়

১। যদিও ছিন্নমস্তককেই রাহু বলা হইয়া থাকে, তবুও অভেদে ভেদ কল্পনা করিয়া রাহুর শির, 'রাহোঃ শিরঃ' এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে।

না করা পর্যন্ত, চার্বাকোক্ত দেহাত্মবাদকে কোন মতেই নির্বিবাদে গ্রহণ করা চলে না। পরস্পর বিরুদ্ধ ঐ দুইপ্রকার প্রত্যক্ষের মধ্যে কোন্ প্রত্যক্ষটি সত্য, এবং কোনটি যে মিথ্যা, তাহাও একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী চার্বাকের পক্ষে নির্ণয় করিয়া বলা সম্ভবপর নহে। সুতরাং চার্বাকের দেহাত্মবাদে সন্দেহের দ্বন্দ্বই আসে, নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় না। আর এক কথা এই যে, 'গৌরোঽহং জানামি', এইপ্রকার অনুভববলে চার্বাক যে চেতনাকে রূপ প্রভৃতির ন্যায় দেহের ধর্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন, সেখানেও সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, রূপ যেমন নিছক দেহেরই ধর্ম, জ্ঞান সেইরূপ দেহের ধর্ম নহে। জ্ঞান আত্মার ধর্ম। ইহা অবশ্যই সত্য যে, জ্ঞান বস্তুতপক্ষে আত্মার ধর্ম হইলেও, আত্মা কোনরূপ দেহের আশ্রয় না লইলে, কস্মিন্ কালেও জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে দেখা যায় না। আত্মা যখন কোন শরীরকে আশ্রয় করে, তখনই বিশ্বপ্রপঞ্চ-সম্পর্কে আত্মার জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। ন্যায়ের দৃষ্টিতে জ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে আত্মাতে থাকে বলিয়া, জ্ঞানকে যেমন আত্মার ধর্ম বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ কোন-না-কোনরূপ দেহ আশ্রয় করিয়াই আত্মার জ্ঞাতব্য বস্তুসম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এইজন্য দেহকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন জ্ঞানকে দেহের ধর্ম বলিতেই বা বাধা কোথায়? ঘট প্রভৃতি যে-সকল বস্তু জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাতে বিষয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে। এই অবস্থায় জ্ঞানকে বিষয়তা সম্বন্ধে জ্ঞেয় ঘট প্রভৃতিরও ধর্ম বলা চলে। এখন কথা এই যে, বিভিন্ন দৃষ্টিতে (বিভিন্ন সম্বন্ধে) জ্ঞানকে আত্মার, আত্মার আধার দেহের এবং জ্ঞেয় ঘট প্রভৃতি বিষয়ের, এই তিনেরই ধর্ম বলা চলিলেও, মুখ্যতঃ জ্ঞান আত্মার ধর্ম বলিয়াই প্রসিদ্ধ। জ্ঞানকে রূপ প্রভৃতির ন্যায় প্রধানভাবে দেহের ধর্ম বলা কোনমতেই সঙ্গত হয় না। দেহ ভিন্ন জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না বলিয়া জ্ঞানকে দেহের ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও, প্রকৃতপক্ষে (সমবায় সম্বন্ধে) জ্ঞানের আশ্রয় যে দেহ নহে, দেহ হইতে অতিরিক্ত অন্য কিছু, জ্ঞান যে মুখ্যতঃ আত্মার ধর্ম, এইরূপ বুঝিবার যুক্তি-সঙ্গত কারণ থাকায়, 'গৌরোঽহং জানামি' এই প্রকার প্রত্যক্ষও চার্বাকোক্ত দেহাত্মবাদের বিপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। তারপর, চার্বাক তাঁহার দেহাত্মবাদের সমর্থনে গুড়, অম্লরস প্রভৃতি হইতে মদশক্তির উৎপত্তির যে দৃষ্টান্ত

উপন্যাস করিয়াছেন, ঐ দৃষ্টান্তও জড় হইতে অজড় আত্মার উৎপত্তির সমর্থন করে না। গুড়, অম্লরস প্রভৃতি যে-সকল বস্তুর সহযোগে মদিরা প্রস্তুত হয়, ঐ সকল বস্তুতে কিছুমাত্রও মদশক্তি আছে বলিয়াই, ঐ সকল মদ্যের উপাদানগুলি মিলিত হইলে, সেক্ষেত্রে মদশক্তির আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। ভাতের যে নেশা আছে তাহা কে না স্বীকার করে? মদ্যের উপাদানসমূহে অল্পমাত্রায়ও মদশক্তি না থাকিলে, উহারা মিলিত হইলেও উহা হইতে কোনমতেই আকস্মিক মদশক্তির আবির্ভাব হইতে পারিত না। উপাদানে যাহা নাই বা থাকে না, এইরূপ কিছুরই কখনও উৎপত্তি হইতে দেখা যায় না। উপাদানে যাহা অব্যক্ত বা অস্পষ্ট অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, উপাদেয়ে বা কার্যে তাহাই সুস্পষ্ট, সুব্যক্ত হইয়া থাকে। এইজন্যই কোনরূপ বিশেষ কার্য সাধন করিতে গেলেই, কর্তাকে ঐ কার্যের উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত দেখা যায়। তিল নিষ্পেষণ করিলেই তিল হইতে তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে, বালুকাকে সহস্রবার যন্ত্রে পেষণ করিলেও বালুকা হইতে তৈল জন্মে না। কারণ, তিলে তৈল অব্যক্ত অবস্থায় আছে, বালুকায় তাহা নাই, এইজন্যই বালুকা হইতে কস্মিন্‌কালেও তৈলের আবির্ভাব হইতে দেখা যায় না। ইহা হইতে গুড়, অম্লরস প্রভৃতি মদের উপাদানগুলিতে যে অব্যক্তরূপে মদশক্তি বিদ্যমান আছে এবং মদ্যের উপাদানগুলির মিলনের ফলে সেই উপাদানে অন্তর্নিহিত অব্যক্ত মদশক্তিই সুব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে, আকস্মিক মদশক্তির আবির্ভাব হয় নাই, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। হলুদ ও চুণ একত্র মিশাইলে উহাতে যে লৌহিত্য জন্মে, পান, চুণ ও খয়ের উপযুক্ত পরিমাণে চিবাইলে, ওষ্ঠপুটে যে রক্তিমার আবির্ভাব হয়, তাহা যে সম্পূর্ণ আকস্মিক এমনও বলা যায় না, শুধু মিলনের গুণে উহা উদ্‌ভূত হইয়াছে এভাবেও উহা ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা, মৌলিক বস্তুগুলিতে লৌহিত্যের উপাদান না থাকিলে, মিলনে তাহা আসিবে কিরূপে? উপনিষদের দৃষ্টিতে বস্তুতত্ত্বের মূল খুঁজিলে দেখা যায়, যে বিশ্বের তাবদ্‌ বস্তুই ক্ষিতি, জল এবং তেজঃ এই তিন প্রকার মৌলিক পদার্থের সমবায়ে গঠিত। (নিখিল বস্তুই ত্রিবৃৎকৃত বা ত্র্যাত্মক) লৌহিত শুক্ল কৃষ্ণ রূপত্রয়েরও ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ এই তিনটি মৌলিক পদার্থই কারণ বলিয়া জানিবে। অগ্নির যে লোহিত রূপ তাহার কারণ তেজঃ, পার্থিব বস্তুর মালিন্যের

কারণ পৃথিবী, জলীয় পদার্থের শুভ্রতার হেতু জলই বটে। সমস্ত ভূতত্রয়াত্মক বস্তুতেই যেমন মাত্রাবিশেষে ক্ষিতি, অপ্ ও তেজঃ আছে, সেইরূপ লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ এই রূপ ত্রয়ও আছে। এই রূপ কোথায়ও ব্যক্ত, কোথায়ও অব্যক্ত। তৈজস পদার্থের লোহিতরূপ ব্যক্ত, শুক্ল কৃষ্ণ রূপ অব্যক্ত। জলীয় বস্তুতে শুভ্রতা ব্যক্ত, রক্তিমা ও মালিন্য অব্যক্ত, পার্থিব পদার্থে মালিন্য সুস্পষ্ট, রক্তিমা শুভ্রতা অস্পষ্ট। তাহার কারণও এই যে, মৌলিক পদার্থের আধিক্য দেখিয়াই যেমন বিশ্বের তাবদ্ বস্তুর পার্থিব, তৈজস জলীয় প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে, সেইরূপ বস্তুর রূপেরও আধিক্য বা স্পষ্টতা দেখিয়া লোহিত, কৃষ্ণ, শুভ্র প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। বস্তুমাত্রেই রূপত্রয় বিদ্যমান আছে। প্রভেদ এই যে, কোথায়ও কোন রূপ সুস্পষ্ট; কোথায়ও তাহা অব্যক্ত, ইহাই বস্তুতত্ত্বের রূপোপলব্ধির রহস্য। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে হরিদ্রা, চুণ, খয়ের প্রভৃতিতেও অব্যক্ত রক্তিমা নাই, এমন কথা বলা যায় কি? হরিদ্রা, চুণ, পান, খয়ের প্রভৃতির সংযোগে আকস্মিক লৌহিত্যের আবির্ভাব হয় নাই, যে লৌহিত্য হরিদ্রা চুণ প্রভৃতিতে অব্যক্তভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, পরস্পর মিলনের ফলে তাহারই সুস্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে মাত্র। এই দৃষ্টিতে কার্যকারণ রহস্য বিচার করিলে চার্বাক গুড়, অন্নরস প্রভৃতি প্রত্যেক মদ্যের উপাদানে মদশক্তি নাই, মদ্যের উপাদানগুলি মিলিত হইযা মদিরার আকারে পরিণত হইলে, তাহাতে অভিনব মদশক্তির সঞ্চার হয়, একথা কিছুতেই বলিতে পারিবেন না। মদ্যের প্রত্যেকটি উপাদানের মধ্যেই সূক্ষ্মরূপে যে মদশক্তি অন্তর্নিহিত আছে, উপাদানগুলির মিলনের ফলে অব্যক্তভাবে উপাদানে অবস্থিত সেই মদশক্তির স্পষ্ট বিকাশ বা আধিক্যই জন্মিয়া থাকে, এই সত্যই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। চার্বাক প্রদর্শিত মদশক্তির আবির্ভাবের দৃষ্টান্ত যে জড়ভূত বস্তু হইতে অজড় চৈতন্যের উৎপত্তি সমর্থন করে না, তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার সাংখ্যদর্শনে বলিয়াছেন, মদ্যের উপাদান অন্নরস প্রভৃতির মাদকতা ভাতের নেশায় অভিভূত ব্যক্তিমাত্রেরই প্রত্যক্ষ-গম্য। চৈতন্য ও জড় আলোক ও অন্ধকারের মত পরস্পর অতি বিরুদ্ধ পদার্থ। অন্ধকার হইতে যেমন আলোক জন্মিতে পারে না, সেইরূপ চৈতন্যলেশবিহীন জড় ভূতবস্তু হইতেও চৈতন্যের উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না। দেহের

উপাদান পৃথিবী প্রভৃতি কোন ভূতবস্তুতেই সূক্ষ্ম অবস্থায়ও যে চৈতন্য আছে, ইহা কোনরূপ প্রমাণ বলেই সমর্থন করা যায় না। এই অবস্থায় ঐ সকল জড় মহাভূতের মিলনের ফলে মানবদেহে চৈতন্যের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবপর হয়।[১] অবয়বের সাহায্যে যে কার্য সম্ভবপর হয় না, অবয়বীর দ্বারা তাহা সম্ভবপর হয়। ঘটের অবয়বের দ্বারা জল তোলা যায় না, অবয়বী ঘটের সাহায্যে জল তোলা চলে। কাপড়ের অবয়ব সূতার দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করা যায় না, কাপড়ের দ্বারা শরীর আবৃত করা চলে। এই অবস্থায় দেহের উপাদান বা অবয়ব পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতে চৈতন্য না থাকিলেও, ঐ সকল মহাভূতের সমবায়ে গঠিত (অবয়বী) শরীরে অভিনব চৈতন্যের আবির্ভাব হইতে বাধা কি?

চার্বাকের এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, চার্বাকের মতে চেতনাকে শরীরের রূপ প্রভৃতির ন্যায় এক প্রকার বিশেষ গুণ বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সমস্ত দ্রব্য পদার্থের চেতনা থাকেনা, দেহেরই চেতনা দেখা যায়। সুতরাং চেতনা যে প্রাণি দেহেরই বিশেষ গুণ ইহা নিঃসন্দেহ। লাল, নীল, শাদা সূতার দ্বারা কাপড় প্রস্তুত করিলে ঐ কাপড়ও যথাক্রমে লাল, নীল বা শাদাই হইবে। কেননা, ভৌতিক বস্তু মাত্রেরই বিশেষ গুণ রূপ প্রভৃতিকে উহাদের কারণের গুণ অনুসারেই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অবয়বের বিশেষ গুণ সর্বত্রই অবয়বীতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। যে-বিশেষ গুণ অবয়বে নাই, তাহা অবয়বীতে কোথায়ও দেখা যায় না। দৈহিক চেতনা ভৌতিক দেহের রূপ প্রভৃতির ন্যায় বিশেষ গুণ হইলে, দেহের কারণ পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতেও চেতনা অবশ্যই থাকিবে এবং ঐ উপাদানের চেতনামূলেই ভৌতিক দেহেও চেতনার সঞ্চার হইবে। পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতে যে সূক্ষ্ম অবস্থায় চেতনা আছে তাহার কোন প্রমাণ নাই; উপাদানে না থাকিলে ভৌতিক দেহেও চেতনার সঞ্চার

১। মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাহিত্যে তদদ্ভবঃ। সাংখ্যসূত্র ২।২২, প্রত্যেক পরিদৃষ্টে সতি সাহিত্যে তদুদ্ভবঃ সম্ভবেৎ। প্রকৃতে তু প্রত্যেকপরিদৃষ্টত্বং নাস্তি। অতো দৃষ্টান্তে প্রত্যেকং শাস্ত্রাদিভিঃ সূক্ষ্মতয়া মাদকত্বে সিদ্ধে সংহতভাবকালে মাদকত্বাবির্ভাবমাত্রং সিধ্যতি। দার্ষ্টান্তিকে তু প্রত্যেক ভূতেষু সূক্ষ্মতয়া ন কেনাপি প্রমাণেন চৈতন্যং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। সাংখ্য-প্রবচনভাষ্য ২।২২

সম্ভবপর হইবে না; অর্থাৎ চেতনাকে দেহের বিশেষ গুণই বলা চলিবে না। পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতের সমবায়ে গঠিত দেহে দেহের বিশেষ গুণ চৈতন্য দৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া, দেহের উপাদান পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেক মহাভূতেই চৈতন্য যে সূক্ষ্মভাবে নিহিত আছে, এইরূপ অনুমান করাও চার্বাকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কেননা, চার্বাক একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী। অনুমানকে তিনি প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না। এই অবস্থায় শরীরের চৈতন্য দেখিয়া চার্বাক শরীরের উপাদান মহাভূতে অব্যক্ত চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুমান করিবেন কিরূপে? দ্বিতীয়তঃ, চৈতন্য রূপ প্রভৃতির ন্যায় দেহের বিশেষ গুণ বা ধর্ম ইহা সিদ্ধ হইলেই, সেই হেতুমূলে দেহের উপাদান মহাভূত প্রভৃতিরও চৈতন্যের অনুমান করা যাইতে পারে। অনুমানের হেতুটি বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয়ের মতসিদ্ধ না হইলে, অসিদ্ধ হেতুর দ্বারা কোনরূপ অনুমান করা (সাধ্য-সাধন করা) চলেনা। চৈতন্য যে দেহের ধর্ম তাহাতো চার্বাক ভিন্ন অন্য কোন দার্শনিকই স্বীকার করেন না। চৈতন্য দেহের ধর্ম কি না, ইহা লইয়াই চার্বাকের সহিত প্রতিবাদী আস্তিক দার্শনিকগণের তুমুল তর্কযুদ্ধ চলিতেছে দেখিতে পাই। চৈতন্য যে দেহের ধর্ম তাহা এখনও প্রমাণিত বা সিদ্ধ হয় নাই। এরূপক্ষেত্রে ঐ অসিদ্ধ বা সন্দিগ্ধ হেতুমূলে দেহের অবয়ব মহাভূতে চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুমান করা চার্বাকের পক্ষে চলেনা। কারণ, চৈতন্য যে দেহের ধর্ম এই হেতু সিদ্ধ নহে বলিয়া উহা হেতুই নহে, হেত্বাভাসমাত্র। তারপর, ঐরূপ অনুমানে যে 'ইতরেতরাশ্রয়' দোষ আসিয়া পড়ে, তাহা চার্বাক লক্ষ্য করিয়াছেন কি? চৈতন্য যে দেহের ধর্ম ইহা সিদ্ধ না হইলে, দেহের অবয়ব পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতে চৈতন্যের অস্তিত্ব সাধন করা চলেনা; পক্ষান্তরে, দেহের অবয়ব মহাভূতে চৈতন্যের অস্তিত্ব না থাকিলে, ঐ সকল অবয়বসমষ্টির দ্বারা গঠিত দেহে ও দেহের বিশেষ-গুণ চৈতন্যের আবির্ভাব সম্ভবপর হয় না, অর্থাৎ চৈতন্য যে রূপ প্রভৃতির ন্যায় দেহের ধর্ম চার্বাকের এই প্রতিজ্ঞাই সিদ্ধ হয় না। আর এক কথা এই যে, চার্বাকের মত অনুসারে চৈতন্যকে ভূতসমষ্টিদ্বারা গঠিত দেহের বিশেষ গুণ বা ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইলে, দেহের উপাদান প্রত্যেক মহাভূতেরই অব্যক্ত চৈতন্য আছে, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কেননা, দেহাবয়বে

(দেহের কারণে) চৈতন্য না থাকিলে কার্য দেহে চৈতন্য আসিবে কিরূপে? কারণের গুণানুসারেই যে কার্যে বিশেষগুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা তো প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য। দেহের অবয়বে চৈতন্য না থাকিলে, ঐ সকল অবয়বের দ্বারা গঠিত দেহে যেমন চৈতন্য থাকিতে পারে না, সেইরূপ দেহের অবয়ব পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতের যাহা অবয়ব তাহাতে চৈতন্য না থাকিলে, দেহের অবয়ব পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতেও চৈতন্য থাকা সম্ভবপর হইবে না, ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে চার্বাকোক্ত ভৌতিক দেহের চৈতন্য উপপাদন করিবার জন্য ক্রমে স্থূল দেহের সর্বমূল উপাদান পার্থিব পরমাণু প্রভৃতি প্রত্যেক পরমাণুরই যে চৈতন্য আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া চার্বাকের উপায় নাই। যাহার চৈতন্য আছে, তাহাই চেতন। সুতরাং একই দেহস্থ অসংখ্য পরমাণুকেই চেতন বলিয়া গ্রহণ করিতে ভূতচৈতন্যবাদী চার্বাক অবশ্যই বাধ্য হইবেন। চার্বাকের সিদ্ধান্তে একই দেহে এইরূপ অসংখ্য চেতনের সমাবেশের কল্পনা নিতান্তই অজ্ঞ-জনোচিত নহে কি? সুধী পাঠক বিচার করিবেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই নিজেকে এক বলিয়াই জানেন, অনেক বলিয়া অনুভব করেন না। আমি একজন, ইহাই সকলের অনুভবসিদ্ধ সত্য। এইরূপ সর্বজনীন অনুভবকে জলাঞ্জলি দিয়া, একই দেহে সংখ্যাতীত চেতনের সমাবেশের কল্পনা সর্বতোভাবে যুক্তি-বিরুদ্ধ। এক শরীরে অনেক চেতনের সমাবেশ মানিতে গেলে, শরীর বেচারার অশেষ দুর্গতি অনিবার্য। প্রত্যেক চেতনেরই একটা স্বাধীন ইচ্ছা, স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি আছে। অসংখ্য চেতনের ঐকমত্য প্রায় দেখা যায় না, বৈমত্যই দেখা যায়। চেতনভেদে অভিপ্রায়ের ভেদই সচরাচর লক্ষিত হয়। শরীরস্থ অগণিত চেতনের স্বাধীন ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে গেলে, শরীর সেক্ষেত্রে হইয়া দাঁড়াইবে কুরুক্ষেত্রের ন্যায় অসংখ্য স্বাধীন চেতন অণুসৈন্যের বিষম সমরাঙ্গন। সেই অবস্থায়, শরীরস্থ চেতনেরা বিরুদ্ধ দলে বিভক্ত হইয়া, শরীরকে যদি পরস্পর বিরুদ্ধ দিকে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে, তবে শরীর বেচারার হয় অপমৃত্যু, নতুবা কোন-দিকেই না যাওয়া ছাড়া গতি কি?[১] অধিকাংশ চেতনের অভিপ্রায় অনুসারে

১। ভামতী, ব্রঃ, সূঃ, ৩।৩।৫৪ সূত্র দ্রষ্টব্য

শরীর কর্মে প্রবৃত্ত হইবে, এইরূপ কল্পনারও কোন মূল্য দেওয়া চলে না। কেননা, শরীরস্থ পরস্পরবিরোধী দুইদল চেতনের সংখ্যা যখন তুল্য হইবে, সে-ক্ষেত্রে দুইদলের টানাটানিতে শরীরের বিনাশই অপরিহার্য হইবে না কি? শরীরের অবয়বের তো কোনরূপ 'কাষ্টিং ভোট' নাই, যে সংখ্যার সাম্যস্থলে তাহা দ্বারা সংখ্যা বৈষম্য উপপাদন করিয়া, অধিকাংশের মতানুসারে শরীর তাহার কার্য সম্পাদন করিবে? শরীরের অবয়ব সকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে, অবয়বী শরীরের ইচ্ছানুসারেই সে স্থলে কার্য হইবে, এইরূপ কল্পনাও নিতান্তই ভিত্তিহীন। কারণ, শরীরের অবয়বের ইচ্ছা ব্যতীত অবয়বী শরীরের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছাই আদৌ থাকিতে পারে না। অবয়বের ইচ্ছাই অবয়বীর ইচ্ছার কারণ। কারণের গুণানুসারেই শরীরে রূপ প্রভৃতির ন্যায় শরীরের ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষগুণের যে উৎপত্তি হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? অবয়বস্থ চৈতন্য যেমন অবয়বী শরীরের চৈতন্যের প্রতি কারণ হইয়া থাকে, ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষগুণের ক্ষেত্রেও সেই নিয়মই প্রযোজ্য। অবয়বের ইচ্ছা ব্যতীত অবয়বীর স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছাই জন্মিতে পারে না। অবয়বগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছা পোষণ করিলে, অবয়বী শরীরের ইচ্ছাও সেক্ষেত্রে কারণের গুণানুসারে পরস্পর বিরুদ্ধই হইতে বাধ্য। এই অবস্থায় শরীরের ধ্বংস বা নিষ্ক্রিয়তাই যে অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে সন্দেহ কি? একই দেহে অনন্ত চেতনের সমাবেশের কল্পনা নিতান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। ঐরূপ অসঙ্গত কল্পনার আশ্রয় লইয়া চেতনাকে ভৌতিক দেহের ধর্ম না বলিয়া, অভৌতিক অজড় আত্মার ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য।

চার্বাকোক্ত দেহাত্মবাদে চেতনাকে যে ভৌতিক দেহের ধর্ম বলা হইয়া থাকে, সেই সম্পর্কে প্রশ্ন আসে এই যে, চৈতন্য কি জড় দেহের স্বাভাবিক ধর্ম? না আগন্তুক ধর্ম? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্য দর্শন-রচয়িতা বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, দেহ পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতের সমবায়ে গঠিত। দেহের উপাদান পৃথিবী প্রভৃতি কোন ভূতপদার্থেরই চেতনা দেখা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে ভূতসমষ্টির দ্বারা গঠিত দেহের চেতনা স্বাভাবিক ধর্ম হইবে কিরূপে? ভূতের যাহা স্বাভাবিক ধর্ম তাহা সমষ্টির ন্যায় ব্যষ্টিভূতেও অবশ্যই থাকিবে। নতুবা, ঐ ধর্মকে স্বাভাবিক ধর্মই বলা চলিবে না। "কিছু জায়গা জুড়িয়া থাকা" (occupation of space) জড় [illegible]

স্বাভাবিক ধর্ম। সেই ধর্ম যেমন সমষ্টি জড়পদার্থে আছে, সেইরূপ সমষ্টির উপাদান পরমাণু বা তন্মাত্র প্রভৃতিতেও তাহা আছে। চেতনা কেবল ভূতসমষ্টিরূপ দেহেই অনুভূত হয়। দেহের উপাদান প্রত্যেক ভূতে চেতনা দেখা যায় না। সুতরাং চৈতন্যকে কোন যুক্তিতেই দেহের স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। আগন্তুক ধর্ম বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হয়।[১] চৈতন্য দেহের স্বাভাবিক ধর্ম হইলে কাহারও মৃত্যু হইতে পারেনা। কেননা, চৈতন্যের অভাব না হইলে মৃত্যু হয়না। চৈতন্য দেহের স্বাভাবিক ধর্ম হইলে, দেহ থাকা পর্যন্ত দেহে চৈতন্যের অভাব ঘটিতে পারেনা। মৃত্যুও সুতরাং অসম্ভব হয়। মৃত্যু তো জীবের প্রতি মুহূর্তেই ঘটিতেছে। চেতনাবিহীন শরীরও দেখা যাইতেছে। ইহা হইতে চৈতন্য যে দেহের স্বাভাবিক ধর্ম নহে, আগন্তুক গুণ, এই সত্যই প্রকাশ পাইতেছে।[২] স্বাভাবিক এবং আগন্তুক, এই দুই প্রকার ব্যতীত তৃতীয় কোনপ্রকার ধর্ম নাই। এই অবস্থায় চেতনা দেহের স্বাভাবিক ধর্ম না হইলে, চৈতন্য যে শরীরের আগন্তুক ধর্ম হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। চেতনা দেহের আগন্তুক ধর্ম এইরূপ সাব্যস্ত হইলে, তাহা দ্বারা ইহাও পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, কেবল দেহই আগন্তুক চেতনার কারণ নহে, দেহ ভিন্ন অপর কোনও শক্তি বা বস্তুবিশেষের সাহায্যে দেহে সাময়িক চেতনার সঞ্চার হইয়া থাকে। শৈত্য জলের স্বাভাবিক ধর্ম, বাহিরের অগ্নিসংযোগের ফলেই জলে আগন্তুক উষ্ণতা জন্মে। এখন প্রশ্ন এই যে, দেহের অতিরিক্ত যে শক্তি বা

১। ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ।

সাংখ্যসূত্র, ৩।২০,

ভূতেষু পৃথক্‌কৃতেষু চৈতন্যাদর্শনাৎ ভৌতিকস্য
দেহস্য ন স্বাভাবিকং চৈতন্যং কিন্তু ঔপাধিকম্।

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য ৩।২০

২। প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ।

সাংখ্যসূত্র, ৩।২১,

প্রপঞ্চস্য সর্বস্যৈব মরণসুষুপ্ত্যাদ্যভাবশ্চ দেহস্য স্বাভাবিকচৈতন্যে সতি স্যাদিত্যর্থঃ। মরণসুষুপ্ত্যাদিকং হি দেহস্য অচেতনতা। সা চ স্বাভাবিকচৈতন্যে সতি নোপপদ্যতে। স্বভাবস্য যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাৎ।

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, ৩।২১

পদার্থের সহায়তায় জড়দেহে আগন্তুক চৈতন্যের সঞ্চার হইয়া থাকে, সেই শক্তি চেতন, না অচেতন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, দেহ-চৈতন্যবাদী চার্বাকের মতে চেতনার কারণ দেহকে যেমন চেতন বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ দেহের অতিরিক্ত যেই শক্তি বা পদার্থের সাহায্যে দেহে আগন্তুক চেতনার সঞ্চার হয়, তাহাকে চেতন না বলিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। চেতনা দেহাতিরিক্ত ঐ পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম। বহ্নির স্বাভাবিক ধর্ম উষ্ণতা যেমন বহ্নির সহিত সংযোগের ফলে জলে আগন্তুকভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ চৈতন্যও দেহাতিরিক্ত সেই পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম। চেতন পদার্থের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায়, শরীরে আগন্তুকরূপে চৈতন্যের উপলব্ধি হইবে, ইহাই তো যুক্তিসঙ্গত কথা। ভৌতিক দেহ জড়, জড়ের নিজের কোন ইচ্ছা নাই, অপরের ইচ্ছানুসারেই জড়বস্তুতে ক্রিয়া হইতে দেখা যায়। কাঠুরিয়ার ইচ্ছাক্রমেই কুঠারের ওঠা-নামা (উত্তোলন এবং নিপাতনরূপ ক্রিয়া) হইয়া থাকে। লেখকের ইচ্ছায় লেখনী চালিত হয়, যোদ্ধার ইচ্ছায় সমরাঙ্গনে অসি শত্রুদেহে বিদ্ধ হয়। জড়দেহের ক্রিয়াও যে সুতরাং জড় ভিন্ন কোন স্বতন্ত্র চেতনের ইচ্ছাবশেই উৎপন্ন হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। জ্ঞান ব্যতীত ইচ্ছার উৎপত্তি হইতে পারে না। জ্ঞানের ফলে ইচ্ছা জন্মে, ইচ্ছাবশতঃ ক্রিয়ানিষ্পন্ন হয়। রামের জ্ঞান-অনুসারে শ্যামের ইচ্ছা হয় না। সকলেরই নিজ জ্ঞান-অনুসারেই নিজের ইচ্ছার বিকাশ হইয়া থাকে। জ্ঞান ও ইচ্ছা এইরূপে একই আধারে বিরাজ করে। এই অবস্থায় ইচ্ছা যদি জড় দেহের স্বাভাবিক গুণ না হয়, তবে ইচ্ছার সহিত একই আশ্রয়ে অবস্থিত ইচ্ছার কারণ চেতনাও যে সেক্ষেত্রে ভৌতিক দেহের স্বাভাবিক ধর্ম হইবে না, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। যাঁহার ইচ্ছায় জড় দেহ পরিচালিত হয়, চেতনাও তাঁহারই স্বাভাবিক ধর্ম, জড় দেহের ধর্ম নহে, এই সিদ্ধান্তই আসিয়া দাঁড়ায়। ইচ্ছা এবং চেতনা যাঁহার স্বাভাবিক গুণ, ন্যায়মতে তাহাই আত্মা। এই আত্মা সুতরাং ভৌতিক দেহ নহে, জড় দেহ হইতে অতিরিক্ত স্বতন্ত্র তত্ত্ব। জড়দেহ সেই সদা চেতন আত্মার ভোগ্যবস্তু, ভোক্তা নহে। বিবিধ অবয়বের সংযোগ ও সন্ধান বা মিলনের ফলে যে-সকল গৃহ, শয্যা, আসন প্রভৃতি রচিত হয়, তাহা যেমন অপরে ভোগ করে, সেইরূপ পৃথিবী, জল, তেজঃ প্রভৃতি ভূতবর্গের মিলনে যে দেহ গঠিত হয়, তাহাও এই দেহের যিনি

মালিক সেই স্বতন্ত্র চেতন আত্মারই ভোগ সাধন করে।[১] সংহতপরার্থত্বাৎ। সাংখ্যসূত্র ১।১৪০। দেহ অপরের ভোগ্য ইহা প্রমাণিত হইলেই শরীর যে চেতন নহে, শরীর হইতে অতিরিক্ত অন্য কোনও স্বতন্ত্র চেতন আছে, জড়দেহ সেই চেতনের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়। জড় শরীরের নিজের কোন প্রয়োজন নাই, এই রহস্যই প্রকাশ পায়। দেহ যাঁহার ভোগ্য, সেই ভোক্তা আত্মা ভূত সমষ্টিদ্বারা গঠিত দেহের ন্যায় বিবিধ অবয়বের সংযোগ ও সন্ধানের ফলে উৎপন্ন হন নাই। আত্মা অসংহত এবং অসংহত বলিয়াই শাশ্বত ও স্বতন্ত্র।

শাশ্বত অসংহত আত্মচৈতন্যের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ব্যতীত শরীরের উৎপত্তিই আদৌ সম্ভবপর হয় না। প্রাণিভিন্ন প্রাণীর উৎপত্তি হয় না, ইহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষিত সত্য। চেতনের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়বশতঃই ভোগায়তন শরীর নির্মিত হয়। শরীরের উপাদানের সহিত চেতন আত্মার সম্বন্ধ না থাকিলে, যেই শুক্র-শোণিতের সমবায়ে দেহ গঠিত হয়, দেহের উপাদান সেই শুক্র শোণিত যে পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। পচা শুক্র-শোণিতের দ্বারা দেহের নির্মাণ, পোষণ প্রভৃতি কোনমতেই সম্ভবপর হয় না। এইজন্য দেহের কারণ মাতৃরজে এবং পিতৃবীজে পূর্ব হইতেই জীব-শক্তির এবং প্রাণ-শক্তির সঞ্চার অবশ্য স্বীকার্য। ভোক্তুরধিষ্ঠানাদ্ ভোগায়তননির্মাণমন্যথা পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ। সাংখ্য সূত্র, ৫ম অধ্যায়, ১১৪ সূত্র। গর্ভাশয়ে নিক্ষিপ্ত শুক্রে ঠিক সেই সময়েই প্রাণ-বায়ুর সঞ্চার হয় না সত্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক বায়ুর সম্বন্ধ থাকে। আধ্যাত্মিক বায়ুর সম্বন্ধ থাকে বলিয়াই শুক্র শোণিত পচিয়া যায় না। "আধ্যাত্মিক বায়ুর সম্বন্ধও কিন্তু জীবের অধিষ্ঠান সাপেক্ষ, আত্মার সম্বন্ধ ভিন্ন আধ্যাত্মিক বায়ুর সম্বন্ধ কল্পনা করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা।"[২] শিলা গাত্রের সহিত আধ্যাত্মিক বায়ুর সম্বন্ধ না থাকায়, পাথর প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া গেলে আর জোড়া লাগেনা। জীবন্ত-বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতিতে আধ্যাত্মিক বায়ুর সম্পর্ক আছে, এবং তাহা আছে বলিয়াই বৃক্ষ, লতা

১। যতঃ সর্বং সংহতং প্রকৃত্যাদিকং পরার্থং ভবতি শয্যাদিবৎ। অতোঽসংহতঃ সংহতদেহাদিভ্যঃ পরঃ পুরুষঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য, ১।১৪০।

২। মঃ মঃ ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার-ফেলোশিপ্ লেক্‌চার ২য় বর্ষ ১৫৯ পৃষ্ঠা।

প্রভৃতির ভাঙ্গা জোড়া লাগে, ক্ষতস্থান শুষ্ক হইতে দেখা যায়। কাটাগাছে আলোচ্য আধ্যাত্মিক বায়ুর সম্পর্ক থাকেনা। এইজন্য কাটাগাছের ক্ষতস্থান শুকায় না, ভাঙ্গাও জোড়া লাগে না। জীবিত শরীর পচেনা, মৃত শরীর পচিয়া যায়। কেন এমন হয়? ইহার উত্তরে উপনিষদের ঋষি বলেন যে, বৃক্ষের যে সকল শাখা জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় (অর্থাৎ যে যে শাখায় জীবের অধিষ্ঠান বিলুপ্ত হয়) সেই সকল শাখা শুষ্ক হইয়া যায়। সমস্ত বৃক্ষ-শরীরে জীবের অধিষ্ঠান বিলুপ্ত হইলে, গোটা গাছটাই শুকাইতে শুকাইতে মরিয়া যায়। এইরূপ জীব পরিত্যক্ত মানবদেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জীবের মৃত্যু হয় না।[১] 'জীবাপেতং বাব কিল ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে। বৃহদাঃ উপঃ ৪অঃ। অতএব অমর জীব বা অজড় আত্মা যে নশ্বর জড় দেহ নহে, দেহ হইতে অতিরিক্ত দেহের প্রভু, চালক এবং পোষক তাহাতে সন্দেহ কি?

চার্বাকোক্ত দেহাত্মবাদ যে কত অসার তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া, বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ভামতী টীকায় বলিয়াছেন যে, সতত পরিবর্তনশীল দেহ অপরিবর্তনীয় আত্মা হইবে কিরূপে? দেহই আত্মা হইলে শৈশবের তরুণ দেহের যখন যৌবনে ও বার্ধক্যে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, শরীরের ঐরূপ পরিবর্তনে আত্মারও পরিবর্তন্ অবশ্যম্ভাবী। কেননা, দেহইতো চার্বাকের আত্মা। সে-ক্ষেত্রে বালক বয়সের "আমি" এবং বৃদ্ধ বয়সের "আমি" বিভিন্ন "আমি" হইয়া যাইতাম্। এই দুই "আমি" যে অভিন্ন, এইরূপ অভেদ-বোধ কোন মতেই উদয় হইতে পারিত না। "যেই আমি বালক বয়সে আমার নিজ মাতা-পিতাকে দেখিয়াছি, সেই আমিই এই বৃদ্ধ বয়সে আমার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতিকে দেখিতেছি।" এইরূপ বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যে আমিত্বের ঐক্যবোধ সকলেরই উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেহাত্মবাদে শৈশব, কৈশোর ও পরিণত বয়সের শরীরের ঐক্য না থাকায়, আমিত্বের ঐরূপ ঐক্যবোধ কোন প্রকারেই উপপাদন করা সম্ভবপর হয় না। বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য এই ত্রিবিধ অবস্থায় দেহ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সুধীমাত্রেই নিজেকে অভিন্ন বলিয়াই মনে করেন, ভিন্ন বলিয়া মনে করেন না। ইহা দ্বারা

১। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪ অঃ

দেহ যে আত্মা নহে, আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত, ইহাই স্পষ্টতঃ বুঝা যায়।

দেহ পরিবর্তনশীল। প্রতিমুহূর্তেই দেহের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিতেছে। পূর্বক্ষণে যেই শরীর ছিল, পরক্ষণে আর সেই শরীর নাই; তাহা পরিবর্তিত হইয়া অন্য শরীর হইয়াছে। এইরূপে কিছুদিন পরে শরীর সম্পূর্ণ নূতন হয়, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। দেহের পরিবর্তনে আত্মার পরিবর্তন স্বীকার করিলে, ক্ষণে ক্ষণেই দেহের ভেদে আত্মার ভেদ এবং একই দেহে অগণিত আত্মার ক্রমিক আবর্তন মানিয়া লইতে হয়। এইরূপ কল্পনা অত্যন্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। দেহের ভেদে আত্মার ভেদ স্বীকার করিলে, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞান প্রভৃতি উপপাদন দুরূহ হয়। রামের পরিদৃষ্ট বিষয় শ্যামের স্মৃতিতে ভাসে না। কেননা, রাম ও শ্যামের আত্মা এক নহে, ভিন্ন। স্মৃতির ন্যায় প্রত্যভিজ্ঞানও এক আত্মাতেই পরিস্ফুট হয়, ভিন্ন আত্মায় হয় না। দেহের ভেদবশতঃ শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্যে আত্মার ভেদ ঘটিলে, শৈশবের 'আমি', যৌবনের 'আমি' এবং বার্ধক্যের 'আমি' ভিন্ন 'আমি' বা আত্মা হইতাম, এক আমি হইতাম না। এক আত্মার অনুভব অন্য আত্মার স্মৃতিতে ভাসে না, ভাসিতে পারে না। যেই আত্মা অনুভব করে, সেই অনুভবের স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞান প্রভৃতি সেই অনুভবিতা আত্মায়ই স্ফূর্তি লাভ করে; অন্য আত্মায় জন্মে না। যেহেতু শৈশবের আমি ও বার্ধক্যের আমি, এক আমি নহি, ভিন্ন আমি, এই অবস্থায় শৈশবের আমির সুপ্ত অনুভূতির স্মৃতি বার্ধক্যের আমিতে কোনমতেই জন্মিতে পারে না।

জরাজীর্ণ বৃদ্ধও স্বপ্নে কমনীয়কান্তি যৌবনোচিত দেহ ধারণ করিয়া সাময়িক যৌবন সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে বৃদ্ধ তাঁহার জীর্ণ বিকল শরীরই লাভ করেন। সেই অবস্থায়ও স্বপ্নের যৌবন-সুখ-ভোগের মধুর স্মৃতি তাঁহার চলিয়া যায়না; মনের কোণে তখনও উহা ভাসিয়া বেড়ায়। ইহা হইতে স্বপ্নে ও জাগরণে যে একই অপরিবর্তনীয় আত্মা জীবদেহে বিরাজ করে, এই সত্যই প্রতিভাত হয়।

পরিবর্তনশীল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়াও যেই এক বস্তু অপরিবর্তনীয় থাকিয়া যায়, তাহা ঐসকল পরিবর্তনশীল বস্তু হইতে যে বিভিন্ন, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। একগাছি সূতায় অনেকগুলি

ফুল গাঁথিয়া একটি মালা প্রস্তুত করা গেল। ঐ মালার ফুলগুলি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও একই সূতায় উহারা গ্রথিত আছে (সূতা গাছির সহিত সকল ফুলেরই সম্বন্ধ আছে)। পরস্পর বিভিন্ন ঐ ফুলগুলি ছিঁড়িয়া লইলে সূতাগাছিই অবশিস্ট থাকে। এই অবস্থায় সূতাগাছি যে ফুলগুলি হইতে ভিন্ন ইহা কে না স্বীকার করেন? পরিবর্তনশীল শরীরের বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও, অহংপ্রত্যয়-গম্য আত্মার কোনরূপ পরিবর্তন হইতে দেখা যায় না। "আমি" বালকের শরীর, যুবকের শরীর বা বৃদ্ধের শরীর নহি। এই শরীরত্রয় হইতে বিভিন্ন, শরীরত্রয়ে অনুস্যূত অপরিবর্তনীয় "আত্মা"। শরীরই আত্মার আবাস গৃহ। এইজন্য শরীরের সঙ্গে আত্মার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায়, আত্মাকে দেহাভিমানী বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই প্রতীতি সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক। আত্মা বস্তুতঃ দেহ নহে, আত্মা নিত্য ও অপরিবর্তনীয় সত্য।[১]

আত্মার দেহাভিমান বশতঃ দেহকেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিলে, পরিণত শরীরে শৈশবের স্মৃতি প্রভৃতির উদয় হইতে পারে না, এইরূপে দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে ইতঃপূর্বে যে আপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহার উত্তরে চার্বাক বলেন যে, অনুভব সংস্কার জন্মায়, সেই সংস্কার সময়ান্তরে মনের মধ্যে জাগরূক হইয়া (উদ্‌বুদ্ধ হইয়া) অনুভূত বিষয়ে স্মৃতি উৎপাদন করে। ইহাই স্মৃতির নিয়ম। শৈশবে অনুভবের ফলে যে বাসনা বা সংস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ বাসনা বৃদ্ধ শরীরে সঞ্চারিত (সংক্রান্ত) হইয়া, সেই বাসনা-মূলে বৃদ্ধ শরীরে স্মৃতির উদয় হইবে, ইহাতে আপত্তি কি? দেহাত্মবাদীর এইরূপ সমাধানের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, উল্লিখিত বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা এবং সূতা ও কুসুম প্রভৃতি দৃষ্টান্তের সাহায্যে নিয়ত পরিবর্তনশীল দেহ যে আত্মা হইতে পারে না, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। শরীর অনুভবিতা নহে, আত্মাই অনুভবিতা। অনুভবজাত সংস্কার আত্মাতেই উৎপন্ন হয়। সংস্কার বা বাসনা আত্মারই গুণ, জড়শরীরের তাহা গুণ

১। তস্মাদ্ যেষু ব্যাবর্ত্তমানেষু যদনুবর্ত্ততে, তত্তেভ্যো ভিন্নং যথা কুসুমেভ্যঃ সূত্রম্। তথা চ বালাদিশরীরেষু ব্যাবর্ত্তমানেষ্বপি পরস্পরমহঙ্কারাস্পদমনুবর্ত্তমানং তেভ্যোভিদ্যতে।

অধ্যাসভাষ্য-ভামতী।

নহে। শরীরে তাহা উৎপন্নও হয় না। বালক শরীরে কোনরূপ সংস্কারই আদৌ জন্মে না বা নাই। মূলেই যাহা নাই তাহার আবার বৃদ্ধ-শরীর প্রভৃতিতে সঞ্চার হইবে কিরূপে? এবং তাহার ফলে স্মৃতিই বা হইবে কিরূপে? আলোচ্য সংস্কার বা বাসনা দেহাতিরিক্ত আত্মার ধর্ম নহে, জড় দেহেরই তাহা ধর্ম, ইহা প্রমাণিত হইলেই শরীরের সংস্কার বা বাসনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংস্কার যে শরীরের ধর্ম তাহাই তো এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। এই অবস্থায় এক শরীরের সংস্কার বা বাসনা অন্য শরীরে সঞ্চারের কথা বলিতে যাওয়া কি নিতান্তই অর্থহীন নহে? তারপর, এক শরীরের বাসনা অন্য শরীরে কেন সঞ্চারিত হইবে, তাহার কোন উপযুক্ত কারণ চার্বাক প্রদর্শন করেন নাই। বিনা কারণে যে বাসনার সঞ্চার সম্ভব হইবে না, ইহা তো জানা কথা। ইহার উত্তরে চার্বাক বলিতে পারেন যে, বাল্যের অনুভব বার্ধক্যে স্মৃতিতে ভাসে, ইহা সত্য কথা। সংস্কার না থাকিলে স্মৃতি হইতে পারে না। অনুভব ব্যতীত সংস্কার জন্মে না। অনুভব শৈশবে হইয়াছিল, বৃদ্ধ বয়সে হয় নাই, অথচ স্মৃতি হইতেছে বৃদ্ধ বয়সে। ইহা দ্বারা বালক শরীরের বাসনা বা সংস্কার যে বৃদ্ধ শরীরে (সংক্রামিত) সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে। কেননা, বাসনার ঐরূপ সঞ্চার ব্যতীত বার্ধক্যে বাল্যের অনুভূত বিষয়ের স্মৃতি কোনমতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। শৈশবের স্মৃতি বার্ধক্যে উদিত হয়, ইহা কে না জানে? সুতরাং উক্তরূপে বাসনার সঞ্চারও যে হয়, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। এক শরীর হইতে অপর শরীরে বাসনার সঞ্চারের কোন হেতু নাই, স্বতন্ত্র আত্মবাদীর এই কথার কোন মূল্য নাই।

চার্বাকের উল্লিখিত যুক্তির খণ্ডনে স্বতন্ত্র আত্মবাদী বলেন যে, বাসনা বা সংস্কার মূলে যে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, ইহা কে অস্বীকার করে? কথা এই যে, শৈশবের তরুণ শরীর এবং বার্ধক্যের জরাজীর্ণ দেহ, এই দুইটি শরীর যে পরস্পর দুইটি ভিন্ন আত্মা, ইহাই দেহাত্মবাদের মর্ম। রামের অনুভূতি-জাত সংস্কার বা বাসনা শ্যামে সঞ্চারিত হইয়া, রামের পরিজ্ঞাত বস্তু সম্পর্কে শ্যামের স্মৃতি উৎপাদন করে কি? তাহা তো করে না। তবে শৈশব শরীর এবং পরিণত শরীর, এই দুইটি পরস্পর বিভিন্ন শরীর বা আত্মার মধ্যে বাসনার সঞ্চারই বা হইবে কিরূপে? আর, শৈশব শরীরের সংস্কারমূলে

বৃদ্ধ শরীরে স্মৃতিইবা জন্মে কিরূপে? এইরূপ স্মৃতি উপপাদনের জন্য দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। চার্বাকোক্ত বাসনার সঞ্চারের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র আত্মবাদীর ঐরূপ আপত্তির উত্তরে দেহাত্মবাদী বলেন যে, রামের সংস্কার শ্যামে সঞ্চারিত হইয়া, রামের পরিজ্ঞাত বিষয়ে শ্যামের স্মৃতি জন্মে না, তাহার কারণ এই যে, রামের শরীর এবং শ্যামের শরীরের মধ্যে কোনরূপ কার্য-কারণ-সম্পর্ক নাই। এইজন্যই ঐ ক্ষেত্রে বাসনার সঞ্চার প্রভৃতির কথা আসে না। বালক-শরীর কৈশোর, যৌবন অতিক্রম করিয়া ক্রমে বার্ধক্যে উপনীত হয়। এইরূপ শারীরিক ক্রমপরিবর্তনের মধ্যে যে একটা কার্য-কারণ-সম্পর্ক আছে, তাহা সুধী অস্বীকার করিতে পারেন না। শৈশবের ক্ষুদ্র শরীর ক্রমপরিণত বৃদ্ধ শরীরের কারণ, আর, পরিণত বৃদ্ধ শরীর শৈশব শরীরের কার্য। কারণ-শরীর (শৈশব শরীর) যেমন কার্য-শরীর (বৃদ্ধ শরীর) উৎপাদন করিবে, সেই কার্য-শরীরে (বৃদ্ধ শরীরে) কারণ-শরীরের (শৈশব শরীরের) অনুরূপ বাসনারও সৃষ্টি করিবে। এইরূপে শৈশব শরীরের বাসনা পরিণত শরীরে সঞ্চারিত হইয়া, পরিণত শরীরে শৈশবের বাসনার অনুরূপ স্মৃতি উৎপাদন করিবে, তাহাতে আপত্তি কি? রামের শরীর ও শ্যামের শরীরের মধ্যে (শৈশব শরীর ও পরিণত শরীরের ন্যায়) কার্য-কারণ-সম্পর্ক নাই। এইজন্য রামের বাসনা শ্যামে সঞ্চারিত হইতে পারে না। রামের অনুরূপ স্মৃতিও শ্যামের জন্মে না। শৈশব শরীরের বাসনা বৃদ্ধ শরীরে সঞ্চারের বিপক্ষে রাম ও শ্যামের শরীরের দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনও সঙ্গত হয় না। ভাল কথা, শৈশবের শরীরও পরিণত শরীরের মধ্যে কার্য-কারণ-সম্পর্ক আছে। এইজন্য সেস্থলে বাসনার সঞ্চার হইতে কোনরূপ বাধা নাই, ইহাই যদি চার্বাকের সিদ্ধান্ত হয়। তবে তাঁহার মতে মাতৃ-শরীর হইতে যে সন্তানের দেহ উৎপন্ন হয়, সেখানে মাতৃ-শরীরই সন্তানের দেহের কারণ, এই অবস্থায় মাতৃশরীরের বাসনা সন্তান-দেহে সঞ্চারিত হইয়া, মাতার অনুভূত বিষয়ে সন্তানের স্মৃতি উৎপাদন করে না কেন? যদি বল যে, মাতৃ-দেহ সন্তান-দেহের কারণ বটে, তবে উপাদান-কারণ নহে। পিতৃ-বীজ এবং মাতৃ-শোণিতই সন্তান-দেহের উপাদান-কারণ। উপাদানের বাসনা প্রভৃতি গুণ ঐ উপাদানের দ্বারা গঠিত দেহে সংক্রামিত হয়। মাতৃ-শরীর নিমিত্ত-কারণমাত্র। এইজন্যই মাতৃ-শরীরের

বাসনা পুত্রে সঞ্চারিত হয় না। এইরূপ কল্পনা চার্বাকের নিজ সিদ্ধান্তেরই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। কেননা, শৈশবের শরীরও তো পরিণত শরীরের উপাদান নহে। উপাদান-কারণ কার্যে অনুগত (অনুবৃত্ত) হইয়া থাকে। উপাদান-কারণ বিনষ্ট হইলে কার্যের ধ্বংসও সেক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। সূতা না থাকিলে কাপড় থাকে না; মাটি চলিয়া গেলে ঘট থাকে না। এইজন্য সূতা ও মাটি যে কাপড় এবং ঘটের উপাদান-কারণ তাহা নিঃসন্দেহ। বার্ধক্যের লোলচর্ম, পলিতকেশ জীর্ণ দেহে শৈশবের কমনীয় শরীরের অনুবৃত্তি তো হয়ই না, শৈশব শরীরের ক্রম-বিধ্বংসের ফলেই বৃদ্ধ-শরীরের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। শৈশব-শরীর এক্ষেত্রে পরবর্তী বৃদ্ধ-শরীরের নিমিত্তমাত্র। এই অবস্থায় শৈশব-শরীরের সংস্কার প্রভৃতি বৃদ্ধ-শরীরে সঞ্চারিত হইবেই বা কিরূপে? শৈশবের স্মৃতিই বা উৎপাদন করিবে কিরূপে? ইহার উত্তরে চার্বাক মতের সমর্থনে বলা যায় যে, "যে দ্রব্যের ধ্বংস হইলে যে দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, সেই দ্রব্যের অর্থাৎ ধ্বস্ত দ্রব্যের যাহা উপাদান-কারণ, সেই দ্রব্যের অর্থাৎ পশ্চাদুৎপন্ন দ্রব্যেরও তাহাই উপাদান-কারণ, এই নিয়মের ব্যভিচার (ব্যতিক্রম) নাই"[১]। কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে ছিন্ন বস্ত্র-খণ্ডের উৎপত্তি হয়। এই ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের কারণ কি তাহা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, গোটা বস্ত্রখানির নাশই বস্ত্রখণ্ডের উৎপত্তির কারণ। গোটা কাপড়খানা যদি গোটাই থাকিত, ছিঁড়িয়া না যাইত, তবে, ছিন্নবস্ত্রের উৎপত্তিই আদৌ সম্ভবপর হইত না। গোটা কাপড়খানা ছিঁড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই বিভিন্ন বস্ত্রখণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে। এক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে গোটা কাপড়খানার যাহা (যেই সূতাগুলি) উপাদান-কারণ, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডেরও তাহাই উপাদান-কারণ বলিয়া জানিবে। আলোচ্য নিয়মে শরীরের উৎপত্তি, পরিণতি প্রভৃতি বিচার করিলে ইহাই প্রতিভাত হইবে যে, শৈশব শরীরের ধ্বংস হইয়া যে যৌবন ও বৃদ্ধ শরীর উৎপন্ন হয়, সে ক্ষেত্রেও শৈশব শরীরের যাহা উপাদান-কারণ, তাহাই যৌবন এবং বৃদ্ধ শরীর প্রভৃতিরও উপাদান-কারণ। শরীরের ক্ষণে ক্ষণেই পরিণাম ঘটিতেছে। পূর্ব অবস্থার ধ্বংস হইয়া, অন্য অবস্থার উৎপত্তিকে দর্শনের পরিভাষায় পরিণাম বলা

১ মঃ মঃ ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ফেলোশিপ্ লেক্‌চার ২য় বর্ষ ১৭০ পৃষ্ঠা।

হইয়া থাকে। পূর্ব মুহূর্তে যাহার যেই শরীর ছিল, পর মুহূর্তে আর সেই শরীর নাই, অন্য শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাক্ষ্য দিতেছে যে, এইরূপে কিছুদিন পরে শরীর সম্পূর্ণ নূতন হয়। এই অবস্থায় পরবর্তী শরীর যে পূর্বের শরীর ধ্বংস হইয়া উৎপন্ন হয় এবং পূর্ব শরীরের যাহা উপাদান তাহাই যে ক্রমপরিণত বৃদ্ধ শরীর প্রভৃতিরও উপাদান, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পূর্ব শরীরকে কোনমতেই পরবর্তী শরীরের উপাদান-কারণ বলা চলিবে না। কেননা, একখানি পূর্ণাবয়ব দেহ হইতে যদি হাত দুখানা কাটিয়া ফেলা হয়, তবে সে স্থলে পূর্বের হস্তশোভিত শরীর বিনষ্ট হওয়ার ফলেই যে হস্ত-বিহীন দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পূর্বের শরীর হস্তযুক্ত শরীর, পরবর্তী শরীর হস্তশূন্য শরীর। হস্তশোভিত শরীরকে হস্তশূন্য শরীরের উপাদান বলা যাইবে কি? হস্তযুক্ত শরীরের পাঞ্চভৌতিক মৌলিক অবয়বই হস্তশূন্য শরীরের উপাদান, এই রূপ সিদ্ধান্তই স্বীকার্য। পূর্বের শৈশব শরীর পরবর্তী বৃদ্ধ শরীরের উপাদান নহে। পূর্ববর্তী শৈশব-শরীরের যাহা উপাদান, তাহাই ক্রমপরিণত বৃদ্ধ শরীরের উপাদান। উপাদানের বিশেষ গুণরাজি উপাদেয়ে বা কার্যে সঞ্চারিত হয়। পূর্ববর্তী শৈশব শরীর যেহেতু উপাদান নহে, এইজন্য পূর্ব শৈশব-শরীরের বাসনা, সংস্কার প্রভৃতি পরবর্তী বৃদ্ধ শরীরে সংক্রামিত হইবে, এরূপ বলা চলে না সত্য, কিন্তু পূর্ব শরীরের যাহা উপাদান, তাহাই পরবর্তী শরীরে বাসনা প্রভৃতির সঞ্চার করিবে, এইরূপ মানিয়া লওয়ায় বাধা কি আছে? নীল কাপড় অথবা লাল কাপড়খানি ছিঁড়িয়া গেলেও ঐ বস্ত্রখণ্ডে যে নীলিমা বা রক্তিমা দৃষ্ট হয়, সেখানে বস্ত্রের উপাদান সূতার নীলিমাই বস্ত্রখণ্ডে সঞ্চারিত হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। চার্বাকের উল্লিখিত যুক্তির খণ্ডনে স্বতন্ত্র আত্মবাদী বলেন যে, দেহাত্মবাদী চার্বাক "অহং জানামি" এইরূপ অনুভবের দ্বারা জ্ঞানকে দেহাশ্রিতরূপেই বুঝিয়া থাকেন। শরীরই ভূতচৈতন্যবাদীর মতে অনুভবিতা বা জ্ঞাতা আত্মা। দেহই জ্ঞান, ইচ্ছা সংস্কার প্রভৃতি বিশেষ গুণের আধার। দেহের যাহা উপাদান তাহাতে বাসনা, সংস্কার প্রভৃতি নাই বা থাকেনা। এই অবস্থায় শরীরের যাহা উপাদান-কারণ, তাহাই পরবর্তী বৃদ্ধশরীর প্রভৃতিতে বাসনার সঞ্চার করিবে, এইরূপ বলিতে যাওয়া তো নিতান্তই

অজ্ঞ-জনোচিত। যাহা বাসনা, সংস্কার প্রভৃতির আশ্রয় অর্থাৎ যাহার বাসনা আছে, সেই স্বকার্যে বাসনা প্রভৃতির উৎপাদন করিলেও করিতে পারে, যাহার নিজেরই বাসনা, সংস্কার প্রভৃতি গুণ নাই, সে অপরের বাসনা, সংস্কার উৎপাদন করিবে, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এই দোষ ক্ষালনের জন্য চার্বাক যদি শরীরকে অনুভবিতা না বলিয়া শরীরের উপাদানকেই অনুভবিতা এবং বাসনা, সংস্কার প্রভৃতির আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে, (চার্বাকের স্বীকৃতি অনুসারে) শৈশব-শরীরের উপাদানে যে সকল জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণ আছে, বৃদ্ধশরীরে ঐসকল গুণ বা ধর্মের সঞ্চার ব্যাখ্যা করা যায় বটে, কিন্তু ঐরূপ কল্পনাও দোষের হাত হইতে ত্রাণ পায় না। কেননা, শরীরের উপাদানে না থাকিলে তাহা যেমন স্থূলশরীরে সংক্রামিত হইতে পারেনা, সেইরূপ শরীরের উপাদানের যাহা উপাদান তাহাতে (অর্থাৎ শরীরের উপাদানের উপাদানে) না থাকিলে, শরীরের উপাদানেও বাসনা, সংস্কার প্রভৃতি সঞ্চারিত হইতে পারে না। এই নিয়মে শরীরে বাসনার সঞ্চার প্রভৃতি উপপাদন করিতে গেলে, শরীরের সর্বমূল সেই বিভিন্নপ্রকার ভৌতিক পরমাণু প্রভৃতিরও বাসনা, সংস্কার-প্রমুখ চেতনের বিশেষ বিশেষ গুণ স্বীকার না করিয়া চার্বাকের গত্যন্তর থাকে না। দেহের অবয়বের গুণানুসারে অবয়বী স্থূলদেহের চেতনা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া চার্বাক যেমন একই দেহে অসংখ্য স্বতন্ত্র চেতনের সমাবেশ প্রভৃতি মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন (এই পরিচ্ছেদের ২৫ পৃষ্ঠার বিবরণ দেখুন) এক্ষেত্রেও সেই সকল দোষই (অগণিত চেতনের একই দেহে সমাবেশ প্রভৃতি দোষই) অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ, উল্লিখিত ব্যাখ্যায় হস্ত-পদ প্রভৃতি অবয়বশূন্য দেহের পক্ষে পূর্বের হস্তপদ প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা অনুভূত বিষয়ের স্মরণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। কারণ, এই মতে কর ও চরণের সাহায্যে যে অনুভূতির উদয় হইয়াছে, তাহার আশ্রয় বা আধার কর এবং চরণই বটে, অবয়বী শরীর নহে। কর ও চরণ ব্যতীত অন্য কোন অবয়বও নহে। এই অবস্থায় পরবর্তীকালে কোন কারণে দেহের ঐ প্রধান অবয়ব হাত-পা কাটিয়া ফেলিলে, কর-চরণাশ্রিত-বাসনা প্রভৃতির হস্তপদবিহীন দেহে সঞ্চার কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না। ফলে, কর ও চরণের দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের স্মৃতিও অসম্ভব হয়। ঐরূপ

স্মৃতি সকলেরই উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং ভূতচৈতন্যবাদী চার্বাকের দেহাত্মবাদকে নির্বিবাদে গ্রহণ করা চলেনা। দেহাত্মবাদে স্মৃতির অনুপপত্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার কোন নির্ভরযোগ্য সমাধানও চার্বাকের সিদ্ধান্তে দেখা যায়না। ঐ দোষের যথার্থ সমাধান দেখিতে হইলে দেহাতিরিক্ত চিন্ময় বিভু আত্মবাদেরই শরণ লইতে হয়।

চার্বাক দার্শনিকগণের মধ্যেও দেখা যায় যে, কোন কোন সূক্ষ্মধী চার্বাক স্থূলদেহকে আত্মা বলেন না। স্থূলদেহের অতিরিক্ত দেহাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া থাকেন। এই মত 'ইন্দ্রিয়াত্মবাদ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মতের সমর্থক চার্বাক পণ্ডিতগণ বলেন যে, আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি বলিতেছি, এইরূপ বোধ সকলেরই উদয় হইয়া থাকে। চক্ষুরিন্দ্রিয় ভিন্ন দর্শন হয় না। কান ভিন্ন শ্রবণ সম্ভব হয় না; বাগিন্দ্রিয় ব্যতীত কথা বলা চলে না। এই অবস্থায় দর্শনাদি ক্রিয়ার মুখ্যসাধন চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আত্মকল্পনার কোন সঙ্গত হেতু নাই। উপনিষৎ প্রভৃতিতে স্ব স্ব প্রধান্য স্থাপনের জন্য বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতির পরস্পর বাদানুবাদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে ইন্দ্রিয়বর্গ যে অচেতন নহে, চেতন, তাহাই স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হয়। এই চেতন ইন্দ্রিয়বর্গই আত্মা ইহাই ইন্দ্রিয়াত্মবাদের স্থূল মর্ম।

চার্বাকোক্ত ইন্দ্রিয়াত্মবাদ ও তাহার খণ্ডন

এই ইন্দ্রিয়াত্মবাদের ভিত্তি নিতান্ত শিথিল। "আমি দেখিতেছি" এই প্রকার অনুভবের দ্বারা আমি দর্শন ক্রিয়ার আশ্রয় বা কর্তা ইহা বুঝা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমি কে? আমি কি চক্ষু? না চক্ষু প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের চালক স্বতন্ত্র কিছু? চক্ষুরিন্দ্রিয় ভিন্ন দর্শন হয় না, ইহা খুব সত্য কথা, কিন্তু তাহা বলিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়কেই যে দর্শনের কর্তা বলিতে হইবে, এইরূপ কল্পনার কোন মূল্য নাই। অগ্নি ভিন্ন পাক হয়না, কুঠার ভিন্ন ছেদন হয়না, এইজন্য অগ্নিকে পাকের, কুঠারকে ছেদনের কর্তা বলা সঙ্গত হইবে কি? চক্ষুরিন্দ্রিয় ভিন্ন যেমন দর্শন হয়না, সেইরূপ দ্রষ্টব্য বস্তু না থাকিলেও, দর্শন সম্ভবপর হয়না। দৃশ্য বস্তু না থাকিলে দেখিবে কাহাকে? চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় দৃশ্য বিষয়ও যে দর্শনের কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দর্শন ক্রিয়ার কারণ বলিয়া

চক্ষুকে দর্শনের কর্তা বলিতে গেলে, দৃশ্য বিষয়কেও দর্শনের কর্তাই বলিতে হয়। কোন সুধী দার্শনিকই দৃশ্যবস্তুকে দর্শনের কর্তা বলিয়া স্বীকার করেন না। দৃশ্য দৃশ্যই বটে, দ্রষ্টা নহে। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, কারণ হইলেই তাহা কর্তা হয় না। দর্শনের কারণ চক্ষুও সুতরাং দর্শনের কর্তা নহে। এইজন্য আত্মাও নহে। দর্শনের যাহা কর্তা তাহাই আত্মা। ক্রিয়ার মুখ্য সাধনকে করণ বলা হইয়া থাকে। ঐ করণ সব সময়ই কর্তার অধীন, কর্তার ন্যায় স্বাধীন নহে। চুলায় আগুন কর্তার চেষ্টায় নিক্ষিপ্ত হয়, এবং পাকক্রিয়া সম্পাদন করে, ঘাতকের চেষ্টায় অসি শত্রুদেহে বিদ্ধ হয়, অসি স্ব ইচ্ছায় শত্রু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। দর্শনের করণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য বিষয়ের সংযোগও চক্ষুর ইচ্ছায় ঘটিবেনা; কর্তার প্রযত্ন বা চেষ্টাবশতঃই তাহা সঙ্ঘটিত হয়। এই অবস্থায় চক্ষুরিন্দ্রিয়কে দর্শনক্রিয়ার করণ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। দর্শনের করণকে কোনমতেই দর্শনের কর্তা বলা চলিবে না। বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার ভামতীতে স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি, মনঃ প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আত্মার সুখ, দুঃখ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মানস জ্ঞানের করণ বুদ্ধি, মনঃ প্রভৃতিকে অহংপ্রত্যয়গম্য আত্মা বলা চলে না।[১] আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, নিজকানে শুনিয়াছি, এইরূপ সকলেই বলিয়া থাকেন এবং অনুভব করেন। ইহা হইতে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যে দর্শনের কর্তা নহে, দর্শনের কর্তা "আমি" চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে অতিরিক্ত অন্য কিছু, এই রহস্যই প্রকাশ পায়।

যদি বল যে, কারকের প্রয়োগ বক্তার ইচ্ছাধীন। বক্তা ইচ্ছা করিলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চক্ষুর প্রাধান্য বুঝাইবার জন্য চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি এইরূপ না বলিয়া (চক্ষুকে করণরূপে ব্যবহার না করিয়া), "চক্ষুঃ পশ্যতি" চক্ষুই দেখিতেছে, এইরূপে চক্ষুকে কর্তা করিয়াও প্রয়োগ করিতে পারেন। সুতরাং করণ কর্তা হইতে পারে না, এই যুক্তির কোনই মূল্য দেওয়া চলে না। বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতির আখ্যায়িকা অনুসারে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ যদি

১ বুদ্ধিমনসোশ্চ করণয়োরহমিতি কর্তৃপ্রতিভাস-প্রখ্যানালম্বনত্বাযোগঃ। অধ্যাসভাষ্য-ভামতী। ৬ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং।

আর এক কথা এই যে, ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব নির্দিষ্ট বিষয়ই গ্রহণ করে। কোন একটি ইন্দ্রিয়ই নির্দিষ্ট একটি বিষয় ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না। চক্ষু রূপই গ্রহণ করে, রস-গন্ধ-শব্দ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারে না। রসনা রসই গ্রহণ করিতে পারে, রূপ-গন্ধ-শব্দ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপ কর্ণ শব্দই গ্রহণ করিতে সমর্থ, রূপ-রস প্রভৃতি অপর কোন বিষয় গ্রহণে সমর্থ নহে। যিনি যেই অম্লরসযুক্ত দ্রব্যের অম্ল রস পূর্বে স্বীয় রসনা দ্বারা অনুভব করিয়াছেন, ঐরূপ কোন রসাভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি পরে কখনও ঐ অম্লরসযুক্ত বস্তু প্রত্যক্ষ করেন, তবে তাঁহার জিহ্বায় জল আসে। জিহ্বায় এরূপ জল আসে কেন? ইহার কোন সদুত্তর ইন্দ্রিয়াত্মবাদী দিতে পারেন না। ঐ প্রশ্নের সদুত্তর পাইতে হইলে, ইন্দ্রিয় সকল যাঁহার ভোগের সহায়ক, এইরূপ ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত ইন্দ্রিয়বর্গের অন্তরচারী আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করিতে হয়। অম্ল দ্রব্য দেখিয়া জিহ্বায় যে জল আসে তাহার কারণ এই, ঐ অম্ল দ্রব্যে চক্ষু পড়িবামাত্র সেই রসে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মনের মধ্যে ঐ অম্লরসযুক্ত দ্রব্যের সুপ্ত স্মৃতির অথবা অনুমান-জ্ঞানের উদয় হয়; এবং ঐ অম্লরসাল বস্তুসম্পর্কে তাঁহার অভিলাষ জন্মে, তাহারই ফলে রস-পিপাসুর জিহ্বা সজল হয়। রসনেন্দ্রিয় অম্ল রস অনুভব করে সুতরাং একমাত্র রসনেন্দ্রিয়ই অম্ল রসের স্মরণ করিতে পারে। রসনেন্দ্রিয় কিন্তু অম্লরসযুক্ত দ্রব্যের দ্রষ্টা নহে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ই দ্রষ্টা বটে। চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্রষ্টা হইলেও চক্ষুরিন্দ্রিয়কে অম্লরসের স্মরণকর্তা (স্মর্তা) বলা চলে না। কারণ, চক্ষুরিন্দ্রিয় তো অম্লরস অনুভব করে না, সে অম্লরস স্মরণ করিবে কিরূপে? যে যেই বস্তু অনুভব করে তাহারই সেই বস্তুসম্পর্কে পরে স্মৃতি হইয়া থাকে। অনুভব এবং অনুভূতি-জাত সংস্কারই স্মৃতির কারণ। অনুভব না থাকিলে স্মৃতি হয় না, হইতে পারে না। অনুভব এবং স্মৃতি এইরূপে এককর্তৃক, ভিন্নকর্তৃক নহে। রূপ দেখিয়া রসের স্মৃতি এবং অনুমানের উদয় হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, রূপ ও রসের অনুভবিতা ভিন্ন ব্যক্তি নহে, একই ব্যক্তি। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি রূপ ও রসের অনুভবিতা হইলে, কোন রূপ দেখিয়া কোনও রসের অনুমান করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কেননা, যেই ব্যক্তি রূপ ও রসের সাহচর্য

(ব্যাপ্তি বা নিয়তসম্বন্ধ) অনুভব করিয়াছে, তাহারই পক্ষে কেবল কোন বিশেষ রূপ দেখিয়া, বিশিষ্ট রসের অনুমান করা সম্ভব হইতে পারে। রূপ ও রসের সাহচর্য বা ব্যাপ্তিবোধ রূপ ও রসের গ্রহণ ব্যতীত কোন মতেই উদয় হইতে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয় বা রসনেন্দ্রিয় কেহই রূপ ও রস এই উভয়ের গ্রহণে সমর্থ নহে, সুতরাং তাহাদের (চক্ষুরিন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয়ের) পক্ষে রূপ ও রসের সাহচর্য বোধ (ব্যাপ্তিবোধ) অসম্ভব। একই ব্যক্তি রূপ ও রস এই উভয়ের গ্রহণে সমর্থ হইলেই সেই ব্যক্তির বিশিষ্ট রূপ ও রসের সাহচর্য বা ব্যাপ্তিবোধ, এবং ঐ ব্যাপ্তিমূলে বিশেষ কোন রূপ দেখিয়া বিশিষ্ট রসের অনুমান অনায়াসেই উৎপন্ন হইতে পারে। ঐরূপ অনুমান হইয়াও থাকে। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, একাধিক বিষয় গ্রহণে অসমর্থ ইন্দ্রিয় জ্ঞাতা নহে, ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত সর্ববিষয়গ্রাহী আত্মাই জ্ঞাতা বটে। ইন্দ্রিয় সকল আত্মার জ্ঞানের সাধনমাত্র। কুঠার যেমন কাঠুরিয়ার ছেদনের প্রধান সহায়, স্বয়ং ছেত্তা নহে। ইন্দ্রিয়বর্গও সেইরূপ জ্ঞাতার জ্ঞানের মুখ্য সাধন; স্বয়ং জ্ঞাতা নহে।

প্রাণ আত্মবাদ ও তাহার খণ্ডন

চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় থাকিলেও প্রাণ থাকিলেই লোক জীবিত থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয় অপেক্ষায় প্রাণ যে শ্রেষ্ঠ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সেই শ্রেষ্ঠ, প্রাণই আত্মা। প্রাণের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি মনোরম আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ এবং প্রাণের মধ্যে পরস্পর শ্রেষ্ঠতা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, উহারা সকলে প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব! আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? প্রজাপতি উত্তর করিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহার সহিত শরীরের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, অর্থাৎ যে শরীর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, শরীর মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। প্রজাপতির এই কথা শুনিয়া প্রথমতঃ বাগিন্দ্রিয় শরীর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন এবং বৎসরান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন যে, তাহার অবর্তমানেও শরীর বিনষ্ট হয় নাই। কেবল মূক ব্যক্তি যেমন কথা বলিতে পারে না, কিন্তু জীবিত থাকে, সেইরূপ বাগিন্দ্রিয়ের অভাবে শরীর মূকের স্থায় বাক্‌শক্তি বিহীন হইয়া জীবিত রহিয়াছে এইমাত্র।

বাগিন্দ্রিয় বুঝিলেন যে, তিনি শ্রেষ্ঠ নহেন। তিনি শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। চক্ষু চলিয়া গেল এবং এক বৎসর পর ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, তাহার অভাবে শরীর মরে নাই, কেবল অন্ধের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছে। চক্ষু বুঝিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নহেন। শ্রোত্র চলিয়া গেল—তাহাতেও শরীর বধিরের ন্যায় জীবিত রহিল। শ্রোত্র বুঝিল যে সেও শ্রেষ্ঠ নহে। তারপর মন চলিয়া গেল। মনের অভাবেও শরীর বিনষ্ট হইল না। অমনস্ক বালকের ন্যায় জীবিত রহিল। মন বুঝিল যে সেও শ্রেষ্ঠ নহে। সর্বশেষ, প্রাণ শরীর হইতে চলিয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিতেই, বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গই শক্তিবিহীন এবং শিথিল হইতে আরম্ভ করিল। শরীর ধ্বংসের উপক্রম হইল। ইহা দেখিয়া অপরাপর ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাণকে বলিল, ভাই তুমিই শ্রেষ্ঠ। তুমি শরীরে আছ বলিয়াই আমরাও আছি। তুমি চলিয়া গেলে আমরা সকলেই মারা যাইব। সুতরাং তুমি শরীর ছাড়িয়া যাইও না! উক্ত আখ্যায়িকা ইন্দ্রিয়বর্গ অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ—এই সত্যই প্রকাশ করে। "প্রাণ আত্মা" ইহা সূচনা করে না। প্রাণ না থাকিলে শরীর থাকে না, এই যুক্তিতে যদি প্রাণকে আত্মা বলিতে হয়, তবে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী প্রভৃতি না থাকিলেও দেহ থাকে না বলিয়া, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী প্রভৃতিকেও আত্মাই বলিতে হয়। আহার ব্যতীত শরীর রক্ষা হয় না ; আলো বাতাস ভিন্ন কোন প্রাণীই জীবন ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু তাহা বলিয়া আহারকে বা আলো বাতাসকে যেমন আত্মা বলা চলে না, সেইরূপ প্রাণের অভাবে দেহ থাকে না বলিয়াই প্রাণকে আত্মা বলা যায় না।

প্রাণ কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে বেদান্তের মতে দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিক বায়ুই প্রাণ। প্রাণকে আত্মা বলিলে বায়ুকেই ভাষান্তরে আত্মা বলা হয়। বায়ু জড় বস্তু এবং অন্যতম ভূতপদার্থ। জড় ভূতের চৈতন্য নাই, সুতরাং জড় ভূত পদার্থ আত্মা হইতে পারে না, ইহা দেহাত্মবাদের আলোচনায়ই আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। জড় প্রাণবায়ুকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিলে, প্রাণাত্মবাদীকে জড় ভূত বায়ুর চৈতন্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ফলে, দেহাত্মবাদের পরীক্ষায় ভূত-চৈতন্যবাদে যে সকল দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রাণাত্মবাদেও সেই সমস্ত দোষই আসিয়া দাঁড়ায়।

সাংখ্য-সিদ্ধান্তে প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের ক্রিয়াকে মনঃ, অহঙ্কার এবং বুদ্ধি, এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণের[১] সাধারণ বৃত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই মতে বৃত্তি এবং বৃত্তিমানের (যাহার বৃত্তি হয় এবং যেরূপ বৃত্তি হয়, এই উভয়ের মধ্যে) কোনরূপ ভেদ নাই। দুইই এক বা অভিন্ন বটে। বৃত্তিমান্ অন্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণ-বৃত্তি প্রাণ-ক্রিয়া ভিন্ন না হইলে, প্রাণাত্মবাদ ইন্দ্রিয়াত্মবাদেই পরিণত হয়; (অর্থাৎ প্রাণাত্মবাদকে ইন্দ্রিয়াত্ম-বাদ ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যায় না) এবং ইন্দ্রিয়াত্মবাদের বিরুদ্ধে ইতঃপূর্বে যে সকল দোষ প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রাণাত্মবাদের বিরুদ্ধেও অবাধে সেই সকল দোষের প্রয়োগ করা চলে।

আত্মা চেতন এবং ভোক্তা। প্রাণ চেতনও নহে। ভোক্তাও নহে। প্রাণ জড় এবং ভোগ্য। প্রাণ শরীরের বন্ধনরজ্জু। প্রাণের বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়াই শরীর ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। প্রাণ-বন্ধন বিযুক্ত হইলেই মৃত শরীর শিথিল হইয়া পড়ে। প্রাণের সহিত শরীরের সন্ধানই জীবন এবং ঐ সন্ধানের বিয়োগই মৃত্যু। যাহা পরস্পর সংহত তাহাই পরার্থ, অর্থাৎ অপরের ভোগ্য বটে, স্বয়ং ভোক্তা নহে। শরীরে সংহত প্রাণও সুতরাং পরার্থই বটে। যিনি প্রাণ অপেক্ষাও পরতর এবং অসংহত, তিনিই আত্মা। মূর্চ্ছা, সুষুপ্তি প্রভৃতি স্থলে প্রাণের ক্রিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি চলিতে দেখা যায়। কিন্তু সেই সময় চেতনা থাকে না। এই জন্যই প্রাণকে আত্মা বলা যায় না। এই সম্পর্কে বৃহদারণ্যক উপনিষদে মনোরম একটি আখ্যায়িকা আছে। বাল্যাবধি অত্যন্ত গর্বিত পণ্ডিত গার্গ্য মহাজ্ঞানী কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি

১ অন্তঃকরণ প্রকৃতপক্ষে একই বটে। একই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। সংশয়াত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে মন, অভিমানাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে অহঙ্কার এবং নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণকে বুদ্ধি বলা হইয়া থাকে। এইরূপে একই অন্তঃকরণকে সাংখ্যমতে ত্রিবিধ বলা হইয়াছে। প্রাণ-ক্রিয়া ঐ ত্রিবিধ অন্তঃকরণেরই সাধারণ বৃত্তি বলিয়া জানিবে।

সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ। সাংখ্য সূত্র ২।৩১

উক্ত সাংখ্যসূত্র এবং এই সাংখ্যসূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করিব। গার্গ্যের কথা শুনিয়া অজাতশত্রু বলিলেন, এই অনুগ্রহের জন্য আমি তোমাকে সহস্র গোধন দান করিতেছি। তারপর, পাণ্ডিত্য গর্বিত গার্গ্য কতিপয় অমুখ্যব্রহ্মের (ব্রহ্ম প্রতীকের) উপদেশ করতঃ পরিশেষে প্রাণ-ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান করিয়া বিরত হইলেন। গার্গ্যের কথা শেষ হইলে, অজাতশত্রু বলিলেন, এই কি তোমার শেষ কথা? গার্গ্য বলিলেন হাঁ। অজাতশত্রু বলিলেন, তুমি যাহার উপদেশ করিলে তাহা প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব নহে, ইহা অমুখ্য ব্রহ্ম। ব্রহ্মের প্রতীকের দৃষ্টিতেই ঐ সকল অমুখ্য ব্রহ্মের উপাসনার কথা অধ্যাত্মশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব অতিদুর্জ্ঞেয়। ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসগোচর। সদ্‌গুরুর উপদেশে বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতির সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়। অজাত-শত্রুর কথা শুনিয়া গার্গ্য বুঝিলেন যে, তিনি যথার্থ ব্রহ্মবিদ্ নহেন। অজাতশত্রুই বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞ। গার্গ্যের অভিমানের খোলস খসিয়া পড়িল। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উদয় হইল। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত অজাতশত্রুকে বলিলেন, তুমি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ। আমি শিষ্যভাবে তোমার নিকট আসীন হইতেছি। তুমি আমাকে ব্রহ্মের উপদেশ কর। ইহা শুনিয়া অজাতশত্রু বলিলেন, তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আচার্যত্বের তুমিই যথার্থ অধিকারী। আমি হীনবর্ণ ক্ষত্রিয়। তুমি আমার নিকট শিষ্যভাবে উপবেশন করিয়া ব্রহ্ম-উপদেশ গ্রহণ করিবে, ইহা অত্যন্তই বিসদৃশ কথা। তুমি আচার্যভাবেই থাক। আমি কৌশলে তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব-রহস্য বুঝাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া অজাতশত্রু গার্গ্যের হাত ধরিয়া রাজপুরীর এক নিভৃত কক্ষে কোনও সুষুপ্তি-সুখমগ্ন পুরুষের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রাণের বৈদিক নাম উচ্চারণ করতঃ সুপ্ত পুরুষকে ডাকিতে লাগিলেন। সেই পুরুষ জাগিলও না, উঠিলও না। পরে, হাত দিয়া ঠেলা দিলে সে জাগিয়া উঠিল। ইহা দ্বারা অজাতশত্রু গার্গ্যকে বুঝাইলেন যে, প্রাণ প্রকৃত আত্মা নহে। আত্মা প্রাণ হইতে অতিরিক্ত বস্তু। আত্মা ভোক্তা এবং সদা চেতন। প্রাণ সেই সদাচেতন ভোক্তা আত্মা হইলে, আমার উচ্চারিত নাম শুনিয়া সে অবশ্য জাগিয়া উঠিত। দগ্ধ করাই অগ্নির স্বভাব। অগ্নির নিকট কোন দাহ্য বস্তু উপস্থিত হইলে, সে অবশ্যই তাহা দগ্ধ করিবে। নতুবা দগ্ধ করাকে অগ্নির স্বভাবই বলা চলিবে না। এইরূপ বোদ্ধৃত্ব বা

জ্ঞাতৃত্ব আত্মার স্বভাব হইলে, আমার আমন্ত্রণ সে অবশ্যই বুঝিতে পারিত এবং উঠিয়া বসিত। আমার আমন্ত্রণ সুপ্ত পুরুষ শুনিতে পায় নাই। সুতরাং প্রাণকে কোনমতেই সর্বদা বোধস্বভাব আত্মা বলা যায় না।[১] যদি বল যে, প্রাণ আত্মা হইলেও সুষুপ্তি অবস্থায় শ্রবণেন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল না থাকায়, সুষুপ্তিমগ্ন পুরুষ তাঁহার আহ্বান শুনিতে পায় নাই। এইরূপ যুক্তির কোনও মূল্য নাই। কারণ, আত্মাই ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা। আত্মার অধ্যক্ষতায় ইন্দ্রিয় সকল ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাণের ক্রিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে থাকে। ইহা হইতে সুষুপ্তিতে প্রাণ যে সুপ্ত নহে, জাগ্রত ও ক্রিয়ারত, তাহাই স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হয়। প্রাণ আত্মা হইলে প্রাণ-ক্রিয়া বিদ্যমান আছে বলিয়া, প্রাণ-পরিচালিত অপরাপর ইন্দ্রিয়ও অবশ্যই ক্রিয়াশীল হইবে; এবং স্ব স্ব কার্য হইতে বিরত হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাণ আত্মা হইলে সুষুপ্তি অবস্থায়ও প্রাণের আমন্ত্রণ শুনিবার পর্যাপ্ত কারণ বতমান আছে। প্রাণ আহ্বান শুনিতে পায় নাই, অতএব প্রাণ যে আত্মা নহে, ইহাই প্রমাণিত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাণ যেমন আহ্বান শুনিতে পায় নাই, আত্মাও তো দেখা যায় আহ্বান শুনিতে পায় নাই। আত্মা যদি আহ্বান শুনিতে পাইত, তবে সুপ্ত পুরুষ অবশ্য জাগিয়া উঠিত। এই অবস্থায় আমন্ত্রণ শুনিতে পায় নাই বলিয়া, প্রাণকে যদি অনাত্মা সাব্যস্ত করিতে হয়, তাহা হইলে অজাতশত্রু কথিত আত্মাই বা অনাত্মা হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, আত্মা সমস্ত দেহাভিমানী বটে, 'অহম্'রূপে সমগ্র দেহাভিমানী আত্মারই উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রাণ হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির ন্যায় দেহের একাংশ মাত্র। দেহের কোনও একাংশের আমন্ত্রণে সমগ্র দেহাভিমানী আত্মা প্রবুদ্ধ হইবেন কেন? দ্বিতীয়তঃ সুষুপ্তি অবস্থায় দেহাভিমানী আত্মা দেহে বিদ্যমান আছেন সত্য, কিন্তু সেই সময়ে সমগ্র ইন্দ্রিয়বর্গ তাহাদের স্ব স্ব ভোগ্য বিষয় হইতে বিরত হইয়া প্রাণে বিলীন হওয়ায়, আত্মাও তখন সুপ্তই বটে। আত্মার জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ সুষুপ্তি অবস্থায়

১। বৃহদারণ্যকের গার্গ্য-অজাতশত্রু সংবাদ দ্রষ্টব্য

নিষ্ক্রিয় হওয়ায়, দেহে আত্মা অবস্থিত থাকিলেও তাহার জ্ঞানোদয় সম্ভবপর হয় না। অজাতশত্রুর আমন্ত্রণ শুনিবারও কথা উঠে না। প্রাণ কিন্তু সুপ্ত নহে। দেহে প্রাণের ক্রিয়া সুষুপ্তি অবস্থায়ও উপলব্ধি হইতেছে। সুতরাং প্রাণ যে সুপ্ত নহে, জাগরিত, তাহা অস্বীকার করা চলে না। প্রাণ আত্মা হইলে প্রাণের অধ্যক্ষতায় চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। সুপ্ত পুরুষের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ যে নিষ্ক্রিয়, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় প্রাণকে কোনমতেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

দেহাত্মবাদ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ এবং প্রাণাত্মবাদ যে যুক্তিসহ নহে, তাহা পরীক্ষা করা গেল। এখন যে সকল চার্বাক দেহ এবং ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালক মনকে আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন, তাঁহাদের মত কতদূর সমীচীন, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

মন আত্মবাদ

মন আত্মবাদীর মতে মনই আত্মা। মনের অতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন তত্ত্ব নাই। যাঁহারা মনের অতিরিক্ত আত্মা মানেন, তাঁহারাও মনের অস্তিত্ব না মানিয়া পারেন না। মনের অস্তিত্ব বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়েই স্বীকার করেন। মনের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব মন-আত্মবাদী চার্বাক মানেন না; সুতরাং মনের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নির্বিবাদ নহে—(বিবাদগ্রস্ত)। এই অবস্থায় যাহা উভয়বাদি-সম্মত সেই মনকেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। দেহাত্মবাদ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী দার্শনিকগণ যে সকল দোষের অবতারণা করিয়া থাকেন, মন আত্মবাদে ঐ সকল দোষও দেখা যায় না। মন আত্মবাদী চার্বাক সম্প্রদায় মনকে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় কেবল জ্ঞানের সাধন হিসাবেই গ্রহণ করেন না। জ্ঞান, বাসনা, স্মৃতি, সংস্কার প্রভৃতির আশ্রয় বা আধার বলিয়াই গ্রহণ করেন। জ্ঞান এই মতে মনেরই ধর্ম, মনের অতীত আত্মার ধর্ম নহে।[১] মনস্তত্ত্ববিদ্ ইউরোপীয় দার্শনিকগণও

১। সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতির নির্দেশ বলে মনকে সুখ, দুঃখ, সংকল্প, বিকল্প, ঐন্দ্রিয়কজ্ঞান, ভীতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা প্রভৃতি যাবতীয় গুণের আধার বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মন ক্রিয়াশীল না হইলে জ্ঞান, বাসনা,

মনকেই আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, মনের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব মানেন না। মহর্ষি গৌতম তাঁহার ন্যায়সূত্রে মন-আত্মবাদের সমর্থনে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আত্মবাদী দার্শনিকগণ মনের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যে-সকল হেতুর উপন্যাস করিয়া থাকেন, তাহা সর্ববিষয়গ্রাহী মনের সম্পর্কেও অবাধে প্রয়োগ করা চলে। সুতরাং আত্মবাদীর আত্মার সাধক ঐসকল হেতুবলে "মন আত্মা" এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়, মনের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না—নাত্মপ্রতিপত্তিহেতূনাং মনসি সম্ভবাৎ। ন্যায়সূত্র, ৩।১।১৫ দ্রষ্টব্য।

এই মন দেহের ন্যায় ভৌতিক নহে। মন অভৌতিক নিরবয়ব এবং নিত্য। দেহাত্মবাদে আমরা দেখিয়াছি যে, চেতনাকে ভৌতিক দেহের ধর্ম বা গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলেই, দেহের বিভিন্ন অবয়বে এমন কি দৈহিক পরমাণুতে পর্যন্ত চেতনা স্বীকার করিতে হয় এবং একই দেহে অনেক চেতনের সমাবেশও মানিয়া লইতে হয়; (২৫,৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন) ফলে, দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্যই দেহাত্মবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। মন আত্মবাদীর নিত্য, নিরবয়ব মনের কারণই আদৌ নাই। এই অবস্থায় অভৌতিক নিত্য মনের চেতনা ভৌতিক দেহের চেতনার ন্যায় কারণের গুণ অনুসারে উৎপন্ন হইবে, এইরূপ আপত্তি করা কোন-মতেই চলিবে না। নিরবয়ব মনে অনেক চেতনের সমাবেশের প্রশ্নও উঠে না। বাল্যে, যৌবনে এবং বার্ধক্যে শরীর ভিন্ন হইলেও, মনের কোন ভেদ হয় না। বাল্যেও যেই মন ছিল, বার্ধক্যেও সেই মনই আছে।

সংস্কার, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির অভ্যুদয় হইতে দেখা যায় না; মনঃ সক্রিয় থাকিলে জ্ঞান ইচ্ছা স্মৃতি সংস্কার প্রভৃতি যাবতীয় মনোধর্মের উদ্‌বোধ হইয়া থাকে। ইহা হইতে (মনের সহিত জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতির অন্বয়-ব্যতিরেক দেখিয়া) মনই যে আলোচ্য সর্ববিধ গুণের আধার তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়।—"বৃত্তিরূপজ্ঞানস্য মনোধর্মত্বে চ কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব" ইতি শ্রুতির্মানম্।

বেদান্তপরিভাষা, ৩৮ পৃষ্ঠা,
বোম্বে সং,

সুতরাং মন-আত্মবাদে শৈশবের অনুভূত বিষয়ের বৃদ্ধ অবস্থায় স্মরণ এবং প্রত্যভিজ্ঞান প্রভৃতি হইতে কোন বাধা দেখা যায় না।

মনকে অন্তঃকরণ বলা হইয়া থাকে। সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের অন্তরেই মন বিরাজ করে এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করায়। মনের সহিত যোগ না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়াশীল হয় না; চক্ষু দৃশ্য-বস্তুর রূপ গ্রহণ করিতে পারে না, কাণ শুনিতে পায় না, রসনা রস-গ্রহণে অক্ষম হয়। এইরূপে দেখা যায় যে, একমাত্র মনই সর্ববিধ ইন্দ্রিয়ের চালক এবং প্রভু। চক্ষু প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়ই একাধিক বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না; স্বীয় নির্দিষ্ট বিষয়ই গ্রহণ করে। ফলে, ইন্দ্রিয়াত্মবাদে "যোঽহমদ্রাক্ষং স এবৈতর্হি স্পৃশামি", "যেই আমি বস্তুটি দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই বস্তুটি স্পর্শ করিতেছি", এইরূপ দর্শন ও স্পর্শনের এক কর্তৃত্বের ভাতি বা বোধ এবং কোনও পরিদৃষ্ট বস্তুর রূপ দেখিয়া ঐ বস্তুর গন্ধ রস প্রভৃতির অনুমান প্রভৃতি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। একই দেহে অনেক চেতনের সমাবেশও মানিয়া লইতে হয়। ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালক সর্বেন্দ্রিয়বিষয়গ্রাহী নিত্য নিরবয়ব মনকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিলে, এই মতে ইন্দ্রিয়াত্মবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত কোন দোষই আসে না। কেননা, একই মন চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করে, কাণের দ্বারা শব্দ শোনে, নাসিকার সাহায্যে গন্ধ ও রসনার দ্বারা রস গ্রহণ করে। সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অন্তরবিহারী সেই একই মনের পক্ষে কোন বিশেষ রূপ বা গন্ধের সহিত বিশেষ রসের সাহচর্য গ্রহণ এবং কোন রূপ দেখিয়া রসের অনুমান করাও অসম্ভব হয় না। দর্শন ও স্পর্শন ক্রিয়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সম্পন্ন হইলেও, উভয়েরই কর্তা একই মন বটে। এইজন্য দর্শন ও স্পর্শনের এক কর্তৃত্বের ভাতি প্রভৃতিও এইমতে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

আলোচ্য মন-আত্মবাদের খণ্ডনে গৌতম, বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন ন্যায়াচার্যগণ বলেন যে, "জ্ঞাতার সমস্ত জ্ঞানেরই সাধন বা করণ অবশ্য স্বীকার্য্য। জ্ঞাতার রূপ-জ্ঞানের সাধন চক্ষুঃ, রস-জ্ঞানের সাধন রসনা ইত্যাদি প্রকারে রূপাদি জ্ঞানের সাধনরূপে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্বীকার করা হইয়াছে। রূপাদি জ্ঞানের

মন-আত্মবাদের খণ্ডন

সাধন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যেরূপ স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ সুখাদি জ্ঞানের ও স্মরণরূপ জ্ঞানের কোনরূপ সাধন বা করণও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। করণ ব্যতীত সুখাদি জ্ঞান ও স্মরণ সম্পন্ন হইলে, রূপাদি জ্ঞানও (চক্ষুরাদি) করণ ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই বিলোপ বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ নিরর্থক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ করণ ব্যতীত রূপাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে না বলিয়াই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সুখাদি জ্ঞান ও স্মরণের সাধনরূপে জ্ঞাতার কোন একটি অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় অবশ্য স্বীকার্য্য। উহারই নাম মন।"[১] রূপ প্রভৃতির প্রত্যক্ষে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যে মুখ্য সাধন হইয়া থাকে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ঐরূপ ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষকে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করিয়া জন্যজ্ঞানমাত্রই যে কোন-না-কোন ইন্দ্রিয়জন্য হইবে, এইরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। রূপ, রস প্রভৃতির জ্ঞান যেমন জন্যজ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতি, অনুমান প্রভৃতি জ্ঞানও সেইরূপ জন্যজ্ঞানই বটে। সুতরাং রূপ, রস প্রভৃতির প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূলে যেমন চক্ষু, রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় করণরূপে বিদ্যমান আছে, সেইরূপ সুখ, দুঃখ, স্মৃতি, অনুমান প্রভৃতি জ্ঞানেরও করণরূপে চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়বর্গ হইতে ভিন্ন "মন" নামে একটি অন্তরিন্দ্রিয় অবশ্য স্বীকার্য। জ্ঞাতার রূপ প্রভৃতির প্রত্যক্ষে চক্ষুরাদি সাধনের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু সুখ-দুঃখ প্রভৃতির প্রত্যক্ষে কোনরূপ সাধনের অপেক্ষা নাই, এইরূপ কল্পনা একান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। রূপাদি প্রত্যক্ষের ন্যায় সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষও সাধন-সাপেক্ষ, এইরূপ অনুমানই যুক্তিসিদ্ধ।[২] রূপ প্রভৃতির প্রত্যক্ষে যেমন ঐ রূপদ্রষ্টা এবং রূপাদি জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে পৃথক্‌ভাবে স্বীকার করা হইয়া থাকে, সেইরূপ সুখ, দুঃখ প্রভৃতির

১। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনূদিত ন্যায়দর্শন ৩।১।১৬ সূত্র দ্রষ্টব্য

২। অনুমানের প্রয়োগ বাক্যটি এইরূপ :—

সুখদুঃখাদি সাক্ষাৎকারঃ সকরণকঃ,

জন্যসাক্ষাৎকারত্বাৎ রূপাদি সাক্ষাৎকারবৎ।

ন্যায়দর্শন-বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ৩।১।১৭ সূত্র।

প্রত্যক্ষেও সুখ-দুঃখের অনুভবিতা এবং এই প্রত্যক্ষের মুখ্যসাধন অন্তরিন্দ্রিয় পৃথক্‌ভাবে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ক্রিয়ামাত্রই কোন-না-কোন সাধন সাপেক্ষ। কাঠুরিয়ার বৃক্ষ-চ্ছেদন ক্রিয়া কুঠার ব্যতীত নিষ্পন্ন হয় না, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর শিরচ্ছেদ অসির সাহায্যে সাধিত হয়, লেখা সর্বদা লেখনী সাপেক্ষ। জ্ঞান-ক্রিয়াও যেহেতু ক্রিয়া সুতরাং জ্ঞান-ক্রিয়ারও যে সাধন বা করণ অবশ্যই থাকিবে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। চক্ষু প্রভৃতির সাহায্যে রূপের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং মানস সুখ-দুঃখ প্রত্যক্ষও যে অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই উদিত হয়, তাহা সুধী অস্বীকার করিতে পারেন না। বৃক্ষের ছেদক কাঠুরিয়া কুঠার হইতে ভিন্ন, হত্যার সাধন অসি ঘাতক হইতে পৃথক্, সুতরাং ক্রিয়ার যাহা সাধন তাহার সাহায্য ব্যতীত ক্রিয়া নিষ্পন্ন না হইলেও, ঐ সাধন বা করণকে কোনমতেই কর্তা বলা চলে না। করণ এবং কর্তা এই দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। করণও কর্তা হয় না, কর্তাও করণ হয় না। ক্রিয়া-সিদ্ধির জন্য উভয়েরই প্রয়োজন আছে। একেকে বাদ দিয়া অপর চলিতে পারে না। এই অবস্থায় মন অন্তরিন্দ্রিয় এবং সুখ, দুঃখ প্রভৃতি প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ সাধন ইহা সাব্যস্ত হইলে, মনকে আর জ্ঞাতা আত্মা বলা চলেনা। চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়বর্গ যেমন জ্ঞাতা নহে, জ্ঞানের মুখ্য সাধন, অন্তরিন্দ্রিয় মন ও সেইরূপ জ্ঞাতা (মন্তা বা মনন কর্তা) নহে, মানস জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন এইমাত্র। জ্ঞানের যাহা সাধন, তাহা কোনমতেই মন্তা বা জ্ঞাতা হইতে পারে না। জ্ঞাতা বা মননকারী আত্মা মন হইতে অতিরিক্ত পদার্থ। জ্ঞানের সাধন মন এবং তাহা হইতে পৃথক্ জ্ঞাতা বা মন্তা আত্মা, এই দুইটিকে স্বীকার করিয়া লইয়া মন-আত্মবাদী যদি আত্মাকে "আত্মা" না বলিয়া "মন" নামে অভিহিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে নামের ভেদ হয় বটে, কিন্তু জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের সাধন এই দুইটিকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হওয়ায়, মন-আত্মবাদের সহিত নৈয়ায়িক প্রভৃতির সিদ্ধান্তের মূলতঃ কোন বিরোধ হয় না—জ্ঞাতুর্জ্ঞানসাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রম্। ন্যায়সূত্র, ৩।১।১৬।

আমি মনে মনে বুঝিয়াছি, আমার নিজ বুদ্ধিদ্বারা জানিয়াছি, আমার মন খারাপ লাগিতেছে, মন চঞ্চল হইয়াছে। আমার মন বলিতেছে যে, কোন

বিপদ অবশ্যই ঘটিয়াছে। আমি আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না, এইরূপ শত শত অনুভব সুধীমাত্রেরই উদয় হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে মন, বুদ্ধি যে আমি নহি, মন এবং বুদ্ধি আমার (আত্মার) জানিবার উপায়, জ্ঞানের মুখ্য সাধন ইহাই বুঝা যায়। মন জ্ঞানের করণ বলিয়া যেমন জ্ঞানের কর্তা বা জ্ঞাতা হইতে পারে না, সেইরূপ মন দৃশ্য বলিয়াও দ্রষ্টা হইতে পারে না। মন দৃশ্য, আত্মা দ্রষ্টা। দ্রষ্টা এবং দৃশ্য পরস্পর বিভিন্ন, মন এবং আত্মাও সুতরাং পরস্পর বিভিন্ন।[১]

তারপর, মন এক (বহু নহে) এবং পরমাণুর ন্যায় অতিশয় সূক্ষ্ম বস্তু। এইরূপ অণুপরিমাণ মন যে আছে, তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন যে, রূপ-জ্ঞান, রস-জ্ঞান, গন্ধ-জ্ঞান প্রভৃতি নানা-জাতীয় ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ একই সময়ে উদিত হইতে দেখা যায় না। একই সময়ে একাধিক বস্তুর প্রত্যক্ষ কেন জন্মে না? এইরূপ আপত্তির সমাধান করিতে গেলেই মনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থূল বস্তুর প্রত্যক্ষে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগ না থাকিলে, কোনরূপ ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষই আদৌ জন্মিতে পারে না। প্রত্যক্ষে দৃশ্য বিষয়ের সহিত চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ন্যায়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগও সহকারী কারণ বটে। মন অতিশয় সূক্ষ্ম এবং এক বিধায়, একই সময়ে এক ইন্দ্রিয় ভিন্ন, একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগ ঘটিতে পারে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়-মনঃ-সংযোগরূপ করণ না থাকায়, ভিন্ন ভিন্ন ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষও একই সময়ে জন্মিতে পারে না। একই সময়ে নানা জাতীয় ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি দ্বারাই অনুমিত হয় যে, স্থূল বস্তুর প্রত্যক্ষে এমন একটি সূক্ষ্ম সহকারী কারণান্তর অবশ্যই আছে, যাহার অভাবে একই সময়ে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞেয় বিষয়ের যোগ (সন্নিকর্ষ) থাকিলেও, একাধিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হয় না, হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার যোগ ঘটিলেই ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহাই অন্তরিন্দ্রিয় "মন" বলিয়া জানিবে।[২]

মনস্তর্হীতি চেন্ন মনসোঽপি
বিষয়ত্বাদ্ রূপাদিবদ্ দ্রষ্টৃত্বানুপপত্তেঃ। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য,
যুগপদ্ জ্ঞানানুপপত্তির্মনসো লিঙ্গম্। ন্যায়সূত্র, ১।১।১৬,
জ্ঞানাযৌগপদ্যাদেকং মনঃ। ন্যায়সূত্র, ৩।২।৫৬

এই মন পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম বলিয়াও ইহাকে "আত্মা" বলা চলে না। কারণ, ঐরূপ সূক্ষ্ম মন, জ্ঞানের আশ্রয় বা জ্ঞাতা আত্মা হইলে, ঐ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ কোনমতেই সম্ভবপর হয় না। কেননা, জ্ঞান আত্মারই গুণ। গুণের আধার দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইয়াই, ঐ দ্রব্যাশ্রিত গুণের প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যক্ষের ইহাই নিয়ম। গুণের আধার দ্রব্যটি অতিশয় সূক্ষ্ম হইলে, (অর্থাৎ ঐ দ্রব্যটি প্রত্যক্ষের উপযোগী মহৎ (বৃহৎ) পরিমাণের না হইলে), ঐ দ্রব্যেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না এবং ঐ দ্রব্যে অবস্থিত কোন গুণের প্রত্যক্ষও সম্ভবপর হয় না। অতি সূক্ষ্ম বস্তুর এবং ঐ বস্তুর বিশেষগুণ বা ধর্মের প্রত্যক্ষ সম্ভবপর হইলে, সূক্ষ্মতম পরমাণুর এবং পরমাণুর রূপ প্রভৃতিরই বা প্রত্যক্ষ হইতে বাধা কি? পরমাণুর কিংবা পরমাণুর রূপ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, পরিমাণে অপেক্ষাকৃত যাহা মহত্তর বা বৃহত্তর ঐরূপ বস্তুর এবং উহার গুণাবলীরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। "আমি জানিতেছি", "আমি দেখিতেছি" এইরূপে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ সকলেরই উদয় হইতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষগম্য ঐ জ্ঞানের আধার আত্মাকে অতিশয় সূক্ষ্ম, অণুপরিমাণ বলা চলিবে না, মহৎ পরিমাণই বলিতে হইবে। মনকে কিন্তু কোনমতেই মহৎপরিমাণ বলা যায় না। মন পরিমাণে মহৎ বা বৃহৎ হইলে, একই সময়ে চক্ষু প্রভৃতি নানা ইন্দ্রিয়ের সহিতও মনের যোগ সম্ভবপর হয়, এবং চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষেরও একই কালে উদয় হইতে পারে। কোন দুইটি প্রত্যক্ষ জ্ঞানই এক সময়ে জন্মে না, ইহা হইতে ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ মন যে অতিশয় সূক্ষ্মবস্তু তাহাই নিঃসন্দেহে বুঝা যায়।[১] ঐরূপ সূক্ষ্ম মন আত্মা হইবে কিরূপে?

১। (ক) যথোক্তহেতুত্বাচ্চাণু। ন্যায়সূত্র, ৩।২।৫৯।

অণু মন একঞ্চেতি·········জ্ঞানাযৌগপদ্যাৎ। মহত্ত্বে মনসঃ সর্বেন্দ্রিয়-সংযোগাদ্ যুগপদ্ বিষয়গ্রহণং স্যাদিতি; ন্যায়সূত্র বাৎস্যায়ন-ভাষ্য, ৩।২।৫৯।

(খ) মহর্ষি চরকও বলিয়াছেন—

অণুত্বমথ চৈকত্বং দ্বৌ গুণৌ মনসঃ স্মৃতৌ।

চরকসংহিতা, শারীর স্থান,

১ম অঃ ১৭ শ্লোক।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আধার আত্মা—জ্ঞানের সাধন মন হইতে অতিরিক্ত পদার্থ।

মনের বিভুত্বও অবশ্য অতি প্রাচীন মত। পাতঞ্জল দর্শনে (কৈবল্য পাদের ১০ম সূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে) ঐ মতের পরিচয় পাওয়া যায়। উদয়ন তাঁহার "কুসুমাঞ্জলিতে" (তৃতীয় স্তবকের প্রথম কারিকার ব্যাখ্যায়) অনুমান প্রভৃতি বিবিধ তর্কজাল বিস্তার করিয়া, মনের বিভুত্ব সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া, অণুত্ববাদ সমর্থন করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে (অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যায়) আমরা দেখিতে পাই যে, মনকে অন্নরস-পরিপুষ্ট এবং ষোলকলায় পরিপূর্ণ বলা হইয়াছে। উপযুক্ত আহার গ্রহণ করিলে দেহের যেমন উপচয় বা বৃদ্ধি হয় এবং আহার না পাইলে শরীরের যেমন ক্রমশঃ অপচয় ঘটে (ক্ষয় হয়), ষোলকলায় পূর্ণ মনেরও সেইরূপ আহার গ্রহণ না করিলে, দিনে দিনেই কৃষ্ণপক্ষের শশি-কলার ন্যায় কলাক্ষয় হইতে থাকে, পুষ্টিকর আহার্য গ্রহণ করিলে আবার ক্রমে ক্রমে রাকার ন্যায় পূর্ণ উহা পরিণতি লাভ করে। শৈশবের স্বল্প পরিসর দেহ যৌবন সমাগমে যেমন সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং বার্ধক্যে জরাজীর্ণ, অচল হইয়া পড়ে, বাল্যের অপুষ্ট, অপরিস্ফুট মনও সেইরূপ যৌবন সমাগমে পূর্ণ পরিপুষ্টি এবং স্ফূর্তি লাভ করে। বার্ধক্যে মনঃশক্তির অপচয় ঘটে। সুতরাং দেহের ন্যায় মনও যে সাবয়ব এবং পরিবর্তনশীল, তাহা সুধী অস্বীকার করিতে পারেন না। কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক মনকে দেহের অংশ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচ্য দৃষ্টান্তে মন সাবয়ব এবং ভৌতিক ইহা সাব্যস্ত হইলে, এবং শরীরের ন্যায় অবয়বের বৃদ্ধি ও হ্রাসে মনেরও উপচয় ও অপচয় (বৃদ্ধি ও হ্রাস) অবশ্যম্ভাবী হইলে, বাল্য যৌবন ও বার্ধক্যে শরীরের (এবং দেহাত্মবাদীর আত্মার) যেমন ভেদ হইবে, মনেরও সেইরূপ ভেদ হইতে বাধ্য। বাল্যে যেই অপুষ্ট অপরিণত মন ছিল, যৌবনে ও বার্ধক্যে সেই মন থাকিবে না। ফলে, দেহাত্মবাদেও যেমন শৈশব-দেহে অনুভূত বিষয়ের বার্ধক্যে স্মৃতি সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ শৈশবের অপুষ্ট মনের অনুভূত বিষয়ের অপরিস্ফুট স্মৃতিও বার্ধক্যে উৎপন্ন হইতে পারিবে না। ভৌতিক দেহ হইতে যেমন চৈতন্যের উদ্ভব হইতে পারে না, ভৌতিক মন হইতেও সেইরূপ চৈতন্যের উৎপত্তি সম্ভবপর হইবে না। এক কথায়, ভৌতিক

দেহাত্মবাদ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ প্রভৃতিতে যে সকল দোষ দেখা গিয়াছিল, মন আত্মবাদেও সেই সকল দোষের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইবে। ভৌতিক শরীরের ক্রিয়া যেমন প্রত্যক্ষদৃষ্ট, ভৌতিক মনের ক্রিয়াও সেইরূপ প্রত্যক্ষদৃষ্ট। জড়শরীরের ক্রিয়া শরীরের ইচ্ছা অনুসারে জন্মে না, ঐ জড়শরীরকে যিনি ভোগ করেন, স্বেচ্ছায় চালিত করেন, সেই স্বতন্ত্র চেতন ভোক্তা এবং চালকের ইচ্ছাক্রমেই শরীরের ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। জড়ের নিজের কোন ইচ্ছা নাই। ইচ্ছা চেতন আত্মারই ধর্ম, জড়ের ধর্ম নহে। ভৌতিক শরীরের ক্রিয়া যেমন শরীরজন্য নহে, ভৌতিক মনের ক্রিয়াও সেইরূপ মনোজন্য নহে। শরীরের যেমন একজন স্বতন্ত্র চালক আবশ্যক, মনেরও সেইরূপ একজন পরিচালক আবশ্যক। মন হইতে পৃথক কোন স্বাধীন চেতনের ইচ্ছানুসারেই যে মন ক্রিয়াশীল হয়, ইহা না মানিয়া উপায় নাই।[১] মনের পরিচালক সেই স্বতন্ত্র চেতনই আত্মা। চেতনের ভোগের সাধন পরতন্ত্র মনঃ আত্মা নহে।

আত্মচৈতন্য নিত্য

এই আত্মচৈতন্য নিত্য। ইহা অনিত্য হইলে অবশ্যই কোন কারণজন্য হইবে। জড় বস্তু হইতে যে চৈতন্য জন্মিতে পারে না, তাহা আমরা চার্বাক মতের বিচারপ্রসঙ্গেই দেখিয়া আসিয়াছি। সুতরাং অনিত্য আত্মচৈতন্য অপর কোন চৈতন্য হইতে উৎপন্ন হইবে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। সেই কারণ চৈতন্য যদি অনিত্য বা জন্য চৈতন্য হয়, তবে তাহারও কারণের প্রশ্ন অবশ্যই আসিবে এবং এইরূপে "অনবস্থা দোষ" অপরিহার্য হইবে। এই অনবস্থা দোষ পরিহারের জন্য কারণ চৈতন্যকে অজন্য বা নিত্য বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে। বীজ ও অঙ্কুরের অনবস্থা যেমন দোষের হয় না, সেইরূপ অনিত্য জন্য চৈতন্যের কারণের অনবস্থাও

১। (ক) পরতন্ত্রাণি ভূতেন্দ্রিয়মনাংসি ধারণ-প্রেরণ-ব্যূহনক্রিয়াসু প্রযত্নবশাৎ প্রবর্ত্তন্তে, চৈতন্যে পুনঃ স্বতন্ত্রাণি স্যুরিতি। ন্যায়ভাষ্য, ৩।২।৩৮,

(খ) ধারণ-প্রেরণ-ব্যূহনক্রিয়াসু যথাযোগং শরীরেন্দ্রিয়াণি পরতন্ত্রাণি ভৌতিকত্বাৎ ঘটাদিবদিতি। মনশ্চ পরতন্ত্রং করণত্বাৎ বাস্যাদিবদিতি।

ন্যায়বার্তিক তাৎপর্য টীকা ৩।২।৩৮,

দোষের কারণ হইবে না। এইরূপ মনে করিলেও এইমতে গৌরবদোষ অবশ্যম্ভাবী হইবে। যোগাচার[১] বৌদ্ধ আলোচ্য অনবস্থাকে মানিয়া লইয়াই অনন্ত চৈতন্য-ক্ষণ-সন্ততিকেই একমাত্র তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই মত কতদূর যুক্তিসহ তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী "অহম্" এই প্রকার ক্ষণিক জ্ঞান ব্যতীত, চিরস্থির আত্মা মানেন না। ঐ অহং জ্ঞানের নাম আলয় বিজ্ঞান, উহা ক্ষণিকমাত্র। পূর্বজাত অহং-

১। বুদ্ধদেবের চারজন প্রধান শিষ্যের প্রশ্ন এবং উত্তরের ভিত্তিতে (১) সৌত্রান্তিক, (২) বৈভাষিক, (৩) যোগাচার এবং (৪) মাধ্যমিক এই চার প্রকার বৌদ্ধ সম্প্রদায় গঠিত হয়। যে শিষ্য গুরুকে সূত্রের অর্থাৎ শাস্ত্রের অন্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সৌত্রান্তিক বলা হয়। সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক ইহারা দুইজনেই পরিদৃশ্যমান বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বৈভাষিকের মতে বাহ্যপদার্থ প্রত্যক্ষ-গম্য। সৌত্রান্তিক বাহ্যপদার্থের প্রত্যক্ষতা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে জ্ঞানের বৈচিত্র্য দেখিয়া বাহ্যবস্তু অনুমিত হইয়া থাকে। "অয়ং ঘটঃ" এই প্রকার প্রতীতি-বশে বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষগম্য হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বাহ্য প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নহে, এইরূপ ভাষা বা উক্তি বিরুদ্ধ। যেই শিষ্য ঐরূপ বিরুদ্ধ উক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাকে "বৈভাষিক" নামে অভিহিত করা হয়। বৌদ্ধমতে গুরু-কথিত বিষয়ের অস্বীকার করাকে "যোগ" এবং ঐ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করার নাম "আচার"। যে শিষ্য বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও, বিজ্ঞানের সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন এবং বৌদ্ধোক্ত শূন্যতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন অর্থাৎ বাহ্য দৃশ্য বস্তু না মানিয়াও, আন্তর বিজ্ঞান মানিয়া লইয়া বৌদ্ধোক্ত সর্বশূন্যবাদের যৌক্তিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে "যোগাচার" আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। যিনি বুদ্ধকথিত সর্বশূন্যবাদ নত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন তোলেন নাই, তাঁহাকে "মাধ্যমিক" বলা হইয়া থাকে। কেননা, তিনি গুরু-কথিত বিষয় শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাকে কোন মতেই নিকৃষ্ট বলা চলে না। গুরুর উপদেশ সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন তোলেন নাই, এইজন্য উৎকৃষ্টও বলা চলে না। তাঁহাকে "মাধ্যমিক" বলাই

মাধবাচার্যকৃত সর্বদর্শনসংগ্রহ,

বৌদ্ধদর্শন, অভ্যংকর সং, ৩০ পৃঃ, ৮৩ পৃষ্ঠা।

জ্ঞান পরক্ষণে আর একটি অহংজ্ঞান জন্মাইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। এই-ভাবে সম্বিৎ-প্রবাহের ন্যায় "অহম্ অহম্ অহম্" এইরূপ আলয়বিজ্ঞানের প্রবাহ চিরনির্বাণ না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই প্রবাহই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর আত্মা; আলোচ্য প্রবাহের অতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কিছুই নাই। ইহারই নাম বিজ্ঞানস্কন্ধ বা অহং-বিজ্ঞান-সন্ততি। দেহভেদে এই সন্তান ভিন্ন ভিন্ন; এবং উহার মধ্যগত এক একটি অহংজ্ঞানের নাম অহংজ্ঞান-সন্তানী। অহং জ্ঞানের প্রবাহ বা সন্তান অহংজ্ঞান-সন্তানী হইতে বস্তুতঃ কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। জ্ঞানের প্রবাহও কতকগুলি বিশেষ জ্ঞান মাত্র। যদি ঐ অহংজ্ঞানের প্রবাহ অহংজ্ঞান-সন্তানী হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থই হয়, তবে, নামান্তরে এবং প্রকারান্তরে ক্ষণিক বিজ্ঞানের অতিরিক্ত স্থির আত্মাই মানিয়া লওয়া হয় না কি? যে-কোন ভাবে স্থির আত্মা মানিতে গেলেই, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীকে তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিতে হয়। এইজন্যই বৌদ্ধসিদ্ধান্তে সন্তান এবং সন্তানীর কোনরূপ বিভেদ স্বীকৃত হয় নাই। নির্বাণ না হওয়া পর্যন্ত অহংজ্ঞান-প্রবাহরূপ আত্মার উচ্ছেদ হয় না। এক সন্তানীর জ্ঞান, সংস্কার প্রভৃতি পরবর্তী অপর সন্তানীতে সঞ্চারিত হয়। এইরূপ সঞ্চারের ফলেই এই মতে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞান প্রভৃতির উদয় হইতে কোনরূপ বাধা দেখা যায় না।

বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ

আলোচ্য বিজ্ঞানবাদের সমালোচনা করিতে গিয়া নিত্যবিজ্ঞানবাদী বৈদান্তিক বলেন যে, চৈতন্য যে ক্ষণিক অর্থাৎ একক্ষণমাত্রই অবস্থান করে, এইরূপ বৌদ্ধসিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, ক্ষণিক বিজ্ঞান-বাদী বুদ্ধিবৃত্তিকেই বিজ্ঞান বলিয়া বুঝিয়াছেন। বুদ্ধিবৃত্তি হইতে অতিরিক্ত বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক চৈতন্যকে লক্ষ্য করেন নাই। বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত স্বচ্ছ বলিয়া তাহাতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়। বুদ্ধিদর্পণে চিৎপ্রতিবিম্ব পড়ায়, জড়বুদ্ধিকেও চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয়। চিদুজ্জ্বল ক্ষণিক বুদ্ধিবৃত্তিকে চেতন মনে করিয়াই, বিজ্ঞানবাদী চৈতন্য ক্ষণিক এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত

আলোচ্য বিজ্ঞান-বাদের খণ্ডন

চৈতন্যের পার্থক্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াই চৈতন্যকে ক্ষণিক বলিয়া বুঝিয়াছেন।[১]

জ্ঞান বস্তুতপক্ষে ক্ষণিক নহে। বিজ্ঞান ক্ষণিক হইলে তাহার আদিও থাকিবে, অন্তও থাকিবে। যাহার আদি আছে, তাহা অবশ্যই জন্যবস্তু হইবে। জন্যবস্তু মাত্রেরই প্রাগভাব (বস্তুর উৎপত্তির পূর্বকালবর্তী অভাব) আছে, এবং যাহার প্রাগভাব আছে, পরবর্তীকালে তাহারই উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। যে-বস্তুর প্রাগভাব নাই, পরবর্তী কালে তাহার উৎপত্তিও অসম্ভব। বিজ্ঞানের প্রাগভাব নাই বা থাকিতে পারে না। বিজ্ঞানের প্রাগভাব থাকিলে, সেই প্রাগভাবকে বুঝিবে কিরূপে? বিজ্ঞানের সাহায্যেই অবশ্য বিজ্ঞানের প্রাগভাবকেও বুঝিতে হইবে। বিশ্বের তাবদ্‌বস্তু জ্ঞানের আলোকে উদ্‌ভাসিত হইয়াই জ্ঞাতার নিকট প্রতিভাত হয়। জ্ঞানই একমাত্র স্বপ্রকাশ বস্তু, জ্ঞান ব্যতীত সমস্তই জ্ঞান-প্রকাশ্য। বিজ্ঞানের প্রাগভাবও যে সুতরাং জ্ঞান-প্রকাশ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? বিজ্ঞানের প্রাগভাব থাকা কালে বিজ্ঞান থাকিলে, তবেই বিজ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানের প্রাগভাবের বোধ সম্ভব হইবে। কেননা, বিজ্ঞানই যদি না থাকে, তাহা হইলে প্রাগভাবের অনুভব করিবে কে? পক্ষান্তরে, বিজ্ঞান যদি বর্তমান থাকে, তবে বিজ্ঞানের প্রাগভাবই আদৌ থাকে না। বিজ্ঞানই এক্ষেত্রে প্রাগভাবের প্রতিযোগী। প্রতিযোগী ঘট উপস্থিত থাকিলে যেমন ঘটের অভাব থাকিতে পারে না, সেইরূপ প্রাগভাবের প্রতিযোগী বিজ্ঞান বিদ্যমান থাকা কালে, বিজ্ঞানের প্রাগভাব কোন মতেই থাকিতে পারে না। ফলে, বিজ্ঞানের প্রাগভাবের গ্রাহক কোন প্রমাণ না থাকায়, বিজ্ঞানের প্রাগভাব নাই, ইহাই সাব্যস্ত হয়।[২] যাহার প্রাগভাব নাই, তাহাই অনাদি। বিজ্ঞানেরও প্রাগভাব নাই সুতরাং বিজ্ঞানও অনাদি। অনাদি বিজ্ঞানের

১। বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধাঃ বৃত্তিবোধাদ্‌বিবেকতঃ।
জ্ঞানাত্মত্বশ্রুতৌ মূঢ়া মেনিরে ক্ষণিকাং চিতিম্‌॥
সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

২। কার্যং সর্বৈর্যতো দৃষ্টং প্রাগভাবপুরঃসরম্‌।
তত্রাপি সংবিৎসাক্ষিত্বাৎ প্রাগভাবো ন সংবিদঃ॥
সুরেশ্বরের বার্তিক।

উৎপত্তি নাই সুতরাং বিনাশও নাই (যাহা উৎপন্ন হয়, তাহারই বিনাশ হয়) সুতরাং বিজ্ঞান ক্ষণিক নহে নিত্য, এই সিদ্ধান্তই আসিয়া দাঁড়ায়।

তারপর, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বিজ্ঞান-সন্তান স্বীকার করিয়া, যেই দৃষ্টিতে স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞান প্রভৃতির উপপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। "বৌদ্ধসম্মত অহংজ্ঞানরূপ আত্মা যখন ক্ষণস্থায়ী, তখন যেই অহংজ্ঞানরূপ আত্মা পূর্বে দর্শন করিয়াছিল, পরক্ষণেই তাহার বিনাশ হওয়ায়, সে আত্মা আর পরে তাহা স্মরণ করিতে পারে না। পরজাত অহংজ্ঞানরূপ কোন আত্মাও তাহা স্মরণ করিতে পারে না। কারণ, সেই পরজাত আত্মা পূর্বে সেই পদার্থ দেখে নাই, তখন পরভাবীঅহংবিজ্ঞানের জন্মই হয় নাই, অন্যের দৃষ্ট পদার্থ অন্যে স্মরণ করিতে পারে না। যিনি দ্রষ্টা, তাঁহাতেই (দর্শনের ফলে) সংস্কার জন্মে; তজ্জন্য তিনিই স্মরণ করেন। এই সিদ্ধান্ত বৌদ্ধসম্প্রদায়ও স্বীকার করেন, নচেৎ তাঁহাদিগের মতে একদেহগত অহংজ্ঞান-প্রবাহরূপ আত্মা অন্যদেহগত অহংজ্ঞান-প্রবাহরূপ অন্য আত্মার দৃষ্ট বিষয় স্মরণ করে না কেন? রামের দৃষ্ট বিষয় শ্যাম না দেখিলে, শ্যাম তাহা স্মরণ করিতে পারে কি? অতএব বৌদ্ধসম্মত একদেহগত ক্ষণিক "অহংজ্ঞান"গুলিও (যাহাদিগকে অহংজ্ঞান-সন্তানী বলা হইয়া থাকে) পরস্পর ভিন্ন বলিয়া, অন্যদেহগত "অহংজ্ঞান"গুলির ন্যায় একে অন্যের অনুভূত বিষয় স্মরণ করিতে পারে না। সুতরাং বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিক "অহংজ্ঞান"গুলি কোনরূপেই আত্মা হইতে পারেনা"।[১] স্মরণের সম্ভাবনা না থাকায়, আলোচ্য বৌদ্ধসিদ্ধান্তে প্রত্যভিজ্ঞানও অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কোনও পদার্থ সম্পর্কে ক্রমে দুইটি জ্ঞান উদিত হইলে, একবিষয়ে উৎপন্ন জ্ঞানদ্বয়ের যে প্রতিসন্ধান বা মানসপ্রত্যক্ষ জন্মে, তাহাকেই প্রত্যভিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। "যেই আমি উহা পূর্বে দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই এখনও উহা দেখিতেছি," এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান সুধীব্যক্তিমাত্রেরই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রত্যভিজ্ঞানে "এখন দেখিতেছি" এই অংশ অনুভব, "পূর্বে দেখিয়াছিলাম" ইহা হইল স্মরণ। স্মরণ এবং অনুভব দুইজাতীয়

১। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত ন্যায়দর্শনের টিপ্পনী, ১ম খণ্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

জ্ঞানের একত্র বিকাশই প্রত্যভিজ্ঞান। ঐ দুইজতীয় জ্ঞানেরই কর্তা একক আমি, ইহাই উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। দর্শন ও স্মরণের কর্তা ভিন্ন দুই ব্যক্তি হইলে, রাম যাহা দেখিয়াছিল, তাহা আমি স্মরণ করিতেছি এইরূপেই অনুভব হইত, যেই আমি দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই স্মরণ করিতেছি এইরূপে দর্শন ও স্মরণের এককর্তৃত্বের প্রতিসন্ধান বা মানস-প্রত্যক্ষবোধ কখনও উদিত হইত না। বিভিন্ন জ্ঞানের এককর্তৃত্বের প্রতিসন্ধান সর্ববাদিসিদ্ধ। বিজ্ঞানবাদীও উক্তরূপ প্রতিসন্ধান অস্বীকার করিতে পারেন না। এখন প্রশ্ন এই যে, ক্ষণিক বিজ্ঞান স্বীকার করিলে আলোচ্য প্রত্যভিজ্ঞান বা প্রতিসন্ধান কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। একই আলয়-বিজ্ঞান প্রবাহের অন্তর্গত প্রত্যেকটি "অহংজ্ঞান" পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন এবং ক্ষণিক হওয়ায়, কোন এক অহংজ্ঞান-সন্তানীই যে দর্শন এবং স্মরণ, এই উভয় ক্রিয়ার কর্তা হইতে পারে না, আর, উভয়ক্রিয়ার একই কর্তা হইলে অহংজ্ঞান-সন্তানীকে যে কোনমতেই ক্ষণিক বলা যাইতে পারে না, তাহা-তো সত্য কথা। ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে আলোচিত স্মৃতি এবং প্রত্যভিজ্ঞার অনুপপত্তিকেই স্থির আত্মবাদী দার্শনিকগণ প্রধান অস্ত্রহিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।[১] বিজ্ঞানবাদী প্রত্যভিজ্ঞার উপপাদন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সাদৃশ্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থেরও একত্ববোধ এবং প্রত্যভিজ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায়। শিরঃস্থিত কেশরাশি ক্ষুর দিয়া কামাইয়া ফেলিলে, পুনরায় যখন নূতন কেশোদ্গম হয়, তখন পূর্বের সেই ছিন্ন কেশ এবং নবজাত কেশ ভিন্ন হইলেও উভয় কেশের মধ্যে সাদৃশ্য থাকার দরুণ, "তে অমী কেশাঃ," এই সেই চুলগুলি, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। প্রদীপের রশ্মি ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহাদের পরস্পর সাদৃশ্য নিবন্ধন "সৈবেয়ং দীপশিখা," এই সেই দীপশিখা, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান কাহার না উদয় হয়? এই অবস্থায় ক্ষণিক বিজ্ঞানসকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য থাকায়, বিভিন্ন জ্ঞানের এক কর্তৃত্বের প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞান হইতে বাধা কি? কিন্তু প্রশ্ন এই যে, প্রত্যভিজ্ঞান কাহার হইবে? দীপশিখার কিংবা ছিন্ন ও নবজাত কেশের

১। অনুস্মৃতেশ্চ। ২।২।২৫, ব্রহ্মসূত্র ও ভামতী দ্রষ্টব্য।

প্রত্যভিজ্ঞান তো দীপশিখার বা কেশের হয় না। দীপশিখাদর্শী কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই হয়। এই দৃষ্টিতে বিজ্ঞানরহস্য বিচার করিলে বলিতেই হইবে যে, বিজ্ঞানবাদীর অহংজ্ঞান-সন্তানীর পরস্পর সাদৃশ্য প্রত্যভিজ্ঞানও ক্ষণিক কোন অহংজ্ঞান-সন্তানীর হইবে না। পরস্পর বিভিন্ন অহংজ্ঞান-সন্তানীর সাদৃশ্য যিনি অনুভব করেন, এমন কোন জ্ঞাতারই তাহা হইবে। ফলে, বৌদ্ধোক্ত ক্ষণিকবাদ অচল হইয়া পড়িবে। ক্ষণিকবাদের পরিবর্তে স্থির আত্মবাদই সিদ্ধ হইবে।

"স এবাহম্" এইরূপে আত্মার যে একত্বের প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা কোন সুধীই অস্বীকার করিতে পারেন না। এমন কি বিজ্ঞানবাদীও তাহা মানিতে বাধ্য। বিজ্ঞানবাদী ক্ষণিক বিজ্ঞান-সন্তানকে আত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; আত্মার একত্বের প্রত্যভিজ্ঞান স্বীয় ক্ষণিক প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিজ্ঞানবাদী কোন মতেই উপপাদন করিতে পারেন না। এইজন্যই সাদৃশ্যবশতঃ আত্মার একত্ব প্রত্যভিজ্ঞান যিনি সমর্থন করিয়া থাকেন, তাঁহার মতে আত্মার একত্ব প্রতীতি বাস্তব নহে, উহা সাদৃশ্যমূলক ভ্রমাত্মকবোধ। বৌদ্ধসিদ্ধান্তে সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক, কোন বস্তুরই পূর্ব-পরক্ষণ-সম্বন্ধ বা স্থায়িত্ব নাই। সুতরাং বৌদ্ধমতে "তে অমী কেশাঃ," সৈবেয়ং দীপশিখা প্রভৃতি প্রত্যেক প্রত্যভিজ্ঞানই যে ভ্রমাত্মক হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। এখন কথা এই যে, "স এবাহম্", "সেই আমি" এইরূপ সুস্পষ্ট প্রত্যভিজ্ঞান ভ্রমাত্মক হইলে, "ন স এবাহম্", 'পূর্বে যেই আমি ছিলাম, এখনকার আমি, সেই আমি নহি,' এইরূপ বাধক বা বিরুদ্ধপ্রতীতিকে অবশ্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; এবং ঐ বাধক-প্রমাণের সাহায্যেই "স এবাহম্" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞানের ভ্রান্তত্ব নির্ণীত হইবে। কোন স্থিরধী ব্যক্তিরই ঐরূপ বাধকজ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায় না। বাধকজ্ঞান তো দূরের কথা, পূর্বে যেই আমি ছিলাম, এখনও সেই আমি আছি কিনা? আমি বা আত্মার একত্ব বা অভেদ সম্পর্কে ঐরূপ সন্দেহও কখনও কাহারও উদিত হয় না। পূর্বে যেই আমি ছিলাম, এখনও সেই আমিই আছি, এইরূপ নিশ্চয়ই লোকের মনে বদ্ধমূল দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় "স এবাহম্" এইরূপ আত্মার একত্ব প্রত্যভিজ্ঞানকে ভ্রম কল্পনা করার কোন সঙ্গত হেতু নাই। বরং ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞানের সত্যতা

নির্ণয় করিবারই নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রহিয়াছে। এই অবস্থায় বিজ্ঞানবাদী যে আত্মার একত্ব প্রত্যভিজ্ঞানকে সাদৃশ্যমূলক ভ্রমাত্মক প্রত্যভিজ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কোনমতেই গ্রহণ করা যায় না। তারপর, প্রত্যভিজ্ঞান এক্ষেত্রে ভ্রম হইলে, অন্য কোন স্থলে উহা যে সত্য বা প্রমা হইবে, তাহা না মানিয়া উপায় নাই। কারণ, ভ্রম ও প্রমা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিরোধী জ্ঞান। জ্ঞান কোনও ক্ষেত্রে ভ্রম হইলেই বুঝিতে হইবে যে, ক্ষেত্রবিশেষে ঐ জ্ঞান অবশ্যই প্রমা বা যথার্থ হইবে। প্রত্যভিজ্ঞান কোন স্থলে প্রমাত্মক না হইলে, তাহাকে ভ্রমাত্মকও বলা চলে না। ক্ষণিকবাদী সমস্ত বস্তুরই ক্ষণিকত্ব স্বীকার করায়, কোন প্রত্যভিজ্ঞানেরই এইমতে যথার্থ বা সত্য হইবার উপায় নাই। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞানকে ভ্রমাত্মক কল্পনা করার এই মতে কোনই অর্থ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ সাদৃশ্য কাহাকে বলে, তাহা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী লক্ষ্য করিয়াছেন কি? মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্যবোধ সকলেরই উদয় হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে "মুখং চন্দ্রঃ" এইরূপে মুখ ও চন্দ্রের অভেদ প্রতীতি হয় কি? মুখখানি চন্দ্রের মত, এইরূপে মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্য বুদ্ধিরই উদয় হয়। প্রত্যভিজ্ঞা স্থলে "স এবাহম্" সেই আমি, এইরূপ স্পষ্টতঃ অভেদ বুদ্ধিই উৎপন্ন হয়। এই অভেদ বোধকে বিজ্ঞানবাদী সাদৃশ্যমূলক বলেন কিরূপে? "সাদৃশ্যবোধ, সাদৃশ্যের অনুযোগী এবং প্রতিযোগীর জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। যাহার সাদৃশ্যবোধ হয়, তাহাকে সাদৃশ্যের প্রতিযোগী বলে। যে-বস্তুতে সাদৃশ্যবোধ হয়, তাহাকে সাদৃশ্যের অনুযোগী বলা হয়। মুখে চন্দ্রের "সাদৃশ্যবোধ হয়, এক্ষেত্রে চন্দ্র এই সাদৃশ্যের প্রতিযোগী এবং মুখ সাদৃশ্যের অনুযোগী। (ক) সাদৃশ্য, (খ) তাহার প্রতিযোগী এবং (গ) অনুযোগী, এই তিনটি বিষয়ের সাহায্যে সাদৃশ্যজ্ঞান সম্পন্ন হয়। যে-ব্যক্তি চন্দ্র বা মুখ জানে না, তাঁহার মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্যজ্ঞান জন্মে না, জন্মিতে পারে না। বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর মতে সাদৃশ্যজ্ঞান আদৌ জন্মিতেই পারে না। কেননা, তাঁহার মতে কোন বিজ্ঞানই একক্ষণের অধিক সময় অবস্থিত থাকে না। পক্ষান্তরে, 'তেনেদং সদৃশম্', অর্থাৎ ইহা তাহার সদৃশ, এই প্রকার সাদৃশ্যজ্ঞান —'ইহা' 'তাহা' এবং 'সদৃশ' এই তিনটি পদার্থঘটিত। ক্ষণিক

বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞান ক্ষণমাত্রস্থায়ী, ক্ষণমাত্রস্থায়ী একটি বিজ্ঞান (একটি পদার্থই গ্রহণ করে) তিনটি পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে না। অথচ তিনটি পদার্থের জ্ঞানভিন্ন সাদৃশ্যজ্ঞান হইতে পারে না। তিনটি পদার্থের জ্ঞান হইতে অন্ততঃ ত্রিক্ষণস্থায়ী জ্ঞাতার আবশ্যক। জ্ঞাতাকে ত্রিক্ষণস্থায়ী স্বীকার করিলে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ পরিত্যাগ করিতে হয়"।[১] এইরূপ আপত্তির উত্তরে বিজ্ঞানবাদী বলিতে পারেন যে, অনেক বিষয়কে লইয়া একটি জ্ঞান অনেক সময়ই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ঘনসন্নিবিষ্ট তরুরাজি দেখিয়া ঐ তরুরাজিতে এক বনবুদ্ধি সকলেরই উদয় হইয়া থাকে। দর্শনের পরিভাষায় ঐরূপ জ্ঞানকে সমূহালম্বন জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সাদৃশ্য, তাহার প্রতিযোগী এবং অনুযোগী এই তিনটি বস্তুকে লইয়া একটি জ্ঞানোদয় হইতে বাধা কি? এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ "সাকার বিজ্ঞানবাদী"। তাঁহার মতে দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ সমস্তই আন্তর-বিজ্ঞানেরই আকার বটে। বিজ্ঞান ভিন্ন গাছ-পালা, গরু-ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতি বাহ্যপদার্থের কিছুরই অস্তিত্ব নাই। বিজ্ঞানের আকার আভ্যন্তরীণ হইলেও, অনাদি বাসনাবশতঃ উহা বহিঃস্থিত বস্তুরূপে জ্ঞাতার ভ্রান্ত দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে বাহ্যবস্তু বলিয়া কিছুই নাই; বাহ্য বস্তুমাত্রই অসত্য। একমাত্র 'সাকার বিজ্ঞান'ই সত্য। ইহাই হইল বিজ্ঞানবাদের মর্মকথা। এখন প্রশ্ন এই যে, সাকার বিজ্ঞান-বাদীর মতে জ্ঞানের আকার জ্ঞান হইতে ভিন্ন, না অভিন্ন? জ্ঞানের আকার যদি জ্ঞান হইতে ভিন্ন হয়, তবে জ্ঞানের আকার যে জ্ঞান নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে; এবং বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের আকার এই দুই প্রকার পদার্থ স্বীকার করায়, "বিজ্ঞানৈকস্কন্ধবাদ" অর্থাৎ বিজ্ঞানই একমাত্র তত্ত্ব এই সিদ্ধান্ত অচল হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানের অগণিত আকার যদি বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন হয়, তবে, জ্ঞানে যাহা যাহা (যে সকল বস্তু) ভাসিবে, বিশ্বের সেই সমস্ত বস্তুই বিজ্ঞানের আকার হইবে এবং আকার-ভেদে বিজ্ঞানের অসংখ্য ভেদও বিজ্ঞানবাদকে মানিয়া লইতে

১। মঃ মঃ ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার—ফেলোসিপ লেক্‌চার, তৃতীয়বর্ষ, ১৮৭ পৃষ্ঠা।

হইবে। অগণিত বাহ্যবস্তুভেদে বিজ্ঞানের ঘট-জ্ঞান, পট-জ্ঞান, গো-জ্ঞান, নর-জ্ঞান প্রভৃতি অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন আকার স্বীকার করিলে, বাহ্যজগৎকেই বা স্বীকার করিতে আপত্তি কি? ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি আচার্যগণ দৃশ্যমান বাহ্যবস্তুরাজির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষগম্য বিবিধ বিচিত্র জাগতিক বস্তুসম্পর্কে জ্ঞাতার জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের কোন আকার নাই। জ্ঞান নিরাকার, কিন্তু নির্বিষয়ক নহে, সবিষয়ক। প্রত্যেক জ্ঞানেরই কিছু-না-কিছু বিষয় আছে। জ্ঞেয় বিষয়ই জ্ঞানকে রূপ দিয়া থাকে। জ্ঞানের নিজের কোনও রূপ নাই। অগণিত বাহ্যবস্তুভেদে বিজ্ঞানের অনন্ত আকার কল্পনা করা অপেক্ষা জ্ঞানকে নিরাকার এবং সবিষয়ক বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত নহে কি? জ্ঞানকে যাঁহারা সবিষয়ক বলেন, তাঁহাদের মতে একটির ন্যায় জ্ঞানের একাধিক বিষয় থাকিতেও কোন আপত্তি নাই। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী যখন জ্ঞানের আকারকে জ্ঞান হইতে অভিন্ন বলিতেছেন, তখন তাঁহার মতে একটি জ্ঞানের তো তিনটি আকার হইতে পারিবে না। একটি জ্ঞানের একটি আকারই হইবে। এক কখনও তিন হয় না; তিনও কখনও এক হয় না। এই অবস্থায় সাকার বিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধ জ্ঞান ও জ্ঞানের আকার অভিন্ন এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া, 'তেনেদং সদৃশম্' এইরূপ সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে তাহা, ইহা (তৎ ও ইদং) এবং সদৃশ এই তিনটি ভিন্নকালবর্তী পদার্থকে ক্ষণস্থায়ী একই জ্ঞানের আকার কল্পনা করিয়া সাদৃশ্য উপপাদন করিবেন কিরূপে?

বৌদ্ধসিদ্ধান্তে "অহম্" আকার আলয়-বিজ্ঞান-প্রবাহ প্রত্যেক ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং রামের আলয়-বিজ্ঞান-সন্তান ও শ্যামের আলয়-বিজ্ঞান-সন্তান যে এক বিজ্ঞানপ্রবাহ নহে, ইহা সত্য কথা। এইজন্য এই মতে রামের অনুভূত বিষয়সম্পর্কে শ্যামের স্মৃতি হইবার প্রশ্ন উঠে না। কারণ, তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান-ধারার মধ্যে কোনরূপ কার্যকারণ সম্পর্ক নাই। একই বিজ্ঞান প্রবাহের অন্তর্গত বিজ্ঞানগুলির মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এইজন্য পূর্ববর্তী অহমাকার বিজ্ঞানের বাসনা, সংস্কার প্রভৃতি উত্তরবর্তী বিজ্ঞানে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ফলে, পূর্ববর্তী বিজ্ঞানের (বা আত্মার) অনুভূত বিষয় সম্পর্কে উত্তরবর্তী বিজ্ঞানের স্মরণোদয় হইতে কোনরূপ বাধা নাই। দেখাও যায় যে, বীজকে লাক্ষারসে (আলতায়) সিক্ত করিয়া সেই

বীজ ভূমিতে বপন করিলে, ঐ লাক্ষারস-সিক্ত বীজ হইতে উৎপন্ন কাপাস তুলাতে রক্ততার সঞ্চার হইয়া থাকে। কার্যে কারণের গুণের সংক্রমণ অস্বাভাবিক নহে। বিজ্ঞানবাদী এইরূপে তাঁহার মতে স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞান প্রভৃতির সমর্থনের যে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহার প্রতিবাদে বলা যায় যে, উপাদান কারণের গুণ বা ধর্ম উপাদেয়ে (কার্যে) সংক্রামিত হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য। সুতরাং অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্ববর্তী বিজ্ঞান পরবর্তী বিজ্ঞানের উপাদান ইহা সাব্যস্ত হইলেই, প্রদর্শিত লাক্ষারস-সিক্ত বীজের দৃষ্টান্তটি তাঁহার মতে যথার্থ দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কাপাস বীজ যে কাপাসের উপাদান এবং বীজই অঙ্কুর, কাণ্ড, নাল প্রভৃতি ক্রমে কালে কাপাস-বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া, কাপাস তুলা উৎপাদন করে, ইহা কে না জানেন? আলোচ্য ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিজ্ঞান উত্তরবর্তী বিজ্ঞানের নিমিত্তমাত্র, উপাদান কারণ নহে। উপাদান সর্বক্ষেত্রেই উপাদেয়ে অনুস্যূত হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী ক্ষণিক বিজ্ঞান পরবর্তী ক্ষণিক বিজ্ঞানে অনুস্যূত থাকে না, থাকিতে পারে না। এইরূপ ক্ষণিক বিজ্ঞানের পরবর্তী বিজ্ঞানে অনুস্যূতি স্বীকার করিলে, বিজ্ঞানকে কোনমতেই ক্ষণিক বলা চলে না। পূর্ববর্তী বিজ্ঞানের উত্তরবর্তী বিজ্ঞানে অনুস্যূতির অনুরোধেই পূর্ববর্তী বিজ্ঞান অন্ততঃ ক্ষণদ্বয় যে অবস্থান করে, তাহা না মানিয়া পারা যায় না। ফলে, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর ক্ষণিকত্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে বাধ্য। বিজ্ঞানবাদী প্রত্যেক বিজ্ঞানকেই ক্ষণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া, বিজ্ঞানের নিরন্বয় বা নিঃশেষে বিনাশ স্বীকার করিয়া থাকেন। এরূপক্ষেত্রে এক বিজ্ঞানপ্রবাহে পতিত পূর্ববর্তী ক্ষণিকবিজ্ঞান পরবর্তী বিজ্ঞানের নিমিত্তমাত্র হইলেও, তাহা যে উপাদান কারণ নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। নিমিত্ত-কারণের স্থলে কারণের কোন গুণ কার্যে সংক্রামিত হইতে কখনও দেখা যায় না। লাক্ষারস-সিক্ত বীজের রক্তিমাই কার্পাসে সঞ্চারিত হয়, ভূমি কর্ষণের জন্য ব্যবহৃত লাঙ্গলের মালিন্য কার্পাসে কখনও সংক্রামিত হয় না। কেননা, যেই লাঙ্গলের দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া ঐ ভূমিতে লাক্ষারস-সিক্ত বীজ বপন করা হয়, সেই লাঙ্গল এই ক্ষেত্রে নিমিত্তমাত্র। মাটির গুণই ঘটে অনুস্যূত হইয়া থাকে, কুম্ভকারের দণ্ড, চক্র প্রভৃতি ঘটের নিমিত্ত কারণেরগুণ ঘটে সঞ্চারিত হয় কি? পূর্ববর্তী বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হয়।

এইরূপ বিজ্ঞান বাসনার নিমিত্ত হইলেও বাসনার আশ্রয় নহে। পরবর্তী বিজ্ঞানে সেই বাসনা প্রভৃতির সঞ্চারও ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে ব্যাখ্যা করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী বিজ্ঞানকে পরবর্তী বিজ্ঞানের কারণ বলিয়াও গ্রহণ করা যায় না। কেননা, কারণ অন্ততঃ একক্ষণ স্থায়ী না হইলে তাহাকে কারণই বলা চলে না। কার্যের যাহা নিয়ত পূর্ববর্তী তাহাকেই কারণ বলে। বিজ্ঞান সম্পর্কে 'উৎপদ্য বিনশ্যতি', উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হইয়া যায়, এইরূপ সিদ্ধান্ত যাঁহারা মানিয়া চলেন, তাঁহাদের মতে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানের কোনরূপ স্থায়িত্ব নাই বলিয়া, তাহার কারণত্ব উপপাদনও যুক্তিসহ নহে।[১] ক্ষণিক বিজ্ঞান-সন্তানকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিলে, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর স্বীয় সিদ্ধান্ত অনুসারেই দেখা যাইবে যে, এক বিজ্ঞান অনুভব করে, অন্য বিজ্ঞানের সংস্কার জন্মে, অপর বিজ্ঞান তাহা স্মরণ করে। এক অহংসন্তানী আত্মা কর্ম করে, অপর অহংসন্তানী তাহার ফল ভোগ করে। ইহাতে কর্ম, কর্মফল-ভোগ প্রভৃতির যে কোনরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে না, তাহা বিজ্ঞানবাদী অস্বীকার করিতে পারেন না। বিজ্ঞান যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয়, জ্ঞেয় বিশ্বের তাবদ্ বস্তুই জীবনের নানাবিধ প্রাত্যহিক প্রয়োজন সাধন করে বলিয়া, তাহাও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সত্য-স্বাভাবিক বলিয়াই বোধহয়, স্বপ্ন প্রপঞ্চের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। "সোঽয়ং ঘটঃ" 'এই সেই ঘটটি' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাবহারিক জগতের আপেক্ষিক সত্যতা এবং স্থায়িত্বই সূচিত হয়। এই অবস্থায় সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার প্রভৃতি কোন বৌদ্ধ সিদ্ধান্তকেই নির্বিবাদে মানিয়া লইতে পারা যায় না। শূন্যবাদী মাধ্যমিকের মতানুসারে সমস্তই শূন্য হইলে, সেই শূন্যতার সাধক প্রমাণও সেক্ষেত্রে শূন্যই হইবে। ফলে, শূন্যতা কোনমতেই সিদ্ধ হইবে না। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন সংগ্রহে'

১। (ক) উত্তরোৎপাদে পূর্বনিরোধাৎ। ব্রহ্মসূত্র, ২।২।২০, ক্ষণভঙ্গবাদিনো-ঽয়মভ্যুপগমঃ উত্তরস্মিন্ ক্ষণে উৎপদ্যমানে পূর্বঃ ক্ষণো নিরুধ্যতে ইতি। নচৈবমভ্যুপগচ্ছতা পূর্বোত্তরয়োঃ ক্ষণয়োর্হেতুফলভাবঃ শক্যতে সম্পাদয়িতুম্। নিরুধ্যমানস্য নিরুদ্ধস্য বা পূর্বক্ষণস্য অভাবগ্রস্তত্বাদুত্তরক্ষণহেতুত্বানুপপত্তেঃ। ব্রহ্মসূত্র শং ভাষ্য, ২।২।২০,

(খ) তথাপি নোপপদ্যতে ক্ষণিকস্য কারণভাবঃ ইত্যাদি ভামতী দ্রষ্টব্য।

উদ্ধৃত 'বিবেকবিলাস' নামক বৌদ্ধগ্রন্থের [কেবলাং সংবিদং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ। এইরূপ] উক্তিমূলে শূন্যকে অদ্বৈতবেদান্তের ব্রহ্মের ন্যায় নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ, নিত্য স্বপ্রকাশ বলিয়া গ্রহণ করিলে, বৌদ্ধ শূন্যবাদ অদ্বৈত বেদান্তীর ব্রহ্মবাদের মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইবে।

'অহমাকার' আলয়বিজ্ঞানপ্রবাহ যে আত্মা হইতে পারে না, তাহা পরীক্ষা করা গেল। এখন ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত আত্মবাদও যে আত্মার প্রকৃতরূপের পরিচয় প্রদান করেনা, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত আত্মবাদ ও তাহার খণ্ডন

ন্যায়-বৈশেষিকের মতে আত্মা জ্ঞাতা, জ্ঞানস্বরূপ নহে। জ্ঞান আত্মার গুণ—আত্মগুণো জ্ঞানমিতি প্রকৃতম্—ন্যায়-দর্শন, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ৩।২।৩৯। আত্মার এই চৈতন্যগুণ আগন্তুক। আত্মার সহিত মনের, মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের, এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞেয় বিষয়ের ক্রমিকযোগ ঘটিলে, আত্মায় চৈতন্য গুণের উদ্ভব হয়। সুষুপ্তি প্রভৃতিতে জ্ঞানের কারণ মনঃসংযোগ প্রভৃতি থাকে না, সুতরাং সুষুপ্তিকালে আত্মার চেতনাও থাকে না। ইহা হইতে ন্যায় ও বৈশেষিক মতে আত্মা যে অচিদ্রূপ এবং জড়স্বভাব, এই সিদ্ধান্তই সূচিত হয়। প্রবীণ মীমাংসক আচার্য প্রভাকরও জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাকে অচিদ্রূপ এবং জড় বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন।[১] জয়ন্তভট্ট স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, চিদ্ বা চৈতন্যের সহিত যোগ ঘটিলেই আত্মা চেতন হইয়া থাকে। চিতের বা চৈতন্যের সহিত যোগ না থাকিলে আত্মা জড়ই বটে—

স চেতনশ্চিতাযোগাত্তদ্‌যোগেন বিনা জড়ঃ।

ন্যায়মঞ্জরী।

যাঁহারা জ্ঞান-যোগ বশতঃ আত্মাকে চেতন বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে যেই কালে আত্মাতে জ্ঞানের যোগ থাকে না, সেই কালে আত্মা যে জড় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আত্মা এইমতে জ্ঞানের আধার বা আশ্রয়। জ্ঞান তো জ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। জ্ঞানের আশ্রয় অবশ্যই জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু হইবে। জড় এবং চৈতন্য, এই দুইপ্রকার ব্যতীত

১। প্রভাকরতার্কিকৌ তু অজ্ঞানমেব আত্মেতি বদতঃ। বেদান্তসার।
এখানে অজ্ঞানশব্দের অর্থ জ্ঞানভিন্ন, জড়বস্তু।

তৃতীয় কোন মৌলিক তত্ত্ব নাই। এই অবস্থায় চৈতন্য যখন চৈতন্যের আশ্রয় হইতে পারিবে না, তখন চৈতন্যের আশ্রয় যে জড় বস্তুই হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? আত্মা জড় হইলেও, জ্ঞান যে জ্ঞাতা-আমি বা আত্মারই ধর্ম, ইন্দ্রিয়, মনঃ বা অর্থ প্রভৃতি অন্য কোনও জড়বস্তুর ধর্ম নহে, ইহা ন্যায়গুরু গৌতম স্পষ্টতই তাঁহার ন্যায়দর্শনে উল্লেখ করিয়াছেন।[১] 'আমি জানিতেছি' এইরূপে সকলেই জ্ঞানকে আত্মার ধর্ম বলিয়াই মনের দ্বারা বুঝিয়া থাকে। ফলে, মনোগ্রাহ্য জ্ঞান যে আত্মারই গুণ, দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কোন অস্থায়ী পদার্থের গুণ বা ধর্ম নহে, ইহাও সহজেই বুঝা যায়। "আমি বাল্যকালে যে পদার্থকে দেখিয়া সুখভোগ করিয়াছিলাম, বৃদ্ধকালে সেই আমিই সেই পদার্থ বা তজ্জাতীয় পদার্থ দেখিলে পূর্ব সংস্কারবশতঃ ঐ পদার্থকে সুখজনক বলিয়া স্মরণ করিয়া, গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং একই আত্মা দর্শন, সুখানুভব, স্মরণ এবং গ্রহণ করিবার ইচ্ছার কর্তা বা আশ্রয়। একই আত্মা বা আমিই যে সেই পদার্থের বাল্যকালের সেই প্রথম দর্শন হইতে বৃদ্ধকালের পুনর্দর্শন, স্মরণ এবং গ্রহণ করিবার ইচ্ছা পর্যন্ত ক্রিয়ার কর্তা বা আশ্রয়রূপে বিদ্যমান আছি, ইহা আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই বুঝিতেছি। কারণ, ঐরূপস্থলে "যে, আমি যেই জাতীয় সুখজনক পদার্থকে পূর্বে দেখিয়া এখন তাহাকে সুখজনক বলিয়া স্মরণ করিতেছি, সেই আমিই সেই জাতীয় পদার্থকে আজ দেখিতেছি এবং তাহাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিতেছি"—এইরূপ মানস প্রত্যক্ষ আমার জন্মিতেছে। ঐরূপ প্রত্যক্ষকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে এবং প্রতিসন্ধানও বলে। প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞা নামক প্রত্যক্ষজ্ঞানে পূর্বে প্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থের স্মৃতি আবশ্যক। একের অনুভূত বিষয় অন্যে স্মরণ করিতে পারে না। সুতরাং যে-আত্মা পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই আত্মাই দীর্ঘকাল পরে তাহা স্মরণ করিয়া ঐরূপ প্রতিসন্ধান করিতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। তাহা হইলে বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত স্থায়ী একই আত্মা প্রথম দর্শন, সুখভোগ এবং তাহার পুনর্দর্শন এবং স্মরণ ও গ্রহণের ইচ্ছা করে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য। দেহ প্রভৃতি কোন অল্পকালস্থায়ী পদার্থ আত্মা হইলে পূর্বোক্ত প্রকার

১। ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্। ন্যায়সূত্র, ১।১।১০ ও ভাষ্য দেখুন

দর্শন, স্মরণ এবং "প্রতিসন্ধান" প্রভৃতি হইতে পারে না। স্মরণ ব্যতীত যখন "প্রতিসন্ধান" অসম্ভব, তখন স্মরণের উপপত্তির জন্য দর্শন হইতে স্মরণকাল পর্যন্ত স্থায়ী একটি আত্মা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।" ফলে, বৌদ্ধক্ত ক্ষণিকবাদও অচল হইয়া পড়িবে। আলোচ্য স্মৃতি এবং প্রতিসন্ধানের উপপাদনের জন্যই জ্ঞান যে আত্মার স্বভাব বা ধর্ম তাহা মহামুনি গৌতম স্পষ্ট বাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন। স্মরণন্ত্বাত্মনো জ্ঞস্বাভাব্যাৎ। ন্যায়সূত্র, ৩।২।৪০, "জ্ঞ" ইহাই আত্মার স্বভাব বা স্বকীয় ধর্ম। জানিবে, জানিতেছে এবং জানিয়াছিল, এই ত্রিবিধ অর্থেই "জ্ঞ" এই পদটি সিদ্ধ হয়। সুতরাং "জ্ঞ" শব্দের দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমানকালীন জ্ঞানের আধার, এই অর্থই বুঝা যায়। আত্মাই জানিয়াছিল, আত্মাই জানিবে এবং আত্মাই জানিতেছে। আত্মার এই কালত্রয়বিষয়ক জ্ঞানসমূহ সমস্ত জীবই নিজের আত্মাতে অনুভব করে। সুতরাং ঐ ত্রিকালীন জ্ঞানের সহিতই আত্মার সম্বন্ধ স্বীকার্য। ইহাই আত্মার স্বভাব, উহাকেই বলে ত্রিকালব্যাপী জ্ঞানশক্তি"।[১] এই শক্তি বা স্বভাব কেবল আত্মারই আছে, ইন্দ্রিয়, অর্থ বা জ্ঞেয় প্রভৃতির নাই। আত্মা, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অর্থ প্রভৃতি সকলই জড় হইলেও, আত্মারই কেন জ্ঞানশক্তি পরিস্ফুট হইল? ইন্দ্রিয়, অর্থ প্রভৃতির স্বভাব কেন ঐরূপ হইল না? এই কথা উঠে না। কেননা, বস্তুর স্বভাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা চলে না।

আত্মার আগন্তুক চৈতন্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক বলেন যে, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ ইচ্ছা প্রভৃতি ধর্মের উৎপত্তি এবং বিলয় সকলেই অনুভব করেন। উৎপত্তি বিনাশশীল ঐ সকল ধর্মের সহিত নিত্য আত্মার অভেদ কোন মতেই সম্ভবপর হয় না। নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর অভেদ যুক্তিবিরুদ্ধ। সুষুপ্তি এবং মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় যে চৈতন্য থাকে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং চৈতন্য বা জ্ঞান যে আত্মার স্বরূপ নহে, আগন্তুক গুণ; এই সিদ্ধান্তই স্বীকার্য। ন্যায় ও বৈশেষিকের আলোচ্য যুক্তির কোন মূল্য দিতে সাংখ্য এবং অদ্বৈতবেদান্তী প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন যে, চৈতন্য যদি আত্মার স্বরূপ না হইয়া

১। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশকৃত [illegible] টিপ্পনী, ৩।২।৪০ সূত্র।

আগন্তুক অনিত্য গুণই হয়; তবে, বিভিন্ন সময়ে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান যে একই আত্মার ধর্ম, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? আত্মার একত্বের প্রতিসন্ধান না থাকায়, বৌদ্ধোক্ত ক্ষণিকবাদে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞার অনুপপত্তি প্রভৃতি যে সকল দোষের অবতারণা হইয়াছে, ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত আত্মবাদেও সেই সকল দোষেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। বৌদ্ধোক্ত ক্ষণিকবাদই সেক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইবে। ন্যায়োক্ত অনুব্যবসায় জ্ঞানের দ্বারা পূর্বজাত ব্যবসায়-জ্ঞান ও আত্মার সহিত ঐ জ্ঞানের সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত হইলেও, স্মরণাতীত কাল হইতে আত্মায় যত জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা যে একই আত্মার ধর্ম তাহা জানিবার কোন উপায় ন্যায় ও বৈশেষিকের সিদ্ধান্তে দেখা যায় না। আর এক কথা এই যে, আত্মাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইন্দ্রিয়, অর্থ প্রভৃতি অন্য কোথায়ও জ্ঞান উৎপন্ন হয় না কেন? তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর ন্যায়-বৈশেষিক দিতে পারেন নাই। বস্তুর স্বভাবই এইরূপ বলিলেও, প্রকৃত সমাধান কিছু হয় না। আত্মা স্বভাবতঃ অপ্রকাশ বা অচেতন হইলে, তাহার প্রকাশ নামক গুণ অর্থাৎ জ্ঞান কখনই জন্মিতে পারে না। অপ্রকাশ-বস্তুতে প্রকাশের উৎপত্তি হইতে কেহ কোনদিন দেখে নাই। ঘট প্রভৃতি পদার্থ স্বভাবতঃ অচেতন, কস্মিন্ কালেও ঘট প্রভৃতির চেতনার উৎপত্তি হয় নাই। অগ্নির অবয়বে প্রকাশগুণ আছে বলিয়াই, অগ্নিতে প্রকাশের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যে বস্তুর অবয়বে প্রকাশগুণ নাই সেই বস্তুতে প্রকাশগুণের উৎপত্তি হয় না। হইতে পারে না। আত্মার কোন অবয়ব নাই। নিরবয়ব আত্মা স্বতঃ অপ্রকাশ বা জড় বলিয়া তাহাতে আগন্তুক প্রকাশগুণের উৎপত্তি কোনমতেই সম্ভবপর বলা যায় না। জন্য-প্রকাশগুণ কার্য, আর অবয়বের প্রকাশগুণ ঐ কার্যের কারণ। আত্মার অবয়ব না থাকায়, কারণের অভাববশতঃ আত্মায় জন্য প্রকাশগুণের বা জ্ঞানের উৎপত্তিরও অভাব অবশ্যই ঘটিবে। ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ নিরবয়ব আত্মায় জন্য জ্ঞানের (প্রকাশগুণের) উৎপত্তি স্বীকার করেন বলিয়াই তাঁহাদের মত গ্রহণযোগ্য নহে। জ্ঞানকে আত্মার গুণ বলিয়া স্বীকার করিলে, নিত্য নিরবয়ব আত্মার প্রকাশ নামক গুণ বা জ্ঞানকেও অগত্যা নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এই অবস্থায় নিত্যগুণময় আত্মা এবং নিত্যগুণ এই উভয়ের নিত্যতা না মানিয়া লাঘববশতঃ নিত্যজ্ঞানকে

আত্মা বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা যদি নিত্য জ্ঞানস্বরূপই হয়, তবে জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ কিরূপে সম্ভবপর হয় ? ইহার উত্তরে সাংখ্য দার্শনিক বলেন যে, উৎপন্ন অনিত্য জ্ঞান আত্মার ধর্ম নহে, তাহা অন্তঃকরণ বা বুদ্ধিনামক জড় বস্তুরই ধর্ম। জড় অন্তঃকরণের ধর্মও যে জড়ই হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? বুদ্ধি এবং তাহার জ্ঞানরূপ ধর্ম, যাহা সাংখ্য-দর্শনের পরিভাষায় বৃত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা অতিশয় স্বচ্ছ। স্বচ্ছতাবশতঃ জলে সূর্যের প্রতিবিম্বের ন্যায় বুদ্ধির সমীপে অবস্থিত চিদাত্মার প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ বুদ্ধিবৃত্তিতে পতিত হয় এবং চিদালোকে আলোকিত হইয়া জড় বুদ্ধিবৃত্তিও চৈতন্যোজ্জ্বল হইয়া উদ্‌ভাসিত হইয়া থাকে এবং জ্ঞান আখ্যা লাভ করে। ইহাকেই বলে অনিত্য বা জন্যজ্ঞান। এই বৃত্তি বা জন্যজ্ঞান বস্তুতঃ আত্মার ধর্ম না হইলেও, আত্মা এবং অন্তঃকরণের মধ্যে বিম্ব এবং প্রতিবিম্বরূপ সম্বন্ধ ঘটায়, আত্মা ও বুদ্ধির ভেদের উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধির ধর্ম, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার ধর্ম বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এই মতে অনিত্য জড় বুদ্ধি এবং নিত্য চৈতন্যের স্বভাবসিদ্ধ ভেদ থাকায়, আত্মার নিত্যত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না। জন্য-জ্ঞানের ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবেদান্তীও উল্লিখিত সাংখ্যের পথেরই অনুসরণ করিয়াছেন। জড়াত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিও চিৎপ্রতিবিম্ববশতঃ প্রকাশোজ্জ্বল হইয়া জ্ঞেয় বিষয় প্রকাশ করতঃ জ্ঞানের মর্যাদা লাভ করে। বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান জড় বলিয়াই পরপ্রকাশ্য। বৃত্তির ভাসক স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মাই সেই 'পর' বটে। বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশয়িতা আত্মা নিত্য বোধস্বরূপ।

আত্মা নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ

ন্যায়-বৈশেষিক মতে নিত্য আত্মার সহিত অনিত্য আগন্তুক জ্ঞানের ভেদ, অভেদ, ভেদাভেদ প্রভৃতি কোনরূপ সম্বন্ধই কল্পনা করা যায় না। বিভেদের ক্ষেত্রে তো সম্বন্ধের কল্পনাই চলে না। রামের জ্ঞান শ্যামের নহে বলিয়া, শ্যামের সহিত রামের জ্ঞানের ভেদ আছে এবং তাহাদের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধও নাই। রামের আত্মার সহিত রামের জ্ঞানেরও যদি শ্যামের জ্ঞানের ন্যায়ই ভেদ স্বীকার করা যায়, তবে সেক্ষেত্রেও রামের আত্মার সহিত রামের জ্ঞানের কোনরূপ সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। পক্ষান্তরে রামের আত্মাও ঐ আত্মায়

সমবায় সম্বন্ধ খণ্ডন

উৎপন্ন জ্ঞান যদি অভিন্ন হয় তবে, নিত্য আত্মার সহিত অনিত্য জ্ঞানের অভেদ স্বীকার করায়, আত্মার নিত্যত্বের ব্যাঘাত ঘটিবে। নিত্য ও অনিত্যের অভেদ সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ। ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরোধী বিধায় ঐরূপ সম্বন্ধ কল্পনাকরাই চলে না। নিত্য আত্মা এবং অনিত্য জ্ঞানের মধ্যে "সমবায়" নামে একপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ন্যায় ও বৈশেষিকের যে প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কতদূর সঙ্গত বিচার করিয়া দেখা যাউক। ন্যায়-বৈশিষেকের সিদ্ধান্তে গুণ ও গুণী প্রভৃতির সম্বন্ধকে সমবায় এবং দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধকে সংযোগ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, গুণ ও গুণী পরস্পর ভিন্ন বলিয়া, তাহাদের মধ্যে যদি "সমবায়" সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, তবে সমবায় এবং সমবায়ীও (সমবায় সম্বন্ধের যাহা আশ্রয়) গুণ ও গুণীর ন্যায় পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া, সমবায়েরও আবার সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, এবং এইরূপে অনবস্থা দোষই আসিয়া দাঁড়ায়—সমবায়াভ্যুপ-গমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ, ব্রহ্মসূত্র, ২।২।১৩। সমবায় নিজে সম্বন্ধস্বরূপ বলিয়া স্বতঃই সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধ ঘটে, এইজন্য সমবায়ের আর সমবায় কল্পনা অনাবশ্যক, এই যুক্তিরও কোন মূল্য দেওয়া যায় না। কেননা, সমবায়ের ন্যায় সংযোগও নিজে সম্বন্ধস্বরূপ বলিয়া তাহারই বা সংযোগীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সমবায় সম্বন্ধ কল্পনার প্রয়োজন কি? যদি বল যে, সংযোগ গুণ পদার্থ সুতরাং সংযোগ তাহার আশ্রয়ের সহিত সমবায় সম্বন্ধেই সম্বন্ধ বটে, সমবায় গুণ পদার্থ নহে, সুতরাং তাহার সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য অন্য কোন সম্বন্ধের অপেক্ষা নাই, ন্যায়-বৈশেষিকের এইরূপ উত্তরেরও কোন মূল্য নাই। কারণ, সংযোগ গুণপদার্থ, সমবায় গুণপদার্থ নহে, ইহা ন্যায়-বৈশেষিকেরই পরিভাষা। প্রতিবাদী সাংখ্য-বেদান্তী প্রভৃতি কেহই ঐ ন্যায়োক্ত পরিভাষার পক্ষপাতী নহেন। ঐরূপ পরিভাষার কোন মূলও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় কেবল নিজের স্বীকৃত পরিভাষার উপর দাঁড়াইয়া কোনও সিদ্ধান্ত করিতে গেলে, প্রতিবাদী দার্শনিকগণ তাহা গ্রহণ করিবেন কেন? দ্বিতীয়তঃ সংযোগ এবং সমবায়, এই উভয় প্রকার সম্বন্ধই ঐ সকল সম্বন্ধের যাহা আশ্রয় তাহা হইতে ভিন্ন বটে। সম্বন্ধের এই ভিন্নত্বরূপ কারণ উভয় ক্ষেত্রেই তুল্যবিধায়, সংযোগের

ন্যায় সমবায়েরও সমবায়ান্তর স্বীকার করিতে হয় নাকি? ফলে, ন্যায়-বৈশেষিক মতে সমবায়কল্পনায় অনবস্থাদোষই আসিয়া পড়ে।[১] ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত সমবায়ের কল্পনার অনুকূলে যখন দৃঢ় কোন যুক্তি দেখা যাইতেছে না, তখন আত্মা জ্ঞানের সমবায়ি কারণ, আত্ম-মনঃসংযোগ প্রভৃতির ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া আত্মায় সমবেত হইয়া থাকে; আত্মা নিত্যচৈতন্যস্বরূপ নহে, চেতন; আত্ম-সম্পর্কে এইরূপ ন্যায়-বৈশেষিকের সিদ্ধান্তও ভিত্তিহীন হইয়া দাঁড়াইবে।

মীমাংসকাচার্য কুমারিল ভট্ট ও জৈন পণ্ডিতগণের মতে আত্মা চিজ্জড়স্বভাব

ন্যায়-বৈশেষিক এবং প্রভাকরোক্ত জড় আত্মবাদ বা অজ্ঞানাত্মবাদের পরীক্ষা করা গেল। এখন আত্মাকে যাঁহারা "চিদচিদ্রূপ" বা চিজ্জড়স্বভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, তাঁহাদের মতের আলোচনা করা যাইতেছে। কুমারিল ভট্ট বলেন, সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞানের একেবারে অভাব হয় না। সুষুপ্তি ভাঙিয়া গেলে, "জড়োভূত্বা অস্বাপ্‌সম্" জড়ের মত হইয়া ঘুমাইয়াছিলাম, এইরূপে সুষুপ্তিকালীন জড়তা মানুষের স্মৃতিতে ভাসিতে থাকে। অনুভূতবিষয়েরই স্মৃতি হইয়া থাকে। যে-বিষয় যেই ব্যক্তি অনুভব করে না, সেই বিষয়ে তাঁহার কখনও স্মৃতি হইতে দেখা যায় না। সুতরাং আলোচ্য জড়তার স্মৃতি হইতে সুষুপ্তি সময়ে জড়তার যে অনুভব হইয়াছিল, ইহাই স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। সুষুপ্তিকালেও অনুভূতি ছিল বলিয়া, আত্মা চিদ্রূপ; জড়তার অনুভব হইয়াছিল সুতরাং জড়তাও তখন ছিল। এই জড়তা আত্মিক জড়তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে—(আত্মা ভিন্ন অন্য কোন বিষয় তখন ছিলনা সুতরাং বিষয়ান্তরগত

১। সমবায়োঽপি সমবায়িভ্যোঽত্যন্তভিন্নঃ সন্ সমবায়লক্ষণেন অন্যেনৈব সংবন্ধেন সমবায়িভিঃ সংবধ্যেত; অত্যন্ত ভেদসাম্যাৎ। ততশ্চ তস্য তস্য অন্যোঽন্যঃ সংবন্ধঃ কল্পয়িতব্য ইত্যনবস্থৈব প্রসজ্যেত। ননু ইহ প্রত্যয়গ্রাহ্যঃ সমবায়ো নিত্যসংবদ্ধ এব সমবায়িভি র্গৃহ্যতে নাসংবদ্ধঃ সংবন্ধান্তরাপেক্ষো বা। ততশ্চ ন তস্য অন্যঃ সংবন্ধঃ কল্পয়িতব্যো যেনানবস্থা প্রসজ্যেতেতি। নেত্যুচ্যতে সংযোগোঽপ্যেবং সতি সংযোগিভির্নিত্যসংবদ্ধ এবেতি সমবায়বন্নান্যং সংবন্ধমপেক্ষেত।··· ··· ···
ন চ গুণত্বাৎ সংযোগঃ সংবন্ধান্তরমপেক্ষতে ন সমবায়োঽগুণত্বাদিতি যুজ্যতে বক্তুম্; অপেক্ষা কারণস্য তুল্যত্বাৎ। গুণপরিভাষায়াশ্চাতন্ত্রত্বাৎ। তস্মাদর্থান্তরং সংযোগমভ্যুপগচ্ছতঃ প্রসজ্যেতৈবানবস্থা। ব্রহ্মসূত্র, শংভাষ্য, ২।২।১৩,

জড়তার অনুভব হইবার সম্ভাবনা কোথায়?) এইজন্য আত্মা কেবল চিদ্রূপ নহে, অচিদ্রূপও বটে। আত্মা খদ্যোতের ন্যায় "চিদচিদ্রূপ"। খদ্যোত যেমন একাংশে প্রকাশরূপ অপর অংশে অপ্রকাশরূপ বলিয়া "প্রকাশাপ্রকাশস্বভাব", আত্মাতেও সেইরূপ জড়তা এবং অনুভব, এই উভয়ের সমাবেশ আছে বলিয়া, আত্মাকে চিদচিদ্রূপই মানিতে হয়। "কুমারিল ও জৈনাচার্যগণ আত্মা চৈতন্যস্বরূপ ইহা মানিয়াও, জ্ঞানাদিরূপে আত্মার পরিণাম স্বীকার করিয়া থাকেন। এইজন্য ভট্ট এবং জৈনগণের সম্মত আত্মাকে খদ্যোতবৎ 'চিজ্জড়স্বভাব' বলিয়া প্রতিবাদী দার্শনিকগণ অভিহিত করিয়াছেন। আত্মার পরিণাম স্বীকার করিলে, তাহাকে জড়স্বভাবই বলিতে হয়। কারণ, জড়েরই পরিণাম দৃষ্ট হয়। চৈতন্যস্বরূপ আত্মারও যখন পরিণাম হয়, তখন জৈন এবং কুমারিলের মতে আত্মা জড় ও চৈতন্যের সমষ্টিই হইয়া দাঁড়ায়। কুমারিল ভট্টের মতে আত্মা চৈতন্যস্বভাব এবং প্রত্যক্ষগম্য হইলেও, তাহার ধর্ম-জ্ঞান অতীন্দ্রিয়, অপ্রত্যক্ষ এবং অনুমানগম্য। অথচ এই জ্ঞান আত্মার সহিত ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। জৈনাচার্য অকলঙ্কদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আত্মা জ্ঞাতা ও দর্শনকর্তা হিসাবে চেতন, আর, প্রমেয়বিধায় উহা অচেতন—

"প্রমেয়ত্বাদিভির্ধর্মৈরচিদাত্মা চিদাত্মকঃ।
জ্ঞান-দর্শনতস্তস্মাচ্চেতনাচেতনাত্মকঃ ॥"[১]

কুমারিল ভট্টের মতের সহিত জৈন মতের প্রভেদ এই যে, কুমারিলের মতে জ্ঞান অতীন্দ্রিয় এবং অনুমানগম্য। আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃ, স্বপ্রকাশ। জৈনমতে জ্ঞান স্ব-পর-প্রকাশ। জ্ঞানের সহিত আত্মার ভেদাভেদ সম্পর্ক উভয় মতই তুল্য বটে।

আত্ম সম্পর্কে ভট্টমত ও জৈনমতের প্রভেদ

উল্লিখিত কুমারিল এবং জৈনমতের খণ্ডনে সাংখ্য-বেদান্ত বলেন যে, চিৎ ও অচিৎ, এই দুইটি পদার্থ আলোক এবং অন্ধকারের মত পরস্পর বিরুদ্ধ। এইরূপ বিরুদ্ধ দুইটি বস্তুর একই সময়ে একত্র সমাবেশ কোনমতেই সম্ভবপর হয় না। এইজন্যই আত্মাকে "চিদচিদ্রূপ" বলা চলে না। খদ্যোতের যে প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। কেননা, খদ্যোত

কুমারিল ও জৈনোক্ত আত্মবাদের খণ্ডন

১। বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় সং, আত্মা শব্দ দ্রষ্টব্য।

সাবয়ব পদার্থ। সুতরাং তাহার কোনও অবয়বে চিদ্‌রূপের, কোন অংশে অচিদ্রূপের সমাবেশ অসম্ভব নহে। আত্মার কোন অবয়ব বা অংশ নাই। এই অবস্থায় খদ্যোতের ন্যায় অংশভেদে আত্মায় চিদচিদ্রূপের সমাবেশের কল্পনা চলে না। নিরবয়ব আত্মাকে হয় চিদ্রূপ, নতুবা অচিদ্রূপই বলিতে হয়। আত্মাকে যে অচিদ্রূপ জড়স্বভাব বলা যায় না, তাহা আমরা ন্যায় ও বৈশেষিকের মতের পরীক্ষায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। অতএব আত্মাকে "চিদ্রূপ" বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সুষুপ্তিতে আত্মায় জড়তার অনুভব হয় বটে, কিন্তু ঐ জড়তা আত্মার নহে, উহা গুণময়ী জড় বুদ্ধির ধর্ম। বুদ্ধির ধর্ম জাড্যই "জড়োভূত্বা অস্বাপ্‌সম্" এইরূপে সুষুপ্তি ভাঙিয়া গেলে মানুষ অনুভব করিয়া থাকে।

এই আত্মা বিভু; শরীর পরিমাণ বা অণু নহে।

এই আত্মাকে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, অদ্বৈত বেদান্ত, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনে আকাশের ন্যায় ভূমা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। জৈন তার্কিকগণ আত্মার বিভুত্ব সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন নাই। আত্মাকে শরীর পরিমাণ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জৈন পণ্ডিতগণের মতে আত্মা দেহপরিমাণ চৈতন্যস্বরূপ, পরিণামী, কর্তা, ভোক্তা এবং প্রতিক্ষেত্রে বিভিন্ন। এই আত্মাই জীবের অদৃষ্টের আধার।[১] শরীরের পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই। ছোট, বড়, মধ্যমাকার নানারূপ শরীর দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মা শরীর পরিমাণ হইলে, তাহা অস্থির, অপূর্ণ এবং পরিচ্ছিন্ন ঘট প্রভৃতি বস্তুর ন্যায় যে অনিত্য হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? "আত্মা অনিত্যঃ পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, মধ্যমপরিমাণত্বাৎ ঘটাদিবৎ," এইরূপ অনুমান নিঃসংশয়ে আত্মার অনিত্যতা সাধন করিবে। আত্মা অনিত্য হইলে বন্ধ মোক্ষাদি ব্যবস্থার কোনই মূল্য থাকে না। এইজন্য আত্মাকে কোন মতেই শরীর পরিমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।[২] ইহা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মার পরিমাণ বিচার প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি।

১। চৈতন্যস্বরূপঃ পরিণামী কর্তা সাক্ষাদ্ ভোক্তা স্বদেহপরিমাণঃ প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নঃ পৌদ্‌গলিকাদৃষ্টবাংশ্চায়ম্।

প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার সূত্র দ্রষ্টব্য।

২। বিস্তৃত আলোচনার জন্য ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ৩৪, ৩৫, ৩৬ সূত্রের ভাষ্য, ভামতী দেখুন।

আত্মা যদি শরীরপরিমাণ বা মধ্যমপরিমাণ না হয়, তবে আত্মা হয় অণু হইবে, নতুবা বিভু হইবে। জীবাণুত্ববাদ পাশুপত, পঞ্চরাত্র মতের এবং পঞ্চরাত্র মতানুবর্তী রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক বল্লভাচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণব-বেদান্তিগণের অনুমোদিত হইলেও, [উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্। ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৯, ২।৩।২৮ এই সকল] ব্রহ্মসূত্রে এই মত পূর্বপক্ষ হিসাবে আলোচনা করিয়া, "তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্‌ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ", ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৯ ; এইসূত্রে আত্মার বিভুত্ব সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করা হইয়াছে। জীবাত্মার অণুত্ববাদের অনুকূলে "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ" প্রভৃতি শ্রুতি উদ্ধৃত হইলেও, জীবের অণুত্বসিদ্ধান্ত যে স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক ইহা অবশ্য স্বীকার্য। স্বভাবতঃ অণুজীবের সহিত বিভু পরব্রহ্মের অভেদের উপদেশ করায়, জীবও যে বস্তুতঃ অণু নহে, বিভু, এই সিদ্ধান্তই ব্রহ্মসূত্রে শঙ্করের অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

"পরমেব চেদ্ ব্রহ্ম জীবস্তস্মাদ্ যাবৎ পরং ব্রহ্ম তাবানেব জীবো ভবিতুমর্হতি। পরস্য চ ব্রহ্মণো বিভুত্বমাম্নাতম্। তস্মাদ্ বিভুর্জীবঃ।" ব্রঃ সূঃ শংভাষ্য, ২।৩।২৯।

উল্লিখিত উক্তিদ্বারা আচার্য শঙ্কর আত্মার বিভুত্ব সিদ্ধান্তই বিরুদ্ধ যুক্তিজালের খণ্ডন পূর্বক স্পষ্টবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন। আত্মার পরিমাণের প্রশ্নে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সুধী পাঠক সেই আলোচনা দেখিবেন।

আত্মা চিদ্রূপ এবং বিভু ইহা সাব্যস্ত হইল। এখন সেই আত্মা এক, না অনেক (নানা), তাহার বিচার করা যাইতেছে। আত্মার নানাত্ব উপপাদন করিতে গিয়া ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার সাংখ্যকারিকায় বলিয়াছেন যে, একজনের জন্মে সকলের জন্ম হয় না, একব্যক্তি মরিলে সকলেই মরে না, একজনে দেখিলে বা শুনিলে সকলের দেখা বা শুনা হয় না, একজন কর্মে প্রবৃত্ত বা অপ্রবৃত্ত হইলে সকলের কর্মে প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। প্রত্যেক ব্যক্তিভেদে সত্ত্ব, রজঃ, এবং তমঃ এই তিনগুণের ভিন্ন ভিন্ন কার্য দৃষ্ট হয়। কোন ব্যক্তি সত্ত্বপ্রধান এবং সত্য ও ধর্মপরায়ণ, কেহ রজঃ-প্রধান সর্বদা কর্মতৎপর। কেহ বা তমোবহুল জড়, অলস প্রকৃতির।

আত্মা এক না অনেক

ইহা হইতে পুরুষ বা আত্মা যে এক নহে, বহু তাহাই প্রমাণিত হয়।[১] যদি সর্বশরীরে একই পুরুষ বা আত্মা হইত, তবে একের জন্মে সকলের জন্ম, একের মৃত্যুতে সকলেরই মৃত্যু ঘটিত। একজনের ইন্দ্রিয় বিকৃত হইলে, সকলেরই সেই ইন্দ্রিয়-বিকার উপস্থিত হইত। তাহা তো হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তীর এক আত্মবাদকে নির্বিবাদে গ্রহণ করা যায় না। ব্যক্তিভেদে আত্মার ভেদই স্বীকার করিতে হয়। সাংখ্যোক্ত এই বহু আত্মবাদ ন্যায়, বৈশেষিক, বৈষ্ণব-বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনেও স্বীকৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ কোনরূপ স্থায়ী আত্মা স্বীকার না করিলেও, প্রতি শরীরে আলয়-বিজ্ঞান সন্তানের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। ইহা আমরা বিজ্ঞানবাদের আলোচনায় দেখিয়াছি। সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে আত্মাকে বিভু বা ভূমা বলা হইয়াছে। বিভু বা ভূমা আত্মার সহিত সকল দেহ এবং অন্তঃকরণেরই যে যোগ আছে, তাহা সুধী দার্শনিক অস্বীকার করিতে পারেন না। রামের বিভু আত্মার সহিত রামের দেহ ও অন্তঃকরণের যেমন যোগ আছে, শ্যামের দেহ এবং মনের সহিতও সেইরূপ যোগ আছে। এই অবস্থায় রামের জ্ঞান, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি রামের আত্মায়ই হইবে, শ্যামের আত্মায় তাহা হইবে না কেন? ইহার কারণ কি? সাংখ্য-সিদ্ধান্তে জড় বুদ্ধির বৃত্তিকেই জন্যজ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সদাভাস্বর আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ার ফলে জড় বুদ্ধি চৈতন্যোজ্জ্বল হইয়া প্রতিভাত হয়। এইরূপ বুদ্ধির বৃত্তিকেই জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। উল্লিখিত সাংখ্য-প্রক্রিয়া অনুসারে আত্মার কূটস্থতার অবশ্য হানি হয় না। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় এই, নিখিল বুদ্ধির সহিতই বিভু, চিন্ময় আত্মার যোগ থাকায়, রামের বুদ্ধিতেই আত্মার প্রতিবিম্ব পড়িল কেন? শ্যামের বুদ্ধিতে তাহা পড়িল না কেন? এইরূপ আপত্তির উত্তরে সাংখ্যাচার্যগণ বলেন যে, আত্মা বহু হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণ বা বুদ্ধির সহিত বিভিন্ন বিভু আত্মার এক প্রকার বিলক্ষণ বা বিজাতীয় সংযোগ জন্মে। যেই আত্মার সহিত যেই দেহ ও মনের বিজাতীয় সংযোগ ঘটিবে, সেই মনোমুকুরেই সেই আত্মার প্রতিবিম্ব পড়িবে,

১। জন্মমরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগবৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াচ্চ॥
সাংখ্যকারিকা, ১৮,

এবং তাহার ফলে সেই অন্তঃকরণেরই বৃত্তি বা জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। অন্য অন্তঃকরণের সহিত সাধারণ যোগ থাকিলেও, অন্য অন্তঃকরণে আত্মপ্রতিবিম্ব পড়িবে না, সুতরাং অন্য অন্তঃকরণে জ্ঞানোদয়ও হইবে না। রামের দেহ এবং অন্তঃকরণের সহিত রামের আত্মার বিলক্ষণ সংযোগ আছে, শ্যামের দেহ ও অন্তঃকরণের সহিত রামের বিভু আত্মার যোগ আছে বটে, তবে বিলক্ষণ বা বিজাতীয় সংযোগ নাই। শ্যামের আত্মার সহিতই শ্যামের মনের বিজাতীয় সংযোগ আছে। এইজন্যই রামের জ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি শ্যামের হয় না, শ্যামের জ্ঞান প্রভৃতিও রামের জন্মে না। আত্মার সহিত অন্তঃকরণের সংযোগের এই বৈজাত্য কিরূপ? কি প্রকারেই বা ইহা সংঘটিত হয়; কোন্ ক্ষেত্রে ইহা হয়, কোন্ ক্ষেত্রে হয় না; এই সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর সাংখ্যাচার্যগণের মুখে শুনা যায় না। ন্যায়-বৈশেষিকের সিদ্ধান্তেও যেই আত্ম-মনঃসংযোগ প্রভৃতির ফলে যেই ব্যক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই আত্ম-মনঃসংযোগেরও বৈজাত্য বা বিলক্ষণতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা রামের জ্ঞান শ্যামের হয় না কেন? এ প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক মীমাংসা আত্মবহুত্ববাদী ন্যায়-বৈশেষিকও করিতে পারিবেন না। তারপর, "একের জন্মে অন্যের জন্ম ও একের মরণে অন্যের মরণ হয় না", এই যুক্তিতে আত্মার বহুত্ব কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। কারণ, জন্ম শব্দের অর্থ জীব-দেহের সহিত আত্মা ও অন্তঃকরণের বিশেষ সম্বন্ধ এবং মৃত্যু অর্থে এই সম্বন্ধের বিয়োগমাত্রই বুঝা যায়। ইহা আত্মবহুত্ববাদীও স্বীকার করেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কোনও বিশেষ দেহের সহিতই আত্মার জন্ম-সম্বন্ধ উৎপন্ন হয় এবং কালে তাহা বিনষ্ট হয়; অন্য দেহের সহিত এরূপ হয় না, যদিও আত্মা সমস্ত দেহের সহিতই সংশ্লিষ্ট—এইরূপ কল্পনা করিবার হেতু কি? প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, আত্মা অনেক, এবং প্রাণি-দেহের সহিত জীবের আত্মার এক প্রকার বিশেষ সম্বন্ধই জন্ম এবং এই সম্বন্ধের বিনাশই মৃত্যু। এই সম্বন্ধ একপ্রকার বিজাতীয় সংযোগ। অন্য দেহের সহিত এই বিজাতীয় সংযোগ ঘটে না, যেহেতু তাহা (ঐ বিজাতীয় সংযোগ) স্বীকার করিলে, একের জন্ম ও মৃত্যুতে অন্যের জন্ম ও মৃত্যু অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এই যুক্তির মূলেও 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষই বিরাজ করে। আর, জন্ম ও মৃত্যু আত্মার ধর্ম নহে, এসিদ্ধান্ত কেবল

সাংখ্যাচার্যগণই স্বীকার করেন তাহা নহে, নৈয়ায়িক প্রভৃতিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। দেহের উৎপত্তি ও বিনাশেই জীবের উৎপত্তি ও মৃত্যু যদি তাঁহারা (সাংখ্যকার) স্বীকার করেন, তবে জীব অনিত্য ও মর্ত্য হইয়া পড়িবে এবং তাহা হইবে অপসিদ্ধান্ত।[১] এইরূপ প্রবৃত্তির প্রতিনিয়মও (অর্থাৎ এক জনের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হইলে অন্যের সেই প্রবৃত্তির অভাবও) আত্মার বহুত্ববাদের সাধক হইবে না। কারণ, প্রবৃত্তি আত্মার ধর্মই হউক কিংবা অন্তঃকরণের ধর্মই হউক—তাহা যখন দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, দৃশ্যবিষয় ও আত্মার সম্বন্ধ ঘটিলে তবেই জন্মে, তখন কোন বিশেষ দেহেরই বা তাহা (প্রবৃত্তি) হয় কেন? সমস্ত দেহ এবং অন্তঃকরণেরই বা প্রবৃত্তির উদয় হয় না কেন? ইহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোনও বিশেষ দেহ অন্তঃকরণ প্রভৃতির সহিত আত্মার বিজাতীয় সংযোগ স্বীকার করিয়া উল্লিখিত আপত্তি পরিহারের প্রচেষ্টা ছলমাত্রেই পর্যবসিত হইবে। তারপর, সাত্ত্বিকাদি ভেদে আত্মার ভেদ উপপাদন করাও বিড়ম্বনা মাত্র। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে জ্ঞান ও সুখাদির উৎকর্ষ, রজোগুণের উৎকর্ষে দুঃখ ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ এবং তমোগুণের উৎকর্ষে বিষাদ, অজ্ঞতা ও নিশ্চেষ্টতার প্রাবল্য ঘটে—ইহা মানিতে কোন বাধা হয় না বটে। কিন্তু ইহাদের (সাংখ্যোক্ত গুণরাজির) আত্মবহুত্বসাধনে উপযোগিতা কোথায়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই সমস্ত গুণ বা ধর্মই উৎপত্তি ও বিনাশশীল, সুতরাং তাহা নিত্য আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইবে কিরূপে? নিত্য ও অনিত্যের সম্বন্ধ সাংখ্যাচার্যগণও স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকগণ ঐরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণের অযোগ্য। আত্মার সহিত দেহ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-সংযোগ প্রভৃতির ফলেই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সংযোগ সর্বদেহেই সাধারণ বলিয়া সংযোগকে ক্ষেত্রবিশেষে "বিজাতীয়" আখ্যা দিয়া, আত্মবহুত্ববাদে ব্যাবহারিক জীবন চালু রাখার যে চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই "বিজাতীয়" বস্তুটির স্বরূপ কি? তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত উপপাদন ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি কোন দর্শনেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় আত্মবহুত্ববাদের সিদ্ধান্তকে নির্দোষ বলিয়া কিরূপে মানিয়া লওয়া যায়?

অদ্বৈতবেদান্তী আত্মার একত্ববাদই সমর্থন করেন। "সদেব

১। বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় সং, আত্মা শব্দ দ্রষ্টব্য।

সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।” “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি” এইরূপ অসংখ্য শ্রুতিবলে দ্বিতীয় আত্মার নাস্তিত্বই স্পষ্টতঃ ঘোষিত হয়। এক সদ্‌বস্তুই বিদ্যমান; নিখিল বিশ্বই এক আত্মার সত্তায় সত্তাবান্; এক আত্মসূত্রেই গ্রথিত। দ্বিতীয় বস্তু মায়াপ্রভাবে প্রতীতি গোচর হয়মাত্র, তাহার বাস্তব সত্তা কিছুই নাই। জীব ও জগৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই মায়িক বিভাব। জীব অখণ্ড ব্রহ্মের সখণ্ড অভিব্যক্তি। জীব ঘটাকাশ, ব্রহ্ম মহাকাশ। এক লক্ষ ঘট এক জায়গায় থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ ঘটাকাশের সৃষ্টি হয় এবং কোনও একটি ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে সেই ঘটাকাশই মহাকাশে বিলীন হয়, অপরাপর ঘটাকাশ যেমন তেমনই বিরাজ করে। এক্ষেত্রে ঘট যেমন আকাশের উপাধি (Limitation) জীবের অন্তঃকরণও সেইরূপ এক অদ্বিতীয় ভূমা ব্রহ্মের উপাধিই বটে। অন্তঃকরণরূপ উপাধি প্রত্যেক জীবের ভিন্ন ভিন্ন। এই উপাধিভেদেই জীবের ভেদ সিদ্ধ হয়। এক ঘটাকাশ ধূলিধূসরিত হইলে, সকল ঘটাকাশই যেমন ধূলিমলিন হয় না। সেইরূপ এক জীবে (অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে) সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, কর্মপ্রবৃত্তি, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির উদয় হইলে, অপর জীবে তাহা সঞ্চারিত হইতে পারে না। জীব কেবল আত্মা নহে, কেবল দেহ বা অন্তঃকরণও নহে। আত্মা, দেহ ও অন্তঃকরণ, ইহাদের পরস্পর অধ্যাসের ফলে জীবত্বের সৃষ্টি হয়। দেহ, অন্তঃকরণ প্রভৃতির বিবিধ ধর্ম আত্মায় (আত্মচৈতন্যে), দেহ এবং অন্তঃকরণ প্রভৃতিতে আরোপিত হইয়া প্রতিভাত হয়। জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধি প্রভৃতি অজর, অমর, আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম হইতে পারে না। জন্ম, মরণ প্রভৃতি অধ্যাসপুষ্ট জীবের ধর্ম। এই ধর্ম সুতরাং পারমার্থিক নহে, ব্যাবহারিকমাত্র। অনাদি-অবিদ্যা এবং নিত্য অদ্বিতীয় আত্মার সম্বন্ধবশতঃ আত্মায় অনাদি জীব ও ঈশ্বর প্রভৃতি বিভাবের বিকাশ হয়। মায়ায় মানুষ সাজিয়া সংসারে রঙ্গশালায় জীব যে জন্ম, মৃত্যু, শোক, দুঃখের বিবিধ বিচিত্র অভিনয় করে, তাহা একান্ত সত্য না হইলেও, সংসার জীবনে তাহার অসত্যতা ধরা পড়ে না। জীব ও জগতের ভেদ সত্য স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। জন্ম, মরণ প্রভৃতির প্রতিনিয়মবশে আত্মবহুত্ববাদী ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি বহু আত্মসিদ্ধির যে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা

অবিদ্যাকল্পিত জীব বহুত্বেরই সিদ্ধি করে, পরমাত্মার ভেদ সাধন করে না। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্", "তৎ সত্যম্ স আত্মা তত্ত্বমসি", "আত্মৈবেদং সর্বম্" ইহাই বেদ ও উপনিষদের বাণী। ইহাই ঋষির সাধনলব্ধ সত্য। এই সত্যের উপলব্ধি করা, ঐ বাণীকে জীবনে বরণ করাই জীবের চরম ঋদ্ধি বা যথার্থ আত্মদর্শন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম

আত্মা অদ্বৈতবেদান্তের মতে নির্গুণ ও নির্বিশেষ তত্ত্ব। নির্বিশেষ ব্রহ্মের ঈশ্বর, জীব ও জগৎ প্রভৃতি বিভাব অবিদ্যাকল্পিত এবং মিথ্যা। জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মই বটে। জীব ও পরমশিবের কোনই ভেদ নাই। 'তত্ত্বমসি,' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বৈদিক মহাবাক্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদই স্পষ্টতঃ সূচনা করে। ব্রহ্মের তিরস্করণী মায়া সহস্র আবরণ রচনা করিয়া, জীবের ব্রহ্মরূপকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেও, সদ্‌গুরুর প্রসাদে জ্ঞান, বৈরাগ্য পরিপক্ব হইলে, জীবের বিজ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া উঠে। জীব নিজের ব্রহ্মভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্' এই শিবরূপে স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের সংক্ষিপ্ত মর্ম। অদ্বৈতবেদান্তের ন্যায় সাংখ্যদর্শনেও নির্গুণ আত্মবাদই বাস্তব তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাংখ্যসিদ্ধান্তে আত্মা সর্বজীবে এক ও অভিন্ন নহে; প্রতিজীবে উহা বিভিন্ন; নির্গুণ, চৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্য আত্মার ধর্ম বা গুণ নহে। "নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্মা" (সাংখ্যসূত্র ১।১৪৬) এই সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে এবং পরবর্তী আলোচনায় সাংখ্যদর্শনের রচয়িতা বিজ্ঞানভিক্ষু বিভিন্ন শাস্ত্রোক্তি ও যুক্তির অবতারণা করিয়া, আত্মা নির্গুণ, চৈতন্যস্বরূপ এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম

আলোচ্য নির্গুণ আত্মবাদ এবং জীব, ঈশ্বর ও জগতের মিথ্যাত্ব প্রভৃতি [illegible] সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িক, রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতি বৈষ্ণব দার্শনিকগণ তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার নির্গুণত্বপক্ষে যেমন শাস্ত্র ও যুক্তি আছে, সগুণত্বপক্ষেও ঐরূপ শাস্ত্র ও যুক্তি আছে। নির্গুণত্ব-বাদীরা যেমন [illegible] বিরুদ্ধপক্ষের শাস্ত্রবাক্যের ভিন্নরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া, "আমি জানি," "আমি সুখী," "আমি দুঃখী" ইত্যাদি সর্বজনীন প্রতীতিকে ভ্রম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আত্মার

নির্গুণ আত্মবাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িক, রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, প্রভৃতি বৈষ্ণব বেদান্তিগণের বক্তব্য

সগুণত্ববাদীরাও সেইরূপ ঐ সমস্ত প্রতীতিকে ভ্রম না বলিয়া, নির্গুণত্ববোধক শাস্ত্রের অন্যরূপ তাৎপর্য বিবৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের বক্তব্য এই, জীবাত্মার জ্ঞানাদি গুণবত্তা যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও অনুমান-প্রমাণ-সিদ্ধ, এবং "এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা," (প্রশ্ন উপনিষদ) "সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ।" (ছান্দোগ্য উপঃ ৩৷১৪৷২) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ, তখন যে-সকল শ্রুতিতে আত্মাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য ইহাই বুঝিতে হইবে যে, মুমুক্ষু আত্মাকে নির্গুণ বলিয়া ধ্যান করিবেন। জীবাত্মার অভিমান বা অহমিকার নিবৃত্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানলাভের সহায়তার জন্যই বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতিতে এইরূপ ধ্যানের উপদেশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ আত্মার নির্গুণত্ব অবাস্তব, আরোপিত; সগুণত্বই বাস্তব তত্ত্ব। (সগুণ) ব্রহ্মের সর্বৈশ্বর্য ও সর্বকামদাতৃত্ব এবং অন্যান্য গুণবত্তা চিন্তা করিলে, মুমুক্ষুর পরমেশ্বরের নিকট ঐশ্বর্যাদিলাভে কামনা জন্মিতে পারে। অভ্যুদয়লাভের বাসনা জাগরূক হইয়া, মুক্তিপথযাত্রীর চিত্তকে আবিল করিয়া তাঁহাকে যোগভ্রষ্ট করিতে পারে। ফলে, মুমুক্ষুর নির্বাণলাভ সুদূর-পরাহত হয়। সুতরাং উচ্চাধিকারী মুমুক্ষু ব্রহ্মের অনন্ত গুণরাশি ভুলিয়া গিয়া, ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াই ধ্যান করিবেন। ঐরূপ ধ্যান তাঁহার নির্বাণ-লাভে সহায়তা করিবে। শাস্ত্রে অনেক স্থানে ব্রহ্মের ঐরূপ ধ্যানের প্রকারই কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের সগুণত্বই সত্য, নির্গুণত্ব অবাস্তব হইলেও, উহা অধিকারীবিশেষের পক্ষে যে ধ্যানের সহায়ক হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? নৈয়ায়িক-মতে আত্মার নির্গুণত্ববোধক শাস্ত্রবাক্যের যে পূর্বোক্তরূপই তাৎপর্য, ইহা "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে ন্যায়গুরু উদয়নাচার্যও ব্যক্ত করিয়াছেন।[১] সেখানে "প্রকাশ" টীকাকার বর্ধমান উপাধ্যায়ও উদয়নোক্তির ঐরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াই বলিয়াছেন—আত্মার আরোপাত্মক ধ্যান বা উপাসনা উপনিষদেও বহুস্থানে উপদিষ্ট হইয়ছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্যও সেই সমস্ত উপাসনাকে আরোপাত্মক উপাসনা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। নির্গুণরূপে আত্মার

১। "নিরঞ্জনাববোধার্থো ন চ সন্নপি তৎপরঃ"

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ৩৷১৭

আত্মনো যন্নিরঞ্জনত্বং বিশেষগুণশূন্যত্বং তদ্ধ্যেয়মিত্যেবংপরো নত্বকর্তৃত্ববোধনপর ইত্যর্থঃ। ঐ প্রকাশটীকা, ৩৷১৭ কাঃ;

উপাসনাই উপনিষদের নির্গুণোক্তির মর্ম বলিয়া নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় মনে করেন। এইজন্যই নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ শঙ্করোক্ত নির্গুণ ব্রহ্মবাদকে বাস্তবতত্ত্ব বলিয়া একেবারেই স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বিশ্বাসের সহিতই বলিয়া গিয়াছেন যে, নির্গুণ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণের অতীত বিধায়, ঐরূপ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে কে উপপাদন করিতে পারে? অর্থাৎ ঈশ্বর নির্গুণ হইলে, প্রমাণাভাবে ঈশ্বরের সিদ্ধিই হয় না।[১]

তারপর, পরমাত্মা পরব্রহ্মকে নির্গুণ বলিলেও, একেবারে সমস্ত গুণ শূন্য বলা যাইতে পারে না। নির্গুণ শব্দের অন্তর্গত 'গুণ' শব্দে এখানে অবশ্য বৈশেষিক দর্শনোক্ত গুণরাজিকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। আত্মাতে বিশেষ গুণ না থাকিলেও, সংখ্যা, পরিমাণ, সংযোগ প্রভৃতি সামান্য গুণ যে আত্মাতে আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু, উল্লিখিত "নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্মা" (সাংখ্যসূত্র ১।১৪৬) এই সূত্রের ভাষ্যে, 'সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ' এই শ্রুতি ব্যাখ্যায় গুণ শব্দের অর্থ যে, বিশেষ গুণ (গুণমাত্রই নহে), তাহা স্পষ্টবাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে নির্গুণ ও সগুণবোধক শ্রুতির কোনরূপ বিরোধ ঘটে না। আত্মার সগুণত্ববাদীরাও নির্গুণত্ববোধক শ্রুতিবাক্যের অনায়াসেই উপপত্তি করিতে পারেন। বৈষ্ণব আচার্যগণ ঐরূপ দৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং এই দৃষ্টিতেই শ্রুতিবিরোধের অবসান ঘটাইবার প্রয়াস করিয়াছেন। শঙ্করোক্ত নির্গুণ ব্রহ্মবাদের বিরুদ্ধে যাঁহার প্রবল প্রতিবাদ ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই ভক্তপ্রবর শ্রীরামানুজাচার্যও ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ন্যায়ই ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর বুদ্ধ্যাদিগুণশূন্য হইতেই পারেন না। ঐরূপ ঈশ্বরে কোনরূপ প্রমাণ নাই। সকল প্রকার প্রমাণই সগুণ, সবিশেষ বস্তুই উপপাদন করে; নির্গুণ নির্বিশেষ বস্তু কোন প্রমাণেরই বিষয় হয় না। ফলে, প্রমাণাভাবেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। আগম-নিগম-পুরাণ প্রভৃতিতে নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক যে সকল উক্তি দেখিতে

পাওয়া যায়, তাহার অর্থ ইহা নহে যে, ব্রহ্ম সর্বপ্রকার গুণশূন্য। নির্গুণত্বের বোধক ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্ম সর্বপ্রকার প্রাকৃত বা হেয়গুণশূন্য। "নির্গুণবাদাশ্চ প্রাকৃত হেয়গুণনিষেধবিষয়তয়া ব্যবস্থিতাঃ।" (সর্বদর্শন সংগ্রহে—রামানুজদর্শন)

পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, যিনি অপরিমিত-অশেষ-কল্যাণগুণের নিলয়, তিনি নির্গুণ হইবেন কিরূপে? নির্গুণ তিনি হইতেই পারেন না। যেই শাস্ত্রে তাঁহার অনন্ত গুণের বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই শাস্ত্রই তাহাকে গুণশূন্য বলিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? শাস্ত্রের ঐ দ্বিবিধ উক্তি হইতে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণভেদে দুইপ্রকার এইরূপ কল্পনারও কোন হেতু নাই।[১] একই গুণময় পরব্রহ্ম দিব্য কল্যাণগুণযোগে সগুণ এবং প্রাকৃত হেয়গুণশূন্য বলিয়া নির্গুণ, এই ভাবেই আচার্য রামানুজ সগুণ ও নির্গুণ বাক্যের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন।[২] আচার্য শঙ্করের ন্যায় সগুণ ও নির্গুণভেদে ব্রহ্মের দ্বৈবিধ্য কল্পনা তিনি যুক্তিসহ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। সগুণ ব্রহ্মবাদী রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে নৈয়ায়িকের ন্যায়ই বলিয়াছেন—"চেতনত্বং নাম চৈতন্যগুণযোগঃ। অত ঈক্ষণগুণবিরহিণঃ প্রধান-তুল্যত্বমেবেতি", শ্রীভাষ্য, ১।১।১২ সূত্র; অর্থাৎ চৈতন্যরূপ গুণবত্তাই চেতনত্ব; চৈতন্যরূপ গুণবিশিষ্ট হইলেই তাহাকে চেতন বলা যায়। সুতরাং "তদৈক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিতেও ব্রহ্মের যে ঈক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, সেই ঈক্ষণ চেতনের ধর্ম বলিয়া, তাহা সাংখ্যোক্ত জড় প্রকৃতির পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায়, বেদান্তদর্শনে "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ব্রঃ সূঃ ১।১।৫ এই সূত্রের দ্বারা সাংখ্যসম্মত জড় প্রকৃতির জগৎকারণত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। এই অবস্থায় সেই ঈক্ষণরূপ গুণ অর্থাৎ চৈতন্যরূপ গুণ ব্রহ্মে না থাকিলে, এক কথায় ব্রহ্ম নির্গুণ হইলে,

---

১। দিব্যকল্যাণযোগেন সগুণত্বং প্রাকৃত হেয়গুণরহিতত্বেন নির্গুণত্বমিতি বিষয়-ভেদবর্ণনেনৈকস্যৈবাগমাদ্ ব্রহ্মদ্বৈবিধ্যং দুর্বচনমিতি দিক্। বেদান্ততত্ত্বসার।

২। (ক) ন চ নির্গুণবাক্যবিরোধঃ; প্রাকৃত হেয়গুণবিষয়ত্বাত্তেষাম্।

শ্রীভাষ্য, ১২৪ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

(খ) নির্গুণবাক্যানাং সগুণবাক্যানাং চ বিষয়মপহতপাপ্মেত্যাদ্যপিপাস ইত্যন্তেন হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য সত্যকামঃ সত্যসংকল্প ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণান্ বিদধতী শ্রুতিরেব বিবিনক্তি। শ্রীভাষ্য, ১২৬ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

নির্গুণ ব্রহ্মও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির ন্যায় জড়ই হইয়া পড়েন নাকি? ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বভাব ইহা নানা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। সেই সকল শাস্ত্রোক্তিকে মিথ্যা বলিবার কোনই হেতু নাই। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মকে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও, শাস্ত্রোক্তির সত্যতার জন্যই ব্রহ্মে গুণবত্তাও সমর্থন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার "সর্বসংবাদিনী" গ্রন্থে রামানুজাচার্যের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াই বলিয়াছেন, যে-সকল শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মের উপাধি বা গুণের নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা পরব্রহ্মের প্রাকৃত বা হেয়গুণেরই নিষেধ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'নিত্যং বিভুং সর্বগতং মহান্তম্' ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্ম পরমাত্মা যে নিত্যত্ব, বিভুত্ব প্রভৃতি অশেষ কল্যাণগুণের আকর, তাহা স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করা হইয়াছে। এইরূপ 'নির্গুণং নিরঞ্জনম্' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মে হিংসা, দ্বেষ, লোভ, মোহ প্রভৃতি প্রাকৃত হেয়গুণের নিষেধই ধ্বনিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্বপ্রকার গুণশূন্য ইহা বুঝায় নাই। ব্রহ্ম সর্বপ্রকার গুণশূন্য, ধর্মশূন্য হইলে, তাহাতে নির্গুণ ব্রহ্মবাদীর অভিপ্রেত নিত্যত্ব, বিভুত্ব প্রভৃতি ধর্মও নাই, ইহাই বলিতে হয় নাকি?[১] ব্রহ্মের নিত্যত্ব, বিভুত্ব প্রভৃতি ধর্ম স্বীকার করিয়া, অদ্বয়ব্রহ্মবাদী পরব্রহ্মকে সর্ববিধ গুণশূন্য বলিবেন কিরূপে? বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার ভগবৎসন্দর্ভেও নানা শাস্ত্রপ্রমাণ আহরণ করিয়া, ব্রহ্মের সগুণত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবীণ আচার্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও তাঁহার 'সিদ্ধান্তরত্ন' গ্রন্থের চতুর্থপাদে বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্র ও তর্কের সুদৃঢ় ভিত্তিতে সগুণ ব্রহ্মবাদ উপপাদন করিয়াছেন। সেখানে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"তস্মাদপ্রাকৃতানন্তগুণরত্নাকরোহরিঃ সর্ববেদবাচ্যঃ" "নির্গুণচিন্মাত্রন্তুলীকমেব"। মূল কথা, বৈষ্ণবদার্শনিকগণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া

১। তথোপাধিপ্রতিষেধবাক্যে অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যম্ ইত্যাদৌ প্রাকৃতহেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য নিত্যত্ববিভুত্বাদি কল্যাণগুণযোগঃ ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতে নিত্যং বিভুং সর্বগতমিত্যাদিনা। নির্গুণং নিরঞ্জনম্ ইত্যাদীনামপি প্রাকৃত হেয়গুণনিষেধবিষয়ত্বমেব। সর্বতো নিষেধে স্বাভ্যুপগতাঃ নিত্যত্বাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুঃ।—শ্রীজীবগোস্বামিকৃত সর্বসংবাদিনী।

স্বীকার করিলেও, তাঁহারাও ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্ম অলীক, উহা প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বিচারপূর্বক বলিয়াছেন।[১]

উপরে ন্যায় ও বৈষ্ণব মতের যে সার সংকলন করা হইল, তাহাদ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা গেল যে, নির্গুণব্রহ্মে কোনও প্রমাণ নাই। এইজন্যই নির্গুণ অদ্বয়বাদ গ্রহণযোগ্য নহে। প্রমাণমাত্রই সগুণ এবং সবিশেষ বস্তুরই সাধক হইয়া থাকে; কোন প্রমাণই নির্গুণ নির্বিশেষ তত্ত্ব সাধন করে না। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের কথাই ধরা যাউক। নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি কোনরূপ গুণ বা ধর্মই নাই। এই অবস্থায় সর্বপ্রকার ধর্মরহিত ব্রহ্মকে ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলা কোনমতেই চলে না। ব্রহ্ম 'অবাঙ্‌মনসগোচর' ইহাই অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত। 'অবাঙ্‌মনসগোচর' ব্রহ্ম যেমন ইন্দ্রিয়গম্য নহেন, সেইরূপ তিনি মনোগম্য বা বাক্যগম্যও নহেন। এইরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের গোচর হইবেন কিরূপে? যাহা কদাচ প্রত্যক্ষগোচর হয় না, তাহার সম্পর্কে অনুমান করাও চলে না। অনুমান হইতে গেলেই কোন-না-কোন ক্ষেত্রে অনুমানের হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি বা নিয়ত সম্বন্ধ (অর্থাৎ হেতু কখনও সাধ্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; হেতু থাকিলেই সাধ্য সেখানে অবশ্যই থাকিবে, হেতু ও সাধ্যের এইরূপ সম্বন্ধকে বলে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি, এই ব্যাপ্তিই অনুমানের কারণ) প্রত্যক্ষগম্য হওয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তি কস্মিন্ কালেও ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি পাকশালা প্রভৃতি কোনও স্থলে প্রত্যক্ষ করে নাই, সেইরূপ ব্যক্তি পর্বতগাত্র হইতে উত্থিত ধূমরাজি দেখিয়াও, পর্বতে বহ্নির অনুমান করিতে পারেন না। ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ যে অনুমানের অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ, তাহা অস্বীকার করা চলে না। নির্বিশেষ বস্তু সম্পর্কে আলোচ্য ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ সম্ভবপর নহে, সুতরাং নির্বিশেষ বস্তুর অনুমানও সম্ভবপর নহে। শব্দ বা শাস্ত্রকেও নির্বিশেষ বস্তুর বোধক বলা যায় না। কারণ, প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের যোগে 'পদ' গঠিত হয়। কয়েকটি সুগঠিত পদ মিলিত হইয়া এক একটি বাক্য রচনা করে; এবং সুচিন্তিত বাক্যরাশি "শাস্ত্রের" মর্যাদা লাভ করে। পদের সংগঠক প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের অর্থ এক

প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ প্রভৃতি কোন প্রমাণই নির্বিশেষ তত্ত্ব প্রতিপাদন করে না।

১। মঃ মঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশকৃত ন্যায়দর্শন, ৪।১।২১ সূত্রের টিপ্পনী দেখুন।

নহে। প্রকৃতিরও যেমন স্বতন্ত্র একটা অর্থ আছে, প্রত্যয়েরও সেইরূপ স্বতন্ত্র অর্থ আছে। ঐ উভয় প্রকার অর্থ মিলিত হইয়াই, পদের অর্থ প্রকাশ করে। পদসমষ্টিদ্বারা গঠিত বাক্যেও প্রথমতঃ বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বোধ জন্মে। পরে, ঐ সমস্ত অর্থের মধ্যে পরস্পর একটা বিশেষ সম্বন্ধের স্ফুরণ হইয়া, মিলিতভাবে বাক্যার্থের জ্ঞান উদিত হয়। কোন পদ বা বাক্যই বিশিষ্ট কোন অর্থ প্রতিপাদন না করিয়া পারে না। শব্দের নির্বিশেষ বস্তু প্রতিপাদনের ক্ষমতা নাই; নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপপাদনে শব্দকে প্রমাণ বলিয়াও গ্রহণ করা চলে না— নির্বিশেষবস্তুপ্রতিপাদনাসামর্থ্যাৎ ন নির্বিশেষবস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্।

শ্রীভাষ্য, ৭৩ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং।

"ইদমহমদর্শম্" আমি ইহা দেখিয়াছি, জ্ঞানের এইরূপই আকার বটে। জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই ত্রিপুটী লইয়াই জ্ঞানের উদয় হয়। "ইদমিত্থম্" "ইহা এই প্রকার" (ইদংশব্দে বিশেষ্য অংশকে, ইত্থংশব্দে বিশেষণ অংশকে বুঝায়) এইরূপে জ্ঞেয় বস্তুর কোন বিশেষরূপ বা ধর্মের সূচনা করাই জ্ঞানের স্বভাব। প্রমাণ সকল সময়ই জ্ঞেয় বস্তুর কোন-না-কোন বিশেষ ভাবের বোধক হইয়া থাকে; নতুবা প্রমাণের প্রমাণত্বই সেক্ষেত্রে ব্যাহত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রমাণ কস্মিন্ কালেও নির্গুণ, নির্বিশেষ বস্তুর বোধক হয় না।[১]

প্রমাণ সগুণ, সবিশেষ বস্তুরই বোধক হয়

অদ্বৈতবেদান্তী জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই ত্রয়ীর মধ্যে জ্ঞানকেই একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। বিষয়-অংশ এবং জ্ঞাতৃ-অংশ তাঁহার মতে অধ্যস্ত এবং মিথ্যা। বিষয়-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যকে জ্ঞেয় এবং অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যকে জ্ঞাতা বলা হইয়া থাকে। এইরূপ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ খণ্ড চৈতন্য জ্ঞেয় বিষয় এবং অন্তঃকরণের সহিত চৈতন্যের অভেদ বা তাদাত্ম্যাধ্যাসের ফলে উৎপন্ন হয়। বিষয় বা অন্তঃকরণ এক্ষেত্রে চৈতন্যের উপাধি (Limitation)। এই সকল উপাধি (যাহার ফলে অসীম, অখণ্ড চৈতন্য সসীম ও সখণ্ড হইয়া

নির্বিশেষ আত্মবাদের সমর্থনে অদ্বৈতবাদীর বক্তব্য

১। নির্বিশেষ বস্তুবাদিভি নির্বিশেষে বস্তুনীদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্; সবিশেষ বস্তুবিষয়ত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্।

শ্রীভাষ্য—৭০ পৃঃ, বোম্বে সং।

প্রতিভাত হয় তাহা) মিথ্যা। জ্ঞানের এই মিথ্যা অংশদ্বয়কে বাদ দিলে, নিরুপাধি চৈতন্যই অবশিষ্ট থাকে; তাহাই বস্তুতঃ সত্য এবং সর্বদা অপরোক্ষ। সেই অপরোক্ষ চৈতন্যে অধ্যস্ত জড় বস্তুসমূহ জ্ঞানের সহিত অভিন্ন হইয়াই প্রত্যক্ষগম্য হইয়া থাকে। ঘট প্রভৃতি বিশেষ বস্তুর প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিলে বুঝা যায় যে, এক অখণ্ড সৎ বা চিৎই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। "ঘটঃ অস্তি" এই কথা বলিলে, অস্তিত্ব এবং ঘট প্রভৃতি উপাধি নিবন্ধন সেই অস্তিত্বের একটা বিশেষ রূপ (ঘটের অস্তিত্ব বা ঘটগত অস্তিত্ব) প্রকাশ পায়; এবং অপরাপর বস্তুর অস্তিত্ব হইতে ঘটের অস্তিত্বের যে ভেদ আছে তাহাও পরিস্ফুট হয়। প্রত্যক্ষ একক্ষণমাত্রই অবস্থান করে। ক্ষণস্থায়ী বিধায়ই, ঐরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে দৃশ্য বস্তুর কেবল অস্তিত্ব বা সত্তাই প্রতীতি-গোচর হইতে পারে। ঘট প্রভৃতি উপাধি নিবন্ধন সত্তার যে ভেদ বুঝা যায়, তাহা কোনমতেই প্রত্যক্ষ-গম্য হইতে পারে না। ভেদ বুঝিতে হইলে "ইহা অমুক বস্তু হইতে ভিন্ন", "অয়মস্মাদ্ ভিন্নঃ", এইরূপেই তাহা বুঝিতে হয়। যে-বস্তুর ভেদ হয় এবং যাহা হইতে ভেদ হয়, সেই দুইটি বস্তুর (ভেদের প্রতিযোগীর ও অনুযোগীর) জ্ঞান ব্যতীত ভেদবুদ্ধি উদিতই হইতে পারে না। সুতরাং ক্ষণস্থায়ী প্রত্যক্ষের দ্বারা "ভেদকে" জানিতেও পারা যায় না। ভেদ বস্তুর স্বরূপও নহে, বস্তুর ধর্মও নহে। ভেদ যদি বস্তুর স্বরূপ হইত, তবে বস্তুর স্বরূপকে জানিলেই, অপরাপর বস্তু হইতে তাহার যে ভেদ আছে, তাহাও বস্তুর প্রত্যক্ষের দ্বারাই জানা যাইত। তাহা তো জানা যায় না। তারপর, ভেদ যদি বস্তুর ধর্ম হয়, তবে বস্তুর স্বরূপ হইতে সেই ভেদরূপ ধর্মেরও ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভেদের আবার ভেদ স্বীকার করিতে হইলে, অনবস্থাই আসিয়া পড়িবে। জাতি-গুণ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্মসংবলিত বস্তুর জ্ঞান হইলে, সেই বস্তুর সহিত অপরাপর বস্তুর যে প্রভেদ আছে তাহা বুঝা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, অপর বস্তু হইতে কোন বস্তুর ভেদ বুঝিলেই, ঐ বস্তুর জাতি-গুণ প্রভৃতির জ্ঞানোদয় সম্ভবপর হয়। এইরূপে "অন্যোন্যাশ্রয়"দোষও অপরিহার্য হইয়া উঠে। সুতরাং বলিতেই হয়, প্রত্যক্ষ প্রভৃতির ফলে যে ভেদবুদ্ধির উদয় হয় তাহা মিথ্যা—অতো ভ্রান্তিমূল এব ভেদব্যবহারঃ।

মহাপূর্বপক্ষ ৫৯ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং। প্রত্যক্ষ বস্তুর সত্তাকেই প্রকাশ করে, দৃশ্য বস্তুর কোন বিশেষ রূপকে প্রকাশ করে না—সন্মাত্রস্যৈব প্রকাশকং প্রত্যক্ষম্। শ্রীভাষ্য, মহাপূর্বপক্ষ, ৬০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং; এইরূপ সিদ্ধান্তই স্বীকার্য।

ঘটোঽস্তি, গৌরস্তি, ঘটোঽনুভূয়তে, পটোঽনুভূয়তে, এইরূপে প্রতিনিয়ত যে জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে, ঐসকল জ্ঞান বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, জ্ঞানমাত্রেরই বিষয় অংশ নিয়ত পরিবর্তনশীল। ঐ পরিবর্তনশীল জড় বিষয়ের অধিষ্ঠানরূপে বিরাজমান সত্তা বা জ্ঞান পরিবর্তনশীল নহে; উহা অপরিবর্তনীয়। "ঘট আছে" বলিলেই, ঘটভিন্ন পট প্রভৃতি অপরাপর বস্তুর অভাব সেখানে বুঝা যায়। এইরূপ পট আছে বলিলেও, ঘট প্রভৃতির অভাব বুঝা যায়। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, সকল জড় বস্তুরই ক্ষেত্রবিশেষে অভাব বা বাধ সিদ্ধ হয়। ফলে, নিয়ত পরিবর্তনশীল জড় বস্তু মিথ্যা, সদা অপরিবর্তনীয়, নিরুপাধি সত্তা বা চৈতন্যই বস্তুতঃ সত্য, ইহাই প্রমাণিত হয়।[১]

সৎ এবং চিদ্ অভিন্ন তত্ত্ব

সত্তা এবং অনুভূতি ভিন্ন বস্তু নহে, অভিন্নই বটে,—"তস্মাৎ সৎ অনুভূতিরেব"। সত্তা অনুভূতি হইতে অভিন্ন বলিয়াই, অনুভূতির ন্যায় সত্তাও স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব। স্বতঃসিদ্ধ বিধায়, ইহা অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সত্তা অনুভূতি হইতে ভিন্ন হইলে এবং অনুভূতির বিষয় হইলে, সত্তাও জ্ঞেয় ঘট প্রভৃতি বস্তুর ন্যায় "অননুভূতি" অর্থাৎ অনুভূতি হইতে পৃথক্, মিথ্যা জড়বস্তুই হইয়া পড়িত। সেক্ষেত্রে সৎ এবং অনুভূতি অভিন্ন বলিয়া কোনমতেই পরিগণিত হইতে পারিত না। দুই প্রকার পদার্থের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একমাত্র অনুভূতিই

অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে অনুভূতির নিত্যত্ব, অজড়ত্ব এবং স্বপ্রকাশত্ব সাধন

স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃ প্রমাণ। অনুভূতি ব্যতীত অপর সকল বস্তুই অনুভূতি-প্রকাশ্য, জ্ঞেয়, জড়বস্তু। অনুভূতি যদি স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃপ্রমাণ না হইত, অপর কোনও প্রমাণগম্য বা পরতঃপ্রমাণ হইত, তবে, অনুভূতিও ঘট প্রভৃতির ন্যায় জড়বস্তু এবং অননুভূতিই হইয়া দাঁড়াইত। এইজন্যই

১। শ্রীভাষ্য, মহাপূর্বপক্ষ, ৬০ পৃঃ; নির্ণয় সাগর সং।

অনুভূতিকে স্বতঃসিদ্ধই বলিতে হইবে। জ্ঞানের আলোকে বিশ্বের তাবদ্ বস্তু উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার জন্য অপর কোন প্রকাশকের অপেক্ষা নাই। এই যুক্তিতেই জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলা হইয়া থাকে।[১]

এই স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতি নিত্যও বটে, এক এবং অখণ্ডও বটে। উৎপন্ন বস্তুমাত্রেরই উৎপত্তির পূর্বে অভাব থাকে। এই অভাবকে "প্রাগভাব" বলে। যে-বস্তুর প্রাগভাব নাই, ধ্বংসও নাই, সেইরূপ বস্তু কস্মিন্ কালেও উৎপন্ন হয় না। উহা নিত্য বলিয়াই পরিগণিত হয়। অনুভূতি

১। অতো নানুভূতিরনুমীয়তে, নাপি জ্ঞানান্তরসিদ্ধা অপিতু সর্বং সাধয়ন্তী অনুভূতিঃ স্বয়মেব সিধ্যতি। শ্রীভাষ্য, মহাপূর্বপক্ষ, ৬৩ পৃষ্ঠা, বোম্বে সং। অনুভূতি যে স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বপ্রকাশ তাহা অনুমানের সাহায্যেও দেখান যাইতে পারে। সেই অনুমানের প্রয়োগটি হইবে এইরূপ—অনুভূতি উহার প্রকাশ এবং ব্যবহার সম্পর্কে অন্য কোন প্রমাণের অধীন নহে, যেহেতু অনুভূতি স্বয়ংই স্বীয় সম্বন্ধবশতঃ ঘট প্রভৃতি জড় বস্তুতে প্রকাশ রূপ নিজধর্ম আধান করে এবং ঘট প্রভৃতির ব্যবহার যোগ্যতা সম্পাদন করে। যে-পদার্থ স্বীয় সম্বন্ধ বশতঃ অপর বস্তুতে নিজ ধর্মের (প্রকাশের) আধান করে এবং ঐ বস্তুর ব্যবহার সাধন করে, সেই (স্বপ্রকাশ) পদার্থটি স্বকীয় প্রকাশে এবং ব্যবহারে কখনও অপরের অধীন হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের বিচিত্র রূপের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রূপ আছে বলিয়াই ঘট প্রভৃতি জড়বস্তু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। রূপ কিন্তু নিজেকে চক্ষুর্গ্রাহ্য করিবার জন্য নিজের আর রূপ কল্পনা করে না। রূপের আর রূপ নাই, রূপ অরূপ। এইজন্য রূপের প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু রূপ আছে বলিয়াই অপর সকল দৃশ্য বস্তুর যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় ইহা সর্ববাদিসিদ্ধ। অনুভূতি স্বীয় সম্বন্ধবশতঃ ঘট প্রভৃতির প্রকাশ সাধন করিলেও, নিজের প্রকাশের জন্য এবং 'প্রকাশতে' এইরূপ ব্যবহার উপপাদনের জন্য অনুভূতি নিজেই কারণ হয়, অপর কোন অনুভূতির অপেক্ষা করে না।

অনুভূতিরনন্যাধীনস্বধর্মব্যবহারা, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ধর্মব্যবহারহেতুত্বাৎ। যঃ স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ধর্মব্যবহারহেতুঃ, স তয়োঃ স্বস্মিন্ অনন্যাধীনো দৃষ্টঃ। যথা—রূপাদিশ্চাক্ষুষত্বাদৌ। রূপাদির্হি পৃথিব্যাদৌ স্বসম্বন্ধাচ্চাক্ষুষত্বাদি জনয়ন্ স্বস্মিন্ ন রূপাদিসম্বন্ধাধীনশ্চাক্ষুষত্বাদৌ। অতোঽনুভূতিরাত্মনঃ প্রকাশমানত্বে "প্রকাশতে" ইতি ব্যবহারে চ স্বয়মেব হেতুঃ। শ্রীভাষ্য, মহাপূর্বপক্ষ, ৬৩—৬৫ পৃঃ, নির্ণয়-সাগর সং।

স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃসিদ্ধ। স্বতঃসিদ্ধত্বনিবন্ধনই অনুভূতির প্রাগভাব থাকিতে থাকিতে পারে না। কেননা, স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতির প্রাগভাব স্বতঃ বা পরতঃ কোনরূপেই জানিতে পারা যায় না। অনুভূতি যদি নিজেই বিদ্যমান থাকে, তবে ঘট থাকিলে যেমন ঘটের অভাব থাকে না, সেইরূপ অনুভূতি থাকিলেও অনুভূতির অভাব থাকিতে পারিবে না। এরূপক্ষেত্রে অনুভূতি বিদ্যমান থাকিয়া তাহার প্রাগভাব বা ধ্বংসসাধন করিবে কিরূপে? পক্ষান্তরে, অনুভূতি যদি নিজেই না থাকে, তবে অনুভূতির অভাব বুঝাইবে কে? অনুভূতির অভাবের সাধক কোন প্রমাণ না থাকায়, অনুভূতিকে "নিত্য" বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

অনুভূতি নিত্য বিধায়, এই অনুভূতি হইবে এক এবং অখণ্ড, নানাপ্রকার নহে। অনুৎপন্ন কোন বস্তুকেই নানাবিধ বৈচিত্র্যময় হইতে কখনও দেখা যায় না। উৎপন্ন ঘট প্রভৃতি জড়বস্তুকেই নানাপ্রকারের হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যেখানে উৎপত্তি আছে, সেইখানেই নানাত্বও আছে। উৎপত্তি ব্যাপক ধর্ম, আর, নানাত্ব তাহার ব্যাপ্য ধর্ম। ব্যাপক উৎপত্তি থাকিলে, সেক্ষেত্রে ব্যাপ্য নানাত্বও অবশ্যই থাকিবে। ব্যাপক ধর্ম উৎপত্তির অভাব ঘটিলে, ব্যাপ্যধর্ম নানাত্বেরও অভাব হইতে বাধ্য। এই অবস্থায় অনুৎপন্ন অনুভূতি যে নানা হইতে পারিবে না, এক এবং অখণ্ডই হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? সর্বপ্রকার ভেদলেশরহিত এই নিত্য অখণ্ড চৈতন্যই অদ্বৈতবেদান্তে আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া পরিচিত।

অনুভূতির একত্ব ও আত্মত্ব সমর্থন

বিশুদ্ধ সংবিদ্ ব্যতীত জ্ঞানের আশ্রয়, জ্ঞাতা-আত্মা বলিয়া কোন তত্ত্ব নাই। আত্মার জ্ঞাতৃত্ব অধ্যস্ত এবং মিথ্যা। অহংকারের সহিত চিদধ্যাসের ফলেই আত্মায় কল্পিত জ্ঞাতৃত্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্বয়ংজ্যোতিঃ সংবিদ্ অনুভাব্যও নহে এবং জড়ও নহে। অনুভূতি ব্যতীত সমস্তই অনুভূতিপ্রকাশ্য এবং জড়বস্তু। জড়ত্বধর্মটি অনাত্মত্বের সমব্যাপ্ত (co-extensive) ধর্ম; অর্থাৎ যাহা জড়বস্তু তাহাই অনাত্মা। ঘট প্রভৃতি আত্মা নহে, যেহেতু ঘট প্রভৃতি সকলই জড়। অনুভূতিতে (অনাত্মত্বের সমব্যাপ্ত) জড়ত্বধর্মটি না থাকায়, অনুভূতি যে অনাত্মা, জড় হইতে পারে না, তাহাও অনায়াসেই বুঝা যায়।[1]

১। যতো নির্ধুতনিখিল ভেদা সংবিৎ, অতএব নাস্যাঃ স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয়ো জ্ঞাতা নাম

আলোচ্য অদ্বৈতসিদ্ধান্তের খণ্ডন করিতে গিয়া আচার্য্য রামানুজ বলেন, প্রত্যক্ষের দ্বারা দৃশ্যবস্তুর বিশেষ রূপেরই স্ফুরণ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ নির্বিশেষ সত্তার গ্রাহক হয় না, হইতে পারে না। 'ঘটোঽস্তি' 'গৌরস্তি' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষ যদি নির্বিশেষ সত্তাকেই কেবল বুঝাইত, সত্তার অতিরিক্ত ঘট প্রভৃতি দৃশ্য-বস্তুর কোনও বিশেষ আকার বা রূপের স্ফুরণ প্রত্যক্ষস্থলে নাই হইত, তবে অশ্ব আনিতে গিয়া, সেই লোক মহিষ দেখিয়া ফিরিয়া আসে কেন, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর অদ্বৈতবেদান্তী দিতে পারেন না। তাঁহার নির্বিশেষ সত্তার কোন বিশেষ রূপ বা আকার নাই। রূপ থাকিলে সে আর নির্বিশেষ থাকে না, সবিশেষই হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় এক অখণ্ড সত্তাই যখন অদ্বৈতবাদীর মতে গরু, ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষের লক্ষ্য, তখন সেই জ্ঞানগুলি ধারাবাহিক জ্ঞানের মত একই বিষয়ে (নির্বিশেষ সত্তাসম্পর্কে) উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিলেও, অদ্বৈতবেদান্তীর তাহাতে আপত্তি করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। অশ্ব এবং হস্তীর সম্পর্কে পর পর দুইটি জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, উভয় জ্ঞানের বিষয় যখন একই নির্বিশেষ সদ্‌বস্তু, তখন পরবর্তী হস্তিজ্ঞান পূর্বোৎপন্ন অশ্বজ্ঞানে পরিজ্ঞাত সত্তাকেই গ্রহণ করায়, পরবর্তী হস্তি-জ্ঞানটিকে (গৃহীতগ্রাহী বিধায়) স্মৃতি বলা চলে নাকি ? এই সকল দোষ ক্ষালনের জন্য অদ্বৈতবাদীকে বাধ্য হইয়াই বলিতে হয় যে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট গরু, ঘোড়া প্রভৃতির বিশেষ আকার বা স্বরূপটিও প্রত্যক্ষগ্রাহ্যই বটে। গরুর আকার অর্থই—গলকম্বল প্রভৃতি গরুর বিশেষ ধর্ম, যাহাকে জাতি বলা হইয়া থাকে। সেই গলকম্বল প্রভৃতি আকারের দ্বারা ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি হইতে গরুর পার্থক্যও স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। গরুর এই আকারটিকে প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিলেই, প্রত্যক্ষ যে নির্বিশেষ সত্তাকেই মাত্র গ্রহণ করে না; গোর আকৃতি, গলকম্বল প্রভৃতি কোন-না-কোন বিশেষ ভাবেরই প্রত্যক্ষে স্ফুরণ হইয়া থাকে, ইহা প্রতিবাদী অদ্বৈতবেদান্তীকেও মানিতেই হইবে।

রামানুজ কর্তৃক শঙ্করোক্ত আলোচ্য নির্বিশেষবাদের খণ্ডন ও প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের সবিশেষ বস্তুগ্রাহিত্ব সাধন

কশ্চিদস্তীতি স্বপ্রকাশরূপা সৈবাত্মা। অজড়ত্বাচ্চ, অনাত্মত্বব্যাপ্তং জড়ত্বং সংবিদি ব্যাবর্তমানমনাত্মত্বমপি হি সংবিদো ব্যাবর্তয়তি। শ্রীভাষ্য, মহাপূর্বপক্ষ, ৬৬—৬৭ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং।

প্রত্যক্ষজ্ঞান ক্ষণস্থায়ী হইলেও, সেই ক্ষণমাত্রস্থায়ী প্রত্যক্ষের সাহায্যেই গলকম্বলধারী গো প্রভৃতির বিশেষ প্রত্যক্ষের উপপাদনও অসম্ভব হয় না। গরুর বিশেষ আকারের সাহায্যে গরুকে জানিলেই, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি প্রাণী হইতে গরুর যে ভেদ আছে, তাহা গরুর প্রত্যক্ষের দ্বারাই বুঝা যাইবে। শাদা বলিলেই যেমন কাল, লাল, নীল বা হলুদে নহে, ইহা বুঝা যায়। এক্ষেত্রে কাল, লাল, নীল প্রভৃতির ভেদ যেমন শুক্লতার স্বরূপই বটে, শুক্লতা হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে, সেইরূপ ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতির আকৃতি হইতে গরুর আকৃতির যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাও গরুর স্বীয় আকার গলকম্বল প্রভৃতি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। গরুর বিশেষ আকৃতি দেখিয়া গরুকে চেনাই বিশ্বের তাবদ্ বস্তু হইতে গরুর ভেদ প্রত্যক্ষ করা। এই অবস্থায় ভেদ কস্মিন্ কালেও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয় না, হইতে পারে না, ইহা কিরূপে বলা যায়? তারপর, নির্বিশেষ সত্তার কোন রূপ নাই। নির্বিশেষ সত্তার যেমন রূপ নাই, সেইরূপ উহার গন্ধ, স্পর্শ, রস প্রভৃতিও নাই। এইরূপ নির্বিশেষ সত্তার চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? দ্বিতীয়তঃ, সত্তা যদি প্রত্যক্ষগম্য বলিয়া ধরিয়াই লওয়া যায়, তবে প্রত্যক্ষের সাহায্যেই নির্বিশেষ সত্তা পরিজ্ঞাত হইতে পারে বলিয়া, নির্বিশেষ সত্তার প্রতিপাদক শ্রুতিসকল প্রত্যক্ষ পরিজ্ঞাত বিষয়টি পুনরায় জ্ঞাপন করায় যে অনুবাদমাত্রই হইয়া পড়ে, তাহা অদ্বৈতবাদী লক্ষ্য করিয়াছেন কি? তাঁহার মতে ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, অমেয়, অনির্দেশ্য। এইরূপ ব্রহ্ম যে আছে, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? এই নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ ও শূন্যবাদের মতই প্রমাণ-হীন হইয়া দাঁড়াইবে নাকি? অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মকে ঘটাদি বস্তুর ন্যায় প্রমাণগম্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, ব্রহ্ম যে জড় এবং বিনাশী হইবে, তাহা অদ্বৈতবাদী কিরূপে অস্বীকার করিবেন? ইহা হইতে সবিশেষ বস্তুরই প্রত্যক্ষ হয়, এইরূপ সিদ্ধান্তই স্বীকার্য।[১] প্রত্যক্ষ সবিশেষ বস্তুর গ্রাহক হইলে প্রত্যক্ষমূলে উৎপন্ন অনুমান, শব্দ প্রভৃতি প্রমাণও যে

১। অতো বস্তুসংস্থানরূপ জাত্যাদি লক্ষণ ভেদবিশিষ্টবিষয়মেব প্রত্যক্ষম্।
রামানুজ ভাষ্য, মহাসিদ্ধান্ত, ৭৮ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং।

সবিশেষ বস্তুরই গ্রাহক হইবে, নির্বিশেষ বস্তুর গ্রাহক হইবে না, তাহাতে সন্দেহ কি ?*

অদ্বৈতবাদীর নির্বিশেষ ব্রহ্মে যে কোনরূপ প্রমাণ নাই, তাহা দেখা গেল। এখন নির্বিশেষ ব্রহ্মের কোনরূপ লক্ষণ নিরূপণ সম্ভব কিনা, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। কোন বস্তুকে অপর সকল বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া দেওয়াই লক্ষণের উদ্দেশ্য। বস্তুর যাহা অসাধারণ ধর্ম বা গুণ (uncommon characteristies) তাহা দ্বারাই সেই বস্তুর লক্ষণ নিরূপিত হইতে পারে। সকল গরুর গলায়ই কম্বলের মত মাংসখণ্ড ঝুলিতে দেখা যায়, গরু ভিন্ন অপর কোন প্রাণীর গলকম্বল নাই; সুতরাং গলকম্বলকে গরুর লক্ষণ বা

নির্বিশেষ ব্রহ্মের কোনরূপ লক্ষণ নিরূপণ করাও সম্ভবপর নহে

*এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, প্রত্যক্ষের দ্বারা নির্বিশেষ সত্তাই কেবল গৃহীত হয়, জ্ঞেয় বস্তুর কোন প্রকার বিশেষ ভাব বা ধর্মের বোধ হয় না, এইরূপে অদ্বৈতবাদী যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার চরম ও পরম ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। অদ্বৈতবেদান্তী প্রত্যক্ষ বলিতে এখানে 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', এই সকল শ্রুতিগম্য সত্য প্রত্যক্ষকেই বুঝিয়াছেন এবং তাহার নির্বিশেষ স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ঘট প্রভৃতি মিথ্যা আধ্যাসিক প্রত্যক্ষকে অদ্বৈতবাদী বোঝেন নাই, তাহাদের নির্বিশেষ স্বরূপ ও তিনি ব্যক্ত করেন নাই। মিথ্যা বিশ্ব প্রপঞ্চের প্রত্যক্ষে প্রপঞ্চের যে বিশেষ রূপের অভিব্যক্তি হয়, এবং উহার ফলেই জীব-জীবনের গতিপথ উন্মুক্ত হয়, তাহা অদ্বৈতবাদীও অস্বীকার করেন না। ঘট প্রভৃতি ব্যাবহারিক বস্তুর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক, মাধ্ব, রামানুজ প্রভৃতির সহিত এক মত। তবে, ঐ সকল প্রত্যক্ষ তাঁহার মতে বাস্তব নহে; উহা অবাস্তব, আধ্যাসিক, ইহাই শুধু অদ্বৈতবাদী বলিতে চাহেন। তাঁহার সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষের ইহা চরম স্তর নহে। প্রত্যক্ষের যাহা পরম স্তর, সেই স্তরে প্রত্যক্ষ নির্বিশেষ সত্তা প্রভৃতিরই বোধক হইয়া থাকে। ব্যাবহারিক জীবনে অবশ্যই ঘট প্রভৃতি বস্তুরও আপেক্ষিক (ব্যাবহারিক) সত্যতা অদ্বৈতবেদান্তী অস্বীকার করেন না। কিন্তু ব্যাবহারিক প্রত্যক্ষের মধ্যেই যাঁহারা প্রত্যক্ষের পূর্ণতর সত্যরূপ উপলব্ধি করিতে চাহেন, সেই রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতির সহিত নির্বিশেষবাদী হাত মিলাইতে পারেন নাই। এই ত্রিপুটী প্রত্যক্ষকে মিথ্যা বলিয়া তিনি (অদ্বৈত বাদী) উড়াইয়াই দিয়াছেন। আচার্য রামানুজ প্রভৃতি অদ্বৈতবেদান্তীর সত্য ও মিথ্যা, এই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষের রহস্য অনুধাবন না করিয়াই, অদ্বৈত বেদান্তের বিরুদ্ধে দোষরাশি উদ্গীরণ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিচায়ক বলা যায়। নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মের ঐরূপ কোন লক্ষণ বা পরিচায়ক চিহ্নের নির্দেশ করা সম্ভব হয় না। কেননা, ঐরূপ চিহ্ন থাকিলে তো ব্রহ্ম সবিশেষই হইয়া পড়েন। নির্বিশেষ তুরীয় ব্রহ্মে কোনরূপ গুণ, ক্রিয়ার সম্বন্ধই নাই, অতএব বিশেষ গুণ বা ক্রিয়ার দ্বারাও তাঁহাকে বুঝাইতে পারা যাইবে না। এইজন্য তাঁহার যে সচ্চিদানন্দরূপ, সেই স্বরূপকেই তাঁহার একমাত্র পরিচয় প্রদানক্ষম লক্ষণরূপে অদ্বৈতবেদান্তে গ্রহণ করা হইয়াছে। উপনিষদে 'সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম', 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম', এইরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং উহাই যে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ, তাহা নিঃসন্দেহ। ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি পর্যালোচনা করিলেও ব্রহ্মের মোটামুটি ঐরূপ পরিচয়ই পাওয়া যায়। বৃংহ ধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃংহ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি বা মহত্ত্ব (বৃহি বৃদ্ধৌ গণপাঠ) এই বৃহত্ত্ব এবং মহত্ত্ব দ্বারা নিরতিশয় মহত্ত্ব বা বৃহত্ত্বই সূচিত হয়; এবং বলিতে হয় যে, দেশ, কাল, অবস্থা প্রভৃতি সর্ববিধ পরিচ্ছেদ-শূন্য, নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পরমমহৎ কোন তত্ত্বই ব্রহ্মশব্দের প্রতিপাদ্য। জন্মাদ্যস্য যতঃ ব্রঃ সূঃ ১।১।২ এই ব্রহ্মসূত্রে দৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিদানরূপে ব্রহ্মের যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অদ্বৈত-বেদান্তের মতে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ।[১] তুরীয় ব্রহ্মের ঐরূপ লক্ষণ হইতে পারে না। তুরীয় ব্রহ্ম যখন মায়াবশে ঈশ্বররূপ পরিগ্রহ করেন, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করেন, নির্গুণ সগুণ হন, সেই ঈশ্বররূপ সগুণ ব্রহ্মের লক্ষণই আলোচ্য ব্রহ্মসূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতি বৈষ্ণব বেদান্তিগণের মতে অনন্তকল্যাণগুণময় পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই

১। তটস্থ লক্ষণং নাম যাবল্লক্ষ্যকালমনবস্থিতত্বে সতি যদ্‌ব্যাবর্তকং তদেব। বেদান্ত-পরিভাষা, বিষয় পরিচ্ছেদ, ১৫৭ পৃঃ রামকৃষ্ণ মিশন্ সং; লক্ষ্যের সহিত যেই লক্ষণের সম্বন্ধ সর্বকালীন নহে, যাহা কেবল আগন্তুক ভাবে লক্ষ্য বস্তুকে চিনাইয়া দেয়, সেইরূপ লক্ষণকে তটস্থ লক্ষণ বলে। 'যে-গৃহে পতাকা উড়িতেছে, ঐ গৃহই রামের গৃহ', এইরূপ পতাকা দেখাইয়া রামের গৃহের যে পরিচয় দেওয়া হয়, সেখানে পতাকা রামের গৃহের তটস্থ লক্ষণ। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় জগতের ধর্ম বলিয়া, জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্মের উহা তটস্থ লক্ষণ।

পরব্রহ্ম[১]। সেই পরব্রহ্মের স্বরূপই স্পষ্ট ভাষায় সূত্রে বিবৃত হইয়াছে। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (তৈঃ ২।১।১), 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' বৃহদাঃ, (৩।৯।২৮), এইরূপে উপনিষদে ব্রহ্মের যে স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা দ্বারাও ব্রহ্ম ভূমানন্দময়, জ্ঞানময় এবং প্রেমময় ইহাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। তুরীয় নির্বিশেষ ব্রহ্মকে বুঝায় না। প্রত্যেক শব্দের একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। শব্দ সেই অর্থের বাচক এবং অর্থ শব্দের বাচ্য। এইরূপে অর্থ ও শব্দের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', এই শ্রুতিতে সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ এই যে তিনটি পদ আছে, তাহাদেরও ভিন্ন ভিন্ন বাচ্য অর্থ আছে। সেই বাচ্য অর্থ প্রকাশ করিয়াই উক্ত পদত্রয় ব্রহ্মের সমানাধিকরণরূপে শ্রুতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত শব্দগুলি কোন একটি মাত্র অর্থ বা বিশেষ্যকে বুঝাইলেই, সেই পদগুলিকে 'সমানাধিকরণ' বলা হয়— প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেন একার্থবৃত্তিত্বং সামানাধিকরণ্যম্। শ্রীভাষ্য, ১২৩ পৃঃ; শব্দের অর্থই শব্দের প্রয়োগের হেতু বা নিমিত্ত। বিভিন্ন অর্থ বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সমানাধিকরণ বা বিশেষণ পদগুলিরও তাহাদের প্রতিপাদ্য অর্থ বুঝাইবার শক্তি আছে। 'নীলোৎপলম্' এস্থলে নীলশব্দে নীলগুণকে এবং উৎপল শব্দে উৎপলকে বুঝায়। স্ব স্ব অর্থ প্রকাশ করিয়াই (অর্থগত বৈলক্ষণ্য বজায় রাখিয়াই) নীল এবং উৎপল এই পদ দুইটি সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। আলোচ্য স্থলেও সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত এই তিনটি পদের (সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব, অনন্তত্ব বিশিষ্টরূপ) বিভিন্ন বাচ্য অর্থ অবশ্যই ধ্বনিত হইবে এবং সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব এবং অনন্তত্বরূপ ধর্ম পরস্পর বিভিন্ন হইয়াই, সামানাধিকরণ্যের ফলে একই ব্রহ্মাশ্রিত হইয়া প্রতিভাত হইবে। সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব এবং অনন্তত্ব ধর্মকে যদি এক বা অভিন্নই বলা যায়, তবে বাচ্য অর্থের (অর্থাৎ প্রবৃত্তি নিমিত্তের) ভেদ না থাকায়, সেক্ষেত্রে ঐ পদগুলির সামানাধিকরণ্যই সম্ভবপর হইবে না।[২] এই অবস্থায়

১। ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরস্তনিখিলদোষোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে। ব্রঃ সূঃ শ্রীভাষ্য, ১।১।১।

২। বিশেষণতো ভিন্নার্থত্বে, বিশেষ্যতশ্চৈকার্থত্বে সতি হি সামানাধিকরণ্যলক্ষণসাদ্গুণ্যমিত্যর্থঃ। শ্রীভাষ্যের শ্রুত প্রকাশিকা টীকা, ২২৩ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং।

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (তৈঃ ২।১।১), এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম যে অনেক ধর্মবিশিষ্ট হইবেন, এবং ইহাদ্বারা যে অদ্বৈত বেদান্তের অভিপ্রেত নির্বিশেষ ব্রহ্মের সিদ্ধি হইবে না, তাহাতে সন্দেহ কি ?

সগুণ ব্রহ্মবাদী রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণের এইরূপ আপত্তির প্রত্যুত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, ব্রহ্ম সর্বপ্রকার ধর্মরহিত নির্বিশেষ তত্ত্ব।

নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মের লক্ষণমুখে পরিচয় অসম্ভব নহে

কোনরূপ বিশেষ ধর্ম বা গুণের দ্বারায়ই ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া চলে না। যিনি সেইরূপ ভাবে ব্রহ্মের পরিচয় দিতে যান, তিনি যে বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞ নহেন, ইহাই 'অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্'। কেন, ২।৩। এইরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। নেতি, নেতি, ব্রহ্ম ইহা নহে, ব্রহ্ম তাহা নহে, ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের ব্রহ্মসম্পর্কে মনন বা তর্কের একমাত্র রীতি। এই রীতি অনুসরণ করিয়াই 'অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘম্'—বৃহদাঃ ৩।৮।৮, প্রভৃতি শ্রুতিতে ব্রহ্ম স্থূলও নহেন, অণুও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন, এইরূপে সর্বপ্রকার বিশেষ ভাব বা ধর্মের নিষেধ করিয়াই ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝান হইয়াছে। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', তৈত্তিরীয়, ২।১।১, 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮, প্রভৃতি উপনিষদেও সেই নেতি নেতি পথেই ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণের চেষ্টা করা হইয়াছে। লক্ষণের সাহায্যে ব্রহ্মের পরিচয় দিতে হইলে, অপরাপর পদার্থরাজি হইতে ব্রহ্মের পৃথক্ স্বরূপটিই দেখান আবশ্যক। শ্রুত্যুক্ত সত্যম, জ্ঞানম্ এবং অনন্তম্, এই তিনটি পদেরদ্বারা ব্রহ্ম ব্যতীত জড় ঘট প্রভৃতি পদার্থ হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য অতিস্পষ্টভাষায় বুঝান হইয়াছে। বিশ্বের তাবদ্ বস্তুই অসত্য, জড় এবং পরিচ্ছিন্ন। ব্রহ্ম অসত্য বা মিথ্যা বস্তু নহেন, জড় নহেন, এবং সসীম বা পরিচ্ছিন্নও নহেন। এই দৃষ্টিতেই অদ্বৈতবেদান্তে নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ বিচার করিতে হইবে। উক্ত তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে সত্যপদের দ্বারায় ব্রহ্ম যে বিকারশীল মিথ্যা বস্তু হইতে (ব্যাবৃত্ত বা) পৃথক্, জ্ঞান পদটির দ্বারা ব্রহ্ম পরপ্রকাশ জড়বর্গ হইতে পৃথক এবং অনন্ত পদের দ্বারা ব্রহ্ম দেশ, কাল প্রভৃতি সর্ববিধ পরিচ্ছেদের অতীত, ইহাই বুঝান হইয়াছে। 'ব্রহ্ম এইরূপ' এইভাবে বিধিমুখে (positively) ব্রহ্মকে জানিবার উপায় নাই। কেননা, ব্রহ্মতত্ত্ব অদ্বৈতবেদান্তের ভাষায় অবাঙ্মনসগোচর। নিষেধমুখেই (negatively) ব্রহ্মকে জানা যায়। বিধিমুখে সচ্চিদানন্দ প্রভৃতি রূপে

ব্রহ্মের যতপ্রকার বর্ণনা বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, নিষেধ মুখেই আলোচ্য রীতিতে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া, ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে হইবে। এখন কথা এই যে, সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত পদের দ্বারা ব্রহ্মে অপরাপর পদার্থরাজির যে বিভেদ বা পার্থক্য সূচিত হইতেছে, সে ভেদও তো ব্রহ্মের ধর্ম হিসাবেই প্রকাশ পাইবে। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত আনন্দ স্বরূপ এইভাবে না বলিয়া, ব্রহ্ম জড় নহে, জড় বস্তু হইতে পৃথক্ (জড় ব্যাবৃত্ত), মিথ্যা নহে, মিথ্যা অবস্তু হইতে বিভিন্ন (ব্যাবৃত্ত) এইরূপে নিষেধমুখে বলিলেও, জড়ের ভেদ, মিথ্যার ভেদ প্রভৃতি ধর্ম ব্রহ্মে প্রতিভাত হইবে বৈ কি? তাহা হইলে ব্রহ্ম সবিশেষই হইয়া পড়িবেন; নির্বিশেষ থাকিবেন কেমন করিয়া? তারপর, সত্য প্রভৃতি শব্দের সত্যত্ব বিশিষ্টরূপ অর্থ গ্রহণ না করিয়া, মিথ্যা নহে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই শ্রুত্যুক্ত তিনটি পদেরই যে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়, অদ্বৈতবাদী তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? ইহার উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, জড় নহে (জড়-ব্যাবৃত্তি), মিথ্যা নহে (মিথ্যা ব্যাবৃত্তি), ইহা ব্রহ্মের স্বরূপই বটে, শুদ্ধব্রহ্ম স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে। "নেদং রজতম্" ইহা রজত নহে, ঝিনুকের খণ্ড, এই সকল স্থলে রজতের যে বাধ বা নিষেধ (ব্যাবৃত্তি) বুঝা যায়, তাহা যেমন ঝিনুকখণ্ড ছাড়া আর কিছুই নহে। সাদা বলিলে কৃষ্ণতার যে নিষেধ হয়, তাহা যেমন শুক্লতারই স্বরূপ, পৃথক্ কোন পদার্থ নহে, সেইরূপ জড়ের নিষেধ, মিথ্যার নিষেধ প্রভৃতিও শুদ্ধ ব্রহ্মেরই স্বরূপ বলিয়া জানিবে। একই ব্রহ্মকে মিথ্যা-জড় প্রভৃতি অপরাপর সকল বস্তু হইতে বিসদৃশ বা পৃথক্ বলিয়া জ্ঞাপন করায়, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত এই তিনটি পদের সার্থকতাও বুঝা যায়।[১] ঐ পদত্রয় একই শুদ্ধ

১। (ক) যদ্যপি সর্বেষাং সত্যাদিপদানাং লক্ষ্যমেকমেব নির্বিশেষং ব্রহ্ম তথাপি নিবর্তনীয়াংশাধিক্যেন ন পদান্তরবৈয়র্থ্যম্।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৬৭৬ পৃষ্ঠা, নির্ণয় সাগর সং।

(খ) সত্যপদং বিকারাস্পদত্বেনাসত্যাদ্ বস্তুনোব্যাবৃত্তব্রহ্মপরম্। জ্ঞানপদং চান্যাধীনপ্রকাশাজ্জড়াদ্বস্তুনো ব্যাবৃত্তপরম্। অনন্তপদং চ দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চ পরিচ্ছিন্নাদ্ ব্যাবৃত্তিপরম্। ন চ ব্যাবৃত্তির্ভাবরূপোঽভাবরূপো বা ধর্মঃ, অপিতু সকলেতর-বিরোধি ব্রহ্মৈব—যথা শৌক্ল্যাদেঃ কার্ষ্ণ্যাদিব্যাবৃত্তিস্তত্তৎপদার্থস্বরূপমেব ন ধর্মান্তরম্, এবমেকস্যৈব বস্তুনঃ (ব্রহ্মণঃ) সকলেতর বিরোধ্যাকারতামবগময়দর্থবত্তরম্, একার্থম্, অপর্যায়ং চ পদত্রয়ম্। শ্রীভাষ্য, ৫৬ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং।

ব্রহ্মকে বুঝাইলেও, মিথ্যাত্ব, জড়ত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী ভাবের [ব্যাবৃত্তি বা] বাধ সূচনা করে বলিয়া, ঐ পদত্রয়কে পর্যায়শব্দও বলা যায় না। একই নির্বিশেষ সত্য বা নির্বিশেষ জ্ঞানকেও শুদ্ধ ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে অপরাপর সর্ববিধ মিথ্যা, জড়, পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি পদার্থ হইতে শুদ্ধ ব্রহ্মের যে পার্থক্য বা ভেদ আছে, তাহা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পায় না। এইজন্য ব্রহ্মে নিখিল জড়-বর্গের বাধ বা নিষেধ [ব্যাবৃত্তি] প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই সত্য, জ্ঞান প্রভৃতি তিনটি পদের অবতারণা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেই বাধ দেখাইতে গিয়া তিনটি পদেরই লক্ষণা বা গৌণ অর্থ স্বীকার করিতে হইলেও, তাহাদ্বারা বাক্যের তাৎপর্য অধিকতর পরিস্ফুট হওয়ায়, লক্ষণাকেও সেক্ষেত্রে দোষের বলা চলে না। সত্য, জ্ঞান প্রভৃতি পদ একই শুদ্ধ ব্রহ্মের বোধক হইলেও, সত্যাদি পদের দ্বারা নিবর্তনীয় ধর্মের মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকায়, সামানাধিকরণ্যেরও কোন অনুপপত্তি নাই। কেন নাই, তাহাই দেখান হইতেছে। যেখানে বাক্যান্তর্গত বিভিন্ন পদগুলি একই অর্থের বোধক হয়, সেখানেই একার্থত্ব বা সামানাধিকরণ্য থাকে। আলোচ্য তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে সত্য, জ্ঞান, এবং অনন্ত পদ একমাত্র ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং সেইরূপ প্রয়োগের ফলে শুদ্ধ ব্রহ্মে জড়ত্ব, মিথ্যাত্ব প্রমুখ সর্বপ্রকার বিরোধী ধর্মের নিবৃত্তি বা নিষেধও সূচিত হইয়াছে। এই জন্যই সত্য, জ্ঞান প্রভৃতি পদগুলির সার্থকতাও যেমন আছে, সেইরূপ সত্যাদি পদ একই শুদ্ধ ব্রহ্মের বোধক হওয়ায়, তাহাদের একার্থত্ব বা সামানাধিকারণ্যও ব্যাহত হয় নাই।[১] প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধর্মই ধর্মীর

১। আলোচ্য শ্রুতিতে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই পদত্রয় যদি স্বতন্ত্রভাবে সত্যত্ব-বিশিষ্ট, জ্ঞানত্ববিশিষ্ট, অনন্তত্ববিশিষ্ট এইরূপ নিজ বাচ্য অর্থ প্রকাশ করিয়া পরে ব্রহ্মের সহিত অন্বিত হইত, তবে সেক্ষেত্রে সত্য-ব্রহ্ম, জ্ঞান-ব্রহ্ম, অনন্ত-ব্রহ্ম, ব্রহ্মের এইরূপ সবিশেষ ভাবই নিঃসন্দেহে বুঝাইত; এবং বিশেষণের ভেদ অনুসারে বিশেষ্যের ভেদও অপরিহার্য হইত। ব্রহ্মের নির্বিশেষ শুদ্ধস্বরূপ বুঝাইত না। নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই সত্য প্রভৃতি পদের অর্থ সহজভাবে (বিধিমুখে Positively) না লইয়া, মিথ্যা নহে, জড় নহে, পরিচ্ছন্ন নহে, এইরূপ নিষেধমুখে (Negatively) গ্রহণ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

লক্ষণ হইয়া থাকে; গোত্ব গরুর, অশ্বত্ব অশ্বের লক্ষণ হয়। অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্মের কোনরূপ ধর্ম নাই, ব্রহ্ম সর্ববিধ ধর্মরহিত, সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ। এই অবস্থায় 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিকে অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলেন যে, ব্রহ্মে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-ধর্মিভাব না থাকিলেও, অবিদ্যা বশতঃ পরব্রহ্মেও কল্পিত ধর্ম-ধর্মিভাবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই কল্পিত ধর্মবলেই সত্যতা প্রভৃতিকে ব্রহ্মের লক্ষণ বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মের এই কল্পিত ধর্ম-ধর্মিভাব সমর্থন করিয়া, আচার্য পদ্মপাদ তাঁহার পঞ্চপাদিকায় বলিয়াছেন যে, "আনন্দ, বিষয়ানুভব ও নিত্যত্ব, চৈতন্যের এই সকল ধর্ম আছে। উহারা বস্তুতঃ চৈতন্য হইতে পৃথক্ না হইলেও পৃথকের মতই প্রতীয়মান হইয়া থাকে"।[১] ব্রহ্মের এই কল্পিত ধর্মগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই স্বরূপ এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সত্য, জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতির অভেদ লক্ষ্য করিয়াই সর্বজ্ঞাত্মমুনি তাঁহার 'সংক্ষেপ শারীরক' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, সত্যেও জ্ঞান আছে, জ্ঞানেও সত্যতা আছে; আনন্দেও জ্ঞান আছে, জ্ঞানেও আনন্দ আছে; আনন্দেও সত্যতা আছে, সত্যতায়ও আনন্দ আছে। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ, ইহাদের পরস্পর কিছুমাত্রও ভেদ নাই। ইহারা বস্তুতঃ অভিন্ন তত্ত্ব[২]। সত্য যদি জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ হইত, তবে স্পষ্টই বুঝা যাইত যে, সত্য জ্ঞান নহে, কিন্তু জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয়। যাহা জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়, তাহা কদাচ সত্য হইতে পারে না। জ্ঞেয় বিশ্বপ্রপঞ্চ সত্য নহে, মিথ্যা। সত্য জ্ঞানের বিষয় হইলে, সত্যও সত্য হইতে পারে না, মিথ্যাই হইয়া পড়ে। যাহা সত্য তাহা কখনও মিথ্যা হয় না সুতরাং সত্য জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, অভিন্ন। জ্ঞান যদি সত্য হইতে ভিন্ন হয়, তবে জ্ঞানও অসত্য বা মিথ্যাই হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞান মিথ্যা হইলে, তাহাকে বিশ্বের আলোক জ্ঞান বলা যায়

১। (ক) আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বঞ্চেতি ধর্মাঃ।
অপৃথক্‌ত্বেঽপি চৈতন্যাৎপৃথগিবাবভাসন্তে॥
পদ্মপাদকৃত পঞ্চপাদিকা, অধ্যাস নিরূপণ, ৪ পৃঃ কাশী সং;

(খ) অদ্বৈতসিদ্ধি ৬৭৭ পৃষ্ঠা, নির্ণয় সাগর সং;

২। সত্যেঽপ্যস্তি জ্ঞানতা জ্ঞানতায়াং সত্যত্বংচ স্পষ্টমন্যোন্যেব তদ্বৎ।
সত্যপ্যেবং নাতিরেকাবকাশঃ পূর্ণে তত্ত্বে জ্ঞানসত্যোপপত্তেঃ॥

কিরূপে ? অতএব জ্ঞানও সত্য হইতে ভিন্ন নহে। আনন্দ জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলে, তাহা অবশ্যই জ্ঞেয়ই হইবে, জ্ঞেয় হইলেই মিথ্যা হইবে। মিথ্যা আনন্দে কাহারও অভিলাষ জন্মিতে পারে না। সকলেই আনন্দের সন্ধানে ব্যস্ত, ইহা হইতে আনন্দ যে জ্ঞান হইতে ভিন্ন তত্ত্ব নহে এবং মিথ্যা নহে, ইহাই সাব্যস্ত হয়। জ্ঞানেও আনন্দ আছে, জ্ঞানে আনন্দ না থাকিলে জ্ঞানের জন্য মানুষ বিবিধ দুঃখকে বরণ করিয়া জ্ঞানান্বেষণে ব্যাকুল হইত না। সুতরাং জ্ঞান ও আনন্দ যে অভিন্ন ইহাই বুঝা যায়। সত্য-জ্ঞান-আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ, এবং লক্ষণও বটে। এই সত্য-জ্ঞান-আনন্দই জগতের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়, এইজন্যই জাগতিক বস্তুতে সময় সময় খণ্ড সত্য, খণ্ড জ্ঞান ও আনন্দের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ব্রহ্মই সেই ভূমানন্দ এবং সার্বভৌম সত্য। এই রহস্যই 'সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম', 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের লক্ষণমুখে উক্ত হইয়াছে।

উপনিষদে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ এই দ্বিবিধভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।[১] এই দুইটি বিভাব আলোক অন্ধকারের মত পরস্পর বিরোধী। সুতরাং ইহার একটি সত্য হইলে, অপরটি মিথ্যা হইতে বাধ্য। দুইটি

আনন্দত্বে জ্ঞানতা জ্ঞানতায়ামানন্দত্বং বিদ্যতে নির্বিশঙ্কম্।
সত্যপ্যেবং নাতিরেকাবকাশঃ পূর্ণে তত্ত্বে জ্ঞানসৌখ্যোপপত্তেঃ॥
আনন্দত্বে সত্যতা সত্যতায়ামানন্দত্বং নির্বিবাদং প্রসিদ্ধম্।
সত্যপ্যেবং নাতিরেকাবকাশঃ পূর্ণেতত্ত্বে সত্যসৌখ্যোপপত্তেঃ॥

সংক্ষেপশারীরক, ১ম অঃ ১৮৬-১৮৮ শ্লোক।

১। ব্রহ্মসূত্র শংভাষ্য, ১।১।১১, ও ৩।২।১১, দ্রষ্টব্য

নির্বিশেষং পরংব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষ নিরূপণৈঃ॥

অদ্বৈতসিদ্ধির ৭২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বেদান্ত কল্পতরুর শ্লোক।

অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ।
তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্বমাশ্রয়েৎ॥

ভগবতী গীতা।

বশীকৃতে মনস্যেষাং সগুণব্রহ্মশীলনাৎ।
তদেবাবির্ভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধিকল্পনম্।

অদ্বৈতসিদ্ধির ৭২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বেদান্ত কল্পতরুর শ্লোক।

কখনই সমানভাবে সত্য হইতে পারে না। অদ্বৈতবেদান্তের মতে নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য ; ব্রহ্মের সগুণভাব মায়িক এবং অসত্য। স্থূলদর্শী সাধকের উপাসনার সুবিধার জন্য ব্রহ্মের সগুণ ভাবের কল্পনা করা হইয়া থাকে। যিনি স্বতঃ নির্গুণ, নির্বিশেষ, তিনিই মায়া উপাধি বশতঃ সগুণ, সবিশেষ হন। 'গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্মৃতঃ'। ভাগবত, ২৬।২৯। এই সগুণভাব তাঁহার লীলামাত্র। লীলাময় পরমেশ্বর প্রাণিগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া স্বেচ্ছানুরূপ মায়িক দেহ ধারণ করেন—'স্যাৎ পরমেশ্বর-স্যাপি ইচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং শরীরং সাধকানুগ্রহার্থম্। ব্রহ্মসূত্র শং ভাষ্য, ১।১।২০। দেহধারীর ন্যায় ভক্তের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হন (দেহবানিব লক্ষ্যতে)। ত্রিগুণময়ী জগজ্জননী মায়াকে বশীভূত করিয়াই জগতের সৃষ্টি লীলায় প্রবৃত্ত হন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য জগতের নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তিনি মায়াধীশ, তাঁহার উপর মায়ার কোন প্রভাব নাই। তিনি মায়া এবং মায়িক জীব ও জগতের সাক্ষীমাত্র[১]। অদ্বৈতবেদান্তের মতে সগুণব্রহ্মেরও একটা নির্দিষ্ট স্থান পাওয়া গেল।* বৈষ্ণববেদান্তী রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতির মতে ব্রহ্ম অনন্ত-গুণময়, তিনি কোনমতেই নির্গুণ নির্বিশেষ হইতে পারে না। 'নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্' প্রভৃতি শ্রুতি ব্রহ্মের গুণশূন্যতা বুঝায় না। ব্রহ্মে কোনরূপ নিকৃষ্ট গুণ বা নীচ ক্রিয়া নাই, ব্রহ্মে নিরতিশয় অসংখ্য কল্যাণগুণগণেরই সমাবেশ আছে, ইহাই বুঝায়। নির্‌শব্দের স্বাভাবিক নিষেধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া "নিকৃষ্ট" অর্থ গ্রহণ করায়, রামানুজ প্রভৃতি যে শব্দার্থের সহজবোধ্য রীতি পরিত্যাগ করিয়া

১। স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নঃ ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবোঽপি সন্ মায়য়া দেহবানিব লোকানুগ্রহং কুর্বন্নিবলক্ষ্যতে।

গীতা শং ভাষ্য উপক্রমণিকা।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ গীতা ৪।৬, ঐ শ্লোকের শং ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

*প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করিবেন, কেমন সুন্দরভাবে আচার্য শঙ্কর তাহার বেদান্তভাষ্যে সগুণ ব্রহ্মবাদ উপপাদন করিয়াছেন।

কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা সুধী অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন। তর্কের ভিত্তিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, নিগুর্ণকে বুঝিতে গেলেই প্রথমতঃ সগুণকে জানা প্রয়োজন হয়। যিনি ঘট জানেন না, এইরূপ ব্যক্তি ঘটের অভাব বুঝিতে পারেন না। অভাবের জ্ঞান তাহার প্রতিযোগীর (যাহার অভাব বুঝা যায়, তাহাকে অভাবের প্রতিযোগী বলে) জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। নিগুর্ণ বাক্যদ্বারা উপনিষদে ব্রহ্মে সর্ববিধ গুণের নিষেধ করা হইয়াছে। নিষেধের কোন রিষয় (নিষেধ্য) না থাকিলে, কাহার নিষেধ তাহা না বুঝাইলে, নিষেধের সেক্ষেত্রে কোনই অর্থ হয় না। সগুণ বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের যে-সকল গুণরাজি বর্ণিত হইয়াছে, নিগুর্ণ বাক্যে সেই সমুদয় গুণেরই নিষেধ সূচিত হইয়াছে। সগুণ বাক্য না থাকিলে, নিগুর্ণ বাক্যের অবতারণাই আদৌ অর্থহীন হয়। ব্রহ্মের গুণ-সম্পর্ক কল্পিত না হইলে, সত্য স্বাভাবিক গুণের নিষেধ কোনমতেই সম্ভবপর হয় না। সে-অবস্থায় গুণের নিষেধে গুণীরও নিষেধ হইয়া যায়। সগুণ বাক্যের প্রাধান্য দিলে, উপনিষদে যে অসংখ্য নিগুর্ণবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নির্বিষয় এবং অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে নিগুর্ণ বাক্যের প্রাধান্য স্বীকার করিলে, উপাসনা জগতে সগুণ ব্রহ্মবোধক বাক্যেরও নির্দিষ্ট স্থান পাওয়া যায়। সগুণ এবং নিগুর্ণ কোনরূপ উপনিষদের উক্তিই মিথ্যা এবং অপ্রমাণ হয় না।[১] এই অবস্থায় প্রথমতঃ সগুণ ব্রহ্মবাদ স্বীকার করিয়া লইয়া, চরমভূমিতে নিগুর্ণ নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধক বাক্যকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা

১। (ক) সগুণবাক্যানাম্ ঔপাধিকগুণবিষয়ত্বেন স্বাভাবিকনির্ধর্মকত্বশ্রুতের্নবিরোধঃ।
অদ্বৈতসিদ্ধি, ৭২১ পৃষ্ঠা।

(খ) নমু নির্গুণবাক্যং সগুণবাক্যং বাধতে, নতু সগুণবাক্যং তদিতি কিমত্র নিয়ামকম্? ন চ নিষেধকতয়া নির্গুণবাক্যং প্রবলম্, 'অসদ্বা' ইত্যাদিবাক্যস্য সদেব ইত্যাদিবাক্যাৎ প্রাবল্যাপত্তেরিতি চেন্ন, অপচ্ছেদন্যায়েন প্রাবল্যস্য প্রাগেবোক্তেঃ। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৭৩৪ পৃষ্ঠা। "অপচ্ছেদ" ন্যায়টি মীমাংসা দর্শনের একটি ন্যায়। অপচ্ছেদ শব্দের অর্থ বিরোধ বা ব্যাঘাত। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উক্তির মধ্যে অপচ্ছেদ বা বিরোধ ঘটিলে, পূর্বটি দুর্বল এবং পরবর্তী উক্তিটি সবল হইয়া থাকে। ব্যাকরণের 'পূর্বপরয়োঃ পরবিধির্বলবান্', 'সাবকাশনিরবকাশয়োর্নিরবকাশবিধির্বলবান্' প্রভৃতি পরিভাষা আলোচ্য অপচ্ছেদ ন্যায়ের মর্মই সূচনা করে। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম; (তৈত্তিরীয়, ২।১।১) নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্

সমধিক যুক্তিসঙ্গত নহে কি? ব্রহ্মের সগুণ ভাবই সত্য, নির্গুণভাব মিথ্যা, এইরূপ কল্পনা নিতান্তই অসঙ্গত। বৈদিক দ্বিবিধ উক্তির একটি (নির্গুণভাব) মিথ্যা হইলে, অপরটি (সগুণভাব) যে সত্য হইবে তাহাই বা কিরূপে বলা যায়?

ব্রহ্মের নির্গুণ এবং নির্বিশেষ স্বরূপ উপপাদন করা গেল। এখন নির্বিশেষ ব্রহ্মে কোন প্রমাণ নাই বলিয়া রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ, বলদেব প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যগণ যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা কতদূর সত্য পরীক্ষা করা আবশ্যক। আলোচ্য ব্রহ্ম-বিষয়ে প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে—'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' [ব্রঃ সূঃ ১।১।৩] এই সূত্রে বলিয়াছেন, বেদ,

নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রমাণ সিদ্ধ

(শ্বেতাশ্বতর ৬।১৯) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মের নির্বিশেষ ভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ, সত্যকামঃ, সত্যসংকল্পঃ, (ছান্দোগ্য ৩।১৪।২) দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা (প্রশ্ন, ৪।৯) প্রভৃতি শ্রুতি ব্রহ্মের সগুণভাব প্রকাশ করিতেছে। সগুণ এবং নির্গুণ পরস্পর বিরোধী। এই অবস্থায় কোন্ শ্রুতিবাক্য দুর্বল, কোন্টি প্রবল, কোন্টি প্রমাণ, কোন্টি অপ্রমাণ হইবে, তাহা বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ ব্রহ্মের গুণ বর্ণনা না করিলে, নির্গুণবাক্যে গুণের যে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার তো কোন অর্থ হয় না। গুণ থাকিলে তবেই তো উহার নিষেধ হইবে? গুণ না থাকিলে নিষেধ হইবে কাহার? নির্গুণ সুতরাং সগুণকে অপেক্ষা করে। এই অবস্থায় গুণসাপেক্ষ নির্গুণ বাক্য যে সগুণ বাক্য অপেক্ষা প্রবল, তাহাতে সন্দেহ কি? সেই প্রবল নির্গুণ বাক্যের দ্বারা সগুণবাক্যের বাধ হইবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। তারপর, ব্রহ্মের গুণবিধান সত্য হইলে, নির্গুণবাক্য সকল নির্বিষয় হইয়া পড়ে। ভেদ বোধক শাস্ত্র এবং অভেদবোধক শাস্ত্রের বিরোধের ক্ষেত্রেও এই একই নীতি প্রযোজ্য। অভেদ ভেদ সাপেক্ষ। ভেদ না জানিলে, ভেদের অভাব বা অভেদ জানিবার উপায় নাই। ভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্র সত্য হইলে, অভেদ-বোধক শাস্ত্র নির্বিষয় হইয়া অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। এইজন্য আলোচ্য ন্যায় অনুসারে গুণসাপেক্ষ নির্গুণ বাক্যের, ভেদ সাপেক্ষ অভেদ বাক্যের প্রামাণ্য মানিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত।

ব্রহ্মের নির্গুণ ও নির্বিশেষ স্বরূপ উপপাদনের জন্য মহামনীষী মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (অদ্বৈতসিদ্ধি ৩১৭—৩৫৫ পৃষ্ঠা, নির্ণয় সাগর সং;) ন্যায়ামৃত-রচয়িতা সগুণ ব্রহ্মবাদী মাধ্ব পণ্ডিত ব্যাসরাজের বিরুদ্ধে অতি গভীর যুক্তিজালের অবতারণা করিয়াছেন এবং মাধ্বোক্ত তর্কও যুক্তির অসারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসু পাঠককে ন্যায়ামৃত এবং অদ্বৈতসিদ্ধির ঐ সকল স্থল আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্রকেই ব্রহ্মবিষয়ে অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া জানিবে।[১] শ্রুতি অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্রহ্মকেই একমাত্র সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ তত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, বৃহদাঃ, ৩।৪।১। প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ প্রভৃতি লৌকিক কোন প্রমাণই নির্বিশেষ বস্তু প্রতিপাদন করে না, করিতে পারে না; সগুণ, সবিশেষ বস্তুই প্রতিপাদন করে। ব্রহ্মকে ব্রহ্মসূত্রে যে 'শাস্ত্রযোনি' বলা হইয়াছে, ঐ শাস্ত্রযোনি ব্রহ্ম নির্বিশেষ ব্রহ্ম নহে, সবিশেষ মায়াময় ব্রহ্ম[২]।

রামানুজ প্রভৃতির মতে নির্বিকল্প ও সবিকল্প জ্ঞানের স্বরূপ

বৈষ্ণববেদান্তী বলেন, নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিকল্পরহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না, হইতে পারে না। অবশ্য সকল প্রত্যক্ষেই সর্বপ্রকার বিকল্প প্রকাশ পায় না। এক জাতীয় বস্তুর প্রথমটির দর্শনেও বস্তুর বিশেষ আকৃতি-প্রকৃতির জ্ঞানোদয় হইয়াই বস্তুর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। গরুর প্রাথমিক প্রত্যক্ষ কালেও, গলকম্বল দেখিয়াই গরুকে গরু বলিয়া চেনা যায়। গলকম্বল (যাহাকে গরুমাত্রেরই অসাধারণ ধর্ম বা গোত্ব বলা হয়) চিহ্ন যে সকল গো-প্রাণীরই আছে, তাহা একটিমাত্র গরু দেখিয়া জানিবার উপায় নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয় গরু দেখিলে, সেই গরুরও গলকম্বল দেখিয়া, এই সকলই যে এক গোজাতীয় পশু, এই জাতীয়তা বোধের উদয় হয়। এই অবস্থায় গরুর প্রথমটির প্রত্যক্ষকে নির্বিকল্পক এবং পরবর্তী গরুর প্রত্যক্ষকে সবিকল্পক বলিয়া রামানুজ, মাধব প্রভৃতি বৈষ্ণব বেদান্তিগণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।[৩] এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, রামানুজ

১। ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্য ব্রহ্মণো যথাবৎ স্বরূপাধিগমে। ব্রঃ সূঃ ১।১।৩।

২। অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তে জগজ্জন্মাদি যেমন ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ, 'শাস্ত্রযোনি' রূপে ব্রহ্মের যে বর্ণনা, তাহাও ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণই বটে। ঐরূপ লক্ষণ যে নির্বিশেষ পরব্রহ্মের বোধক স্বরূপ লক্ষণ হইবে না তাহাতে সন্দেহ কি? আলোচ্য দুই সূত্রে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বর্ণনা করিয়া, 'তত্তু সমন্বয়াৎ।' ব্রঃ সূঃ ১।১।৪। এই চতুর্থ সূত্রে উপনিষদুক্তি সমূহের অদ্বিতীয়, অখণ্ড, নির্বিশেষ ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন করতঃ তন্মূলে পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

৩। নির্বিকল্পকং নাম কেনচিদ্ বিশেষেণ বিযুক্তস্য গ্রহণং ন সর্ববিশেষ রহিতস্য,…… নির্বিকল্পকমেকজাতীয়দ্রব্যেষু প্রথমপিণ্ডগ্রহণম্, দ্বিতীয়াদিপিণ্ডগ্রহণং সবিকল্পকমিত্যুচ্যতে। শ্রীভাষ্য, ৭৩ পৃষ্ঠা নির্ণয় সাগর সং।

প্রভৃতির দৃষ্টি স্থূল বস্তুর ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐরূপ স্থূল প্রত্যক্ষের অন্তরালে যে নির্বিশেষ বোধ লুক্কায়িত আছে, তাহা রামানুজ প্রভৃতির দৃষ্টিতে ভাসে নাই। গোত্ববিশিষ্ট গোর যে প্রত্যক্ষ, তাহা স্থূল বাহ্য প্রত্যক্ষ। বিশিষ্ট বুদ্ধিমাত্রই বিশেষণ, বিশেষ্য এবং বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে অবস্থিত সম্বন্ধ, এই ত্রয়ীকে লইয়াই উৎপন্ন হয়। দণ্ডধারী পুরুষকে দেখিয়া "দণ্ডীপুরুষঃ" এইরূপে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানোদয় হয়, তাহা বিশ্লেষণ করিলে সুধীদর্শক দেখিতে পাইবেন যে, বিশেষণ দণ্ড, বিশেষ্য পুরুষ এবং দণ্ড ও পুরুষের সম্বন্ধ, এই তিনটিকে একত্রিত করিয়া "দণ্ডধারী পুরুষ" এইরূপ বিশেষ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। দণ্ডকে না চিনিলে দণ্ডধারীকে চেনা যায় না। দণ্ড এবং দণ্ডীর সম্বন্ধবোধও ঐরূপ প্রত্যক্ষের তৃতীয় আর একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সংযোগ সম্বন্ধই এখানে স্বতন্ত্র দণ্ড এবং পুরুষের মধ্যে যোগ স্থাপন করিয়াছে এবং "দণ্ডী পুরুষ" এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ উৎপাদন করিয়াছে। আলোচ্য বিশিষ্টবুদ্ধির উদয়ের পূর্বে বিশেষবুদ্ধির অঙ্গ হিসাবে উক্ত ত্রয়ীর স্বতন্ত্র বোধ যে অত্যাবশ্যক, তাহা সূক্ষ্মধী তার্কিক অস্বীকার করিতে পারেন না। 'দণ্ডী পুরুষ' এইরূপ বুদ্ধির ন্যায় গোত্ববিশিষ্ট গোর প্রত্যক্ষও গোর বিশেষধর্ম গোত্ব, গো, গোত্ব এবং গোর সম্বন্ধ, এই তিনের স্বতন্ত্র ভাবে জ্ঞান ব্যতীত জন্মিতে পারে না। উহাদের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান নিঃসম্বন্ধ বোধ। গোর ধর্ম গোত্ব এবং গো, এই দুইটিকে পৃথক্‌ভাবে জানিলে, তবেই তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধবোধের স্ফুরণ হয়। ঐ গোত্ব এবং গোর জ্ঞান যে, নিঃসম্বন্ধ নির্বিকল্প জ্ঞান, তাহা ন্যায়-বৈশেষিকও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং সেই নির্বিকল্প জ্ঞানকে— 'প্রকারতাদিশূন্যং হি সম্বন্ধানবগাহিতৎ'। ভাষাপরিচ্ছেদ, ১৩৬ কারিকা; এইরূপ লক্ষণ নির্বাচন করিয়াও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য ন্যায়-বৈশেষিক পণ্ডিতগণ ঐ নির্বিকল্পজ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন নাই—জ্ঞানং যন্নির্বিকল্পাখ্যং তদতীন্দ্রিয়মিষ্যতে॥ ভাষাপরিচ্ছেদ, ৩৮ কাঃ। ইহার কারণ এই যে, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে আত্মা, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, এই চারটির ক্রমসংযোগের ফলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 'ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্' ইহাই ন্যায়োক্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণ। এই লক্ষণ অনুসারে যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না,

এরূপ সর্বপ্রকার সম্বন্ধরহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। নিঃসম্বন্ধ নির্বিকল্পক জ্ঞানও সুতরাং ন্যায়মতে প্রত্যক্ষগম্য হইতে পারে না। অদ্বৈতবেদান্তী বেদান্তবেদ্য তুরীয় স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্মকে সর্বদা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম" বৃহদাঃ ৩।৪।১ এই শ্রুতিবাক্যে "সাক্ষাৎ" এবং "অপরোক্ষ" এই দুইটি তুল্যার্থ শব্দের প্রয়োগ করিয়া ব্রহ্মই যে একমাত্র অপরোক্ষ তত্ত্ব, ইহাই শ্রুতি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। স্বপ্রকাশ, স্বতঃপ্রমাণ ব্রহ্মই জগতের আশ্রয়। সেই সদাভাস্বর অধিষ্ঠান-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে বলিয়া বিশ্বপ্রপঞ্চও প্রত্যক্ষগম্য হইয়া থাকে।[১] বিশ্বের তাবদ্‌বস্তুই ব্রহ্মালোকেই আলোকিত, ব্রহ্মসত্তায়ই সত্তাবান্। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত বলিয়া পারমার্থিক সত্যতা না থাকিলেও, জাগতিক বস্তুর ব্যাবহারিক সত্যতা অস্বীকার করা চলে না। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে অধ্যস্ত জগতের ব্যাবহারিক সত্যতা আছে বলিয়াই, অদ্বৈতবেদান্তের মতে ব্যাবহারিক জীবন অচল হয়না। জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতিরও মূল্য বুঝা যায় এবং কর্তা, কর্ম ক্রিয়া প্রভৃতি দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে কল্পিত বিধি ও নিষেধবোধক শাস্ত্ররাজিকেও নিষ্ফল বলা যায় না।[২] ঘটে যে সত্যতার উপলব্ধি হয়, তাহা অখণ্ড সত্য নহে, খণ্ড সত্য। 'ঘটোঽস্তি', 'ঘটঃ সন্' এইরূপ বোধে অস্তিত্ব বা সত্তা ঘটগত হইয়া প্রতিভাত হয়। ঘট এক্ষেত্রে অস্তিত্বের উপাধি (Limitation), সেই উপাধিবশে অখণ্ড সত্তা ঘটের সীমায় আবদ্ধ হইয়া, সসীম সখণ্ড হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঘট-জ্ঞান, গো-জ্ঞান, অশ্ব-জ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানস্থলে ও ঘট-গো-অশ্ব প্রভৃতি উপাধিনিবন্ধন জ্ঞান সসীম সখণ্ড হইয়া জ্ঞাতার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এই জ্ঞানের ঘট, গো, অশ্ব প্রভৃতি উপাধি। ঐ সকল উপাধি সরাইয়া লইলে, সত্যতা এবং

১। নির্বিকল্পকন্তু সংসর্গানবগাহি জ্ঞানম্। যথা সোঽয়ং দেবদত্তঃ, তত্ত্বমসি ইত্যাদিবাক্য-জন্যং জ্ঞানম্। ননু শাব্দমিদং জ্ঞানম্, ন প্রত্যক্ষম্, ইন্দ্রিয়াজন্যত্বাদিতি চেন্ন। নহীন্দ্রিয়জন্যত্বং প্রত্যক্ষত্বে তন্ত্রং দূষিতত্বাৎ কিন্তু যোগ্য বর্তমানবিষয়কত্বে সতি প্রমাণ চৈতন্যস্য বিষয় চৈতন্যাভিন্নত্বমিত্যুক্তম্।

বেদান্তপরিভাষা, প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ, ৩৪—৩৫ পৃঃ, রামকৃষ্ণ মিশন সং দ্রষ্টব্য।

২। তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্বে প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ। সর্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিনিষেধ মোক্ষপরাণি। ব্রহ্ম-সূত্র, শং ভাষ্য, ১।১।১

জ্ঞানের অখণ্ড পরিপূর্ণ স্বরূপই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের ফলে প্রকাশিত হয়। এইরূপ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই অদ্বৈতবেদান্তের মতে শুদ্ধ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ। যাঁহার চক্ষুঃ ফুটিয়াছে, জ্ঞান পরিপাক লাভ করিয়াছে, তিনি বিশ্বের তাবদ্ বস্তুর মধ্যেও নির্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্মকেই প্রত্যক্ষ করেন। "সর্বং ব্রহ্মময়ম্ জগৎ"— "ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমিও ব্রহ্ম, তুমিও ব্রহ্ম; জীব ও জগতের অন্তর্যামি সর্বব্যাপি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য। সেই সত্য শুদ্ধ ব্রহ্মকেই জানিতে চেষ্টা করিবে—"সত্যমেব বিজিজ্ঞাসস্ব," তবেই সকল জানার শেষ হইবে, অন্য কিছুই জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকিবে না। এইরূপে অদ্বৈত-বেদান্তে যে নির্বিশেষ নির্বিকল্প ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই বেদান্তোক্ত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার লক্ষ্য। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে নিখিল প্রপঞ্চের প্রত্যক্ষ সবিকল্প বা সবিশেষ প্রত্যক্ষ। রামানুজের দৃষ্টি সেই সবিকল্পক প্রত্যক্ষের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। এইজন্যই অদ্বৈতবেদান্ত-বেদ্য নিবিকল্পক, নির্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ তাঁহার স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। গুণের রাজ্য ছাড়িয়া রামানুজ গুণাতীতকে সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সাধনা অনন্তগুণময়ের সান্নিধ্য লাভ করিয়াই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। অদ্বৈতবেদান্তী এখানেই বিরত হন নাই। জ্ঞান-গিরির তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া নামরূপাত্মক জগতের মধ্যেও নামরূপের অতীত 'অশব্দমস্পর্শ-মরূপমব্যয়ম্' শুদ্ধ ব্রহ্মের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। নিজেকে অপার জ্ঞানসিন্ধুর বিন্দু জানিয়া, স্বীয় সত্তা এবং ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, সত্য-শিব-সুন্দররূপই প্রাপ্ত হইয়াছেন। গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতি তুরীয় ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ পরিচয় প্রদান করে। এইজন্যই জিজ্ঞাসু গুরু ও শাস্ত্রের সেবার ফলে চরম ও পরম বিদ্যা লাভ করে।

বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্রমূলে যে তুরীয় ভূমা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অপরোক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাকে অদ্বৈতবেদান্তের ভাষায় বলা হইয়াছে "অখণ্ডার্থবোধ"। 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাক্যের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে, ঐ সকল বাক্যমূলে যে শুদ্ধ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার উদিত হয়, তাহাকেই বলে অখণ্ডার্থবোধ বা অখণ্ডব্রহ্মবোধ। এই অখণ্ডার্থতা-বোধের

অদ্বৈতবেদান্তোক্ত অখণ্ডার্থ-বোধ কাহাকে বলে?

পরিচয় দিতে গিয়া অদ্বৈতবেদান্তী বলিয়াছেন, বাক্যের সংগঠক পদগুলির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞানোদয় না হইয়া, বাক্য হইতে সমষ্টিগতভাবে বাক্যের রহস্য হিসাবে যে যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই 'অখণ্ডার্থবোধ' বলিয়া জানিবে। প্রত্যয়ার্থপ্রভৃতির সহিত সম্বন্ধরহিত শব্দার্থের সুনির্দিষ্ট জ্ঞানই এই অখণ্ডার্থতা-বোধ। অপর কথায়, যে সকল শব্দ পর্যায়শব্দ নহে, এইরূপ শব্দসমষ্টি হইতে প্রতিটি শব্দের, শব্দার্থের এবং উহাদের অন্তরালবর্তী পরস্পর সম্বন্ধের জ্ঞানোদয় না হইয়া, অর্থাৎ খণ্ডবাক্যার্থের বোধ না হইয়া, সাঁমগ্রিকভাবে বাক্য হইতে যে নির্বিকল্পক জ্ঞানোদয় হয়, তাহাকেই বলে অখণ্ডার্থতা-বোধ বা অখণ্ডবোধ।[১]

অদ্বৈতবেদান্তোক্ত অখণ্ডার্থবোধের বিরুদ্ধে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য মাধবমুকুন্দ তাঁহার 'পরপক্ষগিরিবজ্রে' তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আলোচ্য অখণ্ডার্থবোধের কোনরূপ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। উল্লিখিত 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,' 'তত্ত্বমসি,' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি শ্রুত্যুক্ত মহাবাক্যের ব্যাখ্যায়, বাক্যান্তর্গত পদ ও পদার্থের জ্ঞানোদয় কেন হইবে না? তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। সামগ্রিকভাবে বাক্যার্থ বোধের সহায়ক অখণ্ডার্থত্বের লক্ষণ নির্বচনও সম্ভবপর নহে। প্রমাণমাত্রই সবিশেষ বস্তুরই বোধক হইয়া থাকে, নির্বিশেষের বোধক হয় না :—

প্রমাণমাত্রস্য সবিশেষ প্রমাজনন এব পর্যবসানাৎ।

পরপক্ষগিরিবজ্র, ২৯১ পৃঃ

যদি বল যে, 'সত্যং জ্ঞানম্' ইত্যাদি মহাবাক্য অখণ্ডার্থেরই বোধক হইবে, নির্বিশেষ পর ব্রহ্মকেই বুঝাইবে। নির্বিশেষ পরম ব্রহ্মের লক্ষণরূপেই

১। (ক) সংসর্গাসঙ্গি সম্যক্‌ধীহেতুতা যাগিরামিয়ম্।
উক্তাঽখণ্ডার্থতা যদ্বা তৎপ্রাতিপদিকার্থতা॥

চিৎসুখ, ১ম পরিঃ, ১০৯ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং।

(খ) অপর্যায়শব্দানাং সংসর্গাগোচরপ্রমিতিজনকত্বং বা তেষামেকপ্রাতিপাদিকার্থমাত্রপর্যবসায়িত্বং বা অখণ্ডার্থত্বম্। অদ্বৈতসিদ্ধি ৬৬৩ পৃষ্ঠা, নির্ণয় সাগর সং।

(গ) তদুক্তং কল্পতরুকৃদ্ভিঃ—
অবশি[illegible]শব্দপ্রকাশিতম্।
একং বেদান্তনিষ্ণাতা অখণ্ডংপ্রতিপেদিরে॥ অদ্বৈত সিদ্ধি, ৬৭৪ পৃষ্ঠা।

বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতিতে উহা আলোচিত হইয়াছে। অদ্বয় ব্রহ্মসম্পর্কে জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরেই অধ্যাত্মশাস্ত্রে বৈদিক মহাবাক্যসকল উক্ত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অবস্থায় জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন এবং উত্তরের রহস্য পর্যালোচনা করিলে, বেদান্তোক্ত মহাবাক্য যে অখণ্ডার্থেরই বোধক হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? অদ্বৈতোক্ত অখণ্ডার্থবোধ নিম্নে প্রদর্শিত অনুমানের সাহায্যেও উপপাদন করা যাইতে পারে ঃ—

তত্ত্বমসি প্রভৃতি বেদান্ত মহাবাক্য— (পক্ষ),

অখণ্ডার্থের অর্থাৎ এক অখণ্ড আত্মা বা ব্রহ্ম বোধেরই সহায়ক হইয়া থাকে।— (সাধ্য),

উপনিষদে জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন এবং উত্তর হইতে ইহাই বুঝা যায়।— (হেতু),

দৃষ্টান্তস্বরূপে—সোঽয়ং দেবদত্তঃ, প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্রঃ ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।[১]

উল্লিখিত অনুমানমূলে অখণ্ডার্থবোধ-সাধনের এই প্রয়াসকে 'দৃষ্টান্তাসিদ্ধি', 'সাধ্যাপ্রসিদ্ধি' প্রভৃতি বহুবিধ হেত্বাভাসদোষে কলুষিত এবং অপ্রমাণ বলিয়াই মাধবমুকুন্দ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানমাত্রই যখন সবিশেষ বস্তুর বোধক হইয়া থাকে, তখন 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ'; প্রকৃষ্ট-প্রকাশ শ্চন্দ্রঃ ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানও যে সখণ্ড এবং সবিশেষ বস্তুরই বোধক হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এইরূপ অবস্থায় অখণ্ডার্থতা-বোধের সাধক আলোচ্য অনুমানে 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' প্রমুখ (সবিশেষ) বাক্যকে দৃষ্টান্ত হিসাবে কোনমতেই উপস্থিত করা যায় না। প্রমাণমাত্রই সবিশেষ বস্তুর বোধক হইলে, প্রদর্শিত (অখণ্ডার্থত্বের) অনুমানে 'সাধ্যাপ্রসিদ্ধি'ও

১। (ক) তত্ত্বমস্যাদিবাক্যম্ অখণ্ডার্থনিষ্ঠম্ আত্মস্বরূপমাত্রনিষ্ঠং বা তন্মাত্র প্রশ্নোত্তরত্বাৎ সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যাদি বাক্যবৎ।

মাধবমুকুন্দ-কৃত পরপক্ষ গিরিবজ্র, ২৯১ পৃঃ, (পূর্বপক্ষ গ্রন্থ) বৃন্দাবন সং।

(খ) সত্যাদিবাক্যম্ অখণ্ডার্থনিষ্ঠং লক্ষণবাক্যত্বাৎ তন্মাত্রপ্রশ্নোত্তরত্বাদ্ বা প্রকৃষ্ট-প্রকাশশ্চন্দ্র ইতি বাক্যবৎ।

পরপক্ষ গিরিবজ্র, ২৯১ পৃঃ, (পূর্বপক্ষগ্রন্থ) বৃন্দাবন সং।

অবশ্যম্ভাবী।[১] আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, তত্ত্বমসি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে জ্ঞানত্বরূপ ধর্ম বিরাজ করায়, অনায়াসেই বলা যায় যে, প্রমাত্ব কখনও সর্বপ্রকার সম্বন্ধরহিত প্রমার জনক হয় না। কেননা, প্রমাত্ব জ্ঞানত্বের ব্যাপ্যধর্ম; ঐ জ্ঞানত্বরূপ ব্যাপক ধর্ম ব্যাপ্য প্রমা-জ্ঞানে অবশ্যই থাকিবে। অনুমান-জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন ব্যাপ্য ধর্মের সাহায্যে ব্যাপকের অনুমান হইয়া থাকে, ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধরহিত অনুমানের কল্পনাও করা যায় না; প্রমা-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও সেইরূপ প্রমাত্ব এবং জ্ঞানত্বের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব বা ধর্ম-ধর্মিভাব বিরাজ করায়, প্রমা সর্বদা সখণ্ডার্থ-বোধেরই সহায়ক হইবে, কদাচ অখণ্ডার্থবোধ জন্মাইবে না। ফলে, অদ্বৈতবাদীর আলোচ্য অনুমানে "সৎপ্রতিপক্ষ" হেত্বাভাস অনিবার্যরূপেই দেখা দিবে।[২] প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ যে সবিশেষ বস্তুরই বোধক হইয়া থাকে, তাহা আচার্য রামানুজ অতিস্পষ্ট ভাষায় তদীয় শ্রীভাষ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

অতো বস্তুসংস্থানরূপ জাত্যাদি লক্ষণ ভেদবিশিষ্ট বিষয়মেব প্রত্যক্ষম্।[৩]

শ্রীভাষ্য, ৭৮ পৃঃ;

এই অবস্থায় অদ্বৈতবেদান্তীর অখণ্ডার্থ-বোধের পরিকল্পনার কোনই মূল্য দেওয়া চলে না।

এইরূপে রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈষ্ণববেদান্তিগণ অদ্বৈত-বেদান্তের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উদ্‌ভাবন করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণমূলে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি জ্ঞান যে জাতি-গুণবিশিষ্ট বস্তুরই পরিচয় বহন করে,

১। (ক) তত্ত্বমস্যাদি বাক্যস্য সখণ্ডার্থপরত্বেন দৃষ্টান্তাসিদ্ধেঃ।

পরপক্ষ গিরিবজ্র, ২৯১ পৃঃ।

(খ) প্রমাণমাত্রস্য সবিশেষ ধীজনকত্বনিয়মেন সাধ্যাপ্রসিদ্ধেশ্চ।

পরপক্ষ গিরিবজ্র, ২৯২ পৃঃ।

২। প্রমাত্বং সংসর্গাগোচরপ্রমাবৃত্তি ন ভবতি জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্মত্বাৎ অনুমিত্যাদিবদিতি সৎপ্রতিপক্ষত্বাৎ। পরপক্ষ গিরিবজ্র, ২৯২ পৃঃ।

৩। অতঃ প্রত্যক্ষাদিদৃষ্ট বিষয়ত্বাদনুমানমপি সবিশেষ বিষয়মেব। প্রমাণসংখ্যা বিবাদেঽপি সর্বাভ্যুপগতপ্রমাণানাময়মেব বিষয় ইতি—ন কেনাপি প্রমাণেন নির্বিশেষ বস্তুসিদ্ধিঃ।

শ্রীভাষ্য, ৭৬ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং।

তাহা অস্বীকার করে কে? জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেয়, এই ত্রিপুটীমূলে উৎপন্ন লৌকিক প্রত্যক্ষকে কোন সুধী দার্শনিকই অস্বীকার করিতে পারেন না। গরুর প্রত্যক্ষে গোত্ববিশিষ্ট গরুরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এইজন্যই গরু আনিতে বলিলে, কেহই মহিষ বা ঘোড়া লইয়া আসে না। কেননা, মহিষে বা ঘোড়ায় তো আর গোত্ব নাই। গোত্বই তো গোর একমাত্র পরিচয়। এইরূপ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র কিন্তু বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সকল লৌকিক প্রত্যক্ষকে যদি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যায় যে, ইহার পূর্বস্তরে এমন একটি নির্বিকল্প অনুভূতি বিরাজ করে, যেখানে পরিদৃশ্যমান বস্তুর জাতি, গুণ প্রভৃতি কোনরূপ বিশেষ বিভাবই প্রকাশ পায় না। জ্ঞেয় বস্তুর নির্বিশেষ সত্তাই কেবল দৃষ্টির গোচর হয়। এই শ্রেণীর প্রত্যক্ষকে বলা হইয়া থাকে নির্বিশেষ, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ। তর্করহস্যবিদ্ নৈয়ায়িক তর্কের খাতিরেই এইরূপ নির্বিকল্প প্রত্যক্ষকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

বৈষ্ণব বেদান্তীর আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদীর বক্তব্য

যুক্তি হিসাবে নৈয়ায়িক বলেন, দণ্ডবিশিষ্ট দণ্ডী, গোত্ববিশিষ্ট গো প্রভৃতি বিশেষ অনুভূতি যেখানেই উদিত হয়, সেই সকল ক্ষেত্রেই বিচার করিলে দেখা যায় যে, বিশেষ ধর্মের (গোত্ব প্রভৃতির) জ্ঞানোদয় পূর্বে না হইয়া, বিশিষ্টবোধ (গোত্ব বিশিষ্ট গোবুদ্ধি) জন্মিতেই পারে না। বিশিষ্ট বুদ্ধির উদয়ে উহার পূর্বাঙ্গরূপে বিশেষ ধর্মের (গোত্ব প্রভৃতির) জ্ঞান এবং বিশেষ্য বা ধর্মীর (গো প্রাণীর) সহিত গোত্ব-ধর্মের সম্বন্ধের জ্ঞান অত্যাবশ্যক।[১] গোত্ব, গো এবং গোত্ব ও গোর (সমবায়) সম্বন্ধ, এই তিনের জ্ঞান পৃথক্‌ভাবে না থাকিলে, গোত্ববিশিষ্ট গোবুদ্ধি জন্মিবে কিরূপে? গোত্ব, গো এবং উহাদের সম্বন্ধের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান সবিকল্প বা সবিশেষ জ্ঞান নহে, উহা নির্বিকল্প এবং নির্বিশেষ জ্ঞান। ন্যায়-সিদ্ধান্তে এই নির্বিকল্প জ্ঞানের সত্যতা মানিয়া লওয়া হইয়াছে, এইরূপ জ্ঞানকে অস্বীকার করা হয় নাই। অদ্বৈতবেদান্তীর নির্বিকল্প-নির্বিশেষ জ্ঞানের

১। গুণ ক্রিয়াদি বিশিষ্টবুদ্ধিঃ বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধবিষয়া বিশিষ্টবুদ্ধিত্বাদ্ দণ্ডীপুরুষ ইতি বিশিষ্টবুদ্ধিবৎ।

ভাষাপরিচ্ছেদ-মুক্তাবলী—১১ কারিকা।

নির্বচন এবং বিশ্লেষণ ন্যায়-মতেরই অনুরূপ। তবে নৈয়ায়িক এই নির্বিকল্প, নির্বিশেষ জ্ঞানকে বলিয়াছেন অতীন্দ্রিয়; অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে ঐ জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ। ঐরূপ অপরোক্ষ নির্বিকল্প জ্ঞানই একমাত্র সত্য জ্ঞান। জাতি বিশিষ্ট ব্যক্তির, গুণবিশিষ্ট গুণীর জ্ঞান পরমার্থতঃ সত্য নহে। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতেই ঐ সকল সবিকল্প জ্ঞানকে সত্য বলা হইয়া থাকে। রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈষ্ণব দার্শনিকগণের দৃষ্টি জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, এই ত্রিপুটীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁহাদের সেই সীমাবদ্ধ দৃষ্টি জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের অতীত অসীম ভূমার বিজ্ঞানকে ধরিতে পারে নাই। ব্যাবহারিক জ্ঞানের পরপারেও যে জ্ঞানের আর একটা স্তর আছে; ভূমা রূপ আছে, তাহা বৈষ্ণব দার্শনিকগণের দৃষ্টিতে ভাসে নাই। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণ সেই জ্ঞানের রাজ্যে পৌঁছায় না। সতত জাগরক অখণ্ড অনুভূতিই সেই রাজ্যে বিরাজ করে। সেই ভূমা অনুভূতির বোধকেই অদ্বৈতবাদী অখণ্ডার্থ-বোধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রমাণ-প্রমাতা-প্রমেয় প্রভৃতি বিভাব অবিদ্যারই সৃষ্টি। মৃন্ময় রাজ্যেই তাহাদের স্থান। যেখানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় বিলুপ্ত, দ্রষ্টা—দৃশ্য একাকার, সেই মায়াতীত ভূমার রাজ্যে পৌঁছিলে, জ্ঞাতা আমিই বা কোথায়? জ্ঞেয় জগৎই বা কোথায়? যে-পর্যন্ত মায়ার শৃঙ্খল অটুট থাকিবে, সেই পর্যন্তই জ্ঞান ব্যবহারের ভূমিতে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের জালে নিবদ্ধ থাকিবে। মায়ার গ্রন্থি বিলুপ্ত হইলে, মায়িক জীব এবং জগদ্‌বিভাবও অন্তর্হিত হইবে। এক অখণ্ড চৈতন্যই বিরাজ করিবে। ইহাকেই অদ্বৈতবেদান্তের ভাষায় অখণ্ডার্থ-বোধ বলা হইয়াছে। এইরূপ বোধই অদ্বৈতবেদান্তীর ব্রহ্ম। ভূমা ব্রহ্মেরই নামান্তর। এই নির্বিশেষ ভূমার সহিত বৈষ্ণব দার্শনিকের পরিচয় ঘটে নাই। সুতরাং তাঁহারা যে অ[illegible] নির্বিশেষ অখণ্ড অনুভূতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের স্থান কোথায়?

এই অখণ্ড ব্রহ্ম-চৈতন্য এক, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ, অজ্ঞেয় এবং নিত্য। এইরূপ অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিতে গিয়া রামানুজ বলেন, অনুভূতি বা জ্ঞান কাহাকে বলে? যাহা নিজে বর্তমান থাকিয়া স্বকীয় সত্তার দ্বারাই স্বীয় আশ্রয় বা জ্ঞাতার নিকট প্রকাশিত হয়; নিজেকে জ্ঞাতার নিকট প্রকাশ করিবার জন্য অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা রাখে না এবং

যাহা জ্ঞাতার নিকট জ্ঞেয় বিষয়েরও অস্তিত্ব সাধন করে, তাহাকেই অনুভূতি বা জ্ঞান বলিয়া জানিবে।[১] রামানুজোক্ত এই জ্ঞানের লক্ষণটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞানোদয়ের ফলে জ্ঞাতা যখন কোন জ্ঞেয় ঘটাদি বিষয় জানিতে পারে, কেবল তখনই জ্ঞাতার কাছে জ্ঞেয় ঘটাদি বিষয়ের ন্যায় সেই ঘটাদি বিষয়ের ভাসক জ্ঞানটিও প্রকাশিত হয়। সকলের দৃষ্টিতেই যে জ্ঞানটি ধরা পড়ে তাহা নহে; সুতরাং সকলের পক্ষেই জ্ঞানকে সর্বদা স্বপ্রকাশও বলা যায় না। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞান জ্ঞাতার কাছেই স্বপ্রকাশ, অপরের কাছে নহে। ইহাই রামানুজের মতে স্বপ্রকাশত্বের রহস্য। রামের একখানি বই সম্পর্কে জ্ঞানোদয় হইল। এক্ষেত্রে জ্ঞান রামের নিকট বইখানিকে যে মুহূর্তে প্রকাশ করিল, সেই মুহূর্তেই জ্ঞান নিজেও রামের নিকট প্রকাশিত হইল। রামের জ্ঞান রামেরই বটে; রামের কাছেই উহা স্বপ্রকাশ, শ্যামের কাছে নহে। শ্যামের জ্ঞানও রামের কাছে স্বপ্রকাশ নহে। শ্যামের জ্ঞান শ্যামের কাছে যখন বিষয় প্রকাশ করে, তখন শ্যামের নিকটই সেই জ্ঞান আত্ম-প্রকাশ লাভ করে, রামের কাছে কিংবা অপর কাহারও কাছে তাহা প্রকাশিত হয় না। ব্যক্তিভেদে জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন। একের জ্ঞান অপরের অনুমানের বিষয় হয়। অধ্যাপকের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া সুধী শিষ্যকে আচার্যের গভীর পাণ্ডিত্য অনুমান করিয়া, সেই অধ্যাপকের পদপ্রান্তে বসিয়া শাস্ত্র-অধ্যয়নে যত্নশীল হইতে দেখা যায়। পূর্বতন অনুভবকেও লোকে 'আমি জানিয়াছিলাম', "অহমজ্ঞাসিষম্" এইরূপে স্মরণ করিয়া থাকে (অর্থাৎ অতীত অনুভব ও বর্তমান কালীন স্মরণের বিষয় হয়), এই অবস্থায় জ্ঞান সর্বদা সকলের নিকটই স্বপ্রকাশ, অনুভূতি বা জ্ঞান হইলেই তাহা নিত্য স্বপ্রকাশই হইবে, এইরূপ অদ্বৈতবেদান্তোক্ত স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধান্ত কিরূপে গ্রহণ করা যায়?[২] এই আলোচনা হইতে আর একটা কথাও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, অনুভূতি অনুভাব্য বা জ্ঞেয় হইলেই যে সে অনুভূতি হইবে না, অননুভূতি হইবে, অদ্বৈতবেদান্তীর এইরূপ কথারও কোনই মূল্য দেওয়া যায় না।

রামানুজ কর্তৃক অনুভূতির স্বপ্রকাশত্ব, একত্ব, নিত্যত্ব ও অজ্ঞেয়ত্ব খণ্ডন

১। অনুভূতিত্বং নাম বর্তমানদশায়াং স্বসত্তয়ৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বম্, স্বসত্তয়ৈব স্ববিষয়সাধনত্বং বা। শ্রীভাষ্য, ৮৪ পৃষ্ঠা নির্ণয়সাগর সং।

২। শ্রীভাষ্য, ৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং।

একের অনুভূতি অপরের অনুভবের বিষয় হয়, শিক্ষকের শাস্ত্রজ্ঞান তীক্ষ্ণধী ছাত্রের জ্ঞানের গোচর হয়, শৈশবের কত অনুভব পরবর্তী জীবনে মানুষের স্মরণের (স্মৃতি-জ্ঞানের) ভাণ্ডার পূর্ণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোন জ্ঞানের বিষয় হইলেই, অনুভূতি আর অনুভূতি থাকিবে না। অনুভূতি সেখানে জড় বস্তুর ন্যায় অননুভূতি (বা জড়) হইয়া যাইবে। অনুভূতেরজড়ায়া অর্থবজ্জড়ত্বমাপদ্যেত। শ্রীভাষ্য, ৬২ পৃষ্ঠা নির্ণয়সাগর সং। ইহা কিরূপে মানিয়া লওয়া যায়? অনুভূতি অনুভাব্য বা জ্ঞেয় হইলেও, অনুভূতির যখন নিজেকে এবং নিজের প্রকাশিত বিষয়কে জ্ঞাতার কাছে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণই থাকে, তখন অনুভূতিকে অনুভূতি না বলার, ঘট প্রভৃতির ন্যায় অননুভূতি বলার অদ্বৈতবাদীর কি যুক্তি থাকিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ ঘট প্রভৃতি জড় পদার্থ অনুভাব্য বা অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে বলিয়া যে ঘট প্রভৃতিকে অননুভূতি বা জড় বলা হইয়া থাকে তাহা নহে। ঘট প্রভৃতি জড় বস্তুর নিজেকে নিজের জ্ঞাতার নিকট প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্ব নাই। এইজন্যই জড় ঘট প্রভৃতিকে "অনুভূতি" বলা যায় না। অনুভূতি হইতে জ্ঞেয় ঘট প্রভৃতি পৃথক্ পদার্থ। একের জ্ঞান অপরের অনুভাব্য (অনুমেয়) হইলেও, সেক্ষেত্রেও জ্ঞানের নিজেকে এবং জ্ঞেয় বিষয়কে জ্ঞাতার নিকট প্রকাশ করিবার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া, ঐরূপ (অপরের অনুভবের বিষয়) জ্ঞানকেও "অনুভূতি" বলিতে কোন বাধা দেখা যায় না। অনুভূতির বিষয় বা অনুভাব্য হইলেই যে অনুভূতির অনুভূতিত্ব চলিয়া যাইবে, অর্থাৎ উহা অননুভূতি হইবে, আর অননুভাব্য (বা অজ্ঞেয়) হইলেই যে তাহা অনুভূতি হইবে, এরূপ যুক্তিরও কোন মূল্য নাই। আকাশ-কুসুম অত্যন্ত অসৎ পদার্থ। সুতরাং আকাশ-কুসুম কস্মিন্ কালেও অনুভাব্য হয় না, হইতে পারে না। কিন্তু তাহা বলিয়া কি কখনও আকাশ-কুসুমকে অনুভূতি বা জ্ঞানস্বরূপ বলা যায়? অনুভূতি অননুভাব্য হইলে (অপর কোন অনুভূতির বিষয় না হইলে), তাহা যে আকাশ-কুসুম প্রভৃতির ন্যায় অলীক হইবে না, তাহা অদ্বৈতবেদান্তীকে কে বলিল? যদি বল যে, আকাশ-কুসুম প্রভৃতি অলীক পদার্থ অজ্ঞানের বিরোধী হয় না, অলীক আকাশ-কুসুম প্রভৃতিও অজ্ঞানই বটে। এই কারণেই আকাশ-কুসুম প্রভৃতিকে "অনুভূতি" শ্রেণীভুক্ত

করা যাইতে পারে না। জ্ঞান সদাই অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে, এইজন্যই জ্ঞানকে পরমার্থ সত্য বলিয়া স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে। রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতির দৃষ্টি অনুসারে অনুভূতির অনুভাব্যত্ব স্বীকার করিলে, জ্ঞেয় ঘট প্রভৃতির ন্যায় অনুভূতিরও অজ্ঞানের সহিত একত্র অবস্থিতি সম্ভব হইতে পারে। সেরূপক্ষেত্রে জ্ঞানকে (অনুভূতিকে) আর জ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া চলে না! এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা (বৈষ্ণব-বৈদান্তীরা) বলিব যে, হ্যাঁ ঠিক কথা, কিন্তু তোমার অদ্বৈতবেদান্তের মতেও অনুভূতি অননুভাব্য বা অজ্ঞেয় হইলেও, অজ্ঞেয় বা অননুভাব্য আকাশ-কুসুম প্রভৃতি অসত্য বস্তুর ন্যায় অনুভূতিরও অজ্ঞানের সহিত একত্র অবস্থানে তো কোন বাধা দেখা যায় না। ফলে, তোমার (অদ্বৈতবেদান্তের) মতেও অজ্ঞানের সহিত বিরোধিতা না থাকায়, অনুভূতিকে অনুভূতির মর্যাদা দেওয়া চলিবে না। অদ্বৈতবাদীর মতে নিখিল বিশ্বই অজ্ঞানে কল্পিত। ঘট প্রভৃতি ব্যাবহারিক বস্তুও আকাশ-কুসুমের ন্যায় অজ্ঞানেই অবস্থিত। সেইজন্যই ঘট প্রভৃতি আর অনুভূতি হইতে পারে না। অজ্ঞানের সহিত একত্র অবস্থান করে বলিয়াই ঘট প্রভৃতি জড় বস্তুর "অনুভূতি" হইবার প্রশ্ন উঠে না। এই অবস্থায় অনুভবের বিষয় বা অনুভাব্য হইলেই যে অনুভূতি হইবে না, এইরূপ অদ্বৈতবাদীর মতকে কিরূপে সমীচীন বলিয়া নির্বিবাদে গ্রহণ করা যায়?[১]

অনুভূতির অননুভাব্যত্ব (অজ্ঞেয়ত্ব) এবং স্বপ্রকাশত্ব আলোচনা করা গেল। এখন অনুভূতির নিত্যত্ব সিদ্ধান্তের অনুকূলে অদ্বৈতবাদীর কি যুক্তি আছে, তাহা পরীক্ষা করা যাইতেছে। অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে অনুভূতি বা জ্ঞান বস্তুটি নিত্য, স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃ প্রমাণ। এইরূপ জ্ঞান ও আত্মা অভিন্ন পদার্থ।

অনুভূতির নিত্যত্ব খণ্ডন

নিত্য স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতির প্রাগভাব বা ধ্বংস কিছুই জানিবার উপায় নাই। কেননা, অনুভবের প্রাগভাব জানিতে হইলেও, অনুভব বা জ্ঞান সেখানে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। অনুভব ব্যতীত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। অনুভূতি ও তাহার প্রাগভাব একই কালে থাকিতে পারে না, কারণ, উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থের সমাবেশ

১। শ্রীভাষ্য, মহাসিদ্ধান্ত, ৮৪—৮৫ পৃষ্ঠা, নির্ণয় সাগর সং।

একই কালে হয় না, হইতে পারে না। এইরূপ যুক্তিবলেই অদ্বৈতবেদান্তী জ্ঞানের প্রাগভাব বা ধ্বংস অসম্ভব বিধায়, সংবিদ্ বা জ্ঞানের নিত্যতা সাধন করিয়াছেন। রামানুজ বলেন যে, জ্ঞানমাত্রই কালপরিচ্ছিন্ন এবং অনিত্য। ঘট প্রভৃতির প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বিষয় ঘট প্রভৃতি যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই তাহা সত্য। প্রত্যক্ষের সাহায্যে ঘট প্রভৃতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলেও, ঘট প্রভৃতির বর্তমানকালীন (সাময়িক) অস্তিত্বই বুঝা যায়; সর্বকালীন অস্তিত্ব বুঝা যায় না। এইজন্যই উৎপত্তির পূর্বে এবং ধ্বংসের পর আর ঘট প্রভৃতির কোন সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, জ্ঞান অনিত্য এবং কালপরিচ্ছিন্ন। সেইজন্য প্রত্যক্ষগম্য ঘটপ্রভৃতি পদার্থও সাময়িক ভাবেই প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। জ্ঞান নিজে যদি কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ না হইত, তবে জ্ঞানের বিষয় ঘট প্রভৃতিও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া প্রতীতি গোচর হইত না। জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞেয় পদার্থও নিত্যই হইত। জ্ঞেয় বস্তু যে নিত্য নহে, অনিত্য তাহা তো প্রত্যক্ষ-সিদ্ধই বটে, সুতরাং জ্ঞানও যে নিত্য নহে, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। জ্ঞানের বিষয়ই জ্ঞানকে রূপ দিয়া থাকে। জ্ঞান ও তাহার বিষয় ঘট-প্রভৃতি যে তুল্যরূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? সংবিদনুরূপস্বরূপত্বাদ্ বিষয়াণাম্। শ্রীভাষ্য, ৮৭ পৃষ্ঠা। সর্বপ্রকার বিষয়-সম্পর্ক-রহিত (নির্বিষয়) যে কোন অনুভূতি আছে বা থাকিতে পারে, তাহা কল্পনাও করা যায় না। কেননা, সর্ববিধ বিষয়রহিত সংবিদ্ যে আছে, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। যদি বল যে, সংবিৎ স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ সুতরাং তাহার (স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের) আর প্রমাণের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে রামানুজ বলেন যে, জ্ঞান জ্ঞাতার নিকট জ্ঞেয় বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাই জ্ঞানের স্বভাব। জ্ঞানের এইরূপ স্বভাব না থাকিলে, জ্ঞানকে সেক্ষেত্রে "জ্ঞান"ই বলা চলে না, স্বতঃসিদ্ধও বলা যায় না। জ্ঞান জ্ঞাতার কাছে যখন বিষয় প্রকাশ করে, তখন জ্ঞান নিজেকেও সেই জ্ঞাতার নিকট প্রকাশিত করে বলিয়াই জ্ঞানকে (রামানুজের মতে) স্বপ্রকাশ বা স্বতঃসিদ্ধ বলা হইয়াছে, ইহা আমরা ইতঃপূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। বিদ্যমান বস্তু সম্পর্কেই যে কেবল জ্ঞানোদয় হয় এমন নহে; অতীত এবং ভবিষ্যদ্ বস্তু সম্পর্কেও সকলেরই

জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অনুভূতি বর্তমান থাকা কালে সেই অনুভূতির "প্রাগভাব" অবশ্য থাকিতে পারে না। কেননা, একই বস্তুর ভাব ও অভাব পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। ইহাদের একত্র অবস্থিতি কোনমতেই সম্ভবপর নহে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু পরবর্তী অনুভবের সাহায্যে পূর্বতন (অর্থাৎ অতীতকালীন) জ্ঞানের প্রাগভাবের বোধ হইতে বাধা কি? অনুভূতি যে কেবল বর্তমান বিষয়কেই গ্রহণ করিবে এমন কথা কে বলিল? তাহা হইলে অতীত এবং ভবিষ্যদ্ বস্তুসম্পর্কে তো কখনও কোনরূপ জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। অতীত এবং অনাগত জ্ঞেয় ঘটপ্রমুখ বস্তুর যেমন জ্ঞানোদয় হয়, সেইরূপ পরবর্তী জ্ঞানের সাহায্যে পূর্বতন জ্ঞানের প্রাগভাবের বা ধ্বংসের জ্ঞানোদয় হইতে আপত্তি কি? এই অবস্থায় স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতির প্রাগভাব নাই, তাহার উৎপত্তিও সুতরাং নাই, অনুভূতি উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত এবং নিত্য ইহা কিরূপে বলা যায়?

অনুভূতির জন্মও নাই, বিনাশও নাই, সুতরাং অনুভূতি নিত্য তো বটেই, অধিকন্তু অনুভূতির কোনরূপ ভেদও নাই। ইহা এক এবং অখণ্ড।

অনুভূতির একত্ব খণ্ডন

এইরূপে অদ্বৈতবেদান্তী অনুভূতির যে একত্ব সমর্থন করিয়া থাকেন তাহাও যুক্তিসহ নহে। কারণ, অজ বা জন্মরহিত আত্মার দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে এবং অনাদি অবিদ্যার শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে যে ভেদ আছে, তাহা অদ্বৈতবাদীও অস্বীকার করিতে পারেন না। অনাদি অবিদ্যা এবং শুদ্ধ ব্রহ্মের ভেদ যদি নাই থাকে, তবে অবিদ্যা এবং শুদ্ধ ব্রহ্ম বা আত্মা একই তত্ত্ব হইয়া পড়ে। যদি বল যে, সেই ভেদ মিথ্যা, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, সত্য ভেদ তুমি (অদ্বৈতবাদী) কোথায়ও দেখিয়াছ কি? যদি দেখিয়া থাক, তবে তোমার সেই দেখা দ্বারাই অদ্বৈতবাদ কথার কথা হইয়া দাঁড়াইবে। যাহার জন্ম আছে তাহারই শুধু বিভাগ হইবে। যাহার জন্ম নাই তাহার বিভাগ হইবে না। অজ অনুভূতিরও সুতরাং বিভাগ হইবে না। অদ্বৈতবাদীর এইরূপ কল্পনার মূল কি? যদি বল যে, জন্য ঘট প্রভৃতি বস্তুরই ভেদ বা বিভাগ সর্বদা প্রত্যক্ষ গোচর হয়। অজ বা নিত্য বস্তুর ভেদ দেখা যায় না, সুতরাং জন্মরহিত অনুভূতিরও ভেদ কল্পনা করা চলে না। অনুভূতি বা জ্ঞান অখণ্ড, এইরূপ সিদ্ধান্তই স্বীকার্য। ইহার উত্তরে আমরা (রামানুজপন্থীরা) বলিব যে,

দৃশ্যের ভেদ থাকার দরুণ দর্শনেরও (জ্ঞানেরও) ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ফলে, অদ্বৈতবাদীর অনুভবের একত্ব সিদ্ধান্ত অচল হইয়া দাঁড়াইবে।[১] এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ব্যাবহারিক জ্ঞান-সম্পর্কে দৃশ্য ঘটপ্রমুখ বস্তুর ভেদ বশতঃ দর্শনের বা জ্ঞানের ভেদ অদ্বৈতবাদীও অস্বীকার করেন না। ঘট-জ্ঞান, পট-জ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন খণ্ড জ্ঞান অদ্বৈতবেদান্তীরও অভিপ্রেত। অদ্বৈতবেদান্তী চরম জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানকেই নিত্য অখণ্ড বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চরম অবস্থায় জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয় প্রভৃতি অবিদ্যা কল্পিত বিভাব তিরোহিত হইলে, জ্ঞান সেক্ষেত্রে নিত্য অখণ্ডই হইবে। রামানুজ এইরূপ অখণ্ড জ্ঞান স্বীকার করেন নাই। এই জন্যই তিনি জ্ঞানকে সখণ্ড বলিয়া বুঝিয়াই অদ্বৈতসম্মত অখণ্ড নিত্য জ্ঞানের সমালোচনা করিয়াছেন।

অদ্বৈতবেদান্তোক্ত সংবিদের নিত্যত্ব, একত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, অজ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতি সিদ্ধান্তের খণ্ডনে রামানুজের উল্লিখিত যুক্তিলহরী পরীক্ষা করিলে সুধী সমালোচক দেখিতে পাইবেন যে, সংবিদ্ বা জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে রামানুজ ও শঙ্কর মতের যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্যের দরুণই তাঁহাদের সিদ্ধান্তেও গুরুতর মতভেদের উদ্‌ভব হইয়াছে। আচার্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে জ্ঞানের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি জ্ঞান বলিয়া বৃত্তিজ্ঞানকেই বুঝিয়াছেন। জ্ঞান তাঁহার মতে জ্ঞাতার নিকট জ্ঞেয়বস্তুর পরিচিতি এবং ব্যবহার যোগ্যতা সম্পাদন করিয়া থাকে। অনুভূতি, অবগতি, সংবিৎ প্রভৃতি জ্ঞানেরই অপর নাম। এই জ্ঞান-ক্রিয়া সকর্মক। কোন একটি কর্মকে অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়কে অবলম্বন না করিয়া জ্ঞান থাকে না, থাকিতে পারে না। জ্ঞান জ্ঞাতারই গুণ বা ধর্ম বটে—অনুভবিতুরাত্মনো ধর্মবিশেষঃ। শ্রীভাষ্য, ৯১ পৃঃ। অহং জ্ঞানবান্, আমি ঘটকে জানিয়াছি, আমি এই বিষয়টি অবগত হইয়াছি, এইরূপে জ্ঞাতা আমি বা আত্মার গুণ হিসাবেই জ্ঞানকে লোকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। জ্ঞাতা আত্মার কাছে নিজেকে এবং জ্ঞেয় বিষয়কে প্রকাশ করে বলিয়াই জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলা হয়।[২] রামানুজ স্বামীর আলোচিত জ্ঞানের বিবৃতি

১। অবাধিতপ্রতিপত্তিসিদ্ধদৃশ্যভেদ সমর্থনেন দর্শনভেদোঽপি সমর্থিত এব। শ্রীভাষ্য, ৮৯ পৃষ্ঠা, নির্ণয় সাগর সং।

২। শ্রীভাষ্য, ৯১ পৃষ্ঠা, নির্ণয় সাগর সং।

পর্যালোচনা করিলে মনীষী পর্যবেক্ষক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, "জ্ঞান" বলিতে রামানুজ তাঁহার দর্শনে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই ত্রিপুটী লইয়া যেই ব্যাবহারিক জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেই জ্ঞানকেই বুঝিয়াছেন। জ্ঞান এক অখণ্ড নিরংশ ব্রহ্মবস্তু, জ্ঞানই আত্মা, এই অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে জ্ঞানরহস্য তিনি বিচার করেন নাই। আমরা পূর্বেই নির্বিকল্প এবং সবিকল্প জ্ঞানের ব্যাখ্যায় দেখাইয়া আসিয়াছি যে, জ্ঞান স্থূল দৃষ্টিতে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই ত্রয়ীকে লইয়া উদিত হইলেও, সেইরূপ জ্ঞানই জ্ঞানের চরম ও পরম স্তর নহে। নির্বিশেষ অখণ্ড ভূমা চৈতন্যই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। ইহাই ব্রহ্মবিজ্ঞান। এই জ্ঞানই আত্মা। আত্মা বস্তুতঃ জ্ঞাতা নহে, জ্ঞানস্বরূপ।

আত্মা জ্ঞাতা, না জ্ঞানস্বরূপ? রামানুজের মতে আত্মা জ্ঞাতা

আত্মা জ্ঞাতা, এই মতের সমর্থনে আচার্য রামানুজ বলেন যে, আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, জড় নহে। চৈতন্য আত্মার গুণও বটে—আত্মা চিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণ ইতি। শ্রীভাষ্য ৯৭ পৃষ্ঠা। চিৎ ও চৈতন্য তো একই বস্তু, তাহার আবার গুণ-গুণিভাব হইবে কিরূপে? দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া রামানুজস্বামী বলিয়াছেন, প্রভাকর যেমন নিজে তেজোময় অথচ প্রভা তাহার আশ্রিত ধর্ম, আত্মাও সেইরূপ চিন্ময় এবং চৈতন্য তাহার আশ্রিত ধর্ম বা গুণ। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে হয় যে, প্রভাকর যেমন প্রভাস্বরূপ হইলেও প্রভাকরের প্রভা স্বীয় আশ্রয় প্রভাকরকে ছাড়িয়া পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া পড়ে। কিরণমালার নিজেরও উজ্জ্বলতা আছে। সেই উজ্জ্বলতা দ্বারা প্রভা নিজেকে যেমন প্রকাশিত করে, সেইরূপ সৌর-কিরণ-স্নাত অপরাপর বস্তুকেও প্রকাশিত করিয়া থাকে। প্রভাকরের প্রভা সুতরাং তেজোময় দ্রব্যই বটে। শুক্লতা প্রভৃতির ন্যায় গুণপদার্থ নহে। কেননা, শুক্লতা প্রভৃতি গুণ নিজ আশ্রয় শুক্লদ্রব্যকে ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও কখনও থাকে না, শুক্লতা প্রভৃতি গুণের আর কোন গুণও নাই। সৌরকিরণ কিন্তু সূর্যকে ছাড়িয়াও অবস্থান করে, ধরাবক্ষে পতিত হইয়া বিশ্বের তাবদ্ বস্তুকে উদ্ভাসিত করে। এই অবস্থায় প্রভাকরের প্রভাকে শুক্লাদিগুণের ন্যায় গুণ বলা চলে না। সৌরপ্রভাকে ভাস্বর দ্রব্যই বলিতে হয়। সূর্যপ্রভা

তেজঃপদার্থ হইলেও সূর্য অস্ত গেলে, সৌরকিরণমালাও অস্তমিত হয়। প্রভা প্রভার উৎস সূর্যেরই অধীন। এই দৃষ্টিতেই প্রভাকে প্রভাকরের গুণ বলা হইয়া থাকে। এইরূপ আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইলেও, আত্মচৈতন্য যখন দৃশ্য বিষয়কে উদ্‌ভাসিত করে তখন বিষয়ভাসক জ্ঞান আত্মার গুণরূপেই প্রতিভাত হয়।[১] আত্মা স্বরূপতঃ নিত্যজ্ঞানাত্মক হইলেও, দৃশ্য-বিষয়ের প্রকাশক প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জন্য-জ্ঞানরূপে জ্ঞানকে অনিত্যও বলা যায়। এই অনিত্য জন্য জ্ঞানের সহিত নিত্য চৈতন্যের সম্বন্ধ রামানুজের স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই সম্বন্ধ ভেদ এবং অভেদ কিছুই হইতে পারে না বলিয়া, ইহাকে "ভেদাভেদস্বরূপ" বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। অত্যন্তভেদে কোনরূপ সম্বন্ধই হয় না; নিত্য এবং অনিত্য চৈতন্যের অভেদও কল্পনা করা যায় না। পরস্পর বিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদের একত্র সমাবেশও যুক্তিবিরুদ্ধ। এইরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত রামানুজ স্বীকার করিবেন কিরূপে? অযৌক্তিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয় বলিয়াই, আত্মার সম্পর্কে জৈন এবং কুমারিল ভট্টের মত যে গ্রহণযোগ্য

১। শ্রীভাষ্য, ৯৫ পৃষ্ঠা, নির্ণয় সাগর সং।
জ্ঞানকে আত্মার গুণ বলিতে রামানুজ এখানে ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত দ্রব্যাশ্রিত গুণকে বোঝেন নাই। গুণীভূত এই অর্থেই রামানুজ স্বামী গুণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন—সূর্য অস্ত গেলে সূর্যপ্রভাও বিলুপ্ত হয়। আত্মার বিকাশ না হইলে, আত্ম-চৈতন্য গুণেরও প্রকাশ হয় না। এই দৃষ্টিতেই সূর্যপ্রভা সূর্যের অধীন, আত্ম-চৈতন্য আত্মার অধীন। এই তাৎপর্যই এখানে গুণ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অস্যাস্ত গুণত্বব্যবহারো নিত্যতদাশ্রয়ত্ব তচ্ছেষত্ব-নিবন্ধনঃ। শ্রীভাষ্য ৯৫ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং।
রামানুজ চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াও, নৈয়ায়িকের ন্যায় আত্মাকে জড় বলিয়া স্বীকার করেন নাই। চিদ্রূপ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষেত্রে রামানুজের মতের স্বাতন্ত্র্য অবশ্য লক্ষণীয়। ন্যায়-মতে আত্মাকে চেতন বলা হইয়াছে। চেতন অর্থ চৈতন্যগুণবিশিষ্ট। চৈতন্যগুণের আশ্রয় বা আধার তো চৈতন্য হইবে না। গুণ গুণের আশ্রয় হয় না। দ্রব্যই গুণের আশ্রয় হয়। চৈতন্য গুণের আশ্রয় যে (চৈতন্য ভিন্ন) জড়বস্তু হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ন্যায়-মতে আত্মা শেষ পর্যন্ত জড়ই হইয়া দাঁড়ায়। নিত্যচৈতন্য-গুণ বশতঃই আত্মাকে ন্যায়-সিদ্ধান্তে চেতন বলা হইয়া থাকে।

নহে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। চৈতন্যস্বরূপ আত্মার জ্ঞানরূপে পরিণাম স্বীকার করায়, রামানুজ কুমারিল ও জৈনমতের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। সর্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য মধ্বের মুখে ভেদাভেদবাদী রামানুজকে জৈন-পদাঙ্কানুসারী বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। জীব ও জড়ের সহিত নিত্য চিদ্রূপ আত্মার অংশাংশিভাব প্রভৃতি কিছুই কল্পনা করা যায় না। ঐরূপ কল্পনার আশ্রয় লইতে গেলে আত্মাকে জৈন এবং কুমারিলের ন্যায় চিৎ ও জড়ের সমষ্টি বা "চিদচিদাত্মক" বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। আত্মাকে যে "চিদচিদাত্মক" বলা চলে না, ইহা আমরা আত্ম-সম্পর্কে কুমারিল ও জৈনমতের খণ্ডন প্রসঙ্গে প্রথম পরিচ্ছেদেই আলোচনা করিয়াছি। এই অবস্থায় আত্মাকে নিত্য-চিদ্রূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে নানারূপ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ব্রহ্মসূত্রের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া, "অহম্ জানামি", আমি জানিয়াছি, "অহমেবেদং পূর্বমপ্যন্বভবম্" আমিই ইহা পূর্বেও অনুভব করিয়াছিলাম, এইরূপ প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি মূলে আত্মাকে "জ্ঞাতা", "অনুভবিতা" বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিরাশ্রয়, নির্বিষয় অনুভূতিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন নাই।[১] —সংবিদাত্মেত্যুপ-লব্ধিপরাহতম্। শ্রীভাষ্য, ৯২ পৃষ্ঠা; অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে আত্মা দৃশি বা জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই আত্মার কোনরূপ দৃশ্য বা দর্শনযোগ্য ধর্ম নাই—নাস্যা দৃশের্দৃশিস্বরূপায়া দৃশ্যঃকশ্চিদ্‌ধর্মোঽস্তি; শ্রীভাষ্য ৮৯ পৃষ্ঠা। কোনরূপ দৃশ্য বা দর্শনযোগ্য ধর্ম নাই বলিয়াই, অনুভূতি দৃশ্য বা জ্ঞেয় ঘট প্রভৃতি বস্তু হইতে পৃথক্। পক্ষান্তরে, যাহা জ্ঞেয় বস্তু তাহাও জ্ঞান হইতে পৃথক্। দৃশ্য ঘট প্রভৃতি এবং তাহাদের সম্পর্কে উৎপন্ন জ্ঞান কখনই এক বা অভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং অনুভূতির কোনরূপ দৃশ্যধর্মই স্বীকার করা যাইতে পারে না। আলোচ্য অদ্বৈতবেদান্তের মতের খণ্ডনে রামানুজ বলেন যে, অদ্বৈতবাদী নিজেই অনুভূতিকে নিত্য, স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাহাদ্বারাই তাঁহার মতে অনুভূতি কি সধর্মক হইয়া পড়ে নাই? অনুভূতির কোনরূপ দৃশ্য-ধর্ম থাকিতে পারে না বলিয়া যে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা কি ব্যাহত হয় নাই? অদ্বৈতবেদান্তী

[১] শ্রীভাষ্য, ৯০-৯১ পৃষ্ঠা, নির্ণয় সাগর সং

অবশ্য অনুভূতিকে "নিত্য" বলিয়া নিষেধ মুখে (negatively) অনিত্য ঘট প্রভৃতি পদার্থ হইতে, "স্বয়ংপ্রকাশ" শব্দ দ্বারা জ্ঞানপ্রকাশ্য জড়বস্তু হইতে, অনুভূতির পার্থক্য ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ভাবরূপেই (Positively) বল, কিংবা অভাবমুখেই (negatively) বল, অনুভূতিকে নিত্য স্বপ্রকাশ বলায়, অনুভূতির নিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম সূচিত হয় নাই কি? তারপর, অনুভূতির যদি কোনরূপ ধর্ম-সম্পর্কই না থাকে, তবে অনুভূতির কোনরূপ ধর্ম নাই, (অনুভূতিনির্ধর্মক) এইরূপ ধর্মের নিষেধের তো সেক্ষেত্রে কোন অর্থই হয় না। আর এক কথা, সর্বপ্রকার ধর্মরহিত অনুভূতিকে প্রমাণসিদ্ধও বলা যাইবে না। প্রমাণসিদ্ধ না হইলে, অনুভূতি যে আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক নহে, তাহাই বা অদ্বৈতবাদীকে কে বলিল? জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-সম্পর্ক-রহিত জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণ করাই যে অসম্ভব, তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। "আমি ইহা জানিয়াছি" এইরূপেই লোকে জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। জ্ঞাতা আমি মিথ্যা হইলে এবং জ্ঞেয়-বিষয় না থাকিলে, "জানিয়াছি" এইরূপ জানার কোন অর্থ হয় কি? কে জানিয়াছে? কি জানিয়াছে? তাহা বলিলেই জ্ঞানের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়; নতুবা জ্ঞান হয় সম্পূর্ণ অর্থহীন। জ্ঞান এক জাতীয় মানসী ক্রিয়া। এই জ্ঞান-ক্রিয়া সকর্মক। জ্ঞানের একটি কর্ম বা জ্ঞেয় অবশ্যই থাকিবে। কোন স্বতন্ত্র জ্ঞাতাকে সেই জ্ঞেয় বস্তুর সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়াই, জ্ঞান জ্ঞানের মর্যাদা লাভ করে। জ্ঞান উৎপত্তি-বিনাশশীল। "জ্ঞানমুৎপন্নম্" "জ্ঞানং নষ্টম্" "জ্ঞাতুরেব মমেদং জ্ঞানং জাতম্" জ্ঞাতা আমি, আমার এইরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে। এই সেই জ্ঞান যাহা পূর্বেও আমার জন্মিয়াছিল; এইরূপ সহস্র সহস্র অনুভবের দ্বারা জ্ঞান যে অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং নিত্য নহে; জ্ঞাতা যে অপেক্ষাকৃত স্থির, ইহাই সাব্যস্ত হয় না কি? জ্ঞাতার মানস-সরোবরে এইরূপ ভঙ্গুর জ্ঞানের অগণিত লহরীর উদয়ও বিলয় কে না প্রত্যক্ষ করে? জ্ঞাতা আত্মা ও জ্ঞানের অভেদ কিরূপে মানিয়া লওয়া যায়? 'অহং জানামি', এইরূপ অনুভবের ফলে 'অহম্' পদার্থটি যে ধর্মী এবং জ্ঞান যে আত্মার ধর্ম, জ্ঞাতা আত্মা ও জ্ঞানের এই ধর্মি-ধর্মভাবই স্পষ্টতঃ প্রকাশিত হয়।

এইরূপ ধর্ম-ধর্মিভাব অদ্বৈতবেদান্তী বলেন মিথ্যা। 'অহং জানামি'

এই অহংবোধ অধ্যস্ত। যাহা জ্ঞান প্রকাশ্য, তাহা জ্ঞান হইতে অবশ্যই ভিন্ন এবং অনাত্মা। চিৎস্বরূপ আত্মাই একমাত্র আলোক, আত্ম-চৈতন্য ব্যতীত অপর সকল বস্তুই গাঢ় অন্ধকার তুল্য (তমঃ স্বভাব); আত্মচৈতন্য-প্রকাশ্য অহংপদার্থও সুতরাং তমঃস্বভাব এবং অনাত্মাই বটে। যাহা অনাত্মা তাহাই অদ্বৈতবেদান্তের ভাষায় "যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচর", মিথ্যাও অধ্যস্ত। অহংকারের সহিত চিদধ্যাসের ফলে উৎপন্ন জ্ঞাতা অহংপদার্থও সুতরাং যুষ্মৎশব্দগম্য এবং অনাত্মা।

এইরূপ অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রামানুজ বলেন, প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বিধায় অদ্বৈতবেদান্তীর উল্লিখিত যুক্তির কোন মূল্য দেওয়া চলে না। অস্মৎ শব্দে অহম্ বা আমিকে, যুষ্মৎ শব্দে ত্বম্ বা তুমিকে বুঝায়। তুমি ও আমি হয় না, আমি ও তুমি হয় না। ইহা "যুষ্মদস্মৎ-প্রত্যয়গোচরয়োঃ স্তমঃ-প্রকাশবদ্‌বিরুদ্ধ স্বভাবয়োঃ", এই উক্তিদ্বারা আচার্য শঙ্কর স্বীয় ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের প্রারম্ভেই স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়াছেন। এই অবস্থায় অহংকে ত্বম্‌এর ন্যায় অনাত্মা বলিতে যাওয়া কতদূর সঙ্গত সুধী পাঠক বিচার করিবেন। "অহং জানামি" "অহং জ্ঞানবান্" এইরূপে সকল লোকেরই অবাধিত বা সত্য প্রতীতির উদয় হইয়া থাকে। এই প্রতীতিকে ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও দেখা যায় না।

তারপর, অহংকার জড়বস্তু। তাহার সহিত শুদ্ধ চিৎ বা জ্ঞানের অধ্যাসই আদৌ সম্ভবপর কিনা, তাহাও বিচারসাপেক্ষ। অহংকার জড়বস্তু হইলেও জ্ঞানময় আত্মার নিকট অবস্থান করায়, অহংকারে চৈতন্যের ছায়া বা প্রতিবিম্ব পড়ে। এই কারণে জড়স্বভাব অহংকারেও মিথ্যা জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব সম্ভবপর হয়। এইরূপে অদ্বৈতবেদান্তী যে অহংকারে ভ্রান্ত জ্ঞাতৃত্বের উপপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য এই যে, "চিদ্ বা চৈতন্যের ছায়া পড়ে" এই কথার অর্থ কি? উহা কি চৈতন্যের উপরে অহংকারের ছায়া পড়ে? না, অহংকারের উপর চৈতন্যের ছায়া পড়ে? অহংকারে চৈতন্যের ছায়াপাতের ফলে অহংকারে মিথ্যা জ্ঞাতৃত্বের সৃষ্টি হয়, একথা বলা যায় না। কারণ, অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে চৈতন্যের নিজের যখন জ্ঞাতৃত্ব নাই, তখন অহংকারে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বা ছায়া পড়িলেও, অচেতন অহংকারে জ্ঞাতৃত্ব শক্তির উন্মেষ হইতে পারে

না। কেননা, যাহাতে যেই গুণ বা ধর্ম বস্তুতঃ নাই, সেইরূপ বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বশতঃ অপর বস্তুতেও সেই গুণ কোনমতেই জন্মিতে পারে না। পক্ষান্তরে, অহংকার জড়বস্তু। জ্ঞাতৃত্ব চেতনের ধর্ম, জড়ের ধর্ম নহে। অচেতন অহংকারের জ্ঞাতৃত্ব একেবারেই অসম্ভব কল্পনা। এরূপক্ষেত্রে অচেতন অহংকারের ছায়াপাতের ফলে চৈতন্যে জ্ঞাতৃত্বের সমুন্মেষ ব্যাখ্যা করা চলে কি? চৈতন্য এবং অহংকার এই দুইএর কাহারও রূপ নাই; সুতরাং ইহারা চক্ষুর গোচরও নহে।

যদি বল যে, সংবিদ্ এবং অহংকার, এই দুইএর কাহারও বস্তুতঃ জ্ঞাতৃত্ব নাই, ইহা খুব সত্যকথা। কিন্তু অহংকার স্বয়ং জড়বস্তু হইলেও, আলোক প্রকাশ্য জড় দর্পণ যেমন আলোকের অভিব্যক্তি ঘটায়, সেইরূপ চিৎপ্রকাশ্য জড় অহংকারও চৈতন্যের অভিব্যক্তি সাধন করে। যে-বস্তু যাহার অভিব্যক্তি সম্পাদন করে, সেই অভিব্যঙ্গ্য বস্তুকে (যেই বস্তুকে অভিব্যক্ত করে তাহাকে অভিব্যঙ্গ্য, আর যে অভিব্যক্ত করে তাহাকে অভিব্যঞ্জক বলে, দর্পণ মুখ প্রভৃতির অভিব্যঞ্জক, মুখ প্রভৃতি অভিব্যঙ্গ্য বলিয়া জানিবে) আত্মস্থ বা আত্মগত করিয়া লইয়াই অভিব্যঞ্জক পদার্থ অভিব্যঙ্গ্য বস্তুকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। ইহাই অভিব্যঞ্জক পদার্থের স্বভাব। দর্পণ দর্পণস্থ মুখেরই অভিব্যক্তি সাধন করে। এইরূপ আত্মস্থ বা আত্মগত করার ফলে, অভিব্যঞ্জক ও অভিব্যঙ্গ বস্তুর মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, একের গুণ বা ধর্ম অপরে সঞ্চারিত বা আরোপিত হয়। ইহাকেই অদ্বৈতবেদান্তের পরিভাষায় অধ্যাস বলা হয়। অহংকারের সহিত চিদধ্যাসের ফলে অহংকারে যে "অহমিকা" আছে তাহা চৈতন্যগত হইয়া প্রতিভাত হয় এবং কল্পিত জ্ঞাতৃত্বের সৃষ্টি করে। ইহাকেই বলে "চিত্তের অহংকারগ্রন্থি।" জ্ঞাতা শব্দের অর্থ জ্ঞানের কর্তা বা অনুভবিতা। অনুভূতি নিত্য, নির্বিশেষ, নির্বিকার, সর্বসাক্ষী এবং স্বয়ংজ্যোতিঃ। এইরূপ অনুভূতি নিজে নিজের কর্তা হইতে পারে না। অনুভূতির এই কর্তৃত্বকে বাস্তবও বলা যায় না। জ্ঞাতা বা জ্ঞানক্রিয়ার কর্তা হইলে অনুভূতিকে নিত্য বলিয়াও গ্রহণ করা চলে না। শরীর প্রভৃতি অনাত্ম পদার্থে আত্মাভিমানবশতঃ যেমন 'মনুষ্যোঽহম্' এইরূপ মিথ্যা আত্মবোধ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অহংকারের সহিত চিদধ্যাসের ফলে "অহং জানামি" এইরূপ মিথ্যা জ্ঞাতৃত্বের সৃষ্টি হয়।

অদ্বৈতবেদান্তীর উল্লিখিত যুক্তির খণ্ডনে রামানুজ স্বামী বলেন যে, অনুভূতি প্রকাশ্য জড় অহংকারকে যে অনুভূতির অভিব্যঞ্জক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাই তো অসম্ভব কথা। আত্মা চিৎস্বরূপ, নিত্য এবং স্বয়ংজ্যোতিঃ। জড় অহংকার এইরূপ স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মার অভিব্যঞ্জক হইবে কিরূপে? অহংকার আত্মার অভিব্যঞ্জক হইলে, আত্মাকে যে স্বয়ংজ্যোতিঃ বলা হইয়াছে তাহাই বা সঙ্গত হয় কিরূপে? তারপর, জড় অহংকার এবং অনুভূতি আলোক ও অন্ধকারের মত পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী পদার্থ। অন্ধকারকে যেমন আলোকের অভিব্যঞ্জক বলা যায় না, সেইরূপ জড় অহংকারকেও অনুভূতির অভিব্যঞ্জক বলা চলে না। অনুভূতি অহংকার-ব্যঙ্গ্য হইলে, অনুভূতিও ঘটপ্রভৃতির ন্যায় অনাত্মাই হইয়া পড়ে।[১]

সুষুপ্তি মূর্চ্ছা প্রভৃতিতে কিংবা মুক্তি অবস্থায় "অহংভাবের" অভাব ঘটিলেও, আত্মানুভূতি বর্তমান থাকে। ইহা হইতে আত্মা যে অহংপ্রত্যয়গম্য নহে, চিৎস্বরূপ ইহাই বুঝা যায়। আত্মাকে অহংপ্রত্যয়গম্য এবং কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিলে, দেহ প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধির ন্যায় আত্মার কর্তৃত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব-বোধও মিথ্যাই হইয়া পড়ে। এইরূপ অদ্বৈত সিদ্ধান্তের খণ্ডনে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণব বেদান্তিগণ বলেন, সুষুপ্তি অবস্থায় তমোগুণে অভিভূত হওয়ায় এবং কোনরূপ জ্ঞেয় বস্তুর প্রতীতি না থাকায়, "অহংভাবের" তখন সুস্পষ্ট বিকাশ দেখা যায় না সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া অহংভাব তখন থাকে না, এমন কথা বলা যায় না। কেননা, সুপ্তব্যক্তি জাগরিত হইয়া, 'সুখমহমস্বাপ্সম্' "আমি সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম" এইরূপ আমিত্বসংবলিত সুপ্তিসুখের স্মরণ করিয়া থাকে। নিদ্রিত হইবার পূর্বে সে যাহা যাহা জানিয়াছিল, বলিয়াছিল এবং করিয়াছিল, তাহা ঠিক ঠিক ভাবেই তাঁহার স্মৃতিতে ভাসে। ইহা হইতে সুষুপ্তিতে সুখ প্রভৃতির ন্যায় আমিত্বেরও যে স্ফূর্তি থাকে তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমি এতকাল অর্থাৎ আমার সুষুপ্তি সময়ে কিছুই

১। শান্তাঙ্গার ইবাদিত্যমহংকারো জড়াত্মকঃ।
স্বয়ংজ্যোতিষমাত্মানং ব্যনক্তীতি ন যুক্তিমৎ॥
ব্যঙ্‌ক্তৃব্যঙ্গ্যত্বমন্যোন্যং ন চ স্যাৎ প্রাতিকূল্যতঃ।
ব্যঙ্গ্যত্বেঽনমুভূতিত্বমাত্মনঃ স্যাদ্ যথা ঘটে॥

শ্রীভাষ্য ১০৩ পৃষ্ঠা, নির্ণয় সাগর সং।

জানিতে পারি নাই, "ন কিঞ্চিদহমবেদিষম্" এইরূপেও সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মরণের উদয় হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে "আমি কিছুই জানি নাই" বলায় জ্ঞাতা আমির অভাব বুঝায় না, জ্ঞেয় বস্তুর এবং জ্ঞেয় বস্তুসম্পর্কে উৎপন্ন জ্ঞানেরই অভাব বুঝায়। জ্ঞান ও আত্মা অভিন্ন হইলে, 'কিছুই জানি নাই', এইরূপে জ্ঞানের নিষেধ থাকায়, আত্মারও নিষেধ প্রকাশ পায়। জ্ঞানের অভাবে জ্ঞানময় আত্মার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে না সুতরাং অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্ত অনুসারে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ঐরূপ প্রতীতি ব্যাখ্যা করাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। আমি সুষুপ্তি অবস্থায় আমাকেও জানিতে পারি নাই—"মামপ্যহং ন জ্ঞাতবান্" সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির এইরূপেও জ্ঞানোদয় হইতে দেখা যায়। অহংপদার্থ আত্মা না হইলে, "জানি নাই" এইরূপ অনুভব করিবে কে? প্রশ্ন হইতে পারে যে, অহম্ বা আত্মা যদি বর্তমান থাকে, তবে আমাকে জানি নাই, 'ন মাম্' এইরূপে যে আত্মার নিষেধ করা হইয়াছে তাহার অর্থ কি দাঁড়ায়? কাহার নিষেধ করা হয়? এইরূপ আপত্তির প্রত্যুত্তরে রামানুজ প্রভৃতি বলেন যে, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়ও অহংভাব থাকে, তবে নিদ্রার আবরণে আবৃত থাকায়, সুষুপ্তি অবস্থায় অহংভাবের তখন সুস্পষ্ট প্রকাশ হয় না। অস্ফুট প্রকাশ হয় মাত্র। আমি কাহার পুত্র, কোন্ জাতি, কি গোত্র, আমার নাম ধাম কি? এই সকল পরিচয় জাগরিত অবস্থায় ভাসে। অহংভাবের তখন পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। সুষুপ্তি অবস্থায় জাগরিত অবস্থার বিশেষ পরিচয় থাকে না, ইহাই "মামহং ন জ্ঞাতবান্" এই কথার দ্বারা এখানে ধ্বনিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুষুপ্তি, স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থার অপরিস্ফুট আত্মবোধই অহম্ বা আমি এইরূপ প্রতীতির মর্ম বলিয়া জানিবে। জাগরিত অবস্থায় আমাকে আমি যেইরূপে দেখিতে পাই, সুষুপ্তি অবস্থায় সেইরূপে দেখিতে পাই না। "আমি আছি" এইমাত্র জানিতে পারি। সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার অস্পষ্ট অহং বোধের ইহাই রহস্য। সেই অবস্থায়ও অহংভাবের বিলোপ হয় না। আত্মা সর্বদা সকল অবস্থায়ই বিরাজ করে। এমন কি মুক্তিতেও এই অহংভাবের প্রকাশ ঘটে। ইহা হইতে 'অহম্'ই যে আত্মার স্বরূপ, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়। জ্ঞাতা বলিয়া পরিজ্ঞাত অহম্ পদার্থই যে আত্মা, তাহা অনুমানের সাহায্যেও উপপাদন করা যায়।

এই আত্মা সবসময় অহংরূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে (প্রতিজ্ঞা) —কারণ, আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ। এই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা নিজের প্রয়োজনেই (স্বীয় স্বার্থেই) নিজেকে প্রকাশিত করে, অপরের প্রয়োজনে (স্বার্থে) নহে (হেতু)। আত্মা ব্যতীত অপর সকল বস্তুর প্রকাশই আত্মার্থ অর্থাৎ আত্মার ভোগ, অপবর্গ সম্পাদনার্থই বটে, সুতরাং আত্ম-প্রকাশ্য ঘট প্রভৃতি অনাত্ম বস্তুর প্রকাশ নিজের জন্য নহে (স্বার্থে নহে), পরার্থে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় সম্মত সংসারী আত্মার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আত্মা যে সংসার দশায় "অহম্" আকারেই প্রকাশিত হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। (অন্বয় ব্যাপ্তি)

যাহা অহম্ আকারে প্রকাশিত হয় না, সেই সকল ঘট প্রভৃতি জড়বস্তু স্বার্থে প্রকাশমানও হয় না (ব্যতিরেক ব্যাপ্তি)।

মুক্তি বা সুষুপ্তি অবস্থায়ও আত্মা স্বয়ং প্রকাশমান থাকে (উপনয়)।

অতএব আত্মা সুষুপ্তি বা মুক্তি প্রভৃতি অবস্থায় "অহম্" আকারেই প্রকাশিত হয়। এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা বিধেয় (নিগমন)।[১]

ব্রহ্মদর্শী ঋষি বামদেব প্রভৃতির অপরোক্ষ আত্মানুভবও অহংরূপে আত্মদর্শনের সাক্ষ্য দেয়। "অহং মনুরভবং সূর্যশ্চ"। বৃহদাঃ ৩।৪।১০, গীতা, উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র, বেদান্তের বিভিন্ন প্রস্থানে কিংবা স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্রে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে যে অমূল্য উপদেশাবলী শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সকল স্থানে "জ্ঞাতা অহংরূপে"ই আত্মার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে দেখা যায়, ইহা হইতে অহম্ বা আমিই যে

১। অতোঽহমর্থস্যৈব জ্ঞাতৃতয়া সিধ্যতঃ প্রত্যগাত্মত্বম্। স প্রত্যগাত্মা মুক্তাবপি "অহম্" ইত্যেব প্রকাশতে, স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ। যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সর্বোঽহমিত্যেব প্রকাশতে, যথা তথাবভাসমানোভয়বাদিসম্মতঃ সংসারী আত্মা। যঃ পুনরহমিতি ন চকাস্তি, নাসৌ স্বস্মৈ প্রকাশতে—যথা ঘটাদিঃ, স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তাত্মা, স তস্মাৎ অহমিত্যেব প্রকাশতে।

শ্রীভাষ্য, ১০৯ পৃষ্ঠা, নির্ণয় সাগর সং।

আত্মার স্বরূপ, সেবিষয়ে সন্দেহের লেশও থাকিতে পারে না।[১] "অতোঽহমর্থো জ্ঞাতৈব প্রত্যগাত্মেতি নিশ্চিতম্"। শ্রীভাষ্য, ৯৪ পৃষ্ঠা, অতঃ স্বপ্রকাশোঽয়মাত্মা ন প্রকাশমাত্রম্। শ্রীভাষ্য, ৯৮ পৃষ্ঠা, অতো ন জ্ঞপ্তিমাত্রমাত্মা, অপি তু জ্ঞাতৈবাহমর্থঃ। শ্রীভাষ্য, ৯৯ পৃষ্ঠা, এইরূপ রামানুজস্বামীর মতই শিরোধার্য।

আত্মসম্পর্কে রামানুজের ঐ সিদ্ধান্ত নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য, বলদেব, মাধব প্রভৃতি সকল বৈষ্ণব বেদান্তসম্প্রদায়ই নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছেন।

রামানুজের মতানুসারে আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞাতৃত্বের সমর্থনে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য মাধব মুকুন্দ, দ্বৈতবেদান্তী ব্যাসরাজের যুক্তি-লহরী ও অদ্বৈত-বেদান্তীর উত্তর

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান আচার্য মাধবমুকুন্দ তাঁহার "পরপক্ষগিরিবজ্র" নামক গ্রন্থে এবং দ্বৈতবেদান্তী জয়তীর্থ বাদাবলীতে তর্কতাণ্ডব পণ্ডিত ব্যাসরাজ ন্যায়ামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে নানারূপ তর্কশরজাল বিস্তার করতঃ প্রতিপক্ষ অদ্বৈত-মতকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া, স্বীয় অভিমত দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মাধবমুকুন্দ বলেন যে, আত্মার কর্তৃত্ব এবং জ্ঞাতৃত্ব অধ্যস্ত নহে, স্বাভাবিক। অহংরূপেই আত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে অহংকারের সহিত চৈতন্যের অধ্যাসের ফলে ঝিনুকখণ্ডে রজত-বুদ্ধির ন্যায়, রজ্জুতে মিথ্যা সর্প প্রত্যক্ষের ন্যায়, অহংকারে মিথ্যা জ্ঞাতৃত্বের প্রতিভাস

১। (ক) "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদি"তি শ্রুতিঃ। বৃহদাঃ ৪।৪।১৪,
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চ স্মৃতিঃ॥ গীতা, ১৩।১,
নাত্মাশ্রুতেরিত্যারভ্য সূত্রকারোঽপি বক্ষ্যতি।
জ্ঞোঽতএবেত্যতো নাত্মা জ্ঞপ্তিমাত্রমিতি স্থিতম্॥
শ্রীভাষ্য, ৯৪ পৃষ্ঠা নির্ণয়সাগর সং।

(খ) তথাচ শ্রুতয়ঃ স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরে অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব। বৃহদাঃ ৬।৫।১৩, ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে। বৃহদাঃ ৪।৩।৩০, কতম আত্মা? যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ। বৃহদাঃ, ৮।১২।৪, এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ, ৬।৩।৭, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ, বৃহদাঃ, ২।৪।১৪, ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২, ছান্দোগ্য ৮।২।৩, প্রশ্ন উপ, ৬।৫, তৈত্তিরীয় আনন্দবল্লী, ৪।১।

হইয়া থাকে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেখানে দ্রষ্টব্য এই, সত্য ও মিথ্যার মিথুন বা মিলনই অধ্যাস। এই অধ্যাসে রজ্জু-সর্প প্রভৃতি স্থলে আরোপ্য সর্প এবং আরোপের আধার "ইদম্" এই দুইটি অংশই অতি স্পষ্ট। 'অহম্' এইরূপ অধ্যাসের স্থলে কিন্তু আরোপ্য ও আরোপের অধিষ্ঠান, এই দুইটি অংশ স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় না। এই অবস্থায় অহং-বোধকে রজ্জু-সর্প প্রভৃতির ন্যায় ভ্রম বলা চলে না—তস্মাদ্ দ্ব্যংশতাভানাভাবাৎ অহমর্থ আত্মৈবেতি সিদ্ধম্। পরপক্ষগিরিবজ্র, ১৫৩ পৃষ্ঠা। প্রশ্ন হইতে পারে যে, "অহম্" যদি আত্মা হয়, তবে সুষুপ্তি অবস্থায়ও সেই আত্মা বিদ্যমান থাকায়, সুষুপ্তিতে অহম্ বা আত্মার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় না কেন? সুষুপ্তি অবস্থায় অহমর্থের প্রকাশ থাকেনা বলিয়াই, অদ্বৈতবেদান্তী অহমর্থের আত্মত্ব সমর্থন করেন না। সুষুপ্তি অবস্থায় স্থূলদেহ প্রভৃতির অনুভূতি থাকেনা বলিয়া, স্থূল দেহকে যেমন আত্মা বলা যায় না, সেইরূপ "অহম্" ভাবেরও অনুভব না থাকায়, অহমর্থকেও আত্মা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না—অহমর্থঃ নাত্মা সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাননুগতত্বাৎ স্থূলদেহাদিবৎ। পরপক্ষগিরিবজ্র, ১৫ পৃষ্ঠা। আলোচ্য অনুমানের সাহায্যে অহমর্থ অনাত্মাই হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ যুক্তির খণ্ডনে মাধবমুকুন্দ, ব্যাসরাজ প্রভৃতি বলেন যে, সুষুপ্তি অবস্থায়ও অহমর্থেরই স্ফুরণ হইয়া থাকে। "অহম্" বলিলে যে ইচ্ছা, চেষ্টা প্রভৃতি গুণশালী আত্মার বোধ হয়, তাহাতে প্রতিবাদীরও আপত্তির কোন কারণ নাই, বিবরণ-রচয়িতা প্রকাশাত্মযতি সত্য কথাই বলিয়াছেন যে—অন্তঃকরণবিশিষ্ট আত্মারই সুষুপ্তিতে প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে—অন্তঃকরণ বিশিষ্ট এবাত্মনি প্রত্যভিজ্ঞানং ক্রমঃ, ন নিষ্কল-চৈতন্যে। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৯৫ পৃষ্ঠা। তবে, সুষুপ্তি অবস্থায় ইচ্ছা প্রভৃতির

(গ) যস্মাৎক্ষরাদতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
গীতা, ১৫।১৮,

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ। গীতা ১০।২০,
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। গীতা ৭।৬
অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে। গীতা ১০।৮,

(ঘ) নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৮,
জ্ঞোঽতএব। ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৯।

সুস্পষ্ট প্রকাশ হয় না, সুখেরই কেবল স্মরণোদয় হইয়া থাকে—"সুখমহমস্বাপসম্" আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, এইরূপে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির সুষুপ্তিকালীন সুখের স্মৃতি হইয়া থাকে। আত্মার সুখোপলব্ধি না থাকিলে, সুখের স্মৃতি হইবে কাহার? অহং সুখী, অহমিচ্ছামি, এইরূপে সুখ বা ইচ্ছা প্রভৃতির বোধ ব্যতীত আত্মোপলব্ধিই সম্ভবপর নহে। এই অবস্থায় সুখময় আত্মাকে সগুণাত্মবাদীর মতে ইচ্ছাদিগুণবিশিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিলেও, ক্ষতির কিছু কারণ দেখা যায় না। যদি বল যে, আলোচ্য সুখ-স্মৃতি সুষুপ্তিকালীন সুখের স্মৃতি নহে, সুষুপ্তিমগ্ন ব্যক্তি সুষুপ্তি অবস্থা হইতে যখন জাগরিত অবস্থায় ফিরিয়া আসে, তখন তাঁহার সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের আধার অন্তঃকরণ সজীবতা লাভ করে, সেই অন্তঃকরণের সহিত চিদধ্যাসের ফলেই আত্মায় সুখের স্ফূরণ হইয়া থাকে। এইরূপ কথা বলা যাইবে না, কারণ, সুখের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" আমি কিছুই জানিতে পারি নাই, এইরূপে সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের যে অনুভূতি জন্মে, সেই অজ্ঞান তো আর আশ্রয়শূন্যভাবে থাকিতে পারিবে না। সেই অজ্ঞানের আশ্রয় হিসাবে আত্মাকে সুষুপ্তি অবস্থায় অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সুষুপ্তির সুখ-স্মৃতিকে যদি জাগরিত অবস্থার অনুভূতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা চলে, তবে উক্ত অজ্ঞানের অনুভূতিকেই বা জাগরিত অবস্থার অজ্ঞতাবোধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে আপত্তি কি? ফলে, সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতির অভাবই সিদ্ধ হয়। এইরূপ কল্পনাও ঠিক নহে। এই দৃষ্টিতে সুষুপ্তি কালীন আত্মা এবং জাগরিত অবস্থার সুখ-দুঃখ জ্ঞানময় আত্মা এক আত্মা হইবে না, ভিন্ন আত্মা হইয়া দাঁড়াইবে; এবং এতকাল কি আমি ঘুমাইয়াছিলাম? না, অপর কোন ব্যক্তি ঘুমাইয়াছিল? এতাবন্তং কালমহমেব সুপ্তোঽন্যো বা, অদ্বৈতসিদ্ধি ৫৯৬ পৃষ্ঠা, এই প্রকার সংশয়ও সেক্ষেত্রে দেখা দিবে। সুষুপ্তি অবস্থায় সুপ্ত সুখানুভূতি না থাকিলে, আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানোদয়ও হইতে পারে না। ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন যে, সুষুপ্তি অবস্থায় বিদ্যমান শুদ্ধ চৈতন্যের সহিত জাগরিত অবস্থার জ্ঞাতৃ-চৈতন্যের (অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের) আরোপিত অভেদ বা ঐক্যাধ্যাসের বলেই আলোচ্য সংশয় কাটাইয়া নিশ্চয়ে পৌঁছান সম্ভবপর হইবে—সুষুপ্তি[illegible]ধ্যাসাদিতি

গৃহাণ। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৯৬ পৃষ্ঠা। অদ্বৈতবাদীর এই কথার উত্তরে আমরা (আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞাতৃত্বের সমর্থকগণ) বলিব যে, "অহং" বা জ্ঞাতা আমি এইরূপ আমিত্ব-বোধের অতিরিক্ত অদ্বৈতবেদান্তের জ্ঞানস্বরূপ আত্মার কল্পনাই তো অলীক কল্পনা। ঐরূপ নির্বিশেষ আত্মা যে আছে, তাহারই তো কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে জ্ঞাতা 'অহমে'র শঙ্করোক্ত চিদ্রূপ আত্মার সহিত ঐক্যাধ্যাস বা আরোপিত অভেদের কথা আসে কি করিয়া? দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে পরস্পরাশ্রয়দোষও আসিয়া পড়িবে। জাগরিত অবস্থার "আমি" (অহংবোধ) সুষুপ্তিকালীন আমি বা আত্মা হইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হইলেই ঐক্যাধ্যাসের কথা উঠে; পক্ষান্তরে ঐক্যাধ্যাস বা অভেদারোপ সমর্থিত হইলেই, দুই "আমি"র ভেদও ধ্বনিত হয়। যদি বল যে, সুষুপ্তির আমি ও জাগরিত আমির পার্থক্য জ্ঞানোদয় হইবার পূর্বেই "অহমস্বাপ্‌সম্" এইরূপ বোধ উৎপন্ন হইবে, এরূপ ক্ষেত্রে পরস্পরাশ্রয়দোষের সম্ভাবনা কোথায়? সুষুপ্তি অবস্থায় যে অহংভাব বর্তমান থাকে, "সুখমহমস্বাপ্‌সম্" এইরূপ সুখ-স্মৃতিই তো তাহার প্রমাণ। দুঃখের জ্বালা জুড়াইবার জন্য মানুষমাত্রেই সন্তাপহারিণী নিদ্রার কোলে আশ্রয় লইয়া থাকে। "যেই আমি সুখে শুইয়াছিলাম্, সেই আমিই জাগিয়া উঠিয়াছি" "গতকাল যেই কাজ কতক করিয়াছিলাম, সেই কাজই আজ পুনরায় করিতেছি" এইরূপ আত্ম-প্রত্যভিজ্ঞান এবং কৃতকর্মের স্মৃতি কাহার না উদিত হয়? ইহা হইতে সুষুপ্তিতে যে আমিত্বের বা অহংভাবেরই স্ফূরণ হইয়া থাকে, নির্বিশেষ চৈতন্যই কেবল বিদ্যমান থাকে না, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়।[১] যদি সুষুপ্তি অবস্থায় কেবল নির্বিশেষ চৈতন্যই বর্তমান থাকিত, তবে "অহম-স্বাপ্‌সম্" আমি ঘুমাইয়াছিলাম এইরূপ "অহমে"র জ্ঞানোদয় না হইয়া, "চিদস্বপাৎ" চৈতন্য সুপ্ত অবস্থায় ছিল, এইরূপ বোধই উৎপন্ন হইত এবং আলোচ্য প্রত্যভিজ্ঞান প্রভৃতিও সেক্ষেত্রে সম্ভবপর হইত না। উপনিষদে সুষুপ্তি অবস্থার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়বর্গ এবং উহাদের পরিচালক মন সুষুপ্তিতে বিলীন হইয়া থাকে—(গৃহীতং চক্ষুর্গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ), আত্মভাব

১। (ক) পরপক্ষগিরিবজ্র, ১৫৬ পৃষ্ঠা।
(খ) অদ্বৈতসিদ্ধি (পূর্বপক্ষগ্রন্থ), ৫৯৭ পৃষ্ঠা।

বা অহংভাবের যে বিলয় হয়, এমন কোন কথা শুনা যায় না। সুষুপ্তিতে অহংভাবের বিলয় এবং জাগরণে তাহার পুনরুৎপত্তি স্বীকার করিতে গেলেই "যোঽহমন্বভবম্ সোঽহং স্মরামি" এইরূপ স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞান প্রভৃতির অনুপপত্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। প্রতিবারের সুষুপ্তিতে ব্রহ্মসিন্ধুতে অহংবিন্দুর বিলয় এবং প্রতিজাগরণে অভিনব অহমের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, স্ব স্ব কর্মফল ভোগের নিয়ম রক্ষা করাও অসম্ভব হয়—অহং ব্যক্তিভেদাৎ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ। পরপক্ষগিরিবজ্র, ১৫৬ পৃষ্ঠা। কারণ, যেই অহম্ বা আমি অনুভব করে, সেই অহম্‌ই স্মরণ করে। অনুভব এবং স্মরণের কর্তা এক ও অভিন্ন "অহম্" না হইলে, স্মৃতি-প্রত্যভিজ্ঞান প্রভৃতি জন্মিতেই পারে না। একের জ্ঞান অপরের স্মৃতির বিষয় হয় না। নিজ অনুভূত বিষয়েই নিজের স্মৃতি হইয়া থাকে। স্মৃতি প্রভৃতির ইহাই নিয়ম বটে। অবশ্যই জীব সুষুপ্তি অবস্থায় ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হয়। নিজকেও সে তখন ভুলিয়া যায়—সতি সম্পদ্য ন বিজানাতি অয়মহমস্মীতি। ছান্দোগ্য উপ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৯।২। এইরূপ বর্ণনাও উপনিষদে দেখা যায়।[১] ইহা হইতে অহংভাবের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না। আত্মার কোনও বিশেষ ভাবের পরিচয় থাকে না। এই রহস্যই বুঝা যায়। সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব বিষয় হইতে বিরত হয়। এইজন্য সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা বা অহংভাব বর্তমান থাকিলেও, তাহার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানোদয় সম্ভবপর হয় না।[২] ইহা আমরা পূর্বেই রামানুজের মতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। তারপর, শ্রুতিতে "অথাতোঽহংকারাদেশঃ", "অথাত আত্মাদেশঃ", এইরূপ অহংকার এবং আত্মার পৃথক্‌ভাবে উপদেশ করায়, অহং অভিমানী জ্ঞাতাকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণববেদান্তিগণ বলেন যে, উল্লিখিত

১। সর্বাঃ প্রজাঃ অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন প্রত্যূঢ়াঃ। ছান্দোগ্য-উপনিষৎ, ৮।৩।২

২। নহু জ্ঞাতুঃ সদ্‌ভাবে কিমিতি বিশেষজ্ঞানং ন স্যাদিতি চেন্ন, তত্র বিষয়াভাবাৎ। নহি জ্ঞাতুঃ সত্ত্বমাত্রং বিষয়ানুভবে প্রয়োজকম্, অপি তু বিষয়সত্ত্বসহকৃতমেব, তস্মাৎ জ্ঞাতুঃ সত্ত্বেঽপি বিষয়াভাবাদ্ বিশেষজ্ঞানানুদয়োঽবিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ। পরপক্ষ-গিরিবজ্র, ১৫৭ পৃষ্ঠা।

শ্রুতিতে "অহংকারাদেশঃ" এই কথার দ্বারা দম্ভ প্রভৃতির তুল্যার্থক অহংকার, যাহা বুদ্ধির ধর্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা যে আত্মপদবাচ্য নহে, ইহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আলোচ্য অহংকারশব্দ "অহম্" এই অব্যয় শব্দের পর কৃ-ধাতুর ঘঞন্ত প্রয়োগের ফলে, 'অহং করোমি' এই অর্থে সিদ্ধ হয়। ঐরূপ অব্যয় "অহম্" শব্দ আত্মার বোধক নহে। অস্মদ্ শব্দ হইতে যে 'অহম' পদটি নিষ্পন্ন হয়, তাহাই হয় অহং প্রত্যয়গম্য আত্মার বাচক। আত্মার জ্ঞাতৃত্বাভিমান থাকিলেও অহংকার এবং আত্মা এক নহে, ইহাই শ্রুতির উপদেশের মর্ম। "অহং জানামি" এইভাবে জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতির আধাররূপেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞাতা আত্মাকে অহংশব্দের বাচ্য বলিয়াই জানা যায়। এইরূপ আত্মা নির্গুণ এবং নির্বিশেষ হইবে কিরূপে ?

অদ্বৈতবাদী কিন্তু আত্মাকে অহং-প্রত্যয়গম্য বা অহংশব্দের বাচ্য বলার দরুণই অনাত্মা বলিতে চাহেন। তাঁহার মতে—

"অহম্" এই অহং পদার্থ—(পক্ষ), আত্মা নহে, অনাত্মা (সাধ্য), যেহেতু তাহা "অহম্" জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে (হেতু)। অহং স্থূলঃ, অহং কৃশঃ, এই সকল স্থলে অহংপ্রত্যয়-গম্য শরীরকে যেমন আত্মা বলা চলে না, সেইরূপ অহংপ্রত্যয়-গম্য অধ্যস্ত আত্মাকেও আত্মা বলা চলে না। শরীরে অহংবুদ্ধির ন্যায় অহংকারকে অনাত্মা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়—(দৃষ্টান্ত)—(১) অহমর্থঃ, অনাত্মা অহংপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ শরীরবৎ। অদ্বৈত-সিদ্ধি, ৬০১ পৃষ্ঠা,

অহং পদার্থ (পক্ষ), আত্মা হইতে ভিন্ন (সাধ্য), যেহেতু ইহা (অহংপদার্থ) অহং শব্দের বাচ্য (হেতু)। অব্যয় যে একটি "অহম্" শব্দ আছে, তাহার অর্থ অহংকার,—অহংকার বুদ্ধির বৃত্তি বিশেষ, আত্মা নহে। অব্যয় অহংশব্দবাচ্য অহংকার যেমন আত্মা নহে, আত্মা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ "অহং"শব্দপ্রতিপাদ্য আত্মাও প্রকৃত আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিবে—(দৃষ্টান্ত)—অহমর্থঃ, আত্মান্যঃ, অহংশব্দাভিধেয়ত্বাৎ, অহংকার-শব্দাভিধেয়বৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৬০২ পৃষ্ঠা।

এইরূপে অদ্বৈতবেদান্তী 'অহং' পদার্থের অনাত্মত্ব সাধনের জন্য যে সকল অনুমানের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাদের সম্পর্কে বৈষ্ণববেদান্তী

বলেন, সেই অনুমানের কোনটিই নির্দোষ নহে। অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তে অহংকারের সহিত চৈতন্যের অধ্যাসের ফলে যে মিথ্যা জ্ঞাতৃত্বের বা অহংভাবের উৎপত্তি হয়, সেই অধ্যস্ত "অহম্" অর্থের অন্তর্গত যে অধিষ্ঠান চৈতন্য, যাহাকে অদ্বৈতবেদান্তের ভাষায় নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা আত্মা বলা হইয়া থাকে, সেই চৈতন্যও অবশ্যই অধ্যস্ত অহংপ্রত্যয়ের বিষয় হইবে। সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যকে তো অদ্বৈতবাদী "অনাত্মা" বলিতে পারিবেন না। ফলে, প্রথমোক্ত অনুমানটি যে (অনুমানের হেতু থাকিলেও সাধ্য না থাকায়) সাধ্যব্যভিচারী বা অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আলোচ্য অনুমানের প্রামাণ্য সাধনের উদ্দেশ্যে অদ্বৈতবাদী বলেন, যেইরূপে আত্মা অহংপ্রত্যয়ের বিষয় হইয়া থাকে, সেই অধ্যস্ত অহম্ অভিমানীরূপেই উহা অনাত্মা। অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে আত্মা কখনও অহং প্রত্যয়ের বিষয় হয় না, সুতরাং অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে আত্মাকে অনাত্মাও বলা যায় না। এইজন্য অধিষ্ঠান চৈতন্যসম্পর্কে প্রদর্শিত ব্যভিচারের প্রশ্নও ওঠে না।

অদ্বৈতবেদান্তীর দ্বিতীয় অনুমানে* দ্রষ্টব্য এই যে, দম্ভ, গর্ব, অহংকার প্রভৃতির বোধক অব্যয় "অহম্" শব্দ এবং আত্মার বাচক অস্মদ্ শব্দের অর্থ যখন এক নহে, তখন উক্ত অনুমানের হেতু যে স্বরূপাসিদ্ধ "হেত্বাভাস" দোষে কলুষিত হইবে, তাহা অদ্বৈতবেদান্তী লক্ষ্য করিয়াছেন কি?[1] তারপর, অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ। গীতা ১০।২০; অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ, গীতা ১৮।৬৬, মামেকং শরণং ব্রজ, গীতা ১৮।৬৬; অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা, গীতা ৭।৬। এই সকল গীতার উক্তিতে জানা যায়, বিশ্বাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সর্বজীবে সর্বঘটে অহম্ বা আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। অদ্বৈতবেদান্তের আলোচ্য অনুমান অনুসারে অহংপ্রত্যয়গম্য বিশ্বাত্মা বাসুদেবকেও অনাত্মা

* অহমর্থঃ আত্মান্যঃ অহংশব্দাভিধেয়ত্বাৎ, অহঙ্কারশব্দাভিধেয়বৎ পূর্বপৃষ্ঠায় উল্লিখিত এই অনুমানে।

১। অহংশব্দস্তু অহংকার শব্দবদাত্মভিন্নে প্রয়োগপ্রাচুর্যাভাবাদাত্মপর এবেতি ভাবঃ। এবমহমর্থস্ত সর্বাবস্থানুগতত্বসিদ্ধ্যাপরোক্তানুমানবৃত্তিহেতোঃ স্বরূপাসিদ্ধত্বেনাপ্রমাণত্বং সুপ্রসিদ্ধম্। পরপক্ষগিরিবজ্র, ১৫৭ পৃষ্ঠা, বৃন্দাবন সং।

বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়,[১] এবং উল্লিখিত গীতার উক্তির কোনই মূল্য থাকে না। 'অহম্' ইহাই আত্মার স্বরূপ। নির্বিশেষ চৈতন্যই যে আত্মা এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। "অহম্" এই অহংভাব ব্যতীত আত্মার অন্য কোন স্বরূপ থাকিলে, তাহা অবশ্যই প্রতীতি গোচর হইত, অহংভাব ছাড়িয়া আত্মা জ্ঞানগোচর হয় না, সুতরাং অহংভাব ভিন্ন আত্মার অন্য কোনও রূপ বা ভাব নাই, ইহাই স্পষ্টতঃ বুঝা যায়।[২] আত্মা পরম প্রেমাস্পদ আত্ম-প্রীতিই যে সর্ববিধ প্রীতির মূল, তাহা অদ্বৈতবাদীও অস্বীকার করিতে পারেন না। উপনিষদ্ উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, 'নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি'। (বৃহদাঃ, ৪।৫।৬) মানভুবং হি ভূয়াসম্,' 'মাংমৃতংকৃধি', 'জ্যোতিরহং বিরজাবিপাপ্মা ভূয়াসম্'। অমৃতের অধিকারী হইব, নির্মল, নিষ্পাপ জ্যোতির্ময় হইব, এইরূপে বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতিতে যে আত্মপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই পরমপ্রীতি-নিদান, সদা স্বপ্রকাশ অহংপদবেদ্য আত্মাকে অনাত্মা বলিতে যাওয়া এবং মুক্তিতে প্রেমময় আত্মার বিলোপ সাধনা করা কতদূর সঙ্গত সুধীপাঠক বিচার করিবেন।

"অহং জানামি" এইরূপ অবাধিত প্রত্যক্ষমূলে অহংরূপে আত্মার যে স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়, অনুমান প্রভৃতির সাহায্যেও তাহা সমর্থন করা চলে। ঘটত্ব যেমন ঘটেই থাকে, ঘট ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও থাকেনা, সেইরূপ অনাত্মত্ব অনাত্ম-(ঘট প্রভৃতি) পদার্থেই কেবল থাকে। অনাত্মাকে ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও থাকে না। অহম্ পদার্থে অনাত্মত্ব থাকে না, থাকিতে পারে না, সুতরাং অহমর্থ অনাত্মা নহে, আত্মাই বটে।

(ক) অনাত্মত্বং (পক্ষ) নাহমর্থবৃত্তি (সাধ্য) অনাত্মমাত্রবৃত্তিত্বাৎ (হেতু) ঘটাদিবৎ (দৃষ্টান্ত)। পরপক্ষগিরিবজ্র, ১৬২ পৃঃ বৃন্দাবন সং।

'অহম্' অর্থই সর্বপ্রকার অনর্থনিবৃত্তিরও আশ্রয় বটে, যেহেতু তাহা

১। ন চ অহমর্থ আত্মান্যঃ অহংশব্দাভিধেয়ত্বাৎ অহংকারশব্দাভিধেয়বদিত্যত্র মানমিতি বাচ্যম্, "অহমাত্মা গুড়াকেশে"ত্যহং শব্দাভিধেয়ে বিশ্বাত্মনি শ্রীবাসুদেবে পরব্রহ্মণি ব্যভিচারাৎ। পরপক্ষগিরিবজ্র, ১৫৯ পৃষ্ঠা, বৃন্দাবন সং।

২। অহমর্থাদন্য আত্মা যদি স্যাৎ তর্হি উপলভ্যেত, নতু তথা উপলভ্যত ইতি যোগ্যানুপলব্ধেরপ্যত্রমানত্বাৎ। পরপক্ষগিরিবজ্র, ১৬৪ পৃষ্ঠা, বৃন্দাবন সং।

অনর্থের আশ্রয়। আত্মাকে 'অহমজ্ঞঃ' এইভাবে অজ্ঞানের আধার রূপে সকলেই প্রত্যক্ষ করে। যাহা অজ্ঞানের আশ্রয় হইবে, তাহা অজ্ঞানের নিবৃত্তিরও আশ্রয় হইবে, যেখানে অনর্থ থাকিবে, অনর্থের নিবৃত্তিও সেইখানেই থাকিবে, ইহা সত্য কথা। (খ) অহমর্থঃ অনর্থনিবৃত্ত্যাশ্রয়ঃ অনর্থাশ্রয়ত্বাৎ। পরপক্ষগিরিবজ্র, ১৬২ পৃঃ; মুক্তি অবস্থায়ও অহংপদার্থেরই অনুবৃত্তি হইয়া থাকে, কেননা, অহংপদার্থই মুক্তির সাধন ভগবদ্‌ভজন প্রভৃতির আশ্রয় হয়। মুক্তির সাধনের যাহা আশ্রয় হয়, মুক্তিতে সেই অহমর্থের অনুবৃত্তি খুবই স্বাভাবিক। (গ) অহমর্থঃ মোক্ষান্বয়ী তৎসাধনকৃত্যাশ্রয়ত্বাৎ, পরপক্ষগিরিবজ্র, ১৬২ পৃঃ; মুক্তিতে অহমর্থের অনুবৃত্তি না হইয়া যদি বিলোপ হয়, তবে বৌদ্ধোক্ত শূন্যবাদই আসিয়া পড়ে—মোক্ষেঽহমর্থাভাবে আত্মনাশো মোক্ষ ইতি বাহ্যমতাপত্তেঃ। পরপক্ষগিরিবজ্র, ১৬০, পৃষ্ঠা। বৈষ্ণবাচার্যগণ আলোচ্য যুক্তি, প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে জ্ঞাতা "অহম্" পদার্থের আত্মত্ব সাধন করিয়াছেন—মাহমর্থঃ অনাত্মা, কিন্তু আত্মৈব।*

অদ্বৈতবাদি-কর্তৃক আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞাতৃত্বের খণ্ডন ও জ্ঞানরূপত্ব সাধন

আলোচ্য বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অদ্বৈতবেদান্ত বলেন, "অহং জানামি" এইরূপ প্রত্যক্ষের দ্বারা আত্মাকে "জ্ঞাতা" বলিয়া বোধহয় বটে, কিন্তু আত্মার এই জ্ঞাতৃত্ব স্বাভাবিক নহে, ইহা আধ্যাসিক এবং ভ্রান্তি কল্পিত। অন্তঃকরণের সহিত চৈতন্যের অধ্যাসের ফলে মনোগত কর্তৃত্ব চৈতন্যে আরোপিত হয়। মনসঃ কর্তৃত্বমাত্মনি আরোপ্যতে। অদ্বৈতসিদ্ধি ৬১২ পৃষ্ঠা, এবং অজ্ঞতা বশতঃ লোকে অকর্তা আত্মাকে "কর্তা" মনে করে। "অহং কর্তা' এই অহংকার চিদ্ ও অচিতের গ্রন্থির ফলেই উদিত হয়। অহংকারের দুইটি অংশ আছে। একটি অধিষ্ঠান চিদংশ, অপরটি অচিদ্ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের অংশ। অচিদ্ বুদ্ধির কর্তৃত্ব থাকিলেও, (কর্তৃত্ব বিশিষ্ট) বুদ্ধির চিদধ্যাস ব্যতীত "অহংকর্তা" এইরূপ কর্তৃত্ববোধের উদয়

* মাধব মুকুন্দ কর্তৃক 'পরপক্ষগিরিবজ্রে' উল্লিখিত অনুমান, মাধ্ব পণ্ডিত ব্যাসরাজ তদীয় 'ন্যায়ামৃতে'ও উল্লেখ করিয়াছেন এবং সুদৃঢ় তর্কের ভিত্তিতে ঐ সকল অনুমান স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে 'অহম্' অর্থের স্বরূপ বিচারপ্রসঙ্গে ঐ অনুমান খণ্ডন করিয়াছেন। সুধী পাঠক ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধির আলোচনা দেখিবেন।

হইতে পারে না। এই অবস্থায় গুণময়ী বুদ্ধির চিদধ্যাস স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ'। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩৩, 'জ্ঞোঽতএব' ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৮, 'অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ'। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৮, এই সকল সূত্রে যজেত, জুহুয়াৎ প্রভৃতি পূর্বমীমাংসোক্ত বেদবিধির সার্থকতা উপপাদনের উদ্দেশ্যে সাংখ্যোক্ত অচেতন বুদ্ধির কর্তৃত্ব খণ্ডন করিয়া, চেতন জীবকে কর্তা বলিয়া শারীরক-মীমাংসা-ভাষ্যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এরূপক্ষেত্রে বুদ্ধির সহিত চিদধ্যাসের ফলে বুদ্ধির কর্তৃত্ব আত্মায় আরোপিত হয়, এইরূপ বলা কি সূত্রোক্ত ভাষ্য সিদ্ধান্তের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায় না?

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, "কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" এই সূত্র-ভাষ্যে জীবের কর্তৃত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছ সত্য, কিন্তু সেই কর্তৃত্ব যে আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম, এমন কোন কথা সূত্র-ভাষ্যে শুনা যায় না। পরবর্তী "যথা চ তক্ষোভয়থা"। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪০ এই সূত্রের ভাষ্যে অধ্যাস-ভাষ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, আত্মার কর্তৃত্ব যে বাস্তব নহে,—ন চ স্বাভাবিক মাত্মনঃ কর্তৃত্বম্। ব্রঃ সূঃ ভাষ্য; ২।৩।৪০, আত্মার কর্তৃত্ব আধ্যাসিক, এই সিদ্ধান্তই নানাবিধ যুক্তিমূলে সমর্থন করা হইয়াছে। আত্মার কর্তৃত্ব বাস্তব হইলে, আত্মার এই কর্তৃত্ব কখনও বিলুপ্ত হইত না এবং দুঃখের জ্বালা হইতে আত্মার বিমুক্তিও সম্ভবপর হইত না। কেননা, আত্মার কর্তৃত্বই যে দুঃখ—কর্তৃত্বস্য দুঃখরূপত্বাৎ। ব্রঃ সূঃ শংভাষ্য, ২।৩।৪০, কর্তৃত্ব গুণ-ধর্ম, গুণ থাকিলেই দুঃখ অবশ্যই থাকিবে, সেই দুঃখ হইতে আত্মা বিমুক্ত হইবে কিরূপে? যদি বল যে, বুদ্ধি তো সাধনমাত্র, সেই বুদ্ধি কোন মতেই কর্তা হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, করণও ক্ষেত্রবিশেষে কর্তা হয়, কর্তাও করণ হয়। কারকের ব্যবহার প্রয়োগ-কর্তার ইচ্ছাধীন। সুতরাং বুদ্ধিকে কর্তা বলায় কোনও অসঙ্গতি হয় না। কর্তৃত্ব যদি অনর্থকর এবং দুঃখময় হয়, তবে দুঃখময় কর্তৃত্ব যখন বুদ্ধির ধর্ম তখন অনর্থনিবৃত্তিরূপ মুক্তিকে বুদ্ধির ধর্ম বলিয়াই অদ্বৈতবেদান্তীর গ্রহণ করা উচিত। কেননা, যাহা অনর্থের আশ্রয় হয়, তাহাই অনর্থনিবৃত্তিরও আশ্রয় হইবে। ইহাই তো নিয়ম। এইরূপ আপত্তির

আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, আধ্যাসিক।

উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, কর্তৃত্ব দুঃখকর কি সুখকর, তাহা জড়বুদ্ধি বুঝিবে কিরূপে? জড়বুদ্ধির কাছে কর্তৃত্বের অনর্থতাই আদৌ প্রতিভাত হয় না। স্বতন্ত্র চেতনের কাছেই প্রতিকূল বস্তু সমূহ দুঃখকর ও অনুকূল বস্তুরাজি সুখকর বলিয়া বোধহয়। এই অবস্থায় "কর্তৃত্ব"কে অনর্থকর বলিয়া বুঝিতে হইলে, বুদ্ধিকে আত্মগত করিয়া লইয়াই তাহা বুঝিতে হইবে। সেই আত্মগত অনর্থজালের নিবৃত্তিই মুক্তি বটে। যাহা স্বরূপতঃ অকর্তা, তাহা কোনমতেই কর্তৃত্বের আশ্রয় হইতে পারে না। এরূপক্ষেত্রে চৈতন্যকে কর্তৃত্বের আশ্রয় বলিতে গেলে, কর্তৃত্বকে সেখানে আরোপিত বা কল্পিত বলা ব্যতীত গত্যন্তর কি? আত্মার কর্তৃত্ব যে স্বাভাবিক নহে তাহা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতায় স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন—

> প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
> অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥ গীতা, ৩য় অঃ ২৭।
> তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
> পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বাৎ ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ গীতা, ১৮অঃ ১৬।

সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী প্রকৃতির গুণত্রয়ই সর্ববিধ কর্ম সম্পাদন করে। অহংকারের দ্বারা যাঁহার চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে, তিনিই 'আমি কর্তা' আমি করি, এইরূপ মনে করেন। নিত্যশুদ্ধ অকর্তা আত্মাকে যিনি কর্তারূপে দেখেন, তাঁহার দৃষ্টি অজ্ঞান কলুষিত, তিনি তত্ত্বদর্শী নহেন।

"অহং করোমি" এইরূপ প্রত্যক্ষ যে আত্মার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব প্রতিপাদন করে না; আত্মার কর্তৃত্ব আধ্যাসিক, এই সত্যই প্রতিপাদন করে, তাহা বুঝা গেল। আত্মার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব উপপাদনের জন্য মাধবমুকুন্দ প্রভৃতি আচার্যগণ যে সকল অনুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও দোষমুক্ত নহে বলিয়া, গ্রহণ করা চলে না। প্রথমতঃ আত্মা (পক্ষ), মোক্ষসাধন বিষয়ক কৃতিমান্, (সাধ্য), তৎফলান্বয়িত্বাৎ (হেতু)। অদ্বৈত সিদ্ধি, ৬১১ পৃষ্ঠা। আত্মা মুক্তির সাধন ভগবদ্ভজন প্রভৃতি কর্মের আশ্রয় হন, যেহেতু আত্মা ভগবৎ প্রীতিকর কর্মফল ভোগ করেন। এই অনুমানে আত্মাকে "কৃতিমান্" বা কর্মের আশ্রয় বলিয়া যদি আধ্যাসিক বা আরোপিত কর্মের আশ্রয় বলা হয়, তবে অদ্বৈতবাদীর তাহাতে আপত্তি করার কোনই

কারণ দেখা যায় না। তারপর, আলোচ্য অনুমানের হেতু সাধ্যের ব্যভিচারী হয় বলিয়া, ঐরূপ অনুমানকে প্রমাণের মর্যাদাই দেওয়া চলে না। যে-ব্যক্তি যেই ফল ভোগ করে, সেই ব্যক্তিই সেইফলের উৎপাদক কার্য করে—যো যৎ ফলবান্, স তৎসাধন-কৃতিমানিতি ব্যাপ্তির্বোধ্যা। অদ্বৈত সিদ্ধির গৌড়ব্রহ্মানন্দী টীকা, ৬১১ পৃষ্ঠা। এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানই উল্লিখিত অনুমানের মূল বলিয়া জানিবে। পিতা পুত্রেষ্টি যাগ করেন, তাহার ফলে পুত্র জন্মলাভ করে। এস্থলে উৎপত্তিফল পুত্র ভোগ করে, সে কিন্তু যাগ করে না। যিনি যাগ করেন, তিনি উৎপত্তিফলভাগী হন না। এই অবস্থায় আলোচ্য ব্যাপ্তিকে এবং ঐ ব্যাপ্তিমূলক অনুমানকে কিরূপে সত্য এবং প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়? শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতিতে আত্মাকে কর্তা এবং অকর্তা এই দুইভাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে দেখা যায়। ঐ উভয়ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, আত্মার কর্তৃত্ব আরোপিত এবং অকর্তৃত্বই স্বাভাবিক, এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া উপায় নাই।

আত্মার কর্তৃত্ব যেমন ভ্রান্তিকল্পিত এবং আরোপিত, আত্মার জ্ঞাতৃত্বও সেইরূপ ভ্রান্তিকল্পিত, ইহা অধ্যাস-ভাষ্যের ব্যাখ্যায়ই বিস্তৃতভাবে দেখান হইয়াছে। আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞাতৃত্ব এবং অহমর্থের আত্মত্ব উপপাদনের জন্য বৈষ্ণববেদান্তিগণ যে-সকল যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, জ্ঞাতা অহমর্থ আত্মা নহে। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। 'অহং জানামি', 'অহমিচ্ছামি' এইরূপ প্রত্যক্ষবশতঃ বৈষ্ণববেদান্তী আত্মাকে জ্ঞান-ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের দ্বারা রূপায়িত করিবার যে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা শোভন হয় নাই। কেননা, সুষুপ্তি অবস্থায় অহমর্থের কিংবা ইচ্ছা প্রভৃতির কোন বিকাশ দেখা যায় না। অথচ আত্মার প্রকাশ অব্যাহত থাকে। ইহা দ্বারা আত্মা ও অহমর্থের ভেদ স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয়। সুষুপ্তি ভাঙ্গিলে "সুখমহমস্বাপ্সম্" এইরূপে সুখ-স্মৃতির উদয় হয় বলিয়া, সুষুপ্তিতেও "অহম্" অর্থের বিলোপ হয় না। অহমর্থের বিলোপ হইলে আত্মার যে ভাতি থাকে তাহারই বা প্রমাণ কি? এইভাবে সুষুপ্তিতে অহমর্থের অনুবৃত্তির অনুকূলে যে সকল যুক্তি দেখান হয়, তাহা দ্বারা সুষুপ্তিতে অহমর্থের ভাতি সমর্থিত হয় না। জাগরিত অবস্থায় সক্রিয়

আত্মার কর্তৃত্বের ন্যায় আত্মার জ্ঞাতৃত্বও ভ্রান্তিকল্পিত

অন্তঃকরণের সহিত চৈতন্যের ঐক্যাধ্যাসের ফলে আত্মার কর্তৃত্ববোধ এবং সুখ-স্মৃতি প্রভৃতির সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়, ইহা পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। আলোচ্য ঐক্যাধ্যাস হয় বলিয়াই, "চিদস্বপীৎ" এইরূপ প্রতীতি হয় না, "অহমস্বাপ্সম্" এইরূপেই জ্ঞানোদয় হয়। "ন বিজানাতি অয়মহমস্মি" এই সকল শ্রুতিও স্পষ্টতঃই সুষুপ্তিতে যে অহমর্থের ভাতি হয় না, এই মতই সমর্থন করে। ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণই ইচ্ছা, জ্ঞান প্রভৃতির দ্বার। সুষুপ্তিতে ঐ দ্বার রুদ্ধ থাকে বলিয়া, "অহং নিদুঃর্খঃ স্যাম্" এইরূপ ইচ্ছামূলে সুপ্তির প্রবৃত্তি সহজেই ব্যাখ্যা করা চলে। 'গৃহীতং চক্ষুর্গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ', এই শ্রুতিতে ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের উপরতির কথাই জোর দিয়া বলা হইয়াছে। সুষুপ্তিতে কোন বিশেষ জ্ঞান থাকে না বলিয়া, সুষুপ্তিভঙ্গের পর "সুপ্তোঽহমন্যো বা" এইরূপ সংশয়েরও কোন কারণ দেখা যায় না। কেননা, সুষুপ্তিকালে অবস্থিত শুদ্ধ চিদাত্মার সহিত অন্তঃকরণের ঐক্যাধ্যাসবশতঃ অহন্তার বা অহংভাবের সৃষ্টি না হওয়ায়, সুষুপ্তিকালে ঐ প্রকার সংশয়ের সম্ভাবনা কোথায়? ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে সুষুপ্তির যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে "অহরহর্ব্রহ্ম গচ্ছতি" এইরূপে সাময়িক ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ঘটিলেও, 'ন বিদুরয়মহমস্মীতি,' শ্রুতি দ্বারা সুষুপ্তিতে আত্মার বিশেষ জ্ঞানের অভাবই ধ্বনিত হয়। জীবের অনাদি অজ্ঞান-বন্ধন যাহার ফলে জীবভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, জীবের সেই অজ্ঞান-সূত্র তখনও ছিন্ন হয় নাই। এইজন্যই জীবের পূর্বস্মৃতি কিংবা "যোঽহং সুপ্তঃ, সোঽহং জাগর্মি," "যোঽহং পূর্বেদ্যুরকার্ষং সোঽহমদ্য করোমি", প্রভৃতি প্রত্যভিজ্ঞানের অনুপপত্তির কথা আসে না। "অন্তঃকরণবিশিষ্ট এবাত্মনি প্রত্যভিজ্ঞানম্"; এই বিবরণের উক্তিরও কোনরূপ অসঙ্গতি হয় না। 'যোঽহমনুভবামি, সোঽহং স্মরামি', এইরূপে যে প্রত্যভিজ্ঞান প্রভৃতির উদয় হয়, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সুষুপ্তিকালীন অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই অনুভবিতা বা জ্ঞাতা, আর, জাগরিত অবস্থায় অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই স্মর্তা (স্মরণকারী)। এখানে চৈতন্যের অবিদ্যা এবং অন্তঃকরণ, এই দুইটি উপাধি দেখা গেলেও, মঠের মধ্যস্থ মঠাকাশ যেমন মঠাকাশ হইতে ভিন্ন হয় না, সেই অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যও অবিদ্যাবচ্ছিন্ন হইতে ভিন্ন হয় না। যাহা অবিদ্যাবচ্ছিন্ন হয়, তাহাই আবার

অন্তকরণাবচ্ছিন্ন হয়। এই দৃষ্টিতে অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের ঐক্য সিদ্ধ হওয়ায় আলোচ্য প্রত্যভিজ্ঞান প্রভৃতির উদয়ে কোন বাধা দেখা যায় না।

জ্ঞান এক অখণ্ড এবং নিত্য। জ্ঞানের ভেদ উপাধিকল্পিত। নৈয়ায়িক যেমন অখণ্ড আকাশের উপাধিভেদে ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি ভেদের কল্পনা করিয়া থাকেন, অদ্বৈতবেদান্তীও সেইরূপ জ্ঞেয়বিষয় প্রভৃতি উপাধিভেদেই জ্ঞানের ভেদ সাধন করেন। শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপ, রস প্রভৃতির জ্ঞানের মধ্য হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস প্রভৃতি বিষয় বাদ দিলে, জ্ঞানের কোনই ভেদ থাকে না। জাগরিত অবস্থার পরিস্ফুট জ্ঞান এবং স্বপ্ন অবস্থার অস্ফুট জ্ঞানের মধ্যেও বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। সুষুপ্তি অবস্থায় ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ থাকে না, এইজন্য সুষুপ্তি অবস্থায় কোনরূপ জ্ঞান থাকে না বলিয়া নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করিলেও, অদ্বৈতবেদান্তী এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন না। সুষুপ্তিকালেও অদ্বৈতবেদান্তের মতে জ্ঞান থাকে; তবে সুষুপ্তিতে স্থূল কোন বিষয় থাকে না বলিয়া, জাগরিত অবস্থার ন্যায় জ্ঞান স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় না ইহা অবশ্য সত্য কথা। কিন্তু তাহা বলিয়া সুষুপ্তিতে জ্ঞানের অভাব কল্পনা করা যায় না। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" কিছুই জানিতে পারি নাই, এইরূপে জ্ঞানোদয় হয়, ইহা সকলেই অনুভব করেন। এখন প্রশ্ন এই যে, এই জ্ঞান কি স্মৃতি? না অনুভব? সুষুপ্তি অবস্থায় দৃশ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগ থাকে না, সুতরাং সুষুপ্তির অজ্ঞানের অনুভবকে প্রত্যক্ষ বলা যায় না। ব্যাপ্তি জ্ঞান বা সাদৃশ্যবোধ না থাকায়, উহাকে অনুমান কিংবা উপমান-জ্ঞানও বলা চলে না। শব্দ-জ্ঞানজন্য নহে বলিয়া, ইহাকে শাব্দবোধও বলা যায় না। অগত্যা ইহাকে স্মৃতিই বলিতে হইবে। "অবেদিষম্" "জানিয়াছিলাম্" এই অতীত অনুভবকে স্মৃতি বলিয়া সাব্যস্ত করিলেই ঐ স্মৃতির মূলে যে সুষুপ্তিকালীন অনুভব বিদ্যমান আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কেননা, অনুভূত বিষয় সম্পর্কেই স্মৃতি উদিত হয়। সংস্কার স্মৃতির কারণ। অনুভবই পরক্ষণে সংস্কারের রূপ পরিগ্রহ করে এবং মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিয়া স্মৃতি জন্মায়। অননুভূত বিষয় কস্মিন্ কালেও স্মৃতিতে ভাসে না। সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের যখন স্মৃতি হইতেছে, তখন সুষুপ্তিতে যে অজ্ঞানের অনুভব হইয়াছে, ইহা না মানিয়া উপায় নাই;

অর্থাৎ সুষুপ্তিকালেও অজ্ঞানের যে জ্ঞান ছিল ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। "সুখমহমস্বাপ্‌সম্" এইরূপ সুখ-স্মৃতিও সুষুপ্তিতে যে সুখানুভূতি হইয়াছে তাহাই নিঃসন্দেহে বুঝাইয়া দেয়। সুষুপ্তিতে জ্ঞানের অভাব সাধিত হয় না, জ্ঞানের সদ্‌ভাবই প্রমাণিত হয়।

কোন কোন মনীষী মনে করেন যে, সুষুপ্তিতে সুখের অনুভূতি থাকিলে, ঐ সুখ কোন সুখকর বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই উদিত হইবে। নির্বিষয় সুখের অনুভূতি হয় না। আলোচ্য ক্ষেত্রে যখন কোন বিশেষ সুখের ইঙ্গিত নাই, তখন "সুখ" শব্দে এখানে "দুঃখের অভাবই" বুঝিতে হইবে এইরূপ কল্পনার কোনও মূল্য দেওয়া চলেনা। কারণ, "নকিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপে যে অজ্ঞানের অনুভব হয়, এখানে কোন বিশেষ অজ্ঞান বুঝায় না। সর্বপ্রকার জ্ঞানের অভাবই বুঝায়। অতএব সুষুপ্তিতে (সর্ববিধ জ্ঞানের অভাব থাকায়) দুঃখাভাবেরও জ্ঞানোদয় হইতে পারে না। সুষুপ্তিতে সর্বপ্রকার জ্ঞানের অভাব ঘটিবে, অথচ দুঃখাভাবের জ্ঞান হইবে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? তারপর, অভাবের বোধ হইতে গেলেই যে বস্তুর অভাব অনুভূত হয়, তাহার (অভাবের সেই প্রতিযোগীর) জ্ঞান পূর্বে থাকা অত্যাবশ্যক হয়। ঘট না জানিলে ঘটের অভাব বুঝা যায় না। এইরূপ দুঃখের জ্ঞান না থাকিলে, দুঃখের অভাবের অনুভব জন্মিতে পারে না। এই অবস্থায় অভাব-বোধ উপপাদনের জন্যই সুষুপ্তি অবস্থায়ও দুঃখের জ্ঞান মানিয়া লইতে হয়। ফলে, সুষুপ্তি আর সুষুপ্তি থাকিবে না। একজাতীয় স্বপ্নই হইয়া দাঁড়াইবে। পদ্মপাদ, প্রকাশাত্মযতি, বিদ্যারণ্য প্রভৃতি অদ্বৈতাচার্যগণ বলেন, "সুখমহমস্বাপ্‌সম্" "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এই সকল স্থলে আত্মিক সুখের এবং অনাদিভাবরূপ অজ্ঞানেরই স্মৃতি হইয়া থাকে, আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ এবং সুখ বা আনন্দস্বরূপ। স্বপ্রকাশ আত্মা সুখস্বরূপ হইলে, আত্মার প্রকাশে সুখেরও যে প্রকাশ হইবে, তাহতে সন্দেহ কি? যাহা নিত্য-স্বপ্রকাশ তাহা কোনসময়ে কোনকারণেই অপ্রকাশ থাকিতে পারে না। অতএব সুষুপ্তি অবস্থায় স্বপ্রকাশ, সুখস্বরূপ সাক্ষী চৈতন্য যে ভাসমান ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। অজ্ঞান অনাদিসিদ্ধ বলিয়া সুষুপ্তিতে অজ্ঞানেরও অভাব নাই। এই অজ্ঞান সাক্ষিচৈতন্য-ভাস্য এবং ইহা ব্রহ্মের স্বরূপের আবরক একপ্রকার ভাবপদার্থ, অভাবপদার্থ নহে। অজ্ঞান সাক্ষি-চৈতন্যকে আবৃত করে না,

চৈতন্যাংশ আবৃত হইলে সাক্ষি-চৈতন্য-প্রকাশ্য অজ্ঞানকে প্রকাশ করিবে কে? অজ্ঞানের ইহাই স্বভাব যে ভাবরূপ অজ্ঞান ব্রহ্মকেই আবৃত করে, সাক্ষি-চৈতন্যকে আবৃত করে না। এইজন্য সুষুপ্তি অবস্থায়ও অনাবৃত আত্মিক সুখের এবং অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞানের অনুভব বিলুপ্ত হয় না। জাগরণে তাহাদেরই "সুখমহমস্বাপ্‌সম্" "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" এইরূপে স্মৃতি হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের কোনরূপ বৃত্তি থাকে না। এই অবস্থায় আত্মিক সুখের এবং অনাদি অজ্ঞানের অনুভব হইবে কিরূপে? নিত্য-স্বপ্রকাশ চিদানন্দ আত্মা সুষুপ্তি অবস্থায় বৃত্তির কোনরূপ অপেক্ষা না রাখিয়াই (বৃত্তি নিরপেক্ষ হইয়াই) আত্মানন্দ এবং অজ্ঞানকে অনুভব করিবে, এইরূপ কল্পনাও যুক্তিসহ নহে। কেননা, নিত্য চিদানন্দের বৃত্তিনিরপেক্ষ অনুভব স্বীকার করিতে গেলে, ঐ অনুভবকেও নিত্যই বলিতে হইবে। নিত্য অনুভব কোন কালেই নষ্ট হয় না; সংস্কারও জন্মায় না। সংস্কার ব্যতীত আলোচ্য সুখ-স্মৃতি প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা যায় না। সুষুপ্তির সুখের অনুভব নিত্য হইলে, সুষুপ্তির পরে জাগরিত অবস্থায়ও সেই নিত্য চৈতন্যের অনুভবই হইতে পারে, স্মৃতি হইবার কোন প্রশ্নই আসে না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের বৃত্তি না থাকিলেও, অবিদ্যা-বৃত্তি থাকে। অবিদ্যা বা অজ্ঞানই সেক্ষেত্রে "সুখাকার" বৃত্তিরূপে বিবর্তিত হইয়া থাকে। চৈতন্য-দীপ্ত (সাক্ষি-ভাস্য) অজ্ঞান-বৃত্তির সাহায্যে সুষুপ্তিকালীন সুখের অনুভব হয়। ঐ অজ্ঞান-বৃত্তি সুষুপ্তি সময়ে বিদ্যমান থাকে। সুষুপ্তি ভাঙ্গিলে, সুখ-সংস্কার উৎপাদন করিয়া অবিদ্যা-বৃত্তি বিনষ্ট হয় এবং ঐ সংস্কারের ফলে সুখের স্মৃতি হয়। সুষুপ্তির জ্ঞান কোনরূপ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান নহে। ভাবরূপ অজ্ঞান-বৃত্তির সাহায্যে সুষুপ্তিকালীন সুখের অনুভব হইয়া থাকে, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তের রহস্য। সুষুপ্তিতে কিংবা মূর্চ্ছা প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ বিলীন হইয়া যায় বলিয়া, কোনরূপ জ্ঞানোদয় হয় না, একথা সত্য নহে। অন্তঃকরণ-বৃত্তি বিলুপ্ত হইলেও অদ্বৈতবেদান্ত-মতে অবিদ্যা-বৃত্তির সাহায্যে উল্লিখিত প্রকারে জ্ঞানোদয় হইবে, ইহাতে আপত্তি কি? যাঁহারা অবিদ্যা-বৃত্তি মানেন না, কেবল অন্তঃকরণ-বৃত্তির সাহায্যেই জ্ঞানোৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, তাঁহাদের মতেই সুষুপ্তি অবস্থার জ্ঞান ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হইয়া

পড়ে। অন্তঃকরণ প্রভৃতি না থাকায়, সুষুপ্তিতে “অহং”ভাব থাকেনা বটে, কিন্তু নিত্য আত্মা এবং আত্মানুভব থাকে। ইহা ইহতে “অহং পদার্থ” যে আত্মা নহে, তাহাই প্রমাণিত হয়। সুষুপ্তিতে যেমন অনাবৃত আত্মচৈতন্য বা আত্মানন্দ বর্তমান থাকে, মুক্তিতেও সেইরূপ অনাবৃত চিদানন্দই বিরাজ করে। মিথ্যা অহংভাব বা আমিত্ববুদ্ধি থাকে না। মিথ্যা অহংভাবের বিলোপ কিন্তু আত্মার বিনাশ নহে। অহম্ বা আত্মার অনাবৃত পরিপূর্ণ চিদানন্দ-রূপেরই বিকাশমাত্র। মুক্তিতে অহংভাবেরই প্রকাশ হয়। স চ প্রত্যগাত্মা মুক্তাবপি “অহম্” ইত্যেব প্রকাশতে শ্রীভাষ্য, ১০৯ পৃষ্ঠা, এইরূপে রামানুজস্বামী যে সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত যুক্তিতে অদ্বৈতবেদান্তী কোনমতেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। শ্রুতি এবং স্মৃতিতে অহংভাবের যে বর্ণনা আছে, তাহা আধ্যাসিক বা আবিদ্যক অহমর্থেরই বর্ণনা, প্রকৃত আত্মস্বরূপের বর্ণনা নহে। প্রকৃত আত্মা অনাবৃত বা নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ইহাই চরম আত্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা। অনাদি অবিদ্যা-প্রভাবে জীবের দৃষ্টিতে তাহার শিবরূপ (ব্রহ্মরূপ) আবৃত থাকে। জ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যার আবরণ তিরোহিত হইলে, জীব ও শিবের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। জীব তখন স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহারই নাম মুক্তি বা জীবের শিবভাব। এইরূপ মুক্তিতে আত্ম-বিনাশের কথা, কিংবা বৌদ্ধোক্ত মহাশূন্যতার কথা উঠে কি করিয়া? আত্মবিনাশের বিভীষিকা তাঁহাদিগকেই পাইয়া বসে, যাঁহাদের আত্মার যথার্থ রূপের সহিত পরিচয় নাই, যাঁহারা অনাত্মা “অহং”কেই আত্মা বলিয়া মনে করেন। আত্মা অজ্ঞেয় অবাঙ্মনস-গোচর। এইরূপ আত্মা অহংপ্রত্যয়-গম্য হইবে কিরূপে? যাহা অহংপ্রত্যয়-গম্য তাহা আত্মা নহে, অনাত্মা। কর্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি অনাত্মা অন্তঃকরণের ধর্ম। জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতি অনাত্মধর্ম অহমর্থে আরোপ করায়, অহমর্থও যে অনাত্মা হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? এই সত্যই (১) অহমর্থোঽনাত্মা অহংপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ শরীরবৎ, (২) অহংশব্দঃ আত্মান্যঃ অহংশব্দাভিধেয়ত্বাৎ অহংকারশব্দাভিধেয়বৎ, এইরূপ অনুমান-প্রয়োগের সাহায্যে অদ্বৈতবাদী উপপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উল্লিখিত অনুমানের প্রথম অনুমানটি যে নির্দোষ, তাহা আমরা ইতঃপূর্বে বৈষ্ণব-মতের বিচার প্রসঙ্গেই দেখাইয়া আসিয়াছি। দ্বিতীয় অনুমানে গর্ব বা অহংকার-বাচক

অব্যয় "অহম্" শব্দ ও অস্মৎশব্দ হইতে নিষ্পন্ন অহংপদের অর্থভেদ কল্পনা করিয়া যে "অসিদ্ধি" দোষ উদ্‌ভাবন করা হইয়া থাকে, তাহার কোন মূল্য দেওয়া চলেনা। কেননা, শব্দের প্রকৃতি ভিন্ন হইলেই তাহাদের অর্থ বা অভিধেয় যে ভিন্ন হইবে, বিভিন্ন প্রকৃতিজাত শব্দ যে একই অর্থের বোধক হইতে পারে না, তাহা কে বলিল? অব্যয় মকারান্ত অহম্ এবং অস্মদ্ এই দকারান্ত অহংশব্দের প্রকৃতি ভিন্ন হইলেও, তাহারা পর্যায়শব্দই বটে। তাহাদের কোনরূপ অর্থভেদ নাই। অতএব অনুমানের পক্ষ অহংপদ 'অস্মদ্'শব্দ হইতে নিষ্পন্ন এবং হেতুও দৃষ্টান্তের অন্তর্গত 'অহম্'শব্দ অব্যয় হইলেও, এই অনুমানে হেতুর অসিদ্ধি, দৃষ্টান্তের অসিদ্ধি প্রভৃতি কোনরূপ অসিদ্ধি-দোষেরই সম্ভাবনা নাই।[১] সুতরাং উক্ত অনুমান অনুসারে অহমর্থের অনাত্মত্বই সাব্যস্ত হয়।

আত্মা যদি জ্ঞানস্বরূপ হয়, তবে অনাত্মা শরীর প্রভৃতিতে যখন ভ্রান্ত আত্মবুদ্ধির উদয় হয়, তখন শরীরে জ্ঞানরূপতারই প্রতিভাস হইত, জ্ঞাতৃত্বের প্রতীতি হইত না। শরীর প্রভৃতিতে আত্মাভিমানস্থলে জ্ঞাতৃত্বেরই প্রতিভাস হয়। সুতরাং জ্ঞাতা "অহম্" পদার্থকেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। "অহম্" এইরূপ অবাধিত প্রত্যক্ষ, অনুমান, শ্রুতি ও স্মৃতির অসংখ্য উক্তি জ্ঞাতা অহমর্থকেই আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে— 'জ্ঞাতা অহমর্থ এবাত্মা।' শ্রীভাষ্য, ১১১ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং।

অতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাদুক্তন্যায়াগমান্বয়াৎ।
···আত্মা "জ্ঞাতাঽহমিতি" ভাসতে॥ আত্মসিদ্ধি।

উল্লিখিত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের খণ্ডনে বলা যায় যে, শরীরে অহংবুদ্ধির ন্যায় আত্মার জ্ঞাতৃত্ববোধ যে ভ্রম নহে, তাহা তোমাকে কে বলিল? তারপর, (১) অহমর্থঃ (পক্ষ) মোক্ষান্বয়ী (সাধ্য) তৎসাধনকৃত্যাশ্রয়ত্বাৎ, (হেতু), (২) অহমর্থঃ অনর্থনিবৃত্ত্যাশ্রয়ঃ অনর্থাশ্রয়ত্বাৎ, এইরূপ অনুমানও যে নির্দোষ নহে, সুধী তাহা লক্ষ্য করিবেন। প্রথম অনুমানে ঋত্বিক্ বা পুরোহিত যিনি যজমানের স্বর্গসুখলাভের জন্য বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিজে তো ঐসকল ক্রিয়ার ফলে স্বর্গলাভ করেন না, তিনি তো দক্ষিণা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। এই অবস্থায় প্রথম অনুমানে

১। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৬০১ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং

হেতু থাকিলেও দেখা যায় যে সাধ্য থাকেনা। সুতরাং প্রথমোক্ত অনুমানের হেতু যে সাধ্য-ব্যভিচারী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় অনুমানে "অহমজ্ঞঃ" এইরূপ প্রতীতিবলে "অহম্"কে যেমন অজ্ঞানের বা অনর্থের আশ্রয় বলা হয়, সেইরূপ "স্থূলোঽহম্" এই প্রকার প্রত্যক্ষবশতঃ শরীরকেও অনর্থের আশ্রয় বলা যাইতে পারে। ফলে, শরীরে উক্ত অনুমানের ব্যভিচার অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ আলোচ্য প্রত্যক্ষ অনুসারে অহম্ বা আত্মার ন্যায় শরীরও অনর্থের আশ্রয় হওয়ায়, উল্লিখিত অনুমান অনুসারে আত্মার ন্যায় শরীরকেও অনর্থনিবৃত্তির আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অহমর্থ আত্মাকেই কেবল যে অনর্থনিবৃত্তির আশ্রয় বলা হইয়াছে তাহা অসঙ্গত হয়।

বৈষ্ণবোক্ত অনুমানের দোষ দেখা গেল। এখন গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্রের উক্তির মর্ম কি, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। উপনিষদে আত্মাকে যেমন দ্রষ্টা, শ্রোতা, রসয়িতা, ঘ্রাতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বৃহদাঃ, ৬।৩।৭, প্রভৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার সেই উপনিষদেই "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ," "ন মতের্মন্তারং মন্বীথাঃ," এইরূপে দৃষ্টি (অনুভূতি) ও মননের অতিরিক্ত—দ্রষ্টা (দর্শনকারী), মন্তা (মননকারী) আত্মার স্বরূপের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। যেই বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে "সর্বেশ্বরঃ, সর্বদৃক্, সর্ববেত্তা, সর্বশক্তিঃ, পরমেশ্বরাখ্যঃ" বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৮৬, এইরূপে সর্ববিধ জ্ঞানও সর্ববিধ শক্তির আধার পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই বিষ্ণুপুরাণেই 'জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ', এইরূপে ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া, জ্ঞানই ব্রহ্ম, এই রহস্য বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে—

প্রত্যস্তমিতং ভেদং যৎ সত্তামাত্রমগোচরম্।
বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্ম সংজ্ঞিতম্॥[১] বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।৫৩

যাহা সর্বপ্রকার ভেদ-সম্পর্করহিত, কেবল সৎস্বরূপ, বাক্যের অগোচর এবং আত্মপ্রত্যয়-বেদ্য, সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম নামে পরিচিত।

এই অবস্থায় শাস্ত্রোক্তির মর্ম বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞানস্বরূপ, এই দুইপ্রকার বর্ণনার মধ্যে কোনটি যথার্থ আত্মরূপের বর্ণনা, আর কোনটি মায়িক "অহম্" রূপের বর্ণনা। আমরা এই প্রবন্ধের আরম্ভেই সগুণ ও নির্গুণ বাক্যের তাৎপর্য বিচার প্রসঙ্গে দেখিয়া আসিয়াছি

যে, সগুণ-বাক্য অপেক্ষায় নির্গুণ বাক্যই প্রবল, সগুণ-বাক্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল। সেই দৃষ্টিতে আলোচ্য ক্ষেত্রেও দেখা যাইবে যে, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব-বোধক শাস্ত্রোক্তি সগুণভাব প্রতিপাদন করায়, নির্গুণ ভাবের, আত্মার বিজ্ঞান-রূপতার বোধক বাক্য হইতে দুর্বল বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। নির্বিশেষ বস্তু যে অপ্রমাণ নহে এবং নির্বিশেষ আত্মার লক্ষণ নিরূপণও যে অসম্ভব নহে, তাহা আমরা ইতঃপূর্বেই বিচার করিয়া আসিয়াছি। অনুভূতির একত্ব ও আত্মত্ব সমর্থন করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, "নির্ধূতনিখিলভেদা সংবিদ্, অতএব নাস্যাঃ স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয়ো জ্ঞাতা নাম কশ্চিদস্তীতি স্বপ্রকাশরূপা সৈবাত্মা"। শ্রীভাষ্য, ৬৬-৬৭ পৃঃ ; নির্ণয় সাগর সং। সংবিদ্ বা জ্ঞান বস্তুটি সর্বপ্রকার ভেদরহিত। সেইজন্য ইহার স্বরূপের অতিরিক্ত আশ্রয় বলিয়াও কিছু নাই, জ্ঞাতা বলিয়াও কিছু নাই। এই আলোচনা হইতে একথা বলিলে অসঙ্গত হয় না যে, অদ্বৈতবেদান্তী সর্বপ্রকার ভেদ-সম্পর্ক-রহিত, অখণ্ড ভূমা-জ্ঞানকেই আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণব-বেদান্তী সেই নির্বিশেষ ভূমা-বিজ্ঞানের রাজ্যে পৌঁছিতে পারেন নাই, বৃত্তিজ্ঞানকেই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বুঝিয়াছেন। এই জ্ঞান ইঁহাদের মতে অখণ্ড নহে, সখণ্ড, নিত্য নহে, অনিত্য, নির্বিশেষ নহে, সবিশেষ। জ্ঞাতার ইন্দ্রিয়-শক্তির এবং বোধ-শক্তির তারতম্যানুসারে ঐ ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের সংকোচ, বিকাশ প্রভৃতি অসংকোচে রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যগণ স্বীকার করিয়াছেন[১], এবং জ্ঞানের সংকোচ ও বিকাশে জ্ঞাতার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়াছেন। জ্ঞানে ইন্দ্রিয় ও জ্ঞাতার ছাপ রাখিতে গিয়া, বৈষ্ণব-বেদান্তী জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই ত্রয়ীর জালে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার সংকুচিত দৃষ্টিতে অসীম ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ধরা পড়ে নাই। ইহাই অদ্বৈতবাদের সহিত বৈষ্ণব-বেদান্তীর বিরোধের কারণ। অদ্বৈতবেদান্তী জ্ঞানগিরির তুঙ্গশৃঙ্গে উঠিয়া, ইঁহাদের সহিত বিরোধ

১। ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াং কর্মণা সংকুচিতস্বরূপং তত্তৎকর্মানুগুণতরতমভাবেন বর্ততে, তচ্চেন্দ্রিয়দ্বারেণ ব্যবস্থিতম্। তমিমমিন্দ্রিয়দ্বারজ্ঞানপ্রসারমপেক্ষ্যোদয়াস্তময়ব্যপদেশঃ প্রবর্ততে। জ্ঞানপ্রসারে তু কর্তৃত্বমস্ত্যেব, তচ্চ ন স্বাভাবিকম্, অপি তু কর্মকৃতম্।

শ্রীভাষ্য, ১০১ পৃষ্ঠা, সাহিত্যপরিষৎ, সং।

করেন নাই। প্রেমময়ে ইঁহাদের ভক্তির দৃঢ়তা দেখিয়া, ইঁহাদিগকে মুক্তি পথযাত্রী বুঝিয়া, স্থূলের বা ব্যক্তের উপাসনার মধ্যদিয়াই অব্যক্তে, সূক্ষ্মে পৌঁছিবার সংকেত দিয়াছেন।

অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ভবেৎ।

তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্বমাশ্রয়েৎ॥ ভগবতী গীতা।

এই দৃষ্টিতে আত্মতত্ত্ব বিচার করিলে, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের, সগুণ ব্রহ্মবাদ এবং নির্গুণ ব্রহ্মবাদের মধ্যে বিরোধের অবসান হয়; সামঞ্জস্যের সূত্রও আবিষ্কৃত হয়। জ্ঞানমূর্তি আচার্য শঙ্কর, ভক্তপ্রবর রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক, বল্লভ, বলদেব প্রভৃতি সকলেই একাধারে সত্যদর্শী এবং সাধক। আত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু, আত্মার তুলনায় অপর সকল বস্তুই অসত্য। এইজন্যই উপনিষদে ব্রহ্মকে "সত্যস্য সত্যম্" বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সত্যের ভাবান্তর বা রূপান্তর নাই। যাহার রূপান্তর বা ভাবান্তর হয়, তাহা কখনও সত্য হইতে পারে না, তাহা মিথ্যা। আত্মা যখন পরমসদ্ বস্তু, তখন তাহার স্বরূপ সম্পর্কে সংহিতা উপনিষদ্ প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্রে এবং বিভিন্ন দর্শনে নানারূপ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত দেখা যায় কেন? আর, ঐরূপ পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রচার করায় ঐ সকল শাস্ত্রকে শাস্ত্রের মর্যাদাই বা দেওয়া যায় কি করিয়া? অপরাপর শাস্ত্রের কথা বাদ দিয়া, সর্ববিদ্যার সার ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপনিষদে 'স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ' এই দেহাত্মবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া, চরমভূমিতে আনন্দময় আত্মার স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার এই উক্তিকে ভিত্তি করিয়াই ভারতীয় দার্শনিকগণ আনন্দময় আত্মার সম্পর্কে তাঁহাদের পরস্পরবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত-সৌধ রচনা করিয়াছেন। ইহার কারণ দুর্বোধ্য নহে। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বা আত্ম-জিজ্ঞাসাই যে জিজ্ঞাসার চরম স্তর তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই আত্মার স্বরূপ কি? এই প্রশ্নও খুব স্বাভাবিক। ইহার উত্তর বিভিন্ন দার্শনিক আচার্যের মুখে বিভিন্ন প্রকারে শুনিতে পাওয়া যায়। সত্য সর্বতো মুখ। সেই সার্বভৌম সত্যের যে মুখ যাঁহার জ্ঞাননেত্রে যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, সেইরূপেই তিনি তাঁহার দর্শনে সত্যের স্বরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। লোকে দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। আমি কৃশ, আমি স্থূল এইরূপ

প্রত্যক্ষও দেহাত্মবাদই সমর্থন করে। প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদী চার্বাক এই আত্মবাদই প্রচার করিলেন। এই চার্বাক-মত প্রাণ-আত্মবাদ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ মন-আত্মবাদ প্রভৃতি বিবিধ শাখায় ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়া চিন্তা রাজ্য জুড়িয়া বসিল। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক চক্ষুতে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, জরামরণশীল দেহ এবং বিকারী ভঙ্গুর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কোনমতেই আত্মা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে পৃথক্; এবং দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা, জ্ঞান-ইচ্ছা-সুখ-দুঃখ প্রভৃতি গুণময়। অতএব আত্মা সুখী দুঃখী কর্তা এবং ভোক্তা বটে। এইরূপ আত্মবোধ স্থূল আত্মজ্ঞান হইলেও, দেহাত্মবাদ অপেক্ষা এইরূপ আত্মানুভূতি যে সূক্ষ্ম তাহাতে সন্দেহ কি? আত্ম-জিজ্ঞাসার ইহা প্রথম স্তর।[১] সগুণ আত্মবাদী দার্শনিকগণ এই স্তরেই বিরাজ করেন। ন্যায়-বৈশেষিকের পর সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন বুঝাইয়া দিলেন যে, সুখ, দুঃখ, কর্তৃত্ব প্রভৃতি আত্মার গুণ নহে; ঐ সকলই বুদ্ধির গুণ। আত্মা সুখী, দুঃখী, কর্তা নহে, আত্মা স্বতঃ অসঙ্গ, নির্লেপ, নিরঞ্জন। নির্মল আত্মা বুদ্ধির অতি নিকটে অবস্থান করায়, বুদ্ধিস্থ সুখ, দুঃখ প্রভৃতি গুণ আত্মায় প্রতিবিম্বিত হয় এবং আত্মগত হইয়া প্রতিভাত হয়। ফলে, আত্মাকে সুখী, দুঃখী বলিয়া ভ্রম হয়। আত্মা প্রকৃতপক্ষে নিত্য জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতা নহে, কর্তা নহে, অকর্তা, সঙ্গী নহে, কূটস্থ, অসঙ্গ। সাংখ্য, পাতঞ্জল দর্শনেও দেহভেদে আত্মার ভেদ এবং আত্মার ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি স্বীকার করা হইয়া থাকে। আত্মোপলব্ধির ইহা দ্বিতীয় স্তর।

তৃতীয় স্তরে 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্'। কঠ, ৩৷১৫, 'অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘম্' এইরূপ সর্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম রহিত, 'একাত্মপ্রত্যয়সারং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্' মাণ্ডুক্য-৭, একমাত্র আত্মারূপেই প্রসিদ্ধ, শান্ত, শিব, অদ্বয়, বেদান্তবেদ্য সূক্ষ্মতম আত্মতত্ত্বই উপযুক্ত জিজ্ঞাসুর নিকট প্রকাশিত হয়। সেই অবস্থায় জীবে ও শিবে কোনরূপ ভেদ থাকে না। এইরূপ সূক্ষ্মতম যোগি-গম্য আত্মতত্ত্ব অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই ক্রমে ক্রমে ধাপে

১। ন্যায়বৈশেষিকাভ্যাং হি সুখিদুঃখ্যাদ্যনুবাদতো দেহাদিমাত্রবিবেকেনাত্মা প্রথম-ভূমিকায়ামনুযাপিতঃ। একদা পরসূক্ষ্মে প্রবেশাসম্ভবাৎ।

বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য-ভূমিকা।

ধাপে ভারতীয় দর্শনে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়, এই পাঁচটি আত্মার কোষ বা আবরণ কল্পিত হইয়াছে এবং এই স্থূল আবরণগুলি ভেদ করিয়া চরমে আনন্দময় আত্মতত্ত্বে পৌঁছিবার উপদেশ করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে "নাম" হইতে আরম্ভ করিয়া "বৈষয়িক সুখ" পর্যন্তকে আত্মরূপে উপদেশ করিয়া, সর্বশেষ ভূমা আত্মার বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উপনিষদের এইরূপ উপদেশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এক একখানা করিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া যেমন অভ্রভেদী সৌধের উপরে উঠিতে হয়, সেইরূপ স্থূল হইতে আরম্ভ করিলেই ক্রমে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম আত্মরহস্য বুঝিতে সমর্থ হইবে বিবেচনা করিয়াই, নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে।[১]

ছান্দোগ্যের অষ্টম প্রপাঠকের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, যাঁহারা উত্তম অধিকারী বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য, তাঁহারাই কেবল নির্বিশেষ আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়, পরমার্থ সৎ। সেই ব্রহ্মের দিক্ নাই, দেশ নাই, কাল নাই, গুণ নাই, ক্রিয়া নাই। ঐরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্ম অসত্য বস্তু, শিষ্যদিগের এইরূপ ভ্রম অপনোদনের জন্য গুণময় ব্রহ্ম উপাস্যরূপে বেদ-উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতি কল্যাণময়ী জননীর ন্যায় মনে করেন যে, গুণ ধরিয়াই ইঁহারা সত্য পথে আসুক; সাধনার রাজ্যে প্রবেশ করুক। সবিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা সৎপথে আসিলে, কর্মসন্ন্যাস বা বৈরাগ্য পরিপাকপ্রাপ্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।[২] যাঁহারা

১। (ক) সোপানারোহণবৎ স্থূলাদারভ্য সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরঞ্চ বুদ্ধিবিষয়ং জ্ঞাপয়িত্বা তদতিরিক্তে স্বারাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামীতি নামাদীনি নির্দিক্ষতি। ছান্দোগ্য উপঃ শং ভাষ্য, ৮ম প্রপাঃ।

(খ) অধমোঽধিকারী নামাদীনি ব্রহ্মত্বেনোপাস্য তৎফলঞ্চ ভুক্‌ত্বা ক্রমেণ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মভাবং প্রাপ্নোতি। শংভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত টীকা।

২। দিগ্‌দেশগুণগতিফলভেদশূন্যং হি পরমার্থসদদ্বয়ং ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধীনামসদিব প্রতিভাতি। সন্মার্গস্থাস্তাবদ্ ভবন্তু। ততঃ শনৈঃ পরমার্থসদপি গ্রাহয়িষ্যামীতি মন্যতে শ্রুতিঃ।
ছান্দোগ্য উপঃ, ৮ম প্রপাঠক, শং ভাষ্য ও আনন্দগিরিকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

কর্মপ্রবণ, গুণে যাঁহাদের চিত্ত আসক্ত, তাঁহাদিগকে প্রথমেই নির্বিশেষ, নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মোপদেশ করিবে না, করিলেও তাহা ইঁহাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে। ঐরূপ আত্মতত্ত্ব ইঁহারা ধারণায় আনিতে পারিবে না। অথচ ইঁহাদের কর্মনিষ্ঠা এবং কর্মাসক্তিও তাহা দ্বারা শিথিল হইয়া পড়িবে। ফলে, ঐরূপ ব্রহ্মোপদেশের দ্বারা সুফল না হইয়া, কুফলই ফলিবে বেশী। এইজন্যই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিণাম্" ॥ গীতা, ৩।২৬।

পরমাত্ম-গিরির তুঙ্গশৃঙ্গে পৌঁছিতে হইলে, গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি প্রভৃতি মনীষিগণ আত্মচিন্তার যে সোপানাবলী (ধাপ বা সিঁড়ি) রচনা করিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিয়াই উঠিতে হইবে। লাফ দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলে চলিবে না; তাহাতে চিরতরে পঙ্গু হইয়াই থাকিতে হইবে। কল্যাণের উদ্দেশ্যে, সামঞ্জস্যের দৃষ্টিতে, বিভিন্ন শাস্ত্রে যে আত্মোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; সেই আত্মতত্ত্ব বিচার করিলে, বিরোধের কোন কথা আসে না, বিরোধের মধ্যে মিলনের সূত্রই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কাশ্মীরক সদানন্দ যতি যথার্থই বলিয়াছেন যে, দ্বৈতজগৎ মায়াময়, অদ্বৈতই একমাত্র তত্ত্ব, ইহা সাব্যস্ত হইলে, দ্বৈতপ্রতিপাদক সমস্ত শাস্ত্রই মিথ্যা এবং অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে, এইরূপ কল্পনারও কোন সঙ্গত কারণ নাই। কেননা, সকল শাস্ত্রই ঋষিপ্রণীত। ঋষিরা ত্রিকালজ্ঞ এবং সত্যদর্শী। তাঁহাদের রচিত শাস্ত্র ভ্রান্ত এবং অপ্রমাণ হইবে, ইহা অসম্ভব কথা। অদ্বৈতব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনই তত্ত্বশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ", এক কথায় ইহাই নিখিল ঋষি-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। যাঁহারা স্থূলদর্শী, যাঁহাদের চিত্ত বহির্মুখ এবং বিষয়প্রবণ, তাঁহারা শ্যামা ধরিত্রীকে, নিজ আত্মাকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারেন না। অদ্বৈত-রহস্য ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য, নাস্তিক্যবুদ্ধি বিদূরিত করিবার উদ্দেশ্যে, শাস্ত্রকারগণ সুখবোধ্য দ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন, ভক্তিবাদ, কর্মবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং অনিত্য কর্মফলে অপরিতৃপ্ত শিষ্যকে দ্বৈত সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া অদ্বৈতে পৌঁছিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। সত্যদ্রষ্টা ঋষি কোন শাস্ত্রেই দ্বৈতবাদ চরম তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করেন নাই, অদ্বৈতে নিষ্ঠালাভের

সোপান হিসাবেই দ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।[১] দ্বৈতনদী পরিণামে অদ্বৈত-সাগরে মিশিয়াই নাম-রূপ হারাইয়া ফেলে। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, সগুণ ব্রহ্মবাদ, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেরই বিবিধ বিচিত্র বিভাব মাত্র, বিভিন্ন তত্ত্ব নহে। যিনি স্বতঃ নির্গুণ, নির্বিশেষ, তিনিই মায়াবশে সগুণ সবিশেষ হন। ঈশ্বর, পুরুষোত্তম প্রভৃতিরূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করেন, দুষ্টের শাসন শিষ্টের পালন করেন। মায়ার বন্ধন খসিয়া গেলে, মায়িক বিগ্রহ এবং নাম-রূপ প্রভৃতির পরিচয় তিরোহিত হয়। মূর্তি অমূর্তে, ব্যক্ত অব্যক্তে, মর্ত্য অমৃতে-চিদানন্দে বিলীন হয়। এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দই অবশিষ্ট থাকে। সেই এককেই বহুনামে বহুরূপে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়।

> একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি।
> অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥ ঋগবেদ, ১।১৬৪।৪৬

১। ননু তর্হি দ্বৈতপ্রতিপাদনপরাণাং সর্বেষামপি প্রস্থানানাং প্রাপ্তং নির্বিষয়ত্বম্। ন চ ইষ্টাপত্তিঃ, তৎ কর্তৄণাং মহর্ষীণাং ত্রিকালদর্শিত্বাদিতি চেন্ন, মুনীনামভিপ্রায়াঽপরিজ্ঞানাৎ। সর্বেষাং প্রস্থানকর্তৄণাং মুনীনাম্‌……অদ্বিতীয়ে পরমেশ্বরএব বেদান্তপ্রতিপাদ্যে তাৎপর্যম্। ন হি তে মুনয়ো ভ্রান্তাঃ, তেষাং সর্বজ্ঞত্বাৎ,… কিন্তু বহির্মুখপ্রবণানাং আপাততঃ পরমপুরুষার্থে অদ্বৈতমার্গে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যনিরাকরণায় তৈঃ প্রস্থানভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ, ন তু তাৎপর্যেণ।

কাশ্মীরক সদানন্দযতি-বিরচিত, অদ্বৈত-ব্রহ্মসিদ্ধি,
প্রথমমুদ্রণ, ৪২-৪৩ পৃঃ, কলিকাতা
বিশ্ব বিঃ সং।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরমাত্মা পরব্রহ্ম চিদানন্দস্বরূপ, যাহা দেহাভিমানী অহংপ্রত্যয়-গম্য, তাহা প্রকৃত আত্মা নহে, অমূর্ত আত্মার তাহা অবিদ্যাকল্পিত জীবমূর্তি। অনাদি অবিদ্যা প্রভাবে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই দেহ, মনঃ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া স্বভাবতঃ অসীম-অনন্ত হইলেও সসীমের ন্যায়, পরমাত্মা হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নের ন্যায়, অকর্তা হইলেও কর্তার ন্যায়, অভোক্তা, অজ্ঞাতা হইলেও ভোক্তা জ্ঞাতার ন্যায়, অবাঙ্মনসগোচর হইলেও অহংপ্রত্যয়-গোচর হইয়া "জীব" আখ্যা লাভ করে। অনন্ত মহাব্যোম যেমন এক অভিন্ন হইলেও, ঘট প্রভৃতি উপাধিভেদে সখণ্ড এবং ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ এক অখণ্ড চৈতন্যই ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিযোগে পরিচ্ছিন্ন হইয়া, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও শরীরের বিবিধ ধর্মের দ্বারা নানা ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হয়। পরমাত্মা স্বতঃ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন; তাহার ক্রিয়াশক্তি, ভোগশক্তি প্রভৃতি কোনরূপ শক্তিই থাকিতে পারে না। জড় বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ক্রিয়াশক্তি থাকিলেও, চেতন নহে বলিয়া ভোগশক্তি থাকা সম্ভবপর হয় না। ভোক্তা না থাকিলে, ভোগ্য জগতেরও কোন অর্থ হয় না। এইজন্য দেখা যায় যে, সচ্চিদানন্দ আত্মাই অবিদ্যা-সম্পর্কবশতঃ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির জালে জড়িত হইয়া, ক্রিয়াশক্তি, ভোগশক্তি প্রভৃতি শক্তি লাভ করিয়া থাকে; এবং কর্তা ভোক্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব, অহম্-অভিমানী প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।[১]

১। (ক) সত্যং প্রত্যগাত্মা স্বয়ংপ্রকাশত্বাদবিষয়োঽনংশশ্চ, তথাপি অনির্বচনীয়াবিদ্যা-পরিকল্পিত বুদ্ধিমনঃ সূক্ষ্মস্থূলশরীরেন্দ্রিয়াবচ্ছেদেন অনবচ্ছিন্নোঽপি বস্তুতোঽবচ্ছিন্ন ইব, অভিন্নঃ অপি ভিন্ন ইব; অকর্তা অপি কর্তেব, অভোক্তাপি ভোক্তেব, অবিষয়ঃ অপি অস্মৎপ্রত্যয়বিষয় ইব জীবভাবমাপন্নঃ অবভাসতে, নভ ইব ঘটমণিকমল্লিকাদ্যুপাধ্যবচ্ছেদভেদেন ভিন্নমিব অনেক ধর্মকমিব।

অধ্যাসভাষ্য-ভামতী, ৩৮ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং।

(খ) কর্তা ভোক্তা চিদাত্মা অহংপ্রত্যয়ে প্রত্যবভাসতে। ন চ উদাসীনস্য তস্য

জীবভাব যেমন আবিদ্যক এবং ঔপাধিক, নির্বিশেষ, নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ পরমেশ্বর ভাবও সেইরূপ অবিদ্যাকল্পিত এবং ঔপাধিক। মায়া উপাধিবশতঃ নির্বিশেষ ব্রহ্ম সগুণ সবিশেষ হইয়া থাকেন। তখনই তিনি হন ঈশ্বর বা মহেশ্বর। এই মায়িক সগুণভাব তাঁহার লীলামাত্র। গুণময়ের ভিন্ন নির্গুণের উপাসনা হয় না। উপাসকগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়াই লীলাময় পরমেশ্বর মায়িক দেহ ধারণ করিয়া দেহধারীর ন্যায় প্রতিভাত হন। জগজ্জননী মায়াকে বশীভূত করিয়া জগতের সৃষ্টিলীলায় প্রবৃত্ত হন, ধর্মের গ্লানি বিদূরিত করিবার জন্য নটরাজ জগতের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। তিনি মায়াধীশ। তাঁহার উপর মায়ার কোন প্রভাব নাই। এইজন্য এই সগুণ লীলা দ্বারা ব্রহ্মের নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবের কোন বিচ্যুতি ঘটে না। ঈশ্বর ও ব্রহ্ম অভিন্ন, ভেদ অবিদ্যাকল্পিত এবং মিথ্যা। ব্রহ্মের জীবভাব এবং ঈশ্বরভাব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদের উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যে "অবচ্ছেদবাদ" এবং প্রতিবিম্ববাদই প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে।

অবচ্ছেদবাদ

অবচ্ছেদবাদীর মতে অন্তঃকরণ-সীমিত [অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন] চৈতন্যই জীবাত্মা। এই অন্তঃকরণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন, জীবাত্মাও সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন। এইমতে জীব ঘটাকাশ, ব্রহ্ম মহাকাশ। অখণ্ড আকাশ যেমন ঘটাদি অবচ্ছেদ বা আবেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া ঘটাকাশ বলিয়া অভিহিত হয় এবং মহাকাশ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণের আবেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া অখণ্ড ব্রহ্ম জীবসংজ্ঞা লাভ করে। ঘটাকাশ যেমন মহাকাশের সখণ্ড অভিব্যক্তি, জীবও সেইরূপ পরমাত্মার সখণ্ড বা আংশিক অভিব্যক্তি। ইহাই অবচ্ছেদবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম। "অংশো নানা ব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪৪। এই অংশবাদ

ক্রিয়াশক্তির্ভোগশক্তির্বা সংভবতি। যস্য চ বুদ্ধ্যাদেঃ কারণসংঘাতস্য ক্রিয়াভোগশক্তী ন তস্য চৈতন্যম্। তস্মাচ্চিদাত্মা এব কার্যকারণসংঘাতেন গ্রথিতো লব্ধক্রিয়াভোগশক্তিঃ, স্বয়ংপ্রকাশোঽপি বুদ্ধ্যাদিবিষয়বিচ্ছুরণাৎ কথঞ্চিদস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ঃ অহংকারাস্পদং জীব ইতি চ, জন্তুরিতি চ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চ আখ্যায়তে।

ঐ ভামতী, ৩৯ পৃষ্ঠা,

বা অবচ্ছেদবাদই সমর্থন করে। উপনিষদেও জীবকে ব্রহ্ম-বহ্নির স্ফুলিঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করায়, জীব ব্রহ্মের অংশ, এই সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়। শ্রীভগবানও স্পষ্টতঃই জীবকে ব্রহ্মাংশ বলিয়া গীতায় উল্লেখ করিয়াছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে

বীজভূতঃ সনাতনঃ। গীতা, ১৫।৭।

জীবকে ব্রহ্মের অংশরূপে দেখিলেই অংশ ও অংশিভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ উপপাদন সহজসাধ্য হয়। "সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"। ছান্দোগ্যঃ, ৮।৩।১। তাঁহার অর্থাৎ পরমাত্মার অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকে জানিবে, "ত্বমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি", 'তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) জানিয়াই জীব মৃত্যু অতিক্রম করে', এই সকল শ্রুতিরও সার্থকতা বুঝা যায়। আলোচ্য শ্রুতিতে জীবকে অন্বেষণের কর্তা, পরমাত্মাকে অন্বেষণের কর্ম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। কর্তা ও কর্ম অত্যন্ত অভিন্ন হইলে, সেক্ষেত্রে কর্তৃ-কর্মভাবই হইতে পারে না। বেদোক্ত উপাসনাকাণ্ড এইপ্রকার উপাস্য ও উপাসকের ভেদই সূচনা করে। উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে ভেদ না থাকিলে, কে কাহার উপাসনা করিবে? কে কাহার ধ্যান-ধারণা ভজন-পূজন করিবে? উপাস্য-উপাসকভাব সব সময়ই ভেদ সাপেক্ষ। অন্তঃকরণের দ্বারা সীমাবদ্ধ (অবচ্ছিন্ন) জীব ও ভূমা ব্রহ্মের এই ভেদ বাস্তব নহে, উপাধিকল্পিত।

"ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মৈবেমে কিতবাঃ" এই অথর্ববেদোক্ত ব্রহ্মসূক্তে এবং 'নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টা, ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,' 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'। বৃহদাঃ ৪।৪।১।

এই সকল উপনিষদের উক্তিতে আত্মা বা ব্রহ্মে যে কিছুমাত্র ভেদ নাই, যিনি ব্রহ্মে অল্প মাত্রায়ও ভেদ দর্শন করেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন। এইরূপে ভেদদৃষ্টির নিন্দা করায়, জীব ও ব্রহ্মের অভেদই যে তত্ত্ব, তাহা সাব্যস্ত হয়।

প্রতিবিম্ববাদিগণ বলেন, জীব ব্রহ্মেরই প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব। সূর্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলপূর্ণপাত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, ব্রহ্মও সেইরূপ বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া থাকেন। এই প্রতিবিম্বই জীব।

প্রতিবিম্ব বাদ

আভাস এব চ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৫০। এই ব্রহ্মসূত্রে অতিস্পষ্ট ভাষায়

জীবকে ব্রহ্মের আভাস বা প্রতিবিম্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 'আভাস এব চৈব জীবঃ পরস্য আত্মনো জলসূর্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ'। ব্রহ্মসূত্র, শং ভাষ্য. ২।৩।৫০।

বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন, বিম্ব ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীবও সুতরাং অভিন্ন। এইরূপ অভিমত অদ্বৈতবেদান্তে 'প্রতিবিম্ববাদ' বলিয়া পরিচিত।

অবচ্ছেদবাদে বিভিন্ন অন্তঃকরণের দ্বারা সীমাবদ্ধ জীব যেমন ভিন্ন ভিন্ন, এই মতেও সেইরূপ বিভিন্ন বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত জীব যে ভিন্ন ভিন্ন হইবে তাহাতে আপত্তি কি? অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য যেমন মহাচৈতন্যের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, সেইরূপ বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই বা মহাচৈতন্যের অংশ অর্থাৎ সখণ্ড অভিব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবে না কেন? বস্তুতঃ চৈতন্য অখণ্ডও নিরংশ, তাহার অংশ কল্পনামাত্র, বাস্তব নহে। অংশ ইব অংশঃ, ন হি নিরবয়বস্য মুখ্যোঽংশঃ সম্ভবতি। ব্রঃ সূঃ শংভাষ্য ২।৩।৪৩। উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, অবচ্ছেদবাদের সমর্থক আচার্যগণ অবচ্ছেদবাদের অনুকূলে যে সকল সূত্র বা যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, প্রতিবিম্ববাদ গ্রহণ করিলেও ঐ সকল সূত্র বা যুক্তির কোন বিরোধ ঘটে না। 'আভাস এব চ' ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪৩। এই সূত্রে "এব" শব্দের প্রয়োগ থাকায়, প্রতিবিম্ববাদই ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়। আচার্য গোবিন্দানন্দ তাঁহার রত্নপ্রভা নামক (শাঙ্করভাষ্যের) টীকায় সূত্রোক্ত "এব" শব্দের উপর জোর দিয়া, প্রতিবিম্ববাদই সূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন।[১]

আচার্য সুরেশ্বরের মতে বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন নহে, বিভিন্ন। প্রতিবিম্ব বিম্বের ছায়া বা আভাস। মুখের ছায়া মুখ হইতে বিভিন্ন সুতরাং ব্রহ্মের ছায়া বা আভাস জীব ও ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন। ছায়া সত্য নহে মিথ্যা। অতএব প্রতিবিম্বও সত্য নহে মিথ্যা। সমষ্টি মায়ার আভাস ঈশ্বর, ব্যষ্টি অবিদ্যার আভাস জীব। ঈশ্বরের উপাধি শুদ্ধ সত্ত্বগুণ, সুতরাং ঈশ্বর

আভাসবাদ

১। অংশ ইত্যাদি সূত্রে জীবস্য অংশত্বং ঘটাকাশন্তেব উপাধ্যবচ্ছেদবুদ্ধ্যা উক্তম্। সম্প্রতি এবকারেণ অবচ্ছেদ পক্ষারুচিং সূচয়ন্ "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধং প্রতিবিম্বপক্ষমুপন্যস্যতি ভগবান্ সূত্রকারঃ।
গোবিন্দানন্দ-কৃত ভাষ্য-রত্নপ্রভা, ব্রঃ সূঃ ২।৩।৫০।

সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি, জীবের উপাধি তমঃপ্রধান অবিদ্যা, এইজন্য জীব অল্পজ্ঞ এবং অল্পশক্তি। এইমতে জীবভাবের (জৈব আভাসের) মিথ্যাত্ব নিবন্ধন জীবভাবকে বাধিত করিয়া, মুক্তিতে শুধু চৈতন্যাংশে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সাধন করা হয় বলিয়া, এইরূপ অভেদকে "বাধমূলক অভেদ" বলা হইয়া থাকে। প্রতিবিম্ববাদে প্রতিবিম্ব সত্য এবং বিম্ব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ভেদ মিথ্যা। এইজন্য মিথ্যা ভেদবুদ্ধির নিবৃত্তি সাধন করিয়াই জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপপাদন করা যায়; জীবভাবের বাধ সাধন করিবার প্রশ্ন উঠে না। সুরেশ্বরাচার্যের এই মত "আভাসবাদ" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আভাসবাদের সমালোচনা

আলোচ্য আভাসবাদের তুলনায় প্রতিবিম্ববাদই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্যগণ সকলেই প্রতিবিম্ববাদই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিবিম্ববাদে বিম্ব ও প্রতিবিম্বের বাস্তব কোন ভেদ নাই, ভেদ অজ্ঞানকল্পিত এবং মিথ্যা। দর্পণে পরিদৃশ্যমান মুখপ্রতিবিম্ব বস্তুতঃপক্ষে মুখ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। বুদ্ধি-দর্পণে পতিত চিৎপ্রতিবিম্বও সুতরাং চিদাত্মা হইতে পৃথক্ কিছু নহে। আমিই সেই নিত্য চিৎস্বরূপ আত্মা।[১] বিদ্যারণ্য স্বামী বলেন, বিম্ব ও প্রতিবিম্ব যদি ভিন্ন হয়, তবে সেক্ষেত্রে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবই জন্মিতে পারে না। একবস্তু অন্যবস্তুর প্রতিবিম্ব হয় না। অতএব মুখের প্রতিবিম্ব যে মুখ হইতে ভিন্ন নহে, এই সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতে হয়। 'প্রতিবিম্ব সত্য নহে, মিথ্যা' এইরূপে আভাসবাদী প্রতিবিম্বের মিথ্যাত্ব সাধনের যে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। কেননা, দর্পণে পতিত মুখের ছায়া বা আভাস শুক্তিরজতের ন্যায় মিথ্যা হইলে, কোন-না-কোন সময়ে 'নেদং মুখম্' এইরূপ বাধক জ্ঞান অবশ্যই উৎপন্ন হইত। ঐ প্রকার বাধকজ্ঞান কাহারও কখনও উদিত হইতে দেখা যায় না। "দর্পণে মুখ নাই" এইরূপ বাধকজ্ঞান অবশ্যই উদিত হয় এবং তাহার ফলে দর্পণের সহিত মুখের সম্বন্ধই বাধিত হয়,

---

১। মুখাবভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ
স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা॥

শঙ্কর স্তোত্রাবলী।

মুখের স্বরূপ বাধিত হয় না; এবং প্রতিবিম্বিত মুখের মিথ্যাত্বও নিশ্চিত হইতে পারে না। বরং "এই মুখ আমারই মুখ" এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞানেরই উদয় হয় এবং তাহাদ্বারা বিম্ব হইতে প্রতিবিম্ব যে ভিন্ন নহে, ইহাই প্রমাণিত হয়।

প্রতিবিম্ববাদের বিশদ ব্যাখ্যা

প্রতিবিম্বকে কেহ কেহ বিম্বের ছাঁপ (প্রতিমুদ্রা) বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, এই মতও শোভন নহে। কেননা, ছাঁপ আকারে মূল বস্তুর অর্থাৎ যাহার ছাঁপ পড়ে, সেই বস্তুর সমানই হয়, ছোট বা বড় হয় না। ছোট একখানি আয়নার মধ্যে মুখের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, দর্পণের ক্ষুদ্রতাবশতঃ তাহা আকারে মুখের সমান হয় না। এই অবস্থায় মুখের প্রতিবিম্বকে মুখের প্রতিমুদ্রা বা ছাঁপ বলা কোনমতেই চলেনা। কোন কোন সুধী মনে করেন, আয়নায় যে মুখ দেখা যায়, উহা গ্রীবাস্থ মুখ নহে, অন্য মুখ। এইরূপ কল্পনাও ভিত্তিহীন। কারণ, "ঘাড়ের উপরে আমার যে মুখখানি রহিয়াছে, তাহাই আয়নার মধ্যে দেখা যাইতেছে" এইরূপে সকলেরই নিজ নিজ মুখের প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে। এরূপক্ষেত্রে দর্পণস্থ মুখখানি অন্যমুখ (গ্রীবাস্থ মুখ নহে), ইহা কিরূপে সাব্যস্ত করা যায়? যাঁহারা আয়নায় প্রতিবিম্বিত মুখকে "মুখান্তর" বলিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ মুখ কোথা হইতে আসিল? কি উপাদানে আয়নার মধ্যে ঐ মুখের সৃষ্টি হইল? এইরূপ প্রশ্নের কোন সদুত্তর তাঁহারা দিতে পারেন না। অতএব আয়নার মুখ অন্যমুখ, গ্রীবাস্থ মুখ নহে, এইরূপ মতও গ্রহণ করা যায় না। আপত্তি হইতে পারে যে, প্রতিবিম্ববাদীর মতে বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব যখন অভিন্ন, তখন দর্পণস্থ মুখ এবং গ্রীবাস্থ মুখও অভিন্নই বটে। গ্রীবাস্থ মুখ ঘাড়ের উপরে থাকে, তাহা দর্পণস্থ হইয়া প্রতীতি গোচর হয় কিরূপে? আর, গ্রীবাস্থ মুখ দর্পণস্থ হইয়া জ্ঞানে ভাসিলে, দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখকে সেক্ষেত্রে মিথ্যা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। বিম্ব ও প্রতিবিম্বের অভেদ ব্যাখ্যা করা চলিবে না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, বিম্বমুখ যে দর্পণস্থ হইয়া প্রতিভাত হয়, তাহা অজ্ঞানেরই খেলা। অজ্ঞানই এক বস্তুকে আর এক বস্তুরূপে, এখানের বস্তুকে সেখানের বস্তুরূপে প্রকাশিত করে। অজ্ঞানের অসাধ্য কিছুই নাই। গ্রীবাস্থ বিম্ব মুখ যখন প্রতিবিম্বের

আধার দর্পণস্থ হইয়া প্রতিভাত হয়, ঐ ভাতিকেই প্রতিবিম্ব বলা হইয়া থাকে। গ্রীবাস্থ মুখের দর্পণস্থরূপে অবভাসই দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব বলিয়া জানিবে। কাহারও কাহারও মতে প্রতিবিম্ব নামে কোন পদার্থ নাই। দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে বলিয়া যে বোধ হয়, তাহা ভ্রান্তিমাত্র। আয়নার দিকে তাকাইলে নেত্ররশ্মি আয়নায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে এবং আসল বা বিম্ব মুখখানি গ্রহণ করে। নেত্ররশ্মি আয়নায় প্রতিহত হওয়াতে, দর্পণকে ছাড়িয়া মুখের গ্রহণ সম্ভবপর হয় না। এইজন্যই দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং তাহা গৃহীত হয় বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রতিবিম্ব বলিয়া কিছু নাই। এইরূপ কল্পনাও সঙ্গত নহে। নেত্ররশ্মি আয়নায় প্রতিহত হইয়া, আসল বা বিম্বমুখখানি গ্রহণ করিলে, সেই মুখখানি বিপরীতভাবে গৃহীত হয় কেন? এই 'কেন'র উত্তর কি? পূর্বমুখ হইয়া আয়না দেখিলে, মুখখানি পশ্চিমমুখ হইয়া আয়নায় ফুটিয়া উঠিবে, আমার ডানদিক্ বামদিক্ হইয়া, বামদিক্ ডানদিক্ হইয়া আয়নায় ভাসিবে। আসল মুখ দৃষ্টিগোচর হইলে এই বৈপরীত্য কোনমতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং প্রতিবিম্ব যে আছে, তাহা মানিতেই হইবে, অস্বীকার করা চলিবে না। প্রতিবিম্ববাদে বিম্ব ও প্রতিবিম্বের আশ্রয় বা আধার বিভিন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য আধার-ভেদনিবন্ধন বিম্ব ও প্রতিবিম্বের বিপরীত ভাব ও সহজেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

প্রতিবিম্ব বিভ্রম কাহাকে বলে?

দীঘির পারে ঊর্ধ্বে শাখা বিস্তার করিয়া যে-সকল বৃক্ষরাজি বিরাজ করিতেছে, উহারা যখন দীঘির কাল জলে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন পাদপ-শ্রেণীকে জলস্থ এবং অধোমুখে অবস্থিত দেখা যায়। ইহাকে "প্রতিবিম্ব বিভ্রম" বলা হয়। ইহা অদ্বৈতবেদান্তের মতে অবিদ্যার কার্য। অবিদ্যার কার্য বলিয়াই, 'বৃক্ষরাজি ঊর্ধ্বশাখ' এইরূপ নিশ্চয় সত্ত্বেও, উল্লিখিত প্রতিবিম্ব বিভ্রম উৎপন্ন হইতে কোনরূপ বাধা হয় না। একদিকে প্রতিবিম্ব বিভ্রম যেমন অবিদ্যার কার্য, অপরদিকে প্রতিবিম্বের আধার জলাশয় প্রভৃতি উপাধিকেই আলোচ্য প্রতিবিম্ব বিভ্রমের মূল-দোষ বলা যাইতে পারে। সেই উপাধিদোষ বিদ্যমান থাকায়, 'বৃক্ষরাজি ঊর্ধ্বে শাখা বিস্তার করিয়া বিরাজ করে' এইরূপ নিশ্চয় সত্ত্বেও প্রতিবিম্ব বিভ্রম উদিত হইয়া থাকে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মূলে উপাধি-দোষ বিদ্যমান থাকিলে, সত্যজ্ঞান যদি সোপাধি বিভ্রমের নিবৃত্তি করিতে না পারে, তবে, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেও আত্মার কর্তৃত্ব বিভ্রমের নিবৃত্তি ঘটিতে পারে না। কেননা, অহংভাব বা অহমিকাই আত্মার কর্তৃত্ব বিভ্রমের উপাধি। যে-পর্যন্ত অহম্ অভিমান থাকে, সেই পর্যন্তই আত্মার কর্তৃত্ব বিভ্রমও বিরাজ করে। মূলে উপাধি দোষ থাকায়, কর্তৃত্ব বিভ্রমের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে আচার্য বিদ্যারণ্য বলেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপে ব্রহ্মের সহিত অহম্ বা আত্মার অভেদ-বুদ্ধি জাগরূক হইলে, জীবের 'অহম্' অভিমানের নিঃশেষে নিবৃত্তি ঘটিবে, জীব শিব হইবে। অহমিকার বিলয় হওয়ায়, তন্মূলক আত্মার কর্তৃত্ব বিভ্রমেরও নিবৃত্তি সেখানে অবশ্যই ঘটিবে। সেই অবস্থায় বিম্ব পরব্রহ্ম ও প্রতিবিম্ব জীবের মধ্যে কোনরূপ ভেদ থাকিবে না। লৌকিক বিভ্রমের ক্ষেত্রে উপাধি-দোষ বর্তমান থাকিলে, ব্যবহারিক সত্য-জ্ঞানকে আড়াল করিয়াও, বিভ্রম সেখানে আত্মপ্রকাশ লাভ করিতে পারে। অদ্বয়ব্রহ্ম জ্ঞানোদয়ে বিভ্রমের মূল অবিদ্যা উপাধি প্রভৃতির নিঃশেষে বিলয় ঘটায়, সেক্ষেত্রে আর আত্মার কর্তৃত্ব-বিভ্রম প্রভৃতি কোনরূপ বিভ্রমেরই উদয় হইবার অবকাশ ঘটে না।

ব্রহ্ম ভূমা। সর্বব্যাপী ব্রহ্ম জীবের অন্তরেও বিরাজ করেন; এবং অন্তর্যামিরূপে জীবকে শাসন করেন। জলে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়িলে, সেই জল-মধ্যে বিম্ব আকাশও যেমন বর্তমান থাকে, সেইরূপ অন্তঃকরণে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়িলে, অন্তঃকরণের অন্তঃস্থলেও ব্রহ্ম যে বিদ্যমান থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? প্রতিবিম্ববাদে ব্রহ্মের অন্তর্যামিত্ব সহজেই উপপাদন করা চলে। অবচ্ছেদবাদ গ্রহণ করিলে, পরব্রহ্মের অন্তর্যামিত্ব উপপাদন করা সহজসাধ্য হয় না। কেননা, ঘটের মধ্যে যে আকাশ আছে তাহা "ঘটাকাশ", অনবচ্ছিন্ন অখণ্ড আকাশ ঘটে নাই, ঘটের বাহিরেই তাহা আছে। এইরূপ অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যই অন্তঃকরণে আছে। অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য অন্তঃকরণে নাই, অন্তঃকরণের বাহিরে আছে। একই অন্তঃকরণে পরিচ্ছিন্ন এবং অপরিচ্ছিন্ন, সখণ্ড এবং অখণ্ড, এই উভয় প্রকার চৈতন্য নাই, এবং থাকিতে পারে না। অন্তঃকরণের আবেষ্টনীর মধ্যে পড়িলেই চৈতন্য সীমাবদ্ধ হইবে। অন্তঃকরণের দ্বারা সীমাবদ্ধ চৈতন্য

অসীম হইবে কিরূপে? পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য কোনমতেই জীব ও জগতের অন্তর্যামী হইতে পারে না। এইজন্যই অবচ্ছেদবাদে ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্ব সম্ভবপর হয় না। প্রতিবিম্ববাদেই তাহা সম্ভবপর হয়। সুতরাং অবচ্ছেদবাদের তুলনায় প্রতিবিম্ববাদই অধিকতর যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয়।

এই প্রতিবিম্ববাদ বিভিন্ন অদ্বৈতাচার্যগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'তত্ত্ববিবেকে'র মতে মূল প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি যখন শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধানা হয় অর্থাৎ রজঃ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রকৃতির সত্ত্বগুণ অভিভূত হয় না, তখন এই প্রকৃতিই "মায়া" আখ্যা লাভ করে। রজঃ এবং তমোগুণ প্রবল হইলে, সত্ত্ব অভিভূত হইলে, রজস্তমঃপ্রধানা প্রকৃতিকে বলে "অবিদ্যা"। মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে ঈশ্বর এবং অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জীব বলা হইয়া থাকে।

প্রতিবিম্ব সম্পর্কে তত্ত্ববিবেকের মত

'প্রকটার্থবিবরণে'র সিদ্ধান্তে অনাদি অনির্বাচ্য চৈতন্যাশ্রিত বিশ্বজননী মায়াই প্রকৃতি। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে স্পষ্টবাক্যেই মায়াকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে। এই অনাদি অপরিচ্ছিন্ন মায়ায় চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাকে বলে "ঈশ্বর", আর পরিচ্ছিন্ন মায়া, যাহা অবিদ্যা নামে পরিচিত, সেই অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম জীব। অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ নামে দুইটি শক্তি আছে। যে শক্তির প্রভাবে জীবের দৃষ্টিতে তাঁহার ব্রহ্মরূপ ঢাকা পড়িয়া যায়, তাহাই অবিদ্যার আবরণ-শক্তি, বিক্ষেপ-শক্তি প্রভাবে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে বিবিধ বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চের উদ্ভব হইয়া থাকে। কোন কোন সুধী মূলপ্রকৃতি বা মায়ারই ঐ দুইটি শক্তি স্বীকার করেন এবং তাহা দ্বারাই মায়া এবং অবিদ্যার বিভাগ উপপাদন করিয়া থাকেন। বিক্ষেপ শক্তিপ্রধানা মূল প্রকৃতিকে "মায়া" এবং আবরণশক্তি প্রধানা মূল প্রকৃতিকে "অবিদ্যা" আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। মায়া ঈশ্বরের উপাধি, জীবের উপাধি অবিদ্যা বা অজ্ঞান। এইজন্য জীবই "অহমজ্ঞঃ" এইরূপে স্বীয় অজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করে। ঈশ্বরের কোনরূপ অজ্ঞান নাই। ঈশ্বর অজ্ঞানের অনুভবও করেন না। তিনি সর্বজ্ঞ।

প্রকটার্থ বিবরণের মত

'সংক্ষেপশারীরক'-প্রণেতা সর্বজ্ঞাত্মমুনি বলেন যে, ঈশ্বরের উপাধি মায়া। মায়া-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর। ঈশ্বর মায়াধীশ, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি, জগতের স্রষ্টা, পালক ও পোষক। জীবের উপাধি অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণে চৈতন্যের প্রতিবিম্বই জীব। জীব অবিদ্যাবশ্য, অল্পজ্ঞ এবং অল্পশক্তি। চৈতন্য সর্বব্যাপী। জীবের সসীম অন্তঃকরণের দ্বারা সর্বব্যাপী, জগদাধার [illegible] অবচ্ছেদ স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা হইলেও অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব, এইরূপ "অবচ্ছেদবাদ" গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা, মরজগতে যেই খণ্ডচৈতন্য সংসারী জীবের অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন হইবে, মৃত্যুর পরপারে সেই খণ্ডচৈতন্য মৃত জীবের অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন হয় না, হইতে পারে না। কারণ, সসীম অন্তঃকরণের ইহলোক পরলোক গমন সম্ভবপর হইলেও অসীম চৈতন্য ভূমা বিধায়, তাহার গমনাগমন কোন মতেই সম্ভব হয় না। পরলোকগামী অন্তঃকরণ পরলোকস্থ চৈতন্যপ্রদেশকেই অবচ্ছেদ করিবে, এই মরলোকের চৈতন্যপ্রদেশকে অবচ্ছেদ করিবে না। এই অবস্থায় ইহলোকে এবং পরলোকে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য যে ভিন্ন ভিন্ন হইবে এবং ইহলোকের, পরলোকের জীবও যে বিভিন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? সেরূপক্ষেত্রে কর্ম এবং কর্মফল ভোগের কোনরূপ নিয়ম রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। জীব শুভকর্ম করিয়াও তাহার ফল ভোগ না করিতে পারে, পক্ষান্তরে, অপরে কর্ম না করিয়াও তাহার ফল উপভোগ করিতে পারে।

সর্বজ্ঞাত্মমুনির মত

যদি বল যে, চৈতন্য এক অদ্বিতীয় এবং সর্বব্যাপী বিধায়, প্রদেশভেদ থাকিলেও তাহা দ্বারা চৈতন্যের বস্তুতঃ কোন ভেদ হইবে না। এই জগতে যেই চৈতন্য অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন ছিল, পরজগতেও সেই চৈতন্যই অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন হইবে। এইরূপে কর্ম ও কর্মফল ভোগের নিয়ম ব্যাহত হইবে না। ইহার উত্তরে বলিব যে, তাহা হইলে অর্থাৎ চৈতন্যের প্রদেশ ভেদের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ না করিলে, চৈতন্য এক বিধায়, যেই চৈতন্য অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন হইবে, সেই চৈতন্যই মায়া-পরিচ্ছিন্নও হইবে। ফলে, এই মতে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বিভাগ অসম্পূর্ণ এবং অসম্ভবই হইয়া দাঁড়াইবে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিভেদে অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, এক অদ্বিতীয় ভূমাচৈতন্যই সমস্ত অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন হইবে। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে

গেলে বলিতে হয় যে, যেই চৈতন্য রামের অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন হইবে, সেই চৈতন্যই শ্যামেরও অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন হইবে। ফলে, রাম ও শ্যামের জীব ভাবের অপূর্ণতা এবং সুখ-দুঃখ ভোগেরও অব্যবস্থা ঘটিবে। প্রত্যেক জীবের সুখ-দুঃখ ভোগের নিয়ম অব্যাহত রাখিতে গেলেই, প্রদেশভেদে বা অন্তঃকরণ প্রভৃতি অবচ্ছেদকভেদে চৈতন্যের ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্যের প্রদেশভেদে ভেদ স্বীকার করিলে, ইহলোকে এবং পরলোকে কর্ম এবং কর্মফলভোগের নিয়ম রক্ষা করা যে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব আলোচ্য "অবচ্ছেদবাদ" নির্বিবাদে গ্রহণ করা চলে না।

প্রতিবিম্ববাদে এই সকল দোষ আসে না। অবচ্ছেদক-উপাধির গমনাগমনে অবচ্ছেদ্যের যেমন ভেদ হয়, প্রতিবিম্বের উপাধির গতাগতিতে প্রতিবিম্বের সেইরূপ ভেদ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়, ফটোগ্রাফির প্লেটে শরীর প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রতিবিম্ব গ্রহণের পক্ষে ফটোগ্রাফির প্লেট উপাধি হয় বটে, কিন্তু সেই প্লেটখানিকে বিভিন্ন প্রদেশে সরাইয়া লইয়া গেলেও, তাহা দ্বারা উহাতে পতিত শরীর প্রভৃতির প্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন হয় না, ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, অন্তঃকরণ বা বুদ্ধিদর্পণ বিভিন্ন প্রদেশগত হইলেও, তাহাতে পতিত চিৎপ্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না। ঈশ্বর ও জীব উভয়েই বিভিন্ন উপাধি-পতিত (মায়া এবং অন্তঃকরণে পতিত) চিৎপ্রতিবিম্ব। এই মতে বিশুদ্ধ চৈতন্যই বিম্বস্থানীয়, তাহা কোনরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। বিম্ব-স্থানীয় বিশুদ্ধ চৈতন্যই পরব্রহ্ম। মুক্তিতে উপাধির বিগমে জীব ও ঈশ্বরভাবের পরব্রহ্মেই বিলয় হইয়া থাকে। মুক্ত পুরুষ বিশুদ্ধ চিদ্‌ভাবই প্রাপ্ত হন।[১]

১। ন চ অন্তঃকরণরূপেণ দ্রব্যেণ ঘটেন আকাশস্যেব চৈতন্যস্য অবচ্ছেদসম্ভবাৎ তদবচ্ছিন্নমেব চৈতন্যং জীবোঽস্ত্বিতি বাচ্যম্। ইহ পরত্র চ জীবভাবেন অবচ্ছেদ্য চৈতন্যপ্রদেশস্য ভেদেন কৃতাহানাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ। প্রতিবিম্বস্তু উপাধের্গতা-গতয়োরবচ্ছেদ্যবন্ন ভিদ্যতে ইতি প্রতিবিম্বপক্ষে নায়ং দোষ ইত্যুক্তম্। এবমুক্তেষ্বেতেষু জীবেশ্বরয়োঃ প্রতিবিম্ববিশেষত্বপক্ষেষু যৎ বিম্বস্থানীয়ং ব্রহ্ম তৎ মুক্তপ্রাপ্যং শুদ্ধচৈতন্যম্। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ: ৮২—৮৩ পৃষ্ঠা, চৌখাম্বা সং।

জীব, ঈশ্বর ও শুদ্ধচৈতন্য, চৈতন্যের এই ত্রিবিধ বিভাগের পরিবর্তে মাধবাচার্য তাঁহার "পঞ্চদশী" গ্রন্থের চিত্রদীপ নামক পরিচ্ছেদে জীব, কূটস্থ, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম, চৈতন্যের এই চারপ্রকার বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিভাগ যে ঔপাধিক বা কাল্পনিক তাহা বলাই বাহুল্য। একই আকাশ যেমন ঘটাকাশ, জলাকাশ, মহাকাশ এবং মেঘাকাশভেদে চতুর্বিধরূপে কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় চৈতন্যই বিভিন্ন উপাধি বশতঃ জীব, কূটস্থ, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম, এই চতুর্বিধ আখ্যা লাভ করে। ঘটাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ঘটের দ্বারা সীমাবদ্ধ আকাশের নাম ঘটাকাশ। ঘটমধ্যস্থ জলে প্রতিবিম্বিত অভ্রনক্ষত্রখচিত আকাশের নাম জলাকাশ। অসীম অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত আকাশ মহাকাশ। মহাকাশের মধ্যে সঞ্চরমাণ মেঘমণ্ডলে তুষারের আকারে যে জল অবস্থিত থাকে, ঐ তুষারাকার জলে প্রতিবিম্বিত আকাশকে বলে "মেঘাকাশ"। ঘটমধ্যস্থিত জলে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়িতে দেখা যায়। মেঘের অন্যতম উপাদান তুষারাকার জলও জল বটে, অতএব তুষার-জলেও সহজেই আকাশের প্রতিবিম্বের অনুমান করা যাইতে পারে। উল্লিখিতরূপে একই আকাশের যেমন চারপ্রকার বিভাগ সম্ভবপর হয়, সেইরূপ এক অখণ্ড চৈতন্যেরও জীব, ঈশ্বর, কূটস্থ এবং ব্রহ্ম এই চারপ্রকার কল্পিত বিভাগ-উপপাদন অসম্ভব হয় না। অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে এই লীলাময়ী বিশ্বপ্রকৃতি যেমন চৈতন্যে কল্পিত, সেইরূপ স্থূলশরীর এবং সূক্ষ্মশরীর[১] নামে জীবের যে দুইপ্রকার শরীরের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও ব্রহ্ম-চৈতন্যে কল্পিত বা অধিষ্ঠিত। শুক্তি-রজতের কল্পনায় শুক্তি যেমন রজতের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হইয়া থাকে, শুদ্ধ চৈতন্যই সেইরূপ জীবও জগতের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় বলিয়া জানিবে। আলোচ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ের অধিষ্ঠান এবং উক্ত শরীরদ্বয়-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যই "কূটস্থ চৈতন্য" বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তে

১। পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধির্দশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
শরীরং সপ্তদশকং সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥ বিষ্ণুপুরাণ।

পাঁচ প্রকার প্রাণবায়ু, মনঃ, বুদ্ধি, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই সতেরটি শরীরের উপাদানের সূক্ষ্ম অবয়বের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয়। এই সূক্ষ্মশরীরই ইহলোক এবং পরলোকগামী শরীর। প্রত্যেক ব্যক্তিভেদে এই সূক্ষ্ম-শরীর বিভিন্ন। ইহারই অপর নাম লিঙ্গশরীর।

পরিচিত। সর্ববিধ বিকার প্রবাহের মধ্যে পড়িয়াও চৈতন্য স্বতঃ "কূটের"১ ন্যায় নির্বিকারে অবস্থান করে বলিয়া, ঐ চৈতন্যকে কূটস্থ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম শরীর কূটস্থ চৈতন্যে কল্পিত বলিয়া সাব্যস্ত হইলে, সূক্ষ্মশরীরের অন্তর্গত মনঃ, বুদ্ধিও যে কূটস্থে কল্পিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ঐ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। "জীব্" ধাতুর অর্থ প্রাণ-ধারণ করা, অন্তঃকরণগত চিদাভাস প্রাণ ধারণ করে বলিয়া, তাহাই "জীব" সংজ্ঞা লাভ করে। জীব সংসারী, নির্বিকার "কূটস্থে"র সংসার নাই। কূটস্থ অসংসারী। ব্রহ্ম অনবচ্ছিন্ন বা অনাবৃত শুদ্ধচৈতন্য। মায়া ব্রহ্মাশ্রিত অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত। মায়া জগজ্জননী প্রকৃতি। এই কাননকুন্তলা সমুদ্রমেখলা শ্যামা ধরিত্রী মায়ার গর্ভে সূক্ষ্মরূপে লুক্কায়িত থাকে। সৃষ্টির ঊষায় পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় মায়া বা প্রকৃতি বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করে। প্রাণীর বুদ্ধিও সূক্ষ্মরূপে মায়ায় অন্তর্নিহিত থাকে। বুদ্ধির এইরূপ সূক্ষ্মরূপে মায়াগর্ভে অবস্থিতিকেই "ধী-বাসনা" বা বুদ্ধি-বাসনা বলা হয়। এই ধী-বাসনায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর। উল্লিখিত আকাশের দৃষ্টান্ত অনুসারে বিচার করিলে দেখা যায় যে, কূটস্থ ঘটাকাশ স্থানীয়, জীব জলাকাশ, ব্রহ্ম মহাকাশ এবং ঈশ্বর মেঘাকাশ স্থানীয়। সমস্ত বস্তুরাজিই প্রাণিগণের বুদ্ধির বিষয় হয়। বুদ্ধির অগম্য কিছুই থাকে না। প্রাণিগণের ঐরূপ সমস্ত বস্তু বিষয়ক 'ধী-বাসনা'ই হয় ঈশ্বরের উপাধি। এইজন্যই ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, এবং সর্বজ্ঞ বলিয়াই সর্বশক্তি এবং সর্বকর্তাও বটে। ঈশ্বরের উপাধি 'ধী-বাসনা' প্রত্যক্ষগম্য নহে বলিয়া, ধী-বাসনায় উপহিত ঈশ্বর ও ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি জীবের প্রত্যক্ষগোচর হয় না।

১। কূটস্থ কাহাকে বলে? কূটবন্নির্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে। কূটের মত যাহা সর্বাবস্থায় নির্বিকারে অবস্থান করে, তাহাকেই কূটস্থ বলে। কূটশব্দের অর্থ কি? লৌহযন্ত্রী যে সুদৃঢ় দণ্ডায়মান লৌহপিণ্ডের উপর রাখিয়া অপরাপর লৌহখণ্ডকে পিটাইয়া ইচ্ছামত আকৃতিতে পরিণত করে, সেই দৃঢ়তর লৌহপিণ্ডকে 'কূট' বলে। কেননা, সমস্ত লৌহকে যন্ত্রীর ঈপ্সিত আকৃতিতে পরিণত করিতে সাহায্য করিয়াও, সেই পিণ্ড নিজে কদাচ বিকৃত হয় না, এইরূপ বিকারপ্রবাহের মধ্যে পড়িয়াও যে স্বয়ং অবিকারী, অসঙ্গ থাকে, তাহাকে কূটস্থ বলে। পক্ষান্তরে, কূটশব্দের অর্থ গিরিকূট বা পাহাড়ের চূড়া। সেই চূড়াও ঝটিকাবর্ত প্রভৃতিতে কদাচ বিকৃত হয় না। সেইরূপ যে অবিকারী তাহাকেই কূটস্থ বলে।

জলাকাশের দ্বারা যেমন ঘটাকাশ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়, সেইরূপ জলাকাশ-স্থানীয় জীবের দ্বারাও ঘটাকাশস্থানীয় কূটস্থ তিরোহিত হইয়া থাকেন। জীব অহংরূপে প্রকাশিত হয়, কূটস্থ প্রকাশিত হন না। এই তিরোধান বেদান্তে "অন্যোন্যাধ্যাস" বলিয়া অভিহিত হয়। জীব ও কূটস্থের অবিবেক "মূলাবিদ্যা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মূলাবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ নামে যে দুইটি শক্তি আছে, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আবরণ-শক্তিপ্রভাবে শুক্তি-রজতস্থলে শুক্তিকার শুক্তিত্বরূপ বিশেষ অংশ আবৃত হইয়া, বিক্ষেপবশে যেমন শুক্তিতে রজত অধ্যস্ত হয়, সেইরূপ কূটস্থের অসঙ্গতা, আনন্দরূপতা প্রভৃতি বিশেষ অংশ আবৃত হইয়া, বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবে "অহম্" এইরূপে প্রতীয়মান (অহংপ্রত্যয়গম্য) জীব কূটস্থে অধ্যস্ত হয়। অদ্বৈতবেদান্তের পরিভাষায় ইহাকে বলে "বিক্ষেপাধ্যাস"। শুক্তি-রজতস্থলে যেমন শুক্তির "ইদন্তা"রূপ সামান্য অংশ অধ্যস্ত বা মিথ্যা রজতের রজতত্বরূপ বিশেষ অংশের সহিত মিলিত হইয়া, "ইদং রজতম্" এইরূপ অধ্যাস বা ভ্রমের সৃষ্টি করে, সেইরূপ এখানেও আরোপের অধিষ্ঠান কূটস্থের স্বয়ংত্ব বা আত্মস্বরূপ সামান্য অংশ অধ্যস্ত জীবের "অহংত্ব"রূপ (অহম্ আকার) বিশেষ অংশের সহিত একযোগে প্রকাশিত হইয়া, 'অহমাত্মা', আমিই আত্মা, 'স্বয়মহং করোমি', আমি নিজেই করিয়া থাকি, এইরূপে অহমের আত্মাধ্যাস অর্থাৎ অহমর্থের মিথ্যা আত্মবুদ্ধি সাধন করে। অহংপ্রত্যয়গম্য চিদাভাস বা জীব যেমন কূটস্থ চৈতন্যে কল্পিত বা অধ্যস্ত হইয়া থাকে, অচেতন জড় প্রপঞ্চও সেইরূপ কূটস্থে কল্পিত হইয়া থাকে। কূটস্থ চৈতন্যই জীব ও জগতের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। ঘট প্রভৃতি জড়বর্গ কূটস্থে কল্পিত হইলেও, ঘট প্রভৃতির বুদ্ধিগত চিদাভাস না থাকায়, ঘট প্রভৃতি হয় অচেতন, প্রাণিবর্গের বুদ্ধিগত চিদাভাস থাকায়, প্রাণিবর্গ হয় চেতন। অহংপ্রত্যয়গম্য চিদাভাসের সহিত অধিষ্ঠান চিতের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য থাকায়, ইহাদের (চিদাভাস ও অধিষ্ঠান চৈতন্যের) মিথ্যা অজ্ঞানমূলক (মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্ত) পরস্পর অবিবেক (ইতরেতরাবিবেক বা) অধ্যাস খুবই স্বাভাবিক। সেই (ইতরেতরাবিবেক বা) অধ্যাসের ফলে সংসারী জীব ও অসংসারী কূটস্থের বিভেদ অজ্ঞ জীবের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, ইহাই অধ্যাসের মহিমা।

পঞ্চদশীতে "ব্রহ্মানন্দে" বলা হইয়াছে যে, সুষুপ্তি অবস্থায় নিদ্রার মোহে

জীবের অন্তঃকরণ বিলীন হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়সকল নিষ্ক্রিয় হয়। জীবের তখন বিষয়ভোগ প্রভৃতি থাকে না। সুষুপ্তির আনন্দেই জীব মসৃগুল থাকে। এই অবস্থায় জীবকে "আনন্দময়" বলা হইয়া থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় নিলীন অন্তঃকরণই হয় আত্মার উপাধি। জাগরিত অবস্থায় অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়বর্গ সজাগ হয় (বিলীন অবস্থা পরিত্যাগ করতঃ বৃত্তিলাভের উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়) এইরূপ সজাগ অন্তঃকরণ জাগরিত অবস্থায় আত্মার উপাধিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে এবং জীব "বিজ্ঞানময়" আখ্যা লাভ করে। মাণ্ডুক্য উপনিষদে পরমাত্মার চারিপ্রকার অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় ; তন্মধ্যে তিনপ্রকার অবস্থা উপাধিসংবলিত বা সোপাধিক। তুরীয় অবস্থা নিরুপাধি শুদ্ধচৈতন্য। সোপাধিক অবস্থাত্রয় আবার "আধিদৈবিক" বা "দেবতাত্মক" ও "আধ্যাত্মিক" বা "জীবাত্মক", এইরূপে দ্বিবিধ হইতে দেখা যায়। পরমাত্মা সর্ববিধ বিকারের অধিষ্ঠান হইলেও স্বতঃ সম্পূর্ণ এবং অধিকারী। এইরূপ পরমাত্মাকে চিত্রপটস্থানীয় বলা চলে। চিত্রপটে নিপুণ চিত্রশিল্পী বিবিধ মনোহর চিত্র অঙ্কিত করেন। তাঁহাকে (শিল্পীকে) চিত্রপটখানিকে আঁকিবার উপযোগী করিবার জন্য প্রথমতঃ (১) উহাকে ধুইয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। তারপর, (২) উহাতে অন্নমণ্ড প্রভৃতির লেপ দিতে হয়। তৃতীয় স্তরে (৩) যাহা যাহা চিত্র করিতে হইবে, সেইগুলি পেন্‌সিলের সাহায্যে ভালভাবে আঁকিয়া লইতে হয়। (৪) শেষে পেন্‌সিলে আঁকা চিত্রগুলি উপযুক্ত বর্ণবিন্যাসের সাহায্যে পরিস্ফুট বা রঞ্জিত করা হয়। তখনই চিত্রপট রসজ্ঞ দর্শকের বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিত্রপটের যেমন উল্লিখিত চারিপ্রকার অবস্থার বর্ণনা করা হইল, পরমাত্মাও সেইরূপ চারিপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; (১) সর্বপ্রকার উপাধিরহিত পরমাত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য, (২) মায়োপাধি-সংবলিত পরমাত্মা পরমেশ্বর সংজ্ঞায় অভিহিত হন। (৩) সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর যখন পরমাত্মার উপাধি হয়, তখন পরমাত্মাকে "হিরণ্যগর্ভ" বলা হয়। (৪) সমষ্টি স্থূল-শরীরকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া পরমাত্মা "বিরাট্" নাম গ্রহণ করেন। জীব ও জগতের অধিষ্ঠান পরমাত্মাকে চিত্রপটস্থানীয় বলা যায়। পরমাত্মায় অধিষ্ঠিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চ চিত্রের স্থান অধিকার করে। চিত্রপটে চিত্রিত মানবমূর্তির যেমন সত্য বস্ত্রের অনুরূপ বস্ত্রাভাস (মিথ্যা-চিত্রিত

বস্ত্র) অঙ্কিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মায় অধ্যস্ত দেহাভিমানী 'অহম্' অর্থের অধিষ্ঠান পরমাত্ম-চৈতন্যের অনুরূপ "চিদাভাস" কল্পিত হয়। এই চিদাভাসই সংসারী জীব।

পরমাত্মার (১) শুদ্ধচৈতন্য, (২) ঈশ্বর, (৩) হিরণ্যগর্ভ ও (৪) বিরাট্ এই চারিপ্রকার অধিদৈবত বা দেবতাত্মক বিভাগ প্রদর্শিত হইল। এখন অধ্যাত্ম বা জীবাত্মক বিভাগের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। পরমাত্মার আধ্যাত্মিক সোপাধিক বিভাগ (১) বিশ্ব (২) তৈজস ও (৩) প্রাজ্ঞ, এই তিন প্রকার। জাগরিত অবস্থায় আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগৎকে প্রত্যক্ষ করি এবং ঐ প্রত্যক্ষের অন্তরালবর্তী বিষয়দ্রষ্টা আত্মাকেও অনুভব করি। এই বিষয়দ্রষ্টা আত্মাই স্থূলভুক্ বিশ্ব আত্মা। স্বপ্ন অবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়সকল বাহ্যবিষয় হইতে বিরত হয়, তখন কেবল মন ক্রিয়াশীল থাকে। মন যাহা আমাদের কাছে উপস্থিত করে, তাহাই আমরা তখন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এইজন্য স্বপ্নদৃক্ ঐ আত্মাকে বলা হইয়াছে "প্রবিবিক্তভুক্", প্রবিবিক্তশব্দের অর্থ স্থূল দৃশ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত (বিরত), কেবল মানসসংকল্পজাত। স্বপ্নাবস্থায় মনে যেরূপ সংকল্প বা বাসনার উদয় হইবে আত্মা তদনুরূপই বিষয় ভোগ করিবে। এই আত্মা শ্রুতির ভাষায় তৈজস্ আত্মা অর্থাৎ এই অবস্থায় আত্মা স্থূল শব্দাদি বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া কেবল তেজোময় অন্তঃকরণকে দর্শন করে বলিয়া আত্মাকে "তৈজস" বলা হইয়া থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় মনও নিষ্ক্রিয় হইয়া বিলীন হইয়া যায়। এখানে আত্মার স্থূল বা সূক্ষ্ম বিষয় কিছুরই ভোগ থাকে না, একমাত্র নিদ্রার আনন্দই সে ভোগ করে, সেইজন্য সুষুপ্ত আত্মাকে আনন্দভুক্ প্রাজ্ঞ আত্মা বলা হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাজ্ঞ আত্মা সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মে বিলীন হইয়া তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন হইয়া যায়। আনন্দঘন প্রাজ্ঞ আত্মার তখন কোন দ্বৈতবস্তুর জ্ঞান থাকে না। তুরীয় আত্মারও কোন দ্বৈতজ্ঞান নাই। এই বিষয়ে প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় উভয় আত্মাই তুল্য। পার্থক্য এই যে, সুষুপ্ত প্রাজ্ঞ আত্মার তমঃ বা নিদ্রারূপ অবিদ্যাবীজ বর্তমান থাকে, সুতরাং সুষুপ্তি অবস্থা ভাঙ্গিয়া গেলে উহাকে আবার মন ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মায়ার চক্রে ঘুরিতে হয়। তুরীয় নিত্য আত্মা প্রকাশস্বরূপ। তাঁহার কোনরূপ তমঃ বা অজ্ঞান নাই। আত্মার বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, এই পাদত্রয় অজ্ঞান

কল্পিত। একমাত্র তুরীয় 'ঈশানরূপই' অজ্ঞানাতীত এবং নিত্যবোধস্বরূপ। অনাদিমায়ার ক্রোড়ে সুপ্ত জীব এই তুরীয় নিত্য জ্ঞানময় আনন্দঘন আত্মার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। কিন্তু যখন অজ্ঞান বিদূরিত হয়, বিবেকচক্ষু উন্মীলিত হয়, তখনই সে আনন্দময় আত্মাকে উপলব্ধি করে। অবিদ্যা বশতঃই আত্মার বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি স্থূল, সূক্ষ্ম বিভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যষ্টিরূপে যাহা বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ, সমষ্টিরূপে তাহাই বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা, ঈশ্বর ও অন্তর্যামী বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ সর্বপ্রকার বিভাবের মূলেই রহিয়াছে সেই অনাদি মায়া। কি ব্যষ্টি, কি সমষ্টি, সমস্ত বিভেদই মায়া কল্পিত এবং মিথ্যা। আত্মার যে পাদত্রয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যেও বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, "এক এব ত্রিধা স্থিতঃ", এক আত্মাই তিন অবস্থাতে অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিরূপে বিরাজ করে। যেই আমি জাগিয়া থাকি ; সেই আমিই স্বপ্ন দেখি, এবং সুষুপ্তির আনন্দ অনুভব করি। একই আমি (বা আত্মা) ত্রিবিধ অবস্থার অন্তরালে অবস্থিত আছি। অবস্থাত্রয়ের মধ্যবর্তী হইয়াও আমি নির্মল, সঙ্গী হইয়াও অসঙ্গ, ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগতের অন্তরে বিরাজমান থাকিয়াও প্রপঞ্চাতীত, শুদ্ধ চিন্ময় ও আনন্দঘন।*

পারমার্থিক জীব, ব্যাবহারিক জীব ও প্রাতিভাসিক জীব

পঞ্চদশীর "চিত্রদীপে" যাহাকে "কূটস্থ" চৈতন্য বলা হইয়াছে, "দৃক্-দৃশ্যবিবেকে" সেই কূটস্থ চৈতন্যকেই জীবকোটিতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া "জীব, ঈশো বিশুদ্ধা চিৎ" চৈতন্যের এই ত্রিবিধ বিভাগ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। স্থূল এবং সূক্ষ্ম, এই দুইপ্রকার শরীরের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান হইয়াও যেই চৈতন্য স্থূল এবং সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ শরীরের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, তাঁহাকেই (চিত্র-দীপোক্ত সেই কূটস্থ চৈতন্যকেই) "পারমার্থিক" জীব বলিয়া জানিবে।[১] ইহাকে "পারমার্থিক জীব" আখ্যা দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, এই জাতীয় জীবই উক্ত দেহদ্বয়রূপ উপাধির বিয়োগে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যে জীবের যে ব্রহ্মভাবের উপদেশ করা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মভাব লাভ করে।

* এই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ এই পুস্তকের ১ম খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে দেখুন।

১। দেহদ্বয়াবচ্ছিন্ন কূটস্থচৈতন্যরূপ আত্মা পারমার্থিক জীব ইত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহের কৃষ্ণানন্দতীর্থ কৃত টীকা ১০০ পৃষ্ঠা, চৌখাম্বা সং।

উক্ত শরীরদ্বয়রূপ উপাধি, অন্তঃকরণ-উপাধি ও নিদ্রারূপ উপাধিভেদে জীব পারমার্থিক, ব্যাবহারিক এবং প্রাতিভাসিক, এই তিন প্রকার। নদীবক্ষে তরঙ্গমালা খেলিয়া বেড়ায়। তরঙ্গের উপরে বুদ্‌বুদ্ শোভা পায়। নদী, তরঙ্গ এবং বুদ্‌বুদ্ ইহারা যেমন একটির উপর আর একটি অবস্থিত; নীচে তটিনী, তটিনীর উপর তরঙ্গ, তরঙ্গের উপরে ভাসে বুদ্‌বুদ্, সেইরূপ আলোচ্য জীবত্রয় একের উপরে অপরটি অবস্থিত। কূটস্থ বা পারমার্থিক জীবের উপরে আছে, অন্তঃকরণ প্রতিবিম্বিত (অন্তঃকরণোপাধিক) ব্যাবহারিক জীব, তাঁহার উপরে আছে স্বপ্নাবস্থায় নিদ্রারূপ উপাধি পরিকল্পিত প্রাতিভাসিক জীব।

স্থূল এবং সূক্ষ্ম, এই দুইপ্রকার শরীরের দ্বারা সীমাবদ্ধ পারমার্থিক জীবের উপাধি বা অবচ্ছেদক দেহদ্বয় চৈতন্যে কল্পিত হইলেও, অবচ্ছেদ্য চৈতন্য কল্পিত নহে, সত্য। সেই অংশে ব্রহ্মের সহিত পারমার্থিক জীবের অর্থাৎ কূটস্থের কোন ভেদ নাই। এই অভেদই "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই ব্রহ্ম-ভাবের উপদেশের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়া পারমার্থিক জীবকে আবৃত করিতে পারে না। এইজন্যই পারমার্থিক জীবের ব্রহ্মদৃষ্টি কলুষিত হয় না। মায়া যেক্ষেত্রে জীবকে আবৃত করিতে পারে, সেই অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ জীবে মায়া অবস্থিত থাকে। অন্তঃকরণ মায়ায় কল্পিত, সেই মায়ায় কল্পিত অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসই ব্যাবহারিক বা সংসারী জীব। অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণগত চিদাভাসের মধ্যে কোনরূপ ভেদবুদ্ধি থাকে না। ফলে, চিদাভাস ও অন্তঃকরণ অভিন্ন বা একীভূত হইয়া যায়। অন্তঃকরণের ধর্ম সুখ-দুঃখ প্রভৃতি চিদাভাসস্থ বা জীবগত হইয়া প্রকাশিত হয়। ফলে, জীব 'অহং কর্তা', 'অহং ভোক্তা', এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। এই চিদাভাসও মায়াকল্পিত এবং অন্তঃকরণও মায়িক সুতরাং ব্যাবহারিক জীব এবং তাঁহার উপাধি, এই উভয়ই যে অসত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। সংসারী অবস্থায় ব্যাবহারিক জীবনে চিদাভাসের মিথ্যাত্ব প্রতিভাত হয় না। যে পর্যন্ত ব্যবহার থাকে, সেই পর্যন্ত ব্যাবহারিক জীবের জীবত্বও অক্ষুণ্ণ থাকে। এইজন্যই এই শ্রেণীর জীবকে "ব্যাবহারিক" সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। বেদান্তসারে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ বলা হইয়াছে। এই বিজ্ঞানময় কোষের দ্বারা আবৃত অসীম চৈতন্যই কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভিমানী

জীব বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বপ্নাবস্থায় আসিয়া পৌঁছিলে দেখা যায় যে, এই অবস্থায় ব্যাবহারিক জীবকে এবং ব্যবহারকে আবৃত করিয়া মায়া অবস্থান করে। নিদ্রা মায়া বা অজ্ঞানেরই একপ্রকার বিশেষ অবস্থা। এই অবস্থায় নিজের দেহেও জীবের অভিমান থাকে না। স্বপ্নদৃশ্য বিষয়ের ন্যায় স্বপ্নদ্রষ্টা জীবের দেহও অজ্ঞানের কল্পনা; স্বপ্নদৃষ্ট ঐ কল্পিত দেহেই নিদ্রাবস্থায় জীবের "অহম্" অভিমান হইয়া থাকে। অতএব স্বপ্নাবস্থায় মনুষ্য জীবকে মনুষ্য ভিন্ন অপর প্রাণীর দেহেও অভিমান করিতে দেখা যায়। স্বপ্নে মনুষ্যজীব নিজকে দেবতা কিংবা পশুদেহধারী মনে করিলেও তাহাতে অবাক্ হইবার কোনই কারণ নাই। স্বপ্ন-দেহ প্রভৃতি স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই থাকে, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে, উহাদের আর কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তখন মনের গোপন প্রদেশে তাহাদের প্রতিভাসই মাত্র বিরাজ করে। এইজন্য স্বপ্নাবস্থার জীবকে 'প্রাতিভাসিক' জীব বলা হইয়া থাকে।

যে-চৈতন্যে লিঙ্গদেহ কল্পিত হয়, সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য (বা কূটস্থ চৈতন্য), চৈতন্যে পরিকল্পিত লিঙ্গদেহ এবং লিঙ্গদেহে বিদ্যমান চিদাভাস, এই তিনটিকে মিলিতভাবে দ্বৈতবিবেকে জীব আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।[১]

পঞ্চপাদিকা বিবরণ রচয়িতা প্রকাশাত্মযতি বলেন, অবিদ্যায় চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই জীব—

"নন্বু কোঽয়ং জীবো নাম ব্রহ্মৈব অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত ইতি বদামঃ"।

বিবরণ, ২৬৪ পৃষ্ঠা।

পরমেশ্বর বিম্ব, জীব তাঁহার প্রতিবিম্ব ও অভিন্ন, জীব এবং ব্রহ্মও তত্ত্বতঃ অভিন্ন।[২] এইরূপ প্রতিবিম্ববাদই প্রকাশাত্মযতির অভিপ্রেত। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিম্ব, এই প্রকার প্রতিবিম্ববাদ শঙ্করবেদান্তের অনুমোদিত বলিয়া প্রকাশাত্মযতি মনে করেন না। তিনি বলেন, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে একমাত্র অজ্ঞানই ভেদসাধক উপাধিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। অনাদি অজ্ঞান ব্যতীত জীব ও

ঈশ্বর বিম্বস্থানীয়, জীব তাঁহার প্রতিবিম্ব

১। চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ।
চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসংঘো জীব উচ্যতে॥
পঞ্চদশী ৪।১১।

২। পঞ্চপাদিকা, ২০ পৃষ্ঠা।

ঈশ্বরের অন্য কোন ভেদক নাই। এইজন্য অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই, জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। অজ্ঞান না থাকিলে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ সাধন করিবে কে?[১] অবিদ্যাই ব্রহ্মের প্রতিবিম্বগ্রহণের উপযুক্ত একমাত্র দর্পণ বা উপাধি। একই উপাধিতে একরূপ প্রতিবিম্বই পড়িবে, দুইপ্রকার প্রতিবিম্ব পড়া সম্ভবপর নহে। জীব ও ঈশ্বর, এই দুইটিকেই প্রতিবিম্ব বলিয়া গ্রহণ করিলে, দুই প্রকার প্রতিবিম্ব গ্রহণের জন্য দুইটি বিভিন্ন উপাধি কল্পনা করা আবশ্যক হয়। এখানে এক অজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উপাধি দেখা যায় না। অতএব জীব ও ঈশ্বর এই দুইটিই প্রতিবিম্ব, এইরূপ অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে। ঈশ্বর বিম্ব, জীব তাঁহার প্রতিবিম্ব, এই প্রকার সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এইরূপ স্বীকার করিলেই ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য এবং জীবের ঈশ্বর বশ্যতা সম্ভবপর হয়।

ঈশ্বর ও জীব এই দুইটিই প্রতিবিম্ব নহে

"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"। ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩।

এই ব্রহ্মসূত্রে আপ্তকাম পরমেশ্বরের বিশ্বসৃষ্টিকে যে লীলা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয়। ইহা তাঁহার মহিমা ব্যতীত আর কিছুই নহে যে, তাঁহার দ্বারা এই বিশ্বচক্র সর্বদা আবর্তিত হইতেছে। তিনি সৃষ্টির রথচক্র আবর্তিত করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। নিজের ছায়ায় সরল ও আঁকাবাঁকা ভঙ্গি দেখিয়া মানুষ যেমন আনন্দ অনুভব করে, সেইরূপ স্বীয় প্রতিবিম্ব জীবের সুখ-দুঃখময় সংসার নাটকের অভিনয় দেখিয়া, আনন্দময় নন্দিত হইতেছেন। আলোচ্য 'লীলাসূত্রে'র ইহাই তাৎপর্য বলিয়া জানিবে। যাঁহারা জীবের ন্যায় পরমেশ্বরকেও প্রতিবিম্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, তাঁহাদের মতে প্রতিবিম্ব পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য না থাকায়, উক্ত 'লীলা সূত্র' অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।[২]

বিবরণোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে অবিদ্যায় চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে,

১। বিভেদ জনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥
যোগবাশিষ্ঠ।

২। (ক) প্রতিবিম্বগতাঃ পশ্যন্ ঋজুবক্রাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
পুমান্ ক্রীড়েদ্ যথা ব্রহ্ম তথা জীবস্থ বিক্রিয়াঃ॥

তাহাকে জীব বলিয়া গ্রহণ করিলে একটা প্রশ্ন আসে এই যে, 'কার্যোপাধিরয়ং জীবঃ, কারণোপাধিরীশ্বরঃ', এই সকল শ্রুতি, সূত্র, ভাষ্য প্রভৃতিতে এবং সংক্ষেপশারীরক প্রমুখ মৌলিক গ্রন্থাবলীতে অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে যে জীব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, অবিদ্যায় চৈতন্য-প্রতিবিম্বই জীব বটে। অবিদ্যাকে ছাড়িয়া কেবল অন্তঃকরণ প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জীব বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। জীব বস্তুতপক্ষে অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য হইলেও, প্রমাতা, কর্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী প্রভৃতিরূপে জীবের যে বিশেষ বিভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা যে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি বিবিধ ধর্মসংবলিত অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসের ফলেই উদিত হয়, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? অন্তঃকরণই যে জীবের বিশেষ অভিব্যক্তি-স্থান তাহা অবশ্য স্বীকার্য। অন্তঃকরণ অজ্ঞানের একপ্রকার বিশেষ পরিণাম। এইজন্য অজ্ঞান-প্রতিবিম্ব জীবকে অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও তাহাতে কোনরূপ বিরোধ বা অসঙ্গতি হয় না।[১]

প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে অভিন্ন এবং সত্য

প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, সত্য কি মিথ্যা, এই প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন অদ্বৈতবেদান্তী মনে করেন যে, প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে ভিন্ন নহে। ভেদপ্রতীতি ভ্রমাত্মক। বিম্ব সত্য সুতরাং (বিম্বাভিন্ন) প্রতিবিম্বও সত্য।

এবং বাচস্পতের্লীলা লীলাসূত্রীয় সঙ্গতিঃ।
অস্মতসূত্রতঃ ক্লিষ্টা প্রতিবিম্বেশবাদিনাম্॥
উল্লিখিত লীলাসূত্রের বেদান্ত কল্পতরু, ২।১।৩৩।

(খ) সিদ্ধান্ত লেশ সংগ্রহ, ১০২—১০৫ পৃষ্ঠা।
সিদ্ধান্ত লেশ সংগ্রহের কৃষ্ণানন্দ কৃত টীকা,
১০২—১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১। (ক) সিদ্ধান্ত লেশ সংগ্রহ, ১০৫ পৃষ্ঠা,

(খ) কর্তৃত্বাদিধর্মাণাং কেবলাজ্ঞানপরিণামত্বাভাবেন তদুপাধিমাত্রাৎ ন জীবস্য কর্তৃত্বাদিধর্মরূপ বিশেষলাভঃ, কিন্তু কর্তৃত্বাদিবিশেষবদন্তঃ করণতাদাত্ম্যাধ্যাসাদেব তল্লাভঃ ইতি ন তদুপাধিত্বনিরূপণং ব্যর্থমিতি।
সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহের কৃষ্ণানন্দতীর্থবিরচিত টীকা, ১০৫ পৃষ্ঠা।

কাহারও কাহারও মতে বিম্ব ও প্রতিবিম্ব এক বা অভিন্ন নহে, বিভিন্ন। বিম্ব সত্য, প্রতিবিম্ব মিথ্যা। সত্য ও মিথ্যা এক বা অভিন্ন পদার্থ হইবে কিরূপে? মুখের কাছে আয়না ধরিলে আয়নায় মুখ প্রতিবিম্বিত হয়। ঘাড়ের উপরের মুখ ঘাড়ের উপরেই আছে; আয়নার মধ্যে তাহা নাই এবং থাকিতে পারে না। আয়নায় মুখের প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্বই শুধু আছে। মুখ ও মুখচ্ছবির আকার তুল্য হইলেও, ইহাদের অভেদ অসম্ভব কথা। উত্তরমুখী হইয়া আয়নায় মুখ দেখিলে, আয়নার প্রতিফলিত মুখখানি দক্ষিণমুখ দেখায়। মূল মুখের ডান চক্ষুঃ মুখচ্ছবির বাম চক্ষুঃ, ডান কান বাম কান দেখাইবে। এই অবস্থায় কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই মুখ ও মুখচ্ছবিকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। "আমার মুখ আয়নায় দেখা যাইতেছে", এইরূপে মুখ ও মুখচ্ছবির যে অভেদবুদ্ধির উদয় হয়, তাহা নিছক ভ্রম ভিন্ন কিছু নহে। বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের আকার একরূপ বলিয়াই, ঐরূপ অভেদ বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। মানুষ যে আয়নায় মুখের প্রতিবিম্ব দেখিবার জন্য ব্যগ্র হয়, তাহাও বিম্ব প্রতিবিম্বের অভেদ সূচনা করে না। বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব সমানাকার বিধায়, স্বীয় মুখের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া মুখের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্যই লোকে আয়নায় মুখ দেখে। নিজমুখের চক্ষুর তারা প্রভৃতি কাহারও প্রত্যক্ষগোচর হয় না, প্রতিবিম্বের চক্ষুর তারা প্রভৃতি সকলেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহা হইতে গ্রীবাস্থ মুখ এবং দর্পণস্থ মুখচ্ছবি যে অভিন্ন নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়।

প্রতিবিম্ব সত্য নহে, মিথ্যা

প্রতিবিম্ব স্থলে বিম্বেরই দর্শন হয়, নেত্ররশ্মি প্রতিবিম্বের আধার দর্পণ প্রভৃতিতে প্রতিহত হইয়া বিম্ব-মুখ প্রভৃতির দিকে ফিরিয়া আসে এবং বিম্ব-মুখ প্রভৃতির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মায়। প্রতিবিম্ব বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এইরূপ মতও যুক্তিসম্মত নহে। নির্মল জলাশয়ে সূর্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা জলাশয়ের দিকে তাকাইলে সকলেরই প্রত্যক্ষ হয়। জলাশয়ের অন্তর্গত বালুকারাশিও সেক্ষেত্রে সুধী দর্শকের নয়নগোচর হয়। জলাশয়ের অন্তস্তলে অবস্থিত বালুকারাশির কিছুতেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। বালুকারাশি প্রত্যক্ষ-গোচর হয়, সুতরাং নেত্ররশ্মি যে এক্ষেত্রে জলের দ্বারা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া

প্রতিবিম্ব স্থলে বিম্বেরই দর্শন হয় এইমত যুক্তিযুক্ত নহে

আসে নাই; জলরাশি ভেদ করিয়া বালুকার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই অবস্থায় নেত্ররশ্মি প্রতিবিম্বের আধারে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, এইরূপ মতবাদ কিরূপে গ্রহণ করা যায়? তারপর, সূর্যরশ্মি দ্বারা নেত্ররশ্মি প্রতিহত হয়, ইহা কে না জানেন? এরূপ ক্ষেত্রে নেত্ররশ্মি জলে প্রতিহত হইয়া সূর্য-কিরণজাল ভেদ করিয়া সূর্যমণ্ডলে পৌঁছিয়া সূর্যের প্রত্যক্ষ জন্মাইবে, ইহাকে বাতুলের প্রলাপ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? প্রভাতে যখন সূর্যোদয় হয়, তখন জলাশয়ের পশ্চিমাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলে পশ্চাতে উদীয়মান অংশুমালীকে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে জলে প্রতিহত হইয়া নেত্ররশ্মি পিছনের দিকে ছুটিয়া গিয়া সূর্যকে গ্রহণ করিবে, এইরূপ কল্পনা নিতান্তই অবাস্তব। আয়নাখানি মলিন হইলে, সেই মলিন আয়নায় প্রতিফলিত গৌরোজ্জ্বল মুখও মলিন বলিয়া প্রতিভাত হয়। আয়নায় প্রতিহত নেত্ররশ্মি বিম্ব-মুখের প্রত্যক্ষতা সম্পাদন করিলে, মুখে প্রতিবিম্বের শ্যামলিমা অনুভূত না হইয়া স্বাভাবিক শুভ্রতা এবং উজ্জ্বলতাই প্রত্যক্ষগোচর হইত। কিন্তু তাহাতো হয় না, "মলিনং মে মুখম্", এইরূপে মালিন্যই মুখে অনুভূত হইয়া থাকে। আলোচ্য প্রতিবিম্ববাদ অস্বীকার করিলে ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? দ্বিতীয়তঃ, প্রতিবিম্ব যদি নিছক মিথ্যা হয়, তবে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বেদান্ত মহাবাক্যে অহং-প্রত্যয়-গম্য জীব এবং ব্রহ্মের যে অভেদের উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাই বা কিরূপে উপপাদন করা যায়? মিথ্যা ও সত্যের, বিনাশী জীব এবং অবিনাশী পরব্রহ্মের অভেদ তো অসম্ভব কথা। ইহার উত্তরে প্রতিবিম্ব-মিথ্যাত্ববাদীরা বলেন, "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বাক্য দ্বারা সংসারী অহম্-অভিমানী জীবের এবং নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পরব্রহ্মের অভেদ বুঝায় না। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনরূপ ভেদ নাই; ভেদ অজ্ঞানকল্পিত এবং মিথ্যা ইহাই বুঝায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে মানুষকে দেখিয়া গাছের গুড়ি বলিয়া ভ্রম জন্মিল, পরমুহূর্তে মানুষের হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ দর্শনের ফলে দৃশ্যমান বস্তুটিকে মানুষ বলিয়া চিনিলে, তাঁহার সম্পর্কে উৎপন্ন [গাছের গুড়ি] ভ্রমের যেমন নিঃশেষে নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ "অহং ব্রহ্মাস্মি" "আমি ব্রহ্ম", এই ব্রহ্মবুদ্ধি স্থির হইলে, মিথ্যা 'অহংবুদ্ধি' সমূলে বাধিত হয়। অদ্বৈতবেদান্তের পরিভাষায় ইহাকে অভেদ (বা সামানাধিকরণ্য) বলে না; বাধমূলক ব্রহ্মবোধ

বলে। এইরূপ ব্রহ্মবোধের বিবরণ দিতে গিয়া আচার্য সুরেশ্বর তাঁহার নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিতে উল্লিখিত বৃক্ষকাণ্ড-বিভ্রমের দৃষ্টান্ত উপন্যাস করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

যোঽয়ং স্থাণুঃ পুমানেষ পুংধিয়া স্থাণুধীরিব।
ব্রহ্মাস্মীতি ধিয়াঽশেষা অহংবুদ্ধির্নিবর্ততে॥

সুরেশ্বতকৃত নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি।

আলোচিত প্রতিবিম্ববাদের বিরুদ্ধে অবচ্ছেদ-বাদীর আপত্তি এবং তাহার সমাধান

অবচ্ছেদবাদের সমর্থক আচার্যগণ বলেন, যাহার রূপ নাই, তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে না। জলাশয় প্রভৃতিতে চন্দ্র-সূর্যেরই প্রতিবিম্ব পড়িতে দেখা যায়। সুতরাং নীরূপ ব্রহ্মের বা কূটস্থের প্রতিবিম্ব পড়ে, এইরূপ কল্পনা নিতান্তই অবাস্তব। জলাশয়ে নীরূপ আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে না, অনন্ত আকাশে যে সৌরকিরণ-মালা খেলিয়া বেড়ায়, জলে তাহারই প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই সৌরকিরণের প্রতিবিম্বকে আকাশের প্রতিবিম্ব বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। যদি বল যে, মাথার উপরে অসীম নীল আকাশ দেখিয়া যেমন "আকাশ নীল", "আকাশ অসীম", এইরূপ জ্ঞানোদয় হয়, সেইরূপ জলাশয় প্রভৃতিতে প্রতিবিম্বিত আকাশ দেখিয়াও, 'নীলং নভঃ', 'বিশালং নভঃ', এইপ্রকার অনুভব সকলেরই উদয় হয়। অসীম নীল আকাশ বস্তুতপক্ষে জলাশয়ে নাই, জলাশয়ে অনন্ত আকাশের প্রতিবিম্বই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই অবস্থায় নীরূপ আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে না, এমন কথা বলা যায় না। প্রতিবিম্ব বস্তুর স্বাভাবিক রূপ থাকিলেও পড়িতে পারে, আরোপিত রূপের দ্বারাও সম্ভব হইতে পারে। এই অবস্থায় আকাশের আরোপিত নীল রূপের প্রতিবিম্ব পড়িতে বাধা কি? আয়নায় নীরূপ রূপের এবং নীরূপ সংখ্যার যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা কোন সুধীই অস্বীকার করিতে পারেন না। জলাশয় প্রভৃতিতে পতিত আলোকের প্রতিবিম্বকেই আকাশের প্রতিবিম্ব বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, এইরূপ বলিতে গেলেও প্রকারান্তরে গগনের প্রতিবিম্বের অস্তিত্বই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কেননা, গগন প্রতিবিম্ব আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক হইলে, গগন প্রতিবিম্বের ভ্রমের প্রশ্নই বা আসে কি করিয়া? এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য এই যে, জলাশয় প্রভৃতিতে গগনের আরোপিত প্রতিবিম্ব স্বীকার করিলেও, অবিদ্যা, অন্তঃকরণ প্রভৃতিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, এইরূপ প্রতিবিম্ববাদীর

সিদ্ধান্ত কোনমতেই গ্রহণ করা যায় না। কারণ, যেই আধারে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই আধারের রূপ থাকা আবশ্যক হয়। জলাশয় প্রভৃতিতেই আকাশের প্রতিবিম্ব-ভ্রম হয়, নীরূপ বায়ুতে তাহা হয় না। প্রতিবিম্বের আধারের কোনপ্রকার রূপ না থাকিলে, সেই নীরূপ আধার যে প্রতিবিম্ব-গ্রহণ করে, এমন তো কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। অবিদ্যাই বল, কি অন্তঃকরণই বল, ইহাদের কাহারও কোন রূপ নাই। এই অরূপ অবিদ্যা, অন্তঃকরণ নীরূপ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিবে, ইহা তো নিতান্তই দৃষ্টান্তবিরুদ্ধ কল্পনা।[১] এইরূপ অসম্ভব কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় বলিয়াই আলোচ্য প্রতিবিম্ববাদ নির্বিবাদে মানিয়া লওয়া যায় না। ঘটপরিচ্ছিন্ন বা বা ঘটের দ্বারা সীমাবদ্ধ আকাশের ন্যায়, অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব, অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ঈশ্বর, এইরূপ "অবচ্ছেদবাদ" গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

আলোচ্য অবচ্ছেদবাদে অন্তর্যামি ব্রাহ্মণোক্ত ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্ব কিরূপে সম্ভবপর হয়? ঘটের অন্তর্বর্তী আকাশই ঘটাবচ্ছিন্ন হয়; যেই অনন্ত আকাশ ঘটের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না, সেই অনবচ্ছিন্ন আকাশ ঘটে নাই। ঘটের বাহিরেই আছে। এইরূপ অন্তঃকরণের দ্বারা সীমাবদ্ধ চৈতন্যই জীব, অনবচ্ছিন্ন, অসীম চৈতন্য, যাহা অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন নহে, অন্তঃকরণের বাহিরেই যাহা বিরাজ করে, তাহাই ঈশ্বর। জীব ও জগতের বাহিরে অবস্থিত সেই ঈশ্বর-চৈতন্য জীবকে নিয়ন্ত্রিত করিবে কিরূপে? যিনি আত্মা বা জীবের মধ্যেও অবস্থান করেন, আত্মা যাহাকে জানে না, বিজ্ঞান যাহাকে ধরিতে পারে না, যিনি বিজ্ঞানের অন্তরে বিরাজ করেন, আত্মাকে বিজ্ঞান প্রভৃতিকে, এক কথায় সমস্ত জীব, জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করেন, নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করেন, তিনিই জীব ও জগতের অন্তর্যামী, সমস্ত বিকার প্রবাহের মধ্যে পতিত হইয়াও অবিকারী, জীব ও জগতের প্রভু, শাস্তা, ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। এইরূপে পরমেশ্বরকে জীব ও জগতের অন্তর্যামিরূপে উপনিষদে যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা আলোচিত "অবচ্ছেদবাদে" কিরূপে সঙ্গত হয়? "প্রতিবিম্ববাদে" বুদ্ধিদর্পণে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া থাকে। বিম্বব্যতীত সেই প্রতিবিম্ব সম্ভবপর হয় না। বুদ্ধিতে চৈতন্যের

১। সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহের কৃষ্ণানন্দতীর্থবিরচিত টীকা, ১১১ পৃষ্ঠা।

প্রতিবিম্ব স্বীকার করিতে গেলেই, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির অন্তর্যামিরূপে বুদ্ধিতে বিম্বচৈতন্যের অবস্থানও অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে। অতএব এই মতে বিম্বস্থানীয় ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্ব অসম্ভব হয় না। এইরূপ উক্তির প্রতিবাদে অবচ্ছেদবাদী বলেন যে, জলাশয় প্রভৃতিতে যেমন সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল প্রতিফলিত হইয়া থাকে, প্রতিবিম্ববাদীর মতে বুদ্ধিদর্পণে সেইরূপ ভূমা চৈতন্যের সবখানিই প্রতিফলিত হয় কি? তাহা অবশ্যই হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিভেদে অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন। অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা জীবও সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন। অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়াই চৈতন্য নিঃশেষ হইয়া যায় না। সর্বব্যাপক চৈতন্যের সবখানিই কিছু অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয় না। সামান্য অংশই অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয়। অন্তঃকরণের বাহিরেই থাকে বেশী। ব্যাপী ঈশ্বর চৈতন্য যাহা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয় না, তাহাকেই প্রতিবিম্ববাদীর সিদ্ধান্তে অন্তর্যামী বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের বাহিরে অবস্থিত ভূমা চৈতন্যকে অন্তর্যামী বলিয়া ব্যাখ্যা করায়, এইমতেও ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্ব অসঙ্গত এবং অসম্ভব হয় না কি? অবচ্ছেদবাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্ব অসম্ভব হয় বলিয়া প্রতিবিম্ববাদী যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি নিজেও সেই দোষের কবল হইতে অব্যাহতি পান না। পরমেশ্বরের অন্তর্যামিত্ব উপপাদন করার জন্য প্রতিবিম্ববাদী যদি বলেন যে, অন্তঃকরণে সর্বব্যাপী চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ায় বিম্ব ব্রহ্মও তথায় অবশ্যই বিরাজ করিবে, জীব ও জগৎকে স্ব স্ব পথে পরিচালিত করিবে। প্রতিবিম্ববাদে ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্ব অসম্ভব হইবে না। এরূপক্ষেত্রে আমরাও (অবচ্ছেদবাদীরাও) বলিব যে, অবচ্ছেদবাদেও ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্ব অসঙ্গত হইবে না। কেননা, অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য, যাহা ঈশ্বর বলিয়া পরিচিত, অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন জীব-চৈতন্যের অন্তরেও সেই ঈশ্বর-চৈতন্য বিরাজ করিবে এবং জীবও জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে অবচ্ছেদ-বাদেও অন্তর্যামিত্বের অনুপপত্তির প্রশ্ন আসে না।[১] অরূপ আধারে (অন্তঃকরণে) নীরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে না বলিয়া প্রতিবিম্ববাদই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

১। সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ এবং উহার কৃষ্ণানন্দতীর্থকৃত টীকা। ১১২—১১৪পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

অবচ্ছেদবাদেও যে কোন শ্রুতি বা ব্রহ্মসূত্রের অসঙ্গতি হয় না তাহা দেখাইতে গিয়া মহামনীষী অপ্যয়দীক্ষিত তাঁহার বেদান্তকল্পতরু-পরিমলে (১৫৬—১৫৭ পৃষ্ঠায় নির্ণয়সাগর সং) বলিয়াছেন—অবচ্ছেদবাদীর মতে "ন স্থানতোঽপি" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১১।) ইত্যাদি সূত্রোক্ত অধিকরণে প্রতিবিম্ববাদ ভাষ্যকার স্বয়ংই খণ্ডন করিয়াছেন।[১]

"অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ"। ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৮।

এই সূত্রে জলসূর্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হওয়ায় প্রতিবিম্ববাদই সূত্রে গৃহীত হইয়াছে, প্রতিবিম্ববাদীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে অবচ্ছেদবাদী বলেন—

"অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্"। ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৯।

এই সূত্রে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, সূর্যের জলপূর্ণ ভাণ্ডে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেখানেও দেখা যায় যে, সূর্যের মূর্ত্তি আছে এবং সূর্য জলভাণ্ড হইতে বহুদূরে আকাশপথে বিরাজ করেন, দূরস্থিত মূর্ত্ত-বস্তুরই প্রতিবিম্ব পড়ে, চিদাত্মা ভূমা, সর্বব্যাপী, সর্বান্তর্যামী এবং অমূর্ত। ঐরূপ আত্মার দূর নিকট বলিয়া কিছুই নাই; সুতরাং সর্বব্যাপী চিদাত্মার সুদূর আকাশচারী সূর্যের মত প্রতিবিম্ব পড়িবে কিরূপে।[২] পরব্রহ্মের পক্ষে সূর্যাদি দৃষ্টান্তের তাৎপর্য এই বুঝিতে হইবে যে, সূর্য যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া জলগত বৃদ্ধি, হ্রাস, কম্পন প্রভৃতি উপাধি-ধর্মের অধীন হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন হইয়া অন্তঃকরণ গত সুখ, দুঃখ, শোক, মোহ প্রভৃতির অধীন হইয়া থাকে। ব্রহ্ম সূর্যের মত প্রতিবিম্বিত হন, সূর্য প্রভৃতি দৃষ্টান্তের এইরূপ তাৎপর্য নহে।

আভাস এব চ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৫০।

এই ব্রহ্ম সূত্রোক্ত "আভাসবাদে"র তাৎপর্যও এইরূপই বুঝিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অবচ্ছেদবাদেও কোন সূত্রের বিরোধ বা অসঙ্গতি

১। অথাবচ্ছেদপক্ষমভ্যুপগচ্ছতাং মতমনুস্যত্যোচ্যতে। প্রতিবিম্বপক্ষোভাষ্যকারৈরেব ন স্থানতোঽপি (ব্রঃ অঃ ৩, পাঃ ২, সূঃ ১১) ইত্যধিকরণে নিরাকৃতঃ।
কল্পতরু পরিমল, ১৫৭ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং।

২। যথা অম্বু সূর্যাদিভ্যো মূর্ত্তেভ্যো বিপ্রকৃষ্টদেশং গৃহ্যতে ন তথা আত্মনো বিপ্রকৃষ্ট-দেশং প্রতিবিম্বন-যোগ্যং বস্তু গৃহ্যতে। অতো ন ক্বাপ্যাত্মনো সর্বগতস্য প্রতিবিম্বো যুক্তঃ। কল্পতরু পরিমল, ১৫৭ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং।

নাই। সর্বব্যাপী চৈতন্যের অন্তঃকরণের দ্বারা পরিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া, অনেক মনীষী প্রতিবিম্ববাদের স্থলে অবচ্ছেদবাদই গ্রহণ করিয়াছেন—

"চৈতন্যস্য অন্তঃকরণাদিনা অবচ্ছেদোঽবশ্যম্ভাবীতি
আবশ্যকত্বাদবচ্ছিন্নো জীব ইতি পক্ষং রোচয়ন্তে।"

সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ, ১২১

কোন কোন সুধী আলোচ্য অবচ্ছেদবাদ বা প্রতিবিম্ববাদ এই কোন বাদই অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, কুন্তীপুত্র কর্ণ যেমন কুন্তীপুত্র থাকিয়াই, রাধেয় বা রাধাপুত্র হইয়াছিলেন, পরব্রহ্মও সেইরূপ স্বয়ং অবিকৃত পরব্রহ্ম থাকিয়াই, স্বীয় অবিদ্যা-প্রভাবে জীব আখ্যা লাভ করেন। জীব বস্তুতঃ পক্ষে পরব্রহ্মের অবচ্ছেদ বা প্রতিবিম্ব নহে, অবিকারী ব্রহ্মের ইহা আবিদ্যক প্রকাশ। সর্ববিধ বিকার-প্রবাহের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও অবিকারী পরব্রহ্মই অজ্ঞানবশে সংসারী সাজিয়া বিশ্বের রঙ্গশালায় সুখ-দুঃখের বিচিত্র অভিনয় করেন, বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যা বিধ্বস্ত হইলে, ব্রহ্মের আবিদ্যক জীব-লীলাও বিলুপ্ত হয়। সদাপূর্ণ পরব্রহ্ম তখন নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তরূপেই বিরাজ করেন।[১]

ন প্রতিবিম্বো নাপ্যবচ্ছিন্নো জীবঃ। কৌন্তেয়স্যেব রাধেয়ত্ববদ্ অবিকৃতস্য ব্রহ্মণ এব স্বাবিদ্যয়া জীবভাবঃ।

সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ, ১২২ পৃষ্ঠা।

এ বিষয়ে নিম্নলিখিত গল্পটি বিশেষ অর্থপূর্ণ। কোনও এক রাজার ছেলে অতি শৈশবে পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, ঘটনাচক্রে জনৈক ব্যাধের গৃহে প্রতিপালিত এবং পরিবর্ধিত হন। রাজপুত্র নিজেকে ব্যাধপুত্র বলিয়াই জানিতেন, রাজপুত্র বলিয়া জানিতেন না। রাজোচিত শিক্ষা-দীক্ষাও গ্রহণ করিবার সুযোগ তিনি পান নাই। ব্যাধের দলে মিশিয়া, ব্যাধসুলভ কর্ম করিয়াই, তিনি শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করেন। এমন সময় একদিন কোনও সত্যবাদী সুজনের মুখে রাজপুত্র তাঁহার আত্ম-পরিচয় জানিতে পারিলেন এবং নিজের রাজপরিচয় শুনিবামাত্র আমি রাজা, এইরূপ মনে করিয়া ব্যাধ জাতির অভিমান এবং ব্যাধোচিত

১। কৌন্তেয় ইব রাধেয়ঃ জীবঃ স্বাবিদ্যয়া পরঃ।
নাভাসো নাপ্যবচ্ছিন্ন ইত্যাহুরপরে বুধাঃ॥

বেদান্ত সূক্তিমঞ্জরী, ৪২ কারিকা।

কর্ম পরিত্যাগ করতঃ রাজোচিত গুণাবলী এবং কার্যাবলী অনুসরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। জীবও এইরূপ স্বভাবতঃ পরমাত্মস্বরূপ এবং অসংসারী হইলেও, অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় আত্মাগ্নি হইতে বিচ্যুত হইয়া, দেহেন্দ্রিয়াদির জালে বদ্ধ হইয়া, নিজের পরমাত্মভাব ভুলিয়া গিয়া নিজেকে শোকদুঃখাকুল সংসারী বলিয়াই বিবেচনা করেন। সেই অবস্থায় পরম-কারুণিক আচার্য যদি তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানাইয়া দেন, এবং বুঝাইয়া দেন যে, তুমি শোক-মোহের অধীনে সংসারী নহ, তুমি অসংসারী পরব্রহ্ম, "তত্ত্বমসি"। এই গুরুমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিলে, জীব 'এষণা'র নাগপাশ ছিন্ন করিয়া, শিবভাব প্রাপ্ত হইবে। তাহাতে সন্দেহ কি? অগ্নির স্ফুলিঙ্গ অগ্নি হইতে বিচ্যুত হইবার পূর্বে যেমন সেই অগ্নির সহিত এক এবং অভিন্ন ছিল, জীবও সেইরূপ জীবভাব লাভ করিয়া, সংসারী সাজিয়া, পরমাত্মা হইতে বিভক্ত হইবার পূর্বে পরমাত্মাই ছিল। রাজপুত্রের রাজপরিচয়ের পর যেমন তাঁহার ব্যাধভাব বিলুপ্ত হয়—জীবেরও সেইরূপ পরব্রহ্ম পরিচয় লাভ করার পর, জীবভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হইবে, ইহাই তো স্বাভাবিক।[১] অনাদি অবিদ্যাই জীবভাবের মূল, জ্ঞানদৃষ্টির সাহায্যে নিজের প্রকৃতরূপের পরিচয় পাইলেই, মুমুক্ষু জীবের জীবত্বের খোলস খসিয়া পড়ে, তিনি হন মুক্ত।

'ব্রহ্মৈব স্বাবিদ্যয়া সংসরতি, স্ববিদ্যয়া মুচ্যতে', এইরূপে অবিকৃত ব্রহ্মের আবিদ্যক জীবভাব যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম যেমন এক, জীবও সেইরূপ এক,—'একো বৈ দ্বিতীয়ো নাস্তি', পক্ষান্তরে, যাঁহারা অন্তঃকরণকে জীবের উপাধি বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মতে ব্যক্তিভেদে অন্তঃকরণ বিভিন্ন বিধায়, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরচারী জীবও বিভিন্ন। ইহারই নাম অনেক জীববাদ। এক জীববাদ এবং অনেক জীববাদ, বেদান্তে এই দুই প্রকার মতেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এক জীববাদির মতে একমাত্র

এক জীববাদ ও অনেক জীববাদ

১। রাজসূনোঃ স্মৃতিপ্রাপ্তৌ ব্যাধভাবো নিবর্ততে।
তথৈবমাত্মনো ঽজ্ঞস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যতঃ ॥

সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহের ১২২-১২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত,
বৃহদারণ্যক—বার্তিকের কারিকা।

জীবের দ্বারা কেবল একটি শরীরই হয় সজীব, অপর সকল শরীরই নির্জীব। আমার নিজ দেহে যেমন প্রাণের স্পন্দন ও সজীবতা অনুভূত হয়, অপরাপর জীবের শরীরেও সেইরূপ সজীবতা এবং প্রাণের স্পন্দন পরিলক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু তাহা স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের সজীবতার ন্যায় পরিকল্পিত এবং অসত্য বলিয়া জানিবে। স্বপ্নের ঘোরে আমি যখন সজীব মনুষ্যমূর্ত্তি এবং তাঁহার বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করি, সেই স্বপ্নদৃষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি ও তাঁহার সজীবতা যেমন বাস্তব নহে, আমারই স্বপ্নকল্পিত, সেইরূপ জাগরিত অবস্থায়ও দ্রষ্টা আমি যে কর্মচঞ্চল অসংখ্য জীবন্ত নরনারী প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাঁহারা এবং তাঁহাদের কর্মশালা এই শ্যামলা ধরিত্রী, সমস্তই আমার অজ্ঞানকল্পিত। পরিদৃশ্যমান জীব ও জগৎ কিছুই সত্য নহে। স্বপ্নস্থলে নিদ্রাই হয় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জননী। যে পর্যন্ত আমি সন্তাপহারিণী নিদ্রার ক্রোড়ে সুপ্ত থাকি, সেই পর্যন্ত স্বপ্নকল্পিত জীব ও জগৎ আমার নিদ্রা কলুষিত দৃষ্টিতে সত্য স্বাভাবিক বলিয়াই প্রতিভাত হয়। স্বপ্নের ন্যায় জাগরণেও চলে অনাদি অবিদ্যার খেলা। যে-পর্যন্ত অবিদ্যা বর্তমান থাকে, সেই পর্যন্ত অবিদ্যা প্রসূত জীব ও জগৎপ্রপঞ্চ আমার নেত্রপথে উদ্ভাসিত থাকে। বিদ্যার অরুণালোকে অবিদ্যার তমিস্রা বিধ্বস্ত হইলে, অবিদ্যারচিত জীব ও জগৎ তিরোহিত হয়, একমাত্র বিদ্যার শাশ্বত জ্যোতিঃই তখন বিরাজ করে।

ঐ একমাত্র জীব কে? এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত রামতীর্থ তাঁহার "বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী"তে বলিয়াছেন—যিনি দেখেন, সেই দ্রষ্টাই একমাত্র জীব, অপরাপর সমস্ত জীব ও জগৎদ্রষ্টা জীবেরই অবিদ্যার খেলা।

শিষ্য বলিলেন—আমি আমাকে এবং অপর সকলকেই আমার ন্যায় সংসারী দেখিতেছি। গুরু শিষ্যকে তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, তবে তুমিই একমাত্র দ্রষ্টা জীব; অপর যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা তোমারই অজ্ঞান-কল্পিত। তোমার অবিদ্যাপ্রভাবেই অন্যান্য জীবকুল ও এই লীলাময়ী বিশ্ব-প্রকৃতি তোমার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইতেছে; এমন কি, তোমার আচার্য উপদেষ্টা আমিও তোমারই অনাদি অবিদ্যার সৃষ্টি। আমরা কিছুই বাস্তব নহি, যতক্ষণ তোমার অবিদ্যা থাকিবে, ততক্ষণ আমরাও থাকিব। অবিদ্যা অন্তর্হিত হইলে, তোমার দ্রষ্টৃত্বও থাকিবে না, তোমার দৃষ্টিতে প্রতিভাত

আমরাও থাকিব না। এইমতে জীব এক বলিয়া, বন্ধ-মুক্ত-ব্যবস্থাও নাই; অর্থাৎ একজীববাদে কোন জীব বদ্ধ, আর কোন জীব মুক্ত, এইরূপ ব্যবস্থা চলিতে পারে না। সংসারী জীব বদ্ধ, নারদ-প্রহ্লাদ প্রভৃতি মুক্ত-জীব বলিয়া শাস্ত্রের যে নির্দেশ পাওয়া যায়, তাহা এই মতে স্বপ্নে কোন জীবের মুক্তিদর্শনের ন্যায়ই কল্পিত এবং অসত্য। একজীববাদে বন্ধ-মুক্ত-ব্যবস্থা যেমন অজ্ঞানেরই কল্পনা, সেইরূপ গুরু-শিষ্য, উপাস্য-উপাসক, জীব-ঈশ্বর প্রভৃতি দ্বৈতমূলক সর্বপ্রকার বিভাবই কল্পনা, বাস্তব কিছু নহে। এই সব বিভাব মিথ্যা, সুতরাং এই সকল দ্বৈত ভাবের উপদেশক শাস্ত্ররাজিও মিথ্যা।

দ্রষ্টা 'আমি'ই যখন একমাত্র জীব, দ্বিতীয় জীব যখন নাই, তখন এই একমাত্র জীবকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিবে কে? দ্বিতীয় উপাস্য না থাকায় উপাসনা করিবে কাহার? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে একজীববাদীর বক্তব্য এই যে, স্বপ্নদর্শী যেমন স্বপ্নে কোন কল্পিত গুরুর নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করে, দেবতার কল্পনা করিয়া উপাসনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে, স্বপ্নরাজ্যের সমস্তই যেমন কল্পনা, সেইরূপ আমাদের জাগরণের সর্বপ্রকার ব্যবহারই আবিদ্যক কল্পনা বলিয়াই গ্রহণ করিবে, সত্যদৃষ্টিতে গ্রহণ করিবে না। এইরূপ মতই অদ্বৈতবেদান্তে 'একশরীরবাদ ও এক-জীববাদ' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে।[১] এই এক-জীববাদেও ভিন্ন ভিন্ন মতের পরিচয় পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে একমাত্র হিরণ্যগর্ভই মুখ্য জীব। অপরাপর জীব হিরণ্যগর্ভেরই

১। (ক) একো জীবঃ, তেন একমেবশরীরং সজীবম্। অন্যানি স্বপ্নদৃষ্টশরীরাণীব নির্জীবানি। তদজ্ঞানকল্পিতং সর্বং জগৎ, তস্য স্বপ্নদর্শনবদ্ যাবদবিদ্যং সর্বো ব্যবহারঃ। বদ্ধমুক্তব্যবস্থাপি নাস্তি, জীবস্য একত্বাৎ। শুকমুক্ত্যাদিকমপি স্বাপ্নপুরুষান্তর মুক্ত্যাদিকমিব কল্পিতম্। অত্র চ সম্ভাবিত সকলশঙ্কা-কলঙ্ক-প্রক্ষালনং স্বপ্নদৃষ্টান্তসলিলধারয়ৈব কর্তব্যমিতি।

সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, ১২৪ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং।

(খ) নন্থ জীবৈক্যমতে বিদ্যোপদেষ্টুরভাবাদ্ বিদ্যোদয়ো ন স্যাৎ, জীবেশ্বর-বিভাগাভাবেন জীবস্য ঈশ্বরোপাসনাদিব্যবহারশ্চ ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ, যথা স্বপ্নদশায়াং স্বপ্নদৃক্ কশ্চিদ্ গুরুমীশ্বরং চ কল্পয়িত্বা তাবুপাস্তে, তাভ্যাঞ্চ বিদ্যাদিকং লভতে, তদ্বদিতিভাবঃ।

সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহের কৃষ্ণানন্দতীর্থরচিত টীকা, ১২৪-১২৫ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং।

প্রতিবিম্ব। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ। চিত্রপটে অঙ্কিত মনুষ্যমূর্তির পরিধেয় বস্ত্ররাজি যেমন বস্ত্রাভাস মাত্র, প্রকৃত বস্ত্র নহে, হিরণ্যগর্ভের প্রতিবিম্ব জীবও সেইরূপ জীবাভাসমাত্র, মুখ্য জীব নহে। এইরূপ মত 'সবিশেষ অনেক-শরীরবাদ এবং মুখ্যৈক জীববাদ' বলিয়া পরিচিত। কোন কোন সুধী মনে করেন যে, হিরণ্যগর্ভও বস্তুতঃ এক নহে, হিরণ্যগর্ভ কল্পভেদে ভিন্ন ভিন্ন। এই অবস্থায় কোন্ কল্পের কোন্ হিরণ্যগর্ভ যে মুখ্য জীব, কেযে অমুখ্য জীব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। এইজন্য ঐ সকল পণ্ডিতেরা বলেন—একমাত্র জীবই অবিশেষে সর্বশরীরে অধিষ্ঠিত আছেন। এইরূপ জীবের কোন বিশেষ সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না বলিয়া, এইরূপ মতবাদ 'অবিশেষ এক-জীববাদ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আপত্তি হইতে পারে যে, সর্বশরীরে একই জীব অধিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে, এক শরীরের সুখ-দুঃখবোধ অপর শরীরে উৎপন্ন হয় না কেন? রামের দেহে যেই জীব, শ্যামের দেহেও সেই জীবই বিরাজ করিলে, রামের সুখ-দুঃখবোধ শ্যামের উদয় হইতে বাধা কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে এক-জীববাদীরা বলেন, দেহের ভেদই সেক্ষেত্রে দেহান্তরে সুখ-দুঃখ প্রভৃতির উপলব্ধির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। দেহের ভেদ থাকার দরুণই যে এক দেহের সুখ-দুঃখপ্রভৃতির অপর দেহে জ্ঞানোদয় হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্ত দেহ-ভেদে যাঁহারা আত্মা বা জীবের ভেদ স্বীকার করেন, সেই অনেক-জীববাদীরাও মানিতে বাধ্য। নতুবা আত্মা বা জীব তো তাঁহাদের মতেও দেহপরিমাণ নহে, এক দেহেই সীমাবদ্ধ নহে, আত্মা বা জীব ভূমা এবং ব্যাপক। এই অবস্থায় তাঁহাদের সিদ্ধান্তে রামের সুখ-দুঃখবোধ শ্যামের হয় না কেন? জন্মান্তরের অনুভূত বিষয়সমূহ বর্তমান জন্মে স্মৃতিতে ভাসে না কেন? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর অনেক-জীববাদী দিতে পারেন না। আত্মা দেহের ন্যায় অনিত্য নহে, নিত্য। অন্য জন্মেও দেহে যে শাশ্বত আত্মা বিরাজমান ছিল, এই জন্মের এই দেহেও সেই নিত্য আত্মাই অধিষ্ঠিত আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা না হইলে কর্ম ও কর্ম-ফলভোগের নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখা কোনমতেই সম্ভবপর হইবে না। দেহের ভেদে আত্মার ভেদ স্বীকার করিয়াও, জন্মান্তরে অনুভূত বিষয়ের স্মৃতি-বারণের উদ্দেশ্যে অনেক-জীববাদীরা যদি বর্তমান দেহকে সুখ, দুঃখ, স্মৃতির

প্রতিবন্ধক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তবে একজীববাদী দেহ-ভেদকে সুখ-দুঃখবোধের প্রতিবন্ধক বলিয়া গ্রহণ করিলে, প্রতিবাদীর তাহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে ?

এক-জীববাদে একের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি হইবে। দ্রষ্টা জীবের অজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে, অমুক্ত জীব আর কেহ থাকিবে না। এক-জীববাদে বদ্ধ-মুক্ত ব্যবস্থার যে কোন অর্থ নাই, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই একের মুক্তিতে সকলের মুক্তির প্রশ্নটিকেই অনেক-জীববাদীরা এক-জীববাদের বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সর্বজ্ঞাত্ম মুনি তাঁহার "সংক্ষেপ শারীরক" নামক গ্রন্থে বদ্ধ-মুক্ত ব্যবস্থার সঙ্গতি রক্ষা করিয়াও, আলোচ্য এক-জীববাদ সমর্থন করিয়াছেন। সর্বজ্ঞাত্ম মুনি প্রতিবিম্ববাদ অনুসরণ করতঃ এক-জীববাদ সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, অবিদ্যায় চিৎপ্রতিবিম্বই জীব। অবিদ্যা এক, অতএব অবিদ্যা প্রতিবিম্ব-জীবও এক। এক অবিদ্যায় নানা প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে না, জীবও সুতরাং নানা হইতে পারে না। অন্তঃকরণই জীবের বিশেষ অভিব্যক্তি-স্থান। অন্তঃকরণ অবিদ্যায় কল্পিত এবং দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অবিদ্যা-কল্পিত অন্তঃকরণের দ্বারা অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত জীবের বিভেদ অবশ্যম্ভাবী। যেই অন্তঃকরণে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার উদিত হইবে, সেই অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্বই বিমুক্ত হইবে। অপরাপর অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্ব বা জীব মুক্ত হইবে না। সুখ-দুঃখময় অন্তঃকরণের জালে বদ্ধই থাকিবে। এই দৃষ্টিতে এক-জীববাদ গ্রহণ করিয়াও সর্বজ্ঞাত্ম মুনি বদ্ধ-মুক্ত ব্যবস্থা প্রভৃতির উপপাদন করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তির মর্ম এই যে, ব্রহ্মাশ্রিত অবিদ্যার প্রভাবেই পরব্রহ্ম সংসারী সাজেন। অজ্ঞানবশেই বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র, উপাস্য-উপাসক, গুরু-শিষ্য প্রভৃতি দ্বৈতমূলক বিভাব কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ কল্পিত শাস্ত্র, আচার্য প্রভৃতির উপদেশ হইতেই ব্রহ্মবিদ্যা স্ফূর্তি লাভ করে। ব্রহ্মবিদ্যার ভাস্বর জ্যোতিতে অবিদ্যার অন্ধকার বিদূরিত হয় এবং ব্রহ্ম স্বীয় সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজ করেন।[১] আচার্য মধুসূদন সরস্বতী আলোচ্য-

---

১। স্বীয়াঽবিদ্যাকল্পিতাচার্য-বেদ-ন্যায়াদিভ্যো জায়তে তস্য বিদ্যা।
বিদ্যা-জন্ম-ধ্বস্তমোহস্য তস্য, স্বীয়ে রূপেঽবস্থিতিঃ স্বপ্রকাশে ॥
সংক্ষেপশারীরক ২।১৬৩।

মতের প্রতিধ্বনি করিয়াই বলিয়াছেন যে, অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন জীবের দ্রষ্টৃত্ব, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রভৃতিও যে অন্তঃকরণভেদে বিভিন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তবে, যেই অন্তঃরকণ-পরিচ্ছিন্ন জীবের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তীব্রতর হয়, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে অচলা শ্রদ্ধার উদয় হয়, শ্রবণ-মনন প্রভৃতি আয়ত্ত হয়, সেই ভাগ্যবান্ জিজ্ঞাসু জীবই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। যাঁহাদের অনুরূপ সাধনসম্পদ্ নাই, শ্রদ্ধার দৃঢ়তা নাই, তাঁহারাই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার কুহকে মজিয়া বন্ধনের জালা ভোগ করেন। এইরূপে বিচার করিলে এক-জীববাদেও বদ্ধ-মুক্ত-ব্যবস্থার অনুপপত্তি নাই। দেহভেদে জীবভেদ স্বীকার করারও কোন প্রয়োজন হয় না। এক কথায়, অনাদি অবিদ্যা-প্রভাবে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জীবভাব প্রাপ্ত হন, বিদ্যোদয়ে বিমুক্ত হন, স্বীয় সচ্চিদানন্দরূপে অবস্থান করেন, ইহাই একজীববাদের মর্ম।

একজীববাদে বদ্ধ-মুক্ত-ব্যবস্থার অনুপপত্তি অপরিহার্য বুঝিয়াই, অনেক-জীববাদী আচার্যগণ একজীববাদের পরিবর্তে অনেক-জীববাদ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, বদ্ধ-মুক্ত-ব্যবস্থা শাস্ত্রসিদ্ধ। ইহাকে অলীক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কেবল মানুষের কথা কি? দেবতাদিগের মধ্যেও যাঁহারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। যাঁহারা অমৃতের সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা বন্ধনের বেদনায় কাতর হইয়াছেন। শ্রুতিবাক্যে এবং স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞ জীবের মুক্তির এবং অজ্ঞ জীবের বন্ধনের কথা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। "যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম।" এইরূপ শ্রীভগবানের গীতার বাণী হইতেও জ্ঞানীর অমৃত ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির কথা নিঃসংশয়ে জানা যায়।

অনেক জীববাদ

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শরীরাৎ।

ব্রঃ সূঃ ৪।২।১২।

এই ব্রহ্মসূত্রে আপ্তকাম বা আত্মকাম ব্রহ্মদর্শীর 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি,' বৃহদাঃ, ৪।৪।৪৬, এইরূপে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির উপদেশ করিয়া এবং অজ্ঞানী সংসারীর উৎক্রান্তি, পরলোকগতি প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া, অদ্বৈত-বেদান্তের মূর্তবিগ্রহ আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে জীবের বন্ধন ও মুক্তি সমর্থন করিয়াছেন। এই অবস্থায় অধ্যাত্ম শাস্ত্র ও আচার্যের মর্যাদা

ধূলিসাৎ করিয়া বন্ধ-মুক্ত-ব্যবস্থাকে স্বপ্নের ব্যবহারের ন্যায় অলীক বলিয়া ব্যাখ্যা করা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা সুধী পাঠক বিচার করিবেন। এক-জীববাদের সমর্থক সর্বজ্ঞাত্ম মুনি, মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ অদ্বৈত-চিন্তা-নায়কগণও বন্ধ-মুক্তি-ব্যবস্থাকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিয়াই তাঁহারা তাঁহাদের অঙ্গীকৃত একজীববাদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং অজ্ঞাতসারে বহুজীববাদীর পথেরই অনুবর্তন করিয়াছেন। অন্তঃকরণই জীবের বিশেষ অভিব্যক্তিস্থান ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্বব্যাপী ব্রহ্মের অন্তঃকরণের দ্বারা পরিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী-বিধায়, অন্তঃকরণকে জীবের উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিয়া, অনেক-জীববাদ স্বীকার করিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। অন্তঃকরণ অবিদ্যারই পরিণাম ; সুতরাং অন্তঃকরণরূপ উপাধির মূলে যে অনাদি অজ্ঞান আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। জীবের পরস্পর ভেদ যখন প্রত্যক্ষগম্য, তখন সেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ জীবভেদ সমর্থনের জন্য এক অবিদ্যাকে জীবের উপাধি না বলিয়া, ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন অন্তঃকরণকে ভিন্ন ভিন্ন জীবের উপাধি বলাই শোভন এবং স্বাভাবিক। এই মতে শাস্ত্রসিদ্ধ বন্ধ-মুক্ত-ব্যবস্থার যুক্তি-সঙ্গত উপপাদন সম্ভবপর বিধায়, এইরূপ মতই গ্রহণ যোগ্য।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, অন্তঃকরণ যখন অবিদ্যারই পরিণাম এবং জীবভাব যখন অজ্ঞান কল্পিত, তখন অজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে, অজ্ঞানের সর্ববিধ পরিণামও অবশ্যই বিলীন হইয়া যাইবে। অজ্ঞান তিরোহিত হইলে জীবের অন্তঃকরণরূপ উপাধিও বিলুপ্ত হইতে বাধ্য। অজ্ঞান নিঃশেষে নিবৃত্তি না হইলে, মুক্তি ঘটে না। অজ্ঞান নানা নহে, এক। এই অবস্থায় একজীব মুক্ত হইলেই সকল জীবই মুক্ত হইতে পারে। ফলে, যেই বন্ধ-মুক্ত-ব্যবস্থার ভিত্তিতে এই মত সুগঠিত হইয়াছে, সেই বন্ধ-মুক্ত-ব্যবস্থাই এই মতে অচল হইয়া দাঁড়ায় নাকি ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অনেক জীববাদের সমর্থক পণ্ডিতেরা বলেন যে, অজ্ঞান এক হইলেও, অজ্ঞান নিরংশ নহে, অজ্ঞানেরও মাত্রা বা অংশ আছে। এই মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে অজ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধি সূচিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের অজ্ঞানের এইরূপ মাত্রা কল্পনার যুক্তি এই যে, শাস্ত্রে জীবন্মুক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অবশ্যই বৈষ্ণব-বেদান্ত-সম্প্রদায়, অদ্বৈতবেদান্তিগণের মধ্যেও মণ্ডন-মিশ্র প্রভৃতির সম্প্রদায় জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না। ইঁহারা বলেন যে,

বিদেহ মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি বটে। ভোগদেহই বিদেহ কৈবল্যের প্রতিবন্ধক। দেহ বিনষ্ট না হইলে, বিদেহ কৈবল্য লাভ হইতে পারে না। জ্ঞানীর যে অবস্থাকে জীবন্মুক্তি বলা হইয়া থাকে, তাহা বস্তুতঃ সিদ্ধাবস্থা নহে, উন্নততর সাধক জীবনের বর্ণনা। আচার্য শঙ্করের মতে জীবন্মুক্ত এবং বিদেহ মুক্তের মধ্যে জ্ঞানের কোন তারতম্য নাই। জ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই ষোল কলায়ই পূর্ণ। তবে, জীবন্মুক্তকে প্রারব্ধের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত এই শরীরে অবস্থান করিতে হয়, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিদেহ কৈবল্য লাভ হয় না। জীবন্মুক্তের দেহ এবং দৈহিক ক্রিয়া বিলুপ্ত হয় না, চলিতেই থাকে। দেহমাত্রেই এমন কি জীবন্মুক্তের দেহও অজ্ঞানকল্পিত। জীবন্মুক্তেরও ভোগদেহ থাকায় বুঝা যায় যে, অনাদিকাল সঞ্চিত অনন্ত অবিদ্যা সংস্কার তখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। ঐ অবিদ্যা-সংস্কার-চক্রের ঘূর্ণি বা অজ্ঞান-লেশ তখনও প্রারব্ধরূপে চলিতেছে এবং দেহ থাকা পর্যন্তই চলিবে। জীবন্মুক্তির ক্ষেত্রে অজ্ঞানের লেশ স্বীকার করিতে গেলেই, অজ্ঞানকে আর নিরংশ বা নিরবয়ব বলা চলে না। অজ্ঞানেরও মাত্রা স্বীকার করিতে হয়, এবং দাঁড়ায় এই যে, যেই নির্মল অন্তঃকরণে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান-রাকা উদিত হয়, সেই অন্তঃকরণেরই অজ্ঞানতমঃ বিধ্বস্ত হয় এবং ঐ অন্তঃকরণরূপ উপাধিকল্পিত জীব উপাধি শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া পরিপূর্ণ চিদানন্দে বিলীন হইয়া যায়। অজ্ঞানীর আবিল অন্তঃকরণে অবিদ্যা পূর্বের মতই বিরাজ করে। অজ্ঞানী জীব বন্ধন-জাল ছিন্ন করিতে পারে না, মুক্তির অমৃত-স্বাদও অনুভব করিতে পারে না। এইভাবে বন্ধ-মুক্ত ব্যবস্থার উপপাদন অনায়াসেই করা যাইতে পারে। কোন কোন সুধী মনে করেন যে, ন্যায়-মতে যে-স্থলে ঘট থাকে, সে-স্থলে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না। ঘটের সংযোগ না থাকিলেই সেক্ষেত্রে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে; অতএব ঘট-সংযোগের অভাবকেই ঘটের অত্যন্তাভাবের স্থিতির নিয়ামক বলা হয়। আলোচ্য স্থলেও মনঃই ব্রহ্ম-চৈতন্যে অজ্ঞানের বৃত্তির বা অবস্থিতির নিয়ামক বটে। মনঃ থাকিলেই অজ্ঞানের বৃত্তি থাকে, মনঃ না থাকিলে অজ্ঞানের বৃত্তি থাকে না, ইহা অতি সত্য কথা। যেই উপাধিতে বা অন্তঃকরণে ব্রহ্মবিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, সেই উপাধি বা মনঃ সেক্ষেত্রে বিনষ্ট হয়। ফলে, অজ্ঞানের বৃত্তিও সেখানে থাকে না। যেক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল মনঃ আছে, অজ্ঞানের বৃত্তিও

সেইস্থলে আছে। অজ্ঞান-সম্পর্কই বন্ধ এবং অজ্ঞান-সম্পর্কের বিলোপই মোক্ষ। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলেও, বন্ধ-মোক্ষের সঙ্গতি রক্ষা করা অসম্ভব হয় না। তারপর, যাঁহারা অজ্ঞানকে ব্রহ্মাশ্রিত না বলিয়া, জীবকে অজ্ঞানের আশ্রয়, ব্রহ্মকে অজ্ঞানের বিষয়—'জীবপদাব্রহ্মবিষয়া' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, সেই মণ্ডন, বাচস্পতি প্রভৃতির মতেও একই অজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মাতে বর্তমান থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন এক জীবাত্মার ব্রহ্মবোধ জাগ্রত হইলে, ঐ জীবাত্মার সহিত অজ্ঞানের সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়, সে মুক্ত হয়। অপরাপর জীবাত্মাতে অবিদ্যা পূর্বের ন্যায়ই বিরাজ করে, সেই অজ্ঞানী জীব মুক্ত হয় না, সে থাকে বন্ধ। এইরূপ সিদ্ধান্তেও বন্ধ-মুক্ত ব্যবস্থার কোন অনুপপত্তি ঘটে না। অজ্ঞান এক এবং সমস্ত জীবে উহা বিদ্যমান থাকিলেও, বন্ধ-মুক্ত ব্যবস্থা যে অচল হইয়া পড়ে না তাহা বুঝাইবার জন্য ন্যায়োক্ত-"ঘটত্ব জাতির" কথা দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঘটত্ব জাতি অনেক ঘটে যেমন থাকে, সেইরূপ উহা একটি ঘটেও থাকে। জাতি পদার্থ প্রত্যেক ব্যক্তিতেই বিদ্যমান থাকে। কোন একটি ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটত্বজাতির কিন্তু তাহাতে বিনাশ হয় না। কেবল যেই ঘটটি বিধ্বস্ত হয়, তাহার সহিত ঘটত্ব জাতির সম্পর্ক বিলুপ্ত হয় মাত্র অর্থাৎ ঘটত্ব জাতি সেই বিধ্বস্ত ঘটকে পরিত্যাগ করে। এক অনাদি অজ্ঞান-সম্পর্কেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। অজ্ঞান এক এবং তাহা নিখিল জীবে বিদ্যমান থাকিলেও, অজ্ঞান আলোচ্য ঘটত্ব প্রভৃতি জাতিপদার্থের ন্যায় প্রত্যেক জীবেই স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে। তন্মধ্যে কোন এক জীবের ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলে, সেই জীবের অবিদ্যা-সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়; এবং অজ্ঞান ঐ জীবকে চিরতরে পরিত্যাগ করে। অন্যান্য বন্ধ জীবের ক্ষেত্রে অজ্ঞান যথাপূর্বং পক্ষবিস্তার করিয়া বিরাজ করে। সুতরাং অজ্ঞান এক হইলেও বন্ধ-মুক্ত ব্যবস্থার কোনরূপ অসঙ্গতি হয় না। কোন কোন মনীষী মনে করেন যে, অজ্ঞান এক হইলেও, অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামে যে দুইটি শক্তি আছে, ঐ শক্তিদ্বয় জীবভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। যে-জীবের ব্রহ্মবোধ উদিত হয়, সেই জীবের সম্বন্ধেই অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি বিলুপ্ত হয়। অপরাপর বন্ধ জীবে ঐ শক্তিদ্বয় পূর্বের মতই বর্তমান থাকে; ফলে, বন্ধ-মুক্ত ব্যবস্থার কোন অনুপপত্তি ঘটে না। কেহ কেহ আবার নিঃসন্দেহে বন্ধ-মুক্ত ব্যবস্থার উপপাদন করার উদ্দেশ্যে

নিখিল জীবে একই অজ্ঞান স্বীকার না করিয়া, জীব-ভেদে অজ্ঞানের ভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। এই মতে যেই জীবের আত্মজ্যোতিঃ স্ফূর্তিলাভ করে, সেই জীবেরই অনাদি অজ্ঞান-তমঃ বিধ্বস্ত হয়। ব্রহ্ম-জ্ঞানবিমুখ সংসারাসক্ত জীব বদ্ধ থাকে, এইভাবে অনেক জীববাদী বেদান্তসম্প্রদায় বদ্ধ-মুক্ত-ব্যবস্থা উপপাদন করিবার যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিলে সুধী দেখিতে পাইবেন যে, নিখিল জীবে একই অজ্ঞান স্বীকার করিয়া, ইঁহারাও এক-জীববাদের মূলসূত্র অনুসরণ করিয়াছেন। 'একজীববাদ' বা 'দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ'ই[১] চরম অদ্বৈতবাদ। পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ দ্রষ্টা জীবেরই আবিদ্যক সৃষ্টি। এইরূপ সৃষ্টিতে জগতের মিথ্যাত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হওয়ায়, 'একজীববাদ'ই অদ্বৈতবেদান্তে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে।

জীব এক কি অনেক, এই প্রশ্নের মীমাংসা করা গেল। সম্প্রতি জীবের পরিমাণ আলোচনা করা যাইতেছে। জীবাত্মার পরিমাণ-সম্পর্কে পরস্পর বিরুদ্ধ নানা প্রকার মতের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণববেদান্তী রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জীবাত্মাকে পরমাণু-পরিমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তের মতে জীব ব্রহ্মই বটে, 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় ভূমা বা পরমমহৎ পরিমাণ। ব্রহ্মাভিন্ন জীবও সুতরাং অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তে যে বিভু বা ভূমা হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতি আচার্যগণের মতে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমই ভূমা, জীব অণু। অণুজীব ও ভূমা পুরুষোত্তম অভিন্ন নহে, বিভিন্ন।

জীবের পরিমাণ

জৈনপণ্ডিতগণ জীবাত্মাকে দেহ পরিমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে জৈনমতোক্ত আত্মার স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। আত্মা দেহ-পরিমাণ হইলে, দেহে সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন জীবাত্মার পরিমিত ঘটাদি পদার্থের ন্যায় বিলয় অবশ্যম্ভাবী। জৈনপণ্ডিতগণ জীবাত্মার বিনাশ (অনিত্যতা) স্বীকার করেন না। এইজন্যই জীবাত্মার শরীর-পরিমাণ

আত্মা দেহ পরিমাণ হইতে পারে না

১। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের মর্ম আমরা প্রথম খণ্ডে মণ্ডন ও বাচস্পতির দার্শনিকমতের পরিচয় প্রদানপ্রসঙ্গে এবং প্রকাশানন্দের মতের বিবরণে উল্লেখ করিয়াছি। সুধী পাঠক সেই আলোচনা দেখিবেন।

কল্পনা করা যায় না। জীবাত্মার জন্মান্তর নানা যোনিভ্রমণ প্রভৃতি জৈনগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতেও কর্মানুসারে জীব নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া, কর্মশেষ না হওয়া পর্যন্ত নানাবিধ দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। সকল দেহের পরিমাণ একরূপ নহে। দেহ-পরিমাণ জীবাত্মারও সুতরাং কোনরূপ স্থায়ী পরিমাণ নাই। যেই দেহ গ্রহণ করে, আত্মা সেইরূপ পরিমাণ প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য-জীব মনুষ্য-শরীর-পরিমাণ, হস্তী-জীব হস্তী-শরীর-পরিমাণ, পতঙ্গজীব পতঙ্গ-শরীর-পরিমাণ, এইরূপেই আত্মার পরিমাণ বুঝিতে হইবে। এখন কথা এই যে, মনুষ্য-জীব যদি কর্মবশে পতঙ্গ জন্মলাভ করিয়া পতঙ্গ শরীর গ্রহণ করে, কিংবা মানুষ যদি পরজন্মে হাতী হয়, তবে সেক্ষেত্রে মনুষ্য-শরীর-পরিমাণ আত্মা হাতীর বিশাল কায় ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না, পতঙ্গের ক্ষুদ্র দেহে মনুষ্য আত্মার সমাবেশও অসম্ভব হয়। পরজন্মের কথাই বা বলি কেন? বালকের শরীর-পরিমাণ আত্মা পরিপূর্ণাবয়ব যৌবন দেহ ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। ফলে, সমগ্র যুবদেহে চেতনার উপলব্ধি হইতে পারে না।[১] এই সকল দোষের সমাধান করিতে গিয়া জৈনগণ আত্মাকে প্রদীপের ন্যায় সংকোচ-বিকাশশীল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে প্রদীপ বিশাল গৃহ আলোকিত করে, সেই প্রদীপই ক্ষুদ্র গৃহে নিবদ্ধ হইলে ক্ষুদ্র গৃহটিকে উদ্‌ভাসিত করে, গৃহের বাহিরে সেক্ষেত্রেও আলো ছড়াইয়া পড়ে না। প্রদীপের ন্যায় সংকোচ-বিকাশশীল আত্মাও সেইরূপ যেই দেহ কারাগারে আবদ্ধ হয়, তাহার সবটুকুই আত্মার জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় করিয়া রাখে।[২] উল্লিখিত প্রদীপের দৃষ্টান্তও আত্মার সম্পর্কে প্রয়োগ করা চলে না। কেননা, ক্ষুদ্র গৃহে যে প্রদীপটি জ্বলিতেছে, তাহাকে খুব বড় একটা ঘরের মধ্যে রাখিয়া দিলে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্রগৃহ আলোকমালায় যে ভাবে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল, বড় ঘরটি ততখানি উজ্জ্বল হয় নাই, অল্প প্রকাশিত হইয়াছেমাত্র। বড় ঘরের আলোটি ক্ষুদ্র কোন ঘরে রাখিয়া দিলে, সেই আলোকের প্রভায় ক্ষুদ্র ঘরটি অধিকতর উজ্জ্বল হইবে। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে বৃহৎশরীরে জ্ঞানের

১। এবঞ্চাত্মাকার্ৎস্ন্যম্, ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৪ সূত্রের ভাষ্য-ভামতী দেখুন।

২। যথাহি প্রদীপো ঘটমহাহর্ম্যোদরবর্তী সংকোচবিকাসবানেবংজীবোঽপি পুত্তিকা-হস্তিদেহয়োঃ। ভামতী, ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৪।

অল্পতা এবং ক্ষুদ্রকায়ে জ্ঞানের আধিক্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রকায় শিশু অপেক্ষা পূর্ণাবয়ব যুবকের জ্ঞান যে সমধিক পরিস্ফুট, তাহাতে সন্দেহ আছে কি? উল্লিখিত দৃষ্টান্ত অনুসারে বিচার করিলে ক্ষুদ্রতম কীটপতঙ্গ প্রভৃতিকেই অত্যধিক জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এইজন্য আত্মা প্রদীপের ন্যায় সংকোচ-বিকাশশীল এইরূপ জৈনগণের সিদ্ধান্ত কোনমতেই গ্রহণ করা যায় না। উক্ত দোষের সমাধানের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে জীবাত্মার অবয়বের আগম এবং অপগমই স্বীকার করিতে হয়। জৈন-সিদ্ধান্তে জীবাত্মার অবয়বের অন্ত নাই। মনুষ্য-জীব হস্তী শরীর কিংবা অন্য কোন বৃহৎশরীর গ্রহণ করিলে, পূর্ব অবয়বের দ্বারা হস্তীর বিশাল শরীরে ব্যাপ্ত হইতে পারে না, এইজন্য সেখানে অভিনব কতকগুলি জীবাবয়ব আসিয়া মনুষ্যজীবের সহিত মিলিত হয়, এবং তাহারই ফলে মনুষ্যজীব হস্তীশরীর ব্যাপিয়া থাকে। মনুষ্য-জীব পতঙ্গশরীর গ্রহণ করিলে জীবের যে পরিমাণ অবয়বের পতঙ্গদেহে সমাবেশ হইতে পারে, সেই পরিমাণ অবয়বই পতঙ্গশরীরে থাকিয়া যায়, বাকী অবয়বগুলি চলিয়া যায়। এইরূপ জীবাবয়বের আগম এবং অপগমের কল্পনা নিতান্তই ভিত্তিহীন। ইহাতে জীব যে বিকারী এবং অনিত্য, এই প্রশ্নই আসিয়া দাঁড়ায়। জীবের অবয়বগুলি আসেই বা কোথা হইতে? যায়ই বা কোথায়? দেহের উপাদান ভূতবর্গ হইতে জীবাবয়বের প্রাদুর্ভাব হইবে, ভূতবর্গেই পুনরায় তাহা বিলীন হইবে, এইরূপও কল্পনা করা যায় না। কেননা, জীবাত্মা অভৌতিক পদার্থ, ভৌতিক বস্তু অভৌতিক আত্মার অবয়ব হইবে কিরূপে? কোন আধার বা আশ্রয়ে জীবাত্মার অবয়ব সকল সঞ্চিত থাকে, এবং প্রয়োজন অনুসারে সেই আধার হইতে জীবাত্মার অবয়বসমূহের উপগম এবং ঐ আধারেই সময়বিশেষে অবয়বের বিলয় হইয়া থাকে। এইরূপে জীবাবয়বের কোন আধার কল্পনারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তারপর, অগণিত জীবাবয়বের আগম এবং অপগম স্বীকার করিলে, শরীরের ন্যায় জীবাত্মার বিকার এবং বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জীবাত্মা বিনাশী হইলে, জীবাত্মার অভাবে জৈনদর্শনে মুক্তির উপদেশও অর্থহীন হইয়া পড়িবে। জীবের অসংখ্য অবয়বের কতগুলি আসিল, কতগুলি গেল, তাহার পরিমাণ অবধারণ করিবারও কোন উপায় নাই। ফলে, জীবের

স্বরূপের নিরূপণই এইমতে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। জীবের স্বরূপ নির্ধারিত না হইলে, আত্মজ্ঞান এবং মুক্তি হইবে কাহার? জীবাত্মার যদি অসংখ্য অবয়ব স্বীকার করা হয়, তবে প্রশ্ন আসে এই যে, চেতনা কি জীবের প্রত্যেক অবয়বের ধর্ম? না, অবয়ব-সমষ্টির ধর্ম? চেতনা প্রত্যেক অবয়বের ধর্ম হইলে, একই দেহে অগণিত স্বতন্ত্র চেতনের সমাবেশ মানিয়া লইতে হয়। বহু চেতনের ঐকমত্য দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে দেহের অশেষ দুর্গতি অনিবার্য। পক্ষান্তরে, চেতনাকে যদি অবয়বসমষ্টির ধর্ম বলা যায়, তবে মনুষ্যজীব অতিক্ষুদ্র পতঙ্গদেহ প্রাপ্ত হইলে, মনুষ্যজীবের চেতনা যেই সকল অবয়বসমষ্টির ধর্ম ছিল, পতঙ্গশরীরে সেই অবয়বসমষ্টি নাই, তাহার অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট আছে। এই অবস্থায় পতঙ্গশরীরে চেতনা জন্মিতে পারে না। অবয়বসমষ্টি প্রত্যেক শরীরভেদে যে বিভিন্ন হইবে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই অবস্থায়, কোনও জীব দেহান্তর পরিগ্রহ করিলে পূর্ব দেহের অবয়বসমষ্টি তো বর্তমান দেহে থাকিবে না, বর্তমান দেহের অবয়বসমষ্টি তো আর এক অবয়বসমষ্টি। সমষ্টিদ্বয় বিভিন্ন বলিয়া জীবকে এক্ষেত্রে বিভিন্ন বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। পরিমাণভেদে দ্রব্যের ভেদ হয়, ইহা অতি সত্য কথা। মনুষ্য, হস্তী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শরীরের পরিমাণ যে বিভিন্ন, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষগম্য। জীবাত্মা প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন হইলে, এক জীবাত্মা কর্ম করিবে, অপর জীবাত্মা তাহার ফলভোগ করিবে। কর্ম-ফলভোগের কোন নিয়ম থাকিবে না। সমস্তই ওলট-পালট হইয়া যাইবে। বিধি-নিষেধ প্রভৃতি শাস্ত্রবিধান অর্থহীন হইয়া পড়িবে। এইজন্য আলোচ্য মত গ্রহণ করা যায় না।

মুক্তি অবস্থায় জীবাত্মা যে বর্তমান থাকে, ইহা জৈন পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন। মোক্ষ অবস্থায় জীবাত্মার শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকে না। শরীরসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াই মুক্তিতে জীব স্বীয়রূপে অবস্থান করে। শরীরের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না বলিয়া, মোক্ষ অবস্থায় জীবাত্মার পরিমাণ শরীর সম্বন্ধজনিত নহে, উহা তাহার স্বাভাবিক পরিমাণ বলিয়াই অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। মুক্তিতে জীবাত্মা তাহার স্বাভাবিক পরিমাণ প্রাপ্ত হইলে, কোন কালেই স্বভাবের অন্যথা হইতে পারে না বলিয়া সংসার অবস্থাতেও জীবের স্বাভাবিক পরিমাণেরই অনুবৃত্তি নির্বিবাদে মানিয়া লইতে

হইবে। একই বস্তুর দুইপ্রকার পরিমাণ হইতে পারে না। সুতরাং জীবাত্মাকে দেহ-পরিমাণ বলিয়া কোনমতেই গ্রহণ করা চলে না। জৈন-পণ্ডিতগণ মোক্ষ অবস্থায় জীবাত্মার পরিমাণকে নিত্য পরিমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা নিত্য তাহার কোন কালেই ক্ষয়-ব্যয় বা বিনাশ হইতে পারে না। কালে বিনাশী হইলে তাহাকে আর নিত্য বলা চলে না। যাহা সব সময়ে সকল অবস্থাতেই সমানভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই নিত্য বলে। জীবাত্মার পরিমাণ মুক্তি অবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, জীবাত্মার সেই নিত্য পরিমাণই সংসার অবস্থাতেও বর্তমান থাকিবে, জীবাত্মার পরিমাণ সর্বদা একরূপ এবং অপরিবর্তনীয় হইবে। ফলে, জীবাত্মার শরীর-পরিমাণত্ব সিদ্ধান্ত জৈনগণের স্বীকৃতি অনুসারেই গ্রহণ করা চলিবে না।[১]

জীব অণুপরিমাণ, এই মত ও তাহার খণ্ডন

জীব যে দেহ-পরিমাণ, সসীম বা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না তাহা বুঝা গেল। এখন জীবকে যাঁহারা "অণু" বলিয়া থাকেন তাঁহাদের মত কতদূর যুক্তিসহ তাহা পরীক্ষা করা যাইতেছে। জীবাণুত্ববাদী রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতি বৈষ্ণববেদান্তীরা বলেন, উপনিষদ্ অতি স্পষ্ট ভাষায় জীবকে অণু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ। মুণ্ডক ৩।১।৯
বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ো স চানন্ত্যায় কল্পতে। শ্বেতাশ্বতর, ৫।৯

যাহাতে পঞ্চপ্রাণ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ঐ অণু আত্মাকে মনের সাহায্যে জানা যায়। কেশের আগাটুকুকে শত ভাগ করিয়া, তাহার এক এক ভাগকে পুনরায় শত ভাগ করিলে, সেই ভাগ যেমন অণু বা অতিশয় সূক্ষ্ম হয়, অণুজীবও সেইরূপ অতি সূক্ষ্মতম বলিয়া জানিবে। সেই জীবই অনন্তের অধিকারী হইয়া থাকে। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জীব যে অণু-পরিমাণ তাহা নিঃসন্দেহে জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতিতে জীবের দেহ হইতে নির্গমন

১। ন পর্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ। ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৫।

এবং

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ। ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৬ সূত্রের ভাষ্য-ভামতী দ্রষ্টব্য।

(উৎক্রান্তি) পরলোকগমন এবং ইহলোকে আগমনের কথা (গতি ও আগতি) অতি বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিজ্ঞানাত্মা জীব হৃদয়পথে অথবা চক্ষু, শির বা অন্য কোনও শরীরাবয়বের সাহায্যে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়—

"তেন প্রদ্যোতেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষো বা মূর্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ"। বৃহদাঃ, ৬।৪।২

জীবশূন্য দেহ তখন সাপের খোলসের মত উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকে। কর্মী জীব এই লোক হইতে চন্দ্রলোক প্রভৃতি লোকান্তরে গমন করে এবং লোকান্তরে গমনোপযোগী কর্ম শেষ হইলে, কর্ম করিবার জন্য পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসে।

"যে বৈ কে চাস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি"। কৌষীতকী, ১।২, 'তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকায় কর্মণে'।

বৃহদাঃ, ৬।৪।৬,

এইরূপে উপনিষদে জীবের দেহ হইতে নির্গমন, পরলোকগমন এবং ইহলোকে আগমন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। জীবাত্মা আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী ভূমা হইলে বিভু জীবাত্মা সম্পর্কে ঐ সকল উক্তি কি নিতান্ত অর্থহীন, অসার হইয়া পড়ে না? যাহা বিশ্বব্যাপী এবং সর্বদেশে সর্বকালে বিরাজমান আছে এবং থাকিবে, তাহার আবার গমনাগমন হইবে কি! যেই দেশে যে পূর্বে ছিল না, সে সেই দেশে আসিলে, তবেই তাঁহার সেই দেশে গতি হইল বলা যাইতে পারে। যিনি বিশ্বময় ভূমা তাহার আবার স্থানত্যাগই বা কি? গন্তব্য স্থানই বা কোথায়? পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ বস্তুরই গতি, আগতি হইয়া থাকে। বিভু পদার্থের গতি হইতে পারে না। জীবাত্মার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্তি, পরলোক ও ইহলোকে গমনাগমন, উপনিষদে পুনঃ পুনঃ স্পষ্ট কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা হইতে জীবাত্মা যে বিভু হইতে পারে না তাহাই বুঝা যায়। জীবাত্মা যে মধ্যম পরিমাণ অর্থাৎ দেহপরিমাণ হইতে পারে না, তাহা ইতঃপূর্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং জীবাত্মা যে অণু-পরিমাণ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? উল্লিখিত যুক্তিবলে জীবের অণুত্বসিদ্ধান্ত নিম্নোক্ত অনুমানের সাহায্যেও সমর্থন করা যায়।

"যাহার গতি আছে অথচ যে মধ্যম পরিমাণ নহে, তাহা অবশ্যই অণু-

পরিমাণ হইবে (ব্যাপ্তি), পরমাণুর গতি আছে অথচ পরমাণু মধ্যমপরিমাণ নহে ; অতএব পরমাণু অণুপরিমাণ (দৃষ্টান্ত)। জীবাত্মারও গতি আছে অথচ জীবাত্মা পরিচ্ছিন্ন বা মধ্যম পরিমাণ নহে (হেতু)। অতএব জীবাত্মা ও পরমাণুর ন্যায় অণুপরিমাণ" (সাধ্য)। অতোঽণুরেবায়মাত্মা।[১] শ্রীভাষ্য, ২।৩।২৩।

জীবাত্মা অণুপরিমাণ হইলে অণু জীবাত্মা শরীরের সর্বাঙ্গ জুড়িয়া থাকিতে পারিবে না, কোনও একস্থানেই থাকিবে। চেতনা জীবাত্মার গুণ বা ধর্ম। ধর্ম বা গুণ কখনও ধর্মী (গুণীকে) ছাড়িয়া থাকে না, থাকিতে পারে না। সর্বশরীরেই চেতনার উপলব্ধি হইতে দেখা যায়, নিদাঘে সর্বাঙ্গে সন্তাপের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুশীতল সলিলে অবগাহন করিলে সর্বশরীরে শীতলতার অনুভূতি জন্মে। অণু-জীব শরীরের কোনও একস্থানে থাকিবে, অথচ তাহার গুণ চেতনার উপলব্ধি সর্বশরীরব্যাপী হইবে, ইহা তো নিতান্তই অসম্ভব কথা। জীবাত্মার গুণ বা ধর্মের উপলব্ধি সর্বশরীরব্যাপী হওয়ায়, জীবাত্মাও যে সর্বশরীরব্যাপী হইবে, তাহা কোনমতেই স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। জীবাত্মা যে মধ্যম-পরিমাণ বা দেহ-পরিমাণ হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে। যাহা মধ্যম-পরিমাণ বা শরীর-পরিমাণ নহে, অথচ সর্বশরীরব্যাপী, তাহা অবশ্যই "বিভু" হইবে, জীবাত্মাও সুতরাং অণু নহে, বিভু। জীবাত্মার অণুত্বের অনুমান, বিভুত্ব-অনুমান বাধিত বলিয়া অপ্রমাণ। শ্রুতি কোথায়ও আত্মাকে যেমন "অণু" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কোথায়ও "স বা এষ মহানজ আত্মা"। বৃহদাঃ ৩।৪।২০। এইরূপে বিভু বা ভূমা বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ শ্রুতিবলে মহাকাশের দৃষ্টান্তে আত্মার বিভুত্বের অনুমান অনায়াসেই করা যাইতে পারে। আত্মার পরিমাণ-সম্পর্কে শ্রুতির পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি হইতে আত্মার পরিমাণ দুর্জ্ঞেয়, ইহাই বুঝা যায়। জীবাণুত্ববাদিগণ

১। উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্। ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৮,
পরমাণুরেবায়ং জীবো ন বিভুঃ। কুতঃ উৎক্রান্ত্যাদিভ্য!…ন চ সর্বগতস্য তস্য তাঃ সম্ভবেয়ুঃ। ব্রঃ সূঃ গোবিন্দভাষ্য, ২।৩।১৮।
জীবো ন ব্যাপকঃ, উৎক্রান্তিমত্ত্বাৎ, গতিমত্ত্বাৎ, ক্রিয়াবত্ত্বাৎ, খগশরীরবৎ; অদ্বৈতসিদ্ধি, পূর্বপক্ষগ্রন্থ, ৮৫১ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং।

জীবাত্মাকে অণু এবং বিশ্বাত্মা পুরুষোত্তমকে পরমমহান্ বা ভূমা বলিয়া গ্রহণ করিয়া শ্রুতির তাৎপর্য ব্যাখ্যার যে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহাও "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাক্যে জীব ও ব্রহ্মকে স্পষ্টতঃ অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করায়, নির্বিবাদে মানিয়া লওয়া চলে না।

তারপর, সর্বশরীরের চেতনার সঞ্চার ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে জীবাণুত্ববাদী চন্দনবিন্দু প্রদীপ-প্রভা প্রভৃতি যে সকল দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার কোনটিকেই প্রকৃত দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। চন্দনবিন্দু শরীরের এক অংশে থাকিয়াও যেমন সর্বাঙ্গে পরিতৃপ্তি বা আনন্দের সঞ্চার করে, জীব-বিন্দুও সেইরূপ শরীরের একাংশে, হৃদয়পুণ্ডরীকে থাকিয়াই সমস্তদেহে চেতনার সঞ্চার করিবে।[১] এইরূপ উত্তরের প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, চন্দর বিন্দুর দেহের একাংশে অবস্থিতি এবং সমগ্র দেহে তৃপ্তিজনকতা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট বিষয়ে বিবাদ করা চলে না। আত্মার অণুত্ব এবং চন্দন বিন্দুর ন্যায় দেহের একাংশে অবস্থিতি প্রত্যক্ষগম্য নহে। তাহা সন্দিগ্ধ এবং বিবাদাস্পদ, (নির্বিবাদ নহে), সর্বশরীরব্যাপিনী চেতনা সকলেরই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। সর্বশরীরে আত্মগুণ চেতনা থাকিলে আত্মাও সর্ব-শরীরব্যাপী হইতে বাধ্য। কেননা, গুণমাত্রই কখনই গুণীকে অর্থাৎ সেই গুণের আধার বা আশ্রয়কে পরিত্যাগ করিয়া থাকে না, থাকিতে পারে না। ইহাই গুণের স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। ঘট ছাড়িয়া ঘটের রূপ থাকে কি?[২] আত্মার সম্পর্কে সেই নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, দেহের একাংশে অবস্থিত অণু-আত্মার গুণ চৈতন্য কখনই আত্মাকে ছাড়িয়া দেহে সর্বাঙ্গীণ অনুভূতি সম্পাদন করিতে পারে না; এবং তাহা পারে না বলিয়াই জীবাত্মাকে "অণু" বলা চলে না। "বিভু" বলিয়াই

১। অবিরোধশ্চন্দনবৎ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৩।
যথা হরিচন্দনবিন্দুর্দেহৈকদেশবর্ত্যপি সকলদেহব্যাপিনমাহ্লাদং জয়তি, তদ্বদাত্মাপি দেহৈকদেশবর্তী সকলদেশবর্তিনীং বেদনামনুভবতি। শ্রীভাষ্য, ২।৩।২৩।
অণুরপি জীবস্য সর্বশরীর ব্যাপ্তির্যুজ্যতে, যথা হরিচন্দন-বিপ্রুষ একদেশপতিতায়াঃ সর্বশরীরব্যাপ্তিঃ। ব্রঃ সূঃ মাধ্বভাষ্য, ২।৩।২৩।

২। ন চ গুণিনঃ অণুত্বেঽপি গুণব্যাপ্ত্যা ব্যাপি সুখজ্ঞানানুমান-বিরোধঃ, গুণি-ব্যতিরেকেণান্যাসম্ভাবিতত্বাদন্যথা ঘটব্যতিরেকেণাপি ঘটরূপং স্যাৎ।
অদ্বৈতসিদ্ধি, ৮৫৩ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং।

গ্রহণ করিতে হয়। বিভুত্বই আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম, অসীম আত্মার সসীমভাব উপাধিকৃত এবং আগন্তুক।

ভাল কথা, গুণ যদি গুণীকে ছাড়িয়া নাই থাকে, তবে চন্দনের সৌরভ চন্দন-বিন্দুকে ছাড়িয়া সর্বশরীর জুড়িয়া থাকে কিরূপে? গৃহের কোণে অবস্থিত ভাস্বর মণির বা প্রদীপের প্রভা মণি, প্রদীপকে ছাড়িয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়িয়া সমগ্র ঘরটিকে আলোকমালায় উদ্‌ভাসিত করে কিরূপে? পুষ্পসৌরভ পুষ্পকে ছাড়িয়া পুষ্পোদ্যানের পার্শ্বচর ব্যক্তির ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গোচরে আসে কেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে জীবের বিভুত্ববাদী বলেন যে, চন্দনবিন্দু সাবয়ব পদার্থ, আত্মার ন্যায় নিরবয়ব পদার্থ নহে। সাবয়ব বস্তু হইতে তাহার অবয়বের বিচ্ছুরণ হইয়া থাকে ইহা বিজ্ঞানলব্ধ সত্য। সাবয়ব চন্দনবিন্দু উহার ক্ষুদ্রতম অবয়ব বিকীর্ণ করিয়া সর্বদেহে আমোদের সঞ্চার করিবে, ইহাতে আপত্তি কি? নিরবয়ব আত্মার পক্ষে চিৎকণা বিকীর্ণ করা সম্পূর্ণই অসম্ভব। সুতরাং অণু জীবাত্মার সর্বাঙ্গীণ চেতনার ব্যাখ্যায় চন্দনবিন্দুর দৃষ্টান্ত যে অচল তাহা সুধী অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। মণি এবং প্রদীপের দৃষ্টান্তকেও জীবাণুত্ববাদীর অনুকূল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, আত্মচেতনা যেমন গুণ পদার্থ, প্রভা কিন্তু সেইরূপ গুণ পদার্থ নহে। প্রভা দ্রব্য পদার্থ। প্রদীপ এবং প্রভা বস্তুতঃ একই তৈজস পদার্থ। ঘনীভূত বা পিণ্ডীভূত তৈজস কণা সমষ্টিকে প্রদীপ, আর, বিশ্লিষ্ট তৈজসকণার রশ্মিরাজিকে প্রভা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।[১] উভয় ক্ষেত্রেই আলোকমালা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তৈজসকণাকে আশ্রয় করিয়াই বর্তমান থাকে, নিরাশ্রয়ে স্বতন্ত্রভাবে থাকে না, থাকিতে পারে না। বিশ্লিষ্ট তৈজসকণাগুলি সমগ্র গৃহে ছড়াইয়া পড়িয়া রশ্মিদ্বারা গৃহখানিকে আলোকিত করিবে, ইহাতো খুবই স্বাভাবিক। আত্মা-চেতনা প্রদীপপ্রভার ন্যায় দ্রব্য হইলে, প্রদীপপ্রভার দৃষ্টান্তকে প্রকৃত দৃষ্টান্তের মর্যাদা দেওয়া চলিত। চেতনা দ্রব্য নহে, গুণ পদার্থ। এইরূপ আত্মাশ্রিত চৈতন্যগুণের দেহব্যাপী সঞ্চারে প্রদীপ-প্রভা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্তাভাস বা মিথ্যা দৃষ্টান্তই হইয়া দাঁড়ায়।

প্রভা দ্রব্য পদার্থ হইলেও গন্ধ তো গুণপদার্থই বটে। ফুল্লকুসুমিত

১। নিবিড়াবয়বং হি তেজো দ্রব্যং প্রদীপঃ, প্রবিরলাবয়বন্তু তেজোদ্রব্যমেব প্রভেতি। ব্রঃ সূঃ শংভাষ্য, ২।৩।২৫।

কাননচারী প্রসূন-সৌরভ কাহার না ঘ্রাণের গোচর হয়? লতা-গাত্রে বিকশিত কুসুমরাজির সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নাই; তাহাদের গন্ধের সহিতই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক। পুষ্পের সৌরভ পুষ্পকে ছাড়িয়া বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করে এবং আঘ্রাণকারী ব্যক্তির ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার গন্ধপ্রত্যক্ষ জন্মায়। ইহা হইতে ক্ষেত্রবিশেষে গুণীকে ছাড়িয়াও যে গুণ থাকিতে পারে (গুণিব্যতিরেকেও গুণের বৃত্তি থাকে) তাহা অস্বীকার করা চলেনা। উক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারে আত্ম-গুণ চেতনাও গুণী আত্মাকে ছাড়িয়া দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত হইতে পারে এবং জীবাত্মা অণুপরিমাণ, এই সিদ্ধান্ত দৃষ্টান্ত-বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, গুণীই গুণের আশ্রয়, গুণীর আশ্রয়ে না থাকিলে সেক্ষেত্রে গুণের গুণত্বই থাকে না। গন্ধও রূপ, রস প্রভৃতির ন্যায় গুণই বটে। কুসুমের রূপ যেমন কুসুমকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, ফলের মধুর রস যেমন কদাচ ফলছাড়া হয় না, পুষ্পের সৌরভও সেইরূপ গন্ধের আধার বিকশিত কুসুমকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। রূপ-রস প্রভৃতির ন্যায় গন্ধেরও আশ্রয় বিচ্যুতি অসম্ভব। তবে দূরেও গন্ধের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহা সত্য কথা। এই গন্ধ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে, কুসুমরাজির যে-সকল অতিশয় সূক্ষ্মকণাকে আশ্রয় করিয়া গন্ধ বিরাজ করে, সেই সকল পুষ্পরেণুই বায়ুবেগে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া কুসুমিত উদ্যানের চারিপাশে গন্ধ বিকিরণ করিতে থাকে। বিক্ষিপ্ত পুষ্পরেণু যখন আঘ্রাণকারীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে, তখনই তাহার গন্ধবোধ উদিত হয়। অতিশয় সূক্ষ্মতা নিবন্ধন গন্ধের আধার ঐ সকল কুসুমরেণু প্রত্যক্ষের গোচরে আসে না, কেবল গন্ধই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও নিরাশ্রয় বা আশ্রয় বিচ্যুত গন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না, স্বীয় আশ্রয়ে পুষ্পকণায় অবস্থিত গন্ধ-গুণেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।[১] এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি সমস্তই সাবয়ব বস্তু। সাবয়ব বস্তুর অবয়ব বিচ্ছুরণের ফলে আশ্রয়কে ছাড়িয়া অন্যত্রও গুণের বৃত্তি সম্ভবপর হইলেও, উল্লিখিত দৃষ্টান্তে নিরবয়ব অণু আত্মার গুণ চেতনার সর্বদেহব্যাপী সঞ্চার কোন মতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। আত্মাকে সুতরাং অণু-পরমাণুও বলা চলে না।

১। ব্যতিরেকো গন্ধবৎ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৬, এবং এই সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

জীবাণুত্ববাদীরা বলিতে পারেন যে, ত্বগিন্দ্রিয়ই চন্দন বিন্দুর স্পর্শোপলব্ধির হেতু। চন্দন বিন্দুর সহিত এবং আত্মার সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটিলে তবেই স্পর্শোপলব্ধি জন্মে। ত্বগিন্দ্রিয় সর্বশরীরব্যাপী। সর্বশরীরব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ বশতঃ সমগ্রশরীরে যেমন চন্দনের সুখস্পর্শের উদয় হয়, সেইরূপ আত্মা অণু-পরিমাণ হইলেও, ত্বক্-সম্বন্ধ-নিবন্ধন আত্মার সমগ্রশরীরে উপলব্ধি হইতে বাধা কি? আত্মার সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগ সমগ্রশরীর ব্যাপিয়াই থাকে, আত্ম-সংযুক্ত ত্বগিন্দ্রিয়ও সুতরাং সমস্ত শরীরেই ব্যাপিয়া থাকিবে। এই অবস্থায় সর্বশরীরে আত্মোপলব্ধি হইতে আপত্তি কি? ইহার উত্তরে জীববিভুত্ববাদী বলেন যে, অণুত্ববাদীর উল্লিখিত কল্পনাও নিতান্তই ভিত্তিহীন। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তুর সংযোগ ঘটিলে ঐরূপ সংযোগের ফলে ক্ষুদ্রবস্তু কস্মিন্ কালেও বৃহদ্বস্তু ব্যাপিয়া থাকে না, বৃহদ্বস্তুর এক অংশেই থাকে। পায়ের তলায় কাঁটা বিঁধিলে, ঐরূপ কণ্টক-সংযোগের ফলে পায়ের তলায়ই বেদনার অনুভব হয়, সমগ্র শরীরে বেদনা অনুভূত হয় না। কারণ, কণ্টক অতিশয় ক্ষুদ্রবস্তু। দেহ কণ্টকের তুলনায় অনেক বৃহদাকার। কণ্টক-সংযোগ পদতলে অর্থাৎ দেহের একাংশে অবস্থিত থাকে বলিয়া, পদতলেই বেদনার অনুভূতি জন্মে।[১] ইহা হইতে ক্ষুদ্র এবং বৃহদ্বস্তুর সংযোগ যে বৃহদ্বস্তুব্যাপী হয় না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই অবস্থায় অণু জীবাত্মার সর্বশরীরব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ নিবন্ধনও সর্বশরীর-ব্যাপী উপলব্ধি সমর্থন করা যায় না। সকলেরই সর্বশরীরেই চেতনার উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইতে আত্মা যে অণু নহে, বিভু এই সিদ্ধান্তই আসিয়া পড়ে। আত্মা অণু হইলে, একই সময়ে পায়ে সুখ, মাথায় বেদনার অনুভব হইতে পারে না;[২] সর্বদেহব্যাপী শৈত্যের বা নিদাঘ-তাপের উপলব্ধি উপপাদন সম্ভবপর হয় না। অতএব আত্মার অণুত্বসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

১। ন চ অণোর্জীবস্য সকল শরীরগতা বেদনা উপপদ্যতে। ত্বক্সম্বন্ধাৎ স্যাদিতি চেন্ন, কণ্টক তোদনেঽপি সকলশরীরগতৈব বেদনা প্রসজ্যেত।

ব্রঃ সূঃ শংভাষ্য, ২।৩।২৯।

২। একস্যাণোরেকদা ব্যবহিত দেশদ্বয়াবচ্ছেদাসম্ভবেন "পাদে মে সুখং শিরসি বেদনা" ইত্যাদি যুগপদনুভব বিরোধশ্চ।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৮৫৩ পৃষ্ঠা, নির্ণয় সাগর সং।

যায় না। তারপর, অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ যেমন অগ্নি হইতে ভিন্ন কিছু নহে, অগ্নিরই স্বরূপ, সবিতার প্রকাশ সবিতারই স্বরূপ, আত্ম-চেতনাও সেইরূপ আত্মারই স্বরূপ। আত্মাই চেতনা, চেতনাই আত্মা। এই অবস্থায় সমগ্রশরীরে চেতনার উপলব্ধি হইলে, আত্মাই যে সমগ্রশরীর ব্যাপিয়া আছে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। জীবাণুত্ববাদ কোন প্রকারেই সমর্থন করা যায় না।

কোন কোন উপনিষদ্ জীবাত্মাকে অণুপরিমাণ বলিয়া নির্দেশ করিলেও, উপনিষদেই স্থানান্তরে প্রাণবর্গের অধিষ্ঠাতা আত্মাকে মহান্, অজ (জন্মরহিত) এবং আকাশের ন্যায় বিভু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কোনও ক্ষেত্রে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ বা আত্মা প্রাণিগণের হৃদয়াভ্যন্তরে সন্নিবিষ্ট আছেন। যমরাজ সত্যবানের শরীর হইতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ বা আত্মাকে বলপূর্বক টানিয়া বাহির করিয়া লইয়াছিলেন, এইরূপে জীবাত্মাকে অঙ্গুলিপ্রমাণ বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। কোথায়ও বা একই শ্রুতিতে একই নিঃশ্বাসে জীবকে অণু এবং বিভু এই পরস্পরবিরুদ্ধরূপেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আত্মা অণু হইতেও অণু, মহৎ হইতেও মহত্তর, আত্মার পরিমাণ সম্পর্কে এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ ভাষণও উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়।[১] সুতরাং আত্মার পরিমাণ যে বস্তুতঃ কি, সেই সম্বন্ধে সংশয়ের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঐ সকল পরস্পরবিরোধী শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জস্য করতঃ ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান্ বেদব্যাস এবং শারীরক-মীমাংসাভাষ্য-প্রণেতা আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ত্রয়োদশ অধিকরণে (১৯-২৮ সূত্রে) জীবাণুত্ববাদীর এবং পরিচ্ছিন্ন জীববাদীর বক্তব্য সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

"তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্‌ব্যপদেশঃপ্রাজ্ঞবৎ"। ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৯,

১। এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। শ্বেতাশ্ব, ৩।১৩
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ। মহাভারত, সাবিত্রী উপাখ্যান।
সবা এব মহানজ আত্মা, বৃহদাঃ ৪।৪।২২,
আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ। সর্বোপনিষৎ, ৪,
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মম্। মুণ্ডক, ১।১।৬,
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। কঠ, ২।২০

এই সূত্রে এবং ইহার পরবর্তী কয়েক সূত্রে আত্মা যে অণু বা পরিচ্ছিন্ন নহে, আত্মা বিভু এবং নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, জীবাত্মায় এবং পরমাত্মায় কোনরূপ ভেদ নাই, ভেদ কল্পিত ও মিথ্যা, যেই জীব সেই শিব, এইরূপ সিদ্ধান্তই তাঁহারা সমর্থন করিয়াছেন। সূত্রকার ও ভাষ্যকার শঙ্করের মূল বক্তব্য এই যে, জীবাত্মার অণু-পরিমাণ সমর্থনের জন্য জীবাণুত্ববাদিগণ যে সকল যুক্তি বা প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই সকল যুক্তি-প্রমাণ আত্মার অণু-পরিমাণ সমর্থন করে না। পরমাত্মা পরব্রহ্মই যে বুদ্ধিরূপ উপাধিযোগে জীবভাব প্রাপ্ত হন, সংসারী সাজিয়া সংসারের নাট্যমঞ্চে সুখ-দুঃখ, শোক-মোহের অভিনয় করেন, এই সত্যই প্রকাশ করে। পরমাত্মা পরমপুরুষ যে মহান্, ভূমা সে-বিষয়ে জীবাণুত্ববাদীরও মতানৈক্য নাই। কেবল জীবাত্মার পরিমাণ লইয়াই অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী এবং বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী প্রভৃতি আচার্যগণের মতভেদ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই। অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্তে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনরূপ ভেদ নাই। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ অজ্ঞানকল্পিত এবং মিথ্যা। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান এবং অজ্ঞান-কল্পিত ভেদ তিরোহিত হইলে, জীবের পরিমাণ সম্পর্কেও কোনরূপ বিবাদ থাকিবে না। পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও বিভু এবং ভূমাই হইবে। জীবাত্মা বস্তুতঃপক্ষে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন এবং বিভু হইলেও, জীবাত্মা বুদ্ধিরূপ উপাধির অধীন। বুদ্ধিই পরমাত্মায় কল্পিত জীবভাবের সৃষ্টি করে এবং বুদ্ধির সাহায্যেই জীবাত্মা স্বকৃত পাপ-পুণ্যের কুফল সুফল ভোগ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বুদ্ধিগত সুখ-দুঃখ, কাম, সংকল্প প্রভৃতি গুণরাজিই জীবাত্মার ভোগরাজ্যের মুখ্য অবলম্বন। বুদ্ধি-উপাধি বাদ দিলে যেমন জীবের জীবত্ব থাকে না, সেইরূপ বুদ্ধির কামনা, সংকল্প প্রভৃতি গুণরাজি বাদ দিলেও জীবের বিষয়-ভোগ সম্ভবপর হয় না। বুদ্ধি অতিশয় সূক্ষ্ম অণু-পরিমাণ, সেই বুদ্ধি-উপাধিবশতঃ জীবকে শ্রুতিতে 'অণু' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"বুদ্ধেগুর্ণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রোহ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ"॥ শ্বেতাশ্বতর, ৫।৮

অধ্যাসবশে বুদ্ধির গুণ অণুত্ব আত্মায় আরোপিত হইয়া, অণুত্বই আত্মগুণ হইয়া দাঁড়ায়। বুদ্ধিকল্পিত গুণের দ্বারা আত্মা স্বতঃ বিভু হইলেও,

আরাগ্রপ্রমাণ (অর্থাৎ 'আরা' নামক সূচের স্থায় একজাতীয় লৌহময় অস্ত্রের আগার মত অতিশয় সূক্ষ্ম) বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

"স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু"। বৃহদাঃ, ৪।৪।২২। এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে প্রাণবর্গের অধিষ্ঠাতা জীবকে অতি স্পষ্ট ভাষায় বিভু বলা হইয়াছে। ইহা হইতে জীবের অণুত্ব যে উপাধিকল্পিত এবং মিথ্যা, এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। উপনিষদে জীব-হৃদয়কে ব্রহ্মের "গুহা" এবং জীব-দেহকে "ব্রহ্মপুর" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, ঐ ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ জীব-দেহে একটি অতিসূক্ষ্মকায় পদ্ম আছে, সেই পদ্মটি একটি গৃহস্থানীয়। ঐ গৃহের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহাকে "দহরাকাশ" বলে[1], সেই আকাশের অভ্যন্তরে যিনি বিরাজ করেন তিনিই আত্মা। ঐ দহরাকাশকে শাস্ত্রে ব্রহ্মকোষ বলা হইয়াছে। ঐ ব্রহ্মকোষই জীবের উপাধি এবং পরব্রহ্মের জীবভাবের মূল—

কোষোপাধি বিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্।

পঞ্চদশী ৩।৪১

এই ব্রহ্মকোষ অতিশয় সূক্ষ্ম, অণুতুল্য। অণুপম ঐ কোষ জীবের উপাধি বলিয়াই, জীবকে অণু বলা হইয়া থাকে। নতুবা যিনি স্বভাবতঃ আকাশের স্থায় বিভু, তিনি অণু হইবেন কিরূপে? জীবের উপাধি অণু, এইজন্যই জীবকে অণু বলা হয়। জীবকে কোথায়ও অণু হইতেও অণুতর, মহৎ হইতেও মহত্তর বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। জীব সম্পর্কে এইরূপ পরস্পরবিরোধী বর্ণনার তাৎপর্য এই যে, জীব বস্তুতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নহে; 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। জীবের নিজের কোন পরিমাণ নাই। উপাধির পরিমাণ জীবে আরোপিত হইয়া থাকে, এইজন্য উপাধির পরিমাণ বশতঃ জীবকে অণু, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, বৃহত্তর, মহত্তর প্রভৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। আত্মা সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী আত্মা অণু পদার্থেও আছে, মহত্তর পদার্থেও আছে, আবার সর্ববিধ পদার্থ সম্পর্কের অতীত হইয়াও বিরাজ করিতেছে। জীবের উৎক্রান্তি (বা দেহত্যাগ) প্রভৃতিও যে স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক তাহা শ্রুতিই স্পষ্টতঃ নির্দেশ করিয়াছেন "কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব? কে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি

১। ব্রহ্ম সূত্রোক্ত (ব্রঃ সূঃ ১।৩।১৪) দহরাধিকরণের আলোচনা দেখুন

প্রতিষ্ঠিত থাকিব" ? এই আলোচনা করিয়া ব্রহ্ম প্রাণের সৃষ্টি করিলেন।[১] আত্মার বাস্তবিক উৎক্রান্তি, গমনাগমন প্রভৃতি না থাকিলেও, প্রাণোপাধিকশতঃই জীবাত্মার উৎক্রান্তি প্রভৃতি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। জীবের উৎক্রান্তি বাস্তব নহে, ঔপাধিক। উৎক্রান্তি ঔপাধিক হইলে, জীবের গতি, আগতিও যে ঔপাধিক হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ?[২]

ন্যায়-বৈশেষিক পণ্ডিতগণও জীবাত্মাকে বিভু বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ন্যায়গুরু উদয়নাচার্য তাঁহার বৈশেষিক দর্শনের প্রসিদ্ধ টীকা "কিরণাবলী"তে আত্মার বিভুত্ব উপপাদন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, আত্মা বিভু, কারণ আত্মার কোনরূপ মূর্তি নাই, আত্মা অমূর্ত। মূর্ত হইলে আত্মা যদি পরমাণু-পরিমাণ হয়, তবে পরমাণু যেমন অপ্রত্যক্ষ পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্মতম আত্মা এবং ঐ আত্মার ধর্ম জ্ঞান প্রভৃতিও ন্যায়-বৈশেষিকের মতে অপ্রত্যক্ষই হইবে। আত্মা যদি অবয়বী হয়, তবে তাহার উৎপত্তি এবং বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। উৎপত্তির প্রতি আত্মার সংসারানুরক্তিই কারণ বলিতে হইবে। আত্মা যদি পরিচ্ছিন্ন হয় এবং ঘটাদি বস্তুর ন্যায় পূর্বে না থাকিয়া উৎপন্ন হয় (অভিনব আত্মা জন্মলাভ করে), তবে, রাগ বা আসক্তি বিহীন হইয়াই আত্মা উৎপন্ন হইবে। আত্মার এইরূপ উৎপত্তি ও মুক্তি সম্ভবপর নহে। কেননা, বীতরাগের অর্থাৎ সর্ববিষয়ে অভিলাষশূন্য কোন প্রাণীরই জন্ম হইতে দেখা যায় না—'বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ'। ন্যায়সূত্র, ৩।১।২৪। বীতরাগের জন্ম স্বীকার করিলে আসক্তি রহিত মুক্ত পুরুষেরই বা জন্ম হইতে বাধা কি ? ফলে, মুক্তিই এইমতে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।[৩] ন্যায়কন্দলী রচয়িতা শ্রীধরাচার্য অন্যপথে অগ্রসর হইয়া আত্মার বিভুত্ব সাধন করিয়াছেন। শ্রীধর বলেন, ভূত এবং ভৌতিক বস্তুরাজি আত্মার সুখ-দুঃখের সাধনরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীব স্বীয় অদৃষ্টবশেই জাগতিক বস্তুরাজি ভোগ করে। অদৃষ্ট জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। নিমিত্তকারণের স্বভাবই এই যে, ভাবী দ্রব্যের উপাদানের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াই নিমিত্তকারণ কার্য উৎপাদন করিয়া থাকে। জগতের সৃষ্টি জীবের অদৃষ্ট জন্য ইহাই বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত।

১। প্রশ্ন, ৬।৩, ৬।৪।

২। ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৯ ও ২।৩।৩০ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৩। কিরণাবলী, ১৫১ পৃষ্ঠা, কাশী সং।

এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্যই বৈশেষিককে দেহের বাহিরে অবস্থিত ভূত ও ভৌতিক জগতের সহিতও আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অনুমোদন করিতে হইবে; দেহের বাহিরে আত্মার অস্তিত্বও মানিয়া লইতে হইবে। দেহের বাহিরে অবস্থিত আত্মাকে সসীম, পরিচ্ছিন্নও বলা যায় না। জীবাত্মা সসীম হইলে, তাহা অনিত্য এবং বিনাশী হইতে বাধ্য। এই অবস্থায় অবিনাশী জীবাত্মাকে নিত্য, বিভু বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।[১]

আত্মা স্বতঃ বিভু ইহা সাব্যস্ত হইল। এইরূপ বিভু আত্মা বা জীব-সম্পর্কে শাস্ত্রে নানাবিধ কর্তব্য ও অকর্তব্যের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

জীবের কর্তৃত্ব ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য

বৈদিক সংহিতা প্রভৃতিতে যজ্ঞ করিবে (যজেত), হোম করিবে (জুহুয়াৎ), দান করিবে (দদ্যাৎ), এইরূপে বিবিধ অবশ্য কর্তব্য কর্মের এবং হিংসা করিবে না (মা হিংস্যাৎ), চুরি করিবে না, এইভাবে অসংখ্য নিষেধের বিধান করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে কর্মে জীবের যে স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব আছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এখন প্রশ্ন এই যে, এই কর্তৃত্ব জীবের স্বাভাবিক কিনা? বিভু আত্মার কোনরূপ কার্যকারিণী শক্তি আছে কিনা? আত্মার যদি কর্তৃত্বই আদৌ না থাকে, তবে তাঁহার সম্পর্কে "ইহা করিবে" "ইহা করিবে না", এই সকল বিধি-নিষেধের তো কোনই অর্থ হয় না। পক্ষান্তরে, আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে গেলেই আত্মার পরিণাম, বিকার, স্বরূপ-বিচ্যুতি প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়। আত্মাকে নির্বিকার, নির্লেপ অসঙ্গ বলিয়া বিভিন্ন উপনিষদে যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার কোনই মূল্য থাকে না। ন্যায়-বৈশেষিক পণ্ডিতগণ আত্মার কর্তৃত্বকে স্বাভাবিক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কপিল, পতঞ্জলি প্রভৃতি আত্মার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা স্বাভাবিক কর্তৃত্ব-ভার বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দিয়া, আত্মাকে "অকর্তা" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত যুক্তির সংক্ষিপ্ত মর্ম এই, যিনি যেই কার্য করেন, তিনিই সেই কার্যের কর্তা, এবং ঐ কর্তার ধর্মই কর্তৃত্ব। এই কর্তৃত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া গৌতম, কণাদ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে যাঁহার প্রযত্ন বা চেষ্টা দেখা যায়, সেই প্রযত্ন বা চেষ্টার যিনি আশ্রয়; অর্থাৎ যাঁহার

১। ন্যায়কন্দলী, ৮৮ পৃষ্ঠা, এবং বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় সং, আত্মাশব্দ দ্রষ্টব্য।

প্রযত্ন বা চেষ্টার ফলে কার্য জন্মে, তিনিই হন সেই কার্যের কর্তা, আর তাঁহার ধর্ম প্রযত্নই "কর্তৃত্ব"। এই প্রযত্ন ন্যায়-বৈশেষিকের মতে আত্মার সহিত মনের সংযোগের ফলে আত্মায় উৎপন্ন হয়, প্রযত্ন আত্মাশ্রিত, অতএব আত্মা কর্তা ইহা নিঃসন্দেহ। সাংখ্যের মতে আত্মা নির্বিকার, অসঙ্গ এবং কূটস্থ। ঐরূপ আত্মা, প্রযত্ন প্রভৃতি কোনরূপ ধর্মের আশ্রয় হইতে পারেন না; অসঙ্গ আত্মার সহিত মনের সংযোগও ঘটিতে পারে না। মনের সহিত আত্মার সংযোগ সম্ভবপর হয় না বলিয়া, ঐরূপ সংযোগ-মূলক প্রযত্নের উৎপত্তিও হইতে পারে না। গুণময়ী বুদ্ধি প্রভৃতির প্রেরণায় প্রযত্নের উৎপত্তি সম্ভব হইলেও, কোন প্রকার গুণ বা ধর্মের অনাশ্রয় অসঙ্গ কূটস্থ আত্মা সেই প্রযত্নের আশ্রয় হইবে, ইহাতো একেবারেই অসম্ভব কথা, সুতরাং এইমতে নির্বিকার অপরিণামী আত্মা কর্তা হইবে কিরূপে? পরিণামিনী বুদ্ধিই কর্ত্রী বটে। সাংখ্য মতে প্রযত্ন, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি সমস্তই বুদ্ধির ধর্ম, আত্মার নহে, অতএব প্রযত্নের আশ্রয় বুদ্ধিই যে কর্ত্রী হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? বুদ্ধি কর্ত্রী হইলেও, বুদ্ধির চেতনা নাই। অচেতন বুদ্ধি কর্মফল উপভোগ করিতে পারে না। ভোগ চেতনের ধর্ম, অচেতনের নহে। এইজন্য, 'চিদবসানো ভোগঃ'। এই সাংখ্যসূত্রে আত্মাকেই ভোক্তা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। এইমতে একজনে (বুদ্ধি) কর্ম করে, অপরে (আত্মা) কর্ম না করিয়াও, সেই ফল ভোগ করে। এইরূপ সিদ্ধান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া, ন্যায়-বৈশেষিক পণ্ডিতগণ উল্লিখিত সাংখ্য-সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন যে, 'যোঽহং প্রাক্ কর্ম অকরবম্' সোঽহ-মিদানীং তৎফলং ভুঞ্জে', যেই আমি পূর্বে কর্ম করিয়াছিলাম, সেই আমিই এখন কর্মফল ভোগ করিতেছি, এইরূপ বোধ সকলেরই উদিত হয়। এইরূপ সর্বজনীন বোধকে উপেক্ষা করিয়া, একজনকে কর্তা ও অপরকে সেই ফলের ভোক্তা বলা সম্পূর্ণই যুক্তিবিরুদ্ধ। ইহাতে কর্ম ও কর্মফলের কোনরূপ নিয়ম থাকে না। ব্যবহার জগতে বিষম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তারপর, জড় বুদ্ধিও কর্ত্রী হইতে পারে না। 'চেতনোঽহং করোমি', চেতন আমি কর্ম করিতেছি, এইরূপ অনুভব কাহার না উদিত হয়? ইহা হইতে চেতন আত্মাই যে কর্তা এবং ভোক্তা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। 'চৈতনোঽহং করোমি' এইরূপ অনুভবের আলম্বন বুদ্ধি নহে, জীবাত্মা।

জীবাত্মার কর্তৃত্ব আছে, ইহা বুঝা গেল; এখন সেই কর্তৃত্ব স্বাভাবিক না ঔপাধিক, তাহা বিচার্য। বেদোক্ত বিধিনিষেধের সার্থকতা রক্ষা করিতে গিয়া মুনিবর বেদব্যাস 'কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ'। (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩৩) এই ব্রহ্মসূত্রে জীবকে স্পষ্টবাক্যেই কর্তা এবং ভোক্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলেও, তিনি ন্যায়-মতের অনুসরণ করিয়াছেন, এইরূপ ভুল বুঝিবার কোনও কারণ নাই। কেননা, ব্রহ্মসূত্রকারের মতে জীবের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক। জীবের কার্যকারিণী শক্তি না থাকিলে, বৈদিক বিধির কোনই অর্থ থাকে না। বেদোক্তি উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় অসার ও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। বেদ-বিধির সার্থকতা উপপাদনের জন্যই জীবের কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে হয়।

কর্মজগতে কর্মক্ষম শরীর লাভ করিয়া মানুষ এক মুহূর্তেও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না—"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ"। গীতা। সংসারজীবনে মানুষমাত্রই কামনার দাস। কামনার দুর্বার প্রেরণা মানুষকে তাঁহার অভীষ্ট ফল লাভ করিবার জন্য তৎপর করিয়া তোলে। ইচ্ছামাত্রেই অভীষ্টফল কাহারও হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়ে না। ঈপ্সিত ফললাভের জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কিরূপ ফললাভের জন্য কোন্ কোন্ উপায় বা পথ অবলম্বনীয়, কোন্ পথ পরিত্যাজ্য অনেকক্ষেত্রে নিজ বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং কর্মপথ জানিবার জন্য বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের শরণ লইতে হয়। শাস্ত্রানুমোদিত পথ অনুসরণ করতঃ সুধী কর্মী যাহা ইহলোকে এবং পরলোকে শ্রেয়স্কর তাহা বরণ করেন, যাহা অকল্যাণকর তাহা পরিহার করেন। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গসুখ লাভ হয়, ইহা বেদের উক্তি হইতেই জানা যায়। বৈদিক উক্তি অভ্রান্ত ইহা বুঝিয়া, শ্রেয়স্কামী কর্মী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ইহা খুব স্বাভাবিক। যজ্ঞ যজমান নিজে করেন না, করে যজমানের প্রতিনিধি পুরোহিত বা ঋত্বিক্‌গণ। যজ্ঞারম্ভের পূর্বে যজমানকে কতকগুলি অবশ্যকর্তব্য নিয়ম পালন করিতে হয়। এই নিয়ম পালনের নামই "দীক্ষা"। যজমানই এই যজ্ঞদীক্ষা লাভ করেন এবং 'দীক্ষিত' বলিয়া পরিচিত হন। ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞের পূর্ব কর্তব্য নিয়মাবলী গ্রহণ করেন না। এইজন্য তাঁহাদিগকে দীক্ষিত বলা হয় না, যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিয়াও তাঁহারা অদীক্ষিতই থাকেন অদীক্ষিত যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞফলভাগী হন না। দীক্ষিত যজমানই যজ্ঞের ফল লাভ করেন এখানে একটা প্রশ্ন আসে এই যে, যিনি কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সেই কর্মের ফলভোগ করেন, ইহাই কর্মের স্বভাব বা সাধারণ নিয়ম। কর্মরহস্যজ্ঞ মহর্ষি জৈমিনিও তাঁহার মীমাংসা দর্শনে 'শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরি তল্লক্ষণত্বাৎ'। এই সূত্রে কর্মফল যে কর্মকর্তাই ভোগ করেন, এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। ঋত্বিক্‌গণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদির ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়মের ব্যভিচার দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরে মীমাংসক বলেন যে, কর্মফল কর্তারই প্রাপ্য, অপরের নহে। তবে, ক্ষেত্রবিশেষে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রভৃতি দান করিয়া যাজ্ঞিকগণের নিকট হইতে কর্তার কর্মফল কিনিয়া লইবার কথাও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।* সেই ফলে যজমানেরই ষোল আনা অধিকার জন্মে। "যাং কাঞ্চন আশিষমাসাশতে যজমানস্যৈব আশাসতে"। কর্মে নিযুক্ত ঋত্বিগ্‌গণ যে ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা যজমানের জন্যই করেন, নিজের জন্য করেন না, তাঁহারা দক্ষিণা পাইয়াই সন্তুষ্ট। এই অবস্থায় যজ্ঞফল যজমান ভোগ করিলেও তাহা দ্বারা কর্মও কর্মফল ভোগের নিয়মের কোনরূপ ব্যভিচার ঘটে না। কেবল বৈদিক যাগযজ্ঞের ব্যাপারেই নহে, সংসার জীবনেও অনেক সময় অর্থের দ্বারা ক্রয় করিয়া অপরের কৃতকর্মের ফল-ভোগ করিতে দেখা যায়। রাজমজুরকে অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া তাঁহাদের নির্মিত প্রাসাদ ধনী গৃহস্বামী ভোগ করেন। জলাশয় খননের জন্য খনকক্কে ক্রয় করিয়া জলাশয় প্রস্তুত করাইয়া জলাশয়ের মালিক তাহা উপভোগ করেন। এইরূপ আরও কত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সকল স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যিনি অর্থের দ্বারা অপরের শ্রমার্জিত ফল ক্রয় করেন, তাহাকেই প্রকৃত কর্তা বলা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা কর্মফল-ভোগের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলা যায় না। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে শাস্ত্রই বলিয়া দিতেছে যে, অনুষ্ঠাতা কর্মফলের ভাগী না হইয়া

* মীমাংসাদর্শনের ৩য় অধ্যায়ে ৭ম পাদে ৮ম অধিকরণে "অন্যো বা স্যাৎ পরিক্রয়াম্নানাৎ বিপ্রতিষেধাৎ প্রত্যগাত্মনি." (মীঃ দঃ ৩।৭।২০ সূত্র) এই সূত্রে এবং ঐ অধ্যায়েরই ৮ম পাদের ১ম অধিকরণে "স্বামিকর্ম-পরিক্রয়ঃ কর্মণস্তদর্থত্বাৎ", (মীঃ দঃ ৩।৮।১ সূত্র) এই সূত্রটিতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, যজমান দক্ষিণা দ্বারা ঋত্বিগ্‌গণের নিকট হইতে অনুষ্ঠিত কর্মের ফল ক্রয় করিয়া লইয়া থাকেন।

অপরেই সেই ফল লাভ করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপে পুত্রেষ্টিযাগ, পুত্রকর্তৃক অনুষ্ঠিত পিতার শ্রাদ্ধ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য কোন বিশেষ কারণ না ঘটিলে, যিনি কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই ফললাভ করেন, ইহাই কর্মের স্বাভাবিক নিয়ম। কর্ম কখনও এই স্বভাব পরিত্যাগ করে না।

কেবল শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের সার্থকতা রক্ষার জন্যই যে জীবকে কর্তা ভোক্তা বলা হইয়া থাকে তাহা নহে। কোন কোন শ্রুতিও স্পষ্টতঃ জীবের কর্তৃত্বের বা কার্যকারিতার উল্লেখ করিয়াছেন। স্বপ্ন সময়ে আত্মার অবস্থার বর্ণনা করিতে গিয়া 'বিহারোপদেশাৎ'। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩৪। এই ব্রহ্মসূত্রে ভাষ্যকার 'স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামম্'। বৃহদাঃ ৪।৩।১২, অমৃত বা অমরণশীল আত্মা স্বপ্ন সময়ে ইচ্ছানুসারে গমন করেন, এই বৃহদারণ্যকোক্ত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া, আত্মাকে স্বেচ্ছানুরূপ গতির কর্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গেই বৃহদারণ্যকে অন্য স্থানে বলা হইয়াছে যে, আত্মা নিজের ইচ্ছামতই শরীরের মধ্যেই বিচরণ করেন—"স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে", বৃহদাঃ ২।১।১৮। এখানে বিচরণ ক্রিয়ার কর্তা যে আত্মা তাহাতে সন্দেহ কি? আত্মার কর্তৃত্ব কেবল ঐ সকল শ্রুতি বলেই সমর্থিত হয় না। 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, কর্মাণি তনুতেঽপি চ।' তৈত্তিঃ ২।৫।১, এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিমূলে বেদোক্ত-যাগযজ্ঞ প্রভৃতিতে এবং লৌকিক (ব্যাবহারিক) কর্মে বিজ্ঞান পদবাচ্য জীবাত্মার কর্তৃত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে। উক্ত তৈত্তিরীয়শ্রুতির ব্যাখ্যায় [ব্যপদেশাচ্চক্রিয়ায়াং নচেন্নির্দেশবিপর্যয়ঃ। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩৬] ব্রহ্মসূত্রে বিজ্ঞান-শব্দে যে বিজ্ঞানসংজ্ঞক জীবকেই বুঝায় এবং এইজন্যই "বিজ্ঞানম্" এইরূপ জীবের কর্তৃত্ববোধক প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা ভাষ্যকার অতিস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। বিজ্ঞানশব্দের দ্বারা এখানে জ্ঞানের সাধন বুদ্ধি প্রভৃতিকে বুঝাইলে শ্রুতিতে বিজ্ঞানং এই কর্তৃত্ব বোধক প্রথমান্তপদের প্রয়োগ না করিয়া, "বিজ্ঞানেন" এইরূপ করণ বিভক্তিরই প্রয়োগ করা হইত। শ্রুতির প্রথমান্ত নির্দেশ হইতে জীবাত্মা ব্যতীত জ্ঞানের সাধন বুদ্ধি প্রভৃতি যে কর্তা হইতে পারেনা (জীবাত্মাই কর্তা) ইহাই বুঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ, আত্মার কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনে আত্মার কেবল ভোক্তৃত্ব এবং বুদ্ধির ভোক্তৃত্ব

প্রত্যাখ্যান করিয়া কেবল কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার ফলে কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বের আশ্রয় এক বা অভিন্ন না হওয়ায়, এইমত যে সমীচীন নহে, তাহাও ধ্বনিত হইতেছে। প্রথমে মনের মধ্যে ফলাকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, তারপর, কিরূপে ঐ ফললাভ করা যায়, সেই উপায়ান্বেষণে ফলাভিলাষী কর্মী ব্যাপৃত হন। উপায় আয়ত্তে আসিলে, তবেই কর্মী কর্মের অনুষ্ঠান করেন। ইহাই ক্রিয়ানুষ্ঠানের সাধারণ নিয়ম। যে বুদ্ধি (স্বতঃ) জড় (অচেতন), তাহার ভোগবাঞ্ছা থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহার ঐ ভোগসিদ্ধির অনুকূল উপায় অন্বেষণেরও কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। অতএব তাহার পক্ষে কর্মের অনুষ্ঠানও সম্ভবপর বলা চলে না। আত্মাকে বাদ দিয়া এইরূপ অচেতন বুদ্ধিকে কর্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিরূপে? বুদ্ধিই যদি কর্ত্রী হইত, আত্মার কর্তৃত্ব নাই থাকিত, তবে আত্মা যেমন বুদ্ধির সাহায্যে সমস্ত কার্য নির্বাহ করিয়া থাকে, বুদ্ধিও সেইরূপ (বুদ্ধি ভিন্ন) অপর কোনও করণের সাহায্যেই কার্য সম্পাদন করিয়া আত্মার স্থান অধিকার করিত। সে-ক্ষেত্রে বুদ্ধিকেই আত্মার আসনে বসাইয়া তাহারই কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত হইত। বুদ্ধির অতিরিক্ত স্বতন্ত্র আত্মার কল্পনাই নিষ্প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইত। বুদ্ধিভিন্ন (বুদ্ধির কার্য নির্বাহের জন্য) অপর কোন সাধনের কথা শুনা যায় না। ঐরূপ কারণের কল্পনায় লাভও কিছুই হয় না, গৌরব দোষই অপরিহার্য হয়। বুদ্ধির সহায়তায় চেতন স্বতন্ত্র আত্মা ক্রিয়া করে, কর্মানুযায়ী ফলভোগ করে, ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। অচেতন বুদ্ধির ভোক্তৃত্ব যেমন সম্ভবপর হয় না; কর্তৃত্বও সেইরূপ সম্ভবপর হয় না। যেই ব্যক্তি কর্ম করে, সেই কর্মানুরূপ ফল ভোগ করে, এইরূপ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব যে একই আশ্রয়ে বিরাজ করে, ইহাই কর্মের স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া বুঝা যায়। এই স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের বিভিন্ন আশ্রয় কল্পনা করিলে, কর্ম ও কর্ম-ফলভোগের বিশৃঙ্খলতাই ঘটে। অতএব সাংখ্যোক্ত জড়বুদ্ধির কর্তৃত্ব এবং আত্মার ভোক্তৃত্ব কল্পনা করা অপেক্ষা, একই আত্মার কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব স্বীকার করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব, এই দুইপ্রকার ধর্মই অবিদ্যা প্রভাবে আত্মায় আরোপিত হইয়া থাকে। আরোপ বা

অধ্যাসের ফলে ঐ ধর্মদ্বয় আত্মারই ধর্ম বলিয়া মনে হয়। এই প্রকার আরোপিত ধর্মের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক বিশুদ্ধতার কোন হানি হয় না।

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মাই যদি কর্মকর্তা এবং ফলভোক্তা হন, তবে স্বাধীন হইয়াও আত্মা নিজের অকল্যাণকর দুঃখময় কর্মের অনুষ্ঠান করেন কেন? কোন স্বাধীন ব্যক্তিই আপনার অহিতকর কোন কর্ম করেন না। এমনকি পাগলেও তাহা করে কিনা সন্দেহ। এই অবস্থায় স্বতন্ত্র আত্মা কর্ম করিবার সময় নিজ সুখকর কর্মই করিবে, অনিষ্টকর কর্ম করিবে না; ইহাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যেক আত্মাকেই আপনার হিতকর ও অহিতকর, প্রিয় এবং অপ্রিয় কর্ম করিতে দেখা যায়। ইহা হইতে কর্ম বিষয়ে আত্মার স্বাধীন কর্তৃত্ব আছে কি না, সেই বিষয়েই সন্দেহ আসে। এইরূপ সন্দেহ নিরাসের জন্য 'উপলব্ধিবদনিয়মঃ'। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩৭, এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, আত্মার কর্তৃত্ব সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দিলেও, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্পর্কে কাহারও কোনরূপ মতভেদ নাই। যাঁহারা (সাংখ্যকার প্রভৃতি) আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারাও আত্মাকে জ্ঞাতা ভোক্তা বলিয়া থাকেন। দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা, এইরূপ শ্রুতিও আত্মার জ্ঞাতৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব স্পষ্টতঃ সমর্থন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে যে উপলব্ধির কথা বলা হইয়াছে, সেই উপলব্ধি এবং ভোগ একই কথা। কোনও বিশেষ বিষয়ের উপলব্ধিকেই আত্মার বিষয়ভোগ বলা হইয়া থাকে। এই ভোগ প্রিয় এবং অপ্রিয় ভেদে দুই প্রকার। চেতন আত্মা স্বতন্ত্র হইয়াও যেমন প্রিয় এবং অপ্রিয়, এই দুইপ্রকার বিষয়ই ভোগ করিয়া থাকেন; সেইরূপ হিতকর এবং অহিতকর উভয় প্রকার কর্মেরই অনুষ্ঠান করেন। স্বাধীনতা সত্ত্বেও আত্মা যেমন অপ্রিয় বিষয় পরিহার করিয়া কেবল প্রিয় বিষয়ই ভোগ করেন না, তেমনই কর্মে স্বাধীনতা সত্ত্বেও অনিষ্টকর কর্ম পরিত্যাগ করতঃ কেবল সুখময় কর্মেরই অনুষ্ঠান করেন না। অবশ্যই অহিতকর বলিয়া বুঝিলে সেইরূপ কর্মের অনুষ্ঠানে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই প্রবৃত্তি হয় না, ইহা সত্য কথা, কিন্তু পরিণামে যাহা দুঃখময় তাহাকে হিতকর ভ্রম করিয়াই অনেক ক্ষেত্রে লোককে অনিষ্টকর কর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। ধনী হইবার দুরাশায় বাণিজ্য করিয়া মানুষ সর্বস্বান্ত হয়। সাম্রাজ্যবৃদ্ধির দুরাকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধে লিপ্ত

হইয়া পরিণামে দেশ-বিখ্যাত বীরকেও যুদ্ধাপরাধী সাজিয়া ফাঁসীর রজ্জু গলায় পরিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে স্বাধীন কর্তা হইলেই যে প্রিয় কর্মেরই অনুষ্ঠান করিবে, অপ্রিয় কর্মের অনুষ্ঠান ভ্রমেও করিবে না, এমন কথা বলা চলে কি? তারপর, কর্মে আত্মা স্বাধীন হইলেও নিরপেক্ষ নহে। তাঁহাকেও কর্ম সাধনের জন্য দেশ, কাল, নিমিত্ত প্রভৃতির অপেক্ষা করিতে হয়। ইহা দ্বারা তাঁহার স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের ব্যাঘাত ঘটে, এমন নহে। কার্য করিতে হইলে কর্মীকে অপর কতকগুলি বস্তুর সহায়তা গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহা কার্যমাত্রেরই সাধারণ নিয়ম। সহকারীর সহায়তা না লইয়া, একাকী কোন ব্যক্তিই কোন কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। মানুষের কথা কি, এই লীলাময়ী বিশ্বপ্রকৃতির যিনি স্রষ্টা তাঁহাকেও বিশ্বসৃষ্টিতে জীবের অদৃষ্ট বা প্রাক্তন কর্মফলের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। জীববর্গের কর্মানুসারেই শ্রীভগবান্ সুখ-দুঃখময় বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চ রচনা করিয়াছেন। এই বিশ্বরাজ্যে জীব তাঁহার কর্মানুযায়ী সুখ, দুঃখ ভোগ করিতেছে। বিশ্বস্রষ্টার কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব নাই, কাহারও প্রতি তিনি অকরুণও নহেন[১] —যাঁহার যেটুকু প্রাপ্য তাহাকে সেই প্রাপ্যটুকুই দান করেন, বেশীও দেন না, কমও দেন না। জীবের কর্মানুসারে সৃষ্টির বৈচিত্র্য বিধান করায়, পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য যদি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, তবে দেশ, কাল, নিমিত্তের সহায়তা গ্রহণ করায়, জীবের আত্মকর্তৃত্বের হানি হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? বিশ্বসৃষ্টিতে পরমেশ্বরই যদি স্বাতন্ত্র্য না থাকে, তবে জগতে স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কোন পদার্থই নাই। দেশ-কাল-নিমিত্ত সাপেক্ষ জীবের স্বাতন্ত্র্য হানিরও কোন প্রশ্ন আসে না। কর্মানুষ্ঠানের জন্য আত্মাকে দেশ-কাল ও নিমিত্তের অধীন হইতে হয় বলিয়াই, এক সময়ে, এক স্থলে, এক কারণে যাহা হিতকর হয়, অন্য সময়ে অন্য স্থলে অন্য কারণে তাহাই হইয়া দাঁড়ায় অহিতকর। এইরূপে আত্মা স্বতন্ত্র হইয়াও যে প্রিয় ও অপ্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইবে, হিতাহিত বিষয় ভোগ করিবে, তাহাতে আপত্তি কি? আত্মার কর্তৃত্ব যেমন দেশ, কাল, নিমিত্ত প্রভৃতি সাপেক্ষ, আত্মার জ্ঞাতৃত্বও সেইরূপ চক্ষুরাদি করণসাপেক্ষ, নিমিত্তান্তর নিরপেক্ষ নহে। কোন-না-কোন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়াই রূপাদিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

১। বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি। ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪ এই সূত্রভাষ্য দেখুন।

উপলব্ধির বা জ্ঞানের কোন বিষয় থাকিবে না, ইহা হইতেই পারে না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ জ্ঞেয়বিষয় উপস্থাপিত করিয়া উপলব্ধির সহায়তা সম্পাদন করিলেও, উপলব্ধি বিষয়ে আত্মার স্বাতন্ত্র্যের কোনরূপ হানি হয় না। আত্মা স্বতন্ত্র কর্তা এবং ভোক্তা, ইহাই সিদ্ধ হয়। আত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে, শাস্ত্রে যে ধ্যান-ধারণা, সমাধি প্রভৃতির উপদেশ রহিয়াছে, তাহা কি ব্যর্থ উপদেশ হইয়া পড়ে না? শাস্ত্র ঐরূপ ব্যর্থ উপদেশ দিয়া শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করিতে পারে কিরূপে?

জীবাত্মার যে স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মার ঐ কর্তৃত্ব কি স্বাভাবিক, না ঔপাধিক? জলের উষ্ণতার ন্যায় আগন্তুক? না, সবিতার প্রকাশের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ? যদি স্বতঃসিদ্ধ হয়, তবে, "এমন কোন সময় বা অবস্থাই কল্পনা করা যায় না, যাহাতে আত্মার কর্তৃত্ব ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বিরত হইতে পারে। কর্তৃত্ব বিরত না হইলে, জীবাত্মার সংসার নিবৃত্তি বা মুক্তিলাভ একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কর্তৃত্বই জীবকে সংসারে এবং সাংসারিক দুঃখভোগে নিয়োজিত করিয়া থাকে; সেই কর্তৃত্ব যদি জীবের স্বাভাবিক বা নিত্যসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে মোক্ষ দশায়ও সেই কর্তৃত্বের বিরাম হইবে না; কর্তৃত্বের অবিরামে সংসার ও সাংসারিক দুঃখভোগও নিবৃত্ত হইবে না; সুতরাং জন্ম-মরণ-সম্পর্কশূন্য নির্দুঃখ মোক্ষলাভ কোন কালে বা কোন অবস্থায়ই জীবের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, আত্মার কর্তৃত্ব যদি উপাধিজনিত আগন্তুক ধর্ম হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে না সত্য, কিন্তু জানিতে ইচ্ছা হয় যে, সেই উপাধিটি কি? ও কি প্রকার? এবং কি কারণে কোথা হইতে আইসে? যাঁহার সংস্পর্শে থাকিয়া জীবকে এতদূর অনর্থরাশি ভোগ করিতে হয়।"[১] নৈয়ায়িক, মীমাংসক ও বৈষ্ণব বেদান্ত-সম্প্রদায়ের মতে আত্মার কর্তৃত্ব উপাধিসম্পর্কলব্ধ বা আগন্তুক নহে। কর্তৃত্ব আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম। আত্মার স্বভাবসিদ্ধ কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই, শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ পালনে জীবকে বাধ্য করা হইয়াছে। আত্মার যদি স্বাভাবিক কর্তৃত্বই না থাকিত, তবে, ঐ সকল বিধি-নিষেধ, কর্তব্য-অকর্তব্যের উপদেশ সমস্তই নিতান্ত অর্থহীন হইয়া

১। শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোসিপ প্রবন্ধ ৪র্থ খণ্ড ১৬৯—১৭০ পৃষ্ঠা,

পড়িত। এমন কোন দৃঢ় যুক্তি, প্রমাণ বা অনুপপত্তিও দেখা যায় না, যাহার জন্য আত্মার কর্তৃত্বকে আগন্তুক বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। জীবের প্রত্যক্ষদৃষ্ট কর্তৃত্ব আগন্তুক বা ঔপাধিক নহে, স্বাভাবিক।

ন্যায়, মীমাংসা ও বৈষ্ণব-বেদান্ত-সম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্ত অদ্বৈত-বেদান্তী গ্রহণ করেন নাই। অদ্বৈতবেদান্তী 'যথা চ তক্ষোভয়থা'। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪০। এই ব্যাসসূত্র উদ্ধৃত করিয়া বলেন, কাষ্ঠশিল্পী যেমন কর্তা এবং অকর্তা, এই উভয়ই হইতে পারে, জীবাত্মাও কর্তা এবং অকর্তা, এই উভয়রূপেই অবস্থান করে। কাষ্ঠশিল্পী যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার যন্ত্রপাতি লইয়া কাঠের জিনিষ প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত থাকে, ততক্ষণই সে কাষ্ঠশিল্পী বা কাষ্ঠচ্ছেদন কর্তারূপে পরিচিতি লাভ করে। সে যখন যন্ত্রপাতি বাক্সবন্দী করিয়া কর্ম হইতে বিরত হয়, তখন সে আর কর্তা নহে, অকর্তা। কাঠের মিস্ত্রীর কাঠকাটা, কাঠ খোদাইকরা প্রভৃতি ধর্ম স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক অর্থাৎ নিজের কার্যঘটিত। সেই কাঠকাটা প্রভৃতি কার্য (উপাধি) যতক্ষণ বর্তমান থাকে, ততক্ষণই সে কর্তা, আর, সেই কাঠকাটা প্রভৃতি কার্যরূপ উপাধির অভাব ঘটিলেই, সে হয় অকর্তা। জীবাত্মার অবস্থাও ঠিক এইরূপ। আত্মা যতক্ষণ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধি সহযোগে ক্রিয়া করে, ততক্ষণই সে কর্তারূপে বিরাজ করে, আবার, যখন উপাধিসম্পর্ক-রহিত হইয়া, ক্রিয়া হইতে বিরত হয়, তখনই সেই আত্মা অকর্তা হইয়া দাঁড়ায়। মুক্তি অবস্থায় আত্মার কোনরূপ উপাধিসম্পর্ক থাকে না। অতএব সেই সময়ে ঔপাধিক কর্তৃত্ব এবং তন্মূলক অহম্-অভিমান, শোক, দুঃখ প্রভৃতিও আত্মার থাকে না। আত্মা মুক্তিতে নিজ সচ্চিদানন্দরূপেই বিরাজ করে। জীবের কর্তৃত্বধর্মের সাময়িক অভিব্যক্তি ও নিবৃত্তি আত্মকর্তৃত্বের ঔপাধিকত্বই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করে। আত্মার কর্তৃত্ব স্বভাবসিদ্ধ হইলে, উষ্ণতা যেমন অগ্নির চিরসহচর, অগ্নির উষ্ণতার কখনও বিলোপ হয় না, হইতে পারে না, উষ্ণতা ধর্মের বিলোপে অগ্নিরই বিনাশ ঘটে, আত্মার স্বভাবসিদ্ধ কর্তৃত্বের বিলোপে আত্মার উচ্ছেদই অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। জীবের মুক্তি আত্মার অস্তিত্ব বিলোপেরই নামান্তর হয়। মুক্তিতেও আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে, কর্তৃত্ব দুঃখরূপ বলিয়া মুক্তিতেও দুঃখের তিরোভাব হয় না, এবং ঐরূপ মুক্তিকে মুক্তিই বলা চলে না।

আত্মবিনাশ নহে, আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ, পরম আনন্দময় অবস্থা। এইজন্যই স্বীকার করিতে হয় যে, আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক।

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। মুক্তি অবস্থায় জ্ঞেয় বিষয় থাকে না। আত্মার কোনরূপ জ্ঞানোদয়ও হয় না। কিন্তু তাহার দ্বারা আত্মার জ্ঞানরূপতার যেমন ব্যাঘাত হয় না, সেইরূপ মুক্তি অবস্থায় কর্মের অনুকূল পরিবেশ থাকে না, কর্মের সাধন থাকে না, এইজন্যই আত্মা কর্ম করে না। এই অবস্থায় আত্মার সুপ্ত কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেই বা বাধা কি? এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, আত্মা নিত্য বোধস্বরূপ, ইহা যেমন শ্রুতি এবং যুক্তিসিদ্ধ, আত্মার কর্তৃত্ব সেইরূপ শ্রুতি এবং প্রমাণসিদ্ধ তো নহেই, বরং শ্রুতিবিরুদ্ধ। আত্মা উদাসীন, নির্লেপ, কূটস্থ, অসঙ্গ, এইরূপেই উপনিষদে আত্মার স্বরূপ পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। উদাসীন কূটস্থের কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। কর্তৃত্ব থাকিলেই তাহার ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে। 'যঃ করোতি স কর্তা', ইহাই কর্তার পরিচয়। কোনরূপ ক্রিয়া করিবে না, অথচ "কর্তা" আখ্যা লাভ করিবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক হইলে, মুক্তিতেও আত্মায় ক্রিয়াযোগ স্বীকার করিতে হইবে। ক্রিয়া থাকিলেই দুঃখও থাকিবে। দুঃখাত্যন্তাভাবরূপ মুক্তি অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। মুক্তি অবস্থায় আত্মায় কোনরূপ ক্রিয়া থাকে না, অথচ আত্মা থাকে। সুতরাং পরিষ্কারই দেখা যাইতেছে যে, আত্মার কর্তৃত্ব স্বভাবসিদ্ধ নহে। বিষয়সম্পর্ক ব্যতীত আত্মার জ্ঞানোদয় হয় না, ইহা জন্য জ্ঞান বা বৃত্তিজ্ঞান। আত্মা বৃত্তিজ্ঞানস্বরূপ নহে, নিত্যবোধরূপ। বৃত্তিজ্ঞান ও আত্মার স্বরূপ নিত্য চৈতন্য, এই দুইএর মধ্যে আকাশ-পাতাল-প্রভেদ। এই অবস্থায় উল্লিখিত নিত্য আত্মচৈতন্যের দৃষ্টান্তে আত্মাকে কর্তৃস্বভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া নিতান্তই অসঙ্গত নহে কি? ক্রিয়াশক্তিই কর্তৃত্ব। ক্রিয়াযোগ না থাকিলে, আত্মাতে ক্রিয়াশক্তিও থাকিতে পারে না, কর্তৃত্বও থাকিতে পারে না। সুতরাং ক্রিয়াপরিবেশ ব্যতীতও কর্তৃত্ব থাকে, এইরূপ কল্পনা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ।

সত্য বটে "কর্তা ভোক্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ"। বৃহদাঃ, ৬।৩।৭। এইরূপে শ্রুতিই স্পষ্টতঃ আত্মাকে কর্তা ভোক্তা বলিয়াছেন, কিন্তু ঐ কর্তৃত্ব

এবং ভোক্তৃত্ব যে জীবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম, ঔপাধিক নহে, এমন কোন কথা শ্রুতিতে বলা হয় নাই।

"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ"।

এইরূপে কঠোপনিষদে ভোক্তা আত্মার যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, সেখানে স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে যে আত্মার ভোক্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, (আধ্যাসিক)। ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত সংযোগের ফলেই আত্মাকে "ভোক্তা" বলা হুইয়া থাকে। যিনি ভোক্তা, তিনিই কর্তা। আত্মার ভোক্তৃত্ব ঔপাধিক বা আধ্যাসিক হইলে, আত্মার কর্তৃত্বও যে আধ্যাসিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? "ধ্যায়তীব", "লেলায়তীব", আত্মা যেন ধ্যান করেন, চালিত হন, এই সকল শ্রুতিতে "ইব" শব্দের দ্বারা আত্মার কর্তৃত্ব যে স্বাভাবিক নহে, কল্পিত, তাহাই ধ্বনিত হইয়া থাকে। কর্তৃত্ব বুদ্ধি বা অন্তঃকরণেরই স্বাভাবিক ধর্ম। ঐ বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত অভেদ-সম্বন্ধ (তাদাত্ম্যাধ্যাস) বশতঃ বুদ্ধির ধর্ম কর্তৃত্ব পরমাত্মায় অধ্যস্ত বা আরোপিত হয়। পরমাত্মা কর্তা, সংসারী জীব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিসম্পর্ক লইয়াই জীবের জীবত্ব। বুদ্ধি-সংস্পর্শ বাদ দিলে জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া যায়; জীব স্বীয় সচ্চিদানন্দরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক, অকর্তৃত্বই স্বাভাবিক, ইহা সাব্যস্ত হইলে আত্মার কর্তৃত্ব এবং অকর্তৃত্ববোধক শ্রুতির মধ্যে আপাততঃ প্রতীয়মান বিরোধেরও অবসান হয়।

জীবের কর্তৃত্বে ঈশ্বরের প্রভাব

বুদ্ধির কর্তৃত্ব আত্মায় আরোপিত হয় বলিয়া আত্মার কর্তৃত্ব যেমন স্বাভাবিক নহে, সেইরূপ আরোপিত কর্তৃত্বের আধার জীবাত্মা কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনও নহেন। জীব কোথা হইতে এই কর্তৃত্বশক্তি লাভ করে? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মসূত্রকার বলিতেছেন—'পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ—ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪১। এই সূত্রের সহজ অর্থ এই যে, আত্মার কর্তৃত্ব আছে সত্য, কিন্তু তাহা 'পরাৎ'—অপর বস্তু হইতে আগত। সেই অপর বস্তুটি মায়ার সর্বপ্রথম পরিণাম বুদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; সুতরাং বুদ্ধিই সূত্রোক্ত "পরাৎ" পদের প্রতিপাদ্য। আচার্য শঙ্কর ঐ সূত্রের অন্যপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—আত্মার যে কর্তৃত্ব তাহা 'পরাৎ' পরমাত্মা হইতে প্রাপ্ত। পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জগতের অন্যান্য সমস্ত কার্য যেমন নিষ্পন্ন হয় ...র কর্তৃত্বও সেইরূপ পরমেশ্বরের অমোঘ ইচ্ছাবশেই উৎপন্ন হয়।

পরমেশ্বর জীবগণের প্রাক্তন শুভাশুভ কর্মানুসারে ভাল-মন্দ-বিষয়ে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন; তদনুসারে তাঁহারা কার্য করে। এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিয়াছেন—

"এষহ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষহ্যেব অসাধুকর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিনীষতে'। কৌষীতকী উপ ৩।৮।

পরমেশ্বর যাহাকে উন্নত বা ঊর্ধ্বলোকগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে উত্তম কর্মে নিয়োজিত করেন, আবার তিনি যাহাকে অবনত বা অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে অসাধু কর্মে নিয়োজিত করেন। অবশ্য এক্ষেত্রে পরমেশ্বর কাহারও শত্রুও নহেন, মিত্রও নহেন; তিনি রাগদ্বেষের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং সর্বজীবে সর্বভূতে সমদর্শী। তিনি কখনও রাগদ্বেষের বশবর্তী হইয়া কাহারও প্রতি অনুচিত অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করেন না। জীব জন্মজন্মান্তরে যে প্রকার শুভাশুভ কর্মাশয় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, পরমেশ্বর তদনুরূপ ফল দান করিয়া থাকেনমাত্র। সেই ফল শুভই হউক, কি অশুভই হউক, সেদিকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন না, করিতে পারেন না; কারণ, তাহা হইলে পরমেশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়ে।[১]

ফলদানের ব্যাপারে সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর জীবের শুভাশুভ কর্মকে অপেক্ষা করিলেও, তাহা দ্বারা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হয় না। রাজা যেমন সেবার দৃঢ়তা এবং আন্তরিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সেবকদিগকে সেবার ফলদান করেন; সর্বোত্তম সেবককে তিনি যেরূপ ফলদান করেন, ঐরূপ সুফল তিনি মধ্যম বা অধম সেবককে দান করেন না। প্রদত্তফলের এইরূপ তারতম্যের দ্বারা রাজার ফলপ্রদানের অপ্রতিহত সামর্থ্যের যেরূপ বাধা ঘটে না; বিশ্বরাটও সেইরূপ জীবের কর্মানুসারে জীবকে শুভাশুভ ফলদান করায়, তাঁহার ঈশ্বরত্ব বা সর্বশক্তিমত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার প্রশ্ন আসে না।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আলোচ্য শ্রুতিতে "উন্নিনীষতে" এবং "অধোনিনীষতে" এইরূপ ইচ্ছা অর্থে 'সন্' প্রত্যয়ান্তে দুইটি পদের প্রয়োগ দেখা যায়। ফলে, জীবের ঊর্ধ্ব এবং অধোগতিতে ভগবদিচ্ছার

১। মঃ মঃ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, শ্রীগোপাল বসুমল্লিক ফেলোশিপ প্রবন্ধ ৪র্থ খণ্ড, ১৭৩-১৭৪ পৃষ্ঠা।

প্রাধান্যই সূচিত হয়। এই অবস্থায় শ্রীভগবানকে সর্বজীবে সর্বভূতে সমদর্শী, অপক্ষপাতে কর্মফলদাতা বলা যায় কিরূপে? "জীব রাগদ্বেষাদিবশতঃ স্বাধীন ভাবেই কর্ম করিতেছে, উহাতে জীবের স্বাধীন কর্তৃত্বই স্বীকার্য। কারণ, জীবের যে সমস্ত কর্ম দেখা যায়, তাহাতে ঈশ্বরের কোন অপেক্ষা বা প্রয়োজন বুঝা যায় না। পরন্তু রাগদ্বেষশূন্য পরমকারুণিক পরমেশ্বর জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করিলে, তিনি সকল জীবকে ধর্মেই প্রবৃত্ত করিতেন। তাহা হইলে সকল জীবই ধার্মিক হইয়া সুখীই হইত। ঈশ্বর জীবের কর্মানুসারেই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্মে প্রবৃত্ত করেন, সুতরাং তাঁহার বৈষম্যদোষ হয় না, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ঈশ্বর জীবের কর্মকে অপেক্ষা করিয়া তদনুসারেই তাঁহার সৃষ্টির রথচক্র চালিত করেন। জীবের শুভাশুভ সেই কর্মও ঈশ্বরই করাইয়াছেন, এইরূপ হইলে জীবের কর্মে স্বাতন্ত্র্য না থাকায় ঈশ্বরপরতন্ত্র জীবের দুঃখভোগে ঈশ্বরই মূল। এই অবস্থায় জীব কোন পাপকর্ম করিলে, তজ্জন্য তাহার কোন অপরাধও হইতে পারে না। কারণ, জীবের ঐ কর্মে তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। জীব সকল কর্মেই ঈশ্বরপরতন্ত্র। জীবের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা প্রভৃতি ঈশ্বরেচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে, ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ অনিবার্যরূপেই দেখা দেয়। সুতরাং জীবের স্বাধীন কর্তৃত্বই স্বীকার্য। তাহা হইলেই ঈশ্বরকে জীবের কর্ম সাপেক্ষ বলা যায় এবং তাহাতে বৈষম্যদোষের আপত্তিও চলে না। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে ভগবান্ বাদরায়ণ নিজেই এই আপত্তির সমাধান করিয়া বলিয়াছেন,

"পরাত্তুতচ্ছ্রুতেঃ"। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪১।

জীবের কর্তৃত্ব সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বরই জীবকে কর্ম করাইতেছেন। তিনি প্রযোজক কর্তা, জীব প্রযোজ্য কর্তা, ঐরূপ সিদ্ধান্তই শ্রুতিতে ব্যক্ত আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য এখানে "এষহ্যেবৈনং সাধুকর্ম কারয়তি" ইত্যাদিশ্রুতি এবং "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি" ইত্যাদি শ্রুতিকেই সূত্রোক্ত "শ্রুতি" শব্দদ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। জীবের কর্মে তাহার স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে, অর্থাৎ ঈশ্বরই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম করাইলে, পূর্বোক্ত বৈষম্যাদিদোষের আপত্তি কিরূপে নিরস্ত হইবে? এতদুত্তরে ভগবান্ বাদরায়ণ উহার পরেই বলিয়াছেন,

"কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ"। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪২।

জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন না হইলেও, কর্মে জীবের কর্তৃত্ব আছে। জীব অবশ্যই কর্ম করিতেছে, ঈশ্বর জীবকৃত প্রযত্ন বা ধর্মাধর্মকে অপেক্ষা করিয়াই তদনুসারে জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম করাইতেছেন, ইহাই শ্রুতির রহস্য।"[১] জীবের কর্তৃত্ব ও তন্মূলক ফলভোগ না থাকিলে, শ্রুত্যুক্ত বিধি ও নিষিধের কোন অর্থ থাকে না। শ্রুতির প্রামাণ্যও সেক্ষেত্রে ব্যাহত হয়। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে—

"কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ"। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩৩।

এই সকল সূত্রে অতিস্পষ্ট বাক্যেই জীবের কর্তৃত্ব সমর্থন করিয়াছেন। পরে অবশ্যই তিনি—

'পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ'। ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪১।

এই সূত্রে জীবের কর্তৃত্ব যে ঈশ্বরের অধীন, ঈশ্বর জীবকৃত ধর্মাধর্ম পাপপুণ্যকে অপেক্ষা করিয়াই জীবকে সাধু বা অসাধু কর্ম করাইতেছেন, এই মতই উপপাদন করিয়াছেন। জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন হইলে, জীবের কর্মে তাহার কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য না থাকায়, পরতন্ত্র জীবের পুণ্যাপুণ্য ধর্মাধর্মকে অপেক্ষা করিয়া ঈশ্বর জীবকে শুভ বা অশুভ ফল প্রদান করেন, এই সিদ্ধান্তের কোনই মূল্য থাকে না। ইহা বুঝিয়াই আচার্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে 'পরায়ত্তাধিকরণে' (ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৬ অধিঃ) উক্ত মতের অবতারণা করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন, জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন হইলেও, জীব যে কর্ম করিতেছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য। জীব কর্ম করিতেছে, ঈশ্বর তাহাকে সেই কর্ম করাইতেছেন। জীব প্রযোজ্য কর্তা, ঈশ্বর প্রযোজক কর্তা। প্রযোজ্য কর্তার কর্তৃত্ব না থাকিলে, প্রযোজক কর্তারও কর্তৃত্ব উপপন্ন হয় না। এই অবস্থায় ঈশ্বরকে কারয়িতা বলিলে, জীবকে কর্তা না বলিয়া উপায় কি? জীবের এই কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন হইলেও, জীবানুষ্ঠিত শুভ বা অশুভ কর্মের ফলভোগ জীবকে করিতেই হইবে। কারণ, রাগ বা দ্বেষের বশবর্তী হইয়া জীবই তো কর্ম করিয়াছে; কর্ম সম্পাদনের যে ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা তাহাও তো জীবেরই হইয়াছে। এইরূপ জীবকে কর্তা না বলিয়া পারা যায় কিরূপে।[২] জীব কেবল কর্তা

১। ৺মঃ মঃ ফণিভূষণতর্কবাগীশকৃত ন্যায়দর্শনের টিপ্পনী, ৪ অঃ ১ আঃ ২১ সূত্র।

২। ননু কৃতপ্রযত্নাপেক্ষত্বমেব জীবস্য পরায়ত্তে কর্তৃত্বে নোপপদ্যতে, নৈষ দোষঃ; পরায়ত্তেঽপি হি কর্তৃত্বে করোত্যেব জীবঃ। কুর্বন্তং হি তমীশ্বরঃ কারয়তি। অপি

নহে, কর্মফল ভোক্তাও বটে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, অনুগত রাজভৃত্য প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কোনরূপ শুভ বা অশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, ভৃত্য যেমন পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত হয়, আদেশদাতা প্রভুরও সেক্ষেত্রে রাগদ্বেষ থাকায়, প্রভুও ভৃত্যানুষ্ঠিত কর্মফল ভাল বা মন্দ, শুভ বা অশুভ ভোগ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরকে কিন্তু জীবকৃত কর্মফল ভোগ করিতে হয় না। কারণ, ঈশ্বরের রাগ ও দ্বেষ নাই। সুতরাং রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইয়া, ঈশ্বর কাহাকেও সুখী করিবার জন্য সাধু কর্ম, কাহাকেও দুঃখী করিবার জন্য অসাধু কর্ম করান না। তিনি সর্বভূতে সমান—

"সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" গীতা, ৯।২৯।

ঈশ্বর অপক্ষপাতে জীবের কর্মফলদাতা। জীবের পূর্ব পূর্ব শুভ বা অশুভ কর্মের অনুরূপ ফলভোগ প্রদানের জন্যই, ঈশ্বর জীবকে কর্ম করাইয়া থাকেন। জীব পূর্ব পূর্ব জন্মে শুভ বা অশুভ, ভাল বা মন্দ যেই জাতীয় কর্মের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেই জাতীয় পূর্ব কর্মের অভ্যাস-বশতঃ জীবচিত্ত সহজেই ঐ জাতীয় কর্মের প্রতি ধাবিত হয়। ফলে, এই জন্মেও জীব ঐরূপ শুভ বা অশুভ কর্ম করিতেই সচেষ্ট হয়। পরমেশ্বরও অপক্ষপাতে জীবকে তাহার কর্মানুরূপ শুভাশুভ ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় জীবের প্রতি শ্রীভগবানের নির্দয়তা বা পক্ষপাতিত্বের অবকাশ কোথায়?

আলোচিত শঙ্কর মতের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র ভামতীতে বলিয়াছেন—জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বরের অধীন হইলেও, কর্মানুষ্ঠানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও জীবের অবশ্য স্বীকার্য। নতুবা 'ইহা করিবে', 'ইহা করিবে না', ঈশ্বরপরতন্ত্র জীবের সম্পর্কে এইরূপ বিধি ও নিষেধের যে কোনই অর্থ হয় না, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ জীবের কর্মপ্রবৃত্তির মধ্যে তাহার ইষ্টের প্রতি অনুরাগ, অনিষ্টের প্রতি বিরাগ সুধীমাত্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। জীব কর্মে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অধীন হইলে, ঈশ্বরের খেলার পুতুল জীবের কর্তৃত্বাভিমানকে মিথ্যা, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট

চ পূর্বপ্রযত্নমপেক্ষ্যেদানীং কারয়তি পূর্বতরঞ্চ প্রযত্নমপেক্ষ্য পূর্বমকারয়দিত্যনাদিত্বাৎ সংসারস্যেত্যনবদ্যম্।

ব্রহ্মসূত্র শংভাষ্য, ২।৩।৪২।

পরিহারের চেষ্টাকে ব্যর্থপ্রয়াস বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয় নাকি? এই অবস্থায় কর্তা জীবকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অধীন না করিয়া, জীবের কর্ম-পরিবেশে তাঁহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বাচস্পতিমিশ্র এই দৃষ্টিতেই 'পরায়ত্তাধিকরণের' (ব্রঃ সূঃ ২৩।১৬ অধিঃ) ভামতীতে ভাষ্যকার আচার্য শঙ্করের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বাচস্পতি বলিয়াছেন, প্রবল ঝটিকাবর্ত যেমন অসার তৃণখণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে নিজের অধীন করিয়া উড়াইয়া লইয়া যায়, ঈশ্বর কিন্তু সেইভাবে একেবারে অধীন করিয়া কর্মের আবর্তের মধ্যে টানিয়া আনিয়া জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করান না। কর্মে জীবের রাগ প্রভৃতির সঞ্চারের দ্বারাই ঈশ্বর জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করেন। ফলে, কর্মে জীবের কর্তৃত্ববোধও আত্মপ্রকাশ লাভ করে, ইষ্ট প্রাপ্তি এবং অনিষ্ট পরিহারের চেষ্টাও জীবের কর্মপ্রবৃত্তির মধ্যে ফুটিয়া উঠে। জীবের সম্পর্কে কর্তব্য ও অকর্তব্যের উপদেশ ও সেক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করে। এরূপ ক্ষেত্রে জীবের ঈশ্বরপরতন্ত্রতা থাকিলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও যে আছে, তাহা না মানিয়া উপায় নাই।[১] জীবের কর্তৃত্বও স্বেচ্ছাতন্ত্র নহে, পরমেশ্বরেরই অমোঘ ইচ্ছার অধীন—

ঈশ্বরতন্ত্রাণামেব জন্তূনাং কর্তৃত্বং, ন তু স্বতন্ত্রাণাম্। ভামতী, ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪২।

জীবশক্তির উর্ধ্বে এক মহীয়সী মহাশক্তি আছে, সেই শক্তিই ভগবদিচ্ছা। সেই ভগবদিচ্ছার দ্বারা চালিত হইয়াই জীব কর্ম করে। জীবের প্রাক্তন কর্মজাল ভগবদিচ্ছার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, জীবের ভাগ্য ও কর্মচক্র আবর্তিত করে। ইহারই নাম সৃষ্টিপ্রবাহ। এই প্রবাহের গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। মানুষ ইহাকে অনাদি বুঝিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি বলিয়াই আদিম সৃষ্টির উষায় যখন জীবও ছিল না, জীবের কর্মও ছিল না, তখন এই সুখ-দুঃখসঙ্কুল বিচিত্র বিষম সৃষ্টি কিরূপে উৎপন্ন হইল এইরূপ প্রশ্ন আসে না।[২]

১। ন হি ঈশ্বরঃ প্রবলতপন ইব জন্তূন্ প্রবর্তয়ত্যপিতু তচ্চৈতন্যমনুরুধ্যমানো রাগাদ্যুপহারমুখেন। এবঞ্চেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারার্থিনো বিধিনিষেধাবর্থবন্তৌ ভবতঃ। তদনেনাভিসন্ধিনোক্তম্—পরায়ত্তেঽপি হি কর্তৃত্বে করোত্যেব জীব ইতি।

ব্রহ্মসূত্র-ভামতী, ২।৩।৪২।

২। ন কর্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ। ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৫। প্রাক্‌সৃষ্টের বিভাগাবধারণান্নাস্তি

জীবের হৃদয়গুহায় দেবী ও আসুরী সম্পদ্ নামে দুই প্রকার সম্পদ্ নিহিত থাকে। জীবের কর্মানুসারে সেই সম্পদের ভাণ্ডার জীবের নিকট উন্মুক্ত হয়। শুভকর্মের ফলে জীব যদি দৈবী সম্পদের অধিকারী হয়, শ্রীগুরুর প্রসাদে জীবের জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি প্রসারলাভ করে, তবেই জীবের মিথ্যা কর্তৃত্বাভিমান তিরোহিত হয়। উদাসী বিরাগী জীব তখন সংসারের আসক্তি শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আনন্দময় পরমাত্মায় তন্ময় হইবার জন্য অধীর হয়। এইরূপেই জীব শিব-পর্যায়ে উন্নীত হয়। জীবের শিবলোকে যাত্রাপথেরই এক বিশেষ স্তরে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই যে মায়ার খেলা, ইহা জীবের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এইরূপ জীবকেই 'সাক্ষী' বলা হইয়া থাকে। সাক্ষীর পরিচয় দিতে গিয়া অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, দৃশ্যমান এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অন্তঃকরণের বৃত্তির সাহায্যে প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। ঐরূপ বৃত্তির মূলেও থাকে অনাদি অবিদ্যার খেলা। এই অবিদ্যা অন্তঃকরণবৃত্তির সাহায্যে প্রকাশিত হয় না, একমাত্র সাক্ষীই অবিদ্যাকে প্রকাশ করে। এই সাক্ষী কে? কঃ সাক্ষী? এই প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যারণ্য তাহার পঞ্চদশীর 'কূটস্থ দীপ' নামক পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন যে, জীবদেহ যেই কূটস্থ চৈতন্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকাশ লাভ করে, স্বয়ম্ উদাসীন সেই 'কূটস্থ চৈতন্য'ই জীবের সূক্ষ্ম ও স্থূল এই দ্বিবিধ দেহকে সাক্ষাদ্ভাবে ঈক্ষণ বা দর্শন করতঃ 'সাক্ষী' আখ্যা লাভ করে[১]—সাক্ষাদীক্ষণান্নির্বিকারত্বাচ্চ সাক্ষীত্যুচ্যতে। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ—সাক্ষিস্বরূপ বিচার, ১৮০ পৃষ্ঠা চৌখাম্বা সং। "সাক্ষাদ্ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্"। এই পাণিনীয় বিধান

জীব ও জীবসাক্ষী প্রভৃতির পরিচয়

কর্ম যদপেক্ষ্য বিষমা সৃষ্টিঃ স্যাৎ। সৃষ্ট্যুত্তরকালং হি শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম, কর্মাপেক্ষশ্চ শরীরাদিবিভাগ ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত। অতো বিভাগাদূর্ধ্বং কর্মাপেক্ষ ঈশ্বরঃ প্রবর্ততাং নাম। প্রাগ্ বিভাগাদ্ বৈচিত্র্যনিমিত্তস্য কর্মণোঽভাবাৎ তুল্যৈবাদ্যাসৃষ্টিঃ প্রাপ্নোতীতি চেৎ, নৈষ দোষঃ। অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। ভবেদেষ দোষো যদ্যাদিমান্ সংসারঃ স্যাৎ। অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবদ্ধেতু-হেতুমদ্ভাবেন কর্মণঃ সর্গবৈষম্যস্য চ প্রবৃত্তির্ন বিরুধ্যতে।

ব্রঃ সূঃ শংভাষ্য, ২।১।৩৫,

১ কঃ সাক্ষী? তত্র কূটস্থদীপে কূটস্থচিৎ স্বয়ম্।
[illegible]দেঃ সাক্ষীতি প্রতিপাদিতঃ ॥

বেদান্ত সূক্তি মঞ্জরী।

বলে সাক্ষাৎশব্দের পর দ্রষ্টা অর্থে ইন্ প্রত্যয় করিয়া সাক্ষী পদটি নিষ্পন্ন হয়। ব্যাকরণ অনুসারে সাক্ষী শব্দের অর্থ হয়, দ্রষ্টা বা দর্শনের কর্তা। এরূপ সাক্ষীকে নির্বিকার বলা যায় কি? নির্বিকার অর্থ বিকার রহিত। কর্তৃত্বও তো একপ্রকার বিকারই বটে। কর্তৃত্ব থাকিলে বিকার তো থাকিলই; দ্রষ্টা সাক্ষীকে সেক্ষেত্রে আর নির্বিকার বলা চলে না। কর্তৃত্ব ও নির্বিকারত্ব পরস্পর বিরোধী বিধায়, ঐরূপে সাক্ষীর নির্বচনও দোষাবহ হয়। প্রতিবাদীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন—সাক্ষীর কর্তৃত্ব আরোপিত, বাস্তব নহে। সবিতা প্রকাশাত্মক হইলেও তাহাতে যেমন 'সবিতা প্রকাশতে' এইরূপে প্রকাশের কর্তৃত্বের আরোপ করা হইয়া থাকে, সেইরূপ 'দৃশি'-স্বরূপ সাক্ষীতে দ্রষ্টৃত্বের উপচার করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ব্যাবহারিক জীবনে আমরা দেখিতে পাই, পরস্পর বিবাদ-নিরত পক্ষদ্বয়ের বিবাদের কারণ যিনি বিশেষভাবে (প্রত্যক্ষতঃ) অবগত আছেন, এইরূপ তৃতীয় কোন উদাসীন ব্যক্তিকেই সাক্ষী বলা হয়। কেবল উদাসীন হইলেই তাহাকে সাক্ষী বলা যায় না। বিবাদস্থলের তরুরাজিওতো উদাসীন বটে, তাহারা সাক্ষী হইবে কি? সাক্ষীকে উদাসীনও হইতে হইবে, আবার বোদ্ধা বা জ্ঞাতাও হইতে হইবে। বোদ্ধৃত্ব এবং ঔদাসীন্য, এই উভয়বিধ ধর্ম থাকিলেই, তবে সে সাক্ষী হইবে।

এখন কথা এই যে, এইরূপ সাক্ষী স্বীকারের প্রয়োজন কি? কর্তা, ভোক্তা জীব হইতে ভিন্ন একজন সাক্ষী জীবের অন্তরবিহারী আছেন, ইহাতে প্রমাণই বা কি? জীবের সূক্ষ্ম ও স্থূল, এই দ্বিবিধ দেহের অবভাসক চৈতন্যকে সাক্ষী বলা হইয়াছে। জীবদেহের অবভাস তো প্রকাশাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তির সাহায্যেই উপপাদন করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় আলোচ্য সাক্ষী স্বীকারের কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় না। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন—অন্তঃকরণ জড়বস্তু। জড় অন্তঃকরণের পরিণাম, যাহাকে অন্তঃকরণবৃত্তি বলা হইয়া থাকে, তাহাও জড়, স্বপ্রকাশ নহে, পরপ্রকাশ (চিৎপ্রকাশ্য বা সাক্ষিভাস্য)। এইরূপ জড়বৃত্তিকে জীবের দেহদ্বয়ের ভাসক বলা যায় কিরূপে? জীবের সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের অবভাসের জন্য সাক্ষি-চৈতন্য অবশ্য স্বীকার্য। জড় অন্তঃকরণ বৃত্তি যেমন জীবদেহের ভাসক হয় না; সেইরূপ উহা জড় অন্তঃকরণের ধর্ম সুখ-দুঃখ প্রভৃতিরও

ভাসক হয় না। উহাদের অবভাসের জন্যও সাক্ষীর আবশ্যকতা অপরিহার্য। অন্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণের ধর্ম—সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অন্তঃকরণেরও বিষয় হয় না, ইন্দ্রিয়েরও বিষয় হয় না; কিন্তু সাক্ষীর বিষয় হয়। স্থূল বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে তৈজস (তেজঃ নামক ভূতের কার্য) চক্ষু রূপ এবং ঐ রূপের আধার, এই উভয়কেই গ্রহণ করে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শ এবং তাহার আশ্রয় ঘটপ্রভৃতিকে গ্রহণ করে। ঘ্রাণ, রসনা ও শ্রোত্র, এই তিনটি ইন্দ্রিয় কেবল গন্ধ, রস এবং শব্দকেই গ্রহণ করে, উহাদের আধার ক্ষিতি, জল বা আকাশকে গ্রহণ করে না। কোন বহিরিন্দ্রিয়ই অন্তঃকরণকে গ্রহণ করিতে পারে না; বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্তঃকরণের জ্ঞানোদয়ও সম্ভবপর নহে। বহিরিন্দ্রিয় কেবল স্থূল বিষয়ই গ্রহণ করে। পঞ্চীকৃত ভূতবর্গ এবং তাহাদের কার্যাবলীর মধ্যেই চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রহণশক্তি সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয়বর্গ এবং অন্তঃকরণ অপঞ্চীকৃত ভূতের কার্য এবং সূক্ষ্ম। স্থূল ইন্দ্রিয় সূক্ষ্মকে গ্রহণ করিতে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয় চক্ষুর বিষয় হয় না, শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রোত্রের, রসনেন্দ্রিয় রসনার, এক কথায় কোন ইন্দ্রিয়ই কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না। অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় অপেক্ষাও আন্তর এবং সূক্ষ্মতর বস্তু। এইজন্যই অন্তঃকরণও কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না। অন্তঃকরণ নিজেও নিজের বৃত্তির বিষয় হয় না। বৃত্তির আশ্রয়ই হয় এবং বৃত্তির আশ্রয় হয় বলিয়াই তাহা বৃত্তির বিষয় হইতে পারে না। যেমন অগ্নি দাহের আশ্রয় হয় বলিয়া অগ্নি দাহের বিষয় হয় না, অর্থাৎ অগ্নি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয় না। অগ্নিভিন্ন তৃণকাষ্ঠাদিই দাহের বিষয় হয়। এইরূপ অন্তঃকরণ ব্যতীত অপর বস্তুমাত্রই অন্তঃকরণ বৃত্তির বিষয় হয়। অন্তঃকরণের বৃত্তি অর্থ জ্ঞেয় বিষয়ের আকারে অন্তঃকরণের পরিণতি। যখন ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান হয়, তখন অন্তকরণ ঘটাদি পদার্থের আকার গ্রহণ করে। অন্তঃকরণের এই জ্ঞেয় বিষয়ের আকার ধারণ করাকেই অন্তঃকরণের বৃত্তি বা পরিণতি বলা হয়। এখন অন্তঃকরণকে বৃত্তির সাহায্যে জানিতে হইলে, সেক্ষেত্রেও অন্তঃকরণকে অন্তঃকরণের আকার ধারণ অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু অন্তঃকরণ তো নিজ আকারেই বিদ্যমান, সে আবার অন্তঃকরণের আকার ধারণ করিবে কিরূপে? ফলে, অন্তঃকরণকে আর অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয় বলা চলিবে না। অন্তঃকরণের ন্যায় "অন্তঃকরণের

ধর্মও অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয় হয় না। এইরূপ নিয়ম আছে যে, যাহা বৃত্তির আশ্রয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত হয়, তাহাই বৃত্তির বিষয় হয়, যে বস্তু বৃত্তির আশ্রয়ের নিতান্ত সমীপবর্তী হয়, তাহা বৃত্তির বিষয় হয় না। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বৃত্তির আশ্রয় যে নেত্র, তাহার অত্যন্ত সমীপবর্তী যে (নেত্রস্থ) অঞ্জনাদি, তাহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বৃত্তির বিষয় হয় না। সেইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তির আশ্রয় যে অন্তঃকরণ, তাহার অত্যন্ত সমীপবর্তী যে সুখ প্রভৃতি অন্তঃকরণ-ধর্ম, তাহারা অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয় হয় না। কিন্তু উহা সাক্ষীর বিষয় হয়"।[১] অন্তঃকরণ বৃত্তি সাক্ষীর বিষয় হইয়া থাকে বলিয়াই, সাক্ষী চৈতন্যের আলোকে আলোকিত বৃত্তিও ভাস্বর বলিয়া বোধ হয়; এবং ঐরূপ ভাস্বর বৃত্তিই বৃত্তিগ্রাহ্য বিষয়ের ভাসক হয়। বৃত্তিতে বৃত্তির ভাসক সাক্ষী চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ায়, চৈতন্যোজ্জ্বল বৃত্তিকেও প্রকাশস্বভাব বলিয়া মনে হয়। বৃত্তির অন্তরালে বৃত্তির ভাসক নিত্য স্বপ্রকাশ সাক্ষী না থাকিলে, জড়বৃত্তি বৃত্তিগ্রাহ্য বিষয়ের ভাসক হইবে কিরূপে? ফলে, বৃত্তির ভাসক সাক্ষীর অস্তিত্ব মানিতেই হইবে। "অহং কর্তা, স্থূলোঽহম্" এইরূপে জীবের দেহসম্পর্কে যে অভিমান (অহংকার) জন্মে, বৃত্তির উদয়ে তাহা পরিস্ফুট হইয়া অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারে পরিণতি লাভ করে। বৃত্তির অনুদয়েও ঐরূপ অভিমান জীবের মনোরাজ্য হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় না; অস্পষ্টভাবে ঐরূপ অভিমানের বিকাশ চলিতেই থাকে। এইজন্যই আমি আছি কিনা, আমার প্রাণ আছে কিনা, মন আছে কিনা, [অহং বর্তে নবা, অহং প্রাণিমি নবা] এইরূপ সংশয় কদাচ কোনও সুধী ব্যক্তির উদয় হইতে দেখা যায় না। ঐরূপ সংশয় না ঘটিবার কারণই এই যে, উল্লিখিত বিবিধ অভিমানের মূলে সনাতন স্বপ্রকাশ সাক্ষী বিরাজ করিতেছে, এবং অহমাকারে বৃত্তির অনুদয়কালেও অহন্তার বিকাশ ঘটাইতেছে। এই অবস্থায় 'অহং' সম্পর্কে সংশয় অপনোদন এবং অহন্তার প্রকাশ উপপাদনের জন্যও সাক্ষী স্বীকার একান্ত আবশ্যক।

এই সাক্ষীর কল্পনা অলীক নহে। "কর্তা ও ভোক্তার স্বরূপ যে সংসারী, তাহার এক বিশেষ ভাগকে (অর্থাৎ তাহার অপরিবর্তনীয় আসল ভাগকে) সাক্ষী বলা হয়। যদি সাক্ষীর নিষেধ করা হয়, তাহা হইলে

১। সাধু নিশ্চলদাস বিরচিত 'বিচার সাগর,' দ্বিতীয় তরঙ্গ।

সংসারীর সেই বিশেষ ভাগের নিষেধ হইয়া যাইবে, আর তজ্জন্য কর্তা ও ভোক্তার স্বরূপ যে সংসারী, তাহারও নিষেধ হইয়া পড়িবে।"—বিচারসাগর, দ্বিতীয় তরঙ্গ। জীবের ন্যায় জীব-সাক্ষীও অবশ্য স্বীকার্য। অন্তঃকরণ সাক্ষি-চৈতন্যের উপাধি ও জীবচৈতন্যের বিশেষণ। বিশেষণযুক্তকে "বিশিষ্ট" বলে এবং উপাধিযুক্তকে "উপহিত" বলে (অর্থাৎ অন্তঃকরণ-উপহিত চৈতন্য সাক্ষী এবং অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যকে জীব বলা হয়)।—বিচারসাগর দ্বিতীয় তরঙ্গ। এই অবস্থায় সাক্ষী এবং জীবকে পৃথক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে উপাধি এবং বিশেষণ কাহাকে বলে, উপাধি এবং বিশেষণের পার্থক্য কি, তাহাই সর্বাগ্রে জানা আবশ্যক। যে-বস্তু বা ধর্ম নিজে পৃথক্ থাকিয়া নিজের স্থানে অবস্থিত অন্য বস্তুকে বিজ্ঞাপিত করে, তাহাকে উপাধি বলে। যেমন ন্যায়মতে কর্ণগোলকের মধ্যবর্তী আকাশকে শ্রোত্র বলা হয়। সেস্থলে কর্ণগোলক শ্রোত্রের উপাধি। কারণ, ঐ কর্ণগোলক নিজে যতখানি স্থানে অবস্থিত, ততখানি স্থানের আকাশকে শ্রোত্ররূপে জ্ঞাপন করে এবং নিজে শ্রোত্র হইতে ভিন্নভাবে অবস্থান করে। কর্ণগোলক শ্রোত্রের স্বরূপান্তর্গত হয় না। এইজন্য কর্ণগোলককে শ্রোত্রের উপাধি বলা হয়। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, অন্তঃকরণ নিজের অবস্থান যতখানি স্থানে আছে, ততখানি স্থানে অবস্থিত চেতনকে সে সাক্ষী সংজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাপন করে, অথচ নিজে সাক্ষী হইতে পৃথক্ থাকে। এইজন্য অন্তঃকরণ হয় সাক্ষীর উপাধি। সাক্ষীর মধ্যে সাক্ষীর উপাধি অন্তঃকরণের প্রবেশ থাকে না। কিন্তু বিশিষ্টের মধ্যে বিশেষণের প্রবেশ থাকে। যে বস্তু নিজের সহিত সম্বদ্ধ বস্তুকে জ্ঞাপন করিবার অবসরে নিজেকেও জ্ঞাপন করে, তাহাকে বিশেষণ বলে। যেমন 'কুণ্ডল বিশিষ্ট পুরুষ আসিয়াছে' এস্থলে কুণ্ডলটি পুরুষের বিশেষণ। কারণ, কুণ্ডল নিজের সহিত (নিজেকে বাদ দিয়া নহে) পুরুষের আগমন বিজ্ঞাপিত করিতেছে। এজন্য উহা বিশেষণ হইল। অন্তঃকরণও কর্তা ভোক্তা জীব চৈতন্যের বিশেষণ। কারণ, অন্তঃকরণ সম্বলিত চেতনকে কর্তা ভোক্তা সংসারী বলা হয়, অন্তঃকরণকে বাদ দিয়া নহে। অন্তঃকরণে আশ্রিত চেতন এবং অন্তঃকরণ এই দুইটিকে একযোগে সংসারী বলা হয়। অন্তঃকরণ সংসারী জীবের বিশেষণ, উপাধি নহে। একই ব্রহ্মচৈতন্যে অন্তঃকরণ উপাধি হইলে,

তাহা সাক্ষী আখ্যা লাভ করে, বিশেষণ হইলে তাহা জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। জীবের মধ্যে অন্তঃকরণের প্রবেশ থাকে, সাক্ষীর মধ্যে অন্তঃকরণের প্রবেশ থাকে না। এইজন্য জীব বলিলে অন্তঃকরণ সহিত চেতন বুঝায়; সাক্ষী বলিলে কেবল চেতনই বুঝায়। সাক্ষী উদাসীন বলিয়া রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি সংসারী জীবেই থাকে, সাক্ষীতে থাকে না। সংসারী জীবের বিশেষণ যে অন্তঃকরণ রাগ-দ্বেষ তাহারই ধর্ম, বিশেষ্য যে চৈতন্যাংশ রাগ-দ্বেষ তাহার (বিশেষ্য চৈতন্যাংশের) ধর্ম নহে। ইহা হইতে সংসারীর যাহা বিশেষ্যরূপ চৈতন্যাংশ, তাহার সহিত সাক্ষীর যে কোনও ভেদ নাই তাহাই স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। (১) "এক চৈতন্যই অন্তঃকরণ সহযোগে সংসারী নামে অভিহিত হন, এবং (২) অন্তঃকরণাংশ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ঐ চৈতন্যই সাক্ষী নামে অভিহিত হন।" বিচার সাগর, দ্বিতীয় তরঙ্গ। সাক্ষী ও সংসারীর মধ্যে বিশেষ্যাংশে কোন ভেদ না থাকিলেও সংসারীর বিশেষণ যে অন্তঃকরণ তাহার ধর্ম সুখ-দুঃখ রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা সংসারী রাগ-দ্বেষ ক্লেশাদি ভোগ করেন; আর সাক্ষী হন—উদাসীন রাগ-দ্বেষ রহিত। সাক্ষীর ঔদাসীন্যই সাক্ষীকে সংসারী কর্মী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।[১] কর্মফলভোক্তা জীব হইতে উদাসীন সাক্ষী যে সম্পূর্ণ পৃথক্ তত্ত্ব, ইহা শ্রুতি স্পষ্টবাক্যেই প্রকাশ করিয়াছেন—"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ইতি"। এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য এই যে, কূটস্থ হইতে পৃথক্ জীব—বিচিত্র বিবিধ কর্মফল ভোগ করে; জীব হইতে পৃথক্ কূটস্থ কর্মফল ভোগ করে না, স্বয়ম্ উদাসীন থাকিয়া জীবের বিষয়োপভোগ সাক্ষাদ্‌ভাবে পরিদর্শন করে। ইহা হইতে উদাসীন দ্রষ্টৃত্বই যে সাক্ষিত্ব তাহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। জীব হইতে পৃথক্ উদাসীন সাক্ষীর স্বরূপ দৃষ্টান্তবলে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিদ্যারণ্য তাঁহার পঞ্চদশীর নাটকদীপে নাট্যশালাস্থিত প্রদীপের উল্লেখ করিয়াছেন—

১। ন চ জীবচৈতন্যমেব সাক্ষী ভবতু কিং কূটস্থেনেতি বাচ্যম্। লৌকিক বৈদিক ব্যবহার কর্তৃত্বতোদাসীন দ্রষ্টৃত্বাসম্ভবেন "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চেতি" শ্রুত্যুক্তসাক্ষিত্বাযোগাৎ।

সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, সাক্ষিস্বরূপবিচার, ১৮৩-১৮৪ পৃঃ, চৌখাম্বা সং।

নাট্যশালাস্থিতো দীপঃ প্রভুং সভ্যাংশ্চ নর্তকীম্।
দীপয়েদবিশেষেণ তদভাবেঽপি দীপ্যতে ॥

পঞ্চদশী, নাটকদীপ, ১১।

নাট্যমঞ্চস্থ প্রদীপ যেমন নাট্যাধ্যক্ষ, নট, নর্তকী, নাট্যদর্শক প্রভৃতি সকলকেই সমানভাবে প্রকাশ করে, এবং নাট্যাভিনয়ের অবসানে, নট, নটী, নাট্যাধ্যক্ষ, প্রেক্ষকবর্গ চলিয়া গেলে, জনবিরল নাট্যমঞ্চেও প্রদীপ পূর্বের ন্যায়ই আলোক বিকিরণ করে। নট, নটী প্রভৃতির গমনাগমনে, অভিনয়ের প্রযোজনায় বা সমাপ্তিতে প্রদীপের কিছুমাত্র আসে যায় না। নাট্যাভিনয়ের প্রতি প্রদীপ একেবারেই উদাসীন। এইরূপ সংসারের রঙ্গমঞ্চে রঙ্গাধ্যক্ষ অভিমানী জীবের প্রযোজনায় জীবননাট্যের যে অপরূপ অভিনয় হয়, তাহাতে চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের বিবিধ কার্যাবলীর বিচিত্র সুর ও তাল লয়ের মধ্যে নৃত্যপটীয়সী বুদ্ধির নৃত্যভঙ্গিমায় রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় জগতের ভোক্তা বিমুগ্ধ হয়। জীবননাট্যের নৃত্যগীতমুখর এই অভিনয়ের ডামাডোলের মধ্যে অহম্-অভিমানী জীব, ইন্দ্রিয়বর্গ ও বুদ্ধির ভাসক, মঞ্চ-দীপস্থানীয় সাক্ষী সদা অচঞ্চল উদাসীনভাবেই অবস্থান করে। জীবন নাটকের এই অভিনয় যখন সাঙ্গ হয়, নাট্যশ্রান্ত জীব, নৃত্যক্লান্ত বুদ্ধি ও শ্রমকাতর ইন্দ্রিয়রাজি যখন সুষুপ্তির ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়ে, জীবসাক্ষী কিন্তু তখনও অপলক নেত্রে জাগরূক থাকে। এই সদা জাগৃতি এবং উদাসীনতাই সাক্ষীর স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

সাক্ষীর একান্ত ঔদাসীন্যই সাক্ষী যে জীব বা ঈশ্বরের পর্যায়ে পড়ে না, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করে। কর্মী সংসারী জীব যেমন উদাসীন নহেন, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়কৃৎ ঈশ্বরও সেইরূপ উদাসীন নহেন, ইহারা সাক্ষী হইবেন কিরূপে?

সাক্ষী যথা জীবকোটির্নভবতি, জীবস্য উদাসীনত্বাভাবাৎ, তথা ঈশ্বরকোটিরপি ন ভবতি, জগৎসৃষ্টিনিয়মনাদিব্যাপারকর্তৃত্বস্য উদাসীনত্বাভাবাৎ। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহটীকা, ১৬৮ পৃঃ। পঞ্চদশীর কূটস্থদীপে এবং নাটকদীপে মহামুনি বিদ্যারণ্য সংসারী জীব যে উদাসীন সাক্ষী হইতে পারে না তাহা স্পষ্টতঃই উল্লেখ করিয়াছেন—

কূটস্থদীপে যঃ সাক্ষী [illegible] দর্শিতঃ।
সৈব নাটক দীপেঽপি ততো ভেদেন দর্শিতঃ ॥

সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ টীকা, ১৮৬ পৃঃ।

শৈব-পুরাণ প্রভৃতিতেও উক্তমতেরই প্রতিধ্বনি করিয়া, সাক্ষী যে জীবও ঈশ্বর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, এবং নিত্যশুদ্ধ উদাসীন পরম শিবই যে একমাত্র সাক্ষী আখ্যায় আখ্যাত হইবার যোগ্য, তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে—

ইতি শৈব পুরাণেষু কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ।
জীবেশত্বাদিরহিতঃ কেবলঃ স্বপ্রভঃ শিবঃ॥

সিদ্ধান্তলেশ টীকা, ১৮৬ পৃষ্ঠা।

সাক্ষী যে জীবকোটি বা ঈশ্বরকোটি, এই কোন কোটিরই অন্তর্ভুক্ত হয় না, হইতে পারে না, ইহা আচার্য মধুসূদন সরস্বতীও তাঁহার 'অদ্বৈত সিদ্ধিতে' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব চৈতন্যেরই সোপাধিক অভিব্যক্তি; সুতরাং চৈতন্যাংশে ইহাদের কোনরূপ ভেদ না থাকিলেও উপাধি অংশে যে ভেদ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় কিরূপে? ঈশ্বরত্ব জীবত্ব প্রভৃতি ধর্মরহিত জীবাধিষ্ঠান শুদ্ধ ব্রহ্ম-চৈতন্যই জীবাভিন্ন হইয়া সাক্ষী পদবী লাভ করে।

তত্ত্বকৌমুদীর মতে সাক্ষী পরমেশ্বরই রূপভেদ—

"ঈশস্যরূপভেদোঽসৌ কারণত্বাদিবর্জিতঃ।"

বেদান্ত সূক্তি মঃ ৯৪ কারিকা।

ঈশ্বর বলিতে এখানে জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয়ে ব্যাপৃত, বিশ্বকর্তা পরমেশ্বরকে বুঝায় না, সর্বভূতের হৃদয়গুহায় অবস্থিত, জীবের প্রবৃত্তি নিবৃত্তির নিয়ামক, স্বয়ম্ উদাসীন, জীবের পরম অন্তরঙ্গ পরমেশ্বরকেই বুঝিতে হইবে। উদাসীন না হইলে পরমেশ্বর সাক্ষী হইবেন কিরূপে? সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়বর্গের এবং তাহাদের চালক বুদ্ধিবৃত্তির উপরতি ঘটিলে, জীবের ব্যষ্টি অজ্ঞানের ভাসক ঈশ্বরসাক্ষী পরমেশ্বরই জীবের সহিত অভিন্ন হইয়া "প্রাজ্ঞ" আখ্যা লাভ করেন। এইরূপ উদাসীন সাক্ষী পরমেশ্বরকেই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—

"একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ"॥

শ্রুতির প্রতিধ্বনি করিয়া গীতায়ও জীবের অন্তরবিহারী সাক্ষী ঈশ্বরকে "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুনতিষ্ঠতি"। গীতা ১৮।৬১। বলিয়া প্রকাশ করা

হইয়াছে। তত্ত্বকৌমুদীর মতানুসারে উদাসীন পরমেশ্বরও যে সাক্ষী হইতে পারেন; অর্থাৎ সাক্ষিত্ব যে ঈশ্বরকোটির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে তাহা বুঝা গেল। ইহা হইতে সাক্ষীর জীবকোটিতে অন্তর্ভাবও যে অসম্ভব নহে তাহাও সূচিত হইল। আধ্যাসিক বস্তুদ্বয়ের একের ধর্ম অপরে সংক্রামিত হয় ইহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। 'ইদং রজতম্' প্রভৃতি ভ্রমস্থলে শুক্তির ধর্ম ইদন্তার রজতে অবভাস হইয়া থাকে, ইহা কে না জানেন? এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, জীবের সহিত অভিন্ন জীবের অধিষ্ঠান পরমেশ্বরের সাক্ষিত্বের প্রতিভাস জীবেও যে সম্ভবপর, তাহা অস্বীকার করা চলে না।[১] ফলে, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সাক্ষিভাস্য পদার্থের "অহংসুখমনুভবামি" এইরূপে জীবগত হইয়া যে ভাতি হয়, তাহারও সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া যায়।* এইজন্য কোন কোন বেদান্তী সুখ, দুঃখ অজ্ঞান প্রভৃতির সাক্ষাৎ দ্রষ্টা অবিদ্যোপাধিক জীবকেই সাক্ষী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অর্থাৎ সাক্ষীর জীবকোটিতে অন্তর্ভাব সমর্থন করিয়াছেন। কর্তা ভোক্তা জীব কিভাবে উদাসীন সাক্ষী হইতে পারেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে জীবের সাক্ষিত্ব-সমর্থনকারী বলেন, জীব স্বয়ং বস্তুতঃ অসঙ্গ এবং উদাসীন। ঐ অসঙ্গ এবং উদাসীনরূপেই জীব সাক্ষীর স্থান লাভ করে। জীবের কর্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্মসংবলিত অন্তঃকরণের সহিত জীবচৈতন্যের তাদাত্ম্যাধ্যাসের ফলে জীবে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি আরোপিত হইয়া থাকে। আরোপ মিথ্যা, সুতরাং জীবের আরোপিত কর্তৃত্ব প্রভৃতিও মিথ্যা। তাঁহার উদাসীন অসঙ্গরূপই সত্য এবং এইরূপেই

১। যথা 'ইদং রজতমিতি ভ্রমস্থলে বস্তুতঃ শুক্তিকোট্যন্তর্গতোঽপীদমংশঃ প্রতিভাসতো রজতকোটিঃ, তথা ব্রহ্মকোটিরেব সাক্ষী প্রতিভাসতো জীবকোটিরিতি জীবস্য সুখাদিব্যবহারে তস্যোপযোগ ইতি।

সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ, সাক্ষিস্বরূপ বিচার, ১৯০ পৃঃ, চৌখাম্বা সং;

* তত্ত্বকৌমুদীর মতের আলোচনায় পরমেশ্বরের যে (১) সৃষ্টিকার্যে ব্যাপৃতরূপ ও (২) উদাসীন সাক্ষিরূপের পরিচয় দেওয়া হইল, তাহার তাৎপর্য এই যে, মায়াশবলিত চৈতন্য (মায়াপ্রতিবিম্বিত)ই পরমেশ্বর। এই মায়া যখন পরমেশ্বরের বিশেষণ হইবে, তখন মায়াবিশিষ্ট পরমেশ্বরই হইবেন জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কৃৎ; আর মায়া যখন উপাধি হইবে, তখন পরমেশ্বর হইবেন ঈশ্বরসাক্ষী, 'সর্বভূতান্তরাত্মা', 'সর্বভূতাধিবাসঃ', সর্বকার্যাধ্যক্ষ, সর্বান্তর্যামী অথচ স্বয়মুদাসীন, এইরূপেই ঈশ্বরও ঈশ্বরসাক্ষীর ভেদ বুঝিতে হইবে।

জীব সাক্ষী হইয়া থাকেন।[১] কেহ কেহ অবিদ্যোপাধিক জীবকে সাক্ষী না বলিয়া, অন্তঃকরণোপাধিক জীবকে সাক্ষী বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তির স্থূলমর্ম এই যে, অন্তঃকরণ পুরুষভেদে ভিন্ন ভিন্ন, অন্তঃকরণোপাধিক সাক্ষীও পুরুষভেদে ভিন্ন ভিন্নই হইবে। ফলে, রামের সুখ-দুঃখবোধ আর শ্যামের হইতে পারিবে না। কারণ, রামের অন্তঃকরণ ও শ্যামের অন্তঃকরণতো এক নহে, ভিন্ন। এই অবস্থায় রামীয় অন্তঃকরণে তদুপাধিচৈতন্যের দ্বারা (অর্থাৎ সাক্ষিদ্বারা) সুখের অভিব্যক্তি ঘটিলে, শ্যামের তাহা জানিবার কোনই হেতু নাই। একই সর্বব্যাপিনী অবিদ্যায় উপহিত চৈতন্য সাক্ষী হইলে, সেই ব্যাপিনী অবিদ্যার সহিত রাম, শ্যাম প্রভৃতি সকলের চিত্তের যোগ থাকায়, রামের সুখবোধ শ্যামের উদয় হইতে পারে বলিয়া অবিদ্যোপাধিক চৈতন্যকে সাক্ষী না বলিয়া, অন্তঃকরণোপাধিক জীবকে সাক্ষী বলাই সমধিক যুক্তিসহ।[২]

প্রশ্ন হইতে পারে যে, অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্যকে প্রমাতা বলে। প্রমাতা উদাসীন সাক্ষী হইতে পারে কিরূপে? দ্বিতীয়তঃ সুষুপ্তিতে জীবের প্রমাতৃত্ব থাকে না, সাক্ষিত্ব থাকে। এইরূপে প্রমাতা ও সাক্ষীর বিভেদ সহজেই বুঝা যায়। এই অবস্থায় প্রমাতাকে সাক্ষী বলা চলে না। ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, অন্তঃকরণ যখন চৈতন্যের উপাধি হয়, তখন তাহাকে সাক্ষী বলা হয়; আর বিশেষণ হইলে অন্তঃকরণ বিশিষ্টকে বলে জীব। বিশেষণ এবং উপাধি এক বস্তু নহে, ভিন্ন বস্তু; বিশিষ্ট এবং উপহিতও সুতরাং এক পদার্থ নহে, ভিন্ন পদার্থ।[৩] ইহা আমরা এই প্রবন্ধের আরম্ভে সাক্ষীর লক্ষণ বিচার প্রসঙ্গে পূর্বেই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

১। অবিদ্যোপাধিকো জীব এব সাক্ষাদ্ দ্রষ্টৃত্বাৎ সাক্ষী। লোকেঽপি হ্যকর্তৃত্বে সতি দ্রষ্টৃত্বং সাক্ষিত্বং প্রসিদ্ধম্। তচ্চাসঙ্গোদাসীনপ্রকাশে জীবে এব সাক্ষাৎ সম্ভবতি, জীবস্য অন্তঃকরণতাদাত্ম্যাপত্ত্যা কর্তৃত্বাদ্যারোপভাক্ত্বেঽপি স্বয়মুদাসীনত্বাৎ

সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, সাক্ষিস্বরূপ বিচার। ১৯০ পৃঃ, চৌখাম্বা সং।

২। সত্যং জীব এব সাক্ষী, নতু সর্বগতেনাবিদ্যোপহিতেন রূপেণ·········তস্মাদন্তঃ-করণোপধানেন জীবঃ সাক্ষী।

৩। ন চান্তঃকরণোপহিতস্য প্রমাতৃত্বেন ন তস্য সাক্ষিত্বম্, সুষুপ্তৌ প্রমাত্রভাবেঽপি সাক্ষিসত্ত্বেন তয়োর্ভেদশ্চাবশ্যং বক্তব্য ইতি বাচ্যম্। বিশেষণোপাধ্যোর্ভেদস্য সিদ্ধান্ত-সম্মতত্বেন অন্তঃকরণবিশিষ্টঃ প্রমাতা, তদুপহিতঃ সাক্ষীতি ভেদোপপত্তেঃ।

সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, সাক্ষিস্বরূপবিচার, ১৯৪—১৯৫ পৃঃ চৌখাম্বা সং।

সাক্ষী এক না অনেক, এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই, ঈশ্বর সাক্ষীর উপাধি মায়া এক, ঈশ্বর সাক্ষীও সুতরাং এক, নানা নহে। জীব সাক্ষীর উপাধি অন্তঃকরণ। এই অন্তঃকরণ জীবভেদে বিভিন্ন এবং পরিচ্ছিন্ন; জীব সাক্ষীও সুতরাং নানা এবং পরিচ্ছিন্ন। জীব-সাক্ষীকে এক বলা চলেনা। জীব-সাক্ষীকে এক বলিলে, যখন একটি অন্তঃকরণে সুখ বা দুঃখের উদয় হইবে, জীব-সাক্ষীর একত্ববিধায় সকল অন্তঃকরণেই সেই সুখ বা দুঃখের অভিব্যক্তি হইতে পারে। সাক্ষীকে জীবভেদে বিভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিলে এই দোষ ঘটে না। কারণ, যেই অন্তঃকরণ যেই সাক্ষীর উপাধি হইবে, সেই সাক্ষীর নিকটেই সেই উপাধি-অন্তঃকরণের সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিবিধ ধর্মের ভাতি হইবে, অন্য সাক্ষীর নিকট হইবে না। শ্যামের সুখ-দুঃখ শ্যামই জানিবে, রাম তাহা জানিতে পারিবে না। কেননা, শ্যামের অন্তঃকরণ-উপহিত সাক্ষীর নিকটই শ্যামের সুখ-দুঃখের প্রকাশ ঘটিয়াছে, রামের অন্তঃকরণ-উপহিত সাক্ষীর নিকট তো শ্যামের সুখ-দুঃখের প্রকাশ ঘটে নাই, সুতরাং রাম তাহা জানিবে কিরূপে? এখন কথা এই, জীব-সাক্ষী জীবভেদে নানা হইলেও, ব্রহ্ম তো এক। নানা জীব-সাক্ষীর সহিত এক ব্রহ্মের অভেদ হইবে কিরূপে? ব্যাপক এক ব্রহ্মের সহিত জীব-সাক্ষীর অভেদ স্বীকার করিলে, জীব-সাক্ষীকেও শেষ পর্যন্ত সকল-শরীর ব্যাপী একই বলিতে হয়। ফলে, শ্যামের সুখ-দুঃখের বোধ শ্যামের ন্যায় রামেরও হইতে পারে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, জীব-সাক্ষী জীবভেদে নানা এবং পরিচ্ছিন্ন হইলেও, তাহা ব্যাপক পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। যেমন ঘটাকাশ ঘটভেদে নানা এবং পরিচ্ছিন্ন হইলেও মহাকাশ হইতে ঘটাকাশ ভিন্ন হয় না। সেইরূপ নানা পরিচ্ছিন্ন জীব-সাক্ষীও পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইবে না। কোন একটি ঘটাকাশ ধূলি-মলিন হইলে যেমন সকল ঘটাকাশই ধূলি-মলিন হয় না, সেইরূপ কোনও জীবের অন্তঃকরণে সুখ-দুঃখের উদয় হইলে, সকল জীবের অন্তঃকরণেই সেই ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের বিকাশ হইবার সম্ভাবনা ঘটে না। বস্তুতঃ সাক্ষীর একত্ব ও নানাত্ব উপাধিগত, উপহিত চৈতন্যগত নহে। চৈতন্যাংশে কোনরূপ ভেদ না থাকায়, সাক্ষীর শুদ্ধচৈতন্যাংশের সহিত বিশুদ্ধ ব্রহ্ম

সাক্ষী এক, না অনেক

চৈতন্যের অভেদ হইতে বাধা কি? অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে জীব ও ব্রহ্মের যে অভেদ (জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য) সমর্থিত হইয়াছে, সেই অভেদ সাক্ষীর চৈতন্যের সহিতই বুঝিতে হইবে, অন্তঃকরণবিশিষ্ট সংসারী জীবের সহিত নহে। বেদান্তোক্ত সাক্ষী ব্রহ্মস্বরূপই বটে, ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষীর সহিত ব্রহ্মের অভেদ ব্যাখ্যায় অসঙ্গতির কিছু নাই।

বেদান্তে চারপ্রকার চেতনের পরিচয় পাওয়া যায়—কূটস্থ, জীব, ঈশ্বর ও পরব্রহ্ম। ইহাদের স্বরূপ এবং পরস্পর সম্পর্ক কি, তাহাই এখন আলোচনা করা যাইতেছে। একই আকাশ যেমন (১) ঘটাকাশ (২) জলাকাশ (৩) মেঘাকাশ* ও (৪) মহাকাশ বা মহাব্যোম, এই চারপ্রকারে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, সেইরূপ আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী পরব্রহ্মও উপাধিযোগে কূটস্থ, জীব, ঈশ্বর প্রভৃতি আখ্যা লাভ করেন। বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি অজ্ঞানের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য তাহাকেই 'কূটস্থ' বলা হয়। (ক) যাঁহারা বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জীব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের মতে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের অধিষ্ঠানকে কূটস্থ (চৈতন্য) বলা হইয়া থাকে। (খ) আর, যাঁহারা ব্যষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকে জীব আখ্যা দেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তে ঐ ব্যষ্টি অজ্ঞানের যে অধিষ্ঠান-চৈতন্য তাহাকে 'কূটস্থ' বলে। এই কূটস্থ অজ। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে যেমন 'চিদাভাস' উৎপন্ন হয়,[১] কূটস্থ সেইরূপ উৎপন্ন হয় না। ইহা ব্রহ্মস্বরূপ, তবে ইহা ঘটাকাশ, ব্রহ্ম মহাকাশ। ঘটাকাশ যেমন মহাকাশ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন হয় না, মহাকাশস্বরূপই হয়, কূটস্থও সেইরূপ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, পরব্রহ্মস্বরূপই বটে। কূটশব্দের অর্থ মিথ্যাবুদ্ধি বা চিদাভাস, তাহাদের মধ্যে নির্বিকার অসঙ্গরূপে যে চৈতন্য অবস্থান করে,

জীব, ঈশ্বর কূটস্থ পরব্রহ্ম ইহাদের পরস্পর সম্পর্ক

কূটস্থ

* ঘট মধ্যস্থিত জলে আকাশের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাকে 'জলাকাশ' বলে। মেঘের অন্তর্বর্তী জলকণায় আকাশের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাকে বলে 'মেঘাকাশ'।

১। চিদাভাসকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলার তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মে ভ্রান্তি প্রভৃতি নাই, কিন্তু চিদাভাসে অর্থাৎ জীবে ভ্রান্তি প্রভৃতি আছে। পরব্রহ্মে যেমন ভ্রান্তি নাই, কূটস্থেও সেইরূপ ভ্রান্তি প্রভৃতির সম্ভাবনা নাই।

তাহাকেই 'কূটস্থ' বলা হইয়া থাকে। এইরূপ অসঙ্গ কূটস্থ যে পরব্রহ্মস্বরূপই হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? এই কূটস্থেরই অপর নাম জীবসাক্ষী বা প্রত্যগাত্মা।* 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাক্যের 'ত্বম্' বা 'আত্মা' পদে এই কূটস্থকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। এই কূটস্থই 'ত্বম্' প্রভৃতি পদের লক্ষ্যার্থ, আর জীব বাচ্যার্থ বলিয়া জানিবে। জীব বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত চিদাভাস এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠান চৈতন্য, এই উভয়কেই একযোগে জীব আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। সহজ কথায় বিম্বরূপ কূটস্থের প্রতিবিম্ব বা আভাসই জীব। এই জীব 'জলাকাশ'তুল্য। ঘটাকাশসহ ঘট মধ্যস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত আকাশকে যেমন জলাকাশ বলে, সেইরূপ কূটস্থের সহিত বুদ্ধির চিদাভাসকে জীব বলে। "যেমন বৃহৎ রক্তবর্ণ পুষ্পোপরি স্থাপিত শ্বেতবর্ণ স্ফটিকে ঐ পুষ্পের রক্তিমা প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ কূটস্থের আশ্রিত যে বুদ্ধি, তাহার মধ্যে কূটস্থের প্রকাশ-স্বরূপতার প্রতিফলন দেখা যায়।" এই প্রতিফলনই কূটস্থের জীবভাব। স্ফটিক যেমন অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল, সেইরূপ অবিদ্যার সত্ত্ব-গুণকার্য বুদ্ধিও অতিশয় স্বচ্ছ এবং শুদ্ধ। ঐরূপ স্বচ্ছ শুভ্র বুদ্ধিতে কূটস্থের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই চিদাভাস বা জীব আখ্যা লাভ করে। কোন কোন অদ্বৈতবেদান্তীর মতে জীব ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব। যেমন ঘট মধ্যবর্তী জলে মহাকাশেরই প্রতিবিম্ব পড়ে, ঘটমধ্যস্থ আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে না। কারণ, জলে যতদূর গভীরতা অনুভূত হয়; ততদূর গভীরতা ঘটমধ্যস্থ আকাশে থাকে না,

* প্রতীপং দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিপরীতম্ অঞ্চতি গচ্ছতীতি প্রত্যক্; প্রত্যক্ চাসৌ আত্মা চেতি প্রত্যগাত্মা।

আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড় বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়াই লোকে জানে। জড়ের বিপরীত পথেই আত্মা গমন করে। অজড় বা জড়বিরুদ্ধরূপেই চিন্ময় আত্মা প্রকাশিত হয়। এইজন্যই জড় দেহ প্রভৃতির অন্তরচারী আত্মাকে প্রত্যগাত্মা বলা হইয়া থাকে। অশক্যনির্বচনীয়েভ্যো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্য আত্মানং প্রতীপম্ অঞ্চতি জানাতীতি প্রত্যক্, স চ আত্মা প্রত্যগাত্মা।

অধ্যাসভাষ্য-ভামতী।

প্রাতিলোম্যেন অসজ্জড়দুঃখাত্মকাহঙ্কারাদি বিলক্ষণতয়া
সচ্চিৎসুখাত্মকত্বেন অঞ্চতি প্রকাশত ইতি প্রত্যক্।

ভাষ্য রত্ন-প্রভা।

থাকিতে পারে না। সুতরাং ঘটের জলে আকাশের ঐ প্রতিবিম্বকে ঘটের বহির্দেশে বিরাজমান মহাকাশের প্রতিবিম্ব বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। ঘটের জলে মহাকাশের প্রতিবিম্ব যেমন সম্ভবপর, সেইরূপ সত্ত্বগুণময় স্বচ্ছবুদ্ধিতে সর্বব্যাপী ব্রহ্ম-চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়াও সম্ভবপর এবং সেই প্রতিবিম্বই জীব। যদিও বুদ্ধিগত চিদাভাস এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠান কূটস্থচৈতন্য, এই উভয়কে জীব বলা হইয়া থাকে, তথাপি জীবের কর্মফল সুখ, দুঃখ, পাপপুণ্য প্রভৃতি বুদ্ধিগত চিদাভাসই ভোগ করে, পরলোক বা ইহলোকে গমনাগমন প্রভৃতিও চিদাভাসই করিয়া থাকে, কূটস্থ করে না। কারণ, কূটস্থ সদা অসঙ্গ এবং নির্বিকার। তাঁহার সহিত কর্মফল-ভোগের, পরলোক ইহলোকে গতাগতি প্রভৃতির কোনরূপ সম্পর্ক নাই। ভ্রান্তিবশতঃই কূটস্থকে কর্মফলভুক্ সংসারী বলিয়া মনে হয়। নিষ্ক্রিয় এবং স্বতঃ অসঙ্গ, কূটস্থের কর্মফল ভোগপ্রভৃতির সম্ভাবনা কোথায়? সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের ধর্ম। এই অবস্থায় সুখ-দুঃখ ভোগ প্রভৃতি যেই বুদ্ধির উহারা ধর্ম, সেই বুদ্ধির হওয়াই স্বাভাবিক। কোনরূপ ভোগই উদাসীন কূটস্থের হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে বুদ্ধির সহিত কূটস্থের ঘনিষ্ঠ আধ্যাসিক সম্বন্ধ আছে বলিয়া, কূটস্থে কর্মফল-ভোগ প্রভৃতি ভ্রান্তিবশতঃ কল্পিত হইয়া থাকে এইমাত্র। ফলে, কূটস্থও সুখদুঃখফলভুক্ বলিয়া মনে হয়। যেমন জলপূর্ণ ঘটকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে আনয়ন করিলে, ঘটমধ্যস্থ জলে প্রতিবিম্বিত আকাশও অর্থাৎ আকাশের আভাসও ঘটের সহিত গমনাগমন করে বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ কামনা ও কর্মরূপ জলে পরিপূর্ণ বুদ্ধিরূপ ঘট পাপ-পুণ্য সুখ-দুঃখ প্রভৃতির একমাত্র আশ্রয় হইলেও, সেই বুদ্ধির সহিত অন্তরঙ্গ-সম্বন্ধবশতঃ কূটস্থও সুখদুঃখময় বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের কূটস্থ চৈতন্যই বিম্ব বটে। এই বিম্ব বস্তুতঃ কূটস্থ হইলেও, বুদ্ধির ধর্ম সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসে যেমন অজ্ঞানবশতঃ কল্পিত হইয়া থাকে, কূটস্থেও সেইরূপ ভ্রান্তিবশতঃ কল্পিত হইয়া থাকে। ফলে, কূটস্থ এবং জীব, সাক্ষী চিৎ এবং চিদাভাস, এই উভয়ই সুখদুঃখভুক্ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। চিৎ এবং চিদাভাস, কূটস্থ এবং জীব ইহাদের সহিত বুদ্ধির ধর্ম সুখ-দুঃখ, পুণ্যাপুণ্য প্রভৃতির ফলভোগের কোনই বাস্তব সম্পর্ক নাই।

বুদ্ধিগত চিদাভাস এবং ঐ ব্যষ্টিবুদ্ধির অধিষ্ঠান কূটস্থচৈতন্য, এই উভয়ই একযোগে **জীব** আখ্যা লাভ করিলেও, সুষুপ্তি-অভিমানী 'প্রাজ্ঞ' জীবকে আর জীব বলা চলে না। কারণ, সুষুপ্তি অবস্থায় বুদ্ধির বিলয় ঘটে। ফলে, বুদ্ধিগত চিদাভাস, অর্থাৎ বুদ্ধিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব তখন অসম্ভব হইয়া পড়ে। বুদ্ধিদর্পণ না থাকিলে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়িবে কোথায়? এইজন্য কেহ কেহ বুদ্ধিগত চিদাভাসকে জীব না বলিয়া, ব্যষ্টি অজ্ঞানে[১] চৈতন্যের যে আভাস বা প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই চিদাভাসকে এবং ব্যষ্টি অজ্ঞানের অধিষ্ঠান কূটস্থ চিৎকে, এই উভয়কেই জীব-সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। এইরূপে জীবের লক্ষণ নিরূপণ করিলে, সুষুপ্ত্যভিমানী জীবকেও জীব বলিতে কোন বাধা নাই। সুষুপ্তিকালে অজ্ঞান বর্তমান থাকে। সুষুপ্তিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব সহিত অজ্ঞানের যে অংশটি বুদ্ধির রূপ প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানের সেই অংশে চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব, তাহাও সেই সঙ্গে বুদ্ধিতে উপহিত হইয়া থাকে। এইজন্য 'প্রাজ্ঞে'র উপাধি হয় ব্যষ্টি অজ্ঞান, আর জীবের উপাধি হয় ব্যষ্টি অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি। এইভাবে জীবত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলেও তাহাতে বিরোধের কোন আশঙ্কা ঘটে না। কারণ, ব্যষ্টি অজ্ঞানই বুদ্ধির রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়া, জীবের উপাধিও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ব্যষ্টি অজ্ঞানই বটে।

ঈশ্বর

ঈশ্বর কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়ায় চৈতন্যের যে ছায়া বা প্রতিবিম্ব এবং মায়ার অধিষ্ঠান চৈতন্য, এই দুইকেই মিলিতভাবে ঈশ্বর বলা হইয়া থাকে। ঈশ্বর সর্বান্তর্যামী। সকল জীবের অন্তরে ঈশ্বরই কর্মপ্রেরণা প্রদান করেন। ঈশ্বরের কোন আবরণ নাই, তিনি নিরাবরণ; এইজন্য তিনি সদাই মুক্ত। নিত্য মুক্তবিধায়, ঈশ্বরের জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি বন্ধন-সংস্পর্শ নাই। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। নিখিল বিশ্বই তিনি করামলকবৎ প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে পান। সর্ববিষয়েই তাঁহার জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি অপ্রতিহত। সত্ত্বগুণ প্রকাশস্বভাবই হয়। যেখানে প্রকাশ থাকে, সেখানে আবরণের অন্ধকার থাকিতে পারে না। এইজন্য ঈশ্বরেরও নিজের স্বরূপ-সম্পর্কে কিংবা জীব, জগৎ প্রভৃতি সম্পর্কে কোনরূপ আবরণ নাই। কেননা, যে জীবরূপ-আভাসে আবরণ আছে, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন তাহাতেই আছে, ঈশ্বরের স্বরূপে বা পররূপে

১। অজ্ঞানের খণ্ড অংশকে ব্যষ্টি অজ্ঞান এবং সমগ্র অজ্ঞানকে সমষ্টি অজ্ঞান বলে।

কোনই আবরণ নাই। ঈশ্বর নিত্যমুক্ত। তাঁহাতে বন্ধন থাকিবে কিরূপে ? মলিন-সত্ত্বপ্রধান ব্যষ্টি অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চিদাভাসই জীব। অবিদ্যায় রজঃ এবং তমোগুণের আধিক্য থাকায়, রজঃ এবং তমোগুণদ্বারা সত্ত্বগুণ অভিভূত হওয়ায়, অবিদ্যাস্থসত্ত্বকে মলিনসত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। রজঃ এবং তমোগুণের আধিক্য বশতঃ অবিদ্যা অজ্ঞান আখ্যা লাভ করে, এবং অবিদ্যায় চৈতন্যের যে আভাস বা প্রতিবিম্ব পড়ে (যাহাকে জীব বলা হইয়া থাকে), তাঁহার স্বরূপকে অবিদ্যা আবৃত করে। ফলে, জীবে আবরণ থাকায় জীব হয় বদ্ধ, আর শুদ্ধসত্ত্বে আবরণ থাকে না বলিয়া, ঈশ্বর হয় সদামুক্ত। যদিও অবিদ্যা, অজ্ঞান এবং মায়া অদ্বৈতবেদান্তে একই বস্তু, তথাপি উহাদের প্রকৃতিতে যে সত্ত্ব-রজঃ এবং তমোগুণ পরস্পর মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান থাকে, সেই গুণের আধিক্যবশতঃ মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞানের মধ্যে একটা ভেদ কেহ কেহ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করেন। শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটিলে সেক্ষেত্রে মায়াশব্দের প্রয়োগ করা হয়; মলিন সত্ত্বগুণের অর্থাৎ রজঃ এবং তমোগুণের প্রাধান্য ঘটিলে এবং তাহা দ্বারা সত্ত্বগুণ অভিভূত হইলে, সেখানে অবিদ্যা বা অজ্ঞান শব্দের ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ঈশ্বরের উপাধি মায়াকে শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও, বস্তুতঃ ঐ সত্ত্বগুণও রজঃ, তমঃ বর্জিত নহে। তবে সেক্ষেত্রে প্রকাশস্বভাব সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকায়, রজঃ এবং তমোগুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে, রজঃ এবং তমোগুণ সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিতে পারে না। ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা প্রকৃতির উপাদান সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ এমনভাবে পরস্পর মিশ্রিত থাকে যে, তাহাদিগকে একেবারে পৃথক্ করা যায় না। কেবল কোনও গুণের আধিক্যনিবন্ধন, সেই গুণের উল্লেখ করা হইয়া থাকে এইমাত্র। ইহা দ্বারা অভিভূত অপর দুইটি গুণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। শাস্ত্রে দেব-দেহকে যে সত্ত্বগুণাত্মক বলা হইয়া থাকে, তাহাও অবিমিশ্র (রজঃ এবং তমঃ বর্জিত) সত্ত্বগুণ নহে; রজস্তমোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য নিবন্ধন দেব-দেহে রজঃ এবং তমোগুণ অভিভূত অবস্থায় বর্তমান থাকে। এইজন্যই দেব-দেহের কল্পনায় বিভিন্নগুণের প্রাধান্য বশতঃ একই পরমেশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।[১]

১। (ক) স চ পরমেশ্বর একোঽপি স্বোপাধিভূতমায়ানিষ্ঠসত্ত্বরজস্তমোগুণভেদেন ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদিশব্দবাচ্যতাং ভজতে। বেদান্ত পরিভাষা, বিষয় পরিচ্ছেদ।

অবশ্য বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীভগবানের দেহকে যে শুদ্ধসত্ত্বগুণাত্মক বলা হইয়াছে, ঐ গুণকে বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা মায়া বা প্রকৃতির গুণ বলেন না। ঐ শুদ্ধসত্ত্বগুণকে শ্রীভগবানের স্বরূপান্তর্গত শক্তিবিশেষ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ঐরূপ শুদ্ধসত্ত্বে রজঃ এবং তমের লেশমাত্রও নাই।

সত্ত্বপ্রধানা মায়ায় চিদাভাস, যাহাকে ঈশ্বরনামে অভিহিত করা হইয়া থাকে, তাহাই তত্ত্বমসি প্রভৃতি বেদান্তবাক্যোক্ত 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ; আর মায়াধিষ্ঠান শুদ্ধ চৈতন্যই তৎপদের লক্ষ্যার্থ বলিয়া জানিবে। ভগবদৈশ্বর্য আভাসেই বিদ্যমান, চৈতন্যে নহে। চৈতন্য সদা একরূপ, আকাশের ন্যায় অসঙ্গ এবং কূটস্থ। বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি, বিলয় প্রভৃতিও মায়ায় চিদাভাসেরই ক্রিয়া, সর্বপ্রকার সঙ্গরহিত (অধিষ্ঠান) চৈতন্যের নহে। মায়ায় চিদাভাস মিথ্যা, ঈশ্বরও সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে মিথ্যা, সত্য নহে। আকাশের ন্যায় ভূমা চৈতন্যই একমাত্র সত্য বস্তু।

ব্রহ্ম মহাকাশ-স্থানীয়

যিনি মহাকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, বিশ্বের অন্তরে বাহিরে বিরাজ করেন, এইরূপে বিশ্বানুগ হইয়াও যিনি বিশ্বাতিগ, যিনি সদা পূর্ণ, স্বপ্রকাশ, যাহা হইতে নিখিল জীব জগৎ প্রকাশিত হয়, তিনি কাহারও নিকটেও নহেন, দূরেও নহেন। তিনি সর্বোপাধি বিবর্জিত, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা।[১] এই ব্রহ্মই সত্য। জীবই বল, আর ঈশ্বরই বল, সবই ছায়া, সবই মায়া। জগতের এই খেলার ঘরে জীবরূপ আভাস কর্ম করে। ঈশ্বররূপ আভাস কর্মী জীবকে কর্মানুরূপ ফল দান করেন। এইসব ছায়ায় কায়ারূপী চৈতন্য সম্পূর্ণ অসঙ্গভাবে ছায়ার অন্তরে বিরাজ করে, ছায়ার প্রকাশে সহায়তা করে। ছায়াই কর্মী, ছায়াই ফলদাতা, এই ছায়াকে আশ্রয় করিয়া কর্ম ও উপাসনার প্রতিপাদক শাস্ত্ররাজি এবং ভেদবাদ সার্থকতা লাভ করে। চৈতন্যাংশে জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ভেদ কেবল আভাসাংশে। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে

(খ) অথ যোহ খলু বাবাস্য রাজসোহংশোঽসৌ স যোঽয়ং ব্রহ্মা, অথ যোহখলু বাবাস্য তামসোঽংশোঽসৌ স যোঽয়ং রুদ্রঃ, অথ যোহখলু বাবাস্য সাত্ত্বিকোঽংশোঽসৌ স যোঽয়ং বিষ্ণুঃ।" মৈত্রেয়ী উপনিষৎ।

১। পরব্রহ্মের বিস্তৃত বিবরণ প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

ভেদ ও অভেদবাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বেদের কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড এই উভয়ের প্রামাণ্যে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না। ব্রহ্ম বিরাট্ জ্ঞানপারাবার। জীব ঐ ব্রহ্ম-পারাবারের বিভিন্ন লহরী, ঈশ্বর জলাবর্ত। জলাবর্ত বা লহরী জলভিন্ন অন্যকিছু নহে; জলেরই একপ্রকার অভিব্যক্তি। জলকে ছাড়িয়া ঐ অভিব্যক্তির কোনই সত্যতা নাই। জীব ও ঈশ্বর কূটস্থ বা পরব্রহ্মেরই বিচিত্র বিকাশ। কূটস্থ পরব্রহ্ম কায়া, জীব ও ঈশ্বর ঐ কায়ারই ছায়া। এই ছায়া কায়াকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। কায়ার সত্যতা ব্যতীত ছায়ার কোন সত্যতাও নাই। জীব এবং ঈশ্বরের সত্যতা সুতরাং ইহাদের অধিষ্ঠান চৈতন্যের সত্যতারই সোপাধিক অভিব্যক্তি। চৈতন্যাংশে ছায়া কায়া সবই একাকার। ভেদের লেশমাত্রও সেখানে নাই। ভেদ কেবল ছায়ারূপে। মিথ্যা ছায়াকে ছাড়িয়া মূল কায়ার সন্ধানই অদ্বৈতবেদান্তের লক্ষ্য। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাক্য সেই লক্ষ্যেরই ইঙ্গিত করে। যাঁহার গুরু আছে, শাস্ত্র আছে, সাধনা আছে, সেইরূপ ভাগ্যবান্ জীবই শুধু ঐ ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন। অজ্ঞানান্ধ জীব তাহা বোঝে না, অবিদ্যার কুহকে পড়িয়া কামেরই দাসত্ব করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সৃষ্টি ও স্রষ্টা

অজ্ঞানী জীব ভঙ্গুর পার্থিব সুখকেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা জানিয়া জগল্লক্ষ্মীর কোমল অঙ্কে সুখের উৎসের সন্ধান করে। জ্ঞানী জানেন, শ্যামলা এই প্রকৃতি সত্য নহে, পার্থিব সুখভোগও শাশ্বত নহে। রূপ-রসময়ী এই সুন্দরী ধরিত্রী মিথ্যা। গিরিকিরীটিনী মোহিনী এই ধরণী কিভাবে রূপায়িত হইল ? এই সৃষ্টি-লীলানাটকের মহানট কে ? এই প্রশ্ন স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষের চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছে। কেবল সাধারণ পর্যায়ের মানুষই নহে ; সত্যদ্রষ্টা ঋষিও বিস্ময়বিজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছেন—

"কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ" ?

ভারতীয় মনীষা বেদবারিধির বেলাভূমি হইতে দর্শন ও বিজ্ঞান-গিরির তুঙ্গশৃঙ্গে বিচরণ করিয়াও এই সর্বজনীন প্রশ্নের সমাধান খুঁজিয়াছে ; এবং নানা বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে ঐ সকল সিদ্ধান্তের সার সংকলন করতঃ সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনে বেদান্তের স্থান কোথায়, তাহা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

নাস্তিক ও আস্তিক এই দ্বিবিধ ভারতীয় দার্শনিকের মধ্যে নাস্তিক শিরোমণি চার্বাক কোনরূপ নিমিত্ত বা কারণ ব্যতিরেকেই ভাবপদার্থের উৎপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। চার্বাকের এই মত মহামুনি গৌতম তাঁহার ন্যায়সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

"অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিবৎ।" ন্যায়সূত্র, ৪।১।২২।

আলোচ্য সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, কণ্টকের তীক্ষ্ণতা, পার্বত্য ধাতুসমূহের বর্ণবৈচিত্র্য, শিলাখণ্ডের কাঠিন্য প্রভৃতি যেমন কোনরূপ নিমিত্ত ব্যতীতই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ বিচিত্ররূপে রূপায়িত বিভিন্ন জগৎপ্রপঞ্চও নিমিত্ত ব্যতিরেকেই উৎপন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।[১]

১। অনিমিত্তা রচনাবিশেষাঃ শরীরাদয়ঃ সংস্থানবত্ত্বাৎ কণ্টকাদিবদিতি।

ন্যায় বার্তিক, ৪।১।২২ সূঃ।

এই শ্রেণির নাস্তিক মতবাদেরও প্রাচীনতা অনস্বীকার্য। উপনিষৎ প্রভৃতিতেও এই সকল মতবাদের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনরূপ কারণের অপেক্ষা না রাখিয়া কার্য 'অকস্মাৎ' জন্মলাভ করে, জগতের সৃষ্টি এবং লয় অকারণে ঘটিয়া থাকে, এইরূপ 'অনিমিত্তবাদ' বা 'অকারণবাদ'ই 'আকস্মিক' বা 'যদৃচ্ছাবাদ' নামে প্রাচীন উপনিষৎ প্রভৃতিতে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে—

আকস্মিকবাদ

"কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা," শ্বেতাশ্ব, ১।২।

এইশ্লোকে 'কালবাদ,' 'স্বভাববাদ' ও 'নিয়তিবাদের' সহিত যদৃচ্ছাবাদেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচ্য শ্বেতাশ্বতরোক্তির শঙ্করভাষ্য এবং শঙ্করানন্দকৃত দীপিকা আলোচনা করিলে, 'যদৃচ্ছাবাদ' যে পূর্বোক্ত আকস্মিক-বাদেরই নামান্তর, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়।[১] সুশ্রুতসংহিতাতেও স্বভাববাদ, ঈশ্বরবাদ, কালবাদ, যদৃচ্ছাবাদ, নিয়তিবাদ ও পরিণামবাদের উল্লেখ দেখা যায়।

স্বভাবমীশ্বরং কালং যদৃচ্ছাং নিয়তিস্তথা।
পরিণামঞ্চ মন্যন্তে প্রকৃতিং পৃথুদর্শিনঃ॥

সুশ্রুত সংহিতা, শারীরস্থান, ১।১১।৩।

সুশ্রুতসংহিতার প্রাচীন টীকাকার ডল্লনাচার্য এখানে 'যদৃচ্ছাবাদ' বলিতে আকস্মিকবাদ বোঝেন নাই। ডল্লনাচার্য 'যদৃচ্ছাবাদে'র অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে যদৃচ্ছাবাদীর সিদ্ধান্তেও কার্যমাত্রেরই

১। (ক) কালো নাম সর্বভূতানাং বিপরিণামহেতুঃ। স্বভাবো নাম পদার্থানাং প্রতিনিয়তা শক্তিঃ, অগ্নেরৌষ্ণ্যমিব। নিয়তিরবিষমপুণ্যপাপলক্ষণং কর্ম। যদৃচ্ছা চাকস্মিকী প্রাপ্তিঃ।

শ্বেতাশ্বতর, শং ভাষ্য।

(খ) কালো নিমেষাদি পরার্ধান্তপ্রত্যয়োৎপাদকো ভূতো বর্তমান আগামীতি ব্যবহ্রিয়মাণো জনৈঃ। স্বভাবঃ স্বস্য তত্তৎপদার্থস্য ভাবোঽসাধারণকার্যকারিত্বম্, যথাগ্নের্দাহাদিকারিত্বমপাং নিম্নদেশগমনাদি। নিয়তিঃ সর্বপদার্থেষ্বনুগতাকার-বন্নিয়মনশক্তিঃ। যথা ঋতুষ্বেবযোষিতাং গর্ভধারণম্, ইন্দুদয়ে সমুদ্রবৃদ্ধিরিত্যাদি। যদৃচ্ছা কাকতালীয়ন্যায়েন সংবাদকারিণী কাচ শক্তিঃ।

শ্বেতাশ্বতর, শংকরানন্দকৃত দীপিকা।

নিমিত্ত অবশ্য স্বীকার্য। কোন কার্যই নিমিত্তশূন্য (নির্নিমিত্তক) নহে।[১] ডল্লনাচার্য পূর্বোক্ত স্বভাববাদ প্রভৃতি সমস্ত মতবাদকেই আয়ুর্বেদের মত বলিয়া গ্রহণ করিয়া, সুশ্রুতসংহিতা হইতেই ঐ সমস্ত মতের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী টীকাকার জেজ্জট ও গয়দাসের ব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন। জেজ্জটের মতে ঈশ্বর ব্যতীত স্বভাব, কাল, যদৃচ্ছা প্রভৃতি সমস্তই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণাম। স্বভাব, কাল প্রভৃতি ত্রিগুণময়ী মূলপ্রকৃতি হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। এইজন্য আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্তে স্বভাব প্রভৃতিকে জগতের মূল কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে, প্রকারান্তরে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। গয়দাসের মত যতদূর জানা যায় তাহাতেও দেখা যায়, গয়দাস সুশ্রুতোক্ত স্বভাব, ঈশ্বর, কাল প্রভৃতিকেই জগতের কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষ শুধু এই যে, স্বভাব প্রভৃতি প্রথমোক্ত পাঁচটি গয়দাসের মতে জগতের নিমিত্তকারণ, এবং গুণময়ী প্রকৃতি গুণময়বিশ্বের উপাদান কারণ। সুশ্রুতোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলেও, যদৃচ্ছাবাদের বিবরণে যদৃচ্ছাবাদীরাও কার্যের নিয়ত কারণ স্বীকার করেন বলিয়া যে অভিমত ডল্লনাচার্য তাঁহার টীকায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা কোন-মতেই অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের মতে 'যদৃচ্ছাবাদ' 'আকস্মিকবাদের'ই নামান্তরমাত্র। কোনরূপ নিয়তকারণকে অপেক্ষা না করিয়া কার্য যেক্ষেত্রে স্বয়ংই উৎপন্ন হয়, তাহাই 'আকস্মিকবাদ' বলিয়া পরিচিত। 'যদৃচ্ছা'বাদের দ্বারাও ঐরূপ অর্থই বুঝা যায়। ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ৩১শ সূত্রে ন্যায়গুরু গৌতমও 'অকস্মাৎ' অর্থে 'যদৃচ্ছা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। আকস্মিক অর্থে যদৃচ্ছাশব্দের প্রয়োগ অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের ৩৩শ সূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যের টীকা ভামতীতে বাচস্পতি মিশ্রের 'যদৃচ্ছয়া স্বভাবাদ্বা' এই উক্তির ব্যাখ্যায় আচার্য অমলানন্দ স্বামী তাঁহার কল্পতরু টীকায় যদৃচ্ছা শব্দের আকস্মিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। যদৃচ্ছা এবং স্বভাব যে ভিন্নপদার্থ তাহাও অমলানন্দ স্বামী কল্পতরুতে স্পষ্টতঃ

১। যো যতো ভবতি তৎতন্নিমিত্তমিতি যাদৃচ্ছিকাঃ। যথা তৃণারণিনিমিত্তো বহ্নিরিতি।
সুশ্রুতসংহিতা—শারীরস্থান ১।১১, ডল্লনাচার্যকৃত টীকা।

উল্লেখ করিয়াছেন।[১] শ্বেতাশ্বতরের উক্তিতেও স্বভাব এবং যদৃচ্ছার পৃথক্ উল্লেখই দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, স্বভাববাদ সমর্থনের জন্য স্বভাববাদীরাও যদৃচ্ছাবাদীর কণ্টকের তীক্ষ্ণতাকেই দৃষ্টান্ত হিসাবে উপন্যাস করিয়াছেন। ডল্লনাচার্য স্বভাববাদের ব্যাখ্যায় তদীয় টীকায় লিখিয়াছেন—

"কঃ কণ্টকানাং প্রকরোতি তৈক্ষ্ণ্যং চিত্রং বিচিত্রং মৃগপক্ষিণাঞ্চ।
মাধুর্যমিক্ষৌ কটুতা মরীচে, স্বভাবতঃ সর্বমিদং প্রবৃত্তম্॥"

সুশ্রুতসংহিতা, শারীর স্থান, ডল্লনকৃতটীকা ১।১১।

"কে কাঁটাকে তীক্ষ্ণাগ্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে? মৃগ ও খগকুলের চিত্র-বিচিত্র তনু কাহার সৃষ্টি? ইক্ষুকে মধুর ও মরীচকে কটু কে করিয়াছে? স্বভাববশতঃ ঐ সকল ঐরূপ হইয়াছে।" ডল্লনাচার্যের অনুরূপ উক্তি আমরা অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতেও দেখিতে পাই।[২] জৈনপণ্ডিত নেমিচন্দ্রের প্রাকৃত-ভাষায় লিখিত 'গোম্মটসার' নামক গ্রন্থেও 'স্বভাববাদে'র ব্যাখ্যায় এইরূপ কথাই শুনা যায়।[৩] ফলে, ন্যায়সূত্রোক্ত অনিমিত্তবাদ যে স্বভাববাদেরই নামান্তর তাহা সহজেই বুঝা যায়। কার্যের কোন নিয়ত কারণ নাই; অকারণে অনিয়মেই কার্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ মতই 'আকস্মিকবাদ' বলিয়া পরিচিত, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই আকস্মিকবাদের সহিত আলোচ্য স্বভাববাদেরও মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। উদয়নাচার্য তাঁহার 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থের প্রথম স্তবকের চতুর্থ কারিকায় 'সাপেক্ষত্বাৎ' এই উক্তি দ্বারা কারণ-সাপেক্ষ কার্যই জন্মলাভ করে, অকারণে বা অকস্মাৎ কোন কার্য কদাচ জন্মে না, এই সত্যই প্রকাশ করিয়াছেন। পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ সকলই কার্য-কারণের

১। নিয়ত নিমিত্তমনপেক্ষ্য যদা কদাচিৎ প্রবৃত্ত্যুদয়ো যদৃচ্ছা,
স্বভাবস্তু স এব যাবদ্‌বস্তুভাবী যথা শ্বাসাদৌ।
বেদান্তকল্পতরু, ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩।

২। কঃ কণ্টকস্য প্রকরোতি তৈক্ষ্ণ্যং বিচিত্রভাবং মৃগপক্ষিণাং বা।
স্বভাবতঃ সর্বমিদং প্রবৃত্তং ন কামকারোঽস্তি কুতঃ প্রযত্নঃ॥
অশ্বঘোষরচিত বুদ্ধচরিত, ৫২।

৩। কো করই কণ্টয়াণং তীক্খওং মিগ্‌বিহংগমাদীণং।
বিবিহত্তং তু সহাও ইদি সব্বং প্রিয় সহাওত্তি॥
নেমিচন্দ্রকৃত গোম্মটসার, ৮৮৩ শ্লোক।

নিগূঢ় পাশে আবদ্ধ। অকস্মাৎ বা অকারণে কার্যোৎপত্তির সম্ভাবনা কোথায়? (ক) 'অকস্মাদেব ভবতি' এই বাক্যের দ্বারা কার্যের হেতুর নিষেধ হইতে পারে, অর্থাৎ কার্যের কিছুমাত্র কারণ নাই, ইহাও বলা যায় না। (খ) কার্যের 'ভূতি' অর্থাৎ উৎপত্তিই হয় না, ইহাও বলা যায় না। (গ) কার্য নিজেই নিজের কারণ, কার্যের অতিরিক্ত কোন কারণ নাই, ইহাও বলা যায় না। (ঘ) এবং কোন 'অনুপাখ্য' অলীক পদার্থই কার্যের কারণ, কার্যের বাস্তব কোন কারণ নাই, ইহাও বলা যায় না। অর্থাৎ 'অকস্মাদেব ভবতি' এই বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্তরূপ চতুর্বিধমতের কোন মতই সংস্থাপন করা যায় না"।[১] "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র প্রথম স্তবকের পঞ্চম কারিকায় আচার্য উদয়ন 'আকস্মিকবাদে'র ন্যায় 'স্বভাববাদে'রও খণ্ডন করিয়াছেন। 'স্বভাববর্ণনা নৈবম্' অর্থাৎ স্বভাব হইতেই কার্য জন্মে ইহাও বলা যায় না, আচার্যের এই উক্তি অতি স্পষ্ট। কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা উল্লঙ্ঘন করিয়া, আকস্মিকবাদী—'অকস্মাদেব ভবতি ন কিঞ্চিদপেক্ষ্য কার্যম্'—কার্য অকস্মাৎই জন্মে, অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখে না, এইরূপ যে সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, তাহা আচার্য উদয়ন কার্যমাত্রই কারণসাপেক্ষ (সাপেক্ষত্বাৎ) এই যুক্তিবলে খণ্ডন করিয়াছেন। কার্য সর্বকালীন নহে। কার্য কখনও আছে, কখনও নাই। কারণ থাকিলেই কার্য জন্মে, কারণ না থাকিলে কার্য জন্মে না। এই কার্য-কারণ-পাশ সুদৃঢ়। এইরূপ দৃঢ়পাশে জাগতিক বস্তুসকল আবদ্ধ বলিয়াই যখন তখন বা অকস্মাৎ কোন কার্যই জন্মিতে পারে না। এই শৃঙ্খলা অস্বীকার করিলে কার্যের উৎপত্তির কোনরূপ নিয়ম থাকে না। কার্য কখন হয়, কখন হয় না, তাহাও ব্যাখ্যা করা যায় না। সর্বদাই অনিয়মে কার্যের উৎপত্তি অনিবার্য হইয়া পড়ে। এই কারণেই 'আকস্মিক বাদ' গ্রহণ করা চলে না। স্বভাববাদীরা উদয়নাচার্যের উল্লিখিত আপত্তির খণ্ডনে বলেন, কার্যের আকস্মিক উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার করা চলে না; তবে, বস্তুর 'স্বভাব' বলিয়া যে একটি পদার্থ আছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কার্য কোন নিয়ত দেশে নিয়ত কালেই উৎপন্ন হয়, সর্বদেশে সর্বকালে উৎপন্ন হয় না। ইহার কারণ কি? বস্তুর স্বভাবই ইহার নিয়ামক নহে কি? এখানে লক্ষ্য করা

১। হেতুভূতনিষেধো ন স্বানুপাখ্যবিধির্ন চ।
স্বভাববর্ণনা নৈবমবধের্নিয়তত্বতঃ॥
ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ১ স্তবক, ৫ম কারিকা।

আবশ্যক যে, আকস্মিকবাদীরা 'অকস্মাদেব ভবতি', কার্য কারণনিরপেক্ষ হইয়া অকস্মাৎই জন্মলাভ করে, এইরূপে স্বীয় মত ব্যাখ্যা করিয়া কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মকেই অস্বীকার করিয়াছেন। স্বভাববাদীরা কার্য-কারণপাশ অচ্ছেদ্য বুঝিয়া তাহা উড়াইয়া দেন নাই। বস্তুর স্বভাবকে বস্তুর উৎপত্তির কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এখন এই স্বভাব পদার্থটি কি তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। ন্যায়কুসুমাঞ্জলির টীকাকার বরদরাজ এবং বর্ধমান উপাধ্যায় তাঁহাদের টীকায় স্বভাববাদীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্বভাববাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[১] মাধবাচার্যও 'সর্বদর্শন সংগ্রহে' চার্বাকমতে ব্যাখ্যায় স্বভাববাদীর ঐ উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আলোচ্য স্বভাববাদের খণ্ডনে আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন, স্বভাব বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলেও, ঐ স্বভাবের কোন স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না; এবং আকস্মিকবাদের বিরুদ্ধে উদয়ন যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বভাববাদ স্বীকার করিয়াও ঐ সকল দোষের সমাধান করা চলে না। প্রথমতঃ স্বভাব বলিলে কি বুঝা যায়, তাহাই বিচার করা আবশ্যক। সহজ কথায় স্বভাব বলিলে "স্বঃ ভাবঃ", বস্তুর স্বকীয় ভাব বা ধর্মবিশেষকে বুঝায়। "এখন ঐ স্বভাব কি কার্য্যের স্বভাব, অথবা কারণের স্বভাব, ইহা বলা আবশ্যক। কার্য্যের স্বভাব বলিলে উহা কার্য্যের উৎপত্তির পূর্বে না থাকায়, উহা নিয়ত দেশকালে কার্য্যের উৎপত্তির নিয়ামক হইতে পারে না। ঘটের উৎপত্তির পূর্বে ঘটের কোন স্বভাব থাকিতে পারে না। আর যদি ঐ স্বভাবকে কারণের স্বভাব বলা হয়, তাহা হইলে কারণ স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে কারণের স্বভাব, ইহা কখনই বলা যায় না। কারণ স্বীকার করিতে হইলে আর 'স্বভাববাদ' থাকে না। 'স্বভাব' বলিয়া

১। নিত্যসত্ত্বা ভবন্ত্যন্যে নিত্যাসত্ত্বাশ্চ কেচন।
বিচিত্রাঃ কেচিদিত্যত্র তৎস্বভাবো নিয়ামকঃ॥
অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শস্তথানিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতং (রচিতং) তস্মাৎ স্বভাবাত্তদ্ ব্যবস্থিতিঃ॥

ন্যায়কুসুমাঞ্জলির ১।৫ শ্লোকের বরদরাজকৃত টীকা ও বর্ধমান উপাধ্যায়কৃত টীকা ও মকরন্দ দ্রষ্টব্য।

এই প্রসঙ্গে সর্বদর্শনসংগ্রহের চার্বাকদর্শন আলোচনা করুন।

কোন অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকারেরও কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু কারণের শক্তিই কারণের স্বভাব, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। শক্তি বলিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন নাই। উদয়নাচার্য 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলির' প্রথম স্তবকে বিশেষ বিচারপূর্বক উহা খণ্ডন করিয়া কারণত্বই যে কারণের শক্তি[1] এবং উহা কারণের স্বভাব, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং কার্যের কারণ অস্বীকার করিয়া স্বভাববাদের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।"[2] কার্যের কোন নিয়ত কারণ নাই, কার্য উৎপত্তিতে নিজের স্বভাব ব্যতীত অপর কিছুরই অপেক্ষা রাখে না ইহা বলিলে, 'আকস্মিকবাদে'র ন্যায় স্বভাববাদেও সর্বদা কার্যের উৎপত্তি ও স্থিতির প্রসঙ্গ অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়। কার্য কখনও হয়, কখনও হয় না, সর্বদা সর্বকালেও কার্য জন্মে না, ইহা সুধীমাত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় কার্যমাত্রেরই কোন-না-কোনরূপ নিয়ত কারণ আছে, ইহা অস্বীকার করা চলে না। আলোচ্য স্বভাববাদের খণ্ডন ও নিয়তকারণবাদের সমর্থন করিতে গিয়া উদয়নাচার্য ন্যায়কুসুমাঞ্জলির প্রথম স্তবকের পঞ্চম শ্লোকে বলিয়াছেন—

"স্বভাববর্ণনানৈবমবধের্নিয়তত্বতঃ।"

"সকল কার্যেরই নিয়ত অবধি আছে। যাহা হইতে অথবা যে দেশে ও কালে কার্য জন্মে, যাহার অভাবে ঐ কার্য জন্মে না, তাহাকে ঐ কার্যের 'অবধি' বলা হয়। ঐ 'অবধি' নিয়ত অর্থাৎ উহা 'নিয়মবদ্ধ'। সকল দেশ বা কালই সকল কার্যের অবধি নহে; তাহা হইলে সকল দেশে সকল কালেই সর্বপ্রকার কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহা তো হয় না। কোনও বিশেষ দেশে বিশেষ কালেই কার্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলে, বিশেষ কাল বা দেশই যে কার্যের 'অবধি' ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।" কার্যের যাহা নিয়ত 'অবধি' তাহাকেই ঐ কার্যের কারণ বলা হইয়া থাকে। কার্যমাত্রই কারণসাপেক্ষ। কার্যের উৎপত্তি কারণসাপেক্ষ বলিয়াই কারণ থাকিলে কার্য থাকে, কারণ না থাকিলে কার্য থাকে না,

১। অথ শক্তিনিষেধে কিং প্রমাণং, ন কিঞ্চিৎ, তৎ কিমস্ত্যেব? বাঢ়ম্ নহি নো দর্শনে শক্তিপদার্থ এব নাস্তি। কোঽসৌ তর্হি? কারণমিত্যাদি।
ন্যায় কুসুমাঞ্জলির ১ম স্তবকের ১৩ কারিকার গদ্য ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায়দর্শনের টিপ্পনী ৪।১।২৪ সূত্র দ্রষ্টব্য।

এইরূপ কার্য-কারণের সুসংবদ্ধ নিয়ম এবং কার্যের সাময়িক উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায়। উদয়নাচার্যের ব্যাখ্যা বৌদ্ধসম্প্রদায়েরও অনুমোদিত, ইহা দেখাইবার জন্য ন্যায়কুসুমাঞ্জলির টীকাকার বরদরাজ তদীয় টীকায় বৌদ্ধপণ্ডিত ধর্মকীর্তির শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১] সুতরাং কার্য আকস্মিকভাবে, অথবা স্বীয় স্বভাববশেই জন্মলাভ করে, এইপ্রকার কোনরূপ মতবাদই গ্রহণ করা যায় না।

কার্যমাত্রেরই কোন-না-কোন কারণ আছে, ইহা সাব্যস্ত হইল। এখন কার্যের ঐ কারণের স্বরূপ কি, তাহাই বিচার করা যাইতেছে।

অভাবকারণবাদ ও তাহার খণ্ডন

ভূগর্ভে বীজের বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত অঙ্কুরের উৎপত্তি ঘটে না। বীজের বিনাশ হইলে তবেই অঙ্কুর জন্মলাভ করে। ইহা হইতে বীজের বিনাশই যে অঙ্কুরের কারণ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বীজের বিনাশের ফলে উৎপন্ন অঙ্কুরকে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করিয়া, ঘট, পট প্রভৃতি ভাবকার্যের অভাবই যে উপাদান-কারণ, তাহা অনুমানের সাহায্যেও উপপাদন করা যাইতে পারে—

"পটাদিকম্ অভাবোপাদানকম্ ভাবকার্যত্বাৎ অঙ্কুরাদিবৎ"।

এই অভাব কারণবাদের উল্লেখ আমরা বিভিন্ন উপনিষদেও দেখিতে পাই।[২] ইহা হইতে এই মত যে অমূলক নহে, "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিই যে আলোচ্য অসৎকারণবাদের মূল, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। এই মতের প্রাচীনতাও সুতরাং অনস্বীকার্য। এই মত শূন্যবাদী বৌদ্ধমত বলিয়া পরিচিত। ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে প্রতিবাদী বৌদ্ধের উল্লিখিত অভিমত খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই আলোচিত হইয়াছে।

১। তদাহ কীর্তি :—

নিত্যসত্ত্বমসত্ত্বং বা হেতোরন্যানপেক্ষণাৎ।
অপেক্ষাতো হি ভাবানাং কদাচিৎকত্ব সম্ভবঃ॥

ন্যায়কুসুমাঞ্জলির ১ম স্তবকের ৫ম কারিকায় বরদরাজ কর্তৃক উদ্ধৃত বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তির কারিকা।

২। (ক) তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়তে।
ছান্দোগ্য, ৬।২।১।

(খ) অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততোবৈ সদজায়ত।
তৈত্তিরীয়, ব্রহ্মবল্লী ৭।১।

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম—

"অভাবাদ্ ভাবোৎপত্তির্নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" (ন্যায়সূত্র, ৪।১।১৪।)

এই সূত্রে শূন্যবাদী বৌদ্ধের 'অসতঃ সদুৎপদ্যতে', অভাব হইতে ভাব-পদার্থের উৎপত্তি হয় এই মত উপন্যাস করিয়া, পরবর্তী সূত্রে (ন্যায়-সূত্র, ৪।১।১৭) ইহা খণ্ডন করিয়াছেন। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেন, বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। অতএব অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না।[১]

অভাব কারণবাদের খণ্ডনে—ন্যায়মত

"কারণ, যাহা বিনষ্ট, কার্যের পূর্বে তাহার সত্তা না থাকায়, তাহা কোন কার্যের কারণই হইতে পারে না। যদি বল, বীজের বিনাশরূপ অভাবই অঙ্কুরের উপাদান-কারণ, ইহাই আমার (বৌদ্ধের) মত, ইহাই আমি বলিয়াছি। কিন্তু তাহাও কোনরূপে বলা যায় না। কারণ, বীজের বিনাশ-রূপ অভাবকে অবস্তু বলিলে, উহা কোন বস্তুর উপাদান-কারণ হইতে পারে না। জগতের মূল কারণ অসৎ বা অবস্তু, কিন্তু জগৎ সৎ বা বাস্তবপদার্থ, ইহা কোনমতেই সম্ভব নহে। কারণ, সজাতীয় পদার্থই সজাতীয় পদার্থের উপাদান-কারণ হইয়া থাকে। যাহা অভাব বা অবস্তু তাহা উপাদান-কারণ হইলে, তাহাতে রূপরসাদি গুণ না থাকায়, অঙ্কুরাদি কার্যে রূপরসাদি গুণের উৎপত্তিও হইতে পারে না। পরন্তু, ঐ অভাবের কোন বিশেষ [রূপ] না থাকায়, শালিবীজের বিনাশরূপ অভাব হইতে যবের অঙ্কুরও উৎপন্ন হইতে পারে। কারণের ভেদ না থাকিলে, কার্যের ভেদ হইতে পারে না। অবস্তু অভাবকে বস্তুর উপাদান-কারণ বলিলে, ঐ কারণের ভেদ না থাকায়, উহার শক্তিভেদও থাকিতে পারে না। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার কার্যের উৎপত্তিও সম্ভব হয় না। বীজের বিনাশরূপ অভাবকে বাস্তবপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে, উহাও অঙ্কুরের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। কারণ, দ্রব্য পদার্থই উপাদান-কারণ হইয়া থাকে। রূপরসাদি গুণশূন্য অভাব পদার্থ কোন দ্রব্যের উপাদান হইলে, ঐ দ্রব্যে রূপরসাদি গুণের উৎপত্তিও হইতে পারে না, সুতরাং অভাব পদার্থকে উপাদান-কারণ বলা যায় না"।[২]

১। ন বিনষ্টাদ্ বীজাদঙ্কুর উৎপদ্যতে ইতি তস্মান্নাভাবাদ্ ভাবোৎপত্তিরিতি।
বাৎস্যায়নভাষ্য ৪।১।১৭ সূত্র।

২। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশের ন্যায়দর্শনের টিপ্পনী, ৪।১।১৭ সূত্র।

নৈয়ায়িকের উল্লিখিত যুক্তির অনুরূপ যুক্তিবলেই আচার্য শঙ্কর বেদান্তদর্শনে—

"নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ। ব্রঃ সূঃ ২।২।২৬।

এই সূত্রের ও তৎপরবর্তী সূত্রের শারীরক-ভাষ্যে বৌদ্ধোক্ত অভাব-কারণবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য বলেন যে, অভাব হইতে কোন প্রকারেই ভাব পদার্থের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। অভাব অভাবই। অভাবের কোন স্বরূপ নাই; উহা নিঃস্বরূপ এবং অবস্তু। ঐরূপ অবস্তু নিঃস্বরূপ অভাব জাগতিক ভাবপদার্থের উপাদান হইলে, অবস্তু অভাবাত্মক শশশৃঙ্গ প্রভৃতিরই বা ভাববস্তুর উপাদান কারণ হইতে বাধা কি? কারণ, অভাবের তো কোন বিশেষ রূপ নাই। এই অবস্থায়, বীজের অভাব, মাটির অভাব, শশশৃঙ্গের অভাব, ইহাদের পার্থক্য বুঝা যাইবে কিরূপে? যদি বল যে, অলীক শশশৃঙ্গ প্রভৃতির অভাব আর ভাববস্তু বীজ, মাটি প্রভৃতির অভাব একরূপ নহে। ভাববস্তু মাটি প্রভৃতির অভাবের অন্তরালে ভাব পদার্থ (মাটি প্রভৃতি) আছে বলিয়া উহা সবিশেষ অভাব, আর শশশৃঙ্গ প্রভৃতি অলীক বস্তুর অভাব নির্বিশেষ অভাব। এইরূপে অভাবের মধ্যে ইতর-বিশেষ স্বীকার করিলে, এবং এই দৃষ্টিতে অভাবের স্বভাব ব্যাখ্যা করিলে, সেই অভাব অবস্তু নিঃস্বভাব থাকিল কৈ? অভাবের স্বভাব স্বীকার করায় (বীজের অভাব প্রভৃতি) অভাব একপ্রকার ভাবপদার্থই হইয়া দাঁড়াইল নাকি? উপাদান-কারণের কার্যে অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। মৃন্ময় বস্তুমাত্রেই মাটির অনুবৃত্তি, কাঞ্চনময় ভূষণে কাঞ্চনের অনুবৃত্তি সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অভাব জাগতিক ভাববস্তুর উপাদান-কারণ হইলে, ভাবকার্যে অভাবের অনুবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী হইত। ফলে, বিশ্বপ্রপঞ্চমাত্রই অভাবান্বিত হইয়া প্রতীতিগোচর হইত। বস্তুতঃ তাহাতো হয় না। উৎপন্ন বস্তুমাত্রকেই আমরা ভাবপদার্থ বলিয়াই বুঝিয়া থাকি। কার্যের উপাদান সংগ্রহের জন্য কর্মীর যে প্রচেষ্টা আমরা দেখিতে পাই, মৃৎশিল্পীর মাটির জন্য, স্বর্ণশিল্পীর স্বর্ণের জন্য, তন্তুবায়ের তন্তুর (সূতার) জন্য যে প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, অভাব-কারণবাদে তাহা নিতান্তই নিষ্ফল প্রচেষ্টা হয় নাকি? মাটির অভাব ও স্বর্ণের অভাবের মধ্যে কোন বিশেষত্ব না থাকায়, মাটির অভাব হইতে মৃন্ময়বস্তুর

বেদান্ত মত

যেমন উৎপত্তি হয়, সেইরূপ স্বর্ণময় ভূষণরাজিরই বা উৎপত্তি হইতে বাধা কোথায়? এইরূপে সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তির প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। নির্দিষ্ট কারণ হইতে নির্দিষ্ট কার্য উৎপন্ন হয়, মাটি হইতে ঘট হয়, কাঞ্চন হইতে কাঞ্চনময় ভূষণ প্রভৃতি উৎপত্তি লাভ করে, এইরূপ কার্য-কারণের নিয়ম ও শৃঙ্খলা অর্থহীন হয়। অসৎ শশশৃঙ্গ হইতে সৎ, ভাবপদার্থের উৎপত্তি কস্মিন্ কালেও হইতে দেখা যায় না। সত্য সুবর্ণাদি উপাদান হইতেই স্বর্ণময় ভূষণরাজির উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় অসৎ বা অভাব-কারণবাদকে নির্বিবাদে কিরূপে গ্রহণ করা যায়?[১] অবস্থ অভাব যে কাহারও উপাদান-কারণ হইতে পারে না, অভাব ভাবকার্যের উপাদান হইলে, সর্বপ্রকার অভাব হইতেই যে সর্বপ্রকার ভাবকার্যের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা শ্রীবাচস্পতি মিশ্র তদীয় সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে [নবম শ্লোকের ব্যাখ্যায়] অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বাচস্পতি বলিয়াছেন যে, "অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইলে, অভাব সর্বত্র সুলভ বলিয়া, সকল স্থলেই সকল রকম কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে।"[২] অবস্থ অভাবেরও ইতর-বিশেষ আছে এবং তাহা কিজন্য ঘটে ইহা যদি পরীক্ষা করা যায়, তবে দেখা যায়, যেই বস্তুর অভাব বুঝায়, অভাবের সহিত তাহাকে (অভাবের প্রতিযোগীকে) বিশেষণ হিসাবে জুড়িয়া দিলেই নিঃস্বরূপ, নির্বিশেষ অভাবের এক বিশেষরূপ ফুটিয়া ওঠে। বীজের অভাব, মাটির অভাব, সোনার অভাব, এই সকল

১। (ক) 'নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ'। ব্রঃ সূঃ ২।২।২৬। এই ব্রহ্মসূত্র ও তাহার শংভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(খ) অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তৌ অভাবান্বিতমেব সর্বং কার্যং স্যাৎ। শং ভাষ্য, ২।২।২৬।

(গ) নাভাবাৎ কার্যোৎপত্তিঃ। কস্মাৎ? অদৃষ্টত্বাৎ। নহি শশবিষাণাদঙ্কুরাদীনাং কার্যাণামুৎপত্তির্দৃশ্যতে। যদি তু অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ স্যাৎ ততোঽভাবত্বা-বিশেষাৎ শশবিষাণাদিভ্যোঽপ্যঙ্কুরোৎপত্তিঃ। ন হ্যভাবো বিশিষ্যতে। বিশেষণ-যোগে বা সোঽপি ভাবঃ স্যান্ননিরূপাখ্য ইত্যর্থঃ। ভামতী, ব্রঃ সূঃ ২।২।২৬।

(ঘ) অপি চ যদ্‌যেনানন্বিতং ন তত্তস্য বিকারঃ। যথা ঘটশরাবোদঞ্চনাদয়োহেম্না অনন্বিতা ন হেমবিকারাঃ। অনন্বিতাশ্চৈতে বিকারা অভাবেন। তস্মান্নাভাব-বিকারাঃ। ভামতী ২।২।২৬ সূত্র।

২। যদ্যপি বীজমৃৎপিণ্ডাদি প্রধ্বংসানন্তরমঙ্কুরঘটাদ্যুৎপত্তিরুপলভ্যতে তথাপি ন প্রধ্বংসস্য কারণত্বম্, অপিতু ভাবস্যৈব বীজাদ্যবয়বস্য। অভাবাত্তু ভাবোৎপত্তৌ তস্য সর্বত্র সুলভত্বাৎ সর্বত্র সর্বকার্যোৎপাদপ্রসঙ্গঃ। সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী, ৯ম কারিকা।

অভাব বীজ, মাটি, সোনা প্রভৃতি ভাববস্তুর সহিত যুক্ত থাকায়, উহাদিগকে আর নিঃস্বরূপ অবস্তু বলা যায় না। উহারা তখন এক শ্রেণির ভাববস্তুই হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে সবিশেষ অভাবকে কারণ বলিয়া গ্রহণ করিলে সকল বস্তু হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তির প্রশ্ন (সর্বং সর্বস্মাৎ উৎপদ্যেত) অবশ্য অবান্তর হইয়া পড়ে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, বীজকে অঙ্কুরের কারণ না বলিয়া বীজের অভাবকে অঙ্কুরোৎপত্তির কারণ বলিলে. লঘুতরকে উপেক্ষা করিয়া গুরুতর কারণ কল্পনারই শরণ লওয়া লয়।

ভূগর্ভে বীজ বিনষ্ট হইয়া অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। বীজের বিনাশ এবং অঙ্কুরের উৎপত্তির মধ্যে পৌর্বাপর্য ক্রমও অনস্বীকার্য। যাহা নিয়তপূর্বভাবী তাহাই কারণ, আর কারণের যাহা পরভাবী তাহাই কার্য। কার্য-কারণের এইরূপ ক্রম বা পৌর্বাপর্য বীজনাশ এবং অঙ্কুরের উৎপত্তির মধ্যে অব্যাহতই আছে। এই অবস্থায় বীজের বিনাশরূপ অভাবকে অঙ্কুরোৎপত্তির কারণ বলিলে তাহাতে দোষের কথা কি আছে ? ইহাই সংক্ষেপে অভাববাদীর বক্তব্য। বীজের অভাব অর্থাৎ বীজের বীজাবস্থার ধ্বংস যে অঙ্কুরোদ্গমের কারণ, তাহা সুধী দার্শনিক অস্বীকার করিতে পারেন না। নৈয়ায়িকও ভূগর্ভে বীজের বিনাশকে অঙ্কুরোৎপত্তির অন্যতম (নিমিত্ত) কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বীজের বিনাশ না হইলে অঙ্কুরোদ্গম সম্ভবপর হয় না বলিয়া, বীজের বিনাশকে অঙ্কুরোৎপত্তির সহকারী কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতেও কোনরূপ বাধা দেখা যায় না। বীজের নাশ ও অঙ্কুরের উৎপত্তির পৌর্বাপর্য দেখিয়া অভাবকারণবাদী বীজের বিনাশরূপ অভাবকে যে অঙ্কুরোৎপত্তির উপাদান-কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ঐরূপ সিদ্ধান্ত কোনপ্রকারেই সমর্থন করা যায় না। অবস্তু, নিঃস্বরূপ অভাব কাহারও উপাদান-কারণ হয় না, হইতে পারে না। ভাববস্তুর যে ভাববস্তুই উপাদান-কারণ হইবে ইহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষেত্রেও সুতরাং বীজের বিনাশকে উপাদান-কারণ বলা চলিবে না। বীজের ভাবরূপ অবয়বসমূহই অঙ্কুরের উপাদান-কারণ, বীজের অভাব নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হইবে। ভূগর্ভে বীজ উপ্ত হইলে ভূগর্ভের তেজে উহা ক্রমশঃ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়; এবং বীজের আকৃতির ক্রমপরিবর্তন ঘটিতে থাকে। বীজাবস্থায় বীজের অবয়ব সমূহের পরস্পর সংযোগ বশতঃ বীজের যে আকার পরিদৃষ্ট

হইয়াছিল, বিশ্লিষ্টাবস্থায় সেই বীজাকৃতির ক্রমিক পরিবর্তনের ফলেই অঙ্কুর আত্মপ্রকাশ লাভ করে। বীজের বিনাশের পরক্ষণেই অবশ্য অঙ্কুর জন্মে না। তবে, বীজের বীজাকৃতির বিনাশ না হইলে, অঙ্কুরাকৃতি যখন জন্মিতে পারে না, তখন অঙ্কুরের উৎপত্তিতে বীজের বীজাকৃতির বিনাশ, অর্থাৎ বীজের বিনাশ অবশ্য স্বীকার্য। বীজের বিনাশের পূর্বে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, বীজনাশের পরই অঙ্কুরোদ্গম হয়। এই অবস্থায় বীজের নাশ এবং অঙ্কুরোদ্গমের পৌর্বাপর্য-নিয়মও অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তাহা দ্বারাই বীজের বিনাশই অঙ্কুরের উপাদান, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায় না। বীজের বীজাকৃতি বিনষ্ট হইয়া বীজের বিশ্লিষ্ট অবয়ব সমূহের দ্বারা অভিনব আকৃতি সৃষ্টি হইলে, তাহার পরই অঙ্কুরোদ্গম হয়। ইহা হইতে বীজের অবয়ব সমূহই যে অঙ্কুরের উপাদান-কারণ, তাহাই সিদ্ধ হয়। বীজনাশ বীজের বিশ্লিষ্ট অবয়বসমূহের পুনরায় মিলনের ফলে উৎপন্ন অভিনব আকৃতি সৃষ্টিরই সাক্ষাৎ কারণ, অঙ্কুরোৎপত্তির উহা সাক্ষাৎকারণ নহে, সহকারী মাত্র।

উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ থাকে। অসৎকার্যেরই উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। উৎপত্তির পূর্বে কার্যের যে অভাব (প্রাগভাব) থাকে, তাহাই (কার্যের প্রাগভাবই) সেই কার্যের উপাদান-কারণ, এইরূপ সিদ্ধান্তও গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, সেক্ষেত্রে কার্যমাত্রেরই প্রাগভাব অনাদি বিধায়, কার্যবর্গকেও অনাদি বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। প্রাগভাবেরও স্বাভাবিক কোন ভেদ না থাকায়, উহা হইতে বিভিন্ন শক্তিযুক্ত বিচিত্র কার্যবর্গের উৎপত্তিও সম্ভবপর হয় না। সুতরাং বীজের বিনাশ (ধ্বংসাভাব)ই বল, অঙ্কুরের প্রাগভাবই বল, কোন প্রকার অভাবকেই অঙ্কুরের উপাদান-কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা চলে না।

অসৎবাদ বা অভাববাদ এইরূপে সর্বপ্রকারে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হইলে, নিখিল জ্ঞানাকর বেদ ঐরূপ অযৌক্তিক 'অসৎ'বাদের উপন্যাস করিলেন কেন?

'অসতঃ সজ্জায়তে', 'অসদেবেদমগ্র আসীৎ'।

এইরূপে শ্রুতি অতিস্পষ্টবাক্যে 'অসৎ'বাদ বা অভাববাদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহার রহস্য কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে সৎকারণবাদীরা বলেন, শ্রুতিতে 'অসৎ'বাদ খণ্ডনের

উদ্দেশ্যেই আলোচিত হইয়াছে; সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই। 'একে আহুঃ' এই কথা দ্বারা উহা যে শ্রুতির সিদ্ধান্ত নহে, তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। "অসদেব" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা এই বিশ্বপ্রপঞ্চ শূন্যতার বিবর্ত, অর্থাৎ রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় এই বিশ্বপ্রপঞ্চ শূন্যতায় কল্পিত, উহার সত্তাই নাই, এইরূপ সিদ্ধান্তও সমর্থিত হইতে পারে না। কারণ, যাহার কোন সত্তাই নাই, সেই বিষয় সম্পর্কে কোনরূপ জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। কিন্তু বিশ্বপ্রপঞ্চের যখন জ্ঞান হইতেছে, তখন উহাকে "অসৎ" বা অলীক বলা যায় না। "অসৎখ্যাতি" আমরা স্বীকার করি না। সর্বশূন্যতা স্বীকার করিলে, জ্ঞাতার অভাবে জ্ঞানেরও অভাব হইয়া পড়ে। জ্ঞানের অভাব স্বীকার করিলে, সর্বশূন্যতাবাদী কোনরূপ বিচারই করিতে পারেন না। সুতরাং শূন্যতা অর্থাৎ অভাবই জগতের উপাদান কারণ অথবা জগৎ শূন্যতারই বিবর্ত, এই সিদ্ধান্ত কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না"।[১] 'অসৎ' বা শূন্যতার সহিত 'আসীৎ' এই সত্তা বা অস্তিত্বের বোধক, অস্‌ধাতুর কর্তৃত্বের অন্বয়ও দুর্ঘট হয়। যাহা অসৎ বা শূন্য তাহা সত্তার আশ্রয় হইবে কিরূপে? শূন্যকে সত্তার আশ্রয় বা সৎস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলে, শূন্য সেক্ষেত্রে আর শূন্য থাকে না; তাহা নির্বিশেষ সদ্‌রূপই হইয়া দাঁড়ায়। শূন্যবাদের ব্রহ্মবাদেই পর্যবসান হয়।[২]

উৎপত্তির পূর্বে ঘট প্রভৃতি কার্যবর্গ যে 'অসৎ' তাহা ন্যায়-বৈশেষিকও সমর্থন করেন। মহামুনি গৌতম তাঁহার ন্যায়দর্শনে "বুদ্ধিসিদ্ধন্তু তদসৎ"। ন্যায়সূত্র, ৪।১।৪৯। এই সূত্রে কার্যমাত্রই উৎপত্তির পূর্বে অসৎ, ইহাই অনুভব সিদ্ধ (বুদ্ধিসিদ্ধ) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঘট প্রভৃতির উৎপত্তির পূর্বে কেহই ঘট প্রভৃতি আছে বলিয়া জানে না। মাটি আছে, ঘট নাই, এইরূপই লোকে বুঝিয়া থাকে। এই সর্বজনীন অনুভবের বিরুদ্ধে ঘট প্রভৃতি কার্যবর্গকে উৎপত্তির পূর্বে কোনমতেই সত্য বলা যায় না। উৎপত্তির পূর্বে কার্যকে অসৎই

কার্যকারণভাব—আরম্ভবাদ, পরিণাম-বাদ ও বিবর্তবাদ

১। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনূদিত, ন্যায়দর্শনের ৪।১।১৮ সূত্রের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

২। (ক) ছান্দোগ্য শং ভাষ্য, ৬।২।১

(খ) শূন্যমাসীদিতি ব্রূষে সদ্‌যোগং বা সদাত্মতাম্।
শূন্যস্য ন তু তদ্‌যুক্তমুভয়ং ব্যাহতত্বতঃ॥ পঞ্চদশী, ২।৩২।

বলিতে হয়।* উৎপত্তির পূর্বে কার্য ঘট প্রভৃতি অসৎ হইলে অসৎকার্যবাদে সকল বস্তুই সকল বস্তুর উপাদান হইতে পারে, নিয়ত উপাদানের নিয়ম ব্যাহত হয়, এইরূপে অসৎকার্যবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই আপত্তি ন্যায়-বৈশেষিকের বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে নাকি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, অসৎ ভাবী ঘটপ্রমুখ কার্য, মাটি প্রভৃতি উপাদান কারণের দ্বারাই জন্মে, অন্য কোন কারণের দ্বারা জন্মে না। মাটি হইতে ঘটের, সূতা হইতে বস্ত্রের, তিল হইতে তৈলের উৎপত্তি দেখিয়া, এবং ইহার ব্যতিক্রম না দেখিয়া, সুধী ব্যক্তি সহজেই অনুমান করিতে পারেন যে, মাটিই ঘটের উপাদান, সূতাই বস্ত্রের উপাদান। মাটিতেই ঘটোৎপাদনের শক্তি আছে, সূতায় তাহা নাই; সূতাতেই বস্ত্রোৎপাদনের শক্তি আছে, মাটিতে তাহা নাই। এইরূপে বিশেষ উপাদানে বিশেষ কার্যোৎপত্তির যে শক্তি দেখা যায়, তাহা হইতে কার্যমাত্রেরই যে নিয়ত কারণ আছে; যে-কোন কারণ হইতেই যে, যে-কোন কার্য জন্মে না, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়। কার্য-কারণের নিয়মের উপপাদনও সহজসাধ্য হয়। ঘটাদি কার্যবর্গের উপাদান মাটি প্রভৃতিতে ঘট প্রভৃতি উৎপাদনের যে শক্তি আছে, যাহাকে সৎকার্যবাদী সাংখ্য 'শক্তস্য শক্যকারণাৎ' (সাংখ্যকারিকা ৯ম) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কারণগত কার্যজননী সেই শক্তিকেই নৈয়ায়িক 'কারণত্ব' নামে অভিহিত করিয়াছেন। উদয়নাচার্য তাঁহার "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের প্রথম স্তবকে কার্যের উপাদানকারণে কারণত্ব ব্যতীত আর যে কোনও শক্তি নাই, তাহা বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। মাটি হইতে ঘটের, তিল হইতে তৈলের উৎপত্তি দেখিয়া, মাটিতে ঘটের তিলে তৈলের উৎপাদন শক্তি অর্থাৎ কারণত্ব আছে, ইহাই বুঝা যায়। মাটি হইতে তৈল জন্মে না, তিল হইতে ঘট হয় না, ইহা দ্বারা মাটিতে তৈলের কারণত্ব নাই, তিলে ঘটের কারণত্ব নাই, ইহাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

* এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, বৌদ্ধও অসৎকার্যবাদী, নৈয়ায়িকও অসৎকার্যবাদী। পার্থক্য এই যে, বৌদ্ধ উৎপত্তির পরেও ঘটাদি কার্যকে অসৎ বলেন, আরম্ভবাদী নৈয়ায়িক তাহা বলেন না। নৈয়ায়িক বৈশেষিক প্রভৃতির মতে উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ হইলেও উৎপত্তির পরে আর ঘট প্রমুখ কার্য অসৎ নহে, সত্য।

ন্যায়োক্ত অসৎখ্যাতিবাদের খণ্ডনে সৎকার্যবাদী সাংখ্যদার্শনিক বলেন, কার্য উৎপত্তির পূর্বেও সৎ, পরেও সৎ। কার্য যদি উৎপত্তির পূর্বে অসৎই হয়, অর্থাৎ ন্যায়-বৈশেষিক যাহা বলিয়াছেন তাহাই যদি সত্য হয়, তবে ঐ অসৎ কার্যের উৎপত্তি কোন প্রকারেই উপপাদন করা যায় না। কারণ, যাহা অসৎ, তাহা অসৎই। তাহাকে কেহই সৎ করিতে পারে না, তাহা উৎপন্ন করাও যায় না। সহস্র শিল্পী একত্রিত হইয়াও নীলকে হলুদ করিতে পারে না।[১] সাংখ্যের এইরূপ আপত্তির উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিক বলেন, কার্য উৎপত্তির পূর্বে অসৎ বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া কার্য তো আর আকাশকুসুমের মত অলীক নহে। যাহা অলীক, সর্বকালেই অসৎ, সেই আকাশকুসুম প্রভৃতিকে কেহই উৎপন্ন করিতে পারে না। সর্বকালীন অসতের সত্যতা সাধন করা কাহারও পক্ষে কদাচ সম্ভবপর নহে, ইহা তো সত্য কথা। ন্যায়মতে কার্য উৎপত্তির পূর্বে অসৎ হইলেও উৎপত্তির পরে তো তাহা অসৎ নহে, সত্য স্বাভাবিকই বটে। মাটি হইতে ঘট হইল। ঘটের সাহায্যে নদী হইতে জল আহরণ করিয়া যথেচ্ছ পান করা গেল, স্নান সম্পন্ন করা গেল। এই অবস্থায় মৃন্ময় ঘটকে আকাশ-কুসুমের মত অসৎ বা অলীক বলা চলে কি? কার্যবর্গ একান্তই অসৎ হইলে অবশ্য সাংখ্যের যুক্তি মানিয়া লওয়া যাইত। কার্য তো অলীক নহে। কার্যমাত্রেরই দুইটি ধর্ম আছে—সত্ত্ব ও অসত্ত্ব। কার্যের উৎপত্তির পূর্বে কার্যে অসত্ত্ব ধর্ম থাকে। কার্য উৎপন্ন হইলে সেই উৎপত্তিকাল হইতে কার্যের স্থিতিকাল পর্যন্ত উহাতে সত্তা বা সত্ত্বধর্ম থাকে।

সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদ

কার্যের উৎপত্তির পূর্বে কার্যরূপ ধর্মী না থাকায়, তাহাতে ধর্ম থাকিবে কিরূপে? উৎপত্তির পূর্বেও যদি কার্যের ধর্ম স্বীকার কর, তবে ধর্মীর

১। (ক) অসচ্চেৎ কারণব্যাপারাৎ পূর্বং কার্যং নাস্য সত্ত্বং কর্তুং কেনাপি শক্যং, নহি নীলং শিল্পিসহস্রেণাপি পীতং কর্তুং শক্যতে।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, ৯ম কারিকা।

(খ) কার্যং (পক্ষ), সৎ (সাধ্য), ক্রিয়মাণত্বাৎ (হেতু)। যন্ন সৎ তন্ন ক্রিয়মাণম্ (ব্যাপ্তি), যথা নীলে পীতম্, নরবিষাণম্ (দৃষ্টান্ত)। যাহা সৎ নহে (অসৎ), তাহাকে কোন প্রকারেই উৎপন্ন করা যায় না। যেমন নীলকে পীতবর্ণ করা যায় না, নরবিষাণও (মানুষের শৃঙ্গও) উৎপন্ন করা চলে না।

সত্তাতাও অবশ্যই নৈয়ায়িককে স্বীকার করিতে হইবে। ফলে, ঘটোৎপত্তির পূর্বেও ঘট প্রভৃতি ধর্মীর সত্তা স্বীকার করায়, সৎকার্যবাদকেই প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল নাকি? সাংখ্যের এইরূপ আপত্তির প্রত্যুত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, কার্য যখন আকাশকুসুম নহে, কার্য ঘটাদিরূপ ধর্মীও যখন অসিদ্ধ পদার্থ নহে, তখন উৎপত্তির পূর্বে ধর্মী না থাকিলেও ভাবীকার্যে কালভেদে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, এইরূপ দুইটি ধর্ম থাকিতে কোন বাধা নাই। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় একই সময়ে ঘটে থাকে না; কালভেদেই থাকে। উৎপত্তির পূর্বে ঘটে অসত্ত্ব থাকে। উৎপত্তির পরে তাহাতেই সত্ত্ব থাকে। ধর্মী সকল অলীক নহে বলিয়া, উৎপত্তির পূর্বে ঘট প্রভৃতি ধর্মী না থাকিলেও উহাদের ধর্ম সত্ত্ব অসত্ত্ব প্রভৃতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদের উপপাদনও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

তিলের মধ্যে যেমন তৈল থাকে, ধানের মধ্যে যেমন চাউল থাকে, মাতৃস্তনে যেমন দুগ্ধ থাকে, সেইরূপ মাটির মধ্যে ঘট, সূতার মধ্যে কাপড় থাকে কি? যেই ঘটের দ্বারা জল আনিয়া পিপাসার নিবৃত্তি করা যায়, যেই বস্ত্রের দ্বারা লজ্জা নিবারণ করা যায়, সেই ঘট বা বস্ত্র ঠিক সেই-রূপেই মাটি বা সূতার মধ্যে ছিল বা আছে, ইহা অবশ্য সৎকার্যবাদী সাংখ্যদার্শনিকও বলিবেন না। 'ঘট হয় নাই', 'ঘট হইবে', 'কাপড় হয় নাই', 'কাপড় হইবে', ইহা অসৎকার্যবাদী যেমন বলেন, সৎকার্যবাদী সাংখ্যকারও সেইরূপ বলেন। সাংখ্যকার এইরূপ উক্তি দ্বারা ঘট ও বস্ত্র প্রভৃতিরূপে আবির্ভাবের পূর্বে ঘটাদি পদার্থের অসত্তাই প্রকাশ করেন না কি? তিলের মধ্যে তৈলের যেমন সত্তা আছে, সেইরূপই মাটির মধ্যে ঘটের, সূতার মধ্যে কাপড়ের সত্তা আছে, ইহা কোন সুধীই বলিবেন না। ঘটরূপে আবির্ভাবের পূর্বে ঘটের উপাদান মাটিতে ঘট যে অসৎ, ইহা সৎকার্যবাদীও স্বীকার করিতে বাধ্য।

উল্লিখিত ন্যায়োক্তির বিরুদ্ধে সৎকার্যবাদী সাংখ্যের বক্তব্য এই যে, কার্য ঘটপ্রমুখ পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে কার্য ঘটাদিরূপ ধর্মী না থাকিলেও, উহাতে অসত্ত্বরূপ ধর্ম থাকিতে পারে বলিয়া নৈয়ায়িক যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার কোনই মূল্য নাই। সত্ত্ব, অসত্ত্ব কাহার ধর্ম? অবশ্যই কোনরূপ ধর্মীর উহা ধর্ম। ধর্মী না থাকিলে ঐ ধর্ম তখন কোথায় থাকিবে? কার্য ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্তে আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক না হইলেও, উৎপত্তির

অসৎকার্যবাদী নৈয়ায়িকের বিরুদ্ধে সৎকার্য-বাদী সাংখ্যের বক্তব্য

পূর্বে ঘট প্রভৃতি কার্যবর্গ যে অসৎ, ইহা তো অসৎকার্যবাদী ন্যায়-বৈশেষিক উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়া থাকেন। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য যখন অসৎ বলিয়া স্থির হইল, সেই অসত্ত্বকে নৈয়ায়িক কাহার ধর্ম বলিবেন? ধর্মী নাই অথচ তাহার ধর্ম বর্তমান আছে এবং ঐ ধর্ম ধর্মীতে সমবায়-নামক নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ আছে, ইহা কেমন কথা? ধর্ম মানিলে ধর্মীরও অস্তিত্ব অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে। ফলে সৎকার্যবাদই সিদ্ধ হইবে।[১]

তারপর, তিলে যেমন তৈল থাকে, ধানের মধ্যে যেমন চাউল থাকে, সেরূপ মাটির মধ্যে ঘট থাকে না, সূতার মধ্যে কাপড় থাকে না, সুতরাং সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদ গ্রহণ করা চলে না; এইরূপে ন্যায়-বৈশেষিক যে আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তদুত্তরে সাংখ্যের বক্তব্য এই যে, কার্যসকল স্ব স্ব কারণে সূক্ষ্মরূপেই অবস্থান করে, স্থূলরূপে করে না। সূক্ষ্মরূপে স্বীয় উপাদানকারণে অবস্থিত কার্যবর্গের ব্যবহারোপযোগী স্থূলরূপতা সম্পাদনই কার্যোৎপত্তি বলিয়া সাংখ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। সাংখ্যসিদ্ধান্তে উৎপত্তি অর্থ অভিব্যক্তি, অর্থাৎ সূক্ষ্ম বস্তুকে ব্যবহারযোগ্য স্থূলরূপে আনয়ন [যাহা পূর্বে ছিল না, তাহার উপপাদন নহে]। কার্যমাত্রই আমাদের স্থূল দৃষ্টির অগোচরে সূক্ষ্মশক্তিরূপেই স্ব স্ব কারণে অবস্থান করে। বিশেষ বিশেষ কারণের (তিল, মাটি প্রভৃতির) বিশেষ কার্য উৎপাদনের ক্ষমতাই সেই শক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কারণে কার্যের সূক্ষ্মশক্তিরূপে ঐ প্রকার অবস্থিতির মধ্যে ভেদের রেখা টানা সম্ভবপর হয় না। এইজন্য তিলের মধ্যে যেমন তৈল থাকে, মাটির মধ্যে সেরূপ ঘট থাকে না, নৈয়ায়িকের এইরূপ আপত্তিরও কোন মূল্য দেওয়া যায় না।

কার্য-কারণের রহস্য বিচারে আরও দেখা যায় যে, "যাহা কার্যের সহিত

১। (ক) সদসত্ত্বে ঘটস্য ধর্মাবিতি চেৎ, তথাপ্যসতি ধর্মিণি স তস্য ধর্ম ইতি সত্ত্বং তদবস্থমেব, তথা চ নাসত্ত্বম্।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, ৯ম কারিকা।

(খ) যদি তয়োঃ (সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ) ধর্মত্বং তর্হি ধর্মিরূপং বস্তু দণ্ডায়মানং সদাতনমিতি ন কস্যচিৎ তদ্‌বিকার ইত্যাপদ্যেত, অথাসত্ত্বসময়ে তন্নাস্তি তর্হি কস্য ধর্মোঽসত্ত্বং, নহি অবিদ্যমানে ধর্মিণি তদ্‌ধর্মো বিদ্যমান ইত্যুপপদ্যতে।

বালরা[illegible] বিদ্বত্তোষিনী টীকা, সাংখ্যকারিকা, ৯ম কারিকা।

সম্বন্ধ, তাহাই ঐ কার্যের জনক হইতে পারে ও হইয়া থাকে। অন্যথা মৃত্তিকা হইতেও বস্ত্রের উৎপত্তি এবং সূত্র হইতে ঘটের উৎপত্তি কেন হয় না? কার্যের সহিত কারণের চিরন্তন সম্বন্ধ স্বীকার করিলে উক্তরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, যে কার্যের সহিত যে পদার্থ সম্বন্ধযুক্ত, সেই পদার্থই সেই কার্যের উৎপাদক হইয়া থাকে, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায়। ঘটের সহিত মৃত্তিকার সেই সম্বন্ধ আছে; বস্ত্রের সহিত উহা নাই, অতএব মৃত্তিকা হইতে ঘটেরই উৎপত্তি হয়, বস্ত্রের হয় না। এখন পূর্বোক্ত যুক্তিবশতঃ যদি ঘটের সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য হয়, তাহা হইলে ঐ ঘটের উৎপত্তির পূর্বেও উহার সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, পূর্বে ঘট অসৎ হইলে তাহার সহিত বিদ্যমান মৃত্তিকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। 'সৎ' ও 'অসতে' সম্বন্ধ অসম্ভব। সম্বন্ধের যে দুইটি আশ্রয়, তাহার একটি না থাকিলেও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যেমন ঘট বা ভূতল, ইহার কোন একটি পদার্থ না থাকিলেও, ঐ উভয়ের সংযোগ-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সুতরাং কারণের সহিত কার্যের সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য, এবং তাহা কারণ ও কার্য উভয়ই বিদ্যমান না থাকিলে থাকিতে পারে না। অতএব উৎপত্তির পূর্বেও কারণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কার্য আছে, কার্য তখনও সৎ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে"।[১] উপাদানসম্বন্ধ কার্য যে উৎপত্তির পূর্বেও সৎ তাহা নিম্নলিখিত অনুমানের বলেও উপপাদন করা যায়ঃ—

(ক) উৎপত্তির পূর্বেও কার্য (পক্ষ), স্বীয় উপাদানে সৎ (সাধ্য), যেহেতু কার্যমাত্রই স্ব স্ব উপাদানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত (হেতু), যেই কার্য যেই উপাদানে সৎ নহে, সেই কার্য সেই উপাদানের সহিত সম্বন্ধযুক্তও হইতে পারে না (ব্যতিরেকব্যাপ্তি), যেমন মাটিতে পট প্রভৃতি (দৃষ্টান্ত), মাটিতে পট প্রভৃতি সৎ নহে, সুতরাং ঘটের উপাদান মাটির সহিত পট প্রভৃতি সম্বন্ধও নহে।

(খ) উৎপত্তির পূর্বেও কার্য (পক্ষ) উহার উপাদানের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত (সাধ্য), যেহেতু কার্য সকল স্ব স্ব উপাদানজন্য (হেতু)। যেই কার্য যেই উপাদানের সহিত সম্বন্ধ নহে, সেইরূপ উপাদান কদাচ ঐ

[১] মঃ মঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায়দর্শন ৪।১।৪৯ সূত্রের টিপ্পনী।

অসম্বদ্ধ কার্যের জনক হয় না (ব্যাপ্তি); যেমন মাটি কাপড়ের জনক হয় না (দৃষ্টান্ত)।[১]

যেই কার্য উৎপত্তির পূর্ব হইতেই তাহার উপাদান-কারণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, উপাদান-কারণ শুধু সেইরূপ কার্যই উৎপাদন করে, আলোচ্য অনুমানে এই কথাই বলা হইয়াছে। যেই কার্য উপাদানের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত নহে, উপাদান যদি সেইরূপ অসম্বদ্ধ কার্যেরই জনক হয়, তবে মাটি হইতে ঘট না হইয়া কাপড় হইতেই বা বাধা কি? ফলে, 'সর্বং সর্বস্মাদুৎপদ্যেত' এই দোষই আসিয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ তাহা তো হয় না। কোন কার্য করিতে হইলেই কর্মীকে উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহে তৎপর হইতে দেখা যায়। সাংখ্যসূত্রকার বিজ্ঞানভিক্ষু, 'উপাদাননিয়মাৎ' ১।১।১৫ 'সর্বত্র সর্বদা সর্বসম্ভবাভাবাৎ' ১।১১৬ এই সূত্র দুইটিতে সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদের অন্তর্নিহিত রহস্যই প্রকাশ করিয়াছেন। যেই কারণের সহিত যেই কার্যের কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ কদাচ সেইরূপ কার্য উৎপাদন করে না। উৎপত্তির পূর্ব হইতেই যেই কার্যের সহিত যেই কারণের সম্বন্ধ আছে। কারণ ঐরূপ সম্বদ্ধ কার্যই উৎপাদন করে। অসম্বদ্ধ কারণ অসম্বদ্ধ কার্য উৎপাদন করে না।

১। সাংখ্যকারিকার রচয়িতা ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় সৎকার্যবাদ সিদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত কারিকা প্রণয়ন করিয়াছেন: –

অসদকরণাদ্ উপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকারণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্যম্।

এই শ্লোকে কার্য সৎ ইহাই সাধ্য, পঞ্চম্যন্ত পদগুলি হেতুর বোধক। অসদকরণাৎ এই হেতু দ্বারা যেরূপ অনুমান প্রযোগ করা যাইতে পারে, তাহা আমরা "সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদে"র প্রারম্ভেই পাদটীকায় দেখাইয়াছি। 'উপাদান গ্রহণাৎ এই হেতু দ্বারা কিরূপ অনুমানের প্রয়োগ করিয়া সৎকার্যবাদ সাধন করা যায়, তাহাই এখানে দেখান হইল।

(ক) কার্যম্ উপাদানে সদ্ উপাদানেন সহ সম্বদ্ধত্বাৎ, যদ্ যত্র ন সদ্ ন তৎ তেন সম্বদ্ধং যথা মৃত্তিকয়া পটাদিকম্।

(খ) উৎপত্তেঃ প্রাক্ কার্যমুপাদানসম্বদ্ধং তজ্জন্যত্বাৎ যচ্চ নোপাদানসম্বদ্ধং ন তত্তজ্জন্যং যথা মৃদঃ পটাদিকম্ ইত্যনুমানমত্র সূচিতম্।

বালরামোদাসীনকৃত বিদ্বত্তোষিণী টীকা,
সাংখ্যকারিকা, ৯ম কারিকা।

"তস্মান্নাসম্বদ্ধমসম্বদ্ধেন জন্যতে, অপি তু সম্বদ্ধং সম্বদ্ধেন জন্যতে।"

(সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ৯ম কাঃ)

কারণ অসম্বদ্ধ কার্যের জনক হইলে, সর্বং কার্যজাতং সর্বস্মাৎ ভবেৎ। সকল কারণ হইতেই সকল কার্য জন্মিতে পারে। ইহাই ঈশ্বরকৃষ্ণ তদীয় কারিকায় 'সর্বসম্ভবাভাবাৎ' এই হেতুদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সাংখ্যবৃদ্ধেরা বলেন, কার্য উৎপত্তির পূর্বে অসৎ হইলে, সৎ কারণের সহিত তাহার কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কেননা, সৎ ও অসতের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ হয় না। কারণ অসম্বদ্ধ কার্যের জনক হইলে মাটি হইতেই মৃন্ময় ঘট হয়, সোনা হইতে কাঞ্চনময় ভূষণরাজি জন্মে, এইরূপ নিয়ম সম্পূর্ণই অর্থহীন হয়।[১]

যদি বল যে, কারণ অসম্বদ্ধ কার্যের জনক হইলেও উপাদানে কার্যজননী যে বিশেষ শক্তি আছে, সেই শক্তিবশতঃ যে কারণ যেই কার্য উৎপাদনে সমর্থ, সেইরূপ কারণ হইতে অনুরূপ কার্যই উৎপন্ন হয়, যে-কোন কার্য জন্মে না। ফলে, কার্য-কারণশৃঙ্খলার ব্যতিক্রমেরও আশঙ্কা দেখা দেয় না।

অসৎকার্যবাদীর এইরূপ উক্তির প্রতিবাদে সৎকার্যবাদী বলেন, উপাদান কারণে কার্যজননী শক্তি আছে; সেই শক্তিবশতঃই বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ কার্য উৎপন্ন হয়, ইহা কে অস্বীকার করে? কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সেই কার্যজননী শক্তির স্বরূপ কি? দ্বিতীয়তঃ কার্য ঘটপ্রভৃতির পূর্বে ঘটের উপাদান মাটিতে যে ঘটজননী শক্তি আছে, সেই শক্তির সহিত ভাবী ঘটের কোনরূপ সম্পর্ক আছে কিনা? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই, মাটির শুধু মৃন্ময় ঘট প্রভৃতি উৎপাদনেরই সামর্থ্য (শক্তি) আছে, বস্ত্র উৎপাদনের সামর্থ্য নাই, সূতার বস্ত্র উৎপাদনেরই সামর্থ্য আছে, ঘট উৎপাদনের সামর্থ্য নাই। বিশেষ কারণে বিশেষ কার্য উৎপাদনের এই যে সামর্থ্য, ইহাই কারণের কার্যজননী শক্তি। শক্তির কার্য দেখিয়াই এই

১। যথাহুঃ সাংখ্যবৃদ্ধাঃ—

অসত্ত্বে নাস্তি সম্বন্ধঃ কারণৈঃ সত্ত্বসঙ্গিভিঃ।
অসম্বদ্ধস্য চোৎপত্তিমিচ্ছতো ন ব্যবস্থিতিঃ॥

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর ৯ম কারিকায় উদ্ধৃত শ্লোক।

শক্তির অনুমান হইয়া থাকে। এই শক্তি অসৎ পদার্থ নহে; কারণে এই শক্তি নাই, তাহাও নহে। কারণে যদি এই শক্তি না থাকিত, কিংবা ইহা যদি অসৎ পদার্থ হইত, তবে মাটি হইতে মৃন্ময় ঘটই কেন জন্মে, কাপড় কেন জন্মে না, তাহার কোন সদুত্তর পাওয়া যাইত না। তাহাকেই সেই কার্যের উপাদান বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেই কারণে সেই বিশেষ কার্যেরই প্রজননশক্তি রহিয়াছে। কারণের কার্যনিয়ামিকা এই শক্তি কারণ হইতে ভিন্ন তত্ত্ব কিছু নহে। কার্যোৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্যের অনাগত বা অপরিস্ফুট (অব্যাকৃত) অবস্থাই কার্যজননী শক্তি বলিয়া পরিচিত। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এই শক্তির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—প্রতিনিয়ত কারণ হইতে প্রতিনিয়ত কার্যের উৎপত্তি দেখিয়া কারণে কার্য-নিয়ামিকা এই শক্তির কল্পনা করিতে হইবে। এই শক্তি অসৎ পদার্থ নহে। কারণের অতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র তত্ত্বও নহে। এই শক্তি কারণেরই স্বরূপ, কারণ হইতে ইহা অভিন্ন। কার্যবর্গ এই শক্তিরই অভিব্যক্তি।[১] ভাবী কার্যের অনাগত বা অপরিস্ফুট অবস্থাকেই যদি উপাদানের কার্যজননী শক্তি বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে সেই শক্তির সহিত ভবিষ্যৎ কার্যের সম্পর্কও অবশ্য স্বীকার্য। কার্যের উপাদানে অবস্থিত সেই শক্তির সহিত কার্যের যদি কোনরূপ সম্বন্ধই না থাকে; তবে মাটি হইতে যেমন ঘট হয়, সেইরূপ কাপড়ের উৎপত্তি হইতেই বা বাধা কি? মাটিতে যে ঘটের উৎপাদিকা শক্তি রহিয়াছে তাহার সহিত ঘটের যেমন কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, কাপড়েরও কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। এই অবস্থায় মাটি হইতে ঘটই হইবে, কাপড় হইবে না, ইহা কি করিয়া বলা যায়? এইরূপে সকল কারণ হইতেই সকল কার্যের উৎপত্তির প্রশ্ন দুর্নিবার হয়। এইজন্যই উপাদান-শক্তির সহিত ভাবী কার্যের সম্পর্ক স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কারণ, শক্তি কার্যসম্বদ্ধ হইয়াই কার্য উৎপাদন করে, অসম্বদ্ধ হইয়া করে না, এইরূপ সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত মানিয়া লইতে হয়। কার্য যদি

১। শক্তিশ্চ কারণস্য কার্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা নান্যাঽসতী বা কার্যং নিয়চ্ছেৎ; অসত্ত্বাবিশেষাদন্যত্বাবিশেষাচ্চ তস্মাৎ কারণস্য আত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতম্ কার্যম্।

ব্রহ্মসূত্র শং ভাষ্য, ২।২।১৭।

অসৎ হয়, তবে অসৎ কার্যের সহিত সৎকারণ-শক্তির সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না। সৎ ও অসতের সম্বন্ধ হয় না। ফলে, উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত অসৎকার্যবাদ গ্রহণ করা চলে না।[১]

সৎকার্যবাদীর সিদ্ধান্তে কার্য ও কারণ ভিন্ন নহে, অভিন্ন। মাটি হইতে যে মৃন্ময় ঘট প্রভৃতি জন্মে তাহা মাটি হইতে ভিন্ন নহে। কার্যমাত্রই কারণের রূপান্তরমাত্র। মাটি হইতে ঘট অভিন্ন পদার্থ হইলে, ঘটের উপাদান মাটি যেমন ঘটের উৎপত্তির পূর্বেও সৎ, মাটি হইতে অভিন্ন ঘটও সেইরূপ উৎপত্তির পূর্বে সৎ। ইহাই ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় "কারণভাবাচ্চ সৎ কার্যম্" এই কথাদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন।[২]

কার্য যে কারণেরই অবস্থাবিশেষ, কারণ হইতে ভিন্ন নহে ইহা বুঝাইবার জন্য বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বিবিধ অনুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহার বলে কার্য ও কারণের অভেদ সিদ্ধান্ত স্থাপন করত: সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদ সমর্থন করিয়াছেন :—

(ক) কাপড় (পক্ষ), সূতা হইতে ভিন্ন নহে (সাধ্য), যেহেতু কাপড় সূতারই ধর্ম অর্থাৎ একপ্রকার বিশেষ অবস্থা (হেতু) ; যে পদার্থ যে পদার্থ হইতে বিভিন্ন হয় ; সেই পদার্থ সেই পদার্থের ধর্ম হয় না। (ব্যতিরেক ব্যাপ্তি) ; যেমন অশ্ব হইতে ভিন্ন গোপ্রাণী অশ্বের ধর্ম নহে (দৃষ্টান্ত) ; কাপড় সূতার ধর্ম বা অবস্থা বিশেষ (উপনয়) ; অতএব কাপড় সূতা হইতে ভিন্ন নহে (নিগমন)।[৩]

(খ) কাপড় (পক্ষ) তাহার উপাদান সূতা হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে (সাধ্য) ; যেহেতু কাপড় ও সূতার মধ্যে উপাদান-উপাদেয়ভাব আছে (হেতু) ; যাহারা পরস্পর পৃথক্ পদার্থ হয়, তাহাদের মধ্যে উপাদান-

১। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, ৯ম কারিকা দ্রষ্টব্য।

২। কারণভাবাচ্চ কার্যস্য কারণাত্মকত্বাদ্, নহি কারণাদ্ ভিন্নং কার্যম্ কারণঞ্চ সদিতি কথং তদভিন্নং কার্যমসদ্ ভবেৎ।

সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী ৯ম কারিকা।

৩। (ক) ন পটস্তন্তুভ্যো ভিদ্যতে তদ্ধর্মত্বাৎ ইহ যদ্‌যতো ভিদ্যতে তৎ তস্য ধর্মো ন ভবতি যথা গৌরশ্বস্য—ধর্মশ্চ পটস্তন্তূনাং তস্মান্নার্থান্তরম্।

(খ) উপাদানোপাদেয়ভাবাচ্চ নার্থান্তরত্বং তন্তুপটয়োঃ যয়োরর্থান্তরত্বং ন তয়ো-

উপাদেয়ভাব থাকে না (ব্যাপ্তি); যেমন ঘট এবং পট বা কাপড় (দৃষ্টান্ত); কাপড় ও সূতার মধ্যে উপাদান-উপাদেয় ভাব আছে (উপনয়); অতএব ইহারা পরস্পর পৃথক্ পদার্থ নহে (নিগমন)।

(গ) সূতা এবং কাপড় (পক্ষ); পৃথক্ পদার্থ নহে (সাধ্য); যেহেতু ইহারা পরস্পর সংযোগ এবং বিভাগের আশ্রয় হয় না (হেতু); যাহারা পরস্পর বিভিন্ন হয়, তাহাদেরই সংযোগ কিংবা বিভাগ দৃষ্ট হয় (ব্যাপ্তি); যেমন পুস্তক এবং পুস্তকাধার অথবা যেমন হিমাচল এবং বিন্ধ্যাচল (দৃষ্টান্ত)। সূতা এবং কাপড় ইহাদের পুস্তক পুস্তকাধারের মত সংযোগও হয় না, হিমাচল বিন্ধ্যাচলের মত বিভাগও ঘটে না (উপনয়); সুতরাং ইহারা পরস্পর ভিন্ন নহে। সংযোগ ও বিভাগ ঘটেনা বলিয়া সূতা এবং কাপড় যেমন অভিন্ন, সূতার রূপ প্রভৃতিও ঐ একই যুক্তি-বলে সূতা হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিবে।

(ঘ) কাপড় (পক্ষ) উহার উপাদান সূতা হইতে ভিন্ন নহে (সাধ্য); যেহেতু কাপড় ও সূতা এই উভয়েরই ওজন সমান (হেতু) যে বস্তু যে বস্তু হইতে ভিন্ন হয়, তাহাদের ওজন সমান হয় না; যেমন ৪ তোলা সোনার গহনা ও ৮ তোলা সোনার গহনা (দৃষ্টান্ত); সূতা ও কাপড়ের ওজনের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ দেখা যায় না (উপনয়); সুতরাং কাপড় ও সূতা বিভিন্ন নহে, অভিন্ন[১] (নিগমন)। ওজনের তারতম্য (অসাম্য) দেখিয়া বস্তুর অসাম্য বা ভিন্নতা আমরা লক্ষ্য করি। চার তোলা সোনার প্রস্তুত গহনা তুলাদণ্ডে চাপাইলে তুলাদণ্ডের পাল্লা যতটুকু নীচে নামিয়া

রূপাদানোপাদেয়ভাবো যথা ঘটপটয়োঃ। উপাদানোপাদেয়ভাবশ্চ তন্তুপটয়োঃ তস্মান্নার্থান্তরত্বমিতি।

(গ) ইতশ্চ নার্থান্তরত্বং তন্তুপটয়োঃ সংযোগাপ্রাপ্ত্যভাবাৎ অর্থান্তরত্বে হি সংযোগো দৃষ্টঃ যথা কুণ্ডবদরয়োঃ অপ্রাপ্তির্বা হিমবদ্‌বিন্ধ্যয়োঃ নচেহ সংযোগাপ্রাপ্তী নস্মাননার্থান্তরত্বমিতি।

সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী ৯ম করিকা।

১। ইতশ্চ পটস্তন্তুভ্যো ন ভিদ্যতে গুরুত্বান্তর-কার্যাদর্শনাৎ। ইহ যদ্ যস্মাদ্ ভিন্নং তস্মাত্তস্য গুরুত্বান্তরকার্যং গৃহ্যতে।……ন চ তথা তন্তুগুরুত্বকার্যাৎ পটগুরুত্বকার্যান্তরং দৃশ্যতে,—তস্মাদভিন্নস্তন্তুভ্যঃ পট ইতি।

সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী ৯ম কারিকা।

আসিবে, ৮ তোলা সোনায় নির্মিত গহনায় পরিমাপ যন্ত্রের অবনতি তাহা হইতে অধিক হইবে সন্দেহ নাই। ফলে, চার তোলা সোনার গহনা যে ৮ তোলা সোনায় প্রস্তুত গহনা হইতে ভিন্ন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কাপড় ও তাহার উপাদান সূতা তুলাদণ্ডে চাপাইলে দুই পাল্লার কোন পাল্লাই নীচে নামিয়া আসিবে না। ইহা হইতে উহাদের ওজন যে সর্বাংশে সমান ইহাই প্রমাণিত হইবে। কাপড় সূতার ওজনের সাম্য উহাদের অভেদ বুদ্ধির হেতু বলিয়া জানিবে। বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীতে কাপড় ও সূতার ওজনের সাম্যকেই হেতুরূপে নির্দেশ করিয়া, কাপড় যে সূতা হইতে ভিন্ন নহে, তাহা অনুমান করিয়াছেন।

(ঙ) সূতা কাপড়ের অবয়ব, কাপড় অবয়বী, এইরূপে সূতা এবং কাপড়ের মধ্যে অবয়ব-অবয়বিভাব আছে। যে পদার্থদ্বয় পরস্পর বিভিন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে অবয়ব-অবয়বিভাব থাকে না। যেমন গরু ও ঘোড়া। ইহারা বিভিন্ন প্রাণী। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ অবয়ব-অবয়বিভাব নাই। সূতা ও কাপড়ের মধ্যে অবয়ব-অবয়বিভাব আছে। সুতরাং সূতা ও কাপড় বিভিন্ন নহে, অভিন্ন।[১]

এইরূপ আরও বিবিধ অনুমান প্রয়োগের সাহায্যে সৎকার্যবাদী কার্য ও কারণের অভেদ উপপাদন করিয়াছেন। কাপড় ও সূতা অভিন্ন হইলে, কাপড়ের উপাদান সূতা যখন সৎ তদভিন্ন কাপড়ও সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব হইতেই সৎ। প্রশ্ন হইতে পারে যে, সূতা ও কাপড় অভিন্ন হইলে এইগুলি সূতা, এইখানি কাপড় এইরূপে কাপড়ের উপাদান সূতা এবং সূতায় প্রস্তুত কাপড়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধির উদয় হয় কেন? এইরূপ আপত্তির উত্তরে সৎকার্যবাদী বলেন—সূতাগুলিই একপ্রকার বিশেষ অবস্থায় পরস্পর সংযুক্ত-বিযুক্ত হইয়া বস্ত্র আখ্যা লাভ করে। বস্তুতঃ পক্ষে সূতা ভিন্ন বস্ত্র বলিয়া স্বতন্ত্র কোন দ্রব্য নাই। আচার্য শঙ্করও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে অবয়বীর মিথ্যাত্ব-সাধন করিতে গিয়া অনুরূপ উক্তিই করিয়াছেন।[২]

১। অর্থান্তরমর্থান্তরস্য অবয়বো ন ভবতি যথা ন গৌরশ্বস্য অবয়বঃ—অবয়বাশ্চ তন্তবঃ অবয়বী চ পটঃ—তস্মান্নাসৌ তেভ্যোঽর্থান্তরম্।

বালরামোদাসীনকৃত বিদ্বত্তোষিণী টীকা সাংখ্যকারিকা ৯ম।

২। (ক) এবমভেদে সিদ্ধে তন্তব এব তেন তেন সংস্থানভেদেন পরিণতাঃ পটো ন তন্তুভ্যোঽর্থান্তরং পটঃ। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, ৯ম কারিকা।

সৎকার্যবাদীর কার্য ও কারণের অভেদ সাধক উল্লিখিত অনুমানের প্রমাণ্য অসৎকার্যবাদী ন্যায়-বৈশেষিক স্বীকার করেন না। ন্যায়-বৈশেষিক বলেন, ঘটের উপাদান মাটির ঢেলাও বিশেষ আকারধারী (কম্বুগ্রীবাদিমান্) ঘট যে ভিন্ন পদার্থ তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় প্রত্যক্ষ বাধিত সৎকার্যবাদীর অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিরূপে ? প্রত্যক্ষ-বাধিত বলিয়াই তো ঐ সকল অনুমান অপ্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল অনুমান সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস-কলুষিত বলিয়াও উহাদের কোনরূপ মূল্য দেওয়া চলে না। ন্যায়-বৈশেষিক নিম্নোক্ত প্রতিপক্ষ অনুমান উদ্ভাবন করিয়া কার্য ও কারণের অভেদ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করতঃ কার্যকারণের ভেদই সমর্থন করিয়াছেন।

অসৎ কার্যবাদী ন্যায়-বৈশেষিক কর্তৃক সৎকার্য্যবাদীর অনুমান খণ্ডন

(ক) সূতাগুলি কাপড় হইতে ভিন্ন, যেহেতু ঐগুলি কাপড়ের কারণ। কাপড়ের অন্যতম কারণ বয়ন-যন্ত্র যেমন কাপড় হইতে ভিন্ন, কাপড়ের উপাদান কারণ সূতাগুলিও সেইরূপ কাপড় হইতে ভিন্ন হইবে বৈ কি ?[১]

(খ) কাপড়ের দ্বারা অঙ্গাবরণ প্রভৃতি যে সকল কার্য সাধন করা যায়, সূতাদ্বারা তাহা পারা যায় না ; আবার সূতাদ্বারা যে কাজ হয়, কাপড়ের দ্বারা সেই কাজ হয় না। ঘটের দ্বারা জল আহরণ করা যায়, মাটির দ্বারা তাহা যায় না, মাটির দ্বারা গৃহের ভিত্তি প্রভৃতি প্রস্তুত করা চলে, ঘটের দ্বারা তাহা চলে না। এইরূপে সূতা ও কাপড়, মাটি ও ঘট আমাদের জীবনের যাত্রাপথে বিভিন্ন প্রয়োজন সাধন করে বলিয়া, সূতা ও কাপড়, মাটি ও ঘট যে বিভিন্ন বস্তু ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

(খ) কেবলাস্তু তন্তব এব আতানবিতানবন্তঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যন্তে (নতু পটো নাম দ্রব্যান্তরম্)।

ব্রহ্মসূত্র শং ভাষ্য, ২।১।১৫।

১। অর্থান্তরং পটাৎ তন্তবঃ তদ্‌হেতুত্বাৎ তুর্যাদিযদিতি, তুর্যাদিপটকারণমর্থান্তরং দৃষ্টং তথা চ তন্তবঃ, তস্মাদর্থান্তরমিতি।

বালরামোদাসীনকৃত বিদ্বত্তোষিণীটীকা, ৯ম কারিকা।

(গ) সূতা, কাপড়, ঘট, মাটি প্রভৃতি দেখিয়া, এইগুলি সূতা, ইহা একখানা কাপড়, ইহা মাটির ঢেলা, এইটি ঘট, প্রত্যক্ষদর্শীর এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানোদয় হইতে দেখা যায়। জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদই জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর ভেদ উপপাদন করে। রূপজ্ঞান এবং রসজ্ঞান দুইটি ভিন্ন জ্ঞান। কারণ, ঐ জ্ঞানের বিষয় রূপ ও রস ভিন্ন পদার্থ। ইহা হইতে কাপড় উহার উপাদান সূতা হইতে বিভিন্ন, যেহেতু কাপড় ও সূতা (রূপ ও রসের মত) ভিন্ন প্রকার জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে এইরূপ অনুমান করা অসম্ভব হয় না। তারপর, ইহা মাটি, ইহা ঘট, এইগুলি সূতা. এইখানি কাপড় এইরূপ নামভেদও উপাদান এবং উপাদেয়ের বিভেদই সূচনা করে, অভেদ সাধন করে না।[১]

(ঘ) কাপড় উহার উপাদান সূতা হইতে ভিন্ন। কারণ, সূতা হইতে কাপড় উৎপন্ন হয়, সূতার অভাবে কাপড় বিনষ্ট হয় ইহা কে না জানে? কার্য ও কারণ অভিন্ন হইলে, সহজ কথায় কাপড় ও সূতা একই বস্তু হইলে, নিজ হইতে নিজের উৎপত্তি এবং নিজেতে নিজের বিলয় সম্ভব হয় কিরূপে? 'কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে' 'কাপড় বিনষ্ট হইয়াছে' এইরূপে কাপড়ের উৎপত্তি বিনাশ সুধীমাত্রেই প্রত্যক্ষ করেন। ফলে, কাপড় ও তাহার উপাদান সূতা যে অভিন্ন নহে, বিভিন্ন এই সিদ্ধান্তই আসিয়া দাঁড়ায়।[২]

নৈয়ায়িক অসৎকার্যবাদের সমর্থনে এবং সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদের খণ্ডনে যে সকল প্রতিপক্ষানুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ সকল অনুমান যে অনুমানাভাস, প্রকৃত অনুমান নহে, ন্যায়োক্ত অনুমান বিশ্লেষণ করিলেই তাহা সুধী পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

ন্যায়োক্ত সৎপ্রতিপক্ষানুমানের খণ্ডনে সাংখ্যের বক্তব্য

(ক) সূতা কাপড়ের কারণ সুতরাং কাপড় হইতে সূতা ভিন্ন পদার্থ; যেমন কাপড়ের কারণ বয়নযন্ত্র প্রভৃতি কাপড় হইতে ভিন্ন পদার্থ। এই-

১। পটঃ তন্তুভ্যো ভিদ্যতে সামর্থ্যভেদাৎ অর্থক্রিয়াভেদাৎ, ভিন্নপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ। ব্যপদেশভেদাদিত্যাদ্যনুমানপ্রয়োগা উহনীয়াঃ।

সাংখ্যকারিকা বিদ্বত্তোষিণী টীকা, ৯ম কারিকা।

২। পটস্তন্তুভ্যো ভিদ্যতে তত্র উৎপন্নত্বেন তত্র নষ্টত্বেন চ প্রতীয়মানত্বাৎ। যো ন ভিন্নো ন স তত উৎপদ্যতে যথা তন্তবঃ।

সাংখ্যকারিকার বালরামোদাসীনকৃত বিদ্বত্তোষিণী টীকা, ১১২ পৃষ্ঠা।

রূপে সূতা ও কাপড়ের, উপাদান ও উপাদেয়ের ভেদসাধনের উদ্দেশ্যে যে অনুমান অনুমান বিশেষজ্ঞ তার্কিক প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার কোনও মূল্য নাই। কারণ, উপাদান ও উপাদেয়ের ভেদের সাধনে আলোচ্য অনুমানে বয়নযন্ত্র প্রভৃতি নিমিত্তকারণকে যে দৃষ্টান্ত হিসাবে নৈয়ায়িক উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণহিসাবে উপাদান এবং নিমিত্ত একই পর্যায়ে পড়িলেও, উপাদান ও নিমিত্তের মধ্যে যে গুরুতর প্রভেদ আছে তাহা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে। উপাদানের বিনাশে কার্যের বিনাশ হয়; নিমিত্তকারণ বিনষ্ট হইলেও কার্য বিনষ্ট হয় না। এইরূপে উপাদান-কারণের সহিতই কার্যের সত্তা ও অসত্তার প্রশ্ন জড়িত আছে, নিমিত্ত কারণের সহিত নাই। এই অবস্থায় উপাদান ও উপাদেয় কার্যের সম্পর্ক বিচারে নিমিত্ত-কারণকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থিত করিলে, সেই দৃষ্টান্ত অসদ্ দৃষ্টান্তই হইবে। অনুমানও দৃষ্টান্তাসিদ্ধি হেত্বাভাস-দোষে কলুষিত হইবে তাহা নৈয়ায়িক লক্ষ্য করিয়াছেন কি? নিমিত্ত ও কার্য যে বিভিন্ন তাহা কে না স্বীকার করেন? তন্তুবায়, তাহার বয়ন-যন্ত্র যে কাপড় নহে, তাহা স্থির মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে বলিয়া দিতে হয় কি? কেবল কাপড়ের উপাদান সূতার সহিত সূত্রনির্মিত বস্ত্রের সম্পর্ক কি? তাহাই এখানে আলোচনার বিষয়। সেই আলোচনায় কার্যের নিমিত্ত-কারণকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে সেই দৃষ্টান্ত যে সাধ্যসিদ্ধির সহায়ক না হইয়া, ব্যাঘাতক হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

(খ) মাটি ও ঘট, সূতা ও কাপড় জীবনযাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন সাধন করে বলিয়া, মাটি ও ঘট, সূতা ও কাপড় প্রভৃতি অভিন্ন বস্তু নহে, ভিন্ন বস্তু। এইরূপে অনুমানমূলে কারণ ও কার্যের ভেদসাধনের যে প্রয়াস তার্কিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও বিশেষ কোন মূল্য দেওয়া যায় না। কেননা, সাংখ্যোক্ত কার্য ও কারণের অভেদ সিদ্ধান্তকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিয়া, ভেদ দৃষ্টিকে আবির্ভাব ও তিরোভাবরূপ উপাধি কল্পিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও ন্যায়োক্ত হেতুগুলির উপপাদন সম্ভবপর হয়। ফলে, ন্যায়-বৈশেষিক প্রদর্শিত হেতুসকল কার্য ও কারণের বাস্তবভেদ সাধনে একান্তভাবে সমর্থ নহে বলিয়া, ঐ সকল হেতু 'অনৈকান্তিক' হেত্বাভাসই হইয়া দাঁড়ায়। প্রয়োজনের ভেদ থাকিলেই যে সেক্ষেত্রে বস্তু-

ভেদও থাকিবে, ইহা নৈয়ায়িককে কে বলিল? একই বস্তুকেও বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন সাধন করিতে দেখা যায়। একই অগ্নি কাষ্ঠ-তৃণাদি দগ্ধ করে, আমাদের ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সম্পাদন করে, মন্দির প্রাসাদ প্রভৃতি আলোকিত করে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন সাধন করায় অগ্নির ভেদ হইবে কি? একজন শিবিকা-বাহক শিবিকা বহন করিতে পারে না। কিন্তু গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিতে পারে। অপরাপর শিবিকা-বাহকদিগের সহিত মিলিত হইলে, তবেই সে শিবিকা বহন করিতে পারে। এখানে একক পথপ্রদর্শক শিবিকাবাহক ও শিবিকা-বাহনে নিযুক্ত দলভুক্ত শিবিকা-বাহক একই ব্যক্তি; ভিন্ন ব্যক্তি নহে। শিবিকাবাহকগণ প্রত্যেকে শিবিকাবাহনে অসমর্থ হইলেও, তাহারাই মিলিতভাবে যেমন শিবিকা বহনরূপ কার্য সম্পাদন করিতে পারে, সেইরূপ কাপড়ের উপাদান সূতাগুলি একক-ভাবে দেহের আবরণ, লজ্জা নিবারণ প্রভৃতি কার্যে অক্ষম হইলেও মিলিতভাবে সূতাগুলি বস্ত্রের আকার প্রাপ্ত হইয়া দেহাবরণ প্রভৃতি সাধন করিতে পারে। কাপড়ের উপাদান সূতাগুলি এক প্রকার বিশেষ সংযোগের সূত্রে গ্রথিত হইলে কাপড়ের রূপ প্রাপ্ত হয় এবং দেহাবরণ প্রভৃতি সাধন করে, সূতা এককভাবে তাহা করে না, করিতে পারে না। সূতা ও সূত্রনির্মিত বস্ত্র বিভিন্ন প্রয়োজন সাধন করিলেও তাহা দ্বারা সূতারই রকমান্তর বস্ত্র যে সূতা হইতে ভিন্ন পদার্থ, এইরূপ বুঝিবার কোন হেতু নাই।[১] পক্ষান্তরে,

---

১। (ক) ন চার্থ ক্রিয়াভেদোঽপি ভেদমাপাদয়তি, একস্যাপি নানার্থক্রিয়াদর্শনাৎ, যথৈক এব বহ্নির্দাহকঃ পাচকঃ প্রকাশকশ্চেতি। নাপ্যর্থক্রিয়াব্যবস্থা বস্তুভেদে হেতুঃ, তেষামেব সমস্তব্যস্তানামর্থক্রিয়াব্যবস্থাদর্শনাৎ, যথা প্রত্যেকং বিষ্টয়ো বর্ত্মদর্শনলক্ষণামর্থক্রিয়াং কুর্বন্তি ন তু শিবিকাবহনং মিলিতাস্তু শিবিকাং বহন্তি, এবং তন্তবঃ প্রত্যেকং প্রাবরণমকুর্বাণা অপি মিলিতা আবির্ভূতপটভাবাঃ প্রাবরিষ্যন্তি।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, ৯ম কারিকা,

(খ) অর্থক্রিয়ায়াঞ্চ প্রত্যেকমসমর্থা অপ্যনারভ্যৈবার্থান্তরং কিঞ্চিন্মিলিতাঃ কুর্বন্তো দৃশ্যন্তে, যথা গ্রাবাণ উখাধারণমেকম্, এবমনারভ্যৈবার্থান্তরং তন্তবো মিলিতাঃ প্রাবরণমেকং করিষ্যন্তীতি।

ভামতী অঃ ২, পাঃ ১, সূঃ ১৫।

সূতাগুলিকে বাদ দিলে বা সরাইয়া লইলে, কাপড়ের যখন কোন অস্তিত্ব থাকে না, তখন কাপড়কে সূতা হইতে পৃথক্ একটি অবয়বী বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, কাপড়কে সূতারই একপ্রকার বিশেষ অবস্থা বলিয়া গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। সূতার কাপড়কে সূতারই একপ্রকার বিশেষ অবস্থা বলিয়া গ্রহণ করিলে, অবয়ব ও অবয়বীর নামভেদ, রূপভেদ, জ্ঞানভেদ প্রভৃতির উপপাদনও সহজসাধ্য হয়।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইবে যে, কার্যের ভেদ হইলেই যে বস্তুর ভেদ হইবে, এমন কোন নিয়ম (ব্যাপ্তি) নাই। একের ও বিভিন্ন কার্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, 'যেখানেই বিভিন্ন কার্যকারিতা থাকিবে, সেখানেই বস্তুভেদ থাকিবে',[১] নৈয়ায়িকের এই ব্যাপ্তি নির্দোষ নহে। উপাদান ও উপাদেয়ের ভেদসিদ্ধির সহায়কও নহে; 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি'হেত্বাভাস-দোষে ইহা কলুষিত।

(গ) এক গাছি সূতা অবশ্য কাপড় নহে। সূতাগুলি বিশেষ সংযোগ সূত্রে গ্রথিত হইলেই, উহাকে কাপড় বলে। সূতা হইতে কাপড়ের পার্থক্য এবং উহাদের স্বতন্ত্র কার্যকারিতা সকলেই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কাপড়ের জ্ঞান এবং সূতার জ্ঞান, দুইটি জ্ঞান। ঐ জ্ঞানদ্বয়ের বিষয় সূতা ও কাপড় বিভিন্ন বলিয়াই যে ঐরূপ জ্ঞান ভেদ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইহা দ্বারাই সূতা এবং সূতারই বিচিত্র বিন্যাসের ফলে উৎপন্ন কাপড়ের ভেদ যে বাস্তব, উপাধিকল্পিত নহে, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? সূতা ও কাপড়ের ভেদকে সূতার এক বিশেষ অবস্থাপরিকল্পিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেই বা তাহাতে প্রতিবাদীর আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? নামভেদ, রূপভেদ, জ্ঞানভেদ, ক্রিয়াভেদ প্রভৃতি কোন প্রকার ভেদ বুদ্ধিই কাপড় ও সূতার বাস্তব ভেদ সাধন করিতে পারে না। কাপড়কে সূতারই বিশেষ বিন্যাস বা রকমান্তর বলিয়া বুঝিয়াও সংজ্ঞাভেদ, জ্ঞানভেদ প্রভৃতি ভেদের উপপাদন অনায়াসেই করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় কার্য ও কারণের বাস্তব ভেদের সাধক ন্যায়োক্ত সংজ্ঞাভেদ, রূপভেদ, জ্ঞানভেদ, ক্রিয়াভেদ প্রমুখ ন্যায়োক্ত হেতুগুলি হেত্বাভাসই হইবে

১। যত্র যত্র বিভিন্ন কার্যকারিত্বং তত্র তত্র বস্তুভেদ ইতি ব্যাপ্তিঃ ন সার্বত্রিকীতি ভাবঃ। বিদ্বত্তোষিণী, ১১৫ পৃঃ,

নাকি ?[১] (ঘ) সূতা হইতে কাপড় উৎপন্ন হয়, পরিণামে সূতাতেই কাপড় বিলীন হয়। কার্য ও কারণ একই পদার্থ হইলে, একই বস্তুতে এইরূপ উৎপত্তি ও বিলয় ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং কার্য ও কারণের বিভেদই তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। এইরূপে নৈয়ায়িক কার্য ও কারণের ভেদ সিদ্ধির অনুকূলে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা কার্য ও কারণের বাস্তব ভেদ সাধনের সহায়ক হয় না। এক বা অভিন্ন বস্তুতেও ক্ষেত্রবিশেষে ভেদ বুদ্ধির উদয় হইতে দেখা যায়। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষের সমষ্টিই বন। বন এবং বনস্থ তরুরাজি অভিন্ন হইলেও, 'বনে তরুরাজি' (বনে বৃক্ষাঃ) এইরূপে বন ও বৃক্ষের আধার-আধেয়ভাবের বোধ সুধীমাত্রেরই উৎপন্ন হয়। সূতা এবং সূত্রনির্মিত বস্ত্র বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও, বিশেষ একপ্রকার সংযোগসূত্রে গ্রথিত সূত্রসমূহে 'ইহা একখানি কাপড়' (একোঽয়ং পটঃ), এই প্রকার কল্পিত ভেদবুদ্ধির, তরুরাজিতে বনবুদ্ধির ন্যায়, উদয় হইতে কোন বাধা দেখা যায় না। অতএব "কাপড় সূতা হইতে বিভিন্ন, যেহেতু সূতা হইতেই কাপড়ের উৎপত্তি হয়, সূতাতেই কাপড় বিলীন হয়। যে বস্তু যাহা হইতে ভিন্ন নহে, সে তাহা হইতে উৎপন্ন হয় না"।[২] এইরূপ ন্যায়োক্ত অনুমান কার্য ও কারণের ভেদ সাধন করে না। একই সূত্র উহার এক বিশেষ অবস্থায় কাপড়ের রূপ প্রাপ্ত হইলে, সূতা হইতে কাপড়ের উৎপত্তি এবং সূতার বিচিত্র সংযোগগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইলে কাপড়ের উপাদান সূতায় কাপড়ের বিলয় অনায়াসেই ব্যাখ্যা করা যায়। ফলে, ন্যায়োক্ত (তত উৎপন্নত্বাৎ, তত্র বিনষ্টত্বাৎ এই) হেতু যে অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ?[৩]

১। পটীয়ানাগতাবস্থাবৎসু তন্তুষু তন্তব ইমে ইতি প্রত্যয়ঃ, পটীয়বর্তমানতাবস্থাবৎসু চ তেষু পটোঽয়মিতি প্রত্যয় ইত্যেকস্মিন্নপি বিলক্ষণবুদ্ধিবোধ্যত্বস্য উপপন্নত্বাদ্ বিভিন্ন-প্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ তন্তুপটয়োর্ভেদ ইতি ন্যায়বার্তিকাভিহিতমপি ন যুক্তমিত্যপি বোধ্যম্। বিদ্বত্তোষিণী টীকা, ১১৫ পৃঃ।

২। পটস্তন্তুভ্যো ভিদ্যতে তত্র উৎপন্নত্বেন তত্র বিনষ্টত্বেন চ প্রতীয়মানত্বাৎ। বিদ্বত্তোষিণী টীকা, ১১২ পৃঃ।

৩। (ক) সংস্থান ভেদেন একস্মিন্নপ্যুৎপত্তিনিরোধপ্রত্যয়স্য উপপন্নত্বাৎ ন তদ্বলেন ঘটাদীনাং মৃদাদিভ্যো ভিন্নত্বমিতি তত্ত্বম্। বিদ্বত্তোষিণী টীকা, ১১৪ পৃঃ।

ভেদবাদ বা অসৎকার্যবাদ-সাধনের উদ্দেশ্যে নৈয়ায়িক যে সকল হেতুর অবতারণা করিয়াছেন, অভেদবাদেও ঐসকল হেতুর উপপাদন সম্ভবপর বুঝিয়াই শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র ঐসকল হেতুর উল্লেখ করিয়া তদীয় সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীতে বলিয়াছেন, ন্যায়-প্রদর্শিত হেতুসকল কার্য ও কারণের বাস্তব ভেদের সাধক হয় না।

"নৈকান্তিকং ভেদং সাধয়িতুমর্হন্তি।"[১] সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী ৯ম কারিকা। একই বস্তুর বিশেষপ্রকার আবির্ভাব এবং তিরোভাবের ক্ষেত্রেও ঐসকল হেতুর প্রয়োগ যে অনায়াসেই ব্যাখ্যা করা যায় তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি।[২] ফলে, ন্যায়োক্ত অনুমানের হেতুগুলি হেত্বাভাসই হইয়া

(খ) ইহ তন্তুষু পট ইতি ব্যপদেশোঽপি যথা 'ইহ বনে তিলকাঃ' ইতি বদুপপন্নঃ।

সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী, ৯ম কারিকা,

(গ) 'যথেহবনে তিলকাঃ' ইতি তিলক নামক তরুসমুদায়স্যৈব বনত্বেন তিলক-বনয়োরভেদেঽপি যথাধারাধেয়ব্যবহার এবমেব অনেকেষু তন্তুষ্বেকোঽয়ং পট ইত্যেকত্বব্যপদেশোঽপি এক প্রাবরণলক্ষণ প্রযোজনাবচ্ছেদাদ্ বোধ্যো যথৈক-দেশকালাবচ্ছিন্নেষু বহুষ্বপি তরুষু ইদমেকং বনমিতি।

বলরামোদাসীনকৃত বিদ্বত্তোষিণী, ১১৫ পৃঃ।

১। 'ঐকান্তিক ভেদ সাধন করে না' এইরূপ বাচস্পতির উক্তির বিশ্লেষণে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তদীয় ন্যায়দর্শনে বলিয়াছেন—"সাংখ্যমতেও উপাদান কারণ ও কার্যের আত্যন্তিক অভেদই নাই, কিন্তু কোনরূপে ভেদও আছে, ইহাই (বাচস্পতি) সিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্বে ঘট কোনরূপে সৎ এবং কোনরূপে অসৎ, এই মতেরই সিদ্ধি হইবে। তাহা হইলে সদসদ্বাদ বা জৈনসম্মত "স্যাদ্বাদ" স্বীকারে বাধা কি"? ন্যায়দর্শন, ৪।১।৪৯।

আমাদের মনে হয়, কার্য ও কারণের অভেদই সৎকার্যবাদীর সিদ্ধান্ত। ভেদ কার্যের আবির্ভাব এবং তিরোভাবরূপ উপাধিকল্পিত। ইহাই বাচস্পতির উক্তির মর্ম। ভেদ ও অভেদ দুইই একই স্তরের তত্ত্ব হইলেই সেখানে স্যাদ্বাদের আপত্তি আসে। অভেদ সত্য, ভেদ কল্পিত সুতরাং মিথ্যা, এইরূপে অভেদ ও ভেদের তথ্য বিচার করিলে অভেদ ও ভেদ যে একই স্তরের বস্তু নহে, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। সেক্ষেত্রে আর স্যাদ্বাদের আপত্তি চলে না।

২। স্বাত্মনি ক্রিয়ানিরোধবুদ্ধিব্যপদেশার্থক্রিয়াভেদাশ্চ নৈকান্তিকং ভেদং সাধয়িতুমর্হন্তি, একস্মিন্নপি তত্তদ্‌বিশেষাবির্ভাব তিরোভাবাভ্যামেতেষামবিরোধাৎ।

সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী, ৯ম কারিকা।

দাঁড়ায়। ঐ অনুমানগুলিও হয় সুতরাং অনুমানাভাস। এই অবস্থায় নৈয়ায়িকের উল্লিখিত অনুমান সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়াই গণ্য হইবে না। সমবল বিরুদ্ধ-অনুমানই সৎপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানের প্রয়োগে পরস্পর বিরুদ্ধ অনুমান দুইটির কোন একটিই প্রমাণের মর্যাদা লাভ করিবে না। এইজন্য 'সৎপ্রতিপক্ষ' অন্যতম হেত্বাভাস। তর্কের প্রয়োগের ফলে যদি বিরুদ্ধ অনুমানদ্বয়ের কোন একটির অপূর্ণতা ধরা পড়ে, তবে ঐ অসম্পূর্ণ দুর্বল অনুমানের দ্বারা সবল প্রতিপক্ষ অনুমানের বাধ সাধন করা চলে না। সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদের অনুমান উপনিষৎ-গীতা প্রমুখ তত্ত্বশাস্ত্রানুমোদিত[১] এবং বলিষ্ঠ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অবস্থায় অসৎকার্যবাদী ন্যায়-বৈশেষিক কর্তৃক পূর্বোক্ত অনুমানমূলে সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদের খণ্ডনকে নির্বিবাদে মানিয়া লওয়া যায় কিরূপে ?

উপরের আলোচনায় তর্কের ভিত্তিতে অসৎকার্যবাদ এবং সৎকার্যবাদের মূল্য যাচাই করা গেল। কার্য ঘট, বস্ত্র প্রভৃতি উৎপত্তির পূর্বে সৎ কি অসৎ, এই প্রশ্নে ভারতীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ দুই বিরুদ্ধ দলে বিভক্ত হইয়াছেন। নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, মীমাংসকের মতে উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ ; কারণ ব্যাপারের (কারণবর্গের বিভিন্ন কার্যাবলীর) ফলে পূর্বে অবিদ্যমান কার্যেরই উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে, এইরূপে উহারা অসৎকার্যবাদ সমর্থন করেন। ন্যায়-বৈশেষিকের সিদ্ধান্তে দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চমাত্রেরই মূল উপাদান পরমাণু। একটি পরমাণুর সহিত আর একটি পরমাণু মিলিত হইলে, দ্ব্যণুক নামক অভিনব একটি বস্তুর আরম্ভ বা উৎপত্তি হয়। তিনটি দ্ব্যণুকে মিলিয়া ত্রসরেণুর সৃষ্টি হয়, ত্রসরেণু হইতে চতুরণুক প্রভৃতি স্থূলতর পদার্থ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ সুজলা শ্যামলা গিরিকিরীটিনী এই বিচিত্র ধরণী জন্মলাভ করে। দ্ব্যণুকাদি ক্রমে জাগতিক পদার্থের আরম্ভ বা সৃষ্টি হয় বলিয়া, এই ন্যায়-বৈশেষিক মত "আরম্ভবাদ" আখ্যা লাভ করে। পূর্বোক্ত অসৎ-কার্যবাদই আরম্ভবাদের মূল। অসৎকার্যবাদকে সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করিলে আরম্ভবাদকেও নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। আরম্ভবাদী বা অসৎকার্যবাদী দার্শনিকগণ পরিণামবাদ স্বীকার করেন না।

১। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, ছান্দোগ্য, ৬।২।১।
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। গীতা, ২।১৬।

সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং বৈষ্ণব বেদান্তসম্প্রদায় পরিণামবাদ সমর্থন করিয়াছেন। সৎকার্যবাদই পরিণামবাদের ভিত্তি। কার্যবর্গ এইমতে উপাদান কারণেরই পরিণাম। অদ্বৈতবাদী পরিণামবাদের মূলসূত্র গ্রহণ করিয়াও, সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদ, অথবা বৈষ্ণববেদান্তীর পরিণামবাদ অনুমোদন করেন নাই। তিনি সৎকার্যবাদের পরিবর্তে সদ্‌বিবর্তনবাদ বা সৎকারণবাদ সমর্থন করিয়াছেন এবং কার্যবর্গকে মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। ব্রহ্ম-পরিণামবাদী বিভিন্ন বৈষ্ণবসম্প্রদায় বলেন, পরব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ এবং দৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মেরই পরিণাম। মাটি যেমন ঘটরূপে পরিণত হয়, কাঞ্চন যেমন কাঞ্চনময় ভূষণরাজিতে পরিণত হয়, দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, পরমব্রহ্মও সেইরূপ জগৎরূপে পরিণত হন। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং ঐ শ্রুতির ভিত্তিতে রচিত 'জন্মাদ্যস্য যতঃ।' ব্রঃ সূঃ ১।১।২। এই ব্রহ্মসূত্রেও জগদুপাদান ব্রহ্মের এইরূপ জগদাকারে পরিণামের কথাই বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবেদান্তকেশরী আচার্য শঙ্করও তদীয় ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব প্রকারান্তরে সমর্থন করিয়াছেন এবং তাহা সমর্থন করিতে গিয়া, দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, মাটি যেমন ঘটরূপে পরিণত হয়, সোনা যেমন স্বর্ণময় ভূষণে পরিণত হয়, এই সকল দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিয়াছেন। বিবর্তবাদী শঙ্করাচার্যের মতে ঐ সকল পরিণাম সত্য নহে, মিথ্যা। কারণই সত্য কার্য মিথ্যা, মাটিই সত্য ঘট মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা। 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিও জাগতিক ঘটপ্রমুখ বস্তুরাজি মিথ্যা এবং উহাদের উপাদান মাটি প্রভৃতিই সত্য, ইহা অতি স্পষ্টভাষার ঘোষণা করিয়াছেন। বিবর্তবাদবিদ্বেষী ব্রহ্ম-পরিণামবাদী বৈষ্ণব বেদান্তিদিগের মতে ব্রহ্ম-পরিণাম জগৎ মিথ্যা নহে, সত্য। তাঁহারা বলেন, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে," বৃহদাঃ ২।৫।১৯। এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে এবং অন্যান্য শ্রুতিবাক্যে যে মায়াশব্দ আছে, তাহা দ্বারা ব্রহ্মের শক্তিকেই বুঝায়। পরব্রহ্মের ঐ শক্তি মিথ্যা নহে, সত্য। শক্তির পরিণাম জগৎও সুতরাং সত্য। পরব্রহ্মের ঐ শক্তি অচিন্ত্য। সেই অচিন্ত্য শক্তিবশতঃই পরব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হইলেও, তাঁহার স্বরূপের কিছুমাত্র বিচ্যুতি হয় না, নিত্য সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার

পরিণাম বাদ ও বিবর্তবাদ

নিত্যতাও ব্যাহত হয় না। স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে জগৎরূপে পরিণত হইয়াও পরিণামী ব্রহ্ম যেমন তেমনই থাকেন। এইরূপ ব্রহ্মপরিণামবাদই ব্রহ্মসূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি"। ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২৪।

"দেবতাদিবদপি লোকে"। ব্রঃ সূঃ ২।১।২৫।

এই সকল সূত্রও ব্রহ্ম পরিণামবাদই সমর্থন করে।

"কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা।" ব্রঃ সূঃ ২।১।২৬।

এই সূত্রে আলোচ্য ব্রহ্মপরিণামবাদের বিরুদ্ধে দোষ বা অসঙ্গতি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।" ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭।

এই সূত্রে পূর্বসূত্রোক্ত দোষ খণ্ডন করতঃ পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম (বিবর্ত নহে), এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করা হইয়াছে। সূত্রের আলোচনা হইতে এইরূপ পরিণামই ব্রহ্মসূত্রের অনুমোদিত বলিয়াই মনে হয়। দধি যেমন দুগ্ধের পরিণাম, সেইরূপ জগৎও ব্রহ্মের বাস্তব পরিণাম, ইহাই বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত না হইলে, সূত্রোক্ত 'ক্ষীর' দৃষ্টান্ত (ক্ষীরবদ্ধি) কিরূপে সঙ্গত হয়? জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের বাস্তব পরিণাম না হইলে, অর্থাৎ জগৎ অবিদ্যাকল্পিত হইলে, ব্রহ্মের আংশিক পরিণাম হইলে, পরব্রহ্মের নিরবয়বত্ব এবং নিরংশত্ব বোধক শাস্ত্রের বিরোধ ঘটে। ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণাম বাস্তব হইলেই প্রদর্শিত ব্রহ্মসূত্রের উক্তি সুসঙ্গত হয়। ব্রহ্মপরিণামবাদী রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতি সকল বৈষ্ণব বেদান্তচার্যই এইরূপে ব্রহ্মসূত্রের ভিত্তিতে স্ব স্ব সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। রামানুজাচার্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার 'সর্বসংবাদিনী' গ্রন্থে উল্লিখিত বেদান্তসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়া পরিণামবাদই যে উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতির সিদ্ধান্ত, তাহা বিরোধী মতের অনুপপত্তি প্রদর্শন পূর্বক সমর্থন করিয়াছেন। ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইলেও তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তিবশতঃ পরব্রহ্মের কিছুমাত্র বিকার ঘটে না। তিনি সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকিয়াই নিখিল জগৎ রচনা করেন। এ সম্পর্কে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার 'সর্বসংবাদিনী'তে চিন্তামণিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উপন্যাস করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'চিন্তামণি' নামক মণি যেমন নিজে অবিকৃত থাকিয়াই

নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদন করে, পরব্রহ্মও সেইরূপ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন।[১] চিন্তামণির এই দৃষ্টান্তটি বৈষ্ণবরহস্যবিৎ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' আলোচিত পরিণামবাদের সমর্থনে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কবিরাজ বলিয়াছেন—

"অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্
স্বেচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম।
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী
প্রাকৃত মণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি।
নানা রত্ন রাশি হয় চিন্তামণি হৈতে
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে।
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়॥"

চৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, ৭ম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মের পরিণামবাদ সমর্থন করিয়াই ভাস্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের ভাস্কর-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। আচার্য উদয়ন তাঁহার "ন্যায়কুসুমাঞ্জলির" দ্বিতীয় স্তবকে ভাস্করাচার্যের ব্রহ্ম-পরিণামবাদের উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

সাংখ্য পাতঞ্জলও পরিণামবাদী। তাঁহাদের মতে সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী প্রকৃতিই বিশ্বপ্রসবিনী মহাশক্তি। ঐ ত্রিগুণাত্মিকা মূল প্রকৃতি হইতে মহৎ, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি ক্রমে গুণময় বিশ্বপ্রপঞ্চের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং পরিণামে প্রকৃতিতেই অব্যক্তরূপে নিখিলবিশ্ব প্রপঞ্চ বিলীন হয়। জগতের মূল উপাদান প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত জগৎ মূল-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নহে, অভিন্ন; ভিন্ন স্বভাবের নহে, তুল্যস্বভাব এবং ত্রিগুণাত্মক। এইরূপে সাংখ্য এবং পাতঞ্জল প্রকৃতি-পরিণাম জগতের স্বরূপ ও স্বভাব বিবৃত করিয়াছেন। এইরূপ পরিণামবাদের প্রাচীনতাও অনস্বীকার্য।

সাংখ্য, পাতঞ্জল যেমন জগৎপ্রপঞ্চকে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণাম

১। প্রসিদ্ধিশ্চ লোকশাস্ত্রয়োঃ, চিন্তামণিঃ স্বয়মবিকৃত এব নানাদ্রব্যাণি প্রসূত ইতি।

শ্রীজীবগোস্বামিকৃত সর্বসংবাদিনী।

২। 'ব্রহ্ম-পরিণতেরিতি ভাস্করগোত্রে যুজ্যতে'।

উদয়নকৃত কুসুমাঞ্জলি; ২য় স্তবক, ৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, অদ্বৈতবেদান্তীও সেইরূপ গুণময় বিশ্বকে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার পরিণাম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সাংখ্যের প্রকৃতি ও বেদান্তের মায়া

সাংখ্যের প্রকৃতি ও অদ্বৈতবেদান্তের মায়া উভয়েই ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী এবং নিখিল বিশ্বের প্রসূতি। বিশ্বপ্রপঞ্চের উহা পরিণামী উপাদান। এই অংশে প্রকৃতি ও মায়ার সাম্য দেখা গেলেও, ইহাদের বৈষম্যও বড় কম নহে। সাংখ্যকার বিশ্বপ্রসবিনী পরিণামিনী প্রকৃতিকে নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনে নিত্যপদার্থ পুরুষ এবং প্রকৃতি এই দুইটি। তন্মধ্যে পুরুষ অপরিণামী এবং কূটস্থ নিত্য, প্রকৃতি পরিণামশীলা, কিন্তু তবুও নিত্যা। অদ্বৈতবেদান্তী নিত্য বলিতে যাহা ধ্রুব কূটস্থ এবং অবিকারী, অপরিণামী তাহাকেই বোঝেন, যাহা পরিণামশীলা তাহাকে নিত্য বলিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। ফলে, অদ্বৈতবেদান্তে জগদাধার পরব্রহ্মই নিত্য, ত্রিগুণময়ী বিশ্বজননী মায়া নিত্য নহে, অনাদি, অনিত্য এবং অনির্বাচ্য। জগৎপ্রসবিনী এই মায়া অদ্বৈতবেদান্তের মতে অনির্বাচ্যা বিধায় মায়া-পরিণাম বিশ্বপ্রপঞ্চও সত্ত্বরজস্তমোময় এবং অনির্বাচ্য।[১] বিশ্বের পরিণামী উপাদান এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া জড়স্বভাবা, সুতরাং স্বতন্ত্র চেতনের সাহায্য ব্যতীত মায়ার বিশ্বরচনার কোনরূপ সামর্থ্য নাই; ইহা আমরা "ঈক্ষতের্নাশব্দম্।" ব্রঃ সূঃ ১।১।৫, "রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্।" ব্রঃ সূঃ ২।২।১। ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য পর্যালোচনায় দেখিয়াছি। এইজন্যই অদ্বৈতবাদীকে জগতের আরও একটি উপাদান কারণ স্বীকার করিতে হইয়াছে। পরব্রহ্মই সেই দ্বিতীয় অপরিণামী উপাদান। নিখিল বিশ্বই সচ্চিদানন্দে অধ্যস্ত। পরব্রহ্মের সত্তা দ্বারাই জগৎসত্তা অনুপ্রাণিত হইয়া সত্য, স্বাভাবিক বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের আলোকেই জড় বিশ্ব আলোকিত হয় এবং আনন্দময়ের আনন্দাংশ আহরণ করিয়াই জগৎ মধুময়, আনন্দময় বলিয়া মনে হয়। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সম্পর্ক ত্যাগ করিলে ব্যাবহারিক জগৎ থাকে না। জগতের অস্তিত্বের মূলে ব্রহ্মসত্তা বিরাজ করে বলিয়া, পর-ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়া গ্রহণ না করিয়া অদ্বৈতবেদান্তীর উপায়ান্তর নাই। পরব্রহ্ম এইরূপে জগতের উপাদান হইলেও, জগদাধার

১। এই অনির্বাচ্যা মায়ার বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মের কোনপ্রকার বিকার বা পরিণাম নাই। ব্রহ্ম অবিকারী এবং কূটস্থ। এইরূপ কূটস্থ অবিকারী ব্রহ্মকে অপরিণামী উপাদান বলিয়াই অদ্বৈতবেদান্তী গ্রহণ করিয়াছেন। এই অবিকৃত ব্রহ্মপরিণামবাদ অদ্বৈতবেদান্তে 'বিবর্ত' আখ্যা লাভ করিয়াছে। উপাদানকারণ তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে অদ্বৈত-বেদান্তে দুইটি—একটি (মায়া) পরিণামী উপাদান, অপরটি (ব্রহ্ম) অপরিণামী উপাদান বা বিবর্ত উপাদান। দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ এই মতে মায়ার পরিণাম এবং ব্রহ্মের বিবর্ত (পরিণাম নহে)।

বিবর্তবাদ

অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে যেমন মিথ্যা সর্পের সৃষ্টি হয়, শুক্তিতে 'মিথ্যা রজতের ভাতি হয়, সেইরূপই অবিদ্যাবশে পরব্রহ্মে মিথ্যা জগতের ভাতি হইয়া থাকে। রজ্জু ও শুক্তি যেমন উহাতে আরোপিত মিথ্যা সর্প এবং মিথ্যা রজতের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপে উপাদানকারণ, পরব্রহ্মও সেইরূপ পরব্রহ্মে আরোপিত মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান বা আধাররূপেই উপাদানকারণ। মিথ্যা রজতের আধার ঝিনুকখণ্ড কিংবা কল্পিত সর্পের আশ্রয় রজ্জু যেমন সর্বপ্রকারে অবিকৃত থাকিয়াই, রজত, সর্প প্রভৃতির সৃষ্টি করে; ব্রহ্মও সেইরূপ নিজ সচ্চিদানন্দরূপে অবিকৃত থাকিয়াই জগদিন্দ্রজাল রচনা করেন। নির্বিকার পরব্রহ্মকে অন্য কোনরূপেই মিথ্যা জগতের কারণ বলা চলে না। পরিণামবাদীর মতানুসারে ব্রহ্মের বাস্তব পরিণাম স্বীকার করিতে গেলেই, শ্রুতি প্রতিপাদিত পরব্রহ্মের নির্বিকারত্ব ব্যাহত হয়। পরব্রহ্ম অবিকারী, বিকারের লেশমাত্রও ব্রহ্মে সম্ভবপর নহে; অথচ সেই অবিকারী ব্রহ্মই জগতের উপাদানকারণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হইলে, অদ্বৈতবেদান্তোক্ত বিবর্তবাদেরই শরণ লইতে হয়। বিবর্তবাদে নিখিল বিশ্বই মায়াকল্পিত এবং মিথ্যা। মায়ার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। ইহাই বিবর্তবাদের মূলসূত্র। মায়াবাদ, অনির্বাচ্যবাদ প্রভৃতি এই বিবর্তবাদেরই নামান্তর।[১]

'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ব্রঃ সূঃ ১।১।২

১। পরিণামো নাম উপাদানসমসত্তাককার্যাপত্তিঃ
বিবর্তো নাম উপাদানবিষমসত্তাক কার্যাপত্তিঃ

বেদান্তপরিভাষা, প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ।

উপাদানকারণ ও তদুৎপন্ন কার্যের সত্যতা একই স্তরের হইলে, কার্যবর্গকে সেক্ষেত্রে কারণের পরিণাম বলা হয়, বিভিন্ন স্তরের হইলে সেইরূপ কার্যকে কারণের

এই ব্রহ্মসূত্রে এবং "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রভৃতিতে অতিস্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, "দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ পরব্রহ্ম হইতেই জন্মলাভ করে, ব্রহ্মেই অবস্থান করে, পরিণামে পরব্রহ্মেই বিলীন হয়।" আলোচ্য সূত্রে বা শ্রুতিতে যে 'যতঃ' পদটির প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা কারণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে—'যত ইতি কারণনির্দেশঃ'। ব্রঃ সূঃ শংভাষ্য ১।১।২। এখানে পঞ্চমীবিভক্তি 'জনি কর্তুঃ প্রকৃতিঃ' এই পাণিনি সূত্রবলে বিহিত হইয়াছে। পাণিনি-সূত্রে উপাদান-কারণের বোধক প্রকৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকায়, 'যতঃ' পদটির দ্বারা যে উপাদান-কারণকেই বুঝাইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বিবর্তবাদে পরব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং নিমিত্তকারণ

'তত্তু সমন্বয়াৎ' ব্রঃ সূঃ ১।১।৪।

এই ব্রহ্মসূত্রে জীব ও জগৎ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক। উৎপত্তিশীল জগতের পরব্রহ্মই মূল। জীব ও জগৎ ব্রহ্মসত্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই সত্য, প্রাণময় বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। ব্রহ্মভিত্তি ব্যতীত জীবও জগতের কোনই ভিত্তি নাই। এইরূপে পরব্রহ্মে জীব ও জগতের যে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা পরব্রহ্মকে উপাদান-কারণ বলিয়া গ্রহণ করিলেই সম্ভবপর হয়। অন্য কোনপ্রকারে হয় না। অদ্বৈতবেদান্তের এককে জানিলেই সকলকে জানা যায় (এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা), এইরূপ স্বীকৃতি ব্রহ্ম যে উপাদান-কারণ তাহাই নিঃসংশয়ে বুঝাইয়া দেয়।

বিবর্ত বলে। সাংখ্যোক্ত গুণময়ী প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজাত গুণময় জগৎ উভয়ই সমানভাবে সত্য বলিয়া বিশ্বজগৎকে প্রকৃতির পরিণাম বলা চলে। অদ্বৈত-বেদান্তের মতে সত্য ব্রহ্মই মিথ্যা জগতের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হিসাবে উপাদান। এক্ষেত্রে উপাদান-কারণ পরব্রহ্ম ও মিথ্যা বিশ্বপ্রপঞ্চ একই স্তরের সত্য নহে বলিয়া, মিথ্যা জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, পরিণাম নহে। নূতন নূতন কার্যোৎপত্তির ফলে যেখানে উপাদান-কারণেরও পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ উপাদান-কারণ পরিবর্তিত হইয়া কার্যাকারে রূপায়িত হয়, সেখানে কার্যবর্গকে কারণের পরিণাম বলে, আর, উপাদান-কারণ সর্বপ্রকারে অপরিবর্তিত থাকিয়াই যেক্ষেত্রে কার্য জন্মায়, সেক্ষেত্রে অপরিবর্তিত উপাদানকে বিবর্ত উপাদান বলা হয়।

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা পরিণামঃ ॥

অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্তঃ ॥

অবশ্য অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মকে কেবল উপাদান বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। মায়াধীশ পরমেশ্বররূপে ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্তকারণ, অন্য কোন জগৎ-কর্তা বা জগতের নিমিত্তকারণ নাই, তাহাও অদ্বৈতবেদান্তী স্বীকার করিয়াছেন। একই পরব্রহ্ম যিনি মায়াধীশরূপে জগৎস্রষ্টা ও জগৎপাতা, তিনিই অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপে জগতের উপাদান। অদ্বৈতবাদের এই সিদ্ধান্তই—

'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ'। ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৩।

এই ব্রহ্মসূত্রে সমর্থিত হইয়াছে। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ, না উপাদানকারণ? এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া, উল্লিখিত সূত্রে তদুত্তরে বলা হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম নিখিল বিশ্বের উপাদানকারণও বটেন, নিমিত্তকারণও বটেন। তিনি ঘটশিল্পী, স্বর্ণশিল্পী, বস্ত্রশিল্পী প্রভৃতির ন্যায় কেবল স্রষ্টা নিমিত্তকারণই নহেন—

প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণং চ ব্রহ্ম অভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকারণং চ, ন কেবলং নিমিত্ত কারণমেব। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ১।৪।২৩।

'স ঈক্ষাং চক্রে' (প্রশ্ন ৬।৩), 'স প্রাণমসৃজত' (প্রশ্ন ৬।৪) প্রভৃতি শ্রুতিতে ঈক্ষণ (দর্শন) পূর্বক জগতের যে সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে তাহাদ্বারা স্রষ্টা, জগৎকর্তা পরমেশ্বর যে ঘটকর্তা কুম্ভকার প্রভৃতির ন্যায় বিশ্বের নিমিত্তকারণ, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। বিভিন্ন বৈষ্ণববেদান্ত-সম্প্রদায় এবং ন্যায়াচার্যগণও বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরকে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্ত মায়াধীশ রূপে পরব্রহ্মকে যেমন নিমিত্ত কারণ বলিয়াছেন, জগতের আশ্রয় বা অধিষ্ঠানরূপে তাঁহাকেই আবার উপাদান-কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তীর ঐরূপ সিদ্ধান্তের মূলে আছে তাঁহার এককে জানিলেই সকলকে জানার স্বীকৃতি (একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা)। উপাদানকে জানিলেই উপাদেয় বস্তু-রাজিকে সহজেই জানিতে পারা যায়। মাটিকে জানিলেই মৃন্ময় ঘট, শরা প্রভৃতিকে, স্বর্ণকে জানিলেই স্বর্ণময় ভূষণরাজিকে, লোহাকে জানিলেই লৌহ নির্মিত দাঁ, কুড়াল প্রভৃতিকে জানিতে পারা যায়। সুতরাং নিখিল বিশ্বের উপাদানকে জানিলেই, বিশ্বপ্রপঞ্চকে জানা সম্ভবপর হয়। সুতরাং জগদাধার পরব্রহ্মকে যেমন অপরিণামী-উপাদান বা বিবর্তকারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে

হইবে, সেইরূপ মায়াধীশরূপে তাঁহাকে জগতের নিমিত্তকারণ, জগৎস্রষ্টা, জগৎপাতারূপেও বুঝিতে হইবে।[১]

আলোচ্য অবিকৃত ব্রহ্মপরিণামবাদ বা বিবর্তবাদের সহিত ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত অসৎকার্যবাদ এবং সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদের সম্পর্ক কি তাহাও এই প্রসঙ্গে বিচার করা আবশ্যক। অদ্বৈতবেদান্তী সদ্‌বিবর্তবাদ গ্রহণ করিয়াও, গুণময় অনির্বাচ্য বিশ্বপ্রপঞ্চকে ত্রিগুণাত্মিকা অনির্বাচ্য মায়ার পরিণাম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং এই অংশে পরিণামবাদকে সর্বতোভাবেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অদ্বৈতবাদীর সদ্‌বিবর্তবাদের উপর সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদের কোন প্রভাব আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, সৎকার্যবাদী সাংখ্যের কার্যসত্যতার বিরুদ্ধে কার্যমিথ্যাত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও, 'কার্য-কারণাত্মক', কার্যমাত্রই কারণের একপ্রকার বিশেষ অবস্থা, সৎকার্যবাদীর এই মূলসূত্র[২] অদ্বৈতবেদান্তী অস্বীকার করেন না। তবে কার্যকে কারণাত্মক বলিয়া সৎকার্যবাদী সাংখ্য কার্য ও কারণের যে অভেদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যা বিবর্তবাদীর অন্তর স্পর্শ করে নাই। কার্য ও কারণের

অদ্বৈতবেদান্তের মতে কার্য ও কারণের সম্পর্ক

১। (ক) তত্র চৈকেন বিজ্ঞাতেন সর্বমন্যদবিজ্ঞাতমপি বিজ্ঞাতং ভবতীতি প্রতীয়তে। তচ্চোপাদান কারণবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানং সংভবত্যুপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ কার্যস্য, নিমিত্তকারণাব্যতিরেকস্তু কার্যস্য নাস্তি ; লোকে তক্ষ্ণঃ প্রাসাদব্যতিরেকদর্শনাৎ। দৃষ্টান্তোঽপি যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ইত্যুপাদানকারণগোচর এবাম্নায়তে।

ব্রঃ সূঃ শংভাষ্য, ১।৪।২৩।

(খ) উপাদানকারণাত্মকত্বাচ্চোপাদেয়স্য কার্যজাতস্যোপাদানজ্ঞানেন তজ্‌জ্ঞানোপপত্তেঃ। নিমিত্তকারণং তু কার্যাদত্যন্তভিন্নমিতি ন তজ্‌জ্ঞানে কার্যজ্ঞানং ভবতি। অতো ব্রহ্মোপাদানকারণং জগতঃ। ন চ ব্রহ্মণোঽন্যন্নিমিত্তকারণং জগত ইত্যপিযুক্তম্ ; প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধাদেব। নহি তদানীং ব্রহ্মণি জ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি ; জগন্নিমিত্তকারণস্য ব্রহ্মণোঽন্যস্য সর্বমধ্যপাতিনস্তজ্‌জ্ঞানেনাবিজ্ঞানাৎ। যত ইতি চ পঞ্চমী ন কারণমাত্রে স্মর্যতে, অপি তু প্রকৃতৌ, "জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ" ইতি। ততোঽপি প্রকৃতিত্বমবগচ্ছামঃ।

ভামতী, ১।৪।২৩ সূত্র শং ভাষ্য।

২। পূর্বোক্ত সৎকার্যবাদের আলোচনা দেখুন।

সাংখ্যোক্ত অভেদ সিদ্ধান্তের পরিবর্তে বিবর্তবাদী 'কার্য কারণ হইতে অন্য নহে,' এই 'অনন্যত্ব' সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, কার্যবর্গ সত্ত্বরজস্তমোগুণময় এবং অবিশুদ্ধ, কারণ পরব্রহ্ম গুণাতীত এবং অতিশুদ্ধ, কার্য সসীম, সখণ্ড, কারণ অসীম এবং অখণ্ড, ইহাদের অভেদ হইবে কিরূপে? এইরূপ কার্য ও কারণের অভেদ সিদ্ধান্ত কোন মতেই গ্রহণ করা চলে না। আরম্ভবাদী নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক সাংখ্যোক্ত কার্য ও কারণের অভেদ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া প্রকারান্তরে বিবর্তবাদ প্রতিষ্ঠার সাহায্যই করিয়াছেন।[১] অবশ্যই ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত কার্য ও কারণের ভেদসিদ্ধান্তও অদ্বৈতবেদান্তের অনুমোদন লাভ করে নাই। কার্য ও কারণ বিভিন্ন হইলে, 'এককে জানিলেই সকলকে জানা যায়' অদ্বৈতবেদান্তের এই 'এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা' কোন প্রকারেই উপপাদন করা যায় না। এইজন্যই কারণসত্তায় অনুপ্রাণিত কার্যসত্তার স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিয়া, সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদের স্থলে অদ্বৈতবেদান্তী সৎকারণবাদ বা সদ্‌বিবর্তবাদ সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সদ্‌বিবর্তবাদ প্রতিষ্ঠার ভূমিকা হিসাবে আরম্ভবাদ, পরিণামবাদের স্বরূপ আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক নহে। সুধী অদ্বৈতবেদান্তী সত্যকথাই বলিয়াছেন—

> প্রতিষ্ঠিতেঽস্মিন্ পরিণামবাদে
> স্বয়ং সমায়াতি বিবর্তবাদঃ।
> আরম্ভবাদঃ পরিণামবাদো
> বিবর্তবাদস্য হি ভূমিকেয়ম্॥
>
> অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি।

সৎকারণবাদে কার্য ও কারণের সম্বন্ধ কি তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, ব্রহ্মসূত্রকার[২] যে 'অনন্য' পদটির প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহার ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, দ্রষ্টা-দৃশ্য, ভোক্তা-ভোগ্য, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, কারণ-কার্য প্রভৃতি বিভাগ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অদ্বৈতবেদান্তী স্বীকার করিয়া লইলেও, বাস্তব দৃষ্টিতে তাঁহার মতে দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ, বিবিধ জ্ঞেয় বা ভোগ্য বস্তুর কোনও অস্তিত্ব নাই। সমুদ্রের তরঙ্গমালা, জলাবর্ত প্রভৃতি যেমন

১। ভামতী, ২।১।১৪।

২। তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ। ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৪ সূত্র ও শংভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সমুদ্রের জলেরই এক প্রকার বিশেষ অবস্থা, জলকে বাদ দিয়া জলতরঙ্গের যেমন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, মাটি বা সোনাকে বাদ দিয়া ঘট শরা প্রভৃতি মৃন্ময় বস্তুর, স্বর্ণময় ভূষণরাজির যেমন কোন সত্যতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বিশ্বপ্রপঞ্চেরও সেইরূপ উহার কারণ ব্রহ্মকে বাদ দিয়া কোনরূপ সত্যতা অনুভূত হয় না। কারণের সত্তা ব্যতীত কার্যের স্বতন্ত্র সত্যতার অভাবই (কারণব্যতিরেকেণাভাবঃ) সূত্রোক্ত 'অনন্য' শব্দদ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। আকাশাদি বিবিধ জগৎপ্রপঞ্চই কার্য, পরব্রহ্ম ঐ কার্যবর্গের কারণ। ঐ সকল কার্যবর্গ বাস্তব দৃষ্টিতে কারণ হইতে অন্য বা ভিন্ন কিছু নহে।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক এখানে ইহা লক্ষ্য করিবেন, ব্রহ্মসূত্রকার সূত্রে 'অভেদ' শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, 'অনন্য' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা দ্বারা সূত্রকার কি বুঝাইতে চাহেন? অভেদ ও অনন্য শব্দের অর্থের পার্থক্য কি? তাহাও এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সেই ব্যাখ্যাটি অতি স্পষ্ট ভাষায় বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার ভামতীতে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সূত্রোক্ত অনন্য শব্দের অর্থ অভেদ নহে। অভেদ বলিলে ভেদের অভাব বুঝায়। ভেদ কথাটি অন্যোন্যাভাবের দ্যোতক। মাটি-ঘট, সূতা-কাপড় প্রভৃতি যেই দুইটি বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, ভেদ পদার্থ সেই পরস্পর পৃথক্ দুইটি বস্তুতে অবস্থান করে। নৈয়ায়িকের পরিভাষায় ঐ বস্তুদ্বয়ের একটিকে ভেদের অনুযোগী, অপরটিকে ভেদের প্রতিযোগী বলে। যেই বস্তু হইতে ভেদ বুঝায় সেই বস্তুকে ভেদের অনুযোগী, আর যেই বস্তুর ভেদ বুঝা যায়, তাহাকে ভেদের প্রতিযোগী বলে।[২] মাটি হইতে

১। কার্যমাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ; কারণং পরংব্রহ্ম, তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতো-ঽনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্যস্যাবগম্যতে। ব্রহ্মসূত্র শং ভাষ্য, ২।১।১৪।

২। অনুযোগী প্রতিযোগী এই সকল শব্দগুলি নৈয়ায়িকের পরিভাষা। এই পারিভাষিক শব্দগুলি ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ অর্থ বুঝায়। যস্মিন্নভাবঃ সোঽনুযোগী, যস্যাভাবঃ স প্রতিযোগী, অভাব যেখানে থাকে, অভাবের সেই অধিকরণকে অভাবের অনুযোগী বলে, যাহার অভাব বুঝায় তাহাকে অভাবের প্রতিযোগী বলে। ভূতলে ঘটের অভাব বুঝাইলে ভূতল হয় অভাবের অনুযোগী, আর ঘট হয় প্রতিযোগী। কেবল অভাবেরই অনুযোগী প্রতিযোগী থাকে তাহা নহে। সম্বন্ধেরও অনুযোগী প্রতিযোগী থাকে। এই সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ ন্যায়শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।

ঘটের ভেদ বুঝাইলে, মাটিকে সেক্ষেত্রে ভেদের অনুযোগী, ঘটকে ভেদের প্রতিযোগী বলিয়া বুঝিতে হইবে। অভাবকে বুঝিতে হইলে, যাহার অভাব বুঝাইবে অভাবের সেই প্রতিযোগীর এবং যেখানে অভাবের বোধ জন্মিবে, অভাবের সেই অনুযোগীর জ্ঞান পূর্ব হইতে থাকা আবশ্যক হয়। ঘট না চিনিলে, ঘটাভাবের অধিকরণ ভূতল প্রভৃতির সহিত পূর্ব পরিচয় না থাকিলে, ভূতলে ঘটের অভাব বুঝিতে পারা যাইবে কিরূপে? যে ব্যক্তি মাটিও চিনেনা, ঘটও জানেনা, তাহাকে মাটিও ঘটের পার্থক্য বুঝান যায় কি? যেই দুই বস্তুর মধ্যে ভেদ আছে তাহা বুঝিলেই, অভেদ বুঝা সম্ভবপর হইবে। কেননা, অভেদ কথাটির মধ্যে অভাবের বোধক যে 'অ' (নঞ্ পদটি) আছে, তাহার প্রতিযোগী হইল 'ভেদ' এই কথাটি। অভাবের জ্ঞান যখন উহার প্রতিযোগীর (যাহার অভাব বুঝায় তাহার) জ্ঞানসাপেক্ষ, তখন 'ভেদ'কে না বুঝিলে অভেদকে (ভেদের অভাবকে) বুঝিবে কিরূপে? ভেদ বুঝিতে হইলে, যেই দুই বস্তুর প্রভেদ বুঝা যাইবে, তাহার পূর্বপরিচিতি যে অত্যাবশ্যক, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই অবস্থায় কার্য ও কারণের, ঘট ও মাটির, বস্ত্র ও সূতার অভেদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, মাটির ন্যায় ঘটের, সূতার ন্যায় বস্ত্রের সত্যতাও যে অবশ্য স্বীকার্য তাহা সুধী দার্শনিক অস্বীকার করিতে পারেন না। ব্রহ্ম সত্যতার ন্যায় ব্রহ্মকার্য জগতের সত্যতাও অবশ্য স্বীকার্য হইয়া দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদীর এককে (কারণকে) জানিলে কার্যবর্গকে জানার কথা অসম্ভব পরিকল্পনায়ই পর্যবসিত হয়। এই জন্যই ব্রহ্মসূত্রকার মহর্ষি ব্যাসদেব, তদীয় ব্রহ্মসূত্রে 'অভেদ' শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, 'অনন্য' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। 'অনন্য' শব্দের অর্থ এই যে, কারণ হইতে কার্য অন্য নহে। কারণকে ছাড়িয়া (বাদ দিয়া) কার্যের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই বা থাকিতে পারে না—"কারণব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্যস্য"। কার্যবর্গ কারণেরই একপ্রকার বিশেষ অবস্থা, ইহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ঘট মাটির একপ্রকার বিশেষ অভিব্যক্তি, কাপড় সূতারই রকমান্তর। কার্যরূপে কারণের যে বিশেষ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কারণের ভিত্তিতেই আত্মপ্রকাশ লাভ করে। মাটিকে বাদ দিয়া ঘটের, সূতাকে বাদ দিয়া সূত্রনির্মিত বস্ত্রের কোন অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ঘট প্রভৃতি মৃন্ময়

বস্তুর উপাদান মাটিই ঘট, শরা প্রভৃতি রূপে রূপান্বিত হইয়া, বিভিন্ন নাম গ্রহণ করে। সোনারই বিশেষ বিশেষ আকারে উহাকে আমরা হার, বালা, দুল, পাশা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকি। বাস্তবিক পক্ষে সবই মাটি, সবই সোনা। মাটি এবং সোনাই সত্য। মৃন্ময় ঘট, স্বর্ণময় ভূষণরাজি স্বতন্ত্রভাবে সত্য নহে, মিথ্যা। উহাদিগকে সত্য বলিতে হইলে, উহাদের উপাদান মাটি এবং সোনার সত্যতানিবন্ধনই সত্য বলিতে হইবে, মাটি এবং সোনাকে বাদ দিয়া নহে। কাপড় যে সূতার একপ্রকার বিশেষ অবস্থা • তাহা আমরা সৎকার্যবাদের আলোচনায় পূর্বেই দেখাইয়াছি। সেখানে সৎকার্যবাদী ভিন্নরূপ প্রয়োজন সাধন করে বলিয়া, কাপড়ের উপাদান সূতাকেও যেমন সত্য বলিয়াছেন, লজ্জানিবারণকারী বস্ত্রকেও সেইরূপ সত্য বলিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবেদান্তীর অনুমোদিত নহে। এখানে অদ্বৈতবাদীর বক্তব্য এই, কাপড়ের উপাদান সূতাগুলি বিশেষ এক-প্রকার সংযোগসূত্রে গ্রথিত হইলেই, তখন সূতাগুলিকে আমরা কাপড় বলি। পরস্পর গ্রথিত সূতাগুলি খুলিয়া লইলে, কাপড়ের যে কোন অস্তিত্ব থাকে না, ইহা সৎকার্যবাদীরও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই অবস্থায় কাপড় লজ্জানিবারণ করিতে পারে বলিয়া, কাপড়কে উহার উপাদান সূতার ন্যায়ই সত্য বলিতে হইবে এরূপ যুক্তির অদ্বৈতবাদীর নিকট কোনই মূল্য নাই। দড়িকে সাপ বলিয়া দেখিয়াও লোকে চীৎকার করে, ভয়ে কাঁপিতে থাকে, এইজন্য রজ্জুসর্পকে সুধী দার্শনিক সত্য বলিবেন কি? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোনপ্রকার কার্যকারিতা (অর্থক্রিয়াকারিতা) থাকিলেই তাহাকে সত্য বলা যায় না। মিথ্যা রজ্জুসর্প প্রভৃতির কার্যকারিতাও অস্বীকার করা যায় না। সত্য অর্থ ধ্রুব, অপরিবর্তনশীল। এইরূপ সত্যতা উপাদানেরই কেবল আছে। উপাদেয়ের তাহা নাই। মাটি বা সোনা বিভিন্ন মৃন্ময়, স্বর্ণময় বস্তু সকল উৎপাদন করিয়াও যেই মাটি সেই মাটিই আছে, পূর্বে যে সোনা ছিল, সেই সোনাই আছে, তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই; কেবল বিভিন্নরূপে বিভিন্ন নাম পরিগ্রহ করিয়াছে মাত্র। এইজন্য অদ্বৈতবাদী উপাদানকেই কেবল সত্য বলেন, উপাদেয় তাঁহার মতে সত্য নহে, মিথ্যা। মাটিই সত্য, ঘট প্রভৃতি সত্য নহে। সোনাই সত্য, স্বর্ণনির্মিত ভূষণরাজি সত্য নহে, মিথ্যা। উপাদেয় ঘট

প্রভৃতিকে সত্য বলিতে হইলে, উহাদের উপাদান মাটিরূপেই তাহা সত্য, ঘট প্রভৃতি কার্যরূপে নহে। এইরূপে অদ্বৈতবাদী সৎকার্যবাদী সাংখ্য হইতে আরও একধাপ অগ্রসর হইয়া, 'কার্য কারণেরই অবস্থান্তর,' সৎকার্যবাদীর এই মূলসূত্র অনুসরণ করিয়াই, সৎকার্যবাদের পরিবর্তে 'সৎকারণবাদ' বা কার্যমিথ্যাত্ব-বাদ সমর্থন করিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তোক্ত 'সৎকারণবাদে'র বিস্তৃত ব্যাখ্যা আমরা

'তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ'। ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪।

এই 'আরম্ভণাধিকরণে'র শঙ্কর-ভাষ্য, ভামতী প্রভৃতিতে দেখিতে পাই। আলোচ্য 'অনন্য' পদটির ব্যাখ্যায় বাচস্পতিমিশ্র তদীয় ভামতীতে বলিয়াছেন—

' ন খল্বনন্যত্বমিত্যভেদং ব্রূমঃ, কিন্তু ভেদং ব্যাসেধামঃ',

ব্রহ্মসূত্র-ভামতী ২।১।১৪।

অনন্য অর্থে এখানে আমরা কার্য ও কারণের অভেদ বুঝিব না, উহাদের ভেদের নিষেধই বুঝিব। কার্য ও কারণের যে অভেদ হইতে পারে না, তাহা আমরা এই প্রসঙ্গে পূর্বেই বলিয়াছি। কারণ ও কার্যের ভেদের নিষেধ করিয়া এখানে অদ্বৈতবাদী ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে, কারণের সত্যতা ব্যতীত কার্যের কোন স্বতন্ত্র সত্যতা নাই।[১] এই অবস্থায় কার্যরূপে কার্যকে সত্য বলার কোনই অর্থ হয় না।

'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্ মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'।

ছান্দোগ্য, উপ, ৬।১।১।

এই ছান্দোগ্য শ্রুতির ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—'মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' 'মাটিই কেবল সত্য', এই কথা দ্বারা [এবং শ্রুতিতে এব শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া] ইহাই বুঝিতে হইবে, কার্য সকল বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইলেও, ঐ নাম-রূপময় কার্যবর্গ সত্য নহে, মিথ্যা ; উহাদের উপাদান মাটি প্রভৃতিই সত্য।

"ন তু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি। নামধেয়মাত্রং হ্যেতদনৃতম্।"

ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ২।১।১৪।

এইরূপে আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবেদান্তোক্ত সৎকারণবাদ বা সদ্‌বিবর্তবাদ

১। কারণসত্তাতিরিক্ত সত্তাশূন্যত্বং কার্যস্য সাধ্যতে। সুধী পাঠক আরম্ভণাধিকরণের ভাষ্য, ভামতী দেখুন।

উপপাদন করিয়াছেন। সদ্‌বিবর্তবাদ বা সৎকারণবাদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শঙ্কর বলিয়াছেন, ঘটাকাশ যেমন মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে; মৃগতৃষ্ণিকার জল যেমন মরুপ্রদেশ হইতে অন্য কিছু নহে, ভোগ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ, ভোক্তা জীবও সেইরূপ ইহাদের অপরিণামী উপাদান পরব্রহ্ম হইতে অন্য কিছু নহে। চোখের উপর যাহাদের বিনাশ দেখিতে পাই, তাহাদিগকে সত্য বলি কিরূপে? তাহাদিগকে যেমন ধ্রুব সত্য বলা যায় না, সেইরূপ আকাশকুসুমের ন্যায় অলীকও বলা চলে না। এইরূপে স্বরূপনিরূপণ দুরূহ বলিয়া, অদ্বৈতবেদান্তী ইহাদিগকে 'অনির্বাচ্য' এবং মিথ্যা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[১] ব্রহ্মসত্তায় অনুপ্রাণিত বলিয়াই জীব ও জগৎ সত্য বলিয়া মনে হয়, বস্তুতপক্ষে জীব ও জগৎ সত্য নহে; ইহারা সেই এক অদ্বিতীয় মহাসত্য, সচ্চিদানন্দেরই প্রতিভাসমাত্র। পরব্রহ্মের সম্পর্ক বাদ দিলে ঊষরে জলের ন্যায় জীব ও জগতের কোনই সত্যতা বুঝা যাইবে না। ভাষ্যকারের এইরূপ উক্তির বিবরণে বাচস্পতি মিশ্র ভামতীতে অনুমানের প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন—

যে সকল বস্তুর বিলয় প্রত্যক্ষতঃই দেখিতে পাওয়া যায় (পক্ষ), তাহা বস্তুতঃ সত্য হইতে পারে না (সাধ্য), যেমন মৃগতৃষ্ণিকার জল (দৃষ্টান্ত)। পরিদৃশ্যমান ঘটাদি বিশ্বপ্রপঞ্চেরও বিলয় প্রত্যক্ষগম্য (উপনয়), অতএব ঘটাদি বিশ্বপ্রপঞ্চও সত্য নহে[২] (নিগমন বা conclusion)।

যাহা আছে তাহা চিরকালই আছে, যেমন চিদাত্মা। চিদাত্মা সনাতন। চিদাত্মা কোন কালে, কোন প্রদেশে, কোন অবস্থাবিশেষে থাকে না, সর্বদেশে, সর্বকালে, সকল অবস্থায় চিরজাগরূক আছে এবং থাকিবে। জাগতিক বস্তুসকল কিন্তু এরূপ নহে। উহারা কোনও নির্দিষ্ট কালে, নির্দিষ্ট দেশে স্ব স্ব বিশেষরূপেই অবস্থান করে। এইরূপ দেশ

১। যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং মহাকাশানন্যত্বং যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনা মূষরাদিভ্যোঽনন্যত্বং দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ স্বরূপেণানুপাখ্যত্বাৎ, এবমস্য ভোক্তৃ-ভোগ্যাদিপ্রপঞ্চ জাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্।

ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ২।১।১৪।

২। যে হি দৃষ্টনষ্টস্বরূপা ন তে বস্তুসন্তো যথা মৃগতৃষ্ণিকোদকাদয়ঃ, তথা চ সর্বং বিকারজাতং তস্মাদবস্তু সৎ। ভামতী, ২।১।১৪।

কাল ও অবস্থার বন্ধনে সীমাবদ্ধ কার্যবর্গকে যদি সৎ বা সত্য বল, তবে তাহার বিনাশ দেখি কেন? যাহা সত্য তাহা চিরকালই ধ্রুব ও সত্য। দেশ ও কালের গণ্ডী দিয়া সত্যকে সীমাবদ্ধ করা চলে না। পক্ষান্তরে, যাহা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ, উৎপত্তি-বিনাশশীল তাহাকেও সত্য বলা চলে না। সত্য ও অসত্য এইরূপে আলোক ও অন্ধকারের মত, ভাব ও অভাবের মত পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধপ্রকৃতির। বিশ্বপ্রপঞ্চ সত্য হইলে, তাহা কখনও অসৎ হইতে পারে না; অসত্য হইলে, কদাচ সত্য হইতে পারে না। পরস্পরবিরুদ্ধ সৎ ও অসতের ঐক্য বা অভেদ অসম্ভব কথা। এই সত্তা এবং অসত্তাকে যদি জন্যবস্তুর ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করা যায়, তবেও ঐ ধর্মের আশ্রয় ধর্মী কার্যবর্গের অস্তিত্ব পূর্ব হইতেই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ধর্মী বা আশ্রয় না থাকিলে, উহার ধর্ম সত্তা এবং অসত্তা কোথায় থাকিবে? ফলে, ধর্মী কার্যের নিত্যতাই আসিয়া দাঁড়াইবে। সেই অবস্থায় আর কার্যবর্গকে বিকারী, নশ্বর বলা চলিবে না। কার্যবর্গ অসৎ হইলেও তাহা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক নহে। ঘট প্রভৃতি দ্বারা জল আহরণ করিয়া, পান, অবগাহন প্রভৃতি প্রয়োজন সাধন করা যায়, যাহা মৃগ-তৃষ্ণিকার জলের দ্বারা হয় না। বনকুসুম আহরণ করিয়া মালা প্রস্তুত করা যায়, আকাশকুসুমের দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় ঘট প্রভৃতি জাগতিক বস্তুকে বিনশ্বর এবং অসত্য বলিলেও, মৃগতৃষ্ণিকা জলের ন্যায় কিংবা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক কল্পনা নিতান্তই হাস্যকর। নশ্বর ঘটাদিকে সত্য ও শাশ্বত বলা চলে না। এইরূপ দোটানার মধ্যে পড়িয়াই অদ্বৈতবাদী ঘটাদি বিশ্বপ্রপঞ্চকে অনির্বাচ্য এবং মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কারণই নির্বচনের যোগ্য বলিয়া সত্য, কার্য সৎ বা অসৎ কোনরূপেই নির্বচনের অযোগ্য বলিয়া, কার্যবর্গ অনির্বাচ্য ইহাই সৎকারণবাদ বা সদ্‌বিবর্তবাদের রহস্য। শ্রুতিও 'মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' এই উক্তি দ্বারা সৎকারণবাদই সমর্থন করিয়াছেন।[১] সৎকারণবাদ সমর্থন করিবার জন্য

১। সৎস্বভাবং চেদ্ বিকারজাতং, কথং কদাচিদসৎ? অসৎস্বভাবং চেৎ কথং কদাচিৎ সৎ? সদসতোরেকত্ববিরোধাৎ। অথ সদসত্ত্বে তস্য ধর্মৌ, তে চ স্বকারণাধীন-জন্মতয়া কদাচিদেব ভবতঃ, তত্তর্হি বিকারজাতং দণ্ডায়মানং, সদাতনমিতি ন ন বিকারঃ কস্যচিৎ। অথাসত্ত্বসময়ে তন্নাস্তি, কস্য তর্হি ধর্মোঽসত্ত্বম্। নহি ধর্মিণ্যপ্রত্যুৎপন্নে তদ্ধর্মোঽসত্ত্বং প্রত্যুৎপন্নমুপপদ্যতে।

অদ্বৈতবেদান্তী সাংখ্যোক্ত সৎকার্যসিদ্ধির অনুকূল যুক্তিসমূহ। 'আরম্ভণাধিকরণে' গ্রহণ করিয়াছেন,[১] কিন্তু তিনি সৎকার্যবাদ অনুমোদন করেন নাই। সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদের সাধক যুক্তির সাহায্যে অদ্বৈতবেদান্তী সৎকারণবাদ বা সদ্‌বিবর্তবাদই দৃঢ়ভিত্তিতে সংস্থাপন করিয়াছেন। 'কার্যমাত্রই কারণের এক বিশেষ অবস্থা', এই সিদ্ধান্ত সৎকার্যবাদী সাংখ্য এবং সৎকারণবাদী অদ্বৈতবেদান্তী উভয়েই গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, কার্য কারণেরই একপ্রকার বিশেষ অবস্থাবিধায়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কার্য-কারণ-রহস্য বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, কার্য বলিয়া স্বতন্ত্র কিছুই নাই। কারণেরই একপ্রকার বিশেষ অভিব্যক্তিকে কার্য আখ্যা দেওয়া হয়, এবং উহার বিভিন্ন নাম ও রূপের পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে। নাম ও রূপের কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। এই অবস্থায় কারণের সত্যতা স্বীকার করিলেই কার্য-কারণ এই উভয়েরই সত্যতা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কার্যের স্বতন্ত্র সত্যতার পরিকল্পনা অবাস্তব। সৎ-কারণবাদই দার্শনিক সিদ্ধান্ত হিসাবে যুক্তিসিদ্ধ।[২] এই দৃষ্টিতেই অদ্বৈতবেদান্তী কার্যজগৎকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নতুবা জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে ঘটপ্রভৃতি যে সকল বস্তুরাজির সত্যতা অনস্বীকার্য তাহাদিগকে সুধী দার্শনিক মিথ্যা বলিতে পারেন কিরূপে? মাটি সত্য, মৃন্ময় ঘট প্রভৃতি

……তস্মাদ্ ভিন্নমৃত্তিকারণাদ্ বিকারজাতং ন বস্তুসৎ। অতো বিকারজাত-মনির্বচনীয়মনৃতম্। তদনেন প্রমাণেন সিদ্ধমনৃতত্বং বিকারজাতস্য, কারণস্য নির্বাচ্যতয়া সত্ত্বং "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইত্যাদিনা প্রবন্ধেন দৃষ্টান্ততয়া অনুবদতি শ্রুতিঃ। ভামতী, ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪ সূত্র।

১। 'অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ' ইত্যাদি শ্লোকে সাংখ্যকার সৎকার্যবাদ' সাধনের অনুকূলে যেসকল হেতুর উপন্যাস করিয়াছেন, অদ্বৈতবেদান্তীও "আরম্ভণাধিকরণে" কার্য ও কারণের 'অনন্যত্ব' সিদ্ধান্ত সংস্থাপনের জন্য বিভিন্ন বেদান্তসূত্রে ঐ সকল হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাবে চোপলব্ধেঃ। ২।১।১৫; সত্ত্বাচ্চাবরস্য। ২।১।১৬;
অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্মান্তরেণবাক্যশেষাৎ, ২।১।১৭;
যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ। ২।১।১৮; ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২। তন্তুসংস্থানে পটে তন্তুব্যতিরেকেণ পটো নাম কার্যং নৈবোপলভ্যতে, কেবলাস্তু তন্তব আতানবিতানবন্তঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যন্তে।

ব্রহ্মসূত্রে শং ভাষ্য, ২।১।১৫।

মাটির বিশেষ বিশেষ অবস্থা হিসাবেই সত্য, স্বতন্ত্রভাবে (মাটির সত্যতাকে বাদ দিয়া) সত্য নহে, মিথ্যা। সতোঽন্যত্বেঽনৃতত্বং সদাত্মনা তু সত্যত্বমেব। শং ভাষ্য। ইহাই সংক্ষেপে অদ্বৈতোক্ত জগন্মিথ্যাত্বের রহস্য।

অদ্বৈতবাদী জগৎকে মিথ্যা বলিলেও স্বপ্নপ্রপঞ্চের মত, রজ্জুসর্প বা আকাশকুসুমের মত অলীক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

'নাভাব উপলব্ধেঃ' ব্রঃ সূঃ ২।২।২৮।

'বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ'। ব্রঃ সূঃ ২।২।২৯।

ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধোক্ত বিজ্ঞানবাদের প্রতিবাদে জাগতিক বস্তুরাজির ব্যবহারিক সত্যতা আচার্য শঙ্কর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ যে স্বপ্নদৃষ্ট গজাদির ন্যায় সাময়িকমাত্র নহে ; ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্যন্তই যে ইহাদের সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য, তাহাও অতিস্পষ্ট ভাষায় আচার্য শঙ্কর শারীরক-মীমাংসা-ভাষ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন।[১] এই অবস্থায় আচার্যের জগন্মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্তের সহিত জগৎসত্যতাবাদী বৈষ্ণববেদান্তী, নৈয়ায়িক প্রভৃতিরও বিরোধের কোন কারণ দেখা যায় না। শঙ্করাচার্য জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন, বৈদিক যাগযজ্ঞ প্রভৃতিকে অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন, দ্বৈতসাপেক্ষ ধ্যান, উপাসনা প্রভৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন বলিয়া আচার্যের বিরুদ্ধে যাঁহারা অভিযোগ করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদিগকে ধীরভাবে শঙ্করোক্ত জগন্মিথ্যাত্ব-সিদ্ধান্তের রহস্য উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলেই সুধী দার্শনিক দেখিতে পাইবেন, আচার্য শঙ্করের

১। (ক) ন খল্বভাবো বাহ্যস্যার্থস্যাধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ? উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোঽর্থঃ স্তম্ভঃ, কুড্যং, ঘটঃ পট ইতি। ন চোপলভ্যমানস্যাভাবো ভবিতুমর্হতি।

ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ২।২।২৮।

(খ) যদুক্তং বাহ্যার্থাপলাপিনা স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বজ্জাগরিতগোচরা অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়া বিনৈব বাহ্যেনার্থেন ভবেয়ুঃ প্রত্যয়ত্বাবিশেষাদিতি। তৎপ্রতিবক্তব্যম্, অত্রোচ্যতে—ন স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বজ্জাগরিতপ্রত্যয়া ভবিতুমর্হন্তি। কস্মাৎ? বৈধর্ম্যাৎ। বৈধর্ম্যং হি ভবতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ। কিং পুনর্বৈধর্ম্যম্। বাধাবাধাবিতি ব্রূমঃ। বাধ্যতে হি স্বপ্নোপলব্ধং বস্তু প্রতিবুদ্ধস্য মিথ্যাময়োপলব্ধো মহাজনসমাগম ইতি,……নৈবং জাগরিতোপলব্ধং বস্তু স্তম্ভাদিকং কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং বাধ্যতে।

ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ২।২।২৯।

জগন্মিথ্যাত্ববাদের সহিত জগতের সত্যতাবাদী নৈয়ায়িক, বৈষ্ণববেদান্তী প্রভৃতির বিরোধের কোন বাস্তব ভিত্তি নাই।[১]

কার্য-কারণ-রহস্য বিচার করা গেল এবং সৃষ্টবস্তুমাত্রই কার্য-কারণ-শৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত ইহাও বুঝা গেল। এখন প্রশ্ন এই যে, একজন সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি স্রষ্টা ব্যতীত নিখিল বিশ্বের এই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হইতে পারে কি? যদি না পারে, তবে কে সেই স্রষ্টা? যিনি বিশ্বসৃষ্টির এই মহারথ অপ্রতিহত গতিতে চালাইয়া যাইতেছেন।

সৃষ্টিতে ঈশ্বরের স্থান

ন্যায়-বৈশেষিকের আরম্ভবাদই বল, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিবাদ বা বেদান্তের মায়াবাদেরই শরণ লও, সকল মতেই দেখা যাইবে যে, বিশ্বসৃষ্টির যাহা উপাদান তাহা জড় এবং পরতন্ত্র; স্বতন্ত্র চেতন নহে। চেতন স্বতন্ত্র কর্তার সাহায্য ব্যতীত অস্বতন্ত্র জড় প্রকৃতি বা মায়া যে সৃষ্টি নির্বাহ করিতে পারে না, ইহা

"রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্।" ব্রঃ সূঃ ২।২।১।
"ঈক্ষতে র্নাশব্দম্।" ব্রঃ সূঃ ১।১।৫, ইত্যাদি

ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য প্রভৃতিতে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য পরমাণু-কারণবাদী বৈশেষিক আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতানুসারে পরমাণুর আকর্ষণ, বিকর্ষণ প্রভৃতি শক্তি স্বীকার করিয়া, পরমাণু হইতে বিশ্বসৃষ্টির যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, ঐ পরিকল্পনা বেদান্তদর্শনে আচার্য শঙ্কর আলোচনা করিয়াছেন এবং জড় পরমাণুর স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব অসম্ভব বুঝিয়াই ন্যায়োক্ত পরমেশ্বর কারণতাবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।[২] আচার্য শঙ্কর বলেন, আকর্ষণই পরমাণুর স্বভাব হইলে, সৃষ্টিই কেবল হইবে, প্রলয় সেক্ষেত্রে অসম্ভব হইবে। আবার বিকর্ষণ পরমাণুর স্বভাব হইলে, সৃষ্টি কখনও সম্ভবপর হইবে না। পরমাণু ক্ষুদ্রতম পদার্থ। ক্ষুদ্রতম পরমাণুর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই উভয় প্রকার স্বভাব স্বীকার করিতে গেলে, তাহার পরমাণুত্বই ব্যাহত হয়। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ পরস্পর

১। শঙ্করোক্ত জগন্মিথ্যাত্ববাদের বিরুদ্ধে দ্বৈতবেদান্তী মধ্বাচার্য প্রভৃতির আপত্তি এবং ঐসকল আপত্তির পরিহার আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি।

২। উভয়থাপি ন কর্মাতস্তদভাবঃ। ব্রঃ সূঃ ২।২।১২; নিত্যমেব চ ভাবাৎ। ব্রঃ সূঃ ২।২।১৪; রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্যয়োদর্শনাৎ। ব্রঃ সূঃ ২।২।১৫; ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

বিরুদ্ধ বলিয়া, একই পরমাণুর ঐরূপ বিরুদ্ধ স্বভাবের কল্পনাও করা চলে না।[১] যদি বল যে, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ পরমাণুর স্বভাব নহে, আগন্তুক ধর্ম। অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হইলে, তবেই একটি পরমাণু অপর একটি পরমাণুকে আকর্ষণ করে বা বিযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ অনুকূল পরিবেশের হেতু কি? সৃষ্টির উষায় বায়বীয় পরমাণুতে যে কর্মের উন্মেষ দেখা যায়; যাহার ফলে একটি বায়বীয় পরমাণু অপর একটি বায়বীয় পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া, ক্রমশঃ বায়ুর সৃষ্টি করে, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, এইরূপে দ্ব্যণুকাদিক্রমে (দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু, চতুরণুক প্রভৃতি উপপাদন করিয়া) বিশ্বসৃষ্টির গোড়াপত্তন করে। একটি পরমাণু যে অপর একটি পরমাণুর সহিত যুক্ত হয়, এই সংযুক্তির কারণ কি? সংযুক্তি যখন একটি কার্য, তাহার অবশ্যই কিছু-না-কিছু কারণ অবশ্যই থাকিবে। কারণ ব্যতীত কার্য হয় না। অকারণে কার্যোৎপত্তি স্বীকার করিলে, পরমাণুকারণবাদীর মতে যখন তখন যে-কোন কার্যেরই উৎপত্তি ঘটিতে পারে। বিশ্বের নিয়ম শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। জগৎ বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মেরই ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। সৃষ্টির উষায় জীবের অদৃষ্ট, চেষ্টা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে না বলিয়া, জীবের অদৃষ্ট, প্রযত্ন প্রভৃতিকে বিশ্বসৃষ্টির কারণ বলা চলে না। শেষ পর্যন্ত পরমেশ্বরের সৃজনেচ্ছাকেই (সিসৃক্ষা বৃত্তিকেই) সৃষ্টির কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।* বৃহদারণ্যকের অক্ষর ব্রহ্মের বর্ণনায় আমরা

১। অপি চাণবঃ প্রবৃত্তিস্বভাবা বা নিবৃত্তিস্বভাবা বোভয়স্বভাবা বাঽনুভয়স্বভাবা বাঽভ্যুপগম্যন্তে গত্যন্তরাভাবাৎ। চতুর্ধাপি নোপপদ্যতে। প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে নিত্যমেব প্রবৃত্তের্ভাবাৎ প্রলয়াভাবঃ প্রসঙ্গঃ। নিবৃত্তিস্বভাবত্বেঽপি নিত্যমেব নিবৃত্তের্ভাবাৎ সর্গাভাবপ্রসঙ্গঃ। উভয়স্বভাবত্বং চ বিরোধাদসমঞ্জসম্।

ব্রহ্মসূত্র-শং ভাষ্য, ২।২।১৪ সূঃ।

* অতিআধুনিক বৈজ্ঞানিকও ক্ষুদ্রতম পরমাণুর মধ্যে অপরিমিত শক্তির সন্ধান লাভ করিয়াছেন। সেই শক্তির প্রভাবেই পরমাণু বিশ্বে অসাধ্য সাধন করিতেছে, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে; যাহা কল্পনার রাজ্যে বিরাজ করিত, তাহা বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে ও হইতেছে। এই শক্তির প্রভাব অসীম। সসীমের মধ্যেই এই অসীমের বিকাশ অহরহ নব নব ভাবে ঘটিতেছে। তবুও প্রশ্ন আসে এই যে, ঐ আণবিক শক্তি মৃন্ময়ী, না চিন্ময়ী। শক্তির এই দ্বিবিধ বিভাবই জড়বিজ্ঞানে এবং অধ্যাত্মদর্শনে আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছে। আণবিক শক্তি মৃন্ময়ী জড়শক্তি।

দেখিতে পাই, কেবল পরিদৃশ্যমান বিশ্বই নহে, দ্যুলোক ভূলোক যত কিছু সৃষ্টি আছে, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নদ, নদী, স্থাবর, জঙ্গম সমস্তই অক্ষর ব্রহ্মের অলক্ষ্য নিয়ম বা শাসনকে শিরে ধারণ করিয়া স্ব স্ব গতিপথে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছে।[১] সেই মহাশাসনকে উল্লঙ্ঘন করিয়া নিখিল বিশ্বে কাহারও চলিবার শক্তি নাই। এইজন্য নৈয়ায়িক পরমাণুকারণবাদ গ্রহণ করিয়াও, পরমেশ্বরের ইচ্ছায়ই জগতের উপাদান পরমাণুসমূহ মিলিত হইয়া জগতের সৃষ্টি করে এবং তাঁহারই সংহারেচ্ছাবশতঃ পরমাণুপুঞ্জ বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রলয় ঘটে, এইরূপ ঈশ্বরবাদেরই শরণ লইয়াছেন। বস্তুতঃ ভারতীয় সংহিতাকার, পুরাণবিৎ, দার্শনিক, সকলেই

"দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একো
বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।"

এই শ্রুতিমূলে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি পরমেশ্বরকেই জগতের নিমিত্তকারণ, জগৎ-স্রষ্টা, জগৎপাতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। "একোঽহং বহুস্যাম্" "এক আমি বহু হইব," বহুনামে বহুরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করিব, এইরূপে সৃষ্টির ঊষায় শ্রীভগবানের যে সৃজনেচ্ছার (সিসৃক্ষাবৃত্তির) উদয় হইয়াছিল, তাহারই ফলে এই বিচিত্র ধরিত্রী জন্মলাভ করিয়াছে।

'ঈশ্বরঃ কারণম্' পরমেশ্বর জগতের কারণ, ইহা বুঝা গেল। এখন প্রশ্ন এই, জীবের কর্মনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র ঈশ্বরই জগতের কারণ, না জীবের কর্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের কারণ? জীবের কর্ম ও অদৃষ্টসাপেক্ষ ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিলে, পরমেশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ব্যাহত হয়। এই অবস্থায় তাঁহাকে জগৎকর্তা বলিয়াও নির্বিবাদে স্বীকার করা চলে না। অতএব জীবের কর্মনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র পরমেশ্বরই জগতের কারণ, এই সিদ্ধান্তই স্বীকার্য। ঈশ্বর নিজের ইচ্ছাবশতঃই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সাধন করেন। তিনি

ব্রহ্মশক্তি বা ঈশ্বরশক্তি চিন্ময়ী, সুতরাং অজড়া। এই চিৎশক্তিই বিশ্বপ্রসবিনী মহাশক্তি, ইহারই অপর নাম পরমেশ্বরের সৃজনেচ্ছা বা সিসৃক্ষা বৃত্তি। ইহাই বেদান্তের মায়া, সাংখ্যের প্রকৃতি ও তন্ত্রের দশমহাবিদ্যা।

১। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে প্রাচ্যোনদ্যঃ স্যন্দন্তে প্রতীচ্যন্‌চ·········

বৃহদারণ্যক—অক্ষর ব্রাহ্মণ।

স্বেচ্ছাচারী, তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় কোনরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না, ইহাও অতি প্রাচীনমত। নকুলীশ পাশুপত-সম্প্রদায় এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।[১] শৈবাচার্য ভাসর্বজ্ঞের "গণকারিকা" গ্রন্থের রত্নটীকায় এই মতের বিস্তৃত আলোচনা আছে। তদনুসারে মাধবাচার্য "সর্বদর্শন সংগ্রহের" "নকুলীশ-পাশুপতদর্শনে" ঐ মতের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া পরে "শৈবদর্শন" প্রবন্ধে ঐ মতের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। জীবের কর্মাদিনিরপেক্ষ ঈশ্বরই কারণ, এই মত প্রাচীনকালে একপ্রকার "ঈশ্বরবাদ" নামেও কথিত হইত। প্রাচীন পালিজাতকে ও কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থেও পূর্বোক্তরূপ ঈশ্বরবাদের উল্লেখ দেখা যায়।[২] অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতেও এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] ন্যায়গুরু গৌতম ন্যায়দর্শনে

"ঈশ্বরঃ কারণম্ পুরুষ কর্মাফল্যদর্শনাৎ।" ন্যায়সূত্র, ৪।১।১৯।

এই সূত্রে আলোচ্য ঈশ্বরবাদকে খণ্ডন করিয়া জীবের কর্মসাপেক্ষ পরমেশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

নৈয়ায়িকের এইমত পূর্বমীমাংসার রচয়িতা জৈমিনি গ্রহণ করেন নাই। মহর্ষি জৈমিনির মতে জীবের কর্ম বা অদৃষ্টই বিচিত্র জগৎস্মৃষ্টির নিমিত্তকারণ। তাহাতে ঈশ্বরের কোনই স্থান নাই।

জৈমিনির এই মত বাদরায়ণ "ধর্মং জৈমিনিরতএব।" ব্রঃ সূঃ ৩।২।৪০। এই বেদান্তসূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। "পূর্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ।" ব্রঃ সূঃ ৩।২।৪১। এই সূত্রে উক্ত জৈমিনি-মত খণ্ডন করিয়া, পরমেশ্বরই

১। কর্মাদি নিরপেক্ষস্তু স্বেচ্ছাচারী যতো হ্যয়ম্।
অতঃ কারণতঃ শাস্ত্রে সর্বকারণকারণম্॥
সর্বদর্শন সংগ্রহে নকুলীশ পাশুপত দর্শন দ্রষ্টব্য।

২। ইস্‌সরো সব্বলোকস্‌স স চে কপ্পেতি জীবিতং।
ইদ্ধিব্যসনভাবঞ্চ কম্মং কল্যাণপাপকং।
নিদ্দেসকারী পুরিসো ইস্‌সরো তেন লিস্পতিং।
মহাবোধিজাতক, (জাতক ৫ম খণ্ড—২৩৮ পৃষ্ঠা)
মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহোদয় কর্তৃক অনূদিত ন্যায়দর্শনের টিপ্পনী ৪।১।১৯ সূত্র দেখুন।

৩। সর্গং বদন্তীশ্বরতস্তথান্যে তত্র প্রযত্নে পুরুষস্য কোঽর্থঃ।
য এব হেতুর্জগতঃ প্রবৃত্তৌ হেতুর্নিবৃত্তৌ নিয়তঃ স এব॥
অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, ৯ম সর্গ, ৫৩ শ্লোক।

জীবের সর্বকর্মফলদাতা, বিশ্বসৃষ্টিরও তিনিই নিমিত্ত; "সর্ববেদান্তেষুচেশ্বর-হেতুকা এব সৃষ্টয়ো ব্যপদিশ্যন্তে।" ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ৩।২।৪১, এইরূপ স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

পরমেশ্বরকে জগতের স্রষ্টা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া, ঐ সৃষ্টিকে আবার জীবের অদৃষ্ট এবং কর্মসাপেক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বা সর্বশক্তিমত্তা ব্যাহত হয়। এইজন্য মীমাংসক সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ঐরূপ ঈশ্বরে কোন প্রমাণ নাই, প্রয়োজনও নাই। * সাংখ্যসিদ্ধান্তেও ত্রিগুণাত্মিকা জড়প্রকৃতিই জগতের রচয়িত্রী, তাহাতে ঈশ্বরের কোনও স্থান নাই। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে সাংখ্যসম্মত সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াও, সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরকেই প্রকৃতির অধ্যক্ষ এবং বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত বলিয়া তাঁহার দর্শনে গ্রহণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের এপিকিউরাস্ এবং তাঁহার মতানুবর্তী দার্শনিকগণও অন্ধ জড়শক্তিকেই বিশ্বসৃষ্টির কারণ বলিয়া মনে করেন। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে বাস্প বা নীহারিকাপুঞ্জই জগতের মূল কারণ। নীহারিকাপুঞ্জই ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া জীবনিবাসোপযোগী জগদাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। দার্শনিক পণ্ডিত ক্যাণ্ট্ বলেন, আদিতে শৃঙ্খলারহিত বাস্পময় পদার্থই বিদ্যমান ছিল, তাহাই মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি নৈসর্গিক নিয়মে ক্রমশঃ ঘনীভূত এবং কঠিন হইয়া বর্তমান পৃথিবীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

জীবের কর্ম, অদৃষ্ট কিংবা সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি প্রভৃতি জড় পদার্থ বিধায়, চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত উহারা কোনরূপ কার্যই জন্মাইতে পারে না। সুতরাং জীবকুলের বিবিধ বিচিত্র অদৃষ্টমূলে জগতের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিতে গেলে, সেখানেও জীবের অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা স্বতন্ত্র চেতন স্রষ্টা অবশ্য স্বীকার্য। অসর্বজ্ঞ জীব তাঁহার অনাদিকালসঞ্চিত অনন্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হইতে পারেন না। এই অবস্থায় সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি পরমেশ্বরকেই এই বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টিচক্রের পরিচালক অধ্যক্ষ বলিয়া গ্রহণ করা স্বাভাবিক।

জীবের কর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে, বিচিত্র সৃষ্টিবৈষম্য কোনমতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। করুণাবতার পরমেশ্বর রাগদ্বেষের বশবর্তী হইয়া ইচ্ছাবশতঃ তাঁহার কোন সন্তানকে সুখী,

কোন সন্তানকে ভিক্ষাজীবী, কাহাকে মানুষ, কাহাকেও পশু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা কল্পনাও করা যায় না। তাহাতে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বেই সন্দেহ হয়। তিনি সাধারণ মানুষেরই পর্যায়ে পড়েন। পরমেশ্বর জগন্নিয়ন্তা বলিয়া তাঁহাকে পূজা করা চলে না। পরমেশ্বর যে রাগদ্বেশের বশীভূত নহেন, তাহা আমরা তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই জানিতে পারি।

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। গীতা, ৯।২৯,

এই অবস্থায় জীবের বিবিধ কর্মই বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির কারণ, এইরূপ সিদ্ধান্তই স্বীকার্য। ভগবান্ বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলিয়াছেন—

"বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি"। ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪।

ভাষ্যকার শঙ্কর ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, পরমেশ্বর জীবের কর্মকে অপেক্ষা করিয়া, তদনুসারে দেবতা, মনুষ্য, পশুপক্ষী প্রভৃতি বিচিত্র প্রাণিকুল এবং ঐ সকল প্রাণিভোগ্য বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি এবং সংহার করায়, শ্রীভগবানের কাহারও প্রতি দয়া বা নির্দয়তার প্রশ্ন আসে না। ভগবান্ নির্মল জলের মত। নির্মল জল যেমন ধান, যব প্রভৃতি বিবিধ শস্যের সৃষ্টির কারণ। ভগবান্‌ও সেইরূপেই এই বিশ্বসৃষ্টির কারণ। বারিপাতের ফলে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের কোথায়ও যে ধান, কোথায়ও যে যব, গম প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার প্রতি বিশেষ বিশেষ বীজই কারণ, জল নহে। জল সাধারণ কারণ, আর বিভিন্ন শস্য বীজ অসাধারণ কারণ। দেবতা, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টিতে তাহাদের পূর্বসঞ্চিত অনাদি কর্মবীজই অসাধারণ কারণ। পরমেশ্বর নির্মল বারির ন্যায় সাধারণ কারণমাত্র। এইরূপে বিচিত্র বিবিধ জীবসৃষ্টি তাহার পূর্বকৃত কর্মসাপেক্ষ হওয়ায়, ঈশ্বরের কাহারও প্রতি পক্ষপাতিতা (বৈষম্য) বা দয়াহীনতার (নৈর্ঘৃণ্য) আপত্তি করা চলে না। পরমেশ্বর যদি প্রাণীর কর্মকে অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাবশতঃই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করিতেন; কাহাকেও পরমসুখী কাহাকেও ভিক্ষাজীবী করিয়া সৃষ্টির বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেন, তাহা হইলেই ভগবানের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের আপত্তি অনিবার্য হইত।[১] পরমেশ্বর

১। সৃজ্যমানপ্রাণিকর্মধর্মাধর্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিরিতি নায়মীশ্বরস্যাপরাধঃ। ঈশ্বরস্তু পর্জন্যবদ্‌দ্রষ্টব্যঃ। যথাহি পর্জন্যো ব্রীহি যবাদি সৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি,

সাধারণ লোকের মত রাগ ও দ্বেষের অধীন হওয়ায়, তাহাকে ভগবানের মর্যাদা দেওয়াও অসম্ভব হইত। এইজন্যই বাদরায়ণ উল্লিখিত সূত্রে বলিয়াছেন—"সাপেক্ষত্বাৎ," ইহার অর্থে আচার্য শঙ্কর ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে, স্যাতামেতৌ দোষৌ বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ, নতু নিরপেক্ষস্য নির্মাতৃত্বমস্তি। সাপেক্ষো হি ঈশ্বরো বৈষমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে। কিমপেক্ষত ইতি চেৎ, ধর্মাধর্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ।"

ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ২।১।৩৪।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকেও যদি জীবের শুভাশুভ কর্মকে অপেক্ষা করিয়াই এই বিচিত্র বিষম সৃষ্টি সম্পাদন করিতে হয়, তবে, আদি সৃষ্টিতে জীব যখন জন্মগ্রহণ করে নাই, জীবের শরীর না থাকায়, জীবের কোনরূপ কর্মানুষ্ঠানও যেক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে, সেই সর্বপ্রথম সৃষ্টিতো সমানই হইবে। পরমেশ্বর নিজ ইচ্ছাবশতঃই প্রাথমিক সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। সেই আদিম সৃষ্টি বিষম হইবে কেন? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বেদান্তসূত্রে বলিয়াছেন—

ন কর্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ। ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৫।

এই সূত্রের ব্যাখায় আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—জীবের সংসার অনাদি; সংসারের এই সৃষ্টিপ্রবাহও অনাদি। সুতরাং সর্বপ্রথম সৃষ্টি বলিয়া কোন সৃষ্টিকেই ধরা চলে না। যেই সৃষ্টির পূর্বে আর কোনদিনই সৃষ্টি হয় নাই, এমন কোন সৃষ্টিই নাই। মহাপ্রলয়ের পরে যে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তাহাকেও বস্তুতঃ পক্ষে সর্বপ্রথম সৃষ্টি বলা চলে না। কারণ, তাহার পূর্বেও অসংখ্য সৃষ্টি এবং অসংখ্য প্রলয় ঘটিয়াছে। এইরূপে সৃষ্টি ও প্রলয় অনাদি ধারার-মতই প্রবাহিত হইতেছে। এই অবস্থায় আদি সৃষ্টির প্রশ্ন তুলিয়া, আদি সৃষ্টি বিষম হইল কেন, এইরূপ প্রশ্ন করাই চলে না।[১] সংসার ও সৃষ্টি

ব্রীহিযবাদিবৈষম্যেতু তত্তদ্বীজগতান্যেবাসাধারণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি; এবমীশ্বরো দেবমনুষ্যাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি। দেবমনুষ্যাদিবৈষম্যেতু তত্তজ্জীবগতান্যেবাসাধারণানি কর্মাণি কারণানি ভবন্ত্যেবমীশ্বরঃ সাপেক্ষত্বান্ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং দুষ্যতি।

ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ২।১।৩৪।

১। প্রাগ্ বিভাগাদ্ বৈচিত্র্যনিমিত্তস্য কর্মণোঽভাবাত্তুল্যৈবাদ্যা সৃষ্টিঃ প্রাপ্নোতীতি চেৎ,

প্রবাহের অনাদিতা প্রমাণ করিবার জন্য "উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৬, এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, সংসার সাদি হইলে এবং অকস্মাৎ এই সংসারের উদ্‌ভব হইলে, জীব যথোচিত সৎকর্ম না করিয়াও সংসারের বিচিত্র বিবিধ সুখ উপভোগ করিতে পারে। কারণ, তখন তো শ্রীভগবানের অমোঘ ইচ্ছা ব্যতীত সুখদুঃখাদি ভোগের অন্য কোন কারণ দেখা যায় না। সংসার অনাদি হইলে এবং বিচিত্র বিবিধ সৃষ্টিতে জীবের শুভাশুভ কর্মকে কারণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, সৃষ্টি বৈষম্য অনায়াসেই উপপাদন সম্ভবপর হয়। সেক্ষেত্রে জীবের কর্মব্যতীত 'তাহার শরীর সৃষ্টি হয় না; শরীর ব্যতীত জীবের কর্ম করাও অসম্ভব হয়, এইরূপে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষের আপত্তিও ওঠে না। কারণ, বীজ না হইলে অঙ্কুর হইতে পারে না, অঙ্কুর না হইলে বৃক্ষের উৎপত্তি অসম্ভব হওয়ায় বীজও জন্মিতে পারে না, এক্ষেত্রে যেমন বীজের পূর্বে অঙ্কুরের সত্তা এবং ঐ অঙ্কুরের পূর্বেও বীজের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য। 'পরস্পরাশ্রয়' দোষ এখানে যেমন দোষ বলিয়া গণ্য হইবে না। জীবের কর্মের ক্ষেত্রেও সেইরূপ জীবের কর্মব্যতীত শরীর হয় না, শরীর ব্যতীত কর্ম করা সম্ভবপর হয় না, এইরূপ 'পরস্পরাশ্রয়' দোষের আপত্তি চলিবে না। বীজাঙ্কুরের ন্যায়ই শরীর ও শরীরসাধ্য কর্মের অনাদি কার্য-কারণভাব অবশ্য স্বীকার্য। সৃষ্টি প্রবাহের অনাদিতা প্রমাণ করিবার জন্য শঙ্করাচার্য নিম্নলিখিত শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ" ঋগ্‌বেদ সংহিতা, ১০।১৯০।৩,

"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্নচ সংপ্রতিষ্ঠা" ॥ গীতা, ১৫।১৩

সৃষ্টিলীলায় ঈশ্বরের প্রয়োজন

পরমেশ্বর আপ্তকাম; কোনরূপ বাসনা বা কামনার আগুণ তাঁহার অন্তরকে দগ্ধ করে না। এই অবস্থায় পরমেশ্বর বিশ্বসৃষ্টিতে লিপ্ত হন কেন ?

"ন প্রয়োজনবত্বাৎ।" ব্রঃ সূঃ ২।১।৩২ ; এই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, পরবর্তী "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩ এই সূত্রে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

নৈষ দোষঃ। অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। ভবেদেষ দোষো যদ্যাদিমান্ সংসারঃ স্যাৎ। অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবদ্ধেতুহেতুমদ্‌ভাবেন কর্মণঃ সর্গবৈষম্যস্য চ প্রবৃত্তির্ন বিরুধ্যতে। ব্রঃ সূঃ শংভাষ্য, ২।১।৩৫

উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর বলেন, কাননকুন্তলা গিরিকিরীটিনী এই সুন্দরী ধরিত্রীর সৃষ্টি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রশক্তি জীবের পক্ষে অসাধ্য হইলেও, সর্বশক্তি পরমেশ্বরের পক্ষে ইহা কোন গুরুতর ব্যাপার নহে। তাঁহার ইহা অনায়াসসাধ্য লীলামাত্র। লীলাবশতঃই পরমেশ্বর এই দৃশ্যমান বিশ্ব-প্রপঞ্চের সৃষ্টিলীলায় প্রবৃত্ত হন। আচার্য শঙ্করের উক্তি সমর্থন করিয়া বাচস্পতি মিশ্রও 'ভামতী'তে বলিয়াছেন—'স্বভাবাদ্ বা লীলয়া বা জগৎসর্জনং ভগবতোমহেশ্বরস্য।' ভামতী, ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩ উপনিষদের ঋষিও বলিয়াছেন—

"দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কাস্পৃহা।" মাণ্ডূক্য উপনিষৎ; নিষ্প্রয়োজনে চেষ্টা বা কর্মে উদ্‌যোগ জন্মে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, কোনরূপ স্থির লক্ষ্য বা প্রয়োজন না থাকিলেও সময়-বিশেষে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকেও বিভিন্ন কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে দেখা যায়। এইজন্যই "ন কুর্বীতবৃথা চেষ্টাম্", নিষ্প্রয়োজনে কোন চেষ্টা করিবে না, ধর্মসূত্রকারগণের এইরূপ নিষেধের বিধানও সার্থক হয়। নিষ্প্রয়োজন প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া অপ্যয়দীক্ষিত 'বেদান্ত কল্পতরুপরিমলে' বলিয়াছেন—চিত্তে অপ্রত্যাশিত সুখের উদয় হইলে মানুষ যে হাসে, গান করে, দুঃখের উদ্রেক হইলে বিলাপ করে, কাঁদে, তাহার সুনির্দিষ্ট কারণ থাকিলেও, প্রয়োজন দেখা যায় না। লোকেও হাসিকান্নার কারণই অনুসন্ধান করে, প্রয়োজন অনুসন্ধান করে না।[১] কারণ ও প্রয়োজন এক পদার্থ নহে। পরমেশ্বরেরও জগৎসৃষ্টির কারণ আছে, প্রয়োজন নাই। ইহাই উল্লিখিত লীলাসূত্রের রহস্য।[২] তারপর, বিশ্বসৃষ্টিতে শ্রীভগবানের যদি কোনরূপ

১। সুখিতস্য সুখানুভবপ্রযুক্তা হাসগানাদিরূপা প্রয়োজনোদ্দেশরহিতা দৃশ্যতে। নহি তত্র প্রয়োজনমণ্বপি সংভাবয়িতুং শক্যতে; দুঃখোদ্রেকে রোদনবৎ সুখোদ্রেকে হাসগানাদেঃ প্রয়োজনোদ্দেশরহিতস্য সর্বানুভবসিদ্ধত্বাৎ। অতএব হসিত-রুদিতাদিষু কারণমেব পৃচ্ছন্তি ন প্রয়োজনম্।

বেদান্ত কল্পতরু পরিমল, ২।১।৩৩ ব্রঃ সূঃ।

২। (ক) যথা লোকে মত্তস্য সুখোদ্রেকাদেব নৃত্যগানাদিলীলা, ন তু প্রয়োজনাপেক্ষয়া, এবমেবেশ্বরস্য। নারায়ণ সংহিতায়াঞ্চ

সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্যতু।
কুরুতে কেবলানন্দাদ্ যথা মর্তস্য নর্তনম্॥

প্রয়োজনের কল্পনা অবশ্য কর্তব্য হয়, তবে সৃষ্টিলীলার সাময়িক আনন্দকেই সৃষ্টির প্রয়োজন বলিয়া অনায়াসেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই আনন্দই "ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যাদি" শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীহরির সৃষ্টিলীলার বিবরণে মধ্বাচার্য বলিয়াছেন—মত্ত ব্যক্তি যেমন চিত্তে সুখোদয় হইলে কোনরূপ প্রয়োজনের অপেক্ষা না রাখিয়া নৃত্য গীতাদি লীলায় প্রবৃত্ত হয়, পরমেশ্বরও সেইরূপ প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়াই সৃষ্টিলীলায় প্রবৃত্ত হন। ইহা তাঁহার ক্রীড়ামাত্র। মধ্বাচার্যের লীলাসূত্রের উল্লিখিত ব্যাখ্যা শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামী তদীয় ভগবৎসন্দর্ভে পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। "আচার্য রামানুজও শ্রীভাষ্যে আলোচ্য মতের অনুসরণ করিয়া জগৎসৃষ্টি যে ভগবানের লীলা, চেতন অচেতন সর্ববিধ জাগতিক বস্তুই পরমেশ্বরের সৃষ্টি লীলার উপকরণ ইহা বিশেষভাবে উপপাদন করিয়াছেন।*

পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ।
মুক্তা অপ্যায়ূঃকামাঃ স্যুঃ কিমুতস্যাখিলাত্মনঃ॥ ইতি
দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কাস্পৃহেতি শ্রুতিঃ।

মাধ্বভাষ্য, লীলাসূত্র।

(খ) সর্বাণি চিদচিদ্‌বস্তূনি সূক্ষ্মদশাপন্নানি স্থূলদশাপন্নানি চ পরস্য ব্রহ্মণো লীলোপকরণানি সৃষ্ট্যাদয়শ্চ লীলেতি ভগবদ্ দ্বৈপায়ন পরাশরাদিভিরুক্তম্।

ক্রীড়াহরেরিদং সর্বং ক্ষরমিত্যুপধার্যতাম্॥
ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাং তস্য নিশাময়। (বিষ্ণুপুরাণ ১।২।২৮।)

"বালঃ ক্রীড়নকৈরিব" (বায়ুপুরাণ, উত্তর ৩৬।৯৬) ইত্যাদিভিঃ। বক্ষ্যতি চ "লোকবত্তু লীলাকৈবল্য"মিতি। বেদান্তদর্শন. শ্রীভাষ্য, ১।৪।২৭ সূত্র

*এই প্রসঙ্গে সুধী পাঠক অবশ্য লক্ষ্য করিবেন যে, "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ", ব্র° সূঃ ২।১।৩২ এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া, মাধ্ব, রামানুজ, শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণববেদান্তসম্প্রদায় পর্যন্ত সকলেই এই সূত্রটিকে পূর্বপক্ষসূত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, সৃষ্টিকার্যে পরমেশ্বরের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। প্রবৃত্তি বা চেষ্টামাত্রেরই কোন-না-কোন প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য। পরমেশ্বরের কোনরূপ প্রয়োজন না থাকায়, তাঁহার বিশ্বসৃষ্টি প্রবৃত্তিও জন্মিতে পারে না। এইরূপ আপত্তির সমাধানেই বৈদান্তিক আচার্যগণ লীলাসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্রটিকে সিদ্ধান্ত সূত্ররূপেও সহজেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কোনরূপ প্রয়োজন না থাকায় পরমেশ্বরের বিশ্বসৃষ্টিকর্তৃত্ব নাই, ইহা বলা যায় না। কেন বলা যায় না? এই প্রশ্নের উত্তরে "ন

লীলাময় শ্রীভগবানের এই বিশ্বসৃষ্টি লীলার কোনও প্রয়োজন নাই, এমন নহে। এই লীলারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন কি? আপ্তকাম, পূর্ণপ্রজ্ঞ পরমেশ্বরের নিজের কোন প্রয়োজন নাই, ইহা সত্য কথা। তবে, জীবের প্রতি অনুগ্রহই পরমেশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া জানিবে।

"ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥

গীতা, ৩।২২ শ শ্লোক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্যাসদেবের ঐরূপ সুস্পষ্ট উক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের নিজের কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যই যে তিনি কর্ম করেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যেও (সমাধিপাদের ২৫ সূত্রে) ব্যাসদেব বলিয়াছেন—
"স্বপ্রয়োজনাঽভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্॥ - পরমেশ্বরের নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও ভূতানুগ্রহই ভগবানের সৃষ্টিলীলার প্রয়োজন বলিয়া বুঝিতে হইবে। "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা" এই কথাদ্বারা আপ্তকাম পরমেশ্বরের নিজের কোন স্বার্থ স্পৃহা নাই, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়, পরার্থে, জনগণকল্যাণের জন্যও তাঁহার স্পৃহা নাই, এমন কথা বুঝা যায় না। করুণাময় পরমেশ্বরের জীবকুলের প্রতি স্বতঃসিদ্ধ করুণাই তো তাঁহার পরার্থে স্পৃহা। দয়াময় শ্রীহরির এই স্পৃহা অস্বীকার করা যাইবে কিরূপে? শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদবতারের যে প্রয়োজন বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতেই প্রাণিকুলের প্রতি শ্রীভগবানের দয়ার ভাবটি স্পষ্টতঃ প্রকাশিত হইয়াছে।[১] গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎসন্দর্ভে ভক্তজনের ভজনসুখকে ভগবদবতারের প্রয়োজন বলিয়া বর্ণনা করিয়া অজ্ঞানান্ধ জীবের প্রতি শ্রীহরির অপার করুণার সমর্থন করিয়াছেন।

"পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ
প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ" ?

প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" ব্রঃ সূঃ২।১।৩২ সূত্রটি বলা হইয়াছে। প্রবৃত্তিমাত্রই সপ্রয়োজন বিধায়, পরমেশ্বরের সৃষ্টিকার্যেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

১। তথায়ঞ্চাবতারস্তে ভুবোভারজিহীর্ষয়া।
স্বানাঞ্চানন্যভাবানামনুধ্যানায়চাসকৃৎ॥ ভাগবত, ১।৭২৫,

মধ্বাচার্য কর্তৃক ভাষ্যে উদ্ধৃত এই পদ্যাংশ আলোচনা করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী আপ্তকাম পরমেশ্বরের যে কোনরূপ স্বার্থপ্রবৃত্তি নাই, তাঁহার সমস্ত প্রবৃত্তি বা কর্মপ্রচেষ্টাই পরার্থ; বিশ্বের সৃষ্টিলীলাও সুতরাং পরার্থ। জীবের কল্যাণই ইহারও লক্ষ্য, এইরূপ সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন।

জীবের কর্ম বা অদৃষ্টসাপেক্ষ পরমেশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ। পরমেশ্বরের স্বার্থ প্রবৃত্তি না থাকিলেও পরার্থ প্রবৃত্তিবশতঃ তিনি জগতের সৃষ্টি লীলায় প্রবৃত্ত হন, ইহা বুঝা গেল। এখন কথা এই, বিশ্বস্রষ্টা ঐ ঈশ্বরের স্বরূপ কি? ঈশ্বর সগুণ, না নির্গুণ? জীবাত্মা হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? সজাতীয় না বিজাতীয়? স্রষ্টা ঈশ্বরের শরীর আছে কিনা? শরীর থাকিলে তাঁহার সেই শরীর নিত্য, না অনিত্য? এইরূপ বিবিধ প্রশ্ন অবশ্যই আসিবে। ঐ সকল প্রশ্নের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্মত উত্তর কি, তাহাও এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। আমরা ক্রমশঃ ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। প্রথম কথা এই যে, ঈশ্বর শব্দের অর্থই সর্বৈশ্বর্যময়। যিনি সর্বৈশ্বর্যময় তিনি নির্গুণ হইবেন কিরূপে? নির্গুণের স্রষ্টৃকর্তৃত্বই বা সম্ভবপর হইবে কিরূপে? কারণ, স্রষ্টৃত্বই তো একপ্রকার গুণ, নির্গুণ ঈশ্বরে স্রষ্টৃত্বগুণ থাকিবে ইহা বিরুদ্ধ কথা নহে কি? স্রষ্টৃত্ব থাকিলে স্রষ্টা আর নির্গুণ হন না, তিনি সগুণ, সবিশেষই হন। এইজন্য ঈশ্বরবাদী দার্শনিকগণ জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরকে সগুণ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যদিও অদ্বৈতবেদান্তী নির্গুণ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে সৃষ্টির অপরিণামী উপাদান বা বিবর্ত কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তবু জগৎস্রষ্টাকে অদ্বৈতবাদীও "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই তৈত্তিরীয় (৩।১) শ্রুতির ভিত্তিতে গঠিত "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই বাদরায়ণ সূত্রমূলে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের নিমিত্তকারণ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি অনন্তগুণাকর বলিয়াই বিবৃত করিয়াছেন। অবশ্য অদ্বৈতবেদান্তী এই সগুণরূপকে ব্রহ্মের পরমার্থরূপ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, পরব্রহ্মের মায়িক অভিব্যক্তি বলিয়াই তাঁহার দর্শনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তস্মান্মায়ী সৃজ্যতে বিশ্বমেতৎ"। পরব্রহ্ম চৈতন্যই শুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধানা মায়ায় প্রতিবিম্বিত হইয়া, মায়োপাধি লাভ করতঃ ঈশ্বররূপ প্রাপ্ত হন। মলিনসত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব আখ্যা লাভ

পরমেশ্বরের স্বরূপ

করেন। উপাধির গুণের পার্থক্যবশতঃই জীব অল্প জ্ঞান এবং অল্পশক্তি, পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি।* জীব ও ঈশ্বর এইমতেও সুতরাং বিজাতীয় নহে, সজাতীয়ই বটে।

ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্তেও "ঈশ্বর সগুণ এবং আত্মজাতীয়" অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে ভিন্ন হইলেও বিজাতীয় দ্রব্যান্তর নহেন, ঈশ্বরও আত্মবিশেষ, ইহাই ন্যায়-ভাষ্য প্রভৃতির সিদ্ধান্ত। এইজন্যই তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয়। মহর্ষি পতঞ্জলিও "পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ," এই কথা বলিয়া ঈশ্বরকে আত্মবিশেষই বলিয়াছেন।

ন্যায়মত

প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীবাত্মার জ্ঞান অনিত্য, ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, সুতরাং ঈশ্বর জীবাত্মা হইতে বিজাতীয় পুরুষ, তিনি জীবাত্মার সজাতীয় হইতে পারেন না। এইজন্য ন্যায়-ভাষ্যকার তাঁহার সিদ্ধান্তে যুক্তি প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছেন যে, "আত্মকল্প" (আত্মার প্রকার) হইতে ঈশ্বরের "অন্যকল্প" (অন্যপ্রকার) সম্ভবই নহে। তাৎপর্য এই যে, "আত্মা দুই প্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ঈশ্বরই পরমাত্মা, তিনিও আত্মজাতীয় অর্থাৎ আত্মত্ববিশিষ্ট। একই আত্মত্ব জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দ্বিবিধ আত্মারই ধর্ম। কারণ, আত্মা ভিন্ন আর কোন পদার্থই বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ চেতন হইতে পারে না। বুদ্ধি (জ্ঞান) যখন জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বরেরও বিশেষগুণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, তখন ঈশ্বরকেও আত্মবিশেষই বলিতে হইবে। ঈশ্বরের বুদ্ধি নিত্য বলিয়া তিনি জীবাত্মা হইতে বিজাতীয় হইতে পারেন না। ন্যায়-বার্তিকের তাৎপর্যটীকাকার ইহা সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের বুদ্ধ্যাদিগুণবত্তাবশতঃ তিনি আত্মজাতীয়। ঈশ্বরের বুদ্ধ্যাদিগুণের নিত্যতাবশতঃ তিনি জীবাত্মা হইতে বিজাতীয়, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে জলীয় ও তৈজস পরমাণুর রূপাদি নিত্য, তদ্ভিন্ন জল ও তেজের রূপাদি অনিত্য, সুতরাং জলীয় এবং তৈজস পরমাণু জল ও তেজ হইতে বিজাতীয়, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। অতএব গুণের নিত্যতা এবং অনিত্যতা প্রযুক্ত ঐ গুণাশ্রয়দ্রব্যের বিভিন্ন জাতীয়তা

---

* ইহা আমরা পূর্বপরিচ্ছেদে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ-বিচার-প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। প্রিয় পাঠক, পাঠিকা সেই আলোচনা দেখিবেন।

সিদ্ধ হয় না। একই আত্মত্ব জাতি যে জীবাত্মা এবং ঈশ্বর এই উভয়েতেই আছে"[১] তাহাই স্বীকার করিতে হয়।

বিশ্বস্রষ্টা শরীরী কি অশরীরী, এই প্রশ্নের উত্তরে দ্রষ্টব্য এই যে, পরমেশ্বর জগতের স্রষ্টা হইলে তাঁহাকে অবশ্যই শরীরী হইতে হইবে। যাঁহার শরীর নাই, তাঁহার স্রষ্টৃকর্তৃত্বও অসম্ভব। কেননা, যিনি শরীরী নহেন, তিনিও যে সৃষ্টি করিতে পারেন, এবিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এবং দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। ঘট প্রভৃতি কার্যকে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করিয়া কার্যমাত্রেরই কর্তা আছে—'ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্যত্বাৎ ঘটবৎ', এই প্রকার অনুমানের সাহায্যে দ্ব্যণুক প্রভৃতি কার্যের কর্তারূপে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর সাধন করিতে গেলে, সেক্ষেত্রে ঘটের কর্তা মৃৎশিল্পীর ন্যায় শরীরী চেতন কর্তাই সিদ্ধ হইবে। নৈয়ায়িকের অভিপ্রেত অশরীরী কর্তা সিদ্ধ হইবে না। ফলে, জগৎকর্তারও শরীর স্বীকার করিতেই হইবে; নতুবা তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্বও কোন প্রকারেই সম্ভবপর হইবে না।[২] তারপর, স্রষ্টা পরমেশ্বরের শরীর থাকিলেও, সেই শরীর নিত্য, কি অনিত্য, তাহাও অবশ্য বলিতে হইবে। শীর্যতে ইতি শরীরম্, শীর্ণ বা জীর্ণ হওয়াই যাহার স্বভাব সেই শরীরকে কোন প্রকারেই নিত্য বলা যায় না, উহা অনিত্যই হইবে। পরমেশ্বরের

ঈশ্বরের শরীর আছে কি না?

১। মঃমঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনূদিত ন্যায়দর্শনের ৪।১।২৭ সূত্রের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

২। নৈয়ায়িকের 'ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা জন্যত্বাৎ' এই অনুমানের ঘটাদি দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রতিবাদী মীমাংসক এবং নাস্তিক সম্প্রদায় "ঈশ্বরো যদি কর্তা স্যাৎ তদা শরীরী স্যাৎ", এই প্রকার প্রতিকূল তর্কের অবতারণা করিয়া, 'ক্ষিতিঃ অকর্তৃকা শরীরাজন্যত্বাৎ,' এইরূপে একটি সৎপ্রতিপক্ষ অনুমান উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং ন্যায়োক্ত অনুমানে 'শরীরজন্যত্বরূপ' উপাধিদোষ প্রদর্শনকরতঃ নৈয়ায়িকের অনুমান খণ্ডন করিয়াছেন। কর্তা হইলেই যদি তাঁহাকে শরীরী হইতে হয়, শরীরজন্যত্বরূপ উপাধি সেক্ষেত্রে ন্যায়োক্ত অনুমানের সাধ্য সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্য হইবে। কিন্তু জগতেও জন্যত্ব থাকায় এবং ন্যায়মতে জগৎকর্তা ঈশ্বরের শরীর না থাকায় উক্ত অনুমানের হেতুর (জন্যত্বের) তাহা (শরীরজন্যত্বরূপ উপাধি) ব্যাপক হইবে না। ফলে, "শরীরজন্যত্ব" ঐ অনুমানে উপাধি হইবে—"সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু, হেতুরব্যাপকস্তথা স উপাধিঃ।" ভাষাপরিচ্ছেদ—১৩৮ কারিকা দ্রষ্টব্য।

ঐরূপ অনিত্য পরিচ্ছিন্ন শরীর স্বীকার করিলে, তাঁহার ঐ অনিত্য শরীরের স্রষ্টা কে? তাহাও বলা আবশ্যক। ঈশ্বর নিজেই তাঁহার অনিত্য শরীরের স্রষ্টা হইতে পারেন না। কেননা ঐ শরীরের সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের অন্য শরীর না থাকায়, শরীরবত্ত্বই কর্তৃত্ববিধায়, ঈশ্বর তাঁহার অনিত্য পরিচ্ছিন্ন শরীরের স্রষ্টা হইবেন কিরূপে? ঈশ্বরের ঐ অনিত্য শরীর সৃষ্টির জন্য অন্য ঈশ্বর স্বীকার করিতে গেলে, সেই ঈশ্বরও অনিত্য শরীরীই হইবেন; তাঁহার ঐ শরীর সৃষ্টির জন্যও অন্য ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইবে। এই-রূপে 'অনবস্থা' দোষ অনিবার্যরূপেই দেখা দিবে।

প্রতিবাদী মীমাংসক ও নাস্তিকের উল্লিখিত আপত্তির খণ্ডনে আচার্য উদয়ন, শ্রীধর, গঙ্গেশ, জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি বলেন, ঈশ্বরের শরীর নাই। ঈশ্বরের শরীর না থাকিলেও, তাঁহার বিশ্বসৃষ্টি কর্তৃত্ব অসম্ভব হইবে না। কারণ, শরীরীই কর্তা, অশরীরী কর্তা হইতে পারিবে না, এইরূপ প্রতিবাদীর যুক্তির নৈয়ায়িকের নিকট কোনই মূল্য নাই। মৃত বা সুপ্ত ব্যক্তিরও তো শরীর আছে, ঐ অবস্থায় তাহার কর্তৃত্ব থাকে কি? সুতরাং শরীর-বত্তাই কর্তৃত্ব নহে। ক্রিয়ার অনুকূল প্রযত্নবত্ত্বই কর্তৃত্ব; অর্থাৎ কর্তার স্বীয় প্রযত্নদ্বারা কার্যের অনুকূল কারণ সমূহকে কার্যসাধনে নিয়োগ করাই কর্তৃত্ব বলিয়া জানিবে। ঐরূপ কর্তৃত্ব অশরীরী পরমেশ্বরেরও থাকিতে কোন বাধা নাই। আমরা শরীরের সাহায্য ব্যতীত কর্ম সম্পাদন করিতে না পারিলেও, সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর অশরীরী হইয়াও ইচ্ছামাত্রেই বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিতে পারেন। আমাদের প্রযত্ন বা কর্তৃত্ব শরীর সাপেক্ষ হইলেও, ঈশ্বরের নিত্য প্রযত্ন শরীরসাপেক্ষ নহে। "ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্নজন্য কার্যদ্রব্যের মূল কারণ পরমাণুসমূহে ক্রিয়া জন্মে। তাহার ফলে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ইহাতে প্রথমেই তাঁহার (পরমেশ্বরের) শরীরের কোনই অপেক্ষা নাই। (উল্লিখিত) ঘটাদি দৃষ্টান্তে কার্যত্ব হেতুতে সামান্যতঃ কর্তৃজন্যত্বেরই ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইয়া থাকে। শরীর-বিশিষ্ট কর্তৃজন্যত্বের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না। সুতরাং ঐ ব্যাপ্তিনিশ্চয়-প্রযুক্ত সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি কার্য সামান্যতঃ কর্তৃজন্য, এইরূপই অনুমান হয়। সেই দ্ব্যণুকের কর্তা শরীরী, ইহা ঐ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সেই দ্ব্যণুকাদি কার্যের যিনি কর্তা, তিনি উহার উপাদান-

কারণের দ্রষ্টা এবং অধিষ্ঠাতা, ইহা সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে তিনি যে দ্ব্যণুকের উপাদান-কারণ অতীন্দ্রিয় পরমাণুর দ্রষ্টা, সুতরাং অতীন্দ্রিয়দর্শী, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ, উপাদান-কারণের দ্রষ্টা না হইলে, তাঁহার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের অতীন্দ্রিয়দর্শিত্ব সিদ্ধ হইলে, তিনি যে শরীর ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারেন, সৃষ্টিকার্যে তাঁহার যে আমাদের ন্যায় শরীরাদির অপেক্ষা নাই, ইহাও সিদ্ধ হইবে।"[১] জগতের সৃষ্টি-সংহার প্রভৃতিতে ঈশ্বরের শরীরের অপেক্ষা না থাকিলেও, পরমেশ্বর লোকশিক্ষা এবং ধর্মরক্ষার জন্য সময়বিশেষে শরীর পরিগ্রহ করিয়া ধরিত্রীর বুকে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, ইহা পার্থসারথির মুখেই আমরা গীতায় শুনিতে পাই—

> যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

গীতা, ৪র্থ অঃ ৭-৮ শ্লোক।

উদয়নাচার্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণও গীতোক্ত ঐ মহাসিদ্ধান্ত তাঁহাদের দর্শনে অনুসরণ করিয়াছেন—

"গৃহ্লাতি হীশ্বরোঽপি কার্যবশাৎ শরীরমন্তরা দর্শয়তি চ বিভূতিমিতি।"

উদয়নকৃত ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ৫ম স্তবক, ৫ম কারিকা।

অদ্বৈতবেদান্তের মত

আচার্য বাদরায়ণ বেদান্তদর্শনে "বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্"। ব্রঃ সূঃ ২।১।৩১। এই সূত্রে পরমেশ্বরের দেহ, ইন্দ্রিয়বর্গ না থাকিলেও, তাঁহার বিশ্বসৃষ্টির যে পূর্ণসামর্থ্য আছে তাহা উপপাদন করিয়াছেন। ঐ বাদরায়ণ-সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর "অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ"।[২] এই শ্বেতাশ্বতের শ্রুতির (শ্বেতাশ্ব ৩।১৯)

১। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণের ন্যায়দর্শনের টিপ্পনী, ৪।১।২১ সূত্র।

২। পরমেশ্বরের সর্বশক্তিমত্তাবশতঃ তাঁহার চরণ ও কর না থাকিলেও তিনি চলিতে পারেন, (যে কোন বস্তু) গ্রহণ করিতে পারেন। চক্ষু না থাকিলেও তিনি দেখিতে পান কান না থাকিলেও শুনিতে পান।

উল্লেখ করিয়া বাদরায়ণের উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন—অকরণস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্বসামর্থ্যযোগং দর্শয়তি। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ২।১।৩১।

শ্রীরামানুজ, মধ্বাচার্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণববেদান্ত-সম্প্রদায় ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া পরমেশ্বরের প্রাকৃত দেহ স্বীকার না করিলেও, অপ্রাকৃত নিত্য দেহ স্বীকার করিয়াছেন। পরমেশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ, ইহা ছান্দোগ্য প্রভৃতি বহুশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।[১] ঐ সকল শ্রুতি অনুসারে পরমেশ্বরকে জ্যোতিঃ পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাঁহার রূপও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ, জ্যোতিঃ পদার্থ একেবারে রূপশূন্য হয় না। তবে পরমেশ্বরের ঐরূপ সাধারণ প্রাকৃত রূপ নহে; উহা অপ্রাকৃত রূপ। জীবের প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা ঐরূপ দেখা যায় না। এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—'ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য'। পরমেশ্বরের কোনপ্রকার রূপই না থাকিলে, 'তাঁহার রূপ নাই', ইহাই সরলভাবে শ্রুতিতে বলা উচিত ছিল। তাঁহার রূপ চক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না, এইরূপ চাক্ষুষ-দর্শনের নিষেধের সেক্ষেত্রে কোনই অর্থ হয় না। এইরূপ নিষেধের দ্বারাই পরমেশ্বরের যে অপ্রাকৃত রূপ আছে, তাহা বুঝা যায়।

বৈষ্ণববেদান্ত-সম্প্রদায়ের অভিমত

যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্। মুণ্ডক, ৩।১।

বৃহচ্চতদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্। মুণ্ডক, ৩।১।৭।

বিবৃণুতে তনূং স্বাম্। মুণ্ডক, ৩।২।৩।

জ্ঞান-বিজ্ঞানময় শ্রুতির এই সকল উক্তিদ্বারা পরমেশ্বরের যে রূপ বা তনু আছে, তাহাই নিঃসংশয়ে আমরা বুঝিতে পারি।

সর্বতঃ পাণিপাদন্তং সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ॥ ঋগবেদ, ১০ম মণ্ডল,

অঙ্গানি তস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি। বিষ্ণু পুরাণ।

এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতিতে পরমেশ্বরের রূপের যেমন বর্ণনা পাওয়া যায়, 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্,' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা আবার ঈশ্বরে শব্দ, স্পর্শ রূপ প্রভৃতির অভাবও বুঝা যায়। এই অবস্থায় বিরুদ্ধ শ্রুতি এবং

১। জ্যোতিদীপ্যতে, ছান্দোগ্য, ৩।১৩।৪;
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। মুণ্ডক, ২।২।৯।

স্মৃতির সমন্বয় করিতে গেলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, পরমেশ্বরের সাধারণ চক্ষুর গ্রাহ্য প্রাকৃত রূপ নাই; অপ্রাকৃত জ্যোতির্ময়রূপ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার 'ভগবৎসন্দর্ভে' এবং 'সর্বসংবাদিনী' গ্রন্থে শ্রুতি ও স্মৃতির সমন্বয় বিচার করিয়া উল্লিখিত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত তিনি অনুমান-প্রমাণের সাহায্যেও তদীয় 'ভগবৎসন্দর্ভে' উপপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[১] বিশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্তী আচার্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে "অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ"। ব্রঃ সূঃ ১।১।২১। এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় পরব্রহ্মের অপ্রাকৃতরূপ সমর্থন করিয়াছেন। দ্বৈতবেদান্তী মধ্বাচার্য "রূপোপন্যাসাচ্চ", ব্রঃ সূঃ ১।১।২৩। এই সূত্রের বিবরণে পরমেশ্বরের অপ্রাকৃতরূপের বর্ণনা করিয়া, "অন্তবত্ত্বমসর্বজ্ঞতা বা", ব্রঃ সূঃ ২।২।৪১। এই সূত্রের ভাষ্যে পরব্রহ্মের যে বুদ্ধি, মন, করচরণাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি আছে তাহাও শাস্ত্রবলে সমর্থন করিয়াছেন।[২] পরমেশ্বরের জ্ঞানাদির ন্যায় তাঁহার অপ্রাকৃত দেহও নিত্য, অনিত্য নহে। ঈশ্বরের ঐ দেহ অনিত্য হইলে, তাহা কোনমতেই এই অনাদি সৃষ্টি-প্রবাহের সাধন হইতে পারে না। পরমেশ্বরের ঐ নিত্য দেহ পরিচ্ছিন্ন, কি অপরিচ্ছিন্ন, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীব গোস্বামী 'সর্বসংবাদিনী'তে বলিয়াছেন—

"তস্য শ্রীবিগ্রহস্য পরিচ্ছিন্নত্বেঽপি অপরিচ্ছিন্নত্বং শ্রূয়তে, তচ্চ যুক্তমচিন্ত্য-শক্তিত্বাৎ।"

ভগবানের শ্রীবিগ্রহ পরিচ্ছিন্ন হইলেও অপরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছন্নের এই অপরিছিন্নতা পরব্রহ্মের অবিচিন্ত্য শক্তি বলেই সম্ভবপর হয়। এই মতে শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহ এবং তাঁহার কর-চরণ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

১। তথা চ প্রয়োগঃ—ঈশ্বরঃ সবিগ্রহঃ জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নবৎকর্তৃত্বাৎ কুলালাদিবৎ। স চ বিগ্রহো নিত্য ঈশ্বরকরণত্বাৎ তজ্‌জ্ঞানাদিবদিতি। শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ভগবৎসন্দর্ভ। পরমেশ্বরের বিগ্রহ বা শরীর আছে, যেহেতু তিনি জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন বিশিষ্ট কর্তা। যেমন ঘটাদি কার্যের কর্তা কুম্ভকার। শরীরী ব্যতীত কেহই কর্তা হইতে পারে না। কর্তা হইলেই ঐ কর্তা অবশ্য হইনেব। জগৎকর্তা পরমেশ্বরও সুতরাং শরীরী, অশরীরী নহেন।

২। ব্রঃ সূঃ ১।১।২৩; ও ২।২।৪১ সূত্রের মাধ্বভাষ্য দ্রষ্টব্য।

শ্রীবিগ্রহই পরমেশ্বর, পরমেশ্বরই শ্রীবিগ্রহ। পরমেশ্বর হইতে ঐ বিগ্রহ ভিন্ন কিছু নহে। দেহ এবং দেহী অভিন্ন।

সৃষ্টিতে স্রষ্টার সম্পর্ক যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তাহা অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতও স্বীকার করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটল্ (Aristotle) বলেন—সৃষ্টির কারণ অনাদি এবং অনন্ত। সৃষ্টিও সুতরাং অনাদি এবং অনন্ত। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকে আরিষ্টটল্ স্বয়ম্ভূ হইতে বিচ্ছুরিত বলিয়াই মনে করেন। প্লেটোর মতে অনন্তকাল হইতে যে অপরিবর্তনীয় ভাবধারা (idea) পরিবর্তনশীল পদার্থরাজির সঙ্গে সম্মিলিত রহিয়াছে, বিশ্বজগৎ তাহারই বহিঃপ্রকাশমাত্র। নিওপ্লেটনিক্ (Neoplatonic) দার্শনিকগণের মতে ঈশ্বর ও জগৎ উভয়ই তুল্যরূপে অনাদি ও অনন্ত। জোনোফিনিস্ প্রভৃতির মতে ভগবান্ এবং ব্রহ্মাণ্ড এক ও অভিন্ন। আধুনিক জার্মানীতে এই মতেরই প্রচলন অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টইক্ (Stoic) সম্প্রদায় ভগবান্ ও পদার্থ, এই দুইটিকেই সৃষ্টির মূল কারণ বলিয়া মনে করেন। ইহাদিগের মতে প্রথমটি অর্থাৎ ভগবান্ ক্রিয়াশীল; দ্বিতীয়টি বা জাগতিক পদার্থ ক্রিয়াস্থল। দ্বিতীয়টির উপর প্রথমটির যে ক্রিয়া চলিতেছে, তাহারই ফলে জগৎ উদ্ভূত হইতেছে। খৃষ্টানদিগের ধর্মগ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, পরমেশ্বরের মুখের কথা হইতেই দৃশ্যমান বিশ্বের উদ্‌ভব হইয়াছে। ঈশ্বর বলিলেন—"আলো হউক", অমনি জগতে আলোর উদ্‌ভব হইল। এইভাবে ঈশ্বরের কথানুসারেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব জন্মলাভ করিল। এইরূপ খৃষ্টীয় মতের অনুরূপ মতবাদ আমরা আমাদের প্রাচীন বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, সংহিতা প্রভৃতি হইতেও জানিতে পারি। "স ভূরিতি ব্যাহরৎ স ভূমিমসৃজত" তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২।২।৪।২। এইরূপ দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্টিও স্রষ্টা প্রজাপতির উক্তি অনুসারেই আত্মপ্রকাশ লাভ করিল।[১]

১। (ক) "এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৄঁস্তিরঃ-পবিত্রমিতি গ্রহানাশব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানিতি শস্ত্রমভিসৌভগেত্যন্যাঃ প্রজাঃ" ইতি শ্রুতিঃ।

১।৩।২৮ সংখ্যক ব্রঃ সূত্রের শংভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রুতি।

(খ) অনাদি নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ংভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥

"শব্দ ইতি বচেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্"। ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৮।

এই বেদান্তসূত্রে আচার্য বাদরায়ণ আলোচিত শ্রৌতমত অনুসরণ করিয়া, শব্দ হইতে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি সমর্থন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য ভাষ্যে নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া বাদরায়ণাচার্যের সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, শিল্পী যে ঘট, বস্ত্র প্রভৃতি সৃষ্টি করে, সেক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, শিল্পী ঐ শিল্পের বাচক শব্দকে মনে মনে চিন্তা করিয়া তবেই শিল্পকে রূপায়িত করে। এই অনাদি সৃষ্টি-প্রলয়-প্রবাহেও প্রজাপতি পূর্বতন সৃষ্টির অনুরূপ বিশ্বসৃষ্টি সাধন করিবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টির বাচক নিত্য বৈদিক শব্দসমূহ মনে মনে চিন্তা করিয়াই পূর্ব সৃষ্টির অনুরূপ পশ্চাত্তন সৃষ্টির বিধান করিয়াছেন।[১] নিত্যশব্দই শব্দপূর্বক সৃষ্টির মূল। এইজন্যই জগৎকে বাদরায়ণ বেদান্তসূত্রে 'শব্দপ্রভব' বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন।

আদি পুরুষ আদম ও আদি জননী ইভ্ হইতেই খৃষ্টান সম্প্রদায় যেমন জগতের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করেন, হিন্দু ঋষিগণের মতেও সৃষ্টির ঊষায় স্রষ্টা প্রজাপতি আপনাকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া অর্ধেকে পুরুষের রূপ ও অপরার্ধে প্রকৃতির রূপ পরিগ্রহ করতঃ জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

পুরাণ ও সংহিতাকারের মতে প্রজাপতি বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজ দেহ হইতে ধ্যানবলে এক বিরাট অণ্ড সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে বিশ্ব-জীবন-বীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই অণ্ডমধ্যে সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করিলেন।[২] কোন কোন পুরাণে কিছু কিছু

নামরূপঞ্চ ভূতানাং কর্মণাং চ প্রবর্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্মমে স মহেশ্বরঃ ॥
সর্বেষাং তু স নামানি কর্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্মমে ॥

মনুসংহিতা, ১ম অঃ।

১। চিকীর্ষিত মর্থমনুতিষ্ঠং তস্য বাচকং শব্দং পূর্বং স্মৃত্বা পশ্চাত্তমর্থমনুতিষ্ঠতীতি সর্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষমেতৎ। তথা প্রজাপতেরপি স্রষ্টুঃ সৃষ্টেঃ পূর্বং বৈদিকাঃ শব্দা মনসি প্রাদুর্বভূবুঃ, পশ্চাত্তদনুগতানর্থান্ সসর্জেতি গম্যতে। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ১।৩।২৮।

২। মনুসংহিতা, ১ম অঃ ৮৯ শ্লোক।

মতভেদ থাকিলেও পুরাণোক্ত সৃষ্টির ইহাই মূল কথা। পুরাণকার জলময়ী সৃষ্টি সমর্থন করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থেও জলপ্লাবনের এবং ঐ জলমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় বিশ্ববীজবাহী নোয়ার নৌকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারগণের মধ্যে ভাবের ঐক্য লক্ষ্যণীয়। সৃষ্টির প্রক্রিয়া-সম্পর্কেও সাংখ্য-পাতঞ্জল এবং বেদান্তমতের মধ্যে অনেকাংশে সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে বেদান্তী বলেন, সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় একমাত্র সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন; অপর কিছুই ছিল না। ঋগ্‌বেদের 'নাসদীয়' সূক্তে এই অবস্থার চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। বৈদিক ঋষি সেই অবস্থার বর্ণনায় নাসদীয় সূক্তে বলিয়াছেন, তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, পৃথিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না; সূর্যও ছিল না; চন্দ্রও ছিল না, দিবাও ছিল না, রাত্রিও ছিল না। যদিও দ্বৈতসম্পর্কবর্জিত পরমসত্তা অস্তিতামাত্ররূপে তখনও বর্তমান ছিল, তবু তাঁহাকে সেই অবস্থায় 'সৎ'রূপে অভিহিত করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ, সেই অবস্থায় তখন কোনরূপ আখ্যাও ছিল না, অভিব্যক্তিও ছিল না। সদসতের তাহা অতীতাবস্থা। এই অবস্থার বর্ণনায় শ্রুতি বলিয়াছেন—রাত্রির অন্ধকারে যেমন সমস্ত দৃশ্যপদার্থ আবৃত থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানের গাঢ় অন্ধকারে বিশ্ব তখন আবৃত ছিল—

বেদান্তোক্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া

"নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীম্।
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতম্॥"

ঋগ্‌বেদ ১০ম মঃ, নাসদীয় সূক্ত ১২৯।

সর্বাচ্ছাদক অজ্ঞানই শ্রুতিতে তমঃশব্দে অভিহিত হইয়াছে। সত্তা বা প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত সেই তমঃস্বভাবা মায়া হইতেই নামরূপময় বিশ্বপ্রপঞ্চ আবির্ভূত হইয়াছে। এই আবির্ভাবের নামই জন্ম। স্তিমিত গম্ভীর সেই পরমসত্তাকে অদ্বৈতবেদান্তী বিশ্বের অপরিণামী উপাদান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই দ্বৈতসম্পর্কবর্জিত 'অস্তিতা' কিভাবে, বিশ্বসত্তায় রূপান্তরিত হইল। জগতের অপরিণামী বা বিবর্ত উপাদান 'পরমসৎ' কিরূপে বিশ্বপ্রপঞ্চে অনুস্যূত হইয়া মিথ্যা জগৎকে সত্যরূপ দান করিল। প্রলয়ের তামসী নিশার অবসানে সৃষ্টির রথচক্রকে কিভাবে প্রাচীনপথে পুনরাবর্তিত

করিল, সেই রহস্য এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিব। সৎ, চিৎ ও আনন্দ, পরব্রহ্মের এই ত্রিবিধ বিভাব বেদান্তের সিদ্ধান্তে অভিন্ন হইলেও, সৃষ্টিরহস্য বুঝিবার জন্য ঐ ত্রিবিধ বিভাবের তাৎপর্য আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। পরমসতের যে চিদ্‌ভাব তাহাই বিশ্বপ্রসবিনী মায়াকে বীক্ষণ করিয়া মায়াধীশ, দ্রষ্টা, সাক্ষিরূপ প্রাপ্ত হন। 'এক আমি বহু হইব', মায়াধীশ দ্রষ্টার এইরূপ বহু হইবার আকূতি সেই অনির্বাচ্য। গুণময়ী মায়ারই বিলাস। দ্রষ্টা সাক্ষীর মহামনে যে বিশ্বসৃজনী বৃত্তি আত্মপ্রকাশ লাভ করিল, শ্রুতির ভাষায় তাহারই নাম কাম বা কামনা। এই কামনাই মায়া। মায়াধীশ পরমেশ্বরের সৃষ্টি-উন্মুখ মনের ইহা প্রথম বিচ্ছুরণ। প্রলয়ের অন্ধকারে নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চই বীজরূপে মায়ার গর্ভে লুক্কায়িত ছিল। মায়াধীশ পরমেশ্বরের প্রেরণায় মায়ার শরীরে স্পন্দন দেখা দিল। প্রলয়ের কালরাত্রির প্রভাত হইল। সৃষ্টির উষার অরুণালোকে জীবজগতে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। প্রলয়ের যবনিকা অপসারণ করিয়া দিয়াও, মায়াধীশ মায়ার প্রভাব মুক্ত হইয়া সৃষ্টির জালে বিজড়িত না হইয়াই অবস্থান করেন। এইজন্যই মায়াধীশের পক্ষে এই সৃষ্টি লীলামাত্র, বন্ধন নহে। মিথ্যা মায়া লইয়া স্বাধীনভাবে খেলা করার নামই লীলা। এই লীলার মূল হইল পরব্রহ্মের আনন্দভাব। একক লীলা হয় না। "একাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ"। আনন্দময় পরমেশ্বর নিখিল বিশ্ববীজরূপা যোগমায়াকে তাঁহার সৃষ্টিলীলার সহচরী করিয়া তিনি সৃষ্টিলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন! মায়ার অধ্যক্ষ মায়াধীশে মায়ার কোন প্রভাব নাই, ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। সুতরাং মায়াধ্যক্ষ পরমেশ্বরের এই সৃষ্টিলীলায় যোগমায়া তাঁহার সহচরী হইলেও এই বিশ্বসৃষ্টি তাঁহার পক্ষে লীলামাত্রই রহিল। তাঁহার দ্রষ্টা সাক্ষিস্বরূপের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। মায়া প্রভাব বিস্তার করে যাহারা মায়াবশ্য সেই জীব ও জগতের উপর। মায়াধ্যক্ষ জানেন—মায়া মিথ্যা, মায়িক অভিব্যক্তিও মিথ্যা। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সকলই ভ্রান্তিবিলাসমাত্র। একমাত্র সত্য-শিব-সুন্দররূপ অদ্বয় পরব্রহ্মই সত্য। 'সেই পরব্রহ্মই আমি' অজ্ঞ জীব ইহা জানে না, সেইজন্যই মায়ার কুহকে পড়িয়া সংসার সাগরে ডুবিয়া মরে।

ঈশ্বরের বিশ্বদর্শন এবং জীবের জগদ্দর্শনের মধ্যে পার্থক্যও সুতরাং অনেক। জীবের কর্তৃত্বাভিমান আছে। পরমেশ্বরের তাহা নাই। সে উদাসীন দ্রষ্টা। তাঁহার বহুভবন প্রবৃত্তির মধ্যে (অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়, এইরূপ সৃজনেচ্ছার মধ্যে) অভিমানের অভিব্যক্তি থাকিলেও, এই অভিমান তাঁহার মহামনে কোনপ্রকার রেখাপাত করে না। সৃষ্টির মিথ্যাত্বসম্পর্কে তাঁহার দৃঢ় নিশ্চয় থাকে। স্বীয় সচ্চিদানন্দ ভাবেরও কোনরূপ বিচ্যুতি ঘটে না। এইজন্য সৃষ্টি স্রষ্টাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু মায়ার অধ্যক্ষ হইয়া তিনিই এই জগদিন্দ্রজাল রচনা করেন—

"মায়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচরম্॥"

গীতা ৯।১০।

"দ্রষ্টা পুরুষ দৃশ্য প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া যেন বলেন, "আহা; কি সুন্দর! কি আনন্দ!" ইহাই পুরুষ প্রকৃতির আদি মিলন। এই আদি মিলনানন্দই আভাসরূপে ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্যন্ত সকল জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই আনন্দই সৃষ্টির কারণ।" এই আনন্দকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তৈত্তিঃ ৩।৬ "এই মিলনানন্দই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকরূপে চরাচর জগৎকে আনন্দে নৃত্য করাইতেছে। এই পুরুষ প্রকৃতিই অর্দ্ধনারীশ্বর; শিব-দুর্গা, রাম-সীতা, কৃষ্ণ-রাধা প্রভৃতি রূপে সাধনার জগতে পূজা লাভ করিতেছেন। এই যুগল মিলনে দ্রষ্টা পুরুষ দৃশ্য প্রকৃতির সহিত বাস্তবিক না মিশিলেও যেন মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। এইরূপ যুগলের পরিকল্পনার মধ্যে যে আনন্দভাব প্রকাশ পাইতেছে অন্তর্যামী সাক্ষী চৈতন্যই সেই ভাবের প্রকাশক। ইহা সাক্ষিচৈতন্যের আনন্দ ভাবেরই অভিব্যক্তি। সাক্ষী আনন্দভাবের দ্রষ্টা, আনন্দভাবটি এখানে দৃশ্য বা ভোগ্য। এই দৃশ্য বা ভোগ্য আনন্দ-ভাব উন্মেষপ্রাপ্ত হইয়া দ্রষ্টাকেও যেন আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে।"[১]

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দ্রষ্টা সাক্ষীর যে আনন্দভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা আনন্দমাত্রকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, আনন্দভোগকে লক্ষ্য করিয়া নহে। কেননা, ভোগের আনন্দ জীবেরই

১। আনন্দগীতা, ৮৭ পৃষ্ঠা

সম্ভবপর, সাক্ষীর পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। ভোগাভিমান জীবকেই স্পর্শ করে, উদাসীন সাক্ষীকে তাহা স্পর্শ করে না। দ্বিতীয়তঃ ভোক্তা জীবের যেমন ভোগাভিমান আছে; সেইরূপ ভোগের ব্যাবহারিকভাবে সত্য কোন-না-কোন আলম্বন অবশ্যই থাকিবে; ভোগের আলম্বন ব্যতীত জীবের ভোগ কদাচ সম্ভবপর নহে। ফলে, জীবের ভোগে ভোক্তা, ভোগ্য এবং ভোগ, এই ত্রিপুটীই একান্ত আবশ্যক। যে ভোগে এই ত্রিপুটীর কোন সম্পর্ক নাই; এই ত্রিপুটীকে বাদ দিয়া ভোগ যেখানে আনন্দমাত্রে পর্যবসিত হয়; সেই ত্রিপুটীবর্জিত আনন্দমাত্র বা ভূমানন্দই পরব্রহ্মের আনন্দভাবের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। মায়ার কিছুমাত্র উন্মেষ ঘটিলেই 'পরম সৎ' 'চিৎ'এ বিবর্তিত হন; আরও একটু অধিকতর উন্মেষে 'চিৎ' 'আনন্দে' বিবর্তিত হন। বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা করিতে গেলে মায়া-শক্তির এই উন্মেষ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। অদ্বৈতবেদান্তী এই দৃষ্টিতেই পরব্রহ্মের 'চিদ্'ভাব ও 'আনন্দ'ভাবের সার্থকতা উপপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ ত্রিপুটীবর্জিত হওয়ায় আনন্দমাত্র বা ভূমানন্দ ও চিন্মাত্রেই পর্যবসিত হয়।[১] বিশুদ্ধ চিৎ আবার চেত্যতা (চিতির বিষয় বা জ্ঞেয়) বর্জিত হওয়ায় অস্তিতামাত্র 'পরমসতে'ই পর্যবসান লাভ করে। 'সৎ' 'চিৎ' 'আনন্দ' এই তিনটি বিভাব তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সত্তামাত্র ব্রহ্ম বস্তুকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে।[২]

এই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইয়া মায়াধীশরূপে স্রষ্টা পরমেশ্বর সংজ্ঞা লাভ করেন। যিনি স্বতঃ নির্গুণ তিনিই মায়া উপাধি গ্রহণ করিয়া সগুণ সবিশেষ হন। এই সগুণভাব তাঁহার লীলামাত্র। লীলাময় পরমেশ্বর প্রাণিগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া, মায়িক বিগ্রহ ধারণ করতঃ জগতের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, দেহধারীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকেন (দেহবানিব লক্ষ্যতে), সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী এই মায়াশক্তিই বিশ্ববীজস্বরূপা। মায়াধীশ পরমেশ্বর মায়ার সাক্ষীমাত্র। সাক্ষী পরমেশ্বরের

১। আনন্দগীতা ৮৮পৃঃ।

২। 'সৎ' 'চিৎ' 'আনন্দ' এই ত্রিবিধ বিভাব কিরূপে নির্বিশেষ পরব্রহ্মের বোধক হইয়া থাকে, তাহা আমরা ২য় পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি, জিজ্ঞাসু পাঠক সেই আলোচনা দেখুন।

'বীক্ষণে'র ফলে 'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা' প্রকৃতির শরীরে গুণের বিক্ষোভ ঘটে এবং তখনই সৃষ্টির জোয়ার আরম্ভ হয়। বিশ্বজননী প্রকৃতির উপাদান সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণের স্বভাব এবং কার্যাবলী কিরূপ? এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যের সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা যায়—সত্ত্বের ধর্ম প্রকাশ, আনন্দ, লঘুতা; রজোগুণের ধর্ম প্রবৃত্তি ও কর্মপ্রেরণা; তমোগুণের ধর্ম মোহ, আবরণ বা আচ্ছন্নভাব।[১] দেবগণ সত্ত্বপ্রধান, মানবকুল রজঃপ্রধান, পশুপক্ষী বৃক্ষলতা প্রভৃতি তমঃপ্রধান। আনন্দময় প্রকাশকে যাহা আবৃত করে, তাহাই তমঃ। আবরণ করা বা ঢাকিয়া রাখাই তমোগুণের স্বভাব। এই আবরণকে অপসারণের যে প্রচেষ্টা তাহাই 'রজঃ'। তমোগুণেব আবরণ অপসারিত হইলে যে প্রকাশময় আনন্দময় অবস্থার উদ্‌ভব হয়, তাহাই সত্ত্বগুণের কার্য। গুণময় জগতে সর্বত্রই সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিনগুণের খেলা চলিতেছে। এই গুণাপসারণের প্রচেষ্টারও কিছু বিরাম নাই। গুণের বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া, গুণাতীতে পৌঁছিবার প্রযত্ন যাঁহার যত অধিক ততই তিনি উন্নততর জীব। পরব্রহ্মকে যাঁহারা নিজস্বরূপ বলিয়া জানিয়াছেন—'অহং ব্রহ্মাস্মি', তাঁহারাই গুণাতীত হইয়াছেন, প্রকৃতিকে তাঁহারা মিথ্যা অবস্তু বলিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। কোনরূপ গুণের আবরণ না থাকায়, তাঁহাদের গুণাপসারণের প্রচেষ্টাও নাই; কোন কিছু প্রকাশ হওয়ারও নাই। তাঁহারা স্বপ্রকাশ, আনন্দময়, নিত্যমুক্ত। গুণময়ী ঐ প্রকৃতি দুই প্রকার—শুদ্ধসত্ত্বময়ী এবং মলিনসত্ত্বময়ী। শুদ্ধসত্ত্বময়ী প্রকৃতির নাম মায়া, মলিনসত্ত্বময়ী প্রকৃতির নাম অবিদ্যা। মায়া সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি পরমেশ্বরের উপাধি; অবিদ্যা অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি জীবচৈতন্যের উপাধি। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব অবিদ্যার বশ।

ঈশ্বরের উপাধি মায়া অখণ্ড এবং একই প্রকার, কিন্তু জীব-চৈতন্যের উপাধি অবিদ্যা খণ্ড খণ্ড এবং বহুপ্রকার হইয়া থাকে। "মায়াবী ঈশ্বরের 'আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' এইরূপ বোধ থাকে। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবগণ সত্ত্ব-নানাত্বহেতু আপনাদিগকে খণ্ড খণ্ড বলিয়া বোধ করেন। এই সকল খণ্ডভাবের তারতম্য আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—ইঁহারা বৃহৎ বৃহৎ খণ্ড।

১। সত্ত্বং লঘুপ্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ। গুরুবরণকমেব তমঃ।
ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্য কারিকা।

ব্রহ্মা রজঃপ্রধান, বিষ্ণু সত্ত্বপ্রধান ও মহেশ্বর তমঃপ্রধান। ইঁহারা খণ্ড বটেন, কিন্তু ইঁহাদের অবিদ্যা আবরণ অত্যন্ত স্বল্পমাত্র থাকায়, সৃষ্ট হইবার পর অনুসন্ধানমাত্রে আপন অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপের জ্ঞান হওয়ায়, জীবন্মুক্ত অবস্থায় সৃষ্ট্যাদিকার্য করিতেছেন। মরীচিআদি প্রজাপতিগণ ইঁহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর খণ্ড। ইঁহারাও অতি সহজেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত (অবস্থা প্রাপ্ত হন)। ইন্দ্রাদি দেবগণ আরও ক্ষুদ্র খণ্ড। ইঁহারা প্রজাপতিগণ অপেক্ষা অধিক প্রযত্নে তত্ত্বস্মৃতি লাভ করিয়া থাকেন। গন্ধর্বগণ আরও ক্ষুদ্র খণ্ড, তদপেক্ষা মনুষ্যগণ, তদপেক্ষা পশুপক্ষী-আদি এইরূপে ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রতর বস্তু। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্যন্ত সকলের মধ্যেই খণ্ডভাব অল্পবিস্তর বিদ্যমান; ইহারা সকলেই অবিদ্যাগ্রস্ত জীব। তন্মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্তাবস্থায় প্রারব্ধানুসারে স্বীয় স্বীয় অধিকার পালন করিতেছেন, কেহবা মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন; কেহবা মুক্তির জন্য প্রযত্ন না করিয়া বিষয়ভোগে মত্ত আছেন, কেহবা অত্যন্ত তমসাচ্ছন্ন হইয়া কর্মফল ভোগ করিয়া যাইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে জীবন্মুক্ত পুরুষগণ ঈশ্বরসদৃশ। প্রভেদ এইমাত্র—ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানময়; ইঁহারা কিন্তু সাধনার দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। স্বরূপতঃ ঈশ্বরের সহিত একত্বজ্ঞান থাকিলেও তুচ্ছ মায়িক প্রারব্ধবশে নিজ নিজ অধিকার পালন করিতেছেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরে কিন্তু খণ্ডভাব আদৌ নাই, তিনি অখণ্ড, পূর্ণ। আনন্দমাত্র ব্রহ্ম মায়াশক্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অন্তর্যামী ঈশ্বরনাম ধারণ করেন। অন্তর্যামীর ইচ্ছা, আদেশ বা শাসনানুসারে ব্রহ্মাদি সকলেই নিজ নিজ অধিকারে আছেন। তাঁহার এই নিয়মকেই মহানিয়তি বলে।"[১]

দৃশ্যমান জীব জগৎ সমস্তই এই নিয়তির অধীন। এই নিয়তিই মায়া। মায়া পরমেশ্বরাশ্রিত এবং তাঁহার শক্তি। এই মায়াশক্তিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় বিধান করেন। কর্মমাত্রেরই মূল এই প্রকৃতি (প্র+কৃতি), সেই কর্ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি ক্রিয়াই হউক, কিংবা জীবের ক্ষুদ্রতর ক্রিয়াই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। সাক্ষী অন্তর্যামী পুরুষের কোন ক্রিয়া

১। আনন্দ গীতা ৯১—৯২ পৃষ্ঠা।

নাই। তিনি উদাসীন দ্রষ্টা। ভ্রান্তিবশতঃই প্রকৃতির ক্রিয়া প্রকৃতির ভাসক পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে। স্বচ্ছ কাচখণ্ডের সম্মুখে জবাকুসুম ধরিলে কাচখণ্ডও যেমন লাল দেখায়, প্রকৃতি সম্মুখস্থ হইলে শুদ্ধপুরুষও প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকৃতির শাসক, ভাসকও অন্তর্যামিরূপে সৃষ্টিক্রিয়ায় বিজড়িত বলিয়া প্রতিভাত হন। বস্তুতঃ অন্তর্যামী পুরুষ প্রকৃতির চালক ভাসকরূপে স্রষ্টা হইয়াও, উদাসীন সাক্ষীমাত্র। এই সাক্ষী চৈতন্য সতত জাগরূক* হইলেও জীবের সুষুপ্তি অবস্থায় 'কিছুই জানি না', 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্' এইরূপ অজ্ঞান জীবভাবকে গ্রাস করে। এই অজ্ঞানই মূল প্রকৃতি। সুষুপ্তিতে জীবমাত্রই এই মূল অজ্ঞানজলে ডুবিয়াই জীবভাব হারাইয়া ফেলে। সে জীব ক্ষুদ্রতর খণ্ডই হউক, কি বৃহত্তর খণ্ডই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। বিশ্বশিল্পী ব্রহ্মাও তাঁহার নিদ্রার সময় উপস্থিত হইলে অর্থাৎ প্রলয়ের ঘণ্টা বাজিলে ঐরূপ 'জানিনা'র অজ্ঞানে ডুবিয়া আত্মহারা হন। সৃষ্টির ঊষায় সুষুপ্তি ক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া সৃষ্টিকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্তম্ব পর্যন্ত সকল জীবই এই সুষুপ্তি ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত হইতেছে। এই মূল অজ্ঞানটি একটি বিরাট ক্ষেত্রের ন্যায়। ইহার অন্তরালে অসংখ্য জীব বীজ বর্তমান রহিয়াছে। নিয়তিবশে এই অজ্ঞানক্ষেত্রে যখন যে বীজ ফুটিয়া ওঠে, তখন তাঁহারই কর্ম দেখা যায়। এই মূল অজ্ঞান বা প্রকৃতিকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতিরও উৎপত্তির ক্ষেত্র বলা হয়। ব্রহ্মার জগৎসৃষ্টি, বিষ্ণুর বিশ্বপরিপালন এবং শিবের ধ্বংসলীলাও মূল অজ্ঞান বীজেরই ক্রিয়া। অজ্ঞান ক্ষেত্রই অগণিত অজ্ঞানবীজের আধার। এই বীজগুলি অজ্ঞানক্ষেত্রে সমষ্টিরূপেই বিদ্যমান, ব্যষ্টিরূপে নহে। সমষ্টি ও ব্যষ্টি আপেক্ষিক কথা ; সমষ্টির ব্যষ্টি ; আবার ব্যষ্টিরই সমষ্টি। এই সমষ্টি অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত সাক্ষিচৈতন্যই সমগ্র জীব ও জগতের অন্তর নিয়মিত করিয়া থাকেন বলিয়া অন্তর্যামী সংজ্ঞা লাভ করেন।

মূল অজ্ঞান বা প্রকৃতি সাক্ষীর অধিষ্ঠান ও অন্তর্যামীর প্রতিবিম্ব লইয়া কাল, স্বভাব, নিয়তি বা যদৃচ্ছাবশতঃ ক্রমে ক্ষুব্ধা হন। ফলে, প্রকৃতিতে যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ পরস্পরকে অভিভূত করিয়া সাম্যাবস্থায় বর্তমান

* পূর্ব পরিচ্ছেদে সাক্ষীর স্বরূপের আলোচনা দেখুন।

ছিল, তাহাদের মধ্যে ক্ষোভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমে সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া উঠিয়া এক মহান্ প্রকাশরূপে সমুদিত হয়। ইহাই মহত্তত্ত্ব বা 'অস্মিতা' বা 'আছি' এইরূপ একটা অস্পষ্ট (জৈব) আত্মানুভূতি। 'আছি' কিন্তু 'কে আমি' তাহার নির্দিষ্ট বা স্পষ্ট অনুভব (তখনও) উদিত হয় নাই। পরে রজোগুণের উন্মেষে এই অস্পষ্ট 'আছি' ভাবটা স্পষ্ট 'অহম্' আকারে প্রস্ফুরিত হয়। ইহা নির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট 'আমি' ভাব। 'অস্মি' (বা আছি ভাবটি) 'অহম্' এরই সূক্ষ্মাবস্থা। পরে এই 'অহম্' উঠিয়া বলেন 'অহং বহু স্যাম্', 'আমি বহু হইব'। তখন এই সমষ্টি 'অহম্' হইতে অন্তর্লীন বহু-জীবভাব পৃথক্ পৃথক্ আকারে ক্রমে প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। যথা ঃ—"অহং ব্রহ্মা" "অহং বিষ্ণুঃ" "অহং মহেশ্বরঃ"—ক্রমে ইঁহারা উদিত হয়েন। ব্রহ্মা হইতে আবার মরীচি আদি প্রজাপতিগণ নিজ নিজ অহংভাব লইয়া সমুদিত হন। এইরূপে ক্রমে দেব, গন্ধর্ব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি স্ব স্ব অহংভাব লইয়া অভিব্যক্ত হন। এই 'অহম্' গুলি সকলেই ভোক্তা জীব। ইহারা ভোগের জন্য উন্মুখ হইয়াই অবস্থান করেন। ভোগ নিষ্পাদন করিতে হইলে ভোগের সাধন মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বহিঃকরণ, ভোগায়তন স্থূল দেহ এবং ভোগ্য পদার্থ সম্বলিত বহির্জগৎ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক। ভোগের জন্য উন্মুখ জীবের ভোগসাধনের জন্য অন্তর্যামীর শাসনে তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চ তন্মাত্রে তমোভাব অধিক, সত্ত্ব এবং রজঃ অংশও ইহাতে অল্প মাত্রায় বিদ্যমান আছে। আকাশ বা শব্দতন্মাত্রের সত্ত্ব অংশ হইতে শ্রোত্র বা শ্রবণ শক্তিশালী জ্ঞানেন্দ্রিয়, রজঃ অংশে হইতেই বাক্‌শক্তি বিশিষ্ট কর্মেন্দ্রিয় এবং তামস অংশ হইতে পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্থূল আকাশ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এইরূপে এক একটি তন্মাত্র জীব প্রস্ফুটিত হইয়া তিন তিন অংশে বিভক্ত হয়। তন্মাত্রার সত্ত্বাংশ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, রাজস অংশ হইতে কর্মেন্দ্রিয়, তামস অংশ হইতে স্থূলভূত জন্মলাভ করে। আকাশ তন্মাত্রের গুণ একমাত্র শব্দ। ঐ শব্দগুণের সহিত স্পর্শগুণ যুক্ত হইলে আকাশ তন্মাত্রই বায়ুতন্মাত্রে রূপান্তরিত হয়। বায়ুতন্মাত্রের সহিত রূপের যোগ হইলে বায়ু অগ্নিতে, তাহার সহিত রসের যোগ ঘটিলে অগ্নি জলে এবং গন্ধগুণের যোগে জল পৃথিবীতে পরিণত

হয়।[১] * শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচ প্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। এই অন্তঃকরণ উহার বৃত্তির ভেদবশতঃ অনেক প্রকার হইলেও (১) মনঃ, ও (২) বুদ্ধি, এই দুই প্রকার বৃত্তিই প্রধান। মন সংশয় তোলে, বুদ্ধি সংশয়ের মীমাংসা করিয়া দেয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচ প্রকার কর্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টি হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। বৃত্তি এবং ক্রিয়ার ভেদবশতঃ এই প্রাণও হয় পাঁচ প্রকার—(১) প্রাণ, (২) অপান, (৩) সমান, (৪) উদান ও (৫) ব্যান্। মনঃ, বুদ্ধি, শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচ প্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ, এই সতেরটি অবয়বের সাহায্যে জীবের যে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীরের সৃষ্টি হয়, তাহাই তাঁহার ভোগের করণ বা সাধন। ইহাদের দ্বারাই ভোক্তা জীব বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। ভোগের ঐ সাধন সৃষ্টি হইবার পর, অন্তর্যামী জীবের ভোগসিদ্ধির জন্য ভোগায়তন জীবদেহ এবং ভোগ্য পদার্থসমূহ আকাশাদি পঞ্চতন্মাত্রের তামস অংশ হইতে 'পঞ্চীকরণ' প্রক্রিয়ার সাহায্যে উৎপাদন করেন। তন্মাত্র হইতে পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থসমূহই স্থূল মহাভূত। আকাশ তন্মাত্রের আট আনা অংশ এবং অপরাপর ভূত চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের দুই আনা অংশ (৪ × ২ = ৮) মিলাইয়া স্থূল অকাশ (ভূতাকাশ) জন্মলাভ করে। ইহাকেই পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়া বলে। এইরূপে স্থূল বায়ু, স্থূল তেজঃ, জল, ক্ষিতি প্রভৃতি এই প্রক্রিয়ায়ই সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থূল পাঁচ প্রকার মহাভূতের বিবিধ সংযোগও সন্ধানের ফলে জীবের ভোগায়তন স্থূলদেহ এবং রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধময়ী জীবভোগ্যা এই বিচিত্র ধরিত্রী জন্মলাভ করে। ভোক্তা জীব

১। আনন্দ গীতা ৮৫ পৃঃ, ৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য

আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ ততঃ পৃথিবী।
তৈত্তিরীয়, ২।১।

* তন্মাত্র কাহাকে বলে ?

তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রাস্তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।

তন্মাত্রা শব্দের অর্থ 'তাহাই মাত্র', রূপ নিজে যাহা তাহাই রূপতন্মাত্র, অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতির আধারকে বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই রূপমাত্রকে রূপতন্মাত্র, গন্ধমাত্রকে গন্ধতন্মাত্র, রসমাত্রকে রসতন্মাত্র প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে।

ভোগায়তন স্থূল দেহে অবস্থিত থাকিয়া ভোগের করণ বা সাধন ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সাহায্যে বিষয় সকল ভোগ করিয়া থাকে। * [সজের সৃষ্টিক্রমের চিত্রটি দেখুন]

যে-ক্রমে জগতের সৃষ্টি হয়, তাহার বিপরীত ক্রমে প্রলয় ঘটে। প্রলয়ে ভোগায়তন দেহ এবং ভোগ্য পদার্থসমূহ তমঃপ্রধান প্রকৃতির তামস অংশে, কর্মেন্দ্রিয় সকল রাজস অংশে, জ্ঞানেন্দ্রিয় সাত্ত্বিক অংশে বিলীন হয়। ভোক্তা জীব সকল অহংকারে, অহংকার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি বা মূল অজ্ঞানে বিলীন হইয়া সূক্ষ্মশক্তিরূপে অবস্থান করে। সৃষ্টির উষায় অন্তর্যামীর প্রেরণায় মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতিরূপে বিকাশ লাভ করে। এইরূপে অনাদিভাবে সৃষ্টির জোয়ার, ভাটান টান চলিতে থাকে। এই অবস্থার একটি চমৎকার বর্ণনা আমরা বাচস্পতিমিশ্রের ভামতীতে দেখিতে পাই। মহাপ্রলয়ে অন্তঃকরণ প্রভৃতির কোনই বৃত্তি বা ক্রিয়া থাকে না। তখন ইন্দ্রিয়বর্গ, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়, ভোগায়তন স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্টির কারণ অনাদি অনির্বচনীয় অবিদ্যায় সূক্ষ্ম শক্তিরূপে অবস্থান করে। সৃষ্টির উষায় অবিদ্যায় শক্তিরূপে অবস্থিত বিশ্ববীজ সমূহই অন্তর্যামী পরমেশ্বরের প্রেরণায় কচ্ছপের সংকোচিত দেহ হইতে যেরূপ বিলীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বহির্গত হয়; বর্ষার অবসানে মাটির ঢেলার ন্যায় অবস্থিত ভেকশরীর যেমন বর্ষার জলধারায় স্নাত হইয়া পূর্ণাবয়ব ভেক-দেহ লাভ করে। এই দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ ও অনাদি বাসনা-বশে পূর্ব সৃষ্টির অনুরূপ নামরূপ লইয়াই মায়ার গর্ভ হইতে উদিত হয়। যদিও জগৎ সৃষ্টির মূলে পরমেশ্বরই বিরাজ করেন, তবুও তিনি প্রাণিগণের কর্মজালকে সৃষ্টির সহকারিরূপে গ্রহণ করিয়াই এই বিচিত্র সৃষ্টিলীলায় প্রবৃত্ত হন।[১]

* সৃষ্টিক্রমের এই চিত্রটি ৺অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত "আনন্দগীতা" হইতে উদ্ধৃত হইল।

১। যদ্যপি মহাপ্রলয়ে নান্তঃকরণাদয়ঃ সমুদাচরদ্বৃত্তয়ঃ সন্তি; তথাপি স্বকারণে অনির্বাচ্যায়ামবিদ্যায়াং লীনাঃ সূক্ষ্মেণ শক্তিরূপেণ কর্মবিক্ষেপকাবিদ্যাবাসনাভিঃ সহাবতিষ্ঠন্ত এব।............

তে চাবধিং প্রাপ্য পরমেশ্বরেচ্ছাপ্রচোদিতা যথা কূর্মদেহে নিলীনান্যঙ্গানি ততো নিঃসরন্তি, যথা বা বর্ষাপায়ে প্রাপ্তমৃদ্‌ভাবানি মণ্ডূকশরীরাণি তদ্‌বাসনাবাসিততয়া

এই মায়িক সৃষ্টি মিথ্যা। 'এই যে সুন্দরী জগৎলক্ষ্মী দেখিতেছ ইহা আদিতে ছিল না, পরেও থাকিবে না, মধ্যে থাকিয়াও নাই।' একমাত্র প্রপঞ্চোপশম, শিব, শান্ত, অদ্বয় ব্রহ্মই বিরাজমান, তাহাই সত্য, তদ্‌ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। এই সৃষ্টিকে মিথ্যা জানিয়া ইহাকে লইয়া খেলা করার নামই লীলা। অন্তর্যামী ঈশ্বর যোগমায়ার সাহায্যে এই সৃষ্টির লীলা করিয়া থাকেন। অজ্ঞ জীব ভোগমায়া বা অবিদ্যার কুহকে পড়িয়া এই মিথ্যা সৃষ্টিকে সত্য, স্বাভাবিক মনে করিয়া আপাতমধুর বিষয়োপভোগের জন্য পাগল হয়। এইজন্য অজ্ঞানী জীবের পক্ষে এই মায়া 'দুরত্যয়া' সন্দেহ নাই; তবে যাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণ, গুরুর কৃপায় "সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরই আমি" এইরূপে নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই এই মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে
মায়ামেতাং তরন্তি তে।" গীতা, ৭অঃ ১৪ শ্লোঃ।

ঘনঘনাসারাবসেকসুহিতানি পুনর্মণ্ডূকদেহভাবমনুভবন্তি, তথা পূর্ব্ববাসনাবশাৎ পূ[illegible]পাণ্যুৎপদ্যন্তে। এতদুক্তং ভবতি।—যদ্যপীশ্বরাৎ প্রভবঃ সংসার[illegible] মণ্ডলস্য, তথাপীশ্বরঃ প্রাণভৃৎকর্ম্মাবিদ্যাসহকারী তদনুরূপমেব সৃজতি।

ৗ, ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩০।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অবিদ্যা

কল্যাণী এই জগল্লক্ষ্মী অবিদ্যারই খেলা। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অবিদ্যাই ভ্রান্তি জননী, জীব ও জগৎপ্রসবিনী। অবিদ্যাই সেই মহাশক্তি—

"যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।" সপ্তশতী চণ্ডী।

অদ্বৈতবেদান্তোক্ত এই অনির্বচনীয় অনাদি অবিদ্যার লক্ষণ বা পরিচয় কি? ঐরূপ অবিদ্যায় প্রমাণই বা কি? তাহাই আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। অবিদ্যা বলিলে সহজ কথায় বিদ্যার অভাবকেই বুঝাইয়া থাকে। অবিদ্যা শব্দের অন্তরালে যে 'অ' (বা 'ন') শব্দটি আছে, তাহা স্পষ্টতঃই অভাবের সূচনা করে। এই অভাবকে এখানে অত্যন্তাভাব, অন্যোন্যাভাব প্রভৃতি বিবিধ অর্থেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফলে, অবিদ্যা বলিলে (ক) বিদ্যার অভাব, (খ) বিদ্যাভিন্ন, (গ) বিদ্যাবিরোধী জ্ঞানান্তর বা গুণান্তরকে বুঝায়। অবিদ্যাশব্দের উল্লিখিত ত্রিবিধ অর্থের যেরূপ অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন, অবিদ্যা যে অনির্বচনীয় নহে, বিদ্যার অভাব প্রভৃতিরূপে নির্বচনীয়ই বটে, তাহাতে সন্দেহ কি? যদি বিদ্যার অভাবকে অবিদ্যা বল, তবে ঘট প্রভৃতি জ্ঞেয় বস্তুর অভাব যেরূপ নির্বচনীয়, অবিদ্যাও সেইভাবে নির্বচনীয়ই হইবে। যাহা বিদ্যা নহে তাহাই অবিদ্যা হইলে, বিদ্যাভিন্ন বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই অবিদ্যা বলিয়া নির্বচনের যোগ্য হইবে। বিদ্যা বিরোধী জ্ঞানান্তরকে অবিদ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে, সত্যজ্ঞানের বিরোধী সংশয়, বিভ্রম প্রভৃতিও অবিদ্যাই হইবে; সংশয়, বিভ্রম প্রভৃতিরূপে বিদ্যাবিরোধী অবিদ্যার নির্বচনও সেক্ষেত্রে অসম্ভব হইবে না। এই অবস্থায় অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অবিদ্যাকে ভাবরূপ এবং অনির্বচনীয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা কোনমতেই সঙ্গত বলা যায় না। অনির্বচনীয়, ভাবরূপ অবিদ্যার লক্ষণ-নিরূপণ, প্রমাণ-প্রদর্শন প্রভৃতিও দুরূহ হয়।[১]

প্রতিবাদী বৈষ্ণব বেদান্তীর এইরূপ আপত্তির খণ্ডনে অদ্বৈতবেদান্তী

১। (ক) শ্রীভাষ্য, ১৭৪-১৭৫ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং ;

(খ) মাধবমুকুন্দের পরপক্ষ গিরিবজ্র, ১ম অঃ, ৭৫-৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বলেন, ভাবজগতের প্রসূতি এই অবিদ্যাকে ভাবরূপাই বলিতে হইবে; অভাবরূপা বলা চলিবে না। কেননা, অভাব ভাববস্তুর উপাদান-কারণ হয় না, হইতে পারে না। ভাবপদার্থই ভাববস্তুর উপাদান-কারণ হইয়া থাকে। বিশ্বের তাবদ্‌বস্তুর উপাদান অবিদ্যাকেও সুতরাং ভাবস্বভাবা না বলিয়া গত্যন্তর কি? অবিদ্যাশব্দের অন্তর্গত 'অ' (বা 'ন') শব্দটি এখানে অত্যন্তাভাব বা অন্যোন্যাভাব বুঝায় না; বিদ্যাবিরোধী জ্ঞানান্তর বা মিথ্যা-জ্ঞানকেই বুঝাইয়া থাকে। বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যা তিরোহিত হয়। এইজন্য অবিদ্যাকে বিদ্যাবিরোধী জ্ঞানান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে তাহাতে দোষের কথা কিছুই নাই। অদ্বৈতবেদান্তীর ভাবরূপ অবিদ্যার লক্ষণ কি? প্রতিবাদীর এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী চিৎসুখ বলেন—

অবিদ্যার লক্ষণ

'অনাদি ভাবরূপং যদ্‌বিজ্ঞানেন বিলীয়তে।
তদজ্ঞানমিতি প্রজ্ঞা লক্ষণং সংপ্রচক্ষতে'॥

চিৎসুখী, ১ম পরিচ্ছেদ।

"যাহা অনাদি, ভাবস্বরূপ এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে বিলয়প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানের তাহাই লক্ষণ বলিয়া পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।" আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার অদ্বৈতসিদ্ধিতে অবিদ্যার লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া, উল্লিখিত চিৎসুখের লক্ষণেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—যাহা অনাদি ভাবরূপ এবং জ্ঞানবিনাশ্য তাহাকেই অবিদ্যা বলিয়া জানিবে।[১] ব্রহ্মসূত্রের দেবতাধিকরণে ৩০শ সূত্রে (১ম অঃ ৩য় পাঃ) বেদান্তকল্পতরু টীকায় অমলানন্দ স্বামী—

"ভাবরূপা মতাঽবিদ্যা স্ফুটং বাচস্পতেরিহ।"

বাচস্পতির মতে ভাবরূপ অবিদ্যার পরিচয়

এইরূপে অবিদ্যার ব্যাখ্যা করিয়া, ভাবরূপ অবিদ্যাই যে ভামতীপতি বাচস্পতির অনুমোদিত তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

অবিদ্যার লক্ষণে অবিদ্যার পরিচায়ক তিনটি বিশেষণপদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়—(১) অনাদি, (২) ভাবরূপ এবং (৩) জ্ঞাননাশ্য। এই বিশেষণ তিনটির সার্থকতা কোথায়, তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

১। অথ কেয়মবিদ্যা? অনাদিভাবত্বে সতি জ্ঞাননির্বর্ত্যাসেতি॥
অদ্বৈতসিদ্ধি, অজ্ঞানলক্ষণ নিরুক্তি, ৫৪৪ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং।

পরবর্তী জ্ঞানোদয়ের ফলে পূর্ববর্তী জ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটে, ইহা কে না জানেন? এই জ্ঞান ভাবরূপও বটে, (পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয় বলিয়া) জ্ঞাননাশ্যও বটে। আলোচ্য অবিদ্যার লক্ষণে 'অনাদি' বিশেষণটির প্রয়োগ না করিলে, পরবর্তী জ্ঞাননাশ্য পূর্ববর্তী জ্ঞানকেই বা অজ্ঞান বলিতে বাধা কি? অজ্ঞানকে অনাদি বলায়, পূর্বোৎপন্ন জ্ঞান অনাদি নহে বলিয়া ঐ পূর্বতন জ্ঞানে অবিদ্যা লক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঘটিল না। অজ্ঞানকে ভাবরূপ না বলিলে, জ্ঞানের প্রাগভাবে অবিদ্যা লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য হয়। প্রাগভাব অনাদি; ঘট প্রভৃতি যে সকল বস্তুর প্রাগভাবের প্রতীতি হয়, ঘট প্রভৃতি পদার্থের উৎপত্তি ঘটিলে উঁহাদের প্রাগভাবের নিবৃত্তিও হইয়া থাকে। এইজন্য প্রাগভাবকে প্রতিযোগিনাশ্য বলা হয়। জ্ঞানের প্রাগভাব সুতরাং অনাদিও বটে, জ্ঞাননাশ্যও বটে। কিন্তু প্রাগভাব ভাবপদার্থ নহে, অভাব পদার্থ। অজ্ঞানকে ভাবরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করায় প্রাগভাবকে আর অজ্ঞান বলা চলিল না; অর্থাৎ প্রাগভাবে অজ্ঞানের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না।

অবিদ্যালক্ষণোক্ত বিশেষণের সার্থকতা

কেবল অনাদি এবং ভাবপদার্থ হইলেই তাহা অজ্ঞান হইবে না। অজ্ঞান যেমন অনাদি ভাবপদার্থ হইবে, সেইরূপ তাহা 'জ্ঞাননাশ্য'ও হইবে। ফলে, আত্মা প্রমুখ অনাদি ভাববস্তু সকল 'জ্ঞাননাশ্য' না হওয়ায় আত্মা প্রভৃতি পদার্থ আর অজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইবে না।[১]

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহা অনাদি এবং ভাবস্বভাব তাহা বিনাশী হইবে কিরূপে? অনাদি ভাববস্তুমাত্রই তো অবিনাশী। দৃষ্টান্ত হিসাবে আত্মা, পরমেশ্বর প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবিদ্যা যদি অদ্বৈতবেদান্তে অনাদি ভাববস্তুই হয়, তবে তাহাও পরমাত্মা, পরব্রহ্মের ন্যায় অবিনাশীই হইবে। ঐরূপ অবিদ্যার বিলয় কদাচ ঘটিবে না। যাহা অনাদি ভাবরূপ তাহা বিনাশী হয় না, যেমন আত্মা; এইরূপ অনুমান[২]ও ভাবরূপ অনাদি বস্তুর অবিনশ্বরতাই প্রতিপাদন করে।

ভাবরূপ অনাদি অবিদ্যা বিনাশী হয় কিরূপে?

১। চিৎসুখী—১ম পরিচ্ছেদ, ৫৪ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং;
অদ্বৈতসিদ্ধি—১ম পরিচ্ছেদ, অজ্ঞানলক্ষণ নিরুক্তিঃ; ৫৪৪ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

২। যচ্চানাদিত্বে সতি ভাবরূপং তদনিবর্ত্যং যথা আত্মা।
চিৎসুখের টীকা নয়ন প্রসাদিনী, ৫৭ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

এই অবস্থায় অবিদ্যাকে 'সত্য জ্ঞানোদয়ের ফলে বিলুপ্তি ঘটে' (বিজ্ঞানেন বিলীয়তে) বলিয়া ব্যাখ্যা করায়, এবং অনুমানবিরুদ্ধ তথ্য প্রতিপাদন করায় অদ্বৈতবাদীর অবিদ্যার লক্ষণ যে দোষকলুষিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তারপর, অনাদি সর্বপ্রকার ভাবপদার্থই যদি অবিনাশী হয়, কোন একটি অনাদি ভাববস্তুও যদি বিনাশী এবং জ্ঞাননির্বর্ত্য না হয়, তবে ঐরূপ অবিদ্যার লক্ষণ যে লক্ষ্যশূন্য ও নির্বিষয় হইবে, উক্ত লক্ষণের কোন একটি লক্ষ্যও যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, ভাবরূপ অবিদ্যার উদ্‌গাতা অদ্বৈতবেদান্তী তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

ভাবরূপ অনাদি পদার্থও বিনাশী হয়

প্রতিপক্ষের এইরূপ আপত্তির খণ্ডনে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, অনাদি ভাবপদার্থ হইলেই তাহা যে অবিনাশীই হইবে, কদাচ বিলীন (বিলীয়তে) হইবে না, প্রতিবাদীর এইরূপ সিদ্ধান্তের কোনই মূল্য নাই। প্রতিবাদীর মতেও ক্ষেত্রবিশেষে অনাদি ভাবপদার্থকে বিলীন হইতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে পার্থিব পরমাণুর শ্যামরূপের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পার্থিব পরমাণু অনাদি এবং ভাব পদার্থ, শ্যামা পৃথিবীর পরমাণুর শ্যামলিমাও সুতরাং অনাদি ভাবপদার্থই বটে। কুম্ভকারের পাকযন্ত্রে পোড়াইলে অগ্নিদগ্ধ রক্তিম ঘটে অনাদি ভাববস্তু শ্যামলিমার বিলুপ্তি ঘটাও বিচিত্র কিছু নহে।[১] এইরূপে কোন একটি অনাদি ভাববস্তুর বিলয় দেখা গেলেই, অনাদি ভাবপদার্থের বিলোপ ঘটে না, এইরূপ প্রতিবাদীর অনুমান অসার হইয়া দাঁড়ায়। অদ্বৈতবাদীর অবিদ্যার লক্ষণ লক্ষ্যহীন এবং নির্বিষয় বলিয়া প্রতিবাদী যে আপত্তি তুলিয়াছেন, সেই আপত্তিরও কোনরূপ মূল্য দেওয়া চলে না।

প্রসঙ্গতঃ ইহাও এখানে বিচার করা আবশ্যক যে, পার্থিব পরমাণুর শ্যামগুণ প্রকৃতই অনাদি ভাববস্তু কি? পার্থিব পরমাণুর শ্যামলিমা যদি অনাদি ভাববস্তু বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তবেই তাহার দৃষ্টান্তে অদ্বৈতবেদান্তী অনাদি ভাবরূপ অবিদ্যার সত্য জ্ঞানোদয়ের ফলে বিলোপের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত হয়। পরমাণুর বিশেষ গুণ শ্যামতাকে নবীন তার্কিকসম্প্রদায় 'পাকজরূপ' বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাকের ফলে পরমাণুর গুণের রকমান্তর ঘটে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করেন।

১। চিৎসুখীর টীকা নয়নপ্রসাদিনী, ৫৪ পৃঃ নির্ণয়সাগরং সং।

কাঁচা শ্যামঘট কুম্ভকারের পাকযন্ত্রে অগ্নিপক্ক হইয়া লাল বা মসীকৃষ্ণ হয়, ইহা কে না জানেন? পরমাণুর বিশেষ গুণ শ্যামলিমা যদি 'পাকজ' হয়, তবে তাহাকে তো আর অনাদি ভাববস্তু বলা চলে না; তাহা হইবে সাদি বস্তু। সেই অবস্থায় অদ্বৈতবেদান্তী পার্থিব শ্যামলিমাকে অনাদি ভাবপদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া, অনাদি ভাববস্তুরও বিনাশ হয় বলিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তই অচল হইয়া পড়িবে। আলোচ্য অবিদ্যা-লক্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মাধ্ব প্রভৃতির উদ্‌ভাবিত দোষের ক্ষালনও কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। এই অবস্থায় অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, কুম্ভকারের পাকযন্ত্রের ক্রিয়ার ফলে শ্যামল ঘট রক্ত বা মসীকৃষ্ণ হইয়া থাকে, ইহা সত্যকথা। এইরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্যের অপলাপ করা অবশ্য চলে না, অদ্বৈতবেদান্তীও তাহা করেন না। পাকরক্ত ঘটের রক্তিমা পাকজ বলিয়াই অদ্বৈতবেদান্তী গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা বলিয়া পার্থিব পরমাণুর সর্বপ্রকার বিশেষ গুণই যে পাকজ হইবে, তাহা প্রতিবাদীকে কে বলিল? পার্থিব পরমাণুর বিশেষ গুণ শ্যামতা যে পাকজ নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুকুল যুক্তি ও উপেক্ষণীয় নহে। উপাদানের গুণানুসারে উপাদেয় বস্তুর গুণোৎপত্তি হইয়া থাকে। কারণের গুণই কার্যে আসে, ইহা দার্শনিকমাত্রেই স্বীকার করেন। ত্রসরেণু স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। পরমাণুই ত্রসরেণুর চরম উপাদান এবং পরম মূল, ইহা পরমাণুবাদী অস্বীকার করিতে পারেন না। শ্যামল ত্রসরেণুর শ্যামলিমা প্রত্যক্ষগম্য। ত্রসরেণুর এই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য শ্যামলিমার মূল হইল পরমাণুর শ্যামগুণ। পরমাণুর শ্যামতা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হইলেও অনুমানলব্ধ সত্য। ঐ প্রকার অনুমানের মৌলিক অনুকূল তর্ক হইল—উপাদানের গুণানুসারে উপাদেয়ের গুণোৎপত্তির সর্ববাদিসিদ্ধ নিয়ম। ঐ নিয়মের ভিত্তিতেই অনুমান করিয়া ইহা প্রতিপাদন করা সম্ভবপর যে, পরমাণুতেও শ্যামগুণ আছে; এবং তাহা আছে বলিয়াই পরমাণুর কার্য ত্রসরেণুতে শ্যামতার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পরমাণু অনাদি ভাববস্তু, ইহা প্রতিবাদী অবশ্যই স্বীকার করেন। ঐরূপ পরমাণুর বিশেষ গুণ শ্যামতাও যে অনাদি ভাববস্তুই হইবে, তাহাও প্রতিবাদীর স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। পরমাণুর শ্যামতা পাকজ নহে, অপাকজ, সাদি নহে, অনাদি ভাববস্তু, ইহা প্রাচীন তার্কিকগণও স্বীকার করিয়াছেন। ঐ প্রাচীন তার্কিকমতের অনুবর্তন

করিয়াই অদ্বৈতবেদান্তী পরমাণুর শ্যামতাকে অনাদি ভাববস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরমেশ্বরের অপ্রতিহত জ্ঞানশক্তির প্রভাবে পরমাণুর শ্যামলিমার বিলোপও যে সম্ভবপর তাহা দেখাইয়া, অদ্বৈতবেদান্তের ভাবরূপ অবিদ্যার ব্যাখ্যায় প্রতিবাদীর সর্বপ্রকার আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন।[১] এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্মভিন্ন সকল বস্তুই যখন অনিত্য ও বিনাশী, তখন পরমাণুর শ্যামলিমাকে অপাকজ অনাদি ভাববস্তু প্রভৃতি বলায় অদ্বৈতবাদীর কোনই আগ্রহ নাই, বা থাকিতে পারে না। ইহাতে বরং অদ্বৈতবেদান্তীর সিদ্ধান্তে বিরোধই দেখা দেয়। অদ্বৈতবাদীর পরমাণুর শ্যামতার বিলোপের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করার রহস্য এই যে, প্রতিবাদীও যখন অনাদি ভাববস্তুর (পরমাণুর শ্যামগুণের) বিনাশ অস্বীকার করিতে পারেন না, তখন অদ্বৈতবেদান্তীর সিদ্ধান্তে অনাদি ভাবরূপ অবিদ্যার তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে বিলুপ্তি ব্যাখ্যা করিলে, প্রতিবাদীর তাহাতে আপত্তি করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? সত্য কথা এই যে, অদ্বৈতবাদী অনাদি অবিদ্যাকে ভাববস্তু বলিয়া গ্রহণই করেন না, অনির্বাচ্য (ভাবাভাববিলক্ষণ) বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, ইহা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে।

অবিদ্যা-লক্ষণের ব্যাখ্যায় আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলেন—অবিদ্যার লক্ষণে অবিদ্যাকে ভাবরূপা বলা হইলেও অবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে ভাবরূপা নহে, ইহা 'ভাবাভাববিলক্ষণা', অনির্বাচ্যা। লক্ষণোক্ত ভাবশব্দের স্বভাবসিদ্ধ ভাবরূপ অর্থগ্রহণ করিলে, ভাবরূপ অবিদ্যাকে আর অভাবের উপাদান-কারণ বলা চলে না। বিশ্বজননী অবিদ্যা অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ভাববস্তুর যেমন উপাদান, অভাবেরও সেইরূপ ইহা উপাদান। উপাদান এবং উপাদেয় তুল্যজাতীয়ই হইয়া থাকে। মাটিই মৃন্ময় ঘটের উপাদান হয়, সোনা নহে; সোনা স্বর্ণময় বস্তুর উপাদান হয়, মাটি স্বর্ণময় বস্তুর উপাদান হয় না। বিজাতীয় বস্তু বিজাতীয় বস্তুর উপাদান হয় না। সজাতীয় বস্তুই সজাতীয় বস্তুর উপাদান-কারণ হয়। অবশ্যই উপাদান এবং উপাদেয়ের বৈজাত্য যেমন অভিপ্রেত নহে, ইহাদের সর্বপ্রকারে সাজাত্যও সেইরূপ অভিপ্রেত নহে। উপাদান এবং উপাদেয়

আচার্য মধুসূদনের মতানুসারে ভাবরূপ অজ্ঞানের পরিচয়

১। চিৎসুখী, ১ম পরিচ্ছেদ, ৫৪-৫৫ পৃঃ, নির্ণসাগর সং

সর্বাংশে তুল্য হইলে, সেক্ষেত্রেও উপাদান-উপাদেয় ভাব হয় না। সমান-জাতীয় কারণ ও কার্যের মধ্যেও আংশিক বিভেদ বা বৈলক্ষণ্য অবশ্যই থাকিবে। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, ভাবকে তো আর অভাবের উপাদান বলা যাইবে না। কারণ, ভাব ও অভাব যে সর্বাংশেই বিজাতীয়। ভাবের উপাদান যেমন ভাববস্তু হইবে, অভাবের উপাদানও সেইরূপ অভাবই হইবে, ভাববস্তু হইবে না। ভাববস্তু অভাবের উপাদান হইলে, সেই দৃষ্টিতে সত্য বস্তুকেইবা অসত্য বস্তুর উপাদান বলিতে বাধা কি? অসত্যের উপাদান সত্য হইলে সত্যের নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে বলিয়া, অসত্যেরও সেক্ষেত্রে নিবৃত্তি সম্ভবপর হইবে না। কারণ, উপাদানের নিবৃত্তি না ঘটিলে উপাদেয়ের নিবৃত্তি হয় না, হইতে পারে না। মাটির নিবৃত্তি (বিনাশ) না হইলে ঘটের নিবৃত্তি হইতে পারে কি? অদ্বৈতবাদী অবশ্য সত্য ব্রহ্মকেও অসত্য জগতের উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন, তবে সে উপাদান বিবর্ত উপাদান, পরিণামী উপাদান নহে। উপাদান-উপাদেয় ভাবের উল্লিখিত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য-কারণ-ভাবের রহস্য বিচার করিতে গেলে, ভাবরূপ অবিদ্যাকে কোনমতেই অভাবের কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না। অভাবের উপাদান অজ্ঞানকে অভাবরূপই বলিতে হইবে। অভাবের উপাদান অজ্ঞানে ভাবত্ব থাকিবে না। এইজন্য সেখানে আলোচ্য ভাবরূপ অজ্ঞান-লক্ষণের অব্যাপ্তিও অপরিহার্য হইবে। এই অব্যাপ্তি পরিহারের উদ্দেশ্যে অদ্বৈতবাদী যদি অজ্ঞানকে কেবল ভাববস্তুর উপাদান বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন, অজ্ঞান অভাবের উপাদান নহে, এইরূপ মতবাদই গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও অদ্বৈতসিদ্ধান্ত দোষের কালিমামুক্ত হইতে পারে না। অজ্ঞান যদি অভাবের উপাদান না হয়, তবে, সত্য জ্ঞানোদয়ে অভাবের নিবৃত্তিও হইতে পারিবে না। কারণ সত্য জ্ঞান মিথ্যা অজ্ঞান এবং অজ্ঞান কার্যেরই নিবৃত্তি সাধন করে, অপর কাহারও নিবৃত্তি সাধন করিতে সে অক্ষম। অভাব যদি অজ্ঞানের কার্য বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তবেই সত্য জ্ঞান সেক্ষেত্রে অভাবের উপাদান অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য অভাবের নিবৃত্তি সাধন করিবে। অভাব অজ্ঞানকার্য না হইলে, সত্য জ্ঞানোদয়েও অভাবপদার্থ থাকিয়াই যাইবে, এবং অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ কথার কথা হইয়া দাঁড়াইবে। এই অবস্থায় ব্রহ্মাদ্বৈত সিদ্ধির জন্য অভাবের নিবৃত্তি সাধন অদ্বৈতবেদান্তীকে

করিতেই হইবে। ফলে, অভাব যে অজ্ঞানেরই কার্য, অজ্ঞান ভাববস্তুর ন্যায় অভাবেরও উপাদান-কারণ, এইরূপ সিদ্ধান্তও অদ্বৈতবাদীর স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। অভাবের উপাদান অজ্ঞানে ভাবত্ব না থাকায়, ভাবরূপ অজ্ঞান লক্ষণের অব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী, ইহা বুঝিয়াই অদ্বৈতবাদী অবিদ্যালক্ষণোক্ত ভাব শব্দের স্বাভাবিক ভাবরূপতা অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ভাব শব্দের 'অভাববিলক্ষণ' রূপ গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন[১] —

ভাবত্বং চাত্রাভাববিলক্ষণত্বমাত্রং বিবক্ষিতম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, অজ্ঞানলক্ষণ-নিরুক্তি।

অবিদ্যা কেবল অভাবেরই উপাদান নহে, অবিদ্যা ভাববস্তুরও উপাদান। এই অবস্থায় অবিদ্যাকে শুধু অভাববিলক্ষণ বলিলে চলিবে না; ইহাকে ভাববিলক্ষণও বলিতে হইবে। ফলে, ভাব শব্দের 'ভাবাভাববিলক্ষণ' বা অনির্বাচ্যই হইবে প্রকৃত অর্থ। অবিদ্যা যখন ভাবপদার্থের উপাদান হইবে, তখন তাহাকে বলা হইবে 'ভাববিলক্ষণ', যখন অভাবের উপাদান হইবে, তখন তাহা হইবে 'অভাববিলক্ষণ'। উপাদেয় ভাব ও অভাবের সহিত জগদুপাদান অজ্ঞানের সর্বাংশে সাজাত্য বা বৈজাত্য থাকিলে, সেক্ষেত্রে যে উপাদান-উপাদেয় ভাব হইবে না, ইহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। উপাদান-উপাদেয় ভাবের সিদ্ধির জন্য উপাদান ও উপাদেয়ের আংশিক সাজাত্য বা বৈজাত্য যে অত্যাবশ্যক, কার্য-কারণরহস্যবিৎ দার্শনিক তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। অবিদ্যার ভাবরূপতার বিবরণে 'বিলক্ষণ' শব্দটির যে প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদ্বারা জগদুপাদান অজ্ঞান ও তৎকার্য বিশ্বপ্রপঞ্চের আংশিক সাজাত্য বা বৈজাত্যেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

অনাদি অজ্ঞানের বিবরণ

অবিদ্যার ভাবরূপের পরিচয় দেওয়া গেল। এখন অনাদি অজ্ঞানের পরিচয় লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। অজ্ঞানকে অনাদি বলিলে শুক্তিরজত প্রভৃতি ভ্রমের ক্ষেত্রে সাদি শুক্তি প্রভৃতির আবরক অজ্ঞানকে আর অজ্ঞান বলা চলিবে না। যেহেতু সেই অজ্ঞান অনাদি নহে, সাদি। অবিদ্যা যে অনাদি এবং সাদি, মূলা এবং তুলা, এই দুইপ্রকার তাহা বাচস্পতি তাঁহার ভামতী টীকার প্রারম্ভ শ্লোকে —'অনির্বাচ্যাঽবিদ্যাদ্বিতয়সচিবস্য' এই প্রকার উক্তি দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রকাশ

১। অদ্বৈতসিদ্ধি, অজ্ঞানলক্ষণনিরুক্তিঃ, ১ম পরিচ্ছেদ, ৫৪৪ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং

করিয়াছেন। বাচস্পতির উক্তি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, অমলানন্দ স্বামী বেদান্ত কল্পতরুতে বলিয়াছেন—এক প্রকার অবিদ্যা অনাদি ভাবরূপ এবং ভাবজগতের উহা প্রসূতি, আর একপ্রকার অবিদ্যা পূর্বজাত বিভ্রমের সংস্কারবিশেষ (পূর্ব-পূর্ববিভ্রমসংস্কারঃ) অবিদ্যা এইভাবে দুই প্রকার।[১] অমলানন্দ স্বামীর প্রথমোক্ত অবিদ্যাই জগজ্জননী অনাদি মূলা অবিদ্যা, দ্বিতীয় প্রকার অবিদ্যা জীবের বিভ্রমজননী সাদি বা তুলা অবিদ্যা। জীবের রজ্জুসর্প প্রভৃতি বিভ্রম সাদি ; ঐ সাদি বিভ্রমের উপাদান অবিদ্যাও সুতরাং সাদি। অনাদির ন্যায় সাদি অজ্ঞানও যে বেদান্তসিদ্ধান্তানুমোদিত এবং অজ্ঞানলক্ষণের লক্ষ্য, তাহা অদ্বৈতবাদী অস্বীকার করিতে পারেন না। এইরূপ সাদি অজ্ঞানে (অনাদিত্ব না থাকায়) অবিদ্যা লক্ষণের অব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী নহে কি ?

প্রতিবাদীর এইরূপ আপত্তির সমাধানে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, অবিদ্যা বস্তুতঃ সাদি, অনাদি, দুই প্রকার নহে। অনাদি ব্রহ্মচৈতন্যে আশ্রিত অবিদ্যা অনাদি এবং একপ্রকারই বটে। শুক্তিরজত, রজ্জুসর্প প্রভৃতি ভ্রমের উপাদান অজ্ঞান, যাহাকে সাদি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাও অনাদি চৈতন্যে আশ্রিত বিধায়, মৌলিক দৃষ্টিতে অনাদিই বটে। পরবর্তী কালে শুক্তি প্রভৃতি সাদি বস্তু সেই অনাদি অজ্ঞানের পরিচ্ছেদক হওয়ায়, অনাদি এবং সাদি অজ্ঞানের মধ্যে একটা কল্পিত বিভেদের সৃষ্টি হইয়া থাকে ; শুক্তির উপাদান অজ্ঞানকে সাদি বলিয়া মনে হয়। এইরূপ আরোপিত বিভেদের কোনও মূল্য নাই বলিয়া, অজ্ঞানের সাদি ও অনাদি এই দ্বিবিধ রূপের কল্পনাও হইয়া দাঁড়ায় ভিত্তিহীন। সেইজন্য অদ্বৈতবেদান্তের প্রকৃতসিদ্ধান্তে অজ্ঞানকে অনাদিই বলা হইয়াছে, সাদি এবং অনাদি এই দ্বিবিধ-ভাবে গ্রহণ করা হয় নাই। সাদি অজ্ঞানের মূলে অনাদি অজ্ঞান থাকায়, সেই মৌলিক অনাদি অজ্ঞানের দৃষ্টিতে তথাকথিত সাদি অজ্ঞানেও আলোচিত অজ্ঞান লক্ষণের সঙ্গতি বা ব্যাপ্তি দেখা যায় সুতরাং অব্যাপ্তির কথা উঠে না।[২]

১। একা হ্যবিদ্যা অনাদির্ভাবরূপা দেবতাধিকরণে (ব্রঃ অঃ ১ পা ৩, সূঃ ২৬—৩০) বক্ষ্যতে, অন্যা পূর্ব-পূর্ব বিভ্রম সংস্কারঃ, তত্তেদবিদ্যাদ্বিতয়ম্,

বেদান্তকল্পতরুঃ, ৩ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং ;

২। (ক) রূপ্যোপাদানমজ্ঞানমপ্যনাদি চৈতন্যাশ্রিতত্বাদনাদ্যেব, উদীচ্যং শুক্ত্যাদিকং তু তদবচ্ছেদকমিতি ন তত্রাব্যাপ্তিঃ।

অদ্বৈতসিদ্ধি ; ১ম পরিঃ, অজ্ঞানলক্ষণনিরুক্তিঃ, ৫৪৪ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

উল্লিখিত অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মাধ্ব বলেন, অনাদি ব্রহ্মচৈতন্যে আশ্রিত অবিদ্যাকে অনাদি বলা অদ্বৈতবাদীর কোনমতেই সঙ্গত হয় না। কেননা, অবিদ্যা তমঃস্বভাবা; এবং শুদ্ধ ব্রহ্মে এই তমঃস্বভাবা বিদ্যাবিরোধী অবিদ্যার আশ্রয়ত্ব যে কল্পিত, বাস্তব নহে, ইহা অদ্বৈতবাদীরই সিদ্ধান্ত। কল্পনা অমূলক হয় না। সর্বপ্রকার কল্পনারই কোন-না-কোন মূল অবশ্য আছে এবং থাকিবে। অদ্বৈতবাদীর অবিদ্যার ব্রহ্মাশ্রিতত্ব কল্পনাও সুতরাং অমূলক নহে। দোষ (অধ্যাস)ই হইল এইরূপ কল্পনার মূল। যাহা দোষমূলক, তাহা দোষমূলক বিধায়ই সাদি হইবে, অনাদি হইবে না। এই অবস্থায় জ্ঞাননাশ্য অভাববিলক্ষণ অবিদ্যাকে 'অনাদি' বলিয়া অবিদ্যার যে পরিচিতি নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

অনাদি অবিদ্যার বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদী মাধ্বের আপত্তি

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, অবিদ্যা শুদ্ধ ব্রহ্মে কল্পিত ইহা অবশ্য সত্য কথা। কিন্তু কল্পিত হইলেই যে তাহা সাদিই হইবে, অনাদি কল্পনা করা চলিবে না, তাহা প্রতিবাদী বুঝিলেন কিরূপে? কল্পনা সাদিও হইতে পারে, কারণ থাকিলে কল্পনা অনাদিও হইতে পারে। কল্পনা হইলেই তাহা সাদি হইবে, এইরূপ নিয়ম অদ্বৈতবেদান্তী স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন; পক্ষান্তরে, অবিদ্যার কল্পনা যে অনাদি, তাহাই অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। জগজ্জননী অবিদ্যার এবং অবিদ্যার ব্রহ্মাশ্রিতত্ব কল্পনার মূলে যে অধ্যাসের খেলা চলিতেছে, তাহা অদ্বৈতবেদান্তীরই অনুমোদিত সিদ্ধান্ত। আবিদ্যক কল্পনার মূলে যেমন অধ্যাস আছে, অধ্যাসের মূলেও সেইরূপ অবিদ্যারই লীলা আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ইহা আচার্য শঙ্কর অধ্যাসভাষ্যে অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—মিথ্যা অজ্ঞানবশতঃ সত্য ও মিথ্যার মিলন ঘটে। ইহাকেই চিদচিদ্‌গ্রন্থি বা অধ্যাস বলা হয়। এই অধ্যাস বস্তুতঃ অসত্য হইলেও, ব্যবহারিক জীবনে ইহাকে সত্য স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়।

মাধ্বের আপত্তির খণ্ডন ও অবিদ্যার অনাদিত্ব সাধন

(খ) মাধবমুকুন্দ তাঁহার 'পরপক্ষ গিরিবজ্রে' 'সাদিশুক্ত্যাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যাবরকাজ্ঞানেষ্ব-ব্যাপ্তি স্তেষামনাদিত্বাভাবাৎ" বলিয়া অজ্ঞানের লক্ষণে (পরপক্ষ গিরিবজ্র, ৭২ পৃঃ) যে অব্যাপ্তির প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, মধুসূদন সরস্বতীর অজ্ঞানের লক্ষণের আলোচনায় মাধবমুকুন্দের সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

ফলে, অজ্ঞানান্ধ জীব নিজের শিবরূপ বিস্মৃত হইয়া, আমিত্বের (অহমিকার) মিথ্যা জালে পতিত হয় এবং 'আমি ইহা,' 'আমার ইহা,' আমার ধনদৌলত, প্রাসাদ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি এইরূপ অভিমান করে। জীবের এই অভিমান অনাদি; এইরূপ অভিমানের মূল অধ্যাস এবং অধ্যাসের উপাদান অবিদ্যাও সুতরাং অনাদি।[১] ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর অধ্যাসভাষ্যে জীবের উল্লিখিত ব্যবহারকে 'নৈসর্গিক' অর্থাৎ স্বাভাবিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া, ইহার অনাদিতারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও ভামতী-টীকায় জীব-জীবনের ব্যবহারকে স্পষ্টবাক্যেই অনাদি বলিয়া গ্রহণ করিয়া, ঐ ব্যবহারের মূল অধ্যাসকেও অনাদি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[২] অধ্যাস অনাদি হইলে অধ্যাসের মূল অবিদ্যাও যে অনাদিই হইবে (সাদি হইবে না) তাহাতে সন্দেহ কি? অবিদ্যাই অধ্যাস[৩] এবং অধ্যাসই অবিদ্যা, এইরূপে অবিদ্যা ও অধ্যাসের মধ্যে পরস্পরাশ্রয়তা দেখা গেলেও, অধ্যাস ও অবিদ্যার পরস্পরাশ্রয়তা বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদিসিদ্ধ বলিয়া ইহা দোষাবহ নহে। এইরূপে অধ্যাসভাষ্য, ভামতী প্রভৃতিতে অধ্যাস এবং অধ্যাসের উপাদান অবিদ্যার অনাদিতাই তর্কের ভিত্তিতে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রতিবাদীর আপত্তি যে ভিত্তিহীন তাহা সহজেই অনুমেয়।

অদ্বৈতবাদীর উল্লিখিত উক্তির প্রতিবাদে দ্বৈতবাদী মাধ্ব বলেন—অবিদ্যাকে অদ্বৈতবেদান্তী জ্ঞাননিবর্ত্য এবং অভাববিলক্ষণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করায়, অদ্বৈতবাদীর ঐ সিদ্ধান্ত বলেই অবিদ্যা যে অনাদি নহে, সাদি, তাহা অনুমান-প্রয়োগের সাহায্যে অনায়াসেই প্রতিপাদন করা যাইতে পারে।

অবিদ্যার সাদিত্ব-সাধনে দ্বৈত-বেদান্তীর অনুমান

"অবিদ্যা সাদিঃ, জ্ঞাননিবর্ত্যত্বে সতি অভাববিলক্ষণত্বাৎ, উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্য পূর্বজ্ঞানবৎ।"

১। (ক) মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য 'অহমিদং' 'মমেদমিতি' নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ। ব্রহ্মসূত্র—অধ্যাসভাষ্য।

(খ) এবময়মনাদিরনন্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রবর্তকঃ সর্বলোকপ্রসিদ্ধঃ। অধ্যাস-ভাষ্য।

২। স্বাভাবিকোঽনাদিরয়ং ব্যবহারঃ। ব্যবহারানাদিতয়া তৎকারণস্যাধ্যাসস্যানাদিতোক্তা। অধ্যাসভাষ্য, ভামতী।

৩। তমেতমেবংলক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে। অধ্যাস—শংভাষ্য।

"অবিদ্যা সাদি, অর্থাৎ অবিদ্যার আদি আছে, যেহেতু অবিদ্যা জ্ঞাননিবর্ত্যও বটে, অভাববিলক্ষণও বটে। যাহা জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনের যোগ্য এবং অভাববিলক্ষণ হয়, তাহা সাদিই হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় এবং অভাববিলক্ষণ পূর্বোৎপন্ন জ্ঞানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবিদ্যাও জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় এবং অভাবের বিলক্ষণ, সুতরাং অবিদ্যাও যে সাদি হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ?"

দ্বৈতবেদান্তীর প্রদর্শিত অনুমানের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, এইরূপ অনুমান বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া, উক্ত অনুমানে আগমবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। উপনিষদ্ স্পষ্টবাক্যেই অবিদ্যা বা মায়া যে অনাদি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।[১] এই অবস্থায় মাধ্বোক্ত অনুমান-প্রয়োগের সাহায্যে অবিদ্যার সাদিত্ব সাধনের প্রয়াস করিলে, ঐরূপ অনুমান যে 'বাধ'রূপ হেত্বাভাসদোষে কলুষিত হইবে তাহা প্রতিবাদী লক্ষ্য করিয়াছেন কি ?

অবিদ্যার সাদিত্ব-সাধক অনুমানে অনুপপত্তি প্রদর্শন

তারপর, প্রতিবাদীর অনুমানে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসও অপরিহার্য। প্রতিবাদী যেমন অনুমানের সাহায্যে অবিদ্যার সাদিত্ব সাধন করিয়াছেন, সেইরূপ নিম্নোক্ত প্রতিপক্ষ অনুমান প্রয়োগের সাহায্যে অবিদ্যার অনাদিত্বও সাধন করা যাইতে পারে—

অবিদ্যার সাদিত্ব অনুমানে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস প্রদর্শন

"অবিদ্যা অনাদিঃ জ্ঞাননিবর্ত্যত্বে সতি ভাববিলক্ষণত্বাৎ জ্ঞান-প্রাগভাববৎ।"

অবিদ্যা অনাদি, যেহেতু অবিদ্যা জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় এবং ভাববিলক্ষণ। যাহা জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় এবং ভাববিলক্ষণ হয়, তাহা অনাদিই হয়, যেমন জ্ঞানের প্রাগভাব। জ্ঞানের প্রাগভাব জ্ঞানের উদয়ে বিলুপ্ত হয়, সুতরাং প্রাগভাব যে জ্ঞাননিবর্ত্য তাহাতে সন্দেহ কি ? প্রাগভাব এক শ্রেণির অভাব বিধায়, উহা যে ভাবপদার্থের বিলক্ষণ (বিজাতীয়) ইহাও নিঃসন্দেহ। প্রাগভাব যেমন অনাদি, জ্ঞাননিবর্ত্য এবং ভাববিলক্ষণ

১। (ক) অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণামিত্যাদি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি দ্রষ্টব্য।

(খ) অনাদি মায়য়া সুপ্তো যথা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥

মাণ্ডুক্য কারিকা।

অবিদ্যাকেও সেইরূপ অনাদি এবং জ্ঞাননিবর্ত্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অবিদ্যা হয় সাদি হইবে, নতুবা অনাদি হইবে। সাদি ও অনাদি পরস্পর বিরুদ্ধ বিধায়, অবিদ্যা অবশ্য পরস্পর বিরুদ্ধ উভয়রূপ হইবে না। এখন কথা এই যে, দ্বৈতবেদান্তীর অনুমানমূলে অবিদ্যাকে কি সাদি বলিবে? না অদ্বৈতবাদীর অনুমান বলে ইহাকে অনাদি বলিয়া গ্রহণ করিবে? দ্বৈতবেদান্তীর অবিদ্যার সাদিত্ব সাধক অনুমানের তুল্যবল প্রতিপক্ষ অনুমান থাকায়, অবিদ্যাকে সেক্ষেত্রে সাদি বা অনাদি কিছুই বলা চলিবে না। অবিদ্যার সাদিত্ব বা অনাদিত্বের সন্দেহই সেখানে প্রবলতর হইবে। প্রতিবাদী মাধ্বের উক্ত অনুমানও সেক্ষেত্রে 'সৎপ্রতিপক্ষ' হেত্বাভাস দোষে কলুষিত হইবে।

অদ্বৈতবাদীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে দ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, অদ্বৈতবেদান্তী অবিদ্যার অনাদিত্ব সাধন করিতে গিয়া 'অভাববিলক্ষণ' অবিদ্যাকে 'ভাববিলক্ষণ' বলিয়া ব্যাখ্যা করায় (ভাববিলক্ষণত্বাৎ এইরূপে অনুমানের হেতু নির্দেশ করায়) অদ্বৈতবাদীর অনুমানের (ভাবলক্ষণত্বাৎ এইরূপ) হেতুই অপ্রসিদ্ধ হইবে, এবং অনুমানে হেতুর "স্বরূপাসিদ্ধি" হেত্বাভাসও অবশ্যম্ভাবী হইবে। এইরূপ হেত্বাভাস-কলুষিত অনুমানের বলে দ্বৈত-বেদান্তীর অবিদ্যার সাদিত্ব সাধক অনুমানের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদী সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসের যেই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, সেই আপত্তি ভিত্তিহীন হইয়া দাঁড়াইবে নাকি?

দ্বৈতবেদান্তি কর্তৃক অদ্বৈতবেদান্তীর অবিদ্যার অনাদিত্ব-সাধক অনুমানে হেতুর স্বরূপাসিদ্ধি প্রদর্শন

অদ্বৈতবেদান্তীর অবিদ্যার অনাদিত্বসাধক অনুমানে প্রতিবাদী মাধ্ব হেতুর যে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার খণ্ডনে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, অদ্বৈতবেদান্তে অবিদ্যাকে 'অনির্বাচ্য' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অনির্বাচ্য অবিদ্যার রহস্য এই যে, অবিদ্যা সৎ ও নহে, অসৎ ও নহে, সদসৎও নহে; ভাবও নহে, অভাবও নহে, ভাবাভাবও নহে, এইরূপেই আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার অদ্বৈতসিদ্ধিতে অনির্বাচ্য অবিদ্যার লক্ষণ নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[১]

উক্ত হেতু সম্পর্কে স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাসের খণ্ডন

প্রশ্ন হইতে পারে যে ভাব ও অভাব, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ

১। অবিদ্যা ভাবাভাববিলক্ষণং যৎকিঞ্চিদ্বস্তু সত্ত্বরহিতত্বে সতি অসত্ত্বরহিতত্বে সতি সদসত্ত্ব-রহিতত্বম্—অদ্বৈতসিদ্ধি, অনির্বাচ্যত্বলক্ষণোপপত্তিঃ।

পদার্থ। দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের একটি মিথ্যা হইলেই অপরটি যে সত্য হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। ভাব না হইলেই পদার্থ অভাবাত্মক হইবে, সৎ না হইলেই, অসৎ হইবে। এই অবস্থায় অভাববিলক্ষণ অবিদ্যাকে অদ্বৈতবেদান্তী তাঁহার উল্লিখিত (অবিদ্যার অনাদিত্বসাধক) অনুমানে "ভাববিলক্ষণ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন কি যুক্তিতে? প্রতিবাদীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, ভাব ও অভাব পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও, উহারা এইরূপ বিরুদ্ধ নহে যে উহাদের একটি সত্য হইলেই অপরটি মিথ্যা হইবে। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব অবশ্য একত্র থাকিবে না; কিন্তু ইহাদের উভয়ের অভাব এক জায়গায় থাকিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপে গোত্ব এবং অশ্বত্বের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গোত্ব এবং অশ্বত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। গোত্ব থাকিলে সেখানে অশ্বত্ব থাকে না, অশ্বত্ব থাকিলে, গোত্ব থাকে না। কিন্তু এই পরস্পর বিরুদ্ধ গোত্ব এবং অশ্বত্বের অভাব মহিষ, গজ প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়।[১] এই অবস্থায় গরু না হইলেই তাহা ঘোড়া হইবে, ঘোড়া না হইলেই তাহা গরু হইবে, এইরূপ নির্ণয় করা চলে কি? আলোচ্য স্থলে সৎ বলিতে আমরা (অদ্বৈতবাদীরা) পরব্রহ্মকে এবং অসৎ বলিতে অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতিকে বুঝিয়া থাকি। দৃশ্যমান এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যেমন পরম সৎ (ব্রহ্ম) নহে, সেইরূপ ইহা অসৎ আকাশকুসুমও নহে। সৎ (পরব্রহ্ম) এবং অসৎ (আকাশকুসুম) এই উভয়েরই অভাব জাগতিক বস্তুতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় সৎ নহে বলিয়াই যে তাহা অসৎ আকাশকুসুম হইবে, এবং অসৎ আকাশকুসুম নহে বলিয়াই যে তাহা সৎ (পরব্রহ্ম) হইবে, এইরূপ যুক্তির কোনই মূল্য নাই। অবিদ্যার ক্ষেত্রেও এই যুক্তিই প্রযোজ্য। অবিদ্যা পরব্রহ্ম নহে বলিয়া তাহা যেমন ভাববিলক্ষণ, আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক নহে বলিয়া, অবিদ্যা অভাব বিলক্ষণও বটে। ভাব এবং অভাব এইমতে 'পরস্পর বিরহব্যাপক' নহে। অর্থাৎ বিরুদ্ধ দুইটি বস্তুর একের অভাব (বিরহ) অপরের সত্যতা সাধন করিবে এরূপ নহে। যেই বিরুদ্ধ পদার্থ দুইটি 'পরস্পর বিরহব্যাপক' হয়, তাহাদেরই একের ভাবে অপরের অভাব, একের অভাবে অপরের ভাব

১। গোত্বাশ্বত্বয়োঃ পরস্পরবিরহ ব্যাপ্যত্বেঽপি তদভাবয়োরুষ্ট্রাদাবেকত্র সহোপলম্ভাৎ।
অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫২ পৃঃ

সাধন করা যাইতে পারে। ঐরূপ অত্যন্ত বিরুদ্ধ দুইটি পদার্থের অভাব কোন এক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন গোত্ব এবং গোত্বাভাব। হয় গোত্ব হইবে, নতুবা গোত্বাভাব হইবে। ইহা ভিন্ন তৃতীয় প্রকার নাই। সৎ ও অসৎকে, ভাবও অভাবকে এইরূপে বিচার করিলে, বস্তু হয় সত্য হইবে, নতুবা বস্তু অসত্য হইবে ; পদার্থ হয় ভাব হইবে, নতুবা অভাব হইবে। অন্য কোনপ্রকার হওয়ার এক্ষেত্রে কোন সম্ভাবনাই নাই।[১] প্রতিবাদী মাধ্ব উল্লিখিত দৃষ্টিতে ভাব ও অভাবের ব্যাখ্যা করিয়া (ভাব ও অভাবকে পরস্পরবিরহব্যাপক বলিয়া ধরিয়া লইয়া), অভাববিলক্ষণ অবিদ্যার ভাববিলক্ষণত্ব সম্ভবপর নহে বলিয়া, অদ্বৈতবাদীর অবিদ্যার অনাদিত্ব সাধক অনুমানের (ভাববিলক্ষণত্বাৎ এই) হেতুতে যে স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাসের উদ্‌ভাবন করিয়াছেন, অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে বিচার করিলে সেই দোষের কোনই ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এখন কথা এই যে, দ্বৈতবাদীর অবিদ্যার সাদিত্বসাধক অনুমান যদি অদ্বৈতবাদীর অবিদ্যার অনাদিত্ব সাধক অনুমান প্রয়োগের ফলে সৎপ্রতিপক্ষ-হেত্বাভাস-কলুষিতই হয়, তবে ঐ অনুমানের দ্বারা দ্বৈতবাদী যেমন অবিদ্যার সাদিত্বসাধন করিতে পারিবেন না, অদ্বৈতবাদীও তো সেইরূপ অবিদ্যার অনাদিত্বসাধনে ব্যর্থকাম হইবেন। অবিদ্যা অনাদি এইরূপ অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তও অবশ্যই ব্যাহত হইবে। কারণ, সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানের ক্ষেত্রে দুইটি প্রতিপক্ষ অনুমানই যদি তুল্যবল বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তবে সেক্ষেত্রে কোনরূপ সাধ্যেরই সাধন করা চলে না। এই অবস্থায় পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি সাধ্যের যে কোন একটি সাধ্য সাধন করিতে গেলেই, প্রতিপক্ষ অনুমানদ্বয়ের একটি হীনবল প্রতিপাদন করা ব্যতীত সাধ্যসিদ্ধির অন্য কোন পন্থা দেখা যায় না। এইজন্যই অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদীর অবিদ্যার সাদিত্বসাধক অনুমানে উপাধিদোষ উদ্‌ভাবন করতঃ দ্বৈতবাদীর উপাধিদোষে কলুষিত অনুমান যে হীনবল তাহা দেখাইয়াছেন এবং অবিদ্যার অনাদিত্বের অনুমানই যে গ্রহণযোগ্য, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

১। আচার্য উদয়ন তাঁহার কুসুমাঞ্জলিতে বলিয়াছেন—

পরস্পরবিরোধে হি ন প্রকারান্তরস্থিতিঃ।
নৈকতাপি বিরুদ্ধানামুক্তিমাত্রবিরোধতঃ॥

কুসুমাঞ্জলি, ৩৮।

অবিদ্যা (পক্ষ) সাদিঃ (সাধ্য),
জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বে সতি অভাববিলক্ষণত্বাৎ (হেতু),
উত্তরজ্ঞাননিবর্ত্ত্য পূর্বজ্ঞানবৎ (দৃষ্টান্ত)।

অবিদ্যার আদি আছে, যেহেতু অবিদ্যা জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় এবং অভাবের বিলক্ষণ বা বিসদৃশ। যেমন পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় পূর্বোৎপন্ন জ্ঞান।

দ্বৈতবাদীর উল্লিখিত অনুমানে 'ভাবত্ব' উপাধি হইয়া দাঁড়ায়। উপাধি কাহাকে বলে? যাহা (যে পদার্থ) সাধ্যের ব্যাপক হয়, অর্থাৎ সাধ্য যেখানে যেখানে থাকে, সেই সকল স্থলেই বিদ্যমান থাকে, অথচ হেতু যেখানে যেখানে থাকে, সেই সকল স্থলেই যাহা থাকে না। এইরূপে হেতুর যাহা অব্যাপক হয়, তাহাকে উপাধি বলে—

দ্বৈতবেদান্তীর অবিদ্যার সাদিত্ব সাধক অনুমানে অদ্বৈতবাদিকর্তৃক উপাধি উদ্ভাবন

'সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতুরব্যাপক স্তথা স উপাধিঃ।'[১] ভাষাপরিঃ ১৩৮ কাঃ।

প্রদর্শিত মাধ্ব অনুমানে সাদিত্বকে সাধ্য করা হইয়াছে, আর ভাবত্ব হইতেছে এক্ষেত্রে উপাধি। ভাবত্ব উপাধি হইলে ভাবত্ব অবশ্যই সাধ্য সাদিত্বের ব্যাপক হইবে। অর্থাৎ যাহা যাহা সাদি হইবে তাহাই ভাববস্তু হইবে। ভাবত্ব আলোচ্য অনুমানের যাহা হেতু তাহার (জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বে সতি অভাববিলক্ষণত্বাৎ এইরূপ হেতুর) ব্যাপক হইবে না। অনুমানের পক্ষ অবিদ্যাতে অনুমানের হেতু অবশ্যই আছে। হেতু পক্ষে বর্তমান না থাকিলে, সেখানে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হওয়ায় কোনরূপ অনুমানেরই উদয় হইতে পারে না। অথচ মাধ্ব মতানুসারে ভাবত্ব অবিদ্যায় নাই। এই অবস্থায় অবিদ্যায় উক্ত অনুমানের (জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় এবং অভাবের বিলক্ষণ এইরূপ) হেতু বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ভাবত্ব না থাকায়; হেতু যে (পক্ষকে আশ্রয় করিয়া) ভাবত্বের ব্যভিচারী হইবে এবং তাহার ফলে ব্যাপক-ভাবত্বের ব্যাপ্য সাদিত্যেরও যে তাহা (আলোচিত অনুমানের হেতু) ব্যভিচারী হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভাবত্বকে তো মাধ্বোক্ত অনুমানের সাধ্য সাদিত্বের ব্যাপকই বলা চলে না। কেন না, ধ্বংসে সাদিত্ব আছে, কিন্তু ধ্বংসে ভাবত্ব না থাকায়, ভাবত্বকে সাদিত্বের ব্যাপক বলা যাইবে কিরূপে? এইরূপ অবস্থায় ভাবত্বকে যে উপাধি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাও অসঙ্গত হইবে? এইরূপ আপত্তির উত্তরে উপাধি উদ্‌ভাবনকারী অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, মাধ্বপ্রদর্শিত অনুমানে 'ভাবত্ব' উপাধিটিকে সাধ্য সাদিত্বের ব্যাপক প্রমাণ করতঃ উপাধি লক্ষণের সঙ্গতি প্রদর্শনের জন্য

১। উপাধির বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী পরিচ্ছেদে জগতের মিথ্যাত্ব বিচার প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। উপাধি সম্পর্কে আরও বিশেষ জানিতে হইলে আমাদের লিখিত বেদান্ত-দর্শন-অদ্বৈতবাদের দ্বিতীয়খণ্ডে অনুমান পরিচ্ছেদে উপাধির আলোচনা দেখুন।

উক্ত অনুমানের সাধ্য সাদিত্বকে হেতুর দ্বারা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে। ফলে, জ্ঞাননাশ্য অভাব বিলক্ষণ যে সকল সাদি পদার্থ পাওয়া যাইবে, ভাবত্ব তাহাদেরই ব্যাপক হইয়া উপাধিলক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।* ধ্বংস সাদি হইলেও

* উপাধির ক্ষেত্রে সর্বত্রই উপাধিপদার্থকে সাধ্যের ব্যাপক করিবার জন্য সাধ্যকে হেতুর দ্বারা বিশেষিত করিয়া বলা আবশ্যক হয়; নতুবা 'স শ্যামো মিত্রাতনয়ত্বাৎ' এই সকল উপাধির সুপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তেও উপাধিপদার্থ সাধ্যের ব্যাপক হয় না। ফলে, উপাধিলক্ষণাক্রান্তও হয় না। 'স শ্যামো মিত্রাতনয়ত্বাৎ', এই অনুমানে 'শাক-পাকজন্যত্ব'কে উপাধি বলা হইয়াছে। মিত্রা নামক মহিলার তনয় গৌরবর্ণও হইয়াছে, শ্যামবর্ণও হইয়াছে। তনয়কে গর্ভে ধারণ করিয়া মহিলা যেই যেই বার অতিরিক্ত মাত্রায় শাক ভোজন করিয়াছেন, সেই সেই বারই তাঁহার সন্তান শ্যামল হইয়াছে। ইহা দেখিয়াই উক্ত অনুমানে 'শাকপাকজন্যত্ব'কে উপাধি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। শাকপাকজন্যত্বরূপ উপাধিকে তো সাধ্য শ্যামত্বের ব্যাপক বলা যায় না। কেননা, শ্যামল ঘট প্রমুখ বস্তুতেও তো শ্যামত্ব আছে, সেখানে তো 'শাকপাকজন্যত্ব' নাই। এই অবস্থায় শাকপাকজন্যত্বকে আলোচ্য অনুমানের সাধ্য শ্যামত্বের ব্যাপক বলা যাইবে কিরূপে? তারপর, 'ধ্বংসো বিনাশী জন্যত্বাৎ' এই অনুমানে 'ভাবত্ব'কে যে উপাধি বলা হইয়াছে, সেখানেও দেখা যায় যে, অনুমানের সাধ্য বিনাশিত্ব প্রাগভাবে আছে, প্রাগভাবও বিনাশী বটে, অথচ ভাবত্ব প্রাগভাবে নাই; সেই অবস্থায় ভাবত্বকে (উপাধিকে) অনুমানের সাধ্য বিনাশিত্বের ব্যাপক বলা চলে না। ভাবত্ব উপাধি হইবে কিরূপে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে উপাধি-উদ্‌ভাবনকারী বলেন, উপাধির সকল স্থলেই হেতুকে সাধ্যের বিশেষণরূপে জুড়িয়া দিয়া, উপাধি পদার্থকে সাধ্যের ব্যাপক করিয়া লইতে হইবে। 'শাকপাকজন্যত্ব' শ্যামত্বের ব্যাপক না হইলেও, মিত্রাতনয়গত শ্যামত্বের [মিত্রাতনয়ত্বাবচ্ছিন্ন শ্যামত্বের] উহা (শাকপাকজন্যত্ব উপাধি) যে ব্যাপক হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উপাধি উল্লিখিত দৃষ্টিতে সাধ্যের ব্যাপক হইলেও, 'মিত্রাতনয়ত্বাৎ' এই হেতুর উহা (উপাধি) ব্যাপক হয় নাই। কেননা, মিত্রার ছেলে তো গৌরবর্ণও আছে। এইরূপে 'শাকপাকজন্যত্ব' সাধ্যের (শ্যামত্বের) ব্যাপক ও হেতুর (মিত্রাতনয়ত্বের) অব্যাপক হওয়ায় উপাধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রাগভাবে বিনাশিত্ব (অনুমানের সাধ্য) থাকায়, ভাবত্ব না থাকায়, ভাবত্ব সাধ্য বিনাশিত্বের ব্যাপক হয় না, এইরূপ আপত্তির উত্তরেও বক্তব্য এই যে, 'জন্যত্ব' হেতুকে সাধ্য বিনাশিত্বের বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, ভাবত্বকে জন্য বিনাশী পদার্থমাত্রের ব্যাপক সহজেই করা যাইতে পারে। অনাদি-অনন্ত বিনাশী প্রাগ ভাবের ক্ষেত্রে

তাহা জ্ঞাননিবর্ত্যও নহে, অভাব বিলক্ষণও নহে। এইজন্য জ্ঞাননাশ্য অভাববিলক্ষণ সাদি পদার্থ বলিয়া ধ্বংসকে আর ধরা চলিবে না; ধ্বংসে ভাবত্বরূপ উপাধির অব্যাপকতাও সুতরাং দোষাবহ হইবে না। এইরূপে মধ্বোক্ত অবিদ্যার সাদিত্ব অনুমান সোপাধিক হওয়ায়, ঐরূপ উপাধি কলুষিত অনুমানের সাহায্যে দ্বৈতবাদী অবিদ্যার সাদিত্ব সাধনে যে ব্যর্থকাম হইবেন, তাহাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই।

অদ্বৈতবাদীর প্রদর্শিত অনুমানবলে অবিদ্যার অনাদিত্ব ব্যবস্থাপন।

অবিদ্যা সাদি ইহা প্রমাণিত না হইলে, অবিদ্যা অনাদি এই অদ্বৈতবাদীর প্রতিপক্ষ অনুমানই সেক্ষেত্রে প্রবলতর হইয়া জয়যুক্ত হইবে।

অবিদ্যালক্ষণে অজ্ঞানকে যে জ্ঞাননিবর্ত্য বলা হইয়াছে, তাহাও নির্বিবাদ নহে।

জ্ঞাননিবর্ত্য অজ্ঞানের সমালোচনা

ক্ষেত্রবিশেষে জ্ঞানোদয়ের ফলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটিলেও, এমন স্থলও হয়তো দেখা যাইবে যেখানে জ্ঞানোদয় হইয়াছে কিন্তু অজ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটে নাই।

সেই সকল ক্ষেত্রে অজ্ঞানকে তো জ্ঞাননিবর্ত্য বলা চলে না। ফলে, জ্ঞান অজ্ঞানকে নাশ করে (জ্ঞাননির্বর্ত্যমজ্ঞানম্) এইরূপ অদ্বৈতসিদ্ধান্তই অচল হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বৈতবেদান্তি কর্তৃক অজ্ঞানের জ্ঞান-নিবর্ত্যতার খণ্ডন

দৃষ্টান্তহিসাবে 'রক্তঃ স্ফটিকঃ' এইরূপ ঔপাধিক ভ্রমের উপাদান অজ্ঞান এবং জীবন্মুক্তের অজ্ঞানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঔপাধিক[১] ভ্রম বলার তাৎপর্য এই যে, রজ্জুসর্প প্রভৃতি স্থলে রজ্জুজ্ঞানের উদয়ে সর্পভ্রান্তি তিরোহিত হইলেও, 'রক্তঃ স্ফটিকঃ' প্রভৃতি বিভ্রমের ক্ষেত্রে স্ফটিকের রক্তিমা স্বাভাবিক নহে জানিয়াও, ঐ প্রকার ভ্রম

আর সেখানে ভাবত্বের অব্যাপকতার প্রশ্ন আসে না। ভাবত্ব এইভাবে সাধ্যের ব্যাপক হইলেও জন্যত্ব হেতুর তাহা (ভাবত্ব) ব্যাপক হইবে না। কেননা, ধ্বংসে জন্যত্ব আছে, অথচ ভাবত্ব নাই, সুতরাং ভাবত্ব যে জন্যত্বের—আলোচ্য অনুমানের হেতুর—অব্যাপক হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? ফলে, ভাবত্ব উক্ত অনুমানে উপাধিও হইবে। এই দৃষ্টিতেই মধ্বোক্ত অবিদ্যার সাদিত্ব অনুমানেও ভাবত্বকে উপাধি বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুধী পাঠক ইহা লক্ষ্য করিবেন।

ভাষা পরিচ্ছেদ মুক্তাবলী—১৩৮ কাঃ দেখুন।

১। স্বচ্ছ কাচের (স্ফটিকের) কাছে রক্তবর্ণের জবা থাকিলে জবাফুলের রক্তিমা কাচে প্রতিবিম্বিত হয় এবং স্বচ্ছ শুভ্র কাচকে রক্তবর্ণ দেখায়। 'উপ' অর্থাৎ সমীপবর্তী স্ফটিকে স্বীয় ধর্ম রক্তিমা আধান করে বলিয়া জবাফুলকে এক্ষেত্রে 'উপাধি' বলা হয় এবং 'রক্তঃ স্ফটিকঃ' এই বিভ্রমকে ঔপাধিক বিভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে।

সকলেই করিয়া থাকে। সত্য জ্ঞান এখানে ঔপাধিক ভ্রমের উপাদান অজ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটাইতে পারে না, ইহা স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মজ্ঞ জীবন্মুক্তেরও অজ্ঞানের কার্য দেহসম্বন্ধ, দৈহিক ক্রিয়া, জগতের ভাতি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় তাঁহারও তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে, এমন কথা বলা চলে না। জ্ঞান অজ্ঞানকে বিনাশ করে এইরূপ নিয়মও সুতরাং গ্রহণ করা যায় না। আলোচিত ঔপাধিক ভ্রমের উপাদান অজ্ঞান এবং জীবন্মুক্তের অজ্ঞানে 'জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব' না থাকায়, অবিদ্যালক্ষণের অব্যাপ্তিও দুষ্পরিহর হয়।

অদ্বৈতবেদান্তি কর্তৃক দ্বৈতবাদীর আপত্তির খণ্ডন ও অবিদ্যার জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব সংস্থাপন

এইরূপ আপত্তির খণ্ডনে অদ্বৈতবাদী বলেন, আলোচ্যস্থলেও জ্ঞান অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করিয়াছে এবং করিবে। ফলে, অজ্ঞানে 'জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব'ই থাকিবে; অজ্ঞান জ্ঞানানিবর্ত্য হইবে না। অতএব অবিদ্যার লক্ষণে অব্যাপ্তির প্রশ্নও উঠিবে না। প্রদর্শিত স্থলে জ্ঞানোদয়মাত্রেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটে নাই, অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছে, ইহা অবশ্য সত্য কথা। এই বিলম্বেরও কারণ আছে। ঔপাধিক ভ্রমের উপাদান অজ্ঞানের এবং জীবন্মুক্তের অজ্ঞানের আশু নিবৃত্তিতে উপাধি এবং জীবের প্রারব্ধই প্রতিবন্ধক[১] হইয়া দাঁড়ায়। যে-পর্যন্ত প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকে, সেই পর্যন্ত কারণ থাকিলেও কার্যোৎপত্তি হয় না; প্রতিবন্ধক চলিয়া গেলেই কার্যোৎপত্তি ঘটে। এইজন্য কার্যের উৎপত্তিতে প্রতিবন্ধকের অভাবও যে অন্যতম কারণ, তাহা সুধী দার্শনিকমাত্রেই অবগত আছেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে স্বচ্ছ শুভ্র কাচের নিকটে জবাকুসুমের অবস্থিতি, এবং মুক্ত জীবের অদৃষ্ট, যাহাকে আমরা প্রারব্ধ বলি, তাহা

১। প্রতিবন্ধক কাহাকে বলে? যাহা কার্যোৎপত্তির প্রতিবন্ধ ঘটায় সোজা কথায় তাহাকে প্রতিবন্ধক বলে। কারণ কার্য উৎপাদন করে, কারণ না থাকিলে কার্য হয় না। এই অবস্থায় কারণের অভাবকে প্রতিবন্ধক বলা হইয়া থাকে। ঘটের উৎপত্তিতে দণ্ড, চক্র, সলিল, সূত্র প্রভৃতি কারণ, দণ্ডাভাব প্রভৃতি প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধকের লক্ষণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন—কারণীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বং প্রতিবন্ধকত্বম্। কারণীভূত যে অভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগিকে বলে প্রতিবন্ধক। অত্যন্তাভাবের অভাব প্রতিযোগিস্বরূপ, সুতরাং দণ্ডের অভাবের অভাব দণ্ডস্বরূপ; দণ্ড ঘটোৎপত্তির অন্যতম কারণ। এখানে কারণীভূত অভাব বলিতে দণ্ডের অভাবের অভাবকে (যাহা দণ্ডস্বরূপ) পাওয়া গেল। এই কারণীভূত অভাবের প্রতিযোগী হইল দণ্ডাভাব; এই দণ্ডাভাবকে বলা হয় ঘটের উৎপত্তির প্রতিবন্ধক। এইরূপে অন্যান্য স্থলেও প্রতিবন্ধকের লক্ষণের সঙ্গতি বুঝিতে হইবে।

যতক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত 'রক্তঃ স্ফটিকঃ' এই মিথ্যাবুদ্ধির এবং জীবন্মুক্তের দেহসম্বন্ধ জগদ্‌ভাতি প্রভৃতির মূল অজ্ঞানও থাকিবে। জ্ঞানোদয়ের ফলে অজ্ঞানের মূলোচ্ছেদ ঘটিলে, ঐ ছিন্নমূল অজ্ঞান উপাধির বিলয়ে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইবে। এইরূপে সত্য জ্ঞান আশু বিনাশক না হইয়া, উপাধির বিলম্ব বশতঃ কিছু বিলম্বে অজ্ঞানের নাশক হইলেও অজ্ঞানবিনাশে জ্ঞানই যে একমাত্র কারণ, এই সিদ্ধান্ত কোনমতেই অস্বীকার করা যাইবে না; অবিদ্যার জ্ঞাননিবর্ত্তত্ব স্বভাবেরও ব্যত্যয় ঘটিবে না। এই অবস্থায় অবিদ্যার লক্ষণে প্রতিবাদী কর্তৃক উদ্‌ভাবিত অব্যাপ্তির আপত্তিও হইবে ভিত্তিহীন।[১] এখন প্রশ্ন এই যে, জীবন্মুক্তের ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পরেও (প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত) যদি অজ্ঞান বিদ্যমানই থাকে, তবে সেই অজ্ঞানের আশ্রয় এবং বিষয় তো পরব্রহ্মই হইবে। সেক্ষেত্রে অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় জ্ঞাত ব্রহ্মকেই বা অজ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞাত বলিতে বাধা কি? 'জ্ঞাতেঽপি তত্রাজ্ঞাত ইতি ব্যবহারাপত্তিঃ', অদ্বৈতসিদ্ধি: এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন—অজ্ঞানের দুইটি শক্তি আছে (১) আবরণশক্তি এবং (২) বিক্ষেপশক্তি। আবরণশক্তি প্রভাবেই দৃশ্যবস্তু সকল জ্ঞাতার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না। জ্ঞেয় বস্তুগুলি জ্ঞাতার নিকট আবৃত থাকে। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানের আবরণ তিরোহিত হইলেই দৃশ্যবস্তু জ্ঞাতার দৃষ্টির গোচর হয়, জ্ঞাতাও আমি 'এই বিষয় জানিয়াছি' এইরূপ অভিমান করে। যেই বস্তু অজ্ঞানের আবরণে আবৃত থাকে, জ্ঞাতার জ্ঞানে ভাসেনা, ঐসকল বস্তু অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন কিছু না জানার (অজ্ঞাত থাকিবার) প্রতি অবিদ্যার আবরণ শক্তিই কারণ। এই আবরণ শক্তির তিরোধান যেক্ষেত্রে ঘটিয়াছে, সেক্ষেত্রে বস্তু জ্ঞাতই হইবে, ঐ বস্তুকে আর অজ্ঞাত বলা চলিবে না। আলোচ্য স্থলে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের ফলে পরব্রহ্মসম্পর্কে জীবন্মুক্ত সাধকের অবিদ্যার আবরণ সম্পূর্ণ তিরোহিত হওয়ায়, পরব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষভাবেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে পরব্রহ্ম অজ্ঞাত থাকিবার কোনও হেতু নাই। তবে তাঁহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ঘটিলেও অজ্ঞানের যে আশু বিলয় ঘটে নাই তাহার প্রতি অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তিই কারণ; আবরণ শক্তি

১। ঔপাধিক ভ্রমোপাদানাজ্ঞানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারানন্তর-বিদ্যমান-জীবন্মুক্তাজ্ঞানে চ জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবাদব্যাপ্তিঃ ইতি চেন্ন······উপাধিপ্রারব্ধকর্মণোঃ প্রতিবন্ধকয়োর-ভাববিলম্বেন নিবৃত্তিবিলম্বেঽপি তয়োর্জ্ঞাননিবর্ত্যত্বানপায়াৎ। নহি কচিদবিলম্বেন জনকস্য কচিৎ প্রতিবন্ধেন বিলম্বে জনকতাঽপৈতি।

অদ্বৈতসিদ্ধিঃ, অজ্ঞানলক্ষণনিরুক্তিঃ ৫৪৪ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

নহে[১]। বিক্ষেপশক্তিই বিবিধ উপাধি প্রভৃতি প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়া ছিন্নমূল অজ্ঞানের বিলুপ্তিতে বিলম্ব ঘটায়। বিলম্বেই হউক, কি অবিলম্বেই হউক, জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানের বিলয় অবশ্যম্ভাবী। এইজন্যই অজ্ঞানকে যে 'জ্ঞাননিবর্ত্ত্য' বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।

ভাল, যাহা অনাদি, ভাবরূপ (অর্থাৎ অভাব বিলক্ষণ) এবং জ্ঞাননাশ্য তাহাই যদি অবিদ্যা হয়, তবে, অবিদ্যা ও চিন্ময় ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ তাহাও অনাদি, ভাবরূপ ও জ্ঞানবিনাশ্য বিধায় অবিদ্যাই হইয়া দাঁড়ায় নাকি? ইহার উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, অবিদ্যার লক্ষণে 'জ্ঞাননিবর্ত্ত্য' কথা দ্বারা যাহা সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয়, তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে জ্ঞান অজ্ঞানকেই বিনাশ করে, অন্য কাহাকেও বিনাশ করে না। অবিদ্যা এবং চৈতন্যের যে সম্বন্ধ তাহা অনাদি ভাবরূপ হইলেও, অবিদ্যার কার্য বিধায়, সাক্ষাদ্‌ভাবে উহা জ্ঞাননিবর্ত্ত্য নহে। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটিলে, অজ্ঞানরূপ উপাদানকারণ না থাকায়, সর্বপ্রকার অজ্ঞানের কার্যই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ফলে, অবিদ্যা চৈতন্যের সম্বন্ধের বিলোপও অবশ্য ঘটিবে। এইরূপ বিলুপ্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানজন্য নহে। এই অবস্থায় অবিদ্যাও চৈতন্যের সম্বন্ধে অবিদ্যা লক্ষণের অতিব্যাপ্তির আপত্তি করা চলে না। তারপর, এই সম্বন্ধকে যদি স্বরূপসম্বন্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া অবিদ্যাত্মক (অবিদ্যাস্বরূপ) বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইবে এবং অবিদ্যালক্ষণের লক্ষ্যই হইবে। অবিদ্যালক্ষণের অতিব্যাপ্তির প্রশ্নই সেক্ষেত্রে উঠিবে না।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যকরা আবশ্যক যে, অবিদ্যালক্ষণস্থ 'জ্ঞাননিবর্ত্ত্য' পদের "সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয়" এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, একমাত্র অবিদ্যাই জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইবে, অন্য কিছু হইবে না। কারণ, জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অজ্ঞানব্যতীত অন্য কিছু নিবৃত্তি করিতে পারে না। এই অবস্থায় "সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞান যাহাকে বিনাশ করে" তাহাই অবিদ্যা [সাক্ষাজ্‌জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বমবিদ্যাত্বম্] এইরূপে [উল্লিখিত লক্ষণোক্ত অনাদি, ভাবরূপ বিশেষণ বাদদিয়া] লক্ষণ নির্বচন করিলেও সেই লক্ষণ দোষাবহ হইবে না। এইজন্যই আচার্য মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধিতে এই লক্ষণকে 'লক্ষণান্তর' অর্থাৎ অবিদ্যার আর একটি লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

১। ন চ তর্হি জ্ঞাতেঽপি তত্র অজ্ঞাতইতিব্যবহারাপত্তি ; তাদৃগ্‌ব্যবহারে আবরণশক্তিমদজ্ঞানস্য কারণত্বেন তদাবরণশক্ত্যভাবাদেব ঈদৃগ্‌ ব্যবহারানাপত্তেঃ।

অদ্বৈত সিদ্ধি, অজ্ঞানলক্ষণনিরুক্তি।

২। জ্ঞানত্বেন সাক্ষাত্তন্নিবর্ত্ত্যত্বং তু ভবতি লক্ষণান্তরম্।

অদ্বৈতসিদ্ধি, অজ্ঞানলক্ষণনিরুক্তি।

অবিদ্যার জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব-সিদ্ধান্ত অনুমানবাধিত বলিয়া, ঐরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিবাদী মাধ্ব নিম্নলিখিত অনুমানের প্রয়োগ করিয়া থাকেন—অবিদ্যা (পক্ষ), জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাববতী (সাধ্য), অনাদিত্বে সতি অভাববিলক্ষণত্বাৎ (হেতু), (আত্মবৎ) (দৃষ্টান্ত)।[১] অবিদ্যা জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় হইতে পারে না, যেহেতু অবিদ্যা অনাদি, এবং অভাববিলক্ষণ ; যাহা অনাদি, অভাববিলক্ষণ পদার্থ, তাহা জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় হয় না, যেমন আত্মা।

অবিদ্যার জ্ঞান-নাশ্যতার বিরুদ্ধে মাধ্বের অনুমান

উল্লিখিত মাধ্ব অনুমানের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, প্রতিবাদী দ্বৈতবেদান্তীর এইরূপ অনুমান উপাধি কলুষিত। আত্মত্ব এই অনুমানে উপাধি হইবে। কারণ, 'আত্মত্ব' উক্ত অনুমানের সাধ্যের ব্যাপক হইবে, কিন্তু হেতুর উহা ব্যাপক হইবে না। সরল কথায়, যেখানে যেখানে জ্ঞাননিবর্ত্যত্বের অভাব থাকিবে অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা যাহা নিবর্তনীয় হইবে না, সেই সকল ক্ষেত্রেই আত্মত্ব থাকিবে। কিন্তু যেখানে যেখানে অনাদিত্ব এবং অভাববিলক্ষণত্ব থাকে, অর্থাৎ যাহা যাহা অনাদি এবং অভাববিলক্ষণ হয়, সেখানেই আত্মত্ব থাকে না। আলোচ্য অনুমানের পক্ষ অবিদ্যা অনাদি, অভাব বিলক্ষণ বটে, কিন্তু তাহাতে তো 'আত্মত্ব' নাই। এই অবস্থায় আত্মত্ব যে প্রদর্শিত অনুমানে উপাধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মত্বকে তো আলোচিত অনুমানের সাধ্যেরও ব্যাপক বলা যায় না। অত্যন্তাভাব, অন্যোন্যাভাব মাধ্বমতে নিত্য বিধায় সেক্ষেত্রে অনুমানের সাধ্য জ্ঞাননিবর্ত্যত্বের অভাব আছে, অথচ আত্মত্ব নাই। ফলে, আত্মত্ব যে সাধ্যের ব্যাপক হইতেছে না তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় অদ্বৈতবাদী আত্মত্বকে উল্লিখিত অনুমানের উপাধি বলেন কি হিসাবে? তারপর, অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতি জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় নহে বলিয়া, আকাশকুসুম প্রভৃতিতে জ্ঞাননিবর্ত্যত্বের অভাব (উল্লিখিত অনুমানের সাধ্য) আছে, কিন্তু সেখানেও আত্মত্ব নাই। এই

অদ্বৈতবাদি কর্তৃক মাধ্বের উল্লিখিত অনুমানে উপাধি-দোষ উদ্‌ভাবন

১। দ্বৈতবেদান্তী মধ্বাচার্যের মতে বিষ্ণুশক্তি মায়া বা প্রকৃতি ভাবস্বভাবা এবং অনাদি, সেই দৃষ্টিতে অবিদ্যাকে অনাদি ভাবরূপা মানিতে মধ্বাচার্যের কোনই আপত্তির কারণ নাই। কেবল অবিদ্যা যে 'জ্ঞাননাশ্য' এই অদ্বৈতসিদ্ধান্তই মধ্বাচার্য স্বীকার করেন না। এই অবস্থায় অবিদ্যা 'জ্ঞাননিবর্ত্য' নহে, ইহা যদি অনুমান বলে মধ্বাচার্য প্রমাণ করিতে পারেন, তবে অদ্বৈতবেদান্তীর অনির্বাচ্য জ্ঞাননাশ্য অবিদ্যার সিদ্ধি না হইয়া, সেক্ষেত্রে মধ্বোক্ত প্রকৃতিরই সিদ্ধি হইবে ; এবং মধ্বের দৃষ্টিতে অদ্বৈতবেদান্তের অবিদ্যাসিদ্ধিতে সিদ্ধসাধনদোষই আসিয়া পড়িবে।

অবস্থায় আম্নত্ব সাধ্যের ব্যাপক না হওয়ায়, তাহাতো উপাধিই হইবে না। দ্বৈতবেদান্তীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাব অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে নিত্য নহে। অভাব অধিকরণস্বরূপ,[১] অনিত্য[২] এবং জ্ঞাননিবর্ত্যই বটে। অত্যন্তাভাব বা অন্যোন্যাভাবে উক্ত অনুমানের সাধ্যের (জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবের) ব্যাপকতাই অদ্বৈতবেদান্তী স্বীকার করেন না। এই অবস্থায় অত্যন্তাভাব, অন্যোন্যাভাবে আম্নত্ব না থাকায় আম্নত্ব সাধ্যের ব্যাপক না হওয়ায়, উক্ত অনুমানে আম্নত্ব উপাধি হইতে পারে না, প্রতিবাদীর এইরূপ যুক্তির কোনরূপ মূল্যই দেওয়া চলে না। তারপর, অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতিতে জ্ঞাননিবর্ত্যত্বের অভাব (উক্ত অনুমানের সাধ্য) আছে, আম্নত্ব নাই, সুতরাং আম্নত্ব সাধ্যের ব্যাপক হয় না, এইরূপে যে আপত্তি দেখান হইয়াছে, সেই আপত্তির খণ্ডনে অদ্বৈতবাদী বলেন—অলীক আকাশকুসুমের ক্ষেত্রে আম্নত্ব সাধ্যের (জ্ঞাননিবর্ত্যত্বাভাবের) ব্যাপক হয় না, ইহা সত্য কথা। এইরূপ ক্ষেত্রে আম্নত্ব উপাধিকে সাধ্যের ব্যাপক করিবার জন্য হেতুকে সাধ্যের অংশে বিশেষণ হিসাবে জুড়িয়া দিলে, আলোচ্য (আম্নত্ব) উপাধিও যে সাধ্যের ব্যাপক হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

তুচ্ছ আকাশকুসুমে জ্ঞাননিবর্ত্যত্বের অভাব আছে, আম্নত্ব নাই, সুতরাং আত্বত্ব সাধ্যের ব্যাপক হইতেছে না ইহাই এক্ষেত্রে প্রতিবাদীর বক্তব্য। এখানে উপাধি উদ্ভাবনকারী অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, আকাশকুসুমে যে জ্ঞাননিবর্ত্যত্বের অভাব দেখান হইয়াছে, সেখানে 'জ্ঞাননিবর্ত্য'রূপ সাধ্যকে যদি এইরূপে বিশেষ করিয়া বলা যায় যে, যাহা অনাদি, অভাব বিলক্ষণ এবং জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় নহে, 'আম্নত্ব' উপাধি এইরূপ বিশিষ্ট সাধ্যেরই ব্যাপক হইবে। এই তাৎপর্যেই উপাধি উদ্ভাবনকারী

১। অভাবকে যাঁহারা অধিকরণস্বরূপ বলেন, তাঁহাদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, অভাবের প্রত্যক্ষ হয় অথচ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অভাবের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যোগ থাকে না। যেখানে অভাবের উপলব্ধি হয়, অভাবের সেই অধিকরণ ভূতল প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ করিয়াই ঐ অধিকরণের বিশেষণ অভাবকে আমরা বুঝিয়া থাকি—ঘটাভাববদ্ ভূতলম্। ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, ঘটশূন্য ভূতলের প্রত্যক্ষই ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ, অপর কথায়, কেবল ভূতলই ঘটাভাবের স্বরূপ। অভাব বলিয়া কোন বস্তু নাই। কোন একটি ভাবপদার্থই অন্য কোন বস্তুর অভাব বলিয়া জানিবে—ভাবান্তরমভাবঃ, ইহা প্রভাকর-মীমাংসক প্রভৃতির মত। ইহার বিস্তৃত আলোচনা আমাদের বেদান্তদর্শন [illegible] ২য় খণ্ডে 'অনুপলব্ধি' পরিচ্ছেদে দেখুন।

২। পরব্রহ্মে অবিদ্যার যে অভাব আছে, তাহা পরব্রহ্মেরই স্বরূপ বিধায় কেবল ঐ অভাবই অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে নিত্য বটে, অন্যসকল অভাবই অনিত্য।

অদ্বৈতবেদান্তী 'আশ্রয়ত্ব' উপাধিকে সাধ্যের ব্যাপক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অলীক আকাশকুসুম অনাদি এবং অভাববিলক্ষণ না হওয়ায়, তুচ্ছ আকাশকুসুমে উল্লিখিত বিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপকতাই পাওয়া যাইবে না। ফলে, তুচ্ছের ক্ষেত্রে উপাধিটি সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই বলিয়া উপাধিই হইবে না, এইরূপ আপত্তিও সেক্ষেত্রে ভিত্তিহীন হইবে। সাধ্যকে এইরূপে হেতু দ্বারা বিশেষিত করিয়া নির্দেশ করিলে অত্যন্তাভাব অন্যোন্যা-ভাবকে যাঁহারা নিত্য বলিয়া সাব্যস্ত করেন, তাঁহাদের মতেও অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাবে 'অভাববিলক্ষণতা' না থাকায়, 'অনাদি, অভাববিলক্ষণ অথচ জ্ঞান-নাশ্য নহে' এইরূপ বিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপকতাই পাওয়া যাইবে না [অর্থাৎ অত্যন্তাভাব অন্যোন্যাভাবকে সাধ্যের অন্তর্গত বলিয়াই ধরা চলিবে না] এই অবস্থায় সাধ্যবহির্ভূত অত্যন্তাভাব অন্যোন্যাভাবে আশ্রয়ত্ব না থাকায় আশ্রয়ত্ব উপাধি হইবে না প্রতিবাদীর এইরূপ আপত্তিরও কোনরূপ মূল্য দেওয়া চলিবে না।

মাধ্ব-অনুমানের বিরুদ্ধে অদ্বৈত-বাদীর সৎপ্রতিপক্ষ অনুমান প্রদর্শন ও তার জ্ঞান-নিবর্ত্যত্ব সিদ্ধান্ত সংস্থাপন

দ্বৈতবেদান্তীর উল্লিখিত অনুমান কেবল উপাধি দোষেই দূষিত নহে, উক্ত অনুমানে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসও অবশ্যম্ভাবী। দ্বৈত-বাদীর 'অবিদ্যা জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় নহে' [অবিদ্যা জ্ঞাননির্বর্ত্যা-ভাববতী] এইরূপ মাধ্বের অনুমানের প্রতিপক্ষ 'অবিদ্যা' জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয়ই বটে ('জ্ঞাননিবর্ত্যা') এইরূপ অনুমানও অনায়াসেই করা যাইতে পারে।

অবিদ্যা (পক্ষ) জ্ঞাননিবর্ত্যা (সাধ্য) অনাদিত্বে সতি ভাববিলক্ষণত্বাৎ (হেতু), প্রাগভাববৎ দৃষ্টান্ত। অবিদ্যা জ্ঞাননাশ্য যেহেতু অবিদ্যা অনাদি এবং ভাববিলক্ষণ, যেমন প্রাগভাব।

এইরূপ নির্দোষ প্রবলতর সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানের সাধ্য জ্ঞাননিবর্ত্যত্বের বিরুদ্ধে উদ্ভাবিত অবিদ্যা জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় নহে—[অবিদ্যা জ্ঞাননির্বর্ত্যাভাববতী]—দ্বৈত বেদান্তীর এইরূপ উপাধিদুষ্ট দুর্বল অনুমান যে গ্রহণের অযোগ্য হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ফলে, প্রতিবাদী দ্বৈতবেদান্তীর দোষকলুষিত অনুমান অদ্বৈত-বেদান্তীর অনুমানের প্রতিপক্ষ অনুমান বলিয়াই গণ্য হইবে না। 'অবিদ্যা জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয়' এই অদ্বৈতসিদ্ধান্তই জয়যুক্ত হইবে।

আপত্তি হইতে পারে যে, অবিদ্যার নিবৃত্তিই তো অদ্বৈতবাদীর মতে সম্ভবপর নহে। অবিদ্যা অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সাক্ষিভাস্য। যাহা সাক্ষিভাস্য হয়, সাক্ষী যে পর্যন্ত বর্তমান থাকে, সেই পর্যন্ত ঐসকল সাক্ষ্যভাস্য বস্তুরও অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। অনাদি অবিদ্যার সাক্ষী হইল নিত্য ব্রহ্মচৈতন্য। এই অবস্থায় যদি সাক্ষীর সত্তা পর্যন্তই সাক্ষিভাস্য পদার্থের সত্তা স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তবে অবিদ্যার আর নিবৃত্তিই হইতে পারে না। কেননা, অবিদ্যার সাক্ষী নিত্য

ব্রহ্মচৈতন্যের তো নিবৃত্তি নাই সেই অবস্থায় সাক্ষিভাস্য অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, সাক্ষীর সত্তা পর্যন্ত সাক্ষিভাস্য বস্তুরও সত্তা অব্যাহত থাকে, এইরূপ নিয়মই অদ্বৈতবেদান্তী স্বীকার করেন না। শুক্তিরজত, রজ্জুসর্প প্রভৃতির ভাসক চৈতন্য বর্তমান থাকাকালেই, শুক্তিরজত, রজ্জুসর্প প্রভৃতি মিথ্যা বুদ্ধির নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় সাক্ষী বর্তমান থাকা পর্যন্ত সাক্ষিভাস্যের সত্তা কিরূপে মানিয়া লওয়া যায়? তারপর, ঐরূপ নিয়ম তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লইলেও, অবিদ্যা নিবৃত্তির কোনরূপ অনুপপত্তি ঘটে না। কারণ, অদ্বৈতবেদান্তী শুদ্ধচিৎকে অবিদ্যার সাক্ষী বলেন না, অবিদ্যাবৃত্তি প্রতিবিম্বিত [বৃত্ত্যুপহিত] চৈতন্যকেই অবিদ্যার সাক্ষী বলেন।[১] বৃত্তি চিরস্থির নহে, অস্থির; নিত্য নহে, অনিত্য। বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যও সুতরাং চিরস্থির বা নিত্য নহে। বৃত্তিসম্পর্ক থাকা পর্যন্তই কেবল সাক্ষীরও সত্তা থাকে। বৃত্তি-উপাধি-বিগমে সাক্ষীরও কোন অস্তিত্ব থাকে না। এই অবস্থায় (সাক্ষীর সত্তা পর্যন্ত সাক্ষিভাস্য অবিদ্যার সত্তা স্বীকার করিলেও) বৃত্তিসম্পর্কযোগে উৎপন্ন অস্থির সাক্ষীর বিলয়ে অবিদ্যার নিবৃত্তিতেও কোনপ্রকার বাধা দেখা যায় না।[২]

অনাদি ভাবরূপ অবিদ্যার উল্লিখিত লক্ষণ পরীক্ষা করা গেল। আলোচ্য নিবন্ধে ভ্রমের উপাদানরূপেও যে অবিদ্যার লক্ষণ সম্ভবপর, তাহারই বিচার করা যাইতেছে।[৩] ভ্রমের যাহা উপাদান তাহাই যদি অজ্ঞান হয়, তবে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে অধিষ্ঠিত জগতের পরব্রহ্মও (বিবর্ত) উপাদান বিধায়, তাহাও অজ্ঞানই হইয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ পরব্রহ্মে অবিদ্যালক্ষণের অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য হয়। এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, আলোচ্য লক্ষণের উপাদান শব্দের অর্থ পরিণামী উপাদান; অপরিণামী বা বিবর্ত উপাদান নহে। এইজন্যই পরব্রহ্মে অজ্ঞানের লক্ষণের অতিব্যাপ্তির আপত্তি করা চলে না। লক্ষণস্থ উপাদান শব্দের এইরূপ অর্থ-সংকোচে

ভ্রমের যাহা উপাদান, তাহাই অজ্ঞান, এইরূপে অবিদ্যা-লক্ষণের পরিচয়

১। সাক্ষীর স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখুন।

২। কিঞ্চ কেবলচৈতন্যং ন সাক্ষি, কিন্তুবিদ্যাবৃত্ত্যুপহিতম্; তথাচাস্থিরাবিদ্যাবৃত্ত্যুপহিতস্য সাক্ষিণোঽপ্যস্থিরত্বেন তৎসত্ত্বপর্যন্তমবস্থানেঽপ্যবিদ্যাদের্নিবৃত্তিরুপপদ্যতে।

অদ্বৈতসিদ্ধি, অজ্ঞানলক্ষণনিরুক্তি।

৩। যদ্বা ভ্রমোপাদানত্বমজ্ঞানলক্ষণম্।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৪৫পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

প্রতিবাদীর আপত্তি থাকিলে, বিশ্বপ্রপঞ্চের পরিণামী উপাদান অজ্ঞানই যে আলোচ্য লক্ষণের লক্ষ্য তাহা বুঝাইবার জন্য লক্ষণস্থ উপাদানের অংশে পরিণামী, অচেতন এইরূপ কোন বিশেষণ পদের প্রয়োগ করিলে পরব্রহ্মে আর অজ্ঞান-লক্ষণের অতিব্যাপ্তির প্রশ্নই উঠে না। কারণ, পরব্রহ্ম অচেতনও নহেন, পরিণামীও নহেন। এইরূপ পরব্রহ্ম অজ্ঞান-লক্ষণের লক্ষ্য হইবেন কিরূপে? ভাল, ব্রহ্মে অজ্ঞান-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বরং নাই হইল। এইরূপ লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে নাকি? পুস্তকাধারে অবস্থিত পুস্তকখানিকে 'পুস্তক নহে' বলিয়া ভ্রম হইল। এইরূপ বিভ্রমের মূলে বিভ্রমের উপাদান যে অজ্ঞান বিরাজ করে, পুস্তকজ্ঞানের উদয়ে তাহার নিবৃত্তি ঘটিবে ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। এখন কথা এই যে, ঐরূপ বিভ্রমের মূল অজ্ঞানকে অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে বিভ্রমের উপাদান বলা যাইবে কি? অদ্বৈতবেদান্তী অজ্ঞানকে অভাবের বিলক্ষণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অভাবের বিলক্ষণ অজ্ঞান যে অভাবের বিজাতীয় হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? বিজাতীয় বস্তু তো বিজাতীয় বস্তুর উপাদান হয় না; সজাতীয় বস্তুই সজাতীয় বস্তুর উপাদান হইয়া থাকে—মাটিই মৃন্ময় ঘটের উপাদান হয়, সূতা বা তিল হয় না। ইহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই অবস্থায় অভাবের বিলক্ষণ (বিজাতীয়) অজ্ঞান পুস্তকাভাবের উপাদান হইবে কিরূপে? ফলে, অভাববিলক্ষণ ঐ অজ্ঞানে 'ভ্রমোপাদানত্বম্ অজ্ঞানত্বম্' এইরূপ অজ্ঞান-লক্ষণের ব্যাপ্তি না থাকায়, অব্যাপ্তি দোষই আসিয়া পড়িবে। অজ্ঞানকে অদ্বৈতবাদী ভাববিলক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও, ভাববিলক্ষণ অজ্ঞানও ঐরূপ আরোপিত পুস্তকাভাব প্রভৃতির উপাদান হইতে পারে না। কেননা, অভাব কদাচ কাহারও উপাদানও হয় না, উপাদেয়ও হয় না। ভাববস্তুই কেবল উপাদান বা উপাদেয় হইয়া থাকে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, অজ্ঞান অদ্বৈতবেদান্তে সৎও নহে, অসৎও নহে, ভাবও নহে, অভাবও নহে; উহা ভাবাভাববিলক্ষণ অনির্বাচ্য বস্তু। অজ্ঞানও যেমন অনির্বাচ্য, অজ্ঞানকার্য বিভ্রমও সেইরূপ অনির্বাচ্য। এই দৃষ্টিতে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য বিভ্রম প্রভৃতি বিজাতীয় নহে, সজাতীয়। এইরূপ সজাতীয় অনির্বাচ্য অজ্ঞান যে অনির্বাচ্য অবিছা বিভ্রমের উপাদান হইবে, তাহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? উপাদান বা উপাদেয় হইতে

হইলে তাহাকে যে ভাবপদার্থই হইতে হইবে এমন কোন নিয়ম আছে কি? ভাবপদার্থ উপাদান হয় না, এমনও দেখা যায়। অদ্বৈতবেদান্তীর শুদ্ধ পরব্রহ্ম ভাবপদার্থ, অথচ তাহাতো কাহারও পরিণামী উপাদান নহে। যেই কারণ কার্যে অন্বিত হয়, সেই অন্বয়িকারণই হয় উপাদান, মৃদন্বিত ঘটের মাটি উপাদান, ইহা তো সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। আর যাহা সাদি ঘটপ্রমুখবস্তু তাহাই উপাদেয়। ইহাই তো উপাদান-উপাদেয়-ভাবের নিয়ম। এই নিয়ম মানিতে গেলেই উপাদান এবং উপাদেয়কে যে ভাবপদার্থই হইতে হইবে এমন কথা কিছুতেই বলা চলে না। এই অবস্থায় অজ্ঞান আরোপিত অভাবের উপাদান হইতে পারে না, প্রতিবাদীর এইরূপ আপত্তির কোনই মূল্য দেওয়া চলে না।

যখনই যেখানে যেই বস্তুর প্রমা বা সত্যজ্ঞানের উদয় হয়, সেই সকল স্থলেই সত্যজ্ঞান জ্ঞেয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাতার অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করিয়াই উদিত হয়। ইহাই প্রমা বা সত্যজ্ঞানের স্বভাব। এখন কথা এই, ঝিনুকের খণ্ডকে যদি ঝিনুকের খণ্ড বলিয়াই বুঝা যায়, রূপার খণ্ড বলিয়া মনে না হয়; রজ্জুকে যদি রজ্জু বলিয়াই প্রত্যক্ষতঃ জানা যায়, সাপ বলিয়া ভ্রম না হয়, তবে সেই সকল ক্ষেত্রেও ঝিনুকের বা রজ্জুর জ্ঞান ঐ সকল বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাতার যে অজ্ঞান আছে, তাহাকে নিবৃত্তি করিয়াই যে উদিত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু জ্ঞেয়বিষয়ের আবরক এই অজ্ঞান তো এক্ষেত্রে কোনরূপ ভ্রমের উপাদান হয় নাই। এই অবস্থায় এই অজ্ঞানে "ভ্রমোপাদানত্বম্ অজ্ঞানত্বম্" এই প্রকার অজ্ঞান-লক্ষণের অব্যাপ্তিই অপরিহার্য হইবে নাকি? প্রতিবাদীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন—লক্ষণস্থ ভ্রমের উপাদান কথার দ্বারা ভ্রমের 'উপাদানের যোগ্য' এইরূপ তাৎপর্যই বুঝিতে হইবে। ফলে, পূর্বে কোনরূপ ভ্রান্তির উদয় না হইয়া কোনও বস্তু সম্পর্কে প্রমা বা সত্যজ্ঞানের উদয় হইলে, সেক্ষেত্রে অজ্ঞানের ভ্রমের উপাদানতা না দেখা গেলেও, তাহা দ্বারা অজ্ঞানের ভ্রমের উপাদানের যোগ্যতা অস্বীকার করা চলে না। শুক্তিরজত, রজ্জুসর্প প্রভৃতি বিভ্রমে অবিদ্যার বিক্ষেপ-শক্তিই মিথ্যা রজত, সর্প প্রভৃতির উপাদান, ইহা অদ্বৈতবেদান্তরহস্যবিৎ সকলেই অবগত আছেন। ফলে, ঝিনুকখণ্ডকে যেখানে ঝিনুক বলিয়া, রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছে, সেইসকল ক্ষেত্রে অজ্ঞানের ভ্রমের

উপাদানতা স্পষ্টতঃ না থাকিলেও, অবিদ্যার যে ভ্রমের উপাদান-যোগ্যতা আছে, তাহা অবশ্য মানিতেই হইবে; এবং এইরূপ যোগ্যতা দেখিয়াই সত্যজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অজ্ঞানলক্ষণের সঙ্গতি বুঝিতে হইবে। অব্যাপ্তির প্রশ্ন আর সেই অবস্থায় উঠিবে না।

শুক্তি, রজ্জু প্রভৃতির প্রমাজ্ঞানের উদয়ে মিথ্যা রজত বা সর্প বিভ্রমের নিবৃত্তি হয়; এবং যে-পর্যন্ত শুক্তি প্রভৃতির যথার্থ জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্যন্তই শুক্তিরজত, রজ্জুসর্প প্রভৃতি বিভ্রম ক্রিয়াশীল থাকে। এই অবস্থায় প্রমা বা সত্যজ্ঞানের প্রাগভাবকে ভ্রমের উপাদান বলিয়া গ্রহণ করাই তো স্বাভাবিক। অদ্বৈতবাদী তাহা না করিয়া অনির্বাচ্য অবিদ্যাকে ভ্রমের উপাদান বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে বদ্ধপরিকর কেন? প্রতিবাদীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন—প্রাগভাব তাহার প্রতিযোগীর উৎপত্তিমাত্রই সাধন করে, অপর কিছু সাধন করিতে পারে না। প্রতিযোগী ঘট প্রভৃতির উৎপত্তি ঘটিলেই প্রাগভাব বিলয়প্রাপ্ত হয়। প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের প্রাগভাবও সুতরাং প্রমা বা সত্যজ্ঞানের উৎপত্তি সাধন করিয়াই বিলুপ্ত হইবে, রজ্জুসর্প প্রভৃতি বিভ্রমের সে হেতুই হইবে না। এইরূপ অবস্থায় প্রমার প্রাগভাবকে রজ্জুসর্প বিভ্রমের উপাদান বলিয়া গ্রহণ করা চলে কি? তারপর, প্রমার উৎপত্তির পূর্বপর্যন্ত প্রমার যে প্রাগভাব আছে, সেই প্রাগভাবের প্রতিযোগী প্রমাও যেমন পরোক্ষ, পরোক্ষ প্রমার প্রাগভাবও সেইরূপ পরোক্ষ। ঐরূপ পরোক্ষ প্রমা প্রাগভাবকে প্রত্যক্ষদৃষ্ট রজ্জুসর্প প্রভৃতি বিভ্রমের উপাদান বলিয়া ব্যাখ্যা করা কোনমতেই সঙ্গত হয় না। প্রাগভাব সর্ববাদিসিদ্ধ পদার্থ নহে। অভাব কাহারও উপাদান হয় না। এই অবস্থায় প্রমার প্রাগভাবকে বিভ্রমের উপাদান বলিয়া গ্রহণ করার অনুকূলে প্রতিবাদীর যে কোনরূপ প্রবলতর যুক্তি নাই তাহা সুধী পাঠক অবশ্য লক্ষ্য করিবেন।

এখন প্রশ্ন এই, যেই কারণ কার্যে অন্বিত থাকে, তাহাকেই উপাদান কারণ বলে। বস্ত্রে তাহার উপাদান সূতা, মৃন্ময় ঘটে মাটি প্রভৃতির অন্বয় দেখা যায় বলিয়াই সূতা, মাটি প্রভৃতিকে উপাদান কারণের মর্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে। অবিদ্যা যদি ভ্রমের উপাদান বলিয়াই সাব্যস্ত হয়, তবে বিভ্রমের ক্ষেত্রে শুক্তিরজত প্রভৃতি বিভ্রমের উপাদান অবিদ্যাও যে উপাদেয়ে

অন্বিত হইয়াই প্রকাশ পাইবে তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু তাহা তো হয় না। ফলে, যেইবস্তু, যেইবস্তুর উপাদান, সেই উপাদান বস্তু উপাদেয়ে অন্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়, এইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাকি? এইরূপ আপত্তির উপরে অদ্বৈতবাদী বলেন, ঐরূপ উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম প্রতিবাদীও অস্বীকার করিতে পারেন না। ঘটের শুক্ল, রক্ত প্রভৃতি রূপের প্রতি ঘট উপাদান কারণ ইহাতো প্রতিবাদীও স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি 'রূপংঘটঃ' এইরূপে ঘটে অনুস্যূত রূপের প্রতীতি অনুমোদন করেন কি? ন্যায়মতে দ্ব্যণুকের উপাদান পরমাণু, ত্রসরেণুর উপাদান দ্ব্যণুক, কিন্তু তাহা বলিয়া পরমাণু সম্বলিত দ্ব্যণুকের, দ্ব্যণুক সম্বলিত ত্রসরেণুর প্রতীতি নৈয়ায়িক স্বীকার করেন কি? উপাদানের কোন-না-কোন ধর্মের উপাদেয়ে অনুবৃত্তি অবশ্য স্বীকার্য। অদ্বৈতবাদীও ইহা অনুমোদন করেন। উপাদান অজ্ঞানের জড়ত্ব, অনির্বাচ্যত্ব প্রভৃতি ধর্মের উপাদেয়ে অনুবৃত্তি অদ্বৈতবাদী সর্বদা সর্বপ্রকারেই সমর্থন করেন। শুক্তিরজত, রজ্জুসর্প প্রভৃতি বিভ্রমের উপাদান অজ্ঞান হইলেও, সত্যজ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্যন্ত বিভ্রমকে সত্য, স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়, বিভ্রম বলিয়া মনেই হয় না। এইরূপ বিভ্রমের যাহা উপাদান, তাহাই অজ্ঞান এইরূপে অজ্ঞানের পরিচয়ও সুতরাং দোষাবহ নহে।[১]

অবিদ্যার প্রতীতির সমর্থন

এই ভাবরূপ অনাদি অবিদ্যা সাক্ষিভাস্য এবং বিশুদ্ধ-চিৎ প্রকাশ্য। শুদ্ধ চৈতন্যই অবিদ্যার আশ্রয়ও বটে, বিষয়ও বটে—

"আশ্রয়ত্ব বিষয়ত্বভাগিনী
নির্বিভাগ চিতিরেব কেবলা"। সংক্ষেপ শারীরক।

ব্রহ্মশক্তিরূপেই এই অবিদ্যার বিকাশ। অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ নামে দুইটি শক্তি আছে। আবরণ শক্তিবশতঃ অবিদ্যা সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে ঢাকিয়া রাখে, বিক্ষেপ শক্তিবলে পরব্রহ্মে জগদ্‌বিভ্রমের সৃষ্টি করে। অবিদ্যার এই দ্বিবিধ শক্তি অবিদ্যার বৃত্তিরূপে অদ্বৈতবেদান্তে পরিচিতি-লাভ করিয়াছে। অবিদ্যাও তাহার বৃত্তি, এই দুইই জড় বস্তু এবং চৈতন্যভাস্য। অবিদ্যাবৃত্তিতে শুদ্ধ চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাকেই

১। অদ্বৈতসিদ্ধি—অজ্ঞানলক্ষণ নিরুক্তি দ্রষ্টব্য।

সাক্ষী বলা হইয়া থাকে।—'সাক্ষী চাবিদ্যাবৃত্তি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যম্'। অদ্বৈত-সিদ্ধি, ৫৭৫ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং। রাহু যেমন চন্দ্র-সূর্যকে আবৃত করিয়া উহাদের আলোকেই আলোকিত হইয়া থাকে, অবিদ্যাশক্তিও সেইরূপ শুদ্ধ পরব্রহ্ম-চৈতন্যকে আবৃত করিয়া, সেই চিদালোকেই প্রকাশিত হয়—'রাহুবৎ স্বাবৃতচৈতন্যপ্রকাশ্যাঽবিদ্যা'। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৭৫ পৃঃ; অবিদ্যা অনাদি কিন্তু নিত্য নহে, পারমার্থিক সত্যও নহে। বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্মশক্তি অবিদ্যা স্বীকার করায় অদ্বৈতবেদান্তের বিরুদ্ধে দ্বৈতবেদান্তীরও আপত্তির কোন গুরুতর কারণ দেখা যায় না। পরব্রহ্মের এই অবিদ্যাশক্তির কথা শ্রুতিতেও পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে :—

> পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
> স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ। শ্বেতাশ্ব ৬।৮
> মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যা-
> ন্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। শ্বেতাশ্ব ৪।১০

এই শক্তিই মায়া, প্রকৃতি, তমঃ প্রভৃতি শব্দে বিভিন্ন শ্রুতি এবং শাস্ত্রোক্তিতে বিবৃত হইয়াছে। জগজ্জননী এই শক্তিকে অস্বীকার করিলে দৃশ্যমান এই বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি কোনমতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। ভারতীয় দার্শনিকগণ জগৎপ্রসূতি এই শক্তি স্বীকার করিলেও, অদ্বৈতবেদান্তীর মতানুসারে এই শক্তিকে 'অনির্বাচ্য' বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। এইজন্যই মায়াবাদের বিরুদ্ধে অপরাপর দার্শনিকগণের যে বিক্ষোভ দার্শনিক চিন্তায় আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বস্তুতঃপক্ষে অনির্বাচ্যবাদের বিরুদ্ধেই বিক্ষোভ, মায়া-শক্তির বিরুদ্ধে নহে। এই অনির্বাচ্যবাদ যুক্তিসহ কি না, তাহা আমরা রামানুজোক্ত 'অনির্বচনীয়ত্বানুপপত্তি' প্রবন্ধে বিচার করিয়া দেখাইব।

আচার্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে অদ্বৈতবেদান্তোক্ত অবিদ্যার সমালোচনায় 'সপ্তধা অনুপপত্তি' বা সাত প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্তীকালে মাধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি সম্প্রদায় রামানুজোক্ত অনুপপত্তি বা দোষগুলিকে আরও পল্লবিত করিয়াছেন। অবিদ্যার বিরুদ্ধে রামানুজোক্ত ঐ সপ্তধা অনুপপত্তি বা সাত প্রকার দোষ দার্শনিক পণ্ডিতসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

রামানুজাচার্যের "সপ্তধা অনুপপত্তি" নিম্নরূপ ঃ—

১। **অবিদ্যাস্বরূপানুপপত্তি**—অর্থাৎ অবিদ্যার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না।

২। **আশ্রয়ত্বানুপপত্তি**— অদ্বৈতবেদান্তী জ্ঞানরূপ ব্রহ্মকে যে অজ্ঞানের

(ক) **ব্রহ্মাশ্রয়ত্বানুপপত্তি**—আশ্রয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। জ্ঞান কখনও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না, বিষয়ও হইতে পারে না।

(খ) **জীবাশ্রয়ত্বানুপপত্তি**—জীব অবিদ্যারই সৃষ্টি। অবিদ্যাসৃষ্ট জীব অবিদ্যার আশ্রয় হইবে কিরূপে ?

৩। **তিরোধানানুপপত্তি**—অবিদ্যা বা অজ্ঞান জ্ঞানরূপ ব্রহ্মকে ঢাকিয়া রাখে, এইরূপ কল্পনাও অচল।

৪। **প্রমাণানুপপত্তি**—অদ্বৈতবেদান্তীর অভিপ্রেত ভাবরূপ অবিদ্যার সাধক কোনও দৃঢ়তর প্রমাণ নাই।

৫। **অনির্বচনীয়ত্বানুপপত্তি**—অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে অবিদ্যাকে যে 'অনির্বচনীয়' বলা হইয়াছে, তাহার অনুকূলে কোনও যুক্তি নাই।

৬। **অবিদ্যানিবর্তকানুপপত্তি**—অনাদি ভাবরূপ অবিদ্যার নিবর্তক কোনও হেতু দেখা যায় না।

৭। **অবিদ্যানিবৃত্ত্যনুপপত্তি**—অবিদ্যার নিবৃত্তিও সম্ভবপর নহে।

আমরা আলোচ্য নিবন্ধে অদ্বৈতবেদান্তের পক্ষ হইতে উল্লিখিত 'অনুপপত্তি'র সমাধানের পথের ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিব।

অবিদ্যার লক্ষণ এবং ভাবরূপ অবিদ্যার প্রতীতির সমর্থনে বর্তমান আলোচনার প্রারম্ভে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা দ্বারাই অবিদ্যার স্বরূপ সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই অবস্থায় অবিদ্যার **'স্বরূপের অনুপপত্তি'র** প্রশ্নের অবকাশ কোথায় ? আলোচ্য অনুপপত্তির সমর্থনে আচার্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন—স্বপ্রকাশ চিদ্‌রূপ পরব্রহ্মের আবরক যে অবিদ্যা-দোষের কথা বলা হইয়াছে সেখানে প্রশ্ন এই, উক্ত অবিদ্যা-দোষ সত্য, না মিথ্যা ? অবিদ্যা সত্য হইলে অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদে পরিণত হয়, মিথ্যা হইলে, ঐ মিথ্যার মূল হিসাবেও অপর দোষের কল্পনা আবশ্যক

অবিদ্যার স্বরূপানুপপত্তির উত্তরে অদ্বৈত-বেদান্তীর বক্তব্য

হয়। ফলে, 'অনবস্থাদোষ' অনিবার্যরূপেই দেখা দেয়।[১] এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, জগজ্জননী অবিদ্যা পরব্রহ্মেরই শক্তি। পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ এই অবিদ্যা শক্তিরই পরিণাম। শক্তি বিশ্বের উপাদান কারণ। সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী অবিদ্যা বা মায়াশক্তি মহৎ, অহংকার প্রভৃতি রূপে পরিণত হইয়া, সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপে বিচিত্র বিশ্ব রচনা করে। তন্মধ্যে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বই মায়াশক্তির প্রথম পরিণাম। বুদ্ধি স্বভাবতঃ স্বচ্ছ, শুদ্ধ-চৈতন্যের উহা দর্পণস্বরূপ। স্বচ্ছ ব্যষ্টিবুদ্ধিতে চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই জীব আখ্যা লাভ করে। সমষ্টিবুদ্ধিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্বের নাম ঈশ্বর। চিৎস্বরূপ শুদ্ধ বিম্বচৈতন্য নিরাশ্রয় নির্বিষয় হইলেও, উহার প্রতিবিম্ব জীব বা ঈশ্বর নিরাশ্রয় নির্বিষয় নহে। জীব ও ঈশ্বর বিম্ব শুদ্ধচৈতন্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিবিধ বিচিত্র বিষয় দর্শন করে, নিজেকেও প্রত্যক্ষ করে। নিরুপাধি শুদ্ধ চৈতন্য তাহা করে না। অনন্ত বিষয়জালের অন্তরালে অবস্থান করিয়াও শুদ্ধ শুদ্ধই থাকে। বিষয়ের উপাধির কালিমা তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ভাবরূপ জড় অবিদ্যা-শক্তির এই পরিণামে অবিদ্যার কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য নাই। শুদ্ধ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই অবিদ্যা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরিণামই সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী অবিদ্যার স্বভাব। অবিদ্যার এই স্বাভাবিক পরিণামে তাহার (অবিদ্যার) অধিষ্ঠান বা আশ্রয় শুদ্ধ চৈতন্য ব্যতীত অপর কোনও প্রেরকের অপেক্ষাও নাই, প্রয়োজনও নাই। সুতরাং শ্রীরামানুজোক্ত মিথ্যা অবিদ্যা-দোষের মূলে অপরাপর দোষের কল্পনা এবং তন্নিবন্ধন অনবস্থার আপত্তির কোনই ভিত্তি দেখা যায় না।

অবিদ্যার লক্ষণ ও স্বরূপ পরীক্ষা করা গেল এবং অবিদ্যার স্বরূপে যে কোনরূপ অনুপপত্তি নাই তাহাও বুঝা গেল। আলোচ্য প্রবন্ধে অদ্বৈত-বেদান্তোক্ত ভাবরূপ অবিদ্যায় প্রমাণ কি, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে*।

১। রামানুজকৃত শ্রীভাষ্য, ১৬৮-১৬৯ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

* অবিদ্যাসম্পর্কে রামানুজোক্ত সপ্তধা অনুপপত্তির আলোচনায় প্রথম অনুপপত্তি—'স্বরূপানুপপত্তি' খণ্ডনের পরই আমরা চতুর্থ 'প্রমাণানুপপত্তি' বিচার করিতেছি। প্রমাণানুপপত্তির খণ্ডন প্রসঙ্গেই অপরাপর অনুপপত্তির কথাও আসিয়া পড়িবে। এইজন্যই প্রমাণানুপপত্তি খণ্ডনের পরই অন্যান্য অনুপপত্তিগুলির খণ্ডন শৈলী আমরা আলোচনা করিব; এবং তাহাতেই রামানুজের অনুপপত্তির রহস্য অনুধাবন করা সহজ হইবে। এইরূপ মনে করিয়াই রামানুজের অনুপপত্তির ক্রম আমরা এখানে অনুসরণ করি নাই।

অদ্বৈতবেদান্তী ভাবরূপ অবিদ্যা প্রমাণ করিবার জন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম, অর্থাপত্তি প্রভৃতি বিবিধ প্রমাণের উপন্যাস করিয়াছেন। অবিদ্যার প্রত্যক্ষ সম্পর্কে অদ্বৈতবাদী বলেন, 'আমি অজ্ঞ' (অহম্ অজ্ঞঃ), আমি আমাকে কিংবা অপর কাহাকেও জানিনা (অহং মামন্যঞ্চ ন জানামি), তোমারকথিত বিষয় সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা (ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি), 'এতকাল আমি সুপ্তির ক্রোড়ে নিদ্রাসুখে মগ্ন ছিলাম, ফলে, কিছুই আমি জানিতে পারি নাই', এই শ্রেণির রকমারি প্রত্যক্ষকেই অদ্বৈতবেদান্তী ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণ বলিয়া উপন্যাস করিয়াছেন। অদ্বৈত-বাদীর উল্লিখিত প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণববেদান্তাচার্যগণ বলেন যে, আলোচিত প্রত্যক্ষের দ্বারা জ্ঞানের অভাবই প্রকাশ পায়, অদ্বৈতসম্মত ভাবরূপ অজ্ঞান প্রমাণিত হয় না। অ-জ্ঞান কথাটির মধ্যে যে 'অ' শব্দটি আছে, তাহা নিঃসন্দেহে জ্ঞানের অভাবই ব্যক্ত করে, ভাবরূপ অজ্ঞান প্রতিপাদন করে না। 'না জানাই' দেখা যায় অদ্বৈতবেদান্তীর প্রদর্শিত প্রত্যক্ষের স্থূল কথা। 'না জানা' যে জানার অভাব; 'আমি আমাকে জানিনা', এই প্রকার প্রত্যক্ষ যে জ্ঞানের অভাবেরই সূচনা করে, তাহা সুধীমাত্রেই অবগত আছেন। এই অবস্থায় অদ্বৈতবাদী উল্লিখিত প্রত্যক্ষকে ভাবরূপ অজ্ঞানে প্রমাণহিসাবে উপস্থিত করেন কি যুক্তিতে? ভাবরূপ অজ্ঞানসাধনে উক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণই নহে, উহা প্রমাণাভাস।

অবিদ্যার 'প্রমাণানুপপত্তি' ও তাহার খণ্ডন এবং ভাবরূপ অবিদ্যার প্রত্যক্ষ-প্রমাণের উপপাদন

প্রতিবাদীর এইরূপ মন্তব্যের বিরুদ্ধে স্বীয়মতের সমর্থনে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, প্রদর্শিত প্রত্যক্ষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে, অজ্ঞানকে ভাবরূপ (Positive) বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব, 'অহম্ অজ্ঞঃ' প্রভৃতি প্রত্যক্ষে জ্ঞানের অভাবই প্রকাশ পায়, এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করা চলে না। 'আমি অজ্ঞ' এইপ্রকার প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে স্বীয় অজ্ঞতা জ্ঞাতা সাক্ষাৎসম্বন্ধেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। অভাব সাক্ষাৎসম্বন্ধে জ্ঞাতার জ্ঞানের গোচর হয় না; পরোক্ষভাবেই ভাসে। অভাবের সহিত [illegible] প্রভৃতির মুখ্যতঃ কোনরূপ যোগ ঘটে না। ভূতল প্রভৃতি যে সকল আধারে অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেই ঘটশূন্য ভূতল

প্রভৃতির সহিতই চক্ষুর সংযোগ ঘটে এবং ঘটশূন্য ভূতল প্রভৃতির প্রত্যক্ষই ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ। 'অনুপলব্ধি' নামক স্বতন্ত্র একটি প্রমাণের সাহায্যে অভাবের জ্ঞানোদয় হয়। অনুপলব্ধি পরোক্ষ প্রমাণ। ঐ পরোক্ষ প্রমাণমূলে উৎপন্ন অভাবের বোধও সুতরাং পরোক্ষ। ঐরূপ পরোক্ষ জ্ঞানাভাবের দ্বারা অজ্ঞানের প্রত্যক্ষের উপপাদন কিরূপে সম্ভবপর ? তারপর, পরোক্ষ অনুপলব্ধি-প্রমাণজন্য অভাবের প্রত্যক্ষতা তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলেও, জ্ঞানের অভাবের (প্রাগভাবের) সাহায্যে জ্ঞাতার ঐরূপ অজ্ঞানের উপলব্ধি ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, অভাবের জ্ঞান হইতে হইলেই যেই বস্তুর অভাববোধের উদয় হয়, সেই বস্তুর (অভাবের প্রতিযোগীর) জ্ঞান পূর্বে থাকা একান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তি গরু চেনেনা, সে গরুর অভাব বুঝিবে কিরূপে ? অভাববোধে অভাবের প্রতিযোগীর জ্ঞান যেমন আবশ্যক, সেইরূপ ভূতল প্রভৃতি যেই সকল আধারে অভাবের উপলব্ধি হয়, সেই সকল আধারের বোধও পূর্ব হইতেই থাকা প্রয়োজন, নতুবা অভাবের প্রতীতি হইবে কোথায় ? এই দৃষ্টিতে আলোচ্য জ্ঞানাভাবের প্রত্যক্ষতা উপপাদন করিতে গেলে, এক্ষেত্রেও জ্ঞানের অভাবের প্রতিযোগী জ্ঞানের এবং জ্ঞানাধার আত্মার পূর্বতনীন জ্ঞান যে আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ কি ? অজ্ঞানের প্রতিযোগী জ্ঞান উপস্থিত থাকিলে, সেখানে জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে না। ভূতলে ঘট থাকিলে, ঘটের অভাব সেখানে থাকে কি ? অভাবের সহিত তাহার প্রতিযোগীর বিরোধ তো সুস্পষ্ট। 'অহম্ অজ্ঞঃ' ইহাও অবশ্য এক শ্রেণির জ্ঞান। ঐরূপ জ্ঞান বর্তমান থাকিলে, সেখানে জ্ঞানের অভাবের বোধ প্রতিবাদী কিভাবে উপপাদন করিতে পারেন ? পক্ষান্তরে, ঐ সকল ক্ষেত্রে যদি জ্ঞান নাই থাকে, তবে [জ্ঞানের অভাবের প্রতিযোগী] জ্ঞানের অভাববশতঃই জ্ঞানাভাবের প্রতীতি ব্যাখ্যা করা যাইবে না। ঘট না থাকিলে ঘটাভাবের প্রতীতি ব্যাখ্যা করা যায় কি ? তারপর, এই যে জ্ঞানাভাবের কথা বলা হইতেছে, ইহাদ্বারা কি 'কোন জ্ঞানই নাই' এইরূপে জ্ঞানমাত্রেরই অভাব (জ্ঞানের সামান্যাভাব) বুঝায়, না, কোনপ্রকার বিশেষ শ্রেণির জ্ঞানের অভাব বুঝায়, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। 'ন জানামি', 'আমি জানিনা' এইরূপে যখন জ্ঞান আছে, তখন ইহা যে জ্ঞানমাত্রেরই অভাব অর্থাৎ জ্ঞানের সামান্যাভাব হইতে পারে না, ইহা সুধী দার্শনিক সহজেই বুঝিতে

পারেন। ফলে, জ্ঞানের অভাব বলিতে এখানে কোন-না-কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের অভাবই যে বুঝাইবে তাহা নিঃসন্দেহ। এই অভাবের প্রকৃত রূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আচার্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন, ‘আমি অজ্ঞ’, ‘আমি জানিনা’, এই সকল কথায় যে জ্ঞানের অভাব প্রকাশ পায়, তাহাকে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বতনীন অভাব (জ্ঞানের প্রাগভাব) বলিয়াই বুঝিতে হইবে। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত জ্ঞানের যে প্রাগভাব থাকে তাহা সর্ববাদিসম্মত। এই অবস্থায় সর্বসম্মত জ্ঞানের প্রাগভাবের দ্বারাই যখন ‘অহমজ্ঞ’ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা করা যায়, তখন অদ্বৈতবেদান্তীর ভাবরূপ অজ্ঞান কল্পনার মূল যে নিতান্তই দুর্বল তাহাতে সন্দেহ কি?[১] আচার্য রামানুজের উল্লিখিত অভিমত বিভিন্ন বৈষ্ণব বেদান্তসম্প্রদায়েরই অনুমোদন লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব বেদান্তাচার্যগণ সকলেই জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বকালীন অভাব (জ্ঞানের প্রাগভাব) বলিয়াই আলোচ্য অজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[২] প্রাগভাব তাহার প্রতিযোগী ঘট প্রভৃতির উৎপত্তি না হওয়া পর্যন্তই বিরাজ করে। প্রতিযোগী ঘট প্রভৃতির উৎপত্তি ঘটিলেই প্রাগভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাই প্রাগভাবের স্বভাব। প্রাগভাবের এই স্বভাবের জন্যই প্রাগভাবকে প্রতিযোগিনাশ্য বলা হইয়া থাকে। জ্ঞানের প্রাগভাবও সুতরাং যতক্ষণ জ্ঞানোদয় না হইবে, ততক্ষণই বর্তমান থাকিবে। জ্ঞানোদয় যদি নাই হয়, তবে কোনরূপ বিশেষজ্ঞানের উৎপত্তিও যে সেক্ষেত্রে সম্ভবপর হইবে না, ইহা তো সত্য কথা। এইরূপ অবস্থায় ‘অহম্ অজ্ঞঃ’, “অহং মাম্ অন্যঞ্চ ন জানামি” প্রভৃতি প্রত্যক্ষের বিশ্লেষণে প্রতিবাদী বৈষ্ণব বেদান্তাচার্যগণের কোনরূপ বিশেষজ্ঞানের প্রাগভাবের কল্পনার যে কোনই ভিত্তি নাই, তাহা সুধী অবশ্য লক্ষ্য করিবেন। অতএব জ্ঞানের প্রাগভাবের সাহায্যে অজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা চলে না ইহা বুঝিয়াই অদ্বৈতবেদান্তী

১। জ্ঞানপ্রাগভাবস্তু ভবতাপ্যভ্যুপগম্যতে, প্রতীয়তে চেত্যুভয়াভ্যুপেতো জ্ঞানপ্রাগভাব এবাহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামীত্যনুভূয়ত ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্।

শ্রীভাষ্য, (অজ্ঞানে প্রমাণানুপপত্তি) ১ম সূত্র, ১৭৫ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং।

২। তস্মাদজ্ঞানশব্দস্ত জ্ঞানাভাবপরত্বেন······ত্বন্মতেঽপি অহমর্থস্ত ভাবরূপাজ্ঞানাশ্রয়ত্বেনাহমজ্ঞো ন জানামীত্যাদি প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যার্থং জ্ঞানাভাববিষয়ত্বস্যাবশ্যংভাবাৎ।

মাধবমুকুন্দকৃত পরপক্ষগিরিবজ্র, ১ম অঃ, ৭৬ পৃঃ।

অজ্ঞানকে জ্ঞানের পূর্বতনীন অভাব না বলিয়া 'ভাবরূপ' (Positive) বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আপত্তি হইতে পারে যে, অদ্বৈতবাদী তাঁহার ভাবরূপ অবিদ্যার সমর্থনে 'অহম্ অজ্ঞঃ' প্রভৃতি যে সকল প্রত্যক্ষের উপন্যাস করিয়াছেন, এবং তাহার বলে অবিদ্যা ভাবরূপ বলিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ঐসকল প্রত্যক্ষ যে ভাবরূপ অজ্ঞানেরই প্রত্যক্ষ তাহা অদ্বৈতবেদান্তী বুঝিলেন কিরূপে? 'অহম্ অজ্ঞঃ' এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে দুইটি পদ আছে—অহম্ এবং অজ্ঞঃ। অহম্ পদটি এখানে উদ্দেশ্য, অজ্ঞঃ পদটি বিধেয়। অহম্‌কেই এখানে অজ্ঞঃ অর্থাৎ অজ্ঞানের আশ্রয় বলা হইয়াছে। অজ্ঞানের আশ্রয় সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, 'অহম্' এর মধ্যে যে অহমিকা বা আমিত্বের অভিমান আছে, সেই অভিমানকে আশ্রয় করিয়াই অজ্ঞান বিরাজ করিতেছে। অহমিকা বা আমিত্ব অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে অভিমানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তির ফল। অন্তঃকরণ জড়। জড় অন্তঃকরণের বৃত্তিও সুতরাং জড়। এইরূপ জড় অভিমানই অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে বিরাজ করে। চৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে এই সকল প্রত্যক্ষে ভাসে না। এই অবস্থায় ঐসকল প্রত্যক্ষের দ্বারা অদ্বৈতবাদী 'একমাত্র চৈতন্যই ভাবরূপ অজ্ঞানের আশ্রয়' এই সিদ্ধান্তে কোন প্রকারেই উপনীত হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র চৈতন্যই যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হয়, তবে অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে 'অহম্' এর যে প্রত্যক্ষ, তাহা তো অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সত্য নহে, মিথ্যা, প্রমা নহে, ভ্রম। এইরূপ ভ্রান্তিকলুষিত প্রত্যক্ষের বলে অদ্বৈতবাদী তাঁহার ভাবরূপ অবিদ্যা প্রমাণ করিবেন কিরূপে?

বৈষ্ণব বেদান্তসম্প্রদায়ের এইরূপ আপত্তির খণ্ডনে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, 'অহম্' পদের অর্থের মধ্যে যে অহমিকার ভাবটি পরিস্ফুট রহিয়াছে, ইহা সত্য কথা। এই সত্যের অপলাপ অদ্বৈতবাদীও করেন না। কিন্তু অহমিকার ভাতি আছে বলিয়াই, জড় অভিমানই অজ্ঞানের আশ্রয় হইবে, এইরূপ বৈষ্ণববেদান্তীর যুক্তি অদ্বৈতবেদান্তী সমর্থন করেন না। জড় বস্তুরাজি স্বপ্রকাশ নহে, পরপ্রকাশ; স্বতঃসিদ্ধ নহে, পরতঃসিদ্ধ। একমাত্র জ্ঞানই স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব। চিদালোকে আলোকিত হইয়াই জড় বস্তুবর্গ আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। জড় অহমিকাও চিদালোকে আলোকিত

হইয়াই প্রকাশিত হইয়া থাকে ইহা না মানিয়া উপায় নাই। স্বপ্রকাশ জ্ঞানের সহিত পরপ্রকাশ জড়ের সম্বন্ধ ঘটে অধ্যাসের সাহায্যে। এই অধ্যাসের মূলে আছে অনাদি অজ্ঞান। জ্ঞান ও জড় আলোক ও অন্ধকারের মত বিরুদ্ধ স্বভাবের হইলেও, অনাদি অজ্ঞানবশে এই দুইএর মধ্যে এক প্রকার বাঁধন ঘটে, যাহাকে অদ্বৈত-বেদান্তের ভাষায় বলে 'চিদচিদ্‌গ্রন্থি' বা অধ্যাস। অহমিকার সহিত চৈতন্যের অধ্যাসের ফলে চিতের প্রকাশ জড় অহমিকায় সংক্রামিত হয়। অজ্ঞান তমিস্রার মধ্যেও জ্ঞানের রজতরেখা ফুটিয়া উঠে। এইরূপে সাক্ষি-জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়া, অজ্ঞান আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। অজ্ঞানের যবনিকায় জ্ঞান তখন ঢাকা পড়ে। সত্য-শিব-সুন্দর জীব তাহার নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া, নিজেকে অহম্ অভিমানী মনে করিয়া সংসারের সাগরদোলায় দোল খাইতে থাকে। অজ্ঞ জীবের এইরূপ পরিচয়ই 'অহম্ অজ্ঞঃ' এই প্রত্যক্ষের মূলে বিরাজ করিতেছে। ইহা অদ্বৈতবেদান্তোক্ত ভাবরূপ অজ্ঞানেরই প্রত্যক্ষ। ভাবরূপ অজ্ঞানই যবনিকা; ভাবরূপ অজ্ঞান-বশেই জীবের শিবরূপ ঢাকা পড়ে। অজ্ঞান জ্ঞানের অভাবরূপ হইলে তাহাদ্বারা জীবের শিবভাব ঢাকা পড়িত না। কেননা, অভাবের কোন কিছু ঢাকিয়া রাখিবার ক্ষমতা নাই। অজ্ঞান অনাদি। অজ্ঞানমূলক অধ্যাস বা চিদচিতের বাঁধনও সুতরাং অনাদি। আলোচ্য প্রত্যক্ষের মূলেও অনাদি অজ্ঞানই ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। অনাদি অজ্ঞান মূলে না থাকিলে, জড় অহমিকার সহিত স্বপ্রকাশ চিতের কোনরূপ যোগ ঘটিত না। ঐরূপ প্রত্যক্ষেরও উদয় হইত না। সুতরাং ঐরূপ প্রত্যক্ষই যে অজ্ঞানে প্রমাণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? অভিমানাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তির সহিত অজ্ঞানের আশ্রয় চৈতন্যের তাদাত্ম্যাধ্যাসের ফলেই অহন্তার অন্তর্গত অভিমানকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া মনে হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জড় অভিমান অজ্ঞানের আশ্রয় নহে। নিত্য চৈতন্যই অনাদি অজ্ঞানের একমাত্র আশ্রয়। নিত্য ব্রহ্ম চৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয়ও বটে, বিষয়ও বটে*। চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞানই চৈতন্যের তিরস্করণী। অজ্ঞানের যবনিকায় ঢাকা পড়ে বলিয়াই,

---

*এই সম্পর্কে অবিদ্যার আশ্রয়ত্বানুপপত্তির বিচার প্রসঙ্গে পরে আরও [illegible] আলোচনা করা হইয়াছে, সুধী সেই আলোচনা দেখিবেন।

সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের নিত্য চৈতন্যরূপ অজ্ঞানান্ধ জীবের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না; অহমিকাকলুষিত আধ্যাসিক বা কল্পিতরূপই ধরা পড়ে। জড় বস্তুরাজি অদ্বৈতমতে অজ্ঞানের আশ্রয়ও নহে বিষয়ও নহে। ঘট প্রভৃতি জড় বস্তু অজ্ঞানের বিষয় হয় না বলিয়া, 'ঘটমহং ন জানামি,' 'ঘটকে আমি জানি না,' এইরূপ প্রতীতির ক্ষেত্রে যেমন ঘটজ্ঞানের অভাবই ভাসমান হইয়া থাকে, সেইরূপ আলোচ্য 'অহম্ অজ্ঞঃ,' 'অহং মাং ন জানামি' প্রভৃতি প্রত্যক্ষ স্থলেও জ্ঞানের অভাবই ভাসমান হউক। প্রতিবাদীর এইরূপ আপত্তির বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদী বলেন, অদ্বৈতবেদান্তের মতে অজ্ঞানকে ঘট প্রভৃতি জড় বস্তুর আবরক বলিয়া না মানিলেও, ঘট-চৈতন্যের আবরক তো মানিতেই হইবে। সেক্ষেত্রে চৈতন্য যেমন অজ্ঞানের বিষয় হইয়াছে, সেইরূপ ঐ চৈতন্যের বিষয় ঘট প্রভৃতিও যে অজ্ঞানের বিষয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ন্যায়মতে আমরা দেখিতে পাই, ঘট প্রভৃতি বস্তুর ব্যবসায়জ্ঞান উহার বিষয় ঘটপ্রমুখ বস্তুর সহিতই অনুব্যবসায়রূপ মানস প্রত্যক্ষের গোচর হয়। অদ্বৈতবাদেও সেইরূপ চৈতন্য তাহার ঘটাদি বিষয়ের সহিতই অজ্ঞানের বিষয় হইবে; অর্থাৎ চৈতন্য যেমন অজ্ঞানের বিষয় হইবে, চৈতন্যের অংশে বিশেষণ ঘট প্রভৃতি জড়বস্তুও (চৈতন্যকে দ্বার করিয়া) অজ্ঞানের বিষয় হইবে এইরূপ বলিলে প্রতিবাদীর আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? ঘট প্রভৃতি জড়বস্তুও ভাবরূপ অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে বলিয়া সাব্যস্ত হইলে, 'আমি ঘট জানিনা,' এই প্রত্যক্ষে ঘটজ্ঞানের অভাববোধেরই উদয় হইবে, অদ্বৈতবেদান্তোক্ত ভাবরূপ অজ্ঞানের প্রতীতি হইবে না, বৈষ্ণববেদান্তিগণের এইরূপ যুক্তির কোনই মূল্য দেওয়া চলে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, সুখ, দুঃখ, অজ্ঞান, রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি যাহা যাহা একমাত্র সাক্ষিভাস্য বলিয়া অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ঐ সকল পদার্থ যখন সর্বদাই সাক্ষিভাস্য, তখন উহাদের অজ্ঞান তো কদাচ সম্ভবপর নহে। কারণ, সাক্ষীর কোনরূপ অজ্ঞানসম্পর্ক নাই। সাক্ষী সদাই জাগরূক। এইরূপ সতত জাগরূক সাক্ষীর ভাস্য সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সম্পর্কে যে 'জানিনা' বুদ্ধির উদয় হয়, ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার করিয়া অদ্বৈতবাদী তাহা ব্যাখ্যা করেন কিরূপে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, জীবচিত্ত যখন সুখ-সরস বা বিষাদ-মলিন থাকে,

তখন তো 'জানিনা' বোধই জন্মে না। যখন সুখ-দুঃখ প্রভৃতি জ্ঞাতার জ্ঞানে ভাসে না, তখনই কেবল 'না জানা' বুদ্ধির উদয় হওয়া স্বাভাবিক। প্রমাতার এইরূপ বুদ্ধিকে 'অহম্ অজ্ঞঃ' এইরূপ অনুভবের ন্যায় ভাবরূপ অজ্ঞানের সাহায্যে অদ্বৈতবাদী অনায়াসেই ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

এখন কথা এই, 'ভূতলে ঘটো নাস্তি', 'ভূতলে ঘট নাই' এইরূপ বোধের সহিত, 'অঘটং ভূতলম্' 'ঘটশূন্য ভূতল' এইরূপ প্রতীতির বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের ব্যতিক্রম ছাড়া, জ্ঞেয় বিষয়ের অংশে যেমন কোনরূপ প্রভেদ নাই; উভয়ক্ষেত্রেই ঘটাভাব, ভূতল ও উহাদের বৈশিষ্ট্য এই কয়টি বিষয়ই যেমন ভাসে, সেইরূপ 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' 'আমাতে কোনরূপ জ্ঞান নাই' এইরূপ জ্ঞানের সহিত 'অহম্ অজ্ঞঃ' 'আমি অজ্ঞঃ' এই জ্ঞানটিও জ্ঞেয় বিষয়াংশে অভিন্ন হউক, অর্থাৎ 'অহম্ অজ্ঞঃ' এই জ্ঞানেও অহং পদার্থ, জ্ঞানাভাব এবং ইহাদের বৈশিষ্ট্য এই পদার্থত্রয়ই ভসমান হউক। 'অহম্ অজ্ঞঃ' এই প্রতীতিকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য ভাবরূপ অজ্ঞান পরিকল্পনার প্রয়োজন কি? ঐরূপ কল্পনায় গৌরবদোষই অপরিহার্য হয় না কি? প্রতিবাদী মাধ্বের এইরূপ আপত্তির খণ্ডনে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, কোনও আধারে (ভূতল প্রভৃতিতে) ঘট প্রভৃতি কোন বস্তুর অভাবের জ্ঞানোদয় হইতে হইলে, অভাবের প্রতিযোগী ঘট প্রভৃতির এবং যেই আধারে অভাবের প্রতীতি জন্মিবে, সেই অধিকরণ ভূতল প্রভৃতির জ্ঞান পূর্বেই থাকা আবশ্যক, নতুবা অভাববোধের উদয়ই সেক্ষেত্রে হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ঘট কি তাহা জানে না, ভূতল চেনে না, তাহার 'ঘটাভাববদ্ ভূতলম্' 'ঘটাভাববিশিষ্ট ভূতল' এইরূপ জ্ঞানোদয় কখনই সম্ভবপর নহে ইহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, যেই অধিকরণে যেই বস্তুর অভাববোধের উদয় হইবে, সেই অধিকরণে অভাবের প্রতিযোগী সেই বস্তুটির অবস্থিতির নিশ্চয় না থাকাও একান্ত আবশ্যক। কারণ, ঐরূপ নিশ্চয়জ্ঞান অভাববোধের প্রতিবন্ধক। ভূতলে ঘটের অবস্থিতির নিশ্চয় থাকিলে, ভূতলে ঘটের অভাবজ্ঞান জন্মিতেই পারে না। ইহাই অভাববোধের রহস্য। এই রহস্য বিচার করিলে স্পষ্টতঃই বুঝা যাইবে যে, 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি', 'আমাতে জ্ঞানের অভাব আছে, এই অভাব ব্যাখ্যা করার জন্যও আমিত্বের এবং জ্ঞান পদার্থটির বোধ *পূর্বেই থাকা একান্ত আবশ্যক। অভাব যেখানে থাকে, অভাবের সেই আধার বা আশ্রয়ের এবং যে বস্তুর অভাব থাকে, অভাবের সেই প্রতিযোগী বস্তুটির জ্ঞান যে অভাববুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী পূর্বাঙ্গ,* তাহা কোন সুধীই অস্বীকার করিতে পারেন না। আমি পদার্থটির এবং সেই আমিত্বের আধারে জ্ঞান বস্তুটির বোধ পূর্বেই আছে স্বীকার করিতে গেলে, সহজ কথায়, আমাতে জ্ঞান থাকিলে, সেক্ষেত্রে আর 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' এইরূপ

প্রতীতিই জন্মিতে পারিবে না। কারণ, 'আমাতে জ্ঞান আছে' এইরূপ নিশ্চয়, 'আমাতে জ্ঞানের অভাব আছে' এই প্রকার নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হইতে বাধ্য। অভাবের অধিকরণে (ভূতল প্রভৃতিতে) প্রতিযোগী ঘট প্রভৃতির নিশ্চয় থাকিলে, সেই আধারে (ভূতল প্রভৃতিতে) 'ঘটো নাস্তি' 'ঘট নাই' এইরূপ ঘটাভাবের জ্ঞান জন্মিতেই পারে না। এই অবস্থায় 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি', 'আমাতে জ্ঞান নাই', এই প্রকার প্রতীতিতে জ্ঞানের অভাবই ভাসমান হয়, ইহা কোন মতেই বলা চলে না। অদ্বৈতবেদান্তোক্ত ভাবরূপ অজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং আমিত্বের প্রকৃতরূপের আবরক ভাবরূপ অজ্ঞানই ঐস্থলে প্রতীতির বিষয় হইয়াছে, এইরূপ স্বীকার করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, 'অহম্ অজ্ঞঃ' এই প্রতীতিতেও যে ভাবরূপ অজ্ঞানই পরিস্ফুট হইয়াছে, জ্ঞানের অভাব প্রতিভাত হয় নাই, ইহা দৃঢ়ভাবেই বলা যায়।[১] এইরূপে ভাবরূপ অজ্ঞান মানিয়া লইয়া আলোচ্য প্রতীতিদ্বয়ের বিষয়াংশে সাম্য ব্যাখ্যা করিলে, অদ্বৈতবাদীর সেক্ষেত্রে আপত্তির কোনই কারণ থাকিতে পারে না।

অদ্বৈতবেদান্তীর অনুমোদিত অজ্ঞান অভাব হইতে ভিন্ন (বিলক্ষণ) হইলেও, অর্থাৎ ভাবরূপ হইলেও অদ্বৈতসিদ্ধান্তে জ্ঞানের বিরোধীরূপেই ঐ অজ্ঞানের ভাতি হইয়া থাকে। বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি বলেন—'আশ্রয় ও বিষয় এতদুভয়সাপেক্ষ অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধীরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে; তাহা না হইলে অজ্ঞান যে জ্ঞানের বিরোধী ইহা বুঝা যায় না। এইজন্য অদ্বৈতবেদান্তীর অজ্ঞানের অনুভবেও উহার বিরোধী যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের ভাতি অবশ্য স্বীকার্য। সেই অবস্থায় 'আমাতে জ্ঞান আছে' এইরূপ অনুভব থাকিলে, 'আমাতে অজ্ঞান আছে' এইপ্রকার অনুভব জন্মিতেই পারিবে না। যদি বল যে, বিরোধী জ্ঞানের কোনরূপ জ্ঞানই নাই, তাহা হইলেও অজ্ঞানের অনুভব সেক্ষেত্রে জন্মিতে পারে না। কেননা জ্ঞানের বিরোধীরূপেই অজ্ঞানের অনুভব স্বভাবসিদ্ধ। ফলে, দেখা যাইতেছে যে, অজ্ঞানকে জ্ঞানাভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে যেই দোষের আপত্তি হইতেছিল, যে বিরোধের আশঙ্কা সুস্পষ্ট হইয়াছিল, অজ্ঞানকে জ্ঞানবিরোধী ভাববস্তুরূপে মানিয়াও অদ্বৈতবেদান্তী সেই দোষের কালিমা মুক্ত হইতে পারিতেছেন না।

১। (ক) তস্মাদভাববিলক্ষণমেবাজ্ঞানং 'ময়ি জ্ঞানং নাস্তি' অহমজ্ঞ ইত্যাদি ইতি সিদ্ধম্।

মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি, ১ম পরিঃ, ৫৪৯ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

(খ) 'তদেবং ত্বদুক্তমর্থং ন জানামী'তি প্রত্যক্ষং ভাবরূপাজ্ঞানবিষয়মিতি সিদ্ধম্।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৫৬ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

প্রতিবাদীর এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, অজ্ঞানের অনুভবে উহার বিরোধী জ্ঞানের প্রতীতি আবশ্যক বলিয়া 'বিবরণে' যে কথা বলা হইয়াছে, সেই জ্ঞান এই ক্ষেত্রে প্রমাণজন্য বৃত্তিজ্ঞান; সাক্ষীর স্বরূপজ্ঞান নহে। সাক্ষীর স্বরূপ-জ্ঞানটি অজ্ঞানের বিরোধী নহে। সাক্ষীর স্বরূপজ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী হইলে, সাক্ষী কদাচ অজ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারিত না। অজ্ঞান সাক্ষি-ভাস্ত। সাক্ষীর স্বরূপ জ্ঞান তো সাক্ষি-ভাস্ত অজ্ঞানের সাধকই বটে, বাধক নহে। এই অবস্থায় সাক্ষিজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধ না থাকায়, অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তে সাক্ষিজ্ঞান বর্তমান থাকাকালেও অজ্ঞানের অনুভব হইতে কোনরূপ বাধা নাই।

ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি', 'তোমার কথিত বিষয় আমি জানি না', এই প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও ভাবরূপ অজ্ঞানই প্রতীতির বিষয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে, জ্ঞানাভাব নহে। প্রতিবাদী দ্বৈতবেদান্তী বলিতে পারেন যে, আলোচ্য স্থলে 'তোমার কথিত বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নাই', এইরূপ জ্ঞানবিশেষের অভাবই এখানে প্রকাশ পাইতেছে। বিষয়টি উক্তজ্ঞানে সাক্ষাৎভাবে ভাসমান না হইয়া, বৃত্তিজ্ঞানের বিশেষণরূপেই এখানে প্রতিভাত হইতেছে। বিষয়টি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোচ্য জ্ঞানে ভাসমান না হওয়ায়, অভাববাদে বিষয়টির জ্ঞানে ও অজ্ঞানে যে বিরোধের আপত্তি উঠিয়াছিল, তাহারও কোনরূপ আশঙ্কা এখানে নাই। এই অবস্থায় অজ্ঞান নামে অতিরিক্ত একটি ভাববস্তু স্বীকারের প্রয়োজন কি? প্রতিবাদীর এইরূপ উক্তির প্রত্যুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, উক্ত বৃত্তিজ্ঞানের অভাবের প্রত্যক্ষ তখনই কেবল হইতে পারে, যদি উল্লিখিত বৃত্তিজ্ঞানের বোধ পূর্বে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাহাই তো এখানে সম্ভবপর নহে। কারণ, আলোচ্য বৃত্তিজ্ঞান সাক্ষিস্বরূপ হইতে পারে না; যেহেতু জীবরূপ অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আলোচিত বৃত্তিজ্ঞানের দ্রষ্টা। যদি সাক্ষীকে উহা জানিতে হয়, তবে শব্দপ্রমাণের সাহায্যেই উহা জানিতে হইবে। শব্দপ্রমাণের দ্বারা তোমার কথিত বিষয়ের জ্ঞান হইয়াই, উহা প্রমাণজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করিবে। তাহা হইলে পূর্বে 'তোমার কথিত বিষয়ের' জ্ঞান তো থাকিলই, উহার 'ন জানামি' এইরূপ নিষেধ হইবে কেমন করিয়া? আর নিষেধই যদি হয়, তাহা হইলে উক্ত নিষেধের প্রতিযোগীর জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অভাববোধের বিরোধের আশঙ্কাই বা হইবে না কেন? এই অবস্থায় "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" এ স্থলে ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত নহে কি?

'এতক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছুই জানিতে পারি নাই' সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির এইরূপ পরামর্শের দ্বারা সুষুপ্তিকালীন প্রত্যক্ষেও ভাবরূপ অজ্ঞানই প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। আপত্তি হইতে পারে যে, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ঐ যে পরামর্শ, উহা কি অনুমান, না স্মৃতি? যদি উহা অনুমান হয়, তবে উহা দ্বারা সুপ্তোত্থিত পুরুষের

সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাবেরই অনুমান হইবে, অদ্বৈতবাদীর ভাবরূপ অজ্ঞানের অনুমান হইবে না। অনুমানের আকারটিও হইবে নিম্নরূপ—

আমি সুষুপ্তিকালে (পক্ষ) জ্ঞানশূন্য ছিলাম (সাধ্য), যেহেতু তখন আমি স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থা হইতে বিভিন্ন অবস্থায় বর্তমান ছিলাম (হেতু)। আমি যদি তখন জ্ঞানবিশিষ্ট হইতাম, তবে অবশ্য স্বপ্ন বা জাগরিত অবস্থায়ই বর্তমান থাকিতাম (উপনয়), কিন্তু আমি তাহা ছিলাম না; সুতরাং আমি জ্ঞানহীনই ছিলাম (নিগমন)।

অথবা, সুষুপ্তিকালে আমি (পক্ষ), জ্ঞানশূন্য ছিলাম (সাধ্য), যেহেতু আমাতে তখন জ্ঞানের সামগ্রী বিদ্যমান ছিলনা (হেতু), যদি আমি জ্ঞানবিশিষ্ট হইতাম, তবে আমাতে জ্ঞানের সামগ্রী অবশ্যই থাকিত (উপনয়), কিন্তু আমাতে তাহা ছিল না, সুতরাং আমি জ্ঞানশূন্যই ছিলাম (নিগমন)। যদি সুষুপ্তিকালে আমি জ্ঞানবিশিষ্ট হইতাম, তবে তখন আমি জ্ঞানবিশিষ্ট ছিলাম বলিয়া অবশ্যই এখন আমার স্মরণ হইত, এইরূপ অনুকূল তর্কও উক্ত অনুমানের সহায়ক হইবে।

আলোচ্য-পরামর্শকে অনুমান না বলিয়া যদি স্মৃতি বলা হয়, তবে তাহাও হইবে অযৌক্তিক পরিকল্পনা। কারণ, স্মরণ হইতে হইলে উহার পূর্বসংস্কার থাকা চাই। স্মৃতির কারণ পূর্বসংস্কার মানিতে হইলে, সুষুপ্তিজ্ঞানের বিনাশ হইয়াছে ইহাও না মানিয়া উপায় নাই। সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানের বিনাশ কিন্তু মানা চলে না। কারণ, সুষুপ্তির পরেই আসে স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থা। এই উভয় অবস্থাতেই জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থায় জ্ঞানের বিনাশ হইবে কখন? জ্ঞানের যদি বিনাশ না হয়, তবে সংস্কার জন্মিবে কেমন করিয়া? ফলে, উক্ত সুষুপ্তিকালীন পরামর্শকে স্মরণ না বলিয়া অনুমানই বলিতে হইবে। সেই অনুমান সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞানাভাবেরই অনুমান করিবে, ভাবরূপ অজ্ঞানের নহে।

জ্ঞানাভাববাদীর উল্লিখিত আপত্তির খণ্ডনে অদ্বৈতবাদী বলেন, পরামর্শ অনুমানে ব্যাপারমাত্র, অনুমান নহে। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিবাদীর উল্লিখিত অনুমানে সুষুপ্তিকালকে পক্ষ এবং হেতু এই উভয়েরই বিশেষণরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপ হেতু ও পক্ষের বিশেষণের প্রয়োগ শোভন হয় নাই। কারণ, অনুমান করিতে হইলে অনুমানের অঙ্গ হেতু ও পক্ষের জ্ঞান পূর্বে থাকা আবশ্যক, ইহা সুধীমাত্রেই অবগত আছেন। উক্তরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হেতু ও পক্ষের জ্ঞান পূর্বে থাকা সম্ভবপর কি? জ্ঞানের অভাব ছাড়া সুষুপ্তি অবস্থাকে বুঝিবার আর কোন উপায় নাই। সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞানের অভাব আছে, তাহাও এই অনুমানের দ্বারাই সাধন করা হইয়াছে। তারপর, দ্বিতীয় অনুমানে জ্ঞান সামগ্রীর অভাবরূপ যে হেতুটির উপন্যাস করা হইয়াছে, তাহাও অনুমান সাপেক্ষ। জ্ঞানের অভাব দেখিয়াই সুষুপ্তিতে জ্ঞানসামগ্রীর অভাবের অনুমান করিতে হইবে। কারণ, সামগ্রীর জ্ঞান কার্য দেখিয়াই অনুমিত

হইয়া থাকে। উল্লিখিত অনুমানের হেতু ও পক্ষের জ্ঞান পূর্বে না থাকিলে, সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞানাভাবের অনুমানও হইতে পারে না। এই অবস্থায় সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাবের অনুমান উহার পক্ষ এবং হেতু জ্ঞানকে অপেক্ষা করায়, আবার উক্ত পক্ষ এবং হেতুর জ্ঞান জ্ঞানাভাবের জ্ঞানকে অপেক্ষা করায়, প্রতিবাদীর অনুমান পরস্পরাশ্রয়দোষে কলুষিত হওয়ায় তাহা কোন প্রকারেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

সুষুপ্তিকালীন 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্' 'কিছুই জানিতে পারি নাই' এইরূপ জ্ঞানাভাবের পরামর্শকে 'স্মরণ' বলিতে অদ্বৈতবেদান্তীর কোনই আপত্তি নাই। সুষুপ্তি অবস্থায় সংস্কার উৎপন্ন হইতে না পারায় সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির পরামর্শকে স্মরণ বলা চলে না বলিয়া প্রতিবাদী যে আপত্তি তুলিয়াছেন, অদ্বৈতবেদান্তীর নিকট ঐসকল আপত্তির কোনই মূল্য নাই। সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যরূপ যে সাক্ষী তাহা দ্বারাই অজ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। উক্ত প্রতিবিম্বিত চৈতন্য অনিত্য বিধায় উহার বিনাশও সম্ভবপর। ফলে, সুপ্তোত্থিত পুরুষের জ্ঞান সংস্কার হইতে উৎপন্ন হওয়ায় উহাকে 'স্মরণ' বলিতে বাধা কি?

প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, অজ্ঞান যেমন স্বরূপতঃ সাক্ষীর বেদ্য জ্ঞানের অভাবও সেইরূপই সাক্ষীর বেদ্য হউক। যে-স্থলে প্রতিযোগিবিশিষ্টরূপে অভাবের জ্ঞান হয়, সেই স্থলেই প্রতিযোগীর জ্ঞান পূর্বে থাকা আবশ্যক হয়, স্বরূপতঃ জ্ঞানাভাবের যেখানে ভাতির সম্ভাবনা আছে, সেখানে জ্ঞানরূপ প্রতিযোগীর জ্ঞান পূর্বে না থাকিলেও ক্ষতি নাই। এই অবস্থায় জ্ঞানাভাবের স্বরূপতঃ ভান হইতেই বা আপত্তি কি? প্রতিবাদীর এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, অভাব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাক্ষীর বেদ্য না হওয়ায়, সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞানাভাবের স্বরূপতঃ ভান সম্ভবপর নহে। শব্দপ্রভৃতি প্রমাণবৃত্তিও সুষুপ্তিকালে না থাকায়, তাহাদের দ্বারাও সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানাভাবের ভাতি হইতে পারে না। প্রতিযোগীর জ্ঞান না থাকিলে, অনুপলব্ধি প্রমাণও সেখানে অভাববোধে সহায়ক হয় না। ফলে, সুষুপ্তি অবস্থায় প্রতিযোগীর জ্ঞান না থাকায়, জ্ঞানাভাবের উপপাদনই দুরূহ হয়। সুতরাং সুষুপ্তি-কালীন জ্ঞানাভাবকে সাধারণ অভাব হইতে ভিন্নপ্রকৃতির ভাবরূপ অজ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

অবিদ্যায় অনুমানানুপপত্তি ও তাহার খণ্ডন

'অহম্অজ্ঞঃ' এইরূপ প্রত্যক্ষই যে ভাবরূপ অবিদ্যার প্রমাণ তাহা আমরা আলোচনা করিলাম্। এখন অবিদ্যার অনুমান-প্রমাণের আলোচনা করা যাইতেছে। অবিদ্যা বা অজ্ঞান যে ভাব-রূপ (positive), অভাবরূপ নহে, তাহা উপপাদনের জন্য প্রকাশাত্ম যতি তদীয় "পঞ্চপাদিকাবিবরণে" নিম্নে উদ্ধৃত অনুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন :—

জ্ঞানোদয়ের ফলে যেখানে অপ্রকাশিত ঘটপ্রমুখ বস্তু জ্ঞাতার জ্ঞানে ভাসে, সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রমাণমূলে উৎপন্ন জ্ঞান অজ্ঞাত ঘট প্রভৃতি বস্তুসম্পর্কে জ্ঞাতার যে অজ্ঞান ছিল, সেই অজ্ঞানকে নিঃশেষে নিবৃত্তি করিয়াই আত্মপ্রকাশ লাভ করে। দৃষ্টান্ত-হিসাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন বস্তুর প্রকাশক প্রদীপশিখার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অজ্ঞান কি জ্ঞানের অভাব, না ভাবরূপ কোন বস্তু? ইহা লইয়া দার্শনিক সমাজে মতবিরোধ দেখা দিলেও, অন্ধকারের দৃষ্টান্তটি অজ্ঞান যে ভাবরূপ বস্তু, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বতনীন অভাব নহে, তাহাই স্পষ্টতঃ বুঝাইয়া দেয়। কারণ, অভাব কোন বস্তুরই আবরক হয় না। অভাবের বস্তুকে ঢাকিয়া রাখিবার ক্ষমতা নাই ইহা কেনা জানেন? জ্ঞাতার জ্ঞানের যাহা বিষয় হয়, জ্ঞাতার অজ্ঞানেরও তাহাই বিষয় হয়। জ্ঞান যেখানে থাকে, অজ্ঞানও সেইখানেই থাকে। জ্ঞানের আশ্রয় এবং অজ্ঞানের আশ্রয় একই বস্তু হইয়া থাকে। জ্ঞান যে সকল বস্তু প্রকাশ করে, অজ্ঞান তাহাই ঢাকিয়া রাখে। ঢাকিয়া রাখার এই ক্ষমতা ভাববস্তুরই কেবল আছে। সুতরাং বস্তুর আবরক জ্ঞাননাশ্য অজ্ঞান ভাবরূপই বটে।[১]

ভাবরূপ অবিদ্যা-সম্পর্কে বিবরণের অনুমান

১। বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণ জ্ঞানম্ (পক্ষ),
স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগতবস্বন্তর পূর্বকম্ (সাধ্য)।
অপ্রকাশিতার্থ প্রকাশকত্বাৎ (হেতু)।
অন্ধকারে প্রথমোৎপন্নপ্রদীপশিখাবৎ (দৃষ্টান্ত)।
বিবরণাচার্য প্রকাশাত্ম যতির এই অনুমানটি আচার্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে, মাধবমুকুন্দ তদীয় "পরপক্ষগিরিবজ্রে," দ্বৈতবেদান্তী ব্যাসরাজ ন্যায়ামৃত প্রভৃতি বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থে খণ্ডনের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য অনুমানে শুধু জ্ঞানকে পক্ষ না করিয়া, প্রমাণজ্ঞানকে পক্ষরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহার কারণ এই, কেবল জ্ঞানকে পক্ষ করিলে পরব্রহ্মের নিত্য যে স্বরূপ জ্ঞান, তাহাতো তাহার পূর্ববর্তী অন্য কোন বস্তুর ইঙ্গিত করে না, অর্থাৎ সেখানে (ব্রহ্মের স্বরূপবিজ্ঞানে) তো 'বস্বন্তরপূর্বকত্ব'রূপ অনুমানের সাধ্য থাকে না। পক্ষে সাধ্য না থাকায়, উক্ত অনুমান বাধরূপ হেত্বাভাস দোষে কলুষিত হয়। এইজন্য জ্ঞানকে এখানে 'প্রমাণমূলে উৎপন্ন জ্ঞান', এইরূপে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রমাণমূলে উৎপন্ন জ্ঞানও যখন ধারাবাহিকভাবে প্রতীতির গোচর হইতে থাকে, তখন একটিমাত্র বৃত্তিমূলে উৎপন্ন ঐ জ্ঞানধারার পরবর্তী জ্ঞানগুলিতে

অদ্বৈতবেদান্তীর ভাবরূপ অবিদ্যার সাধক উল্লিখিত অনুমানের বিরুদ্ধে বৈষ্ণববেদান্তিগণ নানাপ্রকার দোষ উদ্ভাবন করিয়া, অদ্বৈতবাদীর প্রদর্শিত অনুমানের অসারতা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আচার্য রামানুজ স্বামী তাঁহার শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন, আলোচিত অনুমান প্রকৃত অনুমান নহে, উহা অনুমানাভাস বা দুষ্ট অনুমান। তিনি (রামানুজস্বামী) বলেন, অপ্রকাশিত অর্থের (বস্তুর) প্রকাশক (অপ্রকাশিতার্থ প্রকাশকত্বাৎ)

ভাবরূপ অবিদ্যার উল্লিখিত অনুমানের বিরুদ্ধে রামানুজ প্রভৃতির আপত্তি

অদ্বৈতবেদান্তীর অভিপ্রেত 'বস্ত্বন্তরপূর্বকত্ব' থাকে না। পক্ষে সাধ্যের ব্যভিচার ঘটে। এইজন্য প্রমাণজ্ঞানকে (পক্ষকে) পুনরায় বিশেষ করিয়া বলার আবশ্যতা দেখা দিল এবং বিবাদাস্পদ (বিবাদাধ্যাসিত) এইরূপ একটি বিশেষণ প্রমাণের অঙ্গে জুড়িয়া দিয়া অনুমানের পক্ষ নির্দেশ করা হইল—'বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণজ্ঞানম্'। এই তো গেল পক্ষের কথা। এখন সাধ্যের আলোচনা করা যাইতেছে। এই বিপুলকায় সাধ্যসম্পর্কে বক্তব্য এই যে, শুধু 'বস্ত্বন্তরপূর্বকম্' এইভাবে সাধ্যের নির্দেশ করিলে, অনুমানে সিদ্ধসাধন-দোষ অপরিহার্য হয়। ঘট প্রমুখ দৃশ্যবস্তুর জ্ঞান যে ঘট প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞানপূর্বক হয়, অর্থাৎ 'বস্ত্বন্তরপূর্বক' হয়, তাহা বাদী প্রতিবাদী কেহই অস্বীকার করেন না। সেক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদীর অনুমান কোন নূতন তথ্য পরিবেশন করে না; যাহা উভয়বাদী-সম্মত সিদ্ধবস্তু তাহাই সাধন করায়, অনুমানের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। অতএব অনুমানের সাধ্য বস্ত্বন্তরকে 'স্বদেশগত' অর্থাৎ জ্ঞানের দেশে বিরাজমান বা জ্ঞান যেখানে থাকে সেইখানেই বর্তমান, এই ভাবে বিশেষ করিয়া বলা হইল। ফলে, সিদ্ধসাধনের প্রশ্ন আর এখানে দেখা দিল না। কারণ, ঘট প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয়ের উপস্থিতি জ্ঞানের পূর্বে থাকিলেও, ঘট প্রমুখ বস্তুরাজি তো জ্ঞানের দেশে (জ্ঞান যেখানে থাকে সেখানে) জীবের আত্মায় বিরাজ করে না। জ্ঞানের বিষয়রূপেই ঘট প্রভৃতি প্রতিভাত হয়। ভাল কথা, ঘট প্রভৃতি জ্ঞেয় বিষয় জ্ঞানের দেশে বিরাজ করে না ইহা বরং বুঝিলাম্, পূর্বতন জ্ঞানের যে সংস্কার তাহাতো জ্ঞান যেখানে থাকে, সেখানেই (জীবের আত্মায়ই) থাকে। এই অবস্থায় 'স্বদেশগত বস্ত্বন্তর' বলিয়া জ্ঞানের সংস্কারকে ধরিতে বাধা কি? এরূপক্ষেত্রে অদ্বৈতবেদান্তীর ভাবরূপ অজ্ঞানের অনুমানের উদ্দেশ্য অবশ্যই বাধা প্রাপ্ত হইবে ইহা বুঝিয়াই অদ্বৈতবাদী তদীয় অনুমানের সাধ্যের অংশে 'স্বনিবর্ত্য' (জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয়), এইরূপ একটি বিশেষণের প্রয়োগ করিয়াছেন। জ্ঞানের সংস্কার তো আর জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় নহে। ফলে, সংস্কারে

এইরূপ হেতুমূলে অদ্বৈতবাদী যে ভাবরূপ অবিদ্যার সাধন করিয়াছেন, সেখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, অবিদ্যা তাঁহার মতে উক্ত অনুমানবলে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ভাবরূপ অজ্ঞানও যে প্রমাণ-জ্ঞান (প্রমাণ-মূলে উৎপন্ন জ্ঞান) তাহাতে সন্দেহ কি ? এইরূপ অজ্ঞান অপ্রকাশিত প্রপঞ্চের প্রকাশকবিধায় (অর্থাৎ উহাতে অনুমানের হেতু বিদ্যমান থাকায়) ঐ অজ্ঞানের আবরক দ্বিতীয় একটি ভাবরূপ অজ্ঞান সাধন করিতেও কোনরূপ বাধা দেখা যায় না। অদ্বৈতবেদান্তীর আলোচ্য অনুমানবলেই ভাবরূপ অজ্ঞানের আবরক অজ্ঞানান্তর সিদ্ধ হইবে। অজ্ঞানের আবরক আর একটি অজ্ঞান অদ্বৈতবাদী অবশ্যই স্বীকার করিবেন না। ফলে, উল্লিখিত অনুমানের হেতু যে অদ্বৈত-বেদান্তীর অভিপ্রেত সাধ্য সাধন করে না, এই রহস্যই অদ্বৈতবাদীকে মানিয়া লইতে হয় এবং সহজ কথায় অপ্রকাশিতার্থের প্রকাশকত্বরূপ হেতু 'অনৈকান্তিক' হেত্বাভাসই হইয়া দাঁড়ায়। সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের আবরক ভাবরূপ অজ্ঞান যদি অপর কোন অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়, তবে সেক্ষেত্রে ব্রহ্ম বিজ্ঞান-রূপ মুক্তি স্বভাবতই সিদ্ধ হয়, মুক্তির জন্য মুমুক্ষুর প্রয়াসেরও সেক্ষেত্রে কোনই অর্থ হয় না।

অতিব্যাপ্তির প্রশ্ন আসে না। রজ্জুসর্প প্রভৃতি বিভ্রমের ক্ষেত্রে ভ্রান্তদর্শীর ভয়, কম্প প্রভৃতি দেখা যায়; তাহা একদিকে যেমন ব্যাবহারিক সত্য জ্ঞাননাশ্য, অপরদিকে সেই ভ্রমজ্ঞানের আলম্বন রজ্জুসর্পই ভয়, কম্প প্রভৃতিরও আলম্বন বটে, জ্ঞানের বিষয় হিসাবে (বিষয়তা সম্বন্ধে) জ্ঞানও সেখানে বিরাজ করে। এই অবস্থায় অজ্ঞানমূলক ভয়-কম্প প্রভৃতিকে বারণ করার উদ্দেশ্যে, 'স্ববিষয়াবরণ' অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ের আবরক, এইরূপ একটি বিশেষণ সাধ্যের অংশে জুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। অজ্ঞানই বিষয়কে আবৃত করে। অজ্ঞানমূলক ভয়, কম্প প্রভৃতি তো বিষয়কে ঢাকিয়া রাখে না, সুতরাং উহাতে অতিব্যাপ্তির কথাও উঠে না। অভাবও একশ্রেণীর বস্তু বধায়, জ্ঞানের প্রাগভাবেও আলোচ্য সাধ্য বিদ্যমান থাকায় উল্লিখিত অনুমান অদ্বৈতবাদীর অভীষ্ট ভাবরূপ অবিদ্যার সাধক না হইয়া, জ্ঞানের প্রাগভাবেরই সাধক হয়। সুতরাং জ্ঞানের প্রাগভাবকে বারণ করার জন্য অনুমানের সাধ্যের অঙ্গে 'স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত' এইরূপ আরও একটি বিশেষণ পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

প্রদর্শিত অনুমানে অপ্রকাশিত অর্থ বা বস্তুর প্রকাশক (অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ) এইরূপে হেতুর নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রকাশক বলিতে এখানে

অদ্বৈতবেদান্তীর উত্তর

এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, ভাবরূপ অবিদ্যা দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদানকারণ সন্দেহ নাই। নিখিল বিশ্বের উপাদান হইলেও, বিশ্বপ্রপঞ্চের তাহা প্রকাশক নহে। ঘটের উপাদান মাটি ঘটের প্রকাশক হয় কি? স্বপ্রকাশ জ্ঞানই একমাত্র প্রকাশক—'সর্বত্রৈব জ্ঞানস্যৈব প্রকাশকত্বম্'। শ্রীভাষ্য, ১৭৯ পৃঃ; ইহা রামানুজস্বামী মুক্তকণ্ঠেই তাঁহার শ্রীভাষ্যে ঘোষণা করিয়াছেন। সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী অবিদ্যা ব্রহ্মের তিরস্করণী, স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্মই অবিদ্যার ভাসক (প্রকাশক)। অবিদ্যা জড় এবং সাক্ষি-ভাস্য।' এইরূপ জড় অবিদ্যার বিশ্বপ্রপঞ্চকে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা কোথায়? ফলে দেখা যাইতেছে যে, অবিদ্যায় অপ্রকাশিত অর্থের প্রকাশকত্বরূপ (অপ্রকাশিতার্থ

সাক্ষাৎ এবং গৌণ, এই উভয় প্রকার প্রকাশকেই বুঝিতে হইবে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানই বস্তুর প্রকাশক হইয়া থাকে। স্বপ্রকাশ জ্ঞান ব্যতীত অপর কাহারও বস্তু প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। বেদান্তসিদ্ধান্তে জ্ঞান ভিন্ন চন্দ্র সূর্য অগ্নি প্রভৃতি সমস্তই জড় এবং অস্বপ্রকাশ। এই অবস্থায় প্রদীপের প্রভাকে যে দৃষ্টান্তহিসাবে আলোচ্য অনুমানে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য এইরূপে বুঝিতে হইবে—প্রদীপ-প্রভায় অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ আলোকিত হয়, চন্দ্র-সূর্যের কিরণমালায় নিখিল বিশ্ব উদ্ভাসিত হয়; সুতরাং উহাদের জ্ঞানের ন্যায় সাক্ষাৎ প্রকাশকত্ব না থাকিলেও, গৌণ প্রকাশকত্ব অবশ্য স্বীকার্য। অবাধিত ব্যবহারের অনুকূল হেতুমাত্রকেই এক্ষেত্রে প্রকাশক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা অবাধ্যব্যবহারানুগুণ্যহেতুত্বং প্রকাশকত্বমিহ বিবক্ষিতম্। শ্রুতপ্রকাশিকা, ১৭২ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং। ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জ্ঞানের হেতু হইলেও, বস্তুর প্রকাশক নহে। প্রদীপ-প্রভা প্রভৃতি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রসারের বিরোধী অন্ধকারের উচ্ছেদ সাধনকরতঃ জ্ঞানের সহায়ক হওয়ায়, প্রদীপ-প্রভা প্রভৃতিকে গৌণভাবে প্রকাশক বলায় কোন বাধা নাই। এই দৃষ্টিতেই প্রদর্শিত অনুমানে প্রদীপ-শিখাকে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করা হইয়াছে। প্রকাশক বলিতে এখানে চৈতন্য ও সূর্য-বহ্নি প্রভৃতি তেজোময় পদার্থে বিদ্যমান মুখ্য ও গৌণ উভয়প্রকার প্রকাশকেই গ্রহণ করিতে হইবে—হেতৌ চ প্রকাশকত্বং প্রকাশপদবাচ্যত্বম্ অপ্রকাশবিরোধিত্বং বা জ্ঞানালোকয়োঃ সাধারণম্। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬৪ পৃঃ। এইজন্য জ্ঞানের প্রকাশের ব্যাখ্যায় প্রদীপ-শিখাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রদর্শন করা অসঙ্গত হয় নাই; প্রদীপ-শিখায় 'অপ্রকাশিতার্থ প্রকাশত্ব'রূপ হেতু নাই, এইরূপ আপত্তি করা চলে না। দৃষ্টান্তাসিদ্ধি হেত্বাভাসের আপত্তিও

প্রকাশকত্বাৎ) হেতু অজ্ঞানের আবরক অজ্ঞানান্তরে (সাধ্যে) বর্তমান না থাকায়, ঐরূপ হেতু যে সাধ্যের ব্যভিচারী হওয়ায় হেত্বাভাস হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? দ্বিতীয় কথা এই যে, অজ্ঞানের আবরক এই অজ্ঞানান্তরের সহিত ব্রহ্মের তো কোন সংস্পর্শ নাই, পরব্রহ্মের উহা আবরক নহে, অজ্ঞানেরই ইহা আবরক। সাক্ষীর সহিত সংস্পর্শ না থাকায় ঐরূপ অজ্ঞানান্তর সাক্ষি-ভাস্যও হইবে না। অজ্ঞান জড় বস্তু। জড় অজ্ঞানের নিজেকে বা অপরকে, কাহাকেই প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। এরূপ ক্ষেত্রে অজ্ঞানের আবরক অজ্ঞানান্তরকে প্রকাশ করিবে কে? প্রকাশক না থাকায় ঐ অজ্ঞানান্তর অপ্রকাশিতই থাকিয়া যাইবে। এইরূপ অপ্রকাশিত অজ্ঞান কল্পনার সার্থকতাই বা কোথায়? ব্রহ্মের তিরোধানের জন্যই তো ব্রহ্মের তিরস্করণী অবিদ্যার কল্পনা করা হইয়াছে। জ্ঞানরূপ ব্রহ্মকে আবৃত না করিলে, সেই অজ্ঞানকে অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে অজ্ঞানই বলা চলিবে না। ঐরূপ অজ্ঞান-কল্পনাও সর্বতোভাবেই নিষ্ফল হইবে। রামানুজস্বামীর অজ্ঞানের আবরক অজ্ঞানান্তরের কল্পনাও সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তীর দৃষ্টিতে নিষ্ফল প্রয়াস বলিয়াই গণ্য হইবে। পরিকল্পিত অজ্ঞানান্তর ব্রহ্মের স্বরূপের আচ্ছাদক ব্রহ্মতিরস্করণী অজ্ঞানকে আবৃত করিলে, অনাবৃত ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মোক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ হইবে, মুমুক্ষুর মুক্তির প্রয়াস ব্যর্থ হইবে বলিয়া বৈষ্ণববেদান্তী যে আপত্তি তুলিয়াছেন তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অজ্ঞানের আবরক অজ্ঞানান্তর ব্রহ্মের আবরক ভাবরূপ অজ্ঞানকে আবৃতই করিবে, বিনাশ করিবে না। অজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানোদয়েই কেবল অবিদ্যা বিধ্বস্ত হয়। অবিদ্যার বিনাশ না হইলে মুক্তি হইবে কিরূপে? অবিদ্যা একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য বলিয়া, অবিদ্যার আবরণ স্বীকার করিলেও আবৃত

অচল হইয়া পড়ে। অন্ধকারকেও এখানে ভাবদ্রব্য হিসাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে। সাংখ্য-বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের সিদ্ধান্তে অন্ধকার ভাবপদার্থ, অভাবপদার্থ নহে।

তমস্তমালবর্ণাভং চলতীতি প্রতীয়তে।
রূপবত্ত্বাৎ ক্রিয়াবত্ত্বাৎ দ্রব্যন্তু দশমং তমঃ॥

বহুলত্ববিরলত্বাস্ববস্থাযোগেন রূপবত্তয়া চোপলব্ধের্দ্রব্যান্তরমেব তম ইতি নিরবদ্যম্।
শ্রীভাষ্য, ১৭৩ পৃঃ।

ভাবরূপ অবিদ্যার দৃষ্টান্তহিসাবে অন্ধকারকে গ্রহণ করাও সুতরাং দোষাবহ নহে।

অবিদ্যার ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তির আশা কোথায়? ব্রহ্মের আবরক মূল অবিদ্যার আবরণান্তর তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলেও ঐরূপ আবরণের ফলে অবিদ্যার কার্যকারিতা বিলুপ্ত হইয়াছে এইরূপ মনে করিবার কোনই হেতু নাই। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির কি দাহশক্তি থাকে না? এই অবস্থায় অবিদ্যা আবৃত হইলেই মুক্তি স্বয়ংসিদ্ধ হইবে বলা যায় কিরূপে?[১]

ভাবরূপ অবিদ্যার সাধনে চিৎসুখীর অনুমান

উপরে আমরা বিবরণোক্ত অনুমানের নাতিবিস্তৃত আলোচনা করিলাম। বিবরণের অনুমান ছাড়াও ভাবরূপ অবিদ্যার সাধনে চিৎসুখাচার্য, অমলানন্দস্বামী, মধুসূদনসরস্বতী প্রভৃতি অদ্বৈতাচার্যগণ বিভিন্নপ্রকার অনুমান প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন :—

আচার্য চিৎসুখ বলেন—

"দেবদত্ত প্রমাতৎস্থ প্রমাভাবাতিরেকিণঃ।
অনাদের্ধ্বংসিনী মাত্বাদবিগীতপ্রমা যথা॥

তত্ত্বপ্রদীপিকা, ৫৮ পৃঃ নির্ণয় সাগর সং।

এই পদ্যটিকে গদ্যে রূপান্তরিত করিয়া অনুমানের প্রয়োগ করিলে অনুমানটি হয় এইরূপ :—দেবদত্ত সম্পর্কে উদিত প্রমাণ জ্ঞান—(পক্ষ),

দেবদত্ত বিষয়ক প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের (প্রাগ্) অভাবের অতিরিক্ত আরও একটি অনাদি(বস্তু)র নিবর্তক হইয়া থাকে (সাধ্য), যেহেতু উহাও (দেবদত্ত-সম্পর্কে উদিত প্রমাণজ্ঞানও) যজ্ঞদত্তসম্পর্কে উৎপন্ন প্রমাণজ্ঞানের ন্যায়ই যথার্থ জ্ঞান [হেতু ও দৃষ্টান্ত]।[২] চিৎসুখাচার্যের অনুরূপভাবেই অমলানন্দস্বামী তদীয় বেদান্তকল্পতরুতে বলিয়াছেন :—

১। আলোচ্য অনুমানে প্রদীপ-প্রভাকে দৃষ্টান্তহিসাবে উপন্যাস করা হইয়াছে। ঐ দৃষ্টান্তেও যে 'অপ্রকাশিতার্থ প্রকাশকত্ব' রূপ হেতু বিদ্যমান আছে, দৃষ্টান্তটি যে 'সাধনবিকল' অর্থাৎ হেতুশূন্য হয় নাই, তাহা আমরা অনুমানটির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পূর্বেই পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি। সুধী পাঠক সেই আলোচনা দেখিবেন।

২। (ক) বিগীতং দেবদত্তনিষ্ঠপ্রমাণজ্ঞানং দেবদত্তনিষ্ঠ প্রমাঽভাবাতিরিক্তানাদে নিবর্তকং প্রমাণত্বাদ্ যজ্ঞদত্তাদিগতপ্রমাণজ্ঞানবদিত্যনুমানম্।

তত্ত্বপ্রদীপিকা, ৫৮ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং।

(খ) দেবদত্তপ্রমাণজ্ঞানমেতন্নিষ্ঠ প্রমাণাভাবব্যা—
নধিকরণানাদিনিবর্তকং প্রমাণত্বাৎ যজ্ঞদত্তপ্রমাণবদিতি।

তত্ত্বপ্রদীপিকা টীকা-নয়নপ্রসাদিনী, ৫৮ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং।

ডিত্থ সম্পর্কে উদিত প্রমা বা সত্য জ্ঞান (পক্ষ), যে-হেতু সত্য জ্ঞান (হেতু), এইজন্যই ডিত্থপ্রমার (প্রাগ্) অভাব ছাড়া আরও একটি অনাদির (অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞানের) নিবৃত্তি সাধন করে (সাধ্য), যেমন ডপিত্থপ্রমা করিয়া থাকে

'বেদান্ত কল্পতরু'র উক্ত অনুমানমূলেই অপ্যয়দীক্ষিতও তাঁহার 'বেদান্ত কল্পতরু-পরিমলে' ভাবরূপ অজ্ঞান সাধন করিয়াছেন।[২] ডপিত্থ নামক জনৈক ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কে আমাদের যথার্থ জ্ঞানোদয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, ডপিত্থের যথার্থ জ্ঞানোদয়ের ফলে ডপিত্থের জ্ঞানের প্রাগভাব ছাড়াও যেই অনাদি (অজ্ঞানের) আবরণটি এতকাল ডপিত্থকে আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, (অজ্ঞানের) সেই মিথ্যা আবরণটি সরিয়া গেল এবং ডপিত্থকে আমরা চিনিলাম। এই আবরণই অদ্বৈতবেদান্তোক্ত ভাবরূপ অজ্ঞান। সমস্ত সত্যজ্ঞানই অজ্ঞানের আবরণকে অপসারিত করিয়া উদিত হয়। ঘট জ্ঞান প্রভৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে যে, প্রমাণ-জ্ঞানমূলে উদিত যথার্থ জ্ঞানমাত্রই ঐ জ্ঞানের বিষয় ঘট প্রভৃতি বস্তুর আবরক ভাবরূপ অজ্ঞানকে অপসারিত করিয়াই ঘটাদি দৃশ্য বিষয়ের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটায়। সুতরাং এইরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে যে :—

"প্রমা প্রমাভাবাতিরিক্তস্ত অনাদে র্নিবর্তিকা কার্যত্বাৎ ঘটবৎ।"

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬৭ পৃঃ।

অজ্ঞানের লক্ষণ নির্বচন প্রসঙ্গে আমরা ইতঃপূর্বে দেখিয়াছি যে, বিভ্রমের উপাদান-কারণরূপেও অজ্ঞানের লক্ষণ নিরূপণ দোষবহ নহে। ঐরূপ লক্ষণবলে ভাবরূপ অবিদ্যার সাধনে নিম্নোক্ত অনুমানের প্রয়োগও অনায়াসেই করা যাইতে পারে :—

বিগীতো বিভ্রমঃ (পক্ষ), এতজ্জ্ঞানকারণাবাধ্যাতিরিক্তোপাদানকঃ (সাধ্য),
বিভ্রমত্বাৎ (হেতু), দেবদত্তাদিবিভ্রমবৎ (দৃষ্টান্ত)।[৩]

চিৎসুখী, ৬০ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং।

বিবাদাস্পদ শুক্তিরজত, রজ্জুসর্প প্রভৃতি বিভ্রম অবাধ্য নহে (বাধ্য) এমন কোনও উপাদান-কারণমূলে উদিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, যেহেতু ইহা দেবদত্ত প্রভৃতির

১। ডিত্থপ্রমা ডিত্থগতত্বে সতি যঃ প্রমাঽভাবস্তত্বানধিকরণানাদিনিবর্তিকা প্রমাত্বাৎ ডপিত্থপ্রমাবৎ। বেদান্ত কল্পতরু, ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩০।

ডিত্থ ও ডপিত্থ রাম ও শ্যামের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের নাম।

২। "ডিত্থপ্র[illegible]দি [illegible]ঃ।" কল্পতরুপরিমল, ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩০।

৩। চিৎসুখাচার্যের এইসকল অনুমান মধুসূদন সরস্বতী তদীয় অদ্বৈতসিদ্ধিতেও উল্লেখ করিয়াছেন।

বিভ্রমের ন্যায়ই বিভ্রম বটে। বিভ্রমের মূল উপাদান সত্যজ্ঞান নহে, মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞান। বিভ্রমের উপাদান সত্য হইলে বিভ্রম আর বিভ্রম থাকে না; সত্যই হইয়া পড়ে।

সত্যোপাদানত্বে সত্যত্বপ্রসঙ্গঃ।……তস্মাদ্‌যদুপাদানো

বিভ্রম স্তদজ্ঞানমিতি সিদ্ধম্। চিৎসুখী, ৬১ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং।

শুক্তি-রজত, রজ্জুসর্প প্রভৃতি বিভ্রমের ক্ষেত্রে ভ্রমের অধিষ্ঠান শুক্তি, রজ্জু প্রভৃতির জ্ঞানোদয়ে যে অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, অদ্বৈতবেদান্তের ভাষায় তাহা তুলাজ্ঞান বা খণ্ড অজ্ঞান। এই খণ্ড অজ্ঞান অনাদি অখণ্ড মূলাজ্ঞানেরই সখণ্ড অভিব্যক্তি। ভিন্ন তত্ত্ব নহে। মূলাজ্ঞানই ব্রহ্মে জগদ্‌বিভ্রমের পরিণামী উপাদান। ঐ উপাদান অনাদি অখণ্ড হইলেও অবাধ্য নহে; মূলাজ্ঞানও ব্রহ্মবিজ্ঞাননাশ্য। ঐ মূলাজ্ঞান পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই বিরাজ করে। ইহারই অপর নাম জগজ্জননী ব্রহ্মশক্তি।

ভাবরূপ অনাদি অজ্ঞানকে জ্ঞানবিরোধী অভাব বিলক্ষণ প্রভৃতিরূপে অদ্বৈতবেদান্তে যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার মূলেও অনুমানের সমর্থন আছে।

জ্ঞানবিরোধিত্বম্ (পক্ষ), অনাদিভাবত্বসমানাধিকরণম্ (সাধ্য),

সকলাজ্ঞানবিরোধিবৃত্তিত্বাৎ (হেতু) দৃশ্যত্ববৎ (দৃষ্টান্ত)। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৭৯ পৃঃ।

দৃশ্যত্ব যেমন জড় দৃশ্যবস্তুতে থাকে, কোনপ্রকার জ্ঞানে দৃশ্যত্ব থাকে না। জ্ঞানত্ব এবং দৃশ্যত্ব পরস্পর বিরোধী। জ্ঞান এবং জড় অজ্ঞানও সেইরূপ পরস্পরবিরোধী। জ্ঞানের বিরোধ যে সকল ক্ষেত্রে আছে, সেই সকল ক্ষেত্রেই জ্ঞানের বিরোধী অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্বও অনস্বীকার্য। অজ্ঞান সত্যজ্ঞানের বিষয়বস্তুটিকে আমাদের দৃষ্টির পথ হইতে ঢাকিয়া রাখে এবং একটি মিথ্যা বস্তু সৃষ্টি করিয়া সত্যজ্ঞানের বিরোধিতা সম্পাদন করে। কোনও কারণে সত্য বস্তুটির সহিত পরিচয় ঘটিলে, অবিদ্যা অন্তর্হিত হয়, তাহার মিথ্যার আবরণ খসিয়া পড়ে, অসত্য সৃষ্টি সত্যের আঘাতে ধূলিসাৎ হয়। কেবল যে রজ্জুসর্প প্রভৃতি বিভ্রম বা ব্যাবহারিক সত্য ঘট প্রভৃতির জ্ঞানের ক্ষেত্রেই জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধিতা প্রকাশ পায় তাহা নহে। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অজ্ঞানের বিরোধিতা সুস্পষ্টরূপেই আত্মপ্রকাশ লাভ করে। ফলে, এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে বিবিধ বিচিত্র জগদ্‌বিভাবের সৃষ্টি হয়। ঐরূপ সৃষ্টির দ্বারাও 'এক' ঢাকা পড়িয়া যায়, 'একে'র মধ্যেও 'অহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়', এই বহুভবনপ্রবৃত্তি জাগরূক হয়, ইহাই অজ্ঞানের লীলা। একের জ্ঞানোদয়ে বহুত্বের ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়ে। সুতরাং জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধ সর্বপ্রকার জ্ঞানের রাজ্যকেই জুড়িয়া আছে বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানের যাহা বিরোধী হইবে, তাহাই অভাবেরও বিলক্ষণ অর্থাৎ ভাবরূপ হইবে, ইহাও অনুমানের সাহায্যে অনায়াসেই উপপাদন করা যাইতে পারে :—

অনাদ্যভাব বিলক্ষণত্বং (পক্ষ), জ্ঞানবিরোধিবৃত্তি (সাধ্য),

[illegible]ক্ষণমাত্রবৃত্তিত্বাৎ (হেতু),
অভিধেয়ত্ববৎ (দৃষ্টান্ত)। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৭৯ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।
অনাদি অভাবের যাহা বিলক্ষণ বা বিসদৃশ, তাহা অনাদি অভাববিলক্ষণ বিধায়ই জ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে। যেমন অভিধেয়ত্ব। অভিধেয়ত্ব (বাচ্যত্ব) অনাদি অভাবের বিলক্ষণ বা বিসদৃশ পদার্থ এবং উহা জ্ঞানের বিরোধীও বটে। কারণ, অভিধেয়ত্ব জ্ঞানরূপ ব্রহ্মে নাই। বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম অভিধেয় নহে। ব্রহ্ম অবাচ্য, অজ্ঞেয় অবাঙ্‌মনস গোচর। অনাদি অভাব বিলক্ষণ ভাবরূপ অবিদ্যাও সুতরাং জ্ঞানের বিরোধী বটে।*

আলোচিত অনুমানের বিরুদ্ধে রামানুজের অনুপপত্তি ও ঐ সকল অনুপপত্তির খণ্ডন

অনাদি ভাবরূপ অবিদ্যার সাধনে উপরে প্রদর্শিত অনুমানের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ বিবরণোক্ত অনুমান-প্রয়োগের বিরুদ্ধে আচার্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে নয়টি প্রতিপক্ষ-অনুমানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, বিবরণের অনুমান হেত্বাভাস দোষে কলুষিত সুতরাং উহা অনুমানাভাস। ঐরূপ অনুমানাভাসের সাহায্যে অদ্বৈতবাদী ভাবরূপ অজ্ঞান কোনক্রমেই সাধন করিতে পারেন না।

রামানুজোক্ত প্রতিপক্ষ অনুমানগুলি নিম্নে দেখান যাইতেছে ঃ—

১ম—বিবাদাধ্যাসিতম্‌ অজ্ঞানম্‌ (পক্ষ), ন জ্ঞানমাত্রব্রহ্মাশ্রয়ম্‌ (সাধ্য), অজ্ঞানত্বাৎ (হেতু), শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ (দৃষ্টান্ত), জ্ঞাত্রাশ্রয়ং হি তৎ (সিদ্ধান্ত বা নিগমন)।

বিবাদগোচর অজ্ঞান কেবল জ্ঞানরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না, যেহেতু ইহা শুক্তিকাদির অজ্ঞানের ন্যায়ই অজ্ঞান। ঐ অজ্ঞান জ্ঞাতাকে আশ্রয় করিয়াই বিরাজ করে, অর্থাৎ জ্ঞাতারই জ্ঞেয়বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞান থাকে।

২য়—বিবাদাধ্যাসিতম্‌ অজ্ঞানম্‌ (পক্ষ) ন জ্ঞানাবরণম্‌ (সাধ্য), অজ্ঞানত্বাৎ

* আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তদীয় অদ্বৈতসিদ্ধিতে [illegible] মাধ্বসংপ্রদায়ের 'জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান' এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদ-সম্মত ভাবরূপ অজ্ঞান সাধনে নানারূপ সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের এবং বিবিধ অনুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন। আমরা এখানে তাহার দিগ্‌দর্শনমাত্র করিলাম্‌, জিজ্ঞাসু পাঠককে আমরা [illegible] অনুমানোপপত্তিঃ" (অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৭২-৫৭৯ পৃঃ,) প্রবন্ধ আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

(হেতু), শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ (দৃষ্টান্ত), বিষয়াবরণং হি তৎ (সিদ্ধান্ত বা conclusion)।

বিবাদাস্পদ অজ্ঞান, অজ্ঞাননিবন্ধনই জ্ঞানের আবরণ হইতে পারে না। অজ্ঞান জ্ঞানের বিষয়কেই আবৃত করে, জ্ঞানকে নহে। যেমন শুক্তিকা প্রভৃতির অজ্ঞান জ্ঞানের বিষয় শুক্তিকা প্রভৃতিকেই জ্ঞাতার দৃষ্টির অন্তরাল করিয়া রাখে।

৩য়—বিবাদাধ্যাসিতম্ অজ্ঞানম্ (পক্ষ), ন জ্ঞাননিবর্ত্যম্ (সাধ্য), জ্ঞান-বিষয়ানাবরণত্বাৎ (হেতু), যজ্‌জ্ঞাননিবর্ত্যমজ্ঞানং তজ্‌জ্ঞানবিষয়াবরণম্ (ব্যাপ্তিপ্রদর্শন), যথাশুক্তিকাদ্যজ্ঞানম্ (দৃষ্টান্ত)।

বিবাদের আকর অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় হইতে পারে না। যেহেতু অজ্ঞান জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করে না। অজ্ঞান যেস্থলে জ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয়, সেখানে অজ্ঞান জ্ঞানের বিষয়কেই আবৃত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপে শুক্তিকাদির অজ্ঞানের উল্লেখ করা যায়। শুক্তিকার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিলে শুক্তিকাকে অবলম্বন করিয়া বিরাজমান অজ্ঞান, যাহা এতক্ষণ পর্যন্ত শুক্তিকাকে ভ্রান্তদর্শীর দৃষ্টিপথ হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হয় এবং শুক্তি জ্ঞাতার দৃষ্টিতে ভাসিয়া ওঠে। ইহা হইতে অজ্ঞান জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করে এবং বিষয়ের জ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয়, এইরূপ সিদ্ধান্তই আসিয়া দাঁড়ায়।

৪র্থ—ব্রহ্ম (পক্ষ), ন অজ্ঞানাস্পদম্ (সাধ্য), জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ (হেতু), ঘটাদিবৎ (দৃষ্টান্ত)।

ব্রহ্ম অজ্ঞানের আধার নহে, যেহেতু ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব নাই। জ্ঞাতাই জ্ঞানের ন্যায় অজ্ঞানেরও আশ্রয় বা আধার হইয়া থাকে। ঘটের জ্ঞাতৃত্ব নাই, সুতরাং ঘট যেমন অজ্ঞানের আধার হয় না, ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব না থাকায়, ব্রহ্মও অজ্ঞানের আধার বা আশ্রয় হইতে পারেন না।

৫ম—ব্রহ্ম (পক্ষ), ন অজ্ঞানাবরণম্ (সাধ্য), [illegible]াৎ (হেতু), যদজ্ঞানাবরণং তজ্‌জ্ঞানবিষয়ীভূতম্ (ব্যাপ্তিপ্রদর্শন), যথা শুক্তিকাদি (দৃষ্টান্ত)।

অজ্ঞান ব্রহ্মের আবরক হয় না, অর্থাৎ অজ্ঞান ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারেনা, যেহেতু ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হয় না। যে সকল বস্তু জ্ঞানের

বিষয় হইয়া থাকে, অজ্ঞান ঐসকল বস্তুকেই আবৃত করে। যেমন ঝিনুকের খণ্ড প্রভৃতি।

৬ষ্ঠ—ব্রহ্ম (পক্ষ), ন জ্ঞাননিবর্ত্যাজ্ঞানম্ (সাধ্য), জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ (হেতু) যজ্ জ্ঞাননিবর্ত্যাজ্ঞানং তজ্ জ্ঞানবিষয়ীভূতম্ (ব্যাপ্তি), যথা শুক্তিকাদি (দৃষ্টান্ত)।

জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় অজ্ঞান ব্রহ্মে থাকে না, যেহেতু ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হয় না। যাহা জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই অজ্ঞানেরও বিষয় হয়, এবং অজ্ঞান সেই বিষয়েই বিরাজ করে। যেমন শুক্তি প্রভৃতি।

৭ম—বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণজ্ঞানম্ (পক্ষ), স্বপ্রাগভবাতিরিক্তাজ্ঞানপূর্বকং ন ভবতি (সাধ্য), প্রমাণজ্ঞানত্বাৎ (হেতু), ভবদভিমতাজ্ঞানসাধনপ্রমাণ-জ্ঞানবৎ (দৃষ্টান্ত)।

বিবাদের আকর প্রমাণজ্ঞান, প্রমাণমূলে উদিত জ্ঞান বিধায়, জ্ঞানের প্রাগভাবের অতিরিক্ত ভাবরূপ অজ্ঞান সাধন করে না, জ্ঞানের অনাদি প্রাগভাবেরই সাধন করে। অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রেত প্রমাণমূলে উৎপন্ন ভাবরূপ অনাদি অজ্ঞান যেমন (প্রমাণ-জ্ঞান হইলেও) ভাবরূপ অজ্ঞানান্তরের সাধন করে না, অজ্ঞানের প্রাগভাবের নিবৃত্তি করিয়াই চরিতার্থতা লাভ করে, সেইরূপ অজ্ঞানের (বিবরণোক্ত) অনুমানও জ্ঞানের প্রাগভাবের নিবৃত্তি সাধন করিয়াই চরিতার্থতা লাভ করিবে, তদতিরিক্ত ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধন করিবে না।

৮ম—জ্ঞানং (পক্ষ) ন বস্তুনো বিনাশকম্ (সাধ্য), শক্তিবিশেষোপবৃংহণ-বিরহে সতি জ্ঞানত্বাৎ (হেতু), যদ্‌বস্তুনো বিনাশকং তচ্ছক্তি-বিশেষোপবৃংহিতং জ্ঞানম্ অজ্ঞানঞ্চ দৃষ্টম্ (ব্যাপ্তি), যথা ঈশ্বরযোগি-প্রভৃতি জ্ঞানং, যথা চ মুদ্গরাদি।

বিশেষ শক্তিযুক্ত না হইলে জ্ঞান কদাচ বস্তুর বিনাশক হয় না। যাহা বস্তুর বিনাশক হয়, সেই জ্ঞান বা অজ্ঞান যে বিশেষ শক্তিশালী তাহা নিঃসন্দেহ। যেমন ঈশ্বর বা যোগি প্রভৃতির জ্ঞান। ঐ জ্ঞানে ঈশ্বরের বা যোগের প্রভাবে এমন একটা অসাধারণ শক্তি সঞ্চারিত হয়, যাহার বলে ঈশ্বর বা যোগী স্বেচ্ছাবশতঃ যে কোন বস্তুকে বিনাশ করিতে পারেন। মুগুরের প্রহারের ফলে যেক্ষেত্রে ঘটপ্রভৃতি বিধ্বস্ত হয়, সেক্ষেত্রেও

মুগুড়ের বিশেষ শক্তিই যে কারণ, শুধু মুগুড়ের জ্ঞান যে কারণ নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন।

৯ম—ভাবরূপম্ অজ্ঞানম্ (সাধ্য), ন জ্ঞানবিনাশ্যম্, ভাবরূপত্বাৎ (হেতু), ঘটাদিবৎ (দৃষ্টান্ত)।[১]

ঘটপ্রমুখ ভাববস্তু যেমন ভাবরূপ বিধায় জ্ঞাননাশ্য হয় না, ভাবরূপ অজ্ঞানও সেইরূপ ভাববস্তু বলিয়া জ্ঞাননাশ্য হইতে পারে না।

উপরে যে নয়টি অনুমানের প্রয়োগবাক্য প্রদর্শিত হইল, ঐ অনুমানগুলি বিবরণোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে আচার্য রামানুজ প্রয়োগ করিয়াছেন। 'শ্রীভাষ্যের ঐ সকল বিবরণ-সিদ্ধান্তবিরোধী অনুমান বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, শ্রীভাষ্যোক্ত প্রথম তিনটি অনুমানে অজ্ঞানকে পক্ষরূপে নির্দেশ করিয়া বিবরণোক্ত অনুমানের যাহা সাধ্য তাহার অসঙ্গতি প্রদর্শনের চেষ্টা করা হইয়াছে। বিবরণের অনুমানে—জ্ঞানের দেশে বা আশ্রয়ে বিদ্যমান (স্বদেশগত), জ্ঞানের বিষয়ের আবরণ (স্ববিষয়াবরণ), জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় (স্বনিবর্ত্য) এইরূপে যে সাধ্যের তিনটি বিশেষণের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহারই বিরুদ্ধে রামানুজ প্রতিকূল তর্কের অবতারণা করিয়া তিনটি অদ্বৈত-সিদ্ধান্তবিরোধী অনুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন। রামানুজের পরবর্তী তিনটি অনুমানে (৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ) ব্রহ্মকে পক্ষরূপে নির্দেশ করিয়া ত্রিবিধ প্রতিকূল তর্কের প্রয়োগ করা হইয়াছে। চতুর্থ অনুমানে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না। জ্ঞাতাই অজ্ঞানের আশ্রয় হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ব্রহ্মকে যদি অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম জ্ঞাতাই হইয়া পড়েন, তিনি আর বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপ থাকেন না। রামানুজোক্ত পঞ্চম অনুমানে দেখান হইয়াছে যে, ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নহে বলিয়া অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া, অজ্ঞান তাহাকে (ব্রহ্মকে) আবৃত করিতে পারে না। জ্ঞানের যাহা বিষয় হয়, অজ্ঞানেরও তাহাই বিষয় হইয়া থাকে। অজ্ঞান অজ্ঞানের বিষয়কেই আবৃত করে। ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নহে বলিয়া, অজ্ঞানেরও তাহা বিষয় হইবে না। অজ্ঞান তাহাকে আবৃতও করিতে পারিবে না। ষষ্ঠ অনুমানে পঞ্চম অনুমানের প্রতিপাদ্য বিষয়কেই সুদৃঢ় করিয়া বলা হইয়াছে যে,

বিবরণোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে রামানুজের অনুপপত্তির বিশ্লেষণ

১। রামানুজ-শ্রীভাষ্য ১৭৯-১৮০ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং।

জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় অজ্ঞান যদি ব্রহ্মাশ্রিত হয় তবে ব্রহ্মও শুক্তিকা প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞেয়ই হইয়া পড়েন—“ব্রহ্মণো জ্ঞাননিবর্ত্যাজ্ঞানত্বে জ্ঞেয়ত্বপ্রসঙ্গঃ।” শ্রুতপ্রকাশিকা, ১৮০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং। সপ্তম অনুমানে প্রমাণজ্ঞানকে পক্ষ করিয়া দেখান হইয়াছে, যে-সকল ক্ষেত্রে প্রমাণমূলে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রমাণজ্ঞান জ্ঞানের প্রাগভাবেরই পূর্ববর্তিতা সূচনা করিয়াছে এবং ঐ প্রাগভাবকে নিবৃত্তি করিয়াই প্রমাণজ্ঞান আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছে। প্রমাণজ্ঞান উহার প্রাগভাব ব্যতীত অপর কোনও ভাবরূপ অনাদি অজ্ঞান সাধন করে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে অদ্বৈতবেদান্তীর অভিপ্রেত ভাবরূপ অনাদি অজ্ঞানের সাধক অনুমানপ্রমাণকেই ধরা যাউক। অদ্বৈতবেদান্তীর অজ্ঞানের অনুমান প্রমাণজ্ঞান বিধায়, অজ্ঞানের আবরক অজ্ঞানান্তরের সাধন করিবে, ইহা অদ্বৈতবাদী বলিতে পারেন কি? কিন্তু অজ্ঞান যখন প্রদর্শিত অনুমানমূলে উদিত হয়, তখন তাহা যে অজ্ঞানের অনাদি প্রাগভাকে নিবৃত্তি করিয়া উৎপন্ন হয়, ইহাতো অদ্বৈতবেদান্তীও অস্বীকার করিতে পারেন না। এই অবস্থায় অজ্ঞানের প্রাগভাবের অতিরিক্ত অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকারের প্রয়োজন কি? যদি ঐরূপ অজ্ঞান স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা অদ্বৈতবেদান্তী উপলব্ধি করেন, তবে অজ্ঞানের আবরক অজ্ঞানান্তর স্বীকার করিতেই বা তাঁহার মতে বাধা কোথায়? ধারাবাহিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, ঘট-ঘট এইরূপ ধারাবাহিক ঘট জ্ঞানের প্রথম জ্ঞান অবিসংবাদী প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণমূলে উৎপন্ন হইলেও সেই প্রাথমিক ঘটজ্ঞান ঘটের প্রাগভাবকে নিবৃত্তি করিয়াই উদিত হইয়াছে, অদ্বৈতবেদান্তীর অভিলষিত অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করিয়া উদিত হয় নাই। ধারাবাহিক জ্ঞানের পরবর্তী জ্ঞানগুলিতেও এই একই যুক্তি প্রযোজ্য। সুতরাং প্রমাণজ্ঞান প্রমেয়বস্তুর প্রাগভাবের অতিরিক্ত অনাদি ভাবরূপ বস্ত্বন্তর সাধন করে এই যুক্তি অচল। জ্ঞান বস্তুর বিনাশক হয় না, এই অষ্টম অনুমানটি একটি ব্যতিরেকী অনুমান। এই ব্যতিরেকী অনুমানের ব্যাপ্তি দেখাইতে গিয়া রামানুজ ‘জ্ঞানত্বাৎ’ এই হেতুটিকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—বিশেষরূপ শক্তিসঞ্চার ব্যতীত জ্ঞান কদাচ কাহারও বিনাশক হয় না। শক্তি বিশেষের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে, কি জ্ঞান, কি অজ্ঞান কিছুই বস্তুকে বিনাশ করিতে পারে না। এই অবস্থায় জ্ঞান ভাবরূপ বস্তুর

(অদ্বৈতাভিমত অজ্ঞানের) বিনাশক হইবে, এইরূপ কল্পনা নিতান্তই ভিত্তিহীন নহে কি? অষ্টম অনুমানের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য নবম অনুমানে বলা হইয়াছে যে, অদ্বৈতসম্মত অজ্ঞান ভাববস্তু বিধায়, জ্ঞান উহাকে [অজ্ঞানকে] কখনও বিনাশ করতে পারিবে না। ভাবরূপ ঘটপ্রমুখ বস্তু যেমন জ্ঞাননাশ্য নহে, ভাবরূপ অজ্ঞানও সেইরূপ (ভাবরূপ বিধায়ই) জ্ঞান বিনাশ্য হইবে না।

আলোচিত অর্থগত দোষ ছাড়াও, বিবরণোক্ত অনুমানে শব্দের যোজনাও যে সুষ্ঠু হয় নাই, তাহাও এই প্রসঙ্গে প্রণিধান করা আবশ্যক। আলোচ্য অনুমানের সাধ্যকে ভাববাচী বস্তুশব্দের প্রয়োগ করিয়া, শুধু 'বস্তুপূর্বকম্' বলিলেই অনুমানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। সেই অবস্থায় সাধ্যের অংশে (স্ব, প্রাক্, অভাবব্যতিরিক্ত ও অন্তর এই) চারটি অনর্থক বিশেষণ জুড়িয়া দিয়া, সাধ্যকে (স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত বস্ত্বন্তররূপে) ভারাক্রান্ত করায়, সাধ্যাংশে ব্যর্থ বিশেষণতার অভিযোগ যে অনিবার্য হইয়াছে, তাহা বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি লক্ষ্য করিয়াছেন কি?

রামানুজ স্বামীর উল্লিখিত বিরোধী (প্রতিপক্ষ) অনুমানগুলির পর্যালোচনা করিয়া অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, রামানুজোক্ত নয়টি প্রতিপক্ষ

রামানুজোক্ত অনুমানানুপপত্তির খণ্ডন

অনুমানের প্রথম এবং চতুর্থ অনুমানটি যাহাতে জ্ঞাতাকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা কোন কোন অদ্বৈতবাদীরও অভীষ্ট বলিয়া, ঐ অনুমান দুইটির সহিত অদ্বৈতসিদ্ধান্তের কোন প্রকার বিরোধ নাই। অজ্ঞানকে "জীবপদা ব্রহ্মবিষয়া,"—অবিদ্যার আশ্রয় জীব এবং বিষয় ব্রহ্ম, এইরূপে মণ্ডনমিশ্র তদীয় ব্রহ্মসিদ্ধিতে, বাচস্পতিমিশ্র ভামতীতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে মাধ্বের আপত্তির বিরুদ্ধে তর্কের ভিত্তিতে অজ্ঞানের জীবাশ্রয়ত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন।[১] সুতরাং রামানুজস্বামীর প্রথম এবং চতুর্থ অনুমান যে অদ্বৈতবেদান্তীর প্রতিকূল নহে, তাহা সুধী সহজেই বুঝিতে পারেন।

রামানুজের দ্বিতীয় এবং পঞ্চম অনুমানে অজ্ঞান জ্ঞানরূপশুদ্ধ ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারে না, জ্ঞানের যাহা বিষয় হয়, অজ্ঞান তাহাকেই আবৃত করে,

১। অজ্ঞানের [illegible]োপপত্তি, অদ্বৈতসিদ্ধি ৫৮৫ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং দেখুন।

এইরূপে যে আপত্তি দেখান হইয়াছে, তদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, অজ্ঞানের আশ্রয় ও ব্রহ্ম এবং বিষয়ও ব্রহ্ম—"আশ্রয়ত্ব-বিষয়ত্বভাগিনী, নির্বিভাগ-চিতিরেব কেবলা।" ইহাই বিবরণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের কথা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। অজ্ঞান তাহার বিষয়ের আবরক হইলে, অজ্ঞানের বিষয়রূপে ব্রহ্মকে আবৃত করিতেই বা বাধা কোথায়? অজ্ঞান ব্রহ্মেরই শক্তি। অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি, তমঃ প্রভৃতি অজ্ঞানেরই বিভিন্ন নাম। এই অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নহে; জ্ঞানের বিরোধী ভাবরূপ বস্তু, ইহাও আমরা ইতঃপূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ব্রহ্মশক্তি অবিদ্যা স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্মের আলোকেই আলোকিত হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মশক্তি অবিদ্যার সহিত ব্রহ্মের স্বতঃ কোনও বিরোধ নাই। অবিদ্যা বা মায়াশক্তি যতক্ষণ ভূমা ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে শক্তিরূপে বিলীন থাকে, ততক্ষণ অবিদ্যার সহিত ব্রহ্মবিদ্যার বিরোধ ঘটে না। অজ্ঞান যখন অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিফলিত হইয়া জীবকে মিথ্যা বিষয় দর্শন করায়, তখনই জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধ ফুটিয়া ওঠে। এই বিরোধে শুদ্ধজ্ঞান বা অজ্ঞানশক্তি কারণ নহে। খণ্ড জ্ঞান ও অজ্ঞানের বৃত্তিসম্পর্কই কারণ বলিয়া জানিবে। অতএব বিশুদ্ধ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের (অবিদ্যাশক্তির) আশ্রয় বলিয়া বিবরণকার যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত হয় নাই।* শুদ্ধব্রহ্মের অন্তরে এইশক্তি ব্রহ্মাভিন্নরূপে বিরাজ করিয়া, ব্রহ্মের সৃষ্টিলীলায় সহায়তা করেন। এইরূপেই পরব্রহ্ম অবিদ্যাশক্তির বিষয় হইয়া থাকেন এবং অবিদ্যা ব্রহ্মকে আবৃত করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রামানুজোক্ত ২য় এবং ৫ম অনুমানের সহিতও অদ্বৈতসিদ্ধান্তের কোনরূপ বিরোধ ঘটিবার কারণ নাই।

উল্লিখিত যুক্তিবলে ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয় বলিয়া সাব্যস্ত হইলে জ্ঞানেরও তাহাই বিষয় হইবে এবং রামানুজোক্ত তৃতীয় এবং ষষ্ঠ অনুমানের হেতু অসিদ্ধ বলিয়াই গণ্য হইবে। তৃতীয় অনুমানে অজ্ঞান জ্ঞানের বিষয়ের আবরক হয় নাই—'জ্ঞানবিষয়ানাবরণত্বাৎ' এইরূপে হেতুর পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। ষষ্ঠ অনুমানে জ্ঞানের অবিষয়ত্বকেই (জ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ) স্পষ্টতঃ হেতুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন বিবরণোক্ত যুক্তি অনুসারে ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় বলিয়া স্থির হইলে, রামানুজের ৩য় এবং ষষ্ঠ অনুমানের "জ্ঞানাবিষয়ত্ব" হেতু হেত্বাভাসই হইয়া দাঁড়াইবে।

* অজ্ঞানের ব্রহ্মাশ্রয়ত্বানুপপত্তির খণ্ডনে এই সম্পর্কে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

সপ্তম অনুমানে 'প্রমাণজ্ঞানত্বাৎ' এইরূপে যে হেতুর প্রয়োগ করা হইয়াছে ঐ 'প্রমাণজ্ঞানত্ব' হেতুটি (স্বপ্রাগভাবাতিরিক্ত অজ্ঞান পূর্বকত্বাভাবরূপ) সাধ্যের ব্যভিচারী হয় বলিয়াই উক্ত অনুমান গ্রহণযোগ্য নহে। যেক্ষেত্রে প্রথম ক্ষণে "স্থাণুর্বা পুরুষো বা" এইরূপ সংশয় জাগিয়াছে, দ্বিতীয় ক্ষণে কর-চরণ প্রভৃতির দর্শন ঘটিয়াছে এবং তৃতীয় ক্ষণে 'অয়ং পুরুষঃ' 'এইটি একটি পুরুষ' এই নিশ্চিত জ্ঞানোদয় হইয়াছে, সেখানে প্রমাণজ্ঞানত্বরূপ হেতু আছে কিন্তু অজ্ঞানপূর্বকত্বাভাবরূপ সাধ্য নাই। কেননা, 'এইটি পুরুষ', এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানের পূর্বে পুরুষ কি-না, এই প্রকার সংশয়াত্মক মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞানই রহিয়াছে, 'অজ্ঞানপূর্বকত্বাভাব' নাই। হেতু এইরূপে সাধ্যব্যভিচারী হওয়ায়, রামানুজের ঐ অনুমান যে অনুমানাভাস হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ?

"জ্ঞানং ন বস্তুনো বিনাশকম্" এইরূপে যে অষ্টম অনুমানের অবতারণা করা হইয়াছে, ঐ অনুমান সিদ্ধসাধন-দোষে কলুষিত হইয়াছে। কারণ, অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই অবস্তু এবং মিথ্যা। পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চও এইমতে মিথ্যাই বটে। সুতরাং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান, যাহা বহুত্বকে, দ্বৈতবুদ্ধিকে নিবৃত্ত করিয়া উদিত হয়, তাহা অবস্তুরই বিনাশক হইয়া থাকে, কদাচ বস্তুর বিনাশক হয় না। দ্বিতীয়তঃ বস্তুশব্দকে এখানে কাল্পনিক বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিলেও উক্ত অনুমানের জ্ঞানত্ব হেতু যে সাধ্যের ব্যাভিচারী হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ? স্মৃতিজ্ঞানও একশ্রেণির জ্ঞান বিধায় 'জ্ঞানত্ব' হেতু স্মৃতিতে আছে, অথচ স্মৃতি সংস্কারের নাশক হওয়ায়, 'বস্তুবিনাশকত্বাভাব'রূপ সাধ্য সেখানে নাই। হেতু থাকিয়াও সাধ্য না থাকায়, হেতু যে সাধ্যের ব্যভিচারী হইবে ইহা নিঃসংশয়েই বুঝা যায়।

এইরূপ নবম অনুমানেও হেতু সাধ্যের ব্যভিচারী হইবে। স্মৃতি সংস্কারের নাশক হয়। সংস্কার ভাবরূপ সুতরাং সংস্কারে নবম অনুমানের হেতু 'ভাবরূপত্ব' আছে, কিন্তু স্মৃতি-জ্ঞানবিনাশ্য সংস্কারে 'জ্ঞানবিনাশ্যত্বের-অভাব'রূপ অনুমিতির সাধ্য নাই। প্রকারান্তরেও এই নবম অনুমানের হেতু যে সাধ্যের ব্যভিচারী হইয়াছে তাহাও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্যক। এই অনুমানে উপাধি-দোষ ঘটিয়াছে। এখানে 'পারমার্থিকত্ব' উপাধি হইয়াছে। যাহা জ্ঞানবিনাশী হয় না, তাহাই পারমার্থিক হইয়া থাকে। এইরূপে পারমার্থিকত্ব 'জ্ঞানবিনাশ্যতাভাব'রূপ সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে সত্য, কিন্তু

ভাবত্বরূপ হেতুর তাহা ব্যাপক হয় নাই। কারণ, ভাবরূপ অজ্ঞানে কিংবা আকাশাদি প্রপঞ্চে ভাবরূপত্ব আছে, অথচ মিথ্যা আকাশাদি প্রপঞ্চে পারমার্থিকত্ব নাই। এই অবস্থায় পারমার্থিকত্ব সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক হওয়ায় উপাধি হইয়াছে। অর্থাৎ ভাবরূপত্বহেতু সাধ্যের ব্যাপক পারমার্থিকত্বের ব্যভিচারী হইয়াছে, ফলে সাধ্যেরও তাহা ব্যভিচারী হইয়াছে। তারপর, ভাবরূপত্ব হেতু এখানে অনৈকান্তিক হেত্বাভাসও হইয়াছে। রজ্জু-সর্পের ক্ষেত্রে সর্পজ্ঞানজন্য ভাবরূপ যে ভয় রজ্জুজ্ঞানের উদয়ে ঐ সর্পভয়ের বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ভাবরূপ হইলেই তাহা জ্ঞান-বিনাশ্য হইবে না (জ্ঞান বিনাশ্যত্বের অভাবই সেখানে থাকিবে) ইহা কি করিয়া বলা যায়? আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলে বলিতে হয় যে, ভাবরূপ হেতু জ্ঞানবিনাশ্যত্বের অভাবই কেবল সাধন করে না, স্থলবিশেষে জ্ঞান-নাশ্যত্বেরও সাধন করে। সুতরাং জ্ঞানবিনাশ্যত্বের অভাব সাধনের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত ভাবরূপত্ব হেতু অনৈকান্তিক হেত্বাভাসই হইয়া দাঁড়ায়। যদি বল যে, ভয়ের কারণ সর্পজ্ঞানের নাশের ফলেই ভয়ের বিনাশ ঘটিয়াছে, রজ্জু-জ্ঞানোদয়ের ফলে ভয়ের নাশ হয় নাই, তবে সেক্ষেত্রেও ভাবরূপ সর্প-জ্ঞানের রজ্জুজ্ঞানোদয়ে বিনাশ হওয়ায়, ভাবরূপ হেতু যে অনৈকান্তিক হেত্বাভাসই হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

বিবরণোক্ত অনুমানের সাধ্যসম্পর্কে ব্যর্থবিশেষণ প্রয়োগের আপত্তি তুলিয়া, রামানুজ তাহার শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন, "ব্যর্থবিশেষণের প্রয়োগ করিয়া বিবরণকার বিশেষণ প্রয়োগের অভিনব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন"।[১] এইরূপ উপহাস রামানুজস্বামীর মুখে শোভা পায় না। কেননা, তাঁহার প্রতিপক্ষ অনুমানগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, রামানুজস্বামীর অনুমানগুলিও পুনরুক্তি কলুষিত। তাঁহার প্রথম অনুমানের দ্বারা যাহা তিনি সাধন করিতে চাহিয়াছেন, তাহাই তিনি তাহার চতুর্থ অনুমানেও পুনরুক্তি করিয়াছেন। শুধু শব্দরচনার পার্থক্য ব্যতীত তথ্যের কোন পার্থক্য তাঁহার প্রথম ও চতুর্থানুমানের মধ্যে দেখা যায় না। রামানুজের দ্বিতীয় ও পঞ্চম অনুমানের মধ্যে, তৃতীয় ও ষষ্ঠের মধ্যে, অষ্টম এবং নবম অনুমানের মধ্যে

১। ব্যর্থবিশেষণোপাদানেন প্রয়োগকুশলতা চাবিষ্কৃতা।

শ্রীভাষ্যে, ১৮০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং

পুনরুক্তির ছায়াপাত সুধী অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন। যদি প্রতিপাদ্য তত্ত্বকে বিশেষভাবে শিষ্যের মনে জাগরূক করিবার উদ্দেশ্যেই রামানুজ অনুমানগুলির পুনরুক্তি করিয়া থাকেন, তবে বিবরণের স্বপক্ষে আমরাও বলিব যে, ভাববাচী বস্তুশব্দের প্রয়োগের দ্বারা বিবরণোক্ত ভাবরূপ অবিদ্যার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও শিষ্যবুদ্ধির বৈশদ্য সম্পাদনের জন্য সাধ্যোক্ত বিশেষণ পদগুলির প্রয়োগ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ বৈশেষিকোক্ত সপ্ত পদার্থের মধ্যে অভাবেরও পরিগণনা থাকায়, শিষ্যের মনে অভাবেরও বস্তুত্বশঙ্কা জাগিতে পারে বুঝিয়াই, বিবরণকার তদীয় অনুমানের সাধ্যের অঙ্গে 'প্রাগভাবব্যতিরিক্ত' প্রভৃতি বিশেষণগুলি জুড়িয়া দিয়াছেন মনে করা কিছু অস্বাভাবিক নহে।

বিবরণোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে আচার্য রামানুজের অনুপপত্তি ও তাহার পরিহার পরীক্ষা করা গেল। সম্প্রতি মাধ্ব তার্কিক ব্যাসরাজের অনুপপত্তি ও তাহার খণ্ডনযুক্তি আলোচনা করা যাইতেছে। ব্যাসরাজ আলোচ্য অনুমানের বিরুদ্ধে নিম্নোদ্ধৃত সৎপ্রতিপক্ষ বা বিরোধী অনুমান উদ্ভাবন করিয়া, বিবরণোক্ত অনাদি ভাবরূপ অবিদ্যার অনুমান যে দোষকলুষিত এবং গ্রহণযোগ্য নহে, তাহাই প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিবরণোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে মাধ্বের অনুপপত্তি

ব্যাসরাজোক্ত ১ম অনুমান :—

অনাদিভাবত্ব বা অভাববিলক্ষণত্ব (পক্ষ),

নিবর্তনীয় কোনও বস্তুতে থাকে না—[ন নিবর্ত্যনিষ্ঠম্] (সাধ্য),

যেহেতু অনাদিভাবত্ব কেবল অনাদি ভাববস্তুতেই থাকে। অভাবের যাহা বিলক্ষণ তাহাও অভাবের বিলক্ষণ পদার্থেই থাকে, অন্যত্র থাকে না—(হেতু) যেমন আত্মা (দৃষ্টান্ত)। আত্মত্ব অনাদি ভাববস্তু, অভাবেরও তাহা বিলক্ষণ বটে, এইজন্যই আত্মা নিবর্তনীয়ও নহে। অবিদ্যা অনাদি ভাববস্তু হইলে, কিংবা অভাবের বিলক্ষণ হইলে, অবিদ্যা আত্মার ন্যায় অনিবর্তনীয় হইবে সন্দেহ নাই।[১]

২য় অনুমান—ব্যাসরাজের দ্বিতীয় অনুমানটি প্রথম অনুমানেরই রকমান্তর। দ্বিতীয় অনুমানে ব্যাসরাজ বলেন, নিবর্তনীয় বা নিবর্ত্যত্ব (পক্ষ), অনাদি ভাববস্তুতে বা অভাব বিলক্ষণ বস্তুতে থাকে না. নিবর্তনীয় বস্তুতেই কেবল থাকে—(সাধ্য), যেমন প্রাগভাব (দৃষ্টান্ত)।

১। অনাদিত্বে সতি ভাবত্বম্ অভাববিলক্ষণত্বং বা ন নিবর্ত্যনিষ্ঠম্, অনাদিভাবমাত্রবৃত্তিধর্মত্বাৎ, অনাদ্যভাববিলক্ষণমাত্রবৃত্তিত্বাদ্বা, আত্মত্ববৎ।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬৬ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

প্রাগভাব প্রতিযোগীর জ্ঞানোদয়ে বিনষ্ট (নিবর্তিত) হয় এবং ঘটপ্রমুখ জন্য বস্তুতেই প্রাগভাব থাকে। আত্মা প্রভৃতি অনাদি ভাববস্তু বা অভাববিলক্ষণ বস্তুতে [জ্ঞান]নিবর্ত্যত্ব থাকে না। [নিবর্ত্যত্বং ন অনাদিভাবনিষ্ঠম্, অনাদ্যভাববিলক্ষণনিষ্ঠং নেতি বা, নিবর্ত্যমাত্রবৃত্তিত্বাৎ, প্রাগভাবত্ববৎ] অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬৬ পৃঃ।

৩য় অনুমান :—অনাদিত্ব (পক্ষ), কোনরূপ আবরণে থাকে না—(সাধ্য) অনাদিত্ব অনাদি পদার্থেই কেবল থাকে (হেতু), যেমন প্রাগভাব। প্রাগভাবে অনাদিত্ব আছে, অথচ প্রাগভাব কাহারও আবরণ নহে (দৃষ্টান্ত)।

[অনাদিত্বম্, নাবরণনিষ্ঠম্, অনাদিমাত্রবৃত্তিত্বাৎ, প্রাগভাবত্ববৎ]

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬৬ পৃঃ।

৪র্থ অনুমান :—প্রমাণজ্ঞান (পক্ষ), জ্ঞানবিধায়, জ্ঞানত্বাৎ (হেতু), অনাদি অভাব ব্যতীত অপর কোনও অনাদির নিবর্তক হয় না—(সাধ্য), যেমন ভ্রমজ্ঞান (দৃষ্টান্ত)। ভ্রমজ্ঞান ঐ জ্ঞানের প্রাগভাবের নিবৃত্তি করিয়াই উদিত হয়, প্রাগভাব ব্যতীত অন্য কোনও অনাদির নিবৃত্তি সাধন করে না। সেই দৃষ্টান্তে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, যেখানে প্রমাণমূলে জ্ঞানের উদয় হয়, সেই খানেই ঐ জ্ঞান জ্ঞানের পূর্বকালীন অনাদি অভাবকে নিবৃত্ত করিয়াই উৎপন্ন হয়, অনাদি অভাব ভিন্ন অপর কোনও অনাদির নিবৃত্তি সাধন করিয়া উদিত হয় না।

[প্রমাণজ্ঞানম্. অনাদ্যভাবান্যানাদ্যনিবর্তকম্, জ্ঞানত্বাৎ, ভ্রমবৎ]

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬৬ পৃঃ।

উল্লিখিতরূপে মাধ্বপণ্ডিত ব্যাসরাজ বিরোধী (সৎপ্রতিপক্ষ) বিবিধ অনুমানের উদ্ভাবন করিয়া, বিবরণোক্ত ভাবরূপ অনাদি অজ্ঞানের বিরুদ্ধে যে আপত্তি (অনুপত্তি) প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার খণ্ডনে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, ব্যাসরাজের প্রথম অনুমান অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। কারণ অনাদি ভাবত্ব নিবর্তনীয় পদার্থে না থাকিলেও, যাহা ভাবরূপ নহে [ভাববিলক্ষণ] সেই অবিদ্যায় নিবর্তনীয়ত্ব থাকিতে অর্থাৎ সেই ভাববিলক্ষণ অবিদ্যার সত্য জ্ঞানোদয়ে নিবৃত্তি হইতে বাধা কি?[১] আলোচিত মাধ্ব অনুমান 'ভাববস্তুর নিবৃত্তি হয় না' ইহাই কেবল সাধন করে, ভাববিলক্ষণ বস্তুর নিবৃত্তি হয় না, এমন কথা তো বলে না। সুতরাং ঐ মাধ্ব অনুমানকে অদ্বৈতমতের বিরোধী কিরূপে

মাধ্বোক্ত অনুপপত্তির খণ্ডন

১। অনাদি ভাবত্বস্য নিবর্ত্যাবৃত্তিত্বেঽপ্যবিদ্যায়া ভাববিলক্ষণায়া নিবর্ত্যত্বোপপত্তে-রাদ্যানুমানেনাবিরোধশ্চ।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬৬ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

বলা যায়? ব্যাসরাজোক্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থানুমান উপাধি-কলুষিত সুতরাং গ্রহণের অযোগ্য[১]।

চৈত্রসম্পর্কে উদিত প্রমাণ-জ্ঞান ঐ জ্ঞানের প্রাগভাবের অতিরিক্ত অনাদির (অজ্ঞানের) নিবর্তক হইয়া থাকে বলিয়া চিৎসুখের অনুমানে যে সাধ্যের নির্দেশ করা হইয়াছে। ঐ সাধ্যরহস্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, সাধ্যকে শুধু অনাদির নিবর্তক বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে প্রাগভাবে ব্যভিচার হয় এবং অনুমানের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়। এইজন্যই প্রাগভাবের অতিরিক্ত অনাদির নিবর্তক বলিয়া সাধ্যকে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, প্রতিবাদী মাধ্ব তো প্রমাণমূলে উৎপন্ন জ্ঞানকে অভাবের অতিরিক্ত অনাদির নিবর্তক বলিয়া স্বীকার করেন না। অতএব প্রতিবাদীর দৃষ্টিতে সাধ্যের অংশে অপ্রসিদ্ধ বিশেষণতার আপত্তি আসে। দ্বিতীয়তঃ আত্মপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পরমাত্মার কোনরূপ আবরণ না থাকায়, সেক্ষেত্রেও "সাধ্যাপ্রসিদ্ধি" দোষ অনিবার্য ভাবেই দেখা দেয়। এইজন্যই প্রমাণজ্ঞানকে চৈত্রগত বা চৈত্রের সম্পর্কে উৎপন্ন প্রমাণজ্ঞান, এইভাবে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। চিৎসুখাচার্যের অনুমানের দৃষ্টান্ত মৈত্রপ্রমায়, চৈত্রপ্রমার প্রাগভাবের অতিরিক্ত অনাদিনিবর্তকত্বরূপ সাধ্য না থাকায় সাধ্যবৈকল্যদোষ অপরিহার্য হয়। এইরূপ প্রতিবাদীর আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, প্রতিবাদীর দৃষ্টিতে সাধ্যের বিচার করিলে পর্বতে বহ্নির অনুমানে মহানসের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়া থাকে, সেখানেও মহানসে পর্বতীয় বহ্নি না থাকায়, মহানসের দৃষ্টান্তেও সাধ্যবৈকল্যের আপত্তি আসে। এইজন্য সেই সকল ক্ষেত্রে যেমন পর্বতীয় বিশেষণ ত্যাগ করিয়া, শুধু বহ্নিমান্‌রূপেই সাধ্যকে বুঝিতে হইবে, আলোচ্য ক্ষেত্রেও সেইরূপ চৈত্রগত প্রভৃতি বিশেষণ ত্যাগ করিয়াই সাধ্যের বিচার করিতে হইবে। ফলে, চৈত্রগত অনাদি নিবর্তকত্ব মৈত্রে না থাকিলেও, চৈত্র-বিশেষণরহিত (প্রমার প্রাগভাবের অতিরিক্ত) অনাদি নিবর্তকত্ব মৈত্র-প্রমাতেও থাকিবে। সুতরাং দৃষ্টান্তে সাধ্য-বৈকল্যের আপত্তি সেক্ষেত্রে চলিবে না[২]।

চিৎসুখাচার্য, অমলানন্দ ও বাচস্পতির অনুমানের বিরুদ্ধে মাধ্বের আপত্তি ও তাহার খণ্ডন

১। দ্বিতীয়েত্বনাশ্রিতমাত্রবৃত্তিত্বমুপাধিঃ। তৃতীয় চতুর্থয়োঃ সকল নিবর্ত্যাবৃত্তিত্বমুপাধিঃ। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬৬ পৃঃ।

ঐ সকল অনুমান কিরূপে উপাধিদোষে কলুষিত হইল তাহা জানিবার জন্য অনুসন্ধিৎসু পাঠক অদ্বৈতসিদ্ধির 'অবিদ্যানুমানোপপত্তিঃ' পরিচ্ছেদ দেখুন।

২। চৈত্রগতত্বং চ নানাদের্বিশেষণম্; মৈত্রপ্রমায়াশ্চৈত্রনি[illegible]ভাবেন দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যাপাতাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬৬ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং। চিৎসুখী ও নয়নপ্রসাদিনী নির্ণয়সাগর সং, ৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বেদান্তকল্পতরুতে অমলানন্দস্বামী কর্তৃক প্রদর্শিত অবিদ্যার অনুমান চিৎসুখের অনুমানেরই অনুরূপ। উপরের আলোচনায় চিৎসুখের অনুমান নির্দোষ প্রতিপন্ন হওয়ায়, অমলানন্দের অনাদি ভাবরূপ অবিদ্যার অনুমানেও যে কোনরূপ দোষস্পর্শ নাই তাহা সুধী সহজেই বুঝিতে পারেন।

ভ্রমের উপাদানরূপে পূর্বে অবিদ্যার যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার সমর্থনে—

"বিভ্রমঃ এতজ্জনকাবাধ্যাতিরিক্তোপাদনকঃ" অর্থাৎ বিভ্রম এইরূপ বিভ্রমের জনক বাধ্য অবিদ্যামূলে উৎপন্ন। এইরূপে যে অনুমানের প্রযোগ প্রদর্শন করা হইয়া থাকে, সেই অনুমানের বিরুদ্ধে সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানের অবতারণা করিয়া প্রতিবাদী মাধ্ব বলেন,

'বিভ্রমঃ এতজ্‌জ্ঞানজনকবাধ্যাতিরিক্তোপাদনকঃ বিভ্রমত্বাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬৭ পৃঃ। প্রতিবাদী মাধ্বের এইরূপ সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদী বলেন, প্রতিবাদী মাধ্বের মতে বাধ্যবস্তু কদাচ কাহারও উপাদান হয় না। এই অবস্থায় প্রতিবাদীর অনুমানের সাধ্যের অংশে 'বাধ্য' পদের প্রয়োগের কোনই সার্থকতা নাই। ঐরূপ পদের প্রয়োগের ফলে 'সাধ্যাপ্রসিদ্ধি' দোষই প্রতিবাদীর অনুমানে দেখা দিবে। দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য সৎপ্রতিপক্ষ অনুমান অদ্বৈতবেদান্তীর দৃষ্টিতে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসই হইবে না। কেননা, অদ্বৈতবাদী অবাধ্য শুদ্ধ ব্রহ্ম এবং বাধ্য অবিদ্যা এই উভয়কেই দৃশ্যমান বিশ্বের উপাদান কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রহ্ম বিশ্ব-প্রপঞ্চের অপরিণামী উপাদান বা বিবর্তকারণ। বাধ্য অবিদ্যা বিশ্বের পরিণামী উপাদান। উপাদান-কারণ অদ্বৈতবেদান্তে এই দুই প্রকার। এরূপ অবস্থায় জন্যবস্তু-মাত্রকেই অবাধ্যাতিরিক্ত অর্থাৎ বাধ্য অবিদ্যোপাদানক, কিংবা বাধ্যাতিরিক্ত বা অবাধ্য ব্রহ্মোপাদনক বলিলে, তাহাতে অদ্বৈতবেদান্তীর আপত্তির কোন কারণ ঘটে না।[1]

প্রমা প্রমার অভাবের অতিরিক্ত অনাদির নিবর্তক, যেহেতু উহা কার্য বা জন্য, যেমন ঘট। [প্রমা, প্রমাঽভাবাতিরিক্তস্য অনাদের্নিবর্তিকা কার্যত্বাৎ ঘটবৎ] অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬৭ পৃঃ]

আলোকের ন্যায় অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশক হইয়া থাকে বলিয়াই জ্ঞান জ্ঞানের বিষয়ের যাহা আবরক তাহার নিবৃত্তি সাধন করিয়া থাকে।[2]

১। নচ·········সৎপ্রতিপক্ষ ইতি বাচ্যম্; বাধ্যস্য ত্বন্মতেঽজনকত্বাৎ সাধ্যাপ্রসিদ্ধেঃ, ব্রহ্মাবিদ্যোভয়োপাদনকত্বেনাবিরোধশ্চ।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬৭ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

২। জ্ঞানত্বং, স্ববিষয়াবরণনিবর্তকনিষ্ঠম্, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশবৃত্তিত্বাৎ, আলোকত্ববৎ।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৬৭ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

এইরূপ আরও বহুবিধ অনুমানের প্রয়োগ করিয়া আচার্য মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রেত ভাবরূপ অনাদি অবিদ্যা প্রমাণ করিয়াছেন।

অবিদ্যায় শ্রুতি এবং অর্থাপত্তিপ্রমাণ

বিভিন্ন শ্রুতির উক্তি এবং অর্থাপত্তি-প্রমাণও যে ভাবরূপ অবিদ্যা সমর্থন করে এবং উল্লিখিত প্রত্যক্ষ এবং অনুমান-প্রমাণের ভিত্তি সুদৃঢ় করে, তাহাও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্যক। ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, কৃষিক্ষেত্রের উপরে সতত বিচরণ করিয়াও অজ্ঞ কৃষক যেমন ক্ষেত্রের অন্তর্নিহিত সোনার সন্ধান পায় না, সেইরূপ প্রজাবর্গ সুষুপ্তি অবস্থায় প্রতিদিন ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়াও অজ্ঞানের আবরণে উহাদের সত্যদৃষ্টি আবৃত থাকায়, 'অনৃতেন প্রত্যূঢ়াঃ' পরব্রহ্মকে জানিতে পারে না।[১] ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত অনৃত শব্দে যে ভাবরূপ অজ্ঞানকেই বুঝায়, তাহা আচার্য মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে [৫৭০ পৃঃ অজ্ঞানবাদে শ্রুত্যুপপত্তি পরিচ্ছেদে] বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। কর্ম, অদৃষ্ট প্রভৃতির দৃশ্য বিষয়কে আবরণ করার ক্ষমতা নাই। জীবের সুষুপ্তি অবস্থায় কর্ম, কর্মফল প্রভৃতি সমস্তই সাময়িক বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন ব্রহ্মশক্তি অনাদি অজ্ঞানই কেবল বিরাজ করে। ঐ অজ্ঞান ভাবরূপ বিধায় তাহারই জ্ঞেয় বস্তুকে ঢাকিয়া রাখিবার সামর্থ্য আছে। অন্য কাহারও সেই সামর্থ্য নাই। এইজন্য আলোচ্য ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে ভাবরূপ অনাদি অজ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই অজ্ঞানই 'নীহারেণ প্রাবৃতাঃ', 'তম আসীৎ', 'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ' 'অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্', 'অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ', প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যে নীহার, তমঃ, মায়া, প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দে উক্ত হইয়াছে।

'ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ'। 'মায়ামেতাং তরন্তি তে', এই সকল শ্রুতির উক্তিতে মায়া বা অজ্ঞান যে ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য তাহাও স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। জ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করিয়াই উদিত হয়।

১। তদ্‌যথা হিরণ্যং নিধিনিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্যুপরি সংচরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন প্রত্যূঢ়াঃ।

ছান্দোগ্য উপঃ ৮ম অধ্যায়, ৩।২।

সুতরাং শ্রুত্যুক্ত মায়া প্রভৃতি শব্দে যে ভাবরূপ অজ্ঞানকেই বুঝায়, তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই।

'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ', জীব ও শিব অভিন্ন, ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের মর্ম। পরব্রহ্ম বা পরমশিব সচ্চিদানন্দস্বরূপ। জীবও সুতরাং সত্যস্বরূপ, আনন্দময়, অমৃতময় সন্দেহ নাই। এইরূপ অমৃতময় জীব সংসারের আগুনে জ্বলিয়া মরে কেন? অমৃতের সন্তান প্রতিদিন মরণের কোলে ঢলিয়া পড়ে কেন? এই 'কেন'র একমাত্র উত্তর, জীব যে শিবস্বরূপ সংসারের মায়ায় সেকথা সে ভুলিয়া যায়, জীব ও শিবের মধ্যে বিভেদের যবনিকা টানিয়া দিয়া, সংসারে শোক ও মোহের অধীন হয়। এই বিভেদের যবনিকা অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞান ব্যতীত অপর কিছু নহে। ঐরূপ অজ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য। শুক্তিতে রজতবিভ্রমের, পরব্রহ্মে জগদ্‌বিভ্রমের উপাদান-কারণ এই ভাবরূপ অজ্ঞান। ভ্রমের উপাদানরূপেই যে অজ্ঞানের পরিচিতি, তাহা আমরা অজ্ঞানের লক্ষণবিচার প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই বিভ্রমের উপাদান হইতে পারে না। জীবের অন্তঃকরণ সাদি, সে অনাদি জগদ্‌বিভ্রমের উপাদান হয় না, হইতে পারে না। পরব্রহ্ম অপরিণামী বিধায়, তাহাকেও বিশ্বের পরিণামী উপাদান কল্পনা করা চলে না। বিবর্তের অধিষ্ঠান শুক্তিরজত প্রভৃতিও উপাদান হয় না। অবিদ্যা ব্যতীত—"অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা"রূপ বিবর্তও সম্ভবপর হয় না। সুতরাং ভ্রমের উপাদানের অন্যথা অনুপপত্তিও ভাবরূপ অবিদ্যার অন্যতম প্রমাণ বলিয়া জানিবে—"ভ্রমস্য সোপাদানত্বান্যথানুপপত্তিরপি অবিদ্যায়াং প্রমাণম্"। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৭৩ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

ভাবরূপ অবিদ্যা প্রমাণসিদ্ধ ইহা বুঝা গেল। এই অবিদ্যাকে অনির্বাচ্য বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তী যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ঐ সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিসহ তাহাই এখানে আলোচনা করা যাইতেছে। এই অবিদ্যাই জগজ্জননী মহাশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি। মায়া, প্রকৃতি, প্রধান প্রভৃতি শব্দ এই ব্রহ্মশক্তিরই নামান্তর। এই শক্তি ব্যতীত বিচিত্র জগচ্চিত্র রচনা করিবে কে? এইজন্য বিশ্বপ্রসবিনী এই মহাশক্তি কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সকল দার্শনিকই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই ব্রহ্মশক্তি সম্পর্কে কাহারও কোনরূপ বিবাদ নাই। যত বিবাদ ঐ

অনির্বচনীয়ত্বানুপপত্তি ও তাহার খণ্ডন

'অনির্বাচ্য' সিদ্ধান্ত লইয়া। অনির্বাচ্য বস্তুর দার্শনিক চিন্তাজগতে কোন স্থান আছে কি না? অনির্বাচ্যের লক্ষণনিরূপণ সম্ভবপর কি না? উহা প্রমাণসিদ্ধ কি না? এই সকল বিষয় লইয়াই কর্ণবিদারী বিবাদের ঝড় উঠিয়াছে। 'অনি[illegible]নুপপত্তি' প্রসঙ্গে আচার্য রামানুজ শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন, প্রতীতি বা উপলব্ধিই হইল দার্শনিক পদার্থ কল্পনার ভিত্তি। পদার্থের মধ্যে কতকগুলি সৎ (সত্য) রূপে, কতকগুলি অসৎ (অসত্য) রূপে প্রতীতির গোচর হইয়া থাকে। ভাব ও অভাব, সৎ ও অসৎ এই দুইপ্রকার পদার্থেরই পরিচয় পাওয়া যায়। 'সর্বাচ প্রতীতিঃ সদসদাকারা।' শ্রীভাষ্য, ১৭০ পৃঃ। পদার্থ হয় সত্য হইবে, নতুবা অসত্য হইবে। সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে, এইরূপ পদার্থ কিরূপে কল্পনা করা যায়? মাধ্বতার্কিক ব্যাসরাজও রামানুজোক্ত যুক্তি অনুসরণ করিয়া, আলোচ্য অনির্বাচ্যবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। রামানুজ প্রভৃতির অভিমত পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, রামানুজ সৎ ও অসৎ শব্দের যে বাচ্য-অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, অদ্বৈতবেদান্তী সেই অর্থ (বাচ্যতা) গ্রহণ করেন নাই। রামানুজের মতে সদ্‌ভিন্নমসৎ, অসদ্‌ভিন্নং সৎ, যাহা সৎ নহে, সদ্‌ভিন্ন তাহাই অসৎ, এবং যাহা অসৎ নহে, অর্থাৎ অসদ্‌ভিন্ন তাহাই সৎ বা সত্য। রামানুজস্বামী সত্য ও অসত্যের is and is not এইরূপ পরস্পর বিরহ ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীর মতে সৎশব্দে পরমার্থসৎ পরব্রহ্মকে বুঝায়, অসৎশব্দে অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতিকে বুঝায়। অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে সৎ ও অসৎশব্দ গোত্ব এবং গোত্বাভাবের মত, is ও is not এর মত পরস্পর বিরহব্যাপক নহে। ইহারা গোত্ব ও অশ্বত্বের ন্যায় পরস্পর বিরহব্যাপ্য (these two cannot co-exist).[১] সৎ ও অসৎ গোত্ব এবং অশ্বত্বের ন্যায় একত্র থাকে না, তবে গজত্বে গোত্ব ও অশ্বত্ব এই উভয়েরই অভাব থাকে। পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বপ্রপঞ্চ পরব্রহ্মের ন্যায় সত্যও নহে, আকাশকুসুমের ন্যায় অলীকও নহে। এইজন্য বিশ্বপ্রপঞ্চে সৎ এবং অসৎ, এই উভয়েরই অভাব পাওয়া যায়। এইরূপ প্রপঞ্চকেই অদ্বৈতবেদান্তের পরিভাষায় অনির্বাচ্য বলা হইয়াছে। এই প্রপঞ্চ এবং উহাদের মূল অবিদ্যা সত্যব্রহ্মও নহে, অসৎ আকাশকুসুমও নহে। ফলে, প্রপঞ্চ সদসৎও নহে, সদসদ্‌ভিন্নও নহে।

১। স[illegible] য়োন পরস্পরবিরহরূপত্বম্, কিন্তু পরস্পরবিরহব্যাপ্যতামাত্রম্।
অদ্বৈতসিদ্ধি, ৬২২ পৃঃ নির্ণয় সাগর সং।

চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত, ইহাই অনির্বাচ্যত্বের পরিচয়। এইরূপ পরিচয়মূলেই অদ্বৈতসিদ্ধিতে মধুসূদন সরস্বতী ব্যাসরাজের আপত্তির বিরুদ্ধে অনির্বাচ্যত্বের নিম্নোক্ত লক্ষণ নির্বচন করিয়াছেন :—

"সদ্বিলক্ষণত্বে সতি অসদ্বিলক্ষণত্বে সতি সদসদ্বিলক্ষণত্বম্'।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৬২১ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং।

সতের বিলক্ষণ ও অসতের বিলক্ষণ হইয়া, যাহা সদসতেরও বিলক্ষণ হয়, তাহাই অনির্বাচ্য বলিয়া জানিবে।

অনির্বাচ্যকে সত্য ও অসত্য বলিয়া কিংবা সদসদ্ বলিয়া বিচার করা যায় না। সুতরাং "সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাং বিচারাসহত্বে সতি সদসত্ত্বেন বিচারাসহত্বম্।" এইরূপ অনির্বচনীয়ের লক্ষণ নির্বচনও দোষাবহ নহে। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৬২১ পৃঃ।

অনির্বাচ্য অবিদ্যায় প্রমাণ কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতিই অনির্বাচ্য অবিদ্যায় প্রমাণ হইয়া থাকে।

অনির্বাচ্য অবিদ্যায় প্রমাণ

শুক্তিরজত, রজ্জুসর্প প্রভৃতি স্থলে শুক্তি প্রভৃতি আধারে মিথ্যা রজতের যে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ঐরূপ প্রত্যক্ষই অনির্বাচ্য অবিদ্যায় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। শুক্তির জ্ঞানোদয়ে রজত যখন তিরোহিত হয়, তখন 'মিথ্যৈব রজতমভাৎ', এতকাল পর্যন্ত আমার দৃষ্টিতে মিথ্যা রজতেরই ভাতি হইয়াছিল, এইরূপে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানোদয় হয়, সেখানে মিথ্যা শব্দে অনির্বচনীয় রজতকেই বুঝায়। এই মিথ্যা-রজত আকাশকুসুমের ন্যায় অলীকবস্তু নহে, সুতরাং উহা অসৎও নহে, আবার ধ্রুবসত্যও নহে। সৎ ও অসৎ উভয়েরই উহা বিলক্ষণ বা বিসদৃশ। সুতরাং সদসতেরও উহা বিলক্ষণ। অতএব ঐরূপ রজত যে অনির্বাচ্য হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

নিম্নে প্রদর্শিত অনুমানও মিথ্যারজত প্রভৃতি যে অনির্বাচ্য তাহা প্রমাণিত করে।

বিমতং (পক্ষ) সত্ত্বরহিতত্বে সতি অসত্ত্বরহিতত্বে সতি সত্ত্বাসত্ত্বরহিতম্ (সাধ্য), বাধ্যত্বাদ্দোষপ্রযুক্তভানাদ্বা (হেতু), যন্নৈবং তন্নৈবং (ব্যতিরেক ব্যাপ্তি), যথা ব্রহ্ম (দৃষ্টান্ত)। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৬২৭ পৃঃ।

বিবাদগোচর মিথ্যা শুক্তিরজত প্রভৃতি সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে। সুতরাং শুক্তিরজত প্রভৃতি অনির্বাচ্য। যেহেতু উহা অধিষ্ঠান শুক্তি প্রভৃতির

জ্ঞানোদয়ে বাধিত হয় এবং দোষবশতঃই মিথ্যারজত প্রভৃতির ভাতি হইয়া থাকে। যাহা অনির্বাচ্য নহে তাহা কদাচ বাধিত হয় না, সেই বস্তুর ভাতি বা প্রকাশের মূলে কোনরূপ দোষও বিরাজ করে না, যেমন শুদ্ধ নির্বিশেষ পরব্রহ্ম। মিথ্যা শুক্তিরজত যেমন অনির্বাচ্য, তথাকথিত সত্য রজত এবং উহাদের মূল অবিদ্যাও অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তে অনির্বাচ্য। সুতরাং আলোচ্য অনুমানে সপক্ষ দৃষ্টান্ত সম্ভবপর নহে বলিয়াই ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের উপন্যাস করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ অনুমানই অনির্বাচ্যত্বে প্রমাণ বলিয়া জানিবে—'তস্মাদনুমানমত্রপ্রমাণম্'। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৬২৯ পৃঃ।

রামানুজ ও শঙ্কর মতের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে, যাহা সৎ নহে, তাহাই অসৎ, যাহা অসৎ নহে তাহাই সৎ, এই দৃষ্টিতেই রামানুজস্বামী সৎ ও অসৎ শব্দের অর্থ বা বাচ্যতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে পদার্থ হয় সৎ হইবে, না হয় অসৎ হইবে। সদ্‌ভিন্নম্ অসৎ, অসদ্‌ভিন্নং সৎ; সৎ ও অসতের একের নিষেধ হইলেই অপরের সত্যতা অবশ্যম্ভাবী হইবে। সেরূপ ক্ষেত্রে সৎ ও অসৎ ব্যতীত, সৎ ও অসতের বিলক্ষণ অনির্বাচ্য বস্তুর পরিকল্পনা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং রামানুজের দৃষ্টিতে অনির্বাচ্যতাবাদের বিরুদ্ধে অনুপপত্তি বা দোষ প্রদর্শন অহেতুক নহে। অদ্বৈতবাদী সৎ ও অসতের যে অর্থ বা বাচ্যতা তদীয় দর্শনে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মতে সৎ ও অসতের বিলক্ষণ অনির্বাচ্য বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। সৎ শব্দে পরম সৎ ব্রহ্মকে, অসৎ শব্দে যাহা ইদংরূপে প্রতীতির যোগ্য নহে, সেইরূপ অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতিকে গ্রহণ করিলে, ইদংরূপে প্রতীতির যোগ্য শুক্তিরজত বা ব্যাবহারিক সত্যরজত প্রভৃতি প্রপঞ্চ যাহা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক নহে, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে ধাবিত হয় বলিয়া বাস্তব সত্যও নহে; সতেরও বিলক্ষণ, অসতেরও (আকাশকুসুম প্রভৃতির) বিলক্ষণ প্রপঞ্চকে সৎ ও অসৎরূপে নির্বচনের অযোগ্য, অনির্বাচ্য বলিতে বাধা কি? সৎ বা সত্যরূপে খ্যাতি (প্রকাশ) এবং যথার্থ জ্ঞানোদয়ে বাধ (নিবৃত্তি বা তিরোধান) ঘটে বলিয়া, প্রাতিভাসিক শুক্তি-রজত প্রভৃতি এবং উহাদের মূল অবিদ্যা যে অনির্বচনীয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই প্রতীতি ও বাধ অন্য কোনও প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না বলিয়া, অর্থাপত্তি প্রমাণও অনির্বাচ্যতা সমর্থন করে।—অর্থাপত্তিরপি

খ্যাতিবাধান্যথানুপপত্তিরূপা তত্র প্রমাণম্। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৬৩০ পৃঃ। . ঐরূপ অর্থাপত্তির মূলে অনুমানই বিরাজ করে।—বিবাদাস্পদ শুক্তিরজত প্রভৃতি যদি সত্য হইত, তবে বাধিত হইত না, যদি অসৎ হইত, তাহা হইলে উহাদের প্রতীতিই হইত না, বাধিতও হয়, প্রতীতিরও গোচর হয়। সুতরাং সৎ ও অসতের বিলক্ষণ শুক্তি-রজত প্রভৃতি অনির্বচনীয়ই বটে।[১] এই অনির্বচনীয় অবিদ্যায়—"নাসদাসীন্নোসদাসীৎ", "তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতম্", ইত্যাদি নাসদীয়সূক্তও প্রমাণ বলিয়া জানিবে। রামানুজ ও শঙ্করের মতে সৎ ও অসতের অর্থের (বাচ্যতার) ভেদ স্বীকার করায়, অনির্বাচ্যত্বের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্যের অনুপপত্তি শঙ্করমতকে স্পর্শ করে না। উভয়মতে সৎ ও অসতের একরূপ অর্থ বা বাচ্যতা গ্রহণ করিলেই, অনির্বাচ্যতাবাদের বিরুদ্ধে রামানুজের অনুপপত্তি কার্যকরী হইত, ইহা সুধী পাঠক লক্ষ্য করিবেন।*

আশ্রয়ত্বানুপপত্তি ও তাহার খণ্ডন

বিবরণোক্ত ভাবরূপ অবিদ্যার অনুমানের বিরুদ্ধে আচার্য রামানুজ যে নয়টি প্রতিপক্ষ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। উহার প্রথম এবং চতুর্থ অনুমানে "অজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্রব্রহ্মাশ্রয়ম্, জ্ঞাত্রাশ্রয়ং হিতৎ" (১ম অনুমান), "ব্রহ্ম ন অজ্ঞানাস্পদং জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ"। (৪র্থ অনুমান), ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না, জ্ঞাতাই অজ্ঞানের আশ্রয় হইয়া থাকে, এইরূপে রামানুজস্বামী যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহার খণ্ডনে আমরা (৩৮৮ পৃঃ) দেখাইয়াছি, জ্ঞাতা অজ্ঞানের আশ্রয় হইয়া থাকেন, ইহা মণ্ডন মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অদ্বৈতবেদান্তীরই সিদ্ধান্ত। অবিদ্যার আশ্রয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মণ্ডন ও বাচস্পতি

১। বিমতং রূপ্যাদি সচ্চেন্ন বাধ্যেত, অসচ্চেন্ন প্রতীয়েত, বাধ্যতে প্রতীয়তেঽপি, তস্মাৎ সদসদ্‌বিলক্ষণত্বাদনির্বচনীয়ম্।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৬৩০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

* শঙ্করের অনির্বাচ্যতাবাদ সম্পর্কে আমরা ইহার পরবর্তী পরিচ্ছেদে জগতের মিথ্যাত্বনির্ণয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানের আলোচনা আমরা সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলাম। জিজ্ঞাসু পাঠক পরবর্তী পরিচ্ছেদের আলোচনা দেখিবেন

বলেন, জীবের ব্রহ্মসম্পর্কে অজ্ঞান দেখা যায়। সুতরাং অজ্ঞানের আশ্রয় জীব, বিষয় ব্রহ্ম, এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। অবিদ্যা ব্রহ্মশক্তি। এই শক্তির সহায়তায় ব্রহ্ম মহেশ্বররূপ পরিগ্রহ করিয়া সৃষ্টিলীলায় প্রবৃত্ত হন। এই অবস্থায় অবিদ্যা বা মায়াকে পরমেশ্বরাশ্রিত বলিতেও কোন বাধা নাই। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"। ইহাও অদ্বৈতবেদান্তেরই সিদ্ধান্ত। জীব অবিদ্যারই সৃষ্টি; ঈশ্বরও মায়াকল্পিত। অবিদ্যা বা মায়া-কল্পিত জীব ও ঈশ্বর অবিদ্যার আশ্রয় হইবেন কিরূপে? ব্রহ্মের ঈশ্বর বা জীবভাবে অবিদ্যাই তো কারণ। কারণ তো কার্যের পূর্বে বিদ্যমান থাকে। নিয়তপূর্ববর্তী না হইলে, তাহাতো কারণই হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর বা জীব যেমন স্বীয় ঈশ্বরত্ব এবং জীবত্বের জন্য অবিদ্যাকে অপেক্ষা করে, অবিদ্যা বা মায়াও সেইরূপ স্বকীয় আশ্রয়ের জন্য ঈশ্বর বা জীবকে অপেক্ষা করে। ফলে, "অন্যোন্যাশ্রয়" দোষ অনিবার্যরূপেই দেখা দেয়। তারপর, ঈশ্বর বা জীবভাবের কারণ অবিদ্যা নিরাধারে অবস্থান করিতে পারে না বলিয়া, যদি সেখানে তাহার আশ্রয়রূপে জীব বা ঈশ্বরের কল্পনা করিতে হয়, তবে ঐরূপ কল্পনার মূল অবিদ্যারও পুনরায় আশ্রয়কল্পনার আবশ্যকতা দেখা দিবে এবং এইরূপে অনবস্থার প্রশ্নই আসিয়া পড়িবে। উল্লিখিত আপত্তির উত্তরে বাচস্পতি প্রভৃতি বলেন, বীজ ও অঙ্কুরের অনবস্থা যেমন দোষের কারণ হয় না, সেইরূপ অনাদি অবিদ্যা এবং অনাদি জীবের অনবস্থা, অন্যোন্যাশ্রয় প্রভৃতিও দোষের কারণ হইবে না।[১]

এইরূপ উত্তর প্রকাশাত্মযতির হৃদয় স্পর্শ করে নাই।

> "আশ্রয়ত্ববিষয়ত্বভাগিনী নির্বিভাগ চিতিরেব কেবলা।
> পূর্বসিদ্ধতমসোহি পশ্চিমো নাশ্রয়ো ভবতি নাপি গোচরঃ॥"
>
> সং শারীরক, ১।৩১৯

সংক্ষেপশারীরকের এই উক্তিতে অবিচল থাকিয়া বিবরণরচয়িতা প্রকাশাত্ম যতি নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই অবিদ্যার আশ্রয়ও বটে, বিষয়ও বটে, এইরূপ সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। ইহা আমরা পূর্বেই বিবরণোক্ত অনুমানের

১। অজ্ঞানবাদে অবিদ্যায়াঃ সর্বজ্ঞাশ্রয়ত্বোপপত্তিঃ এবং বাচস্পতিসম্মত জীবাশ্রয়-ত্বোপপত্তিঃ দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৮৩-৫৮৫ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

অনুপপত্তির বিচারপ্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। অবশ্য অবিদ্যার বিষয় যে ব্রহ্ম সে-সম্পর্কে সকল অদ্বৈতবেদান্তীই একমত।

অবিদ্যার এই "ব্রহ্মাশ্রয়ত্বানুপপত্তি"র বিরুদ্ধে রামানুজাচার্যের বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে দাঁড়ায় এই যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না। কেননা, জ্ঞান ও অজ্ঞান আলোক ও অন্ধকারের মত পরস্পরবিরোধী পদার্থ। অন্ধকারের নাশক আলোক যেমন অন্ধকারের আশ্রয় হয় না। অজ্ঞানের নাশক বিশুদ্ধ জ্ঞানও সেইরূপ অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না।

রামানুজোক্ত এই অনুপত্তি পরীক্ষা করিলে সুধী পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, রামানুজাচার্য অজ্ঞানকে জ্ঞানের অভাব বলিয়াই বুঝিয়াছেন। ঘট ও ঘটাভাব যেমন এক জায়গায় থাকে না, জ্ঞান এবং জ্ঞানাভাবও সেইরূপ একত্র থাকিতে পারে না। রামানুজস্বামী অজ্ঞান, অবিদ্যা প্রভৃতি শব্দে 'ন'এর বা অকারের প্রয়োগ দেখিয়াই ঐরূপ অনুপপত্তির জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন এবং অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জ্ঞানের প্রাগভাবের অতিরিক্ত অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞান, যাহা প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে অদ্বৈতবেদান্তী নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা রামানুজের অন্তর স্পর্শ করে নাই। এই সত্ত্বরজস্তমো-গুণময়ী ভাবরূপ অবিদ্যাকে জগজ্জননী ব্রহ্মশক্তিরূপে অদ্বৈতবাদী গ্রহণ করিয়াছেন। এই শক্তিই মায়া, প্রকৃতি, প্রধান, তমঃ প্রভৃতি শব্দে বিবিধ দর্শনে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জগৎপ্রসবিনী এই মহাশক্তিকে অভাবরূপ বলা যায় কি? অভাব বিশ্বের পরিণামী উপাদান হইতে পারে কি? সুতরাং রামানুজের অজ্ঞানের ব্যাখ্যা যে গ্রহণযোগ্য নহে তাহা সহজেই বুঝা যায়।*

ব্রহ্মশক্তি অবিদ্যা বা অজ্ঞান যে অভাবরূপ নহে, তাহা বুঝা গেল। এখন কথা এই, অদ্বৈতবেদান্তীর সিদ্ধান্ত অনুসারে 'অবিদ্যা বিদ্যাবিরোধী ভাবরূপ বস্তু', ইহা স্বীকার করিলেই বা বিদ্যাকে বিদ্যাবিরোধী অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয় বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে কিরূপে? তারপর, বিদ্যাই অবিদ্যার ভাসক, অবিদ্যা সাক্ষিভাস্য। যে ভাসক, সে নাশক হইবে কিরূপে?

* আমরা অবিদ্যার "স্বরূপানুপপত্তি"র খণ্ডনে অবিদ্যাশক্তি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, জিজ্ঞাসু পাঠক সেই আলোচনা দেখিবেন।

এইজন্যই জ্ঞানাভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত অজ্ঞানের বিরোধ থাকায়, জ্ঞানময় ব্রহ্মকে কোনমতেই অজ্ঞানের আশ্রয় বলা চলে না—জ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণো বিরোধাদেব নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বম্। শ্রীভাষ্য, ১৬৮ পৃঃ।

রামানুজাচার্যের এইরূপ আপত্তির উত্তরে মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে বলিয়াছেন, জ্ঞান এবং অজ্ঞান আলোক ও অন্ধকারের মত পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও, অজ্ঞানবিরোধী জ্ঞান চৈতন্যমাত্রই নহে, কিন্তু অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্য। ঐ বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে। বৃত্তিপ্রফলিত ঐ চৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় নহে। শুদ্ধ পরব্রহ্ম চৈতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয়। এই আশ্রয় শুদ্ধ চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে।[১] প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞান যদি অজ্ঞানের বিরোধী হয়, তবে জ্ঞানের জ্ঞানত্বই অজ্ঞানের বিরোধিতার হেতু হইবে। শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানেও জ্ঞানত্ব আছে, বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত জ্ঞানেও জ্ঞানত্ব আছে। এই অবস্থায় বৃত্তিপ্রতিফলিত জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী হইবে, শুদ্ধ ব্রহ্ম বিজ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী হইবে না, আশ্রয় হইবে, এইরূপ অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত কিরূপে নির্বিবাদে গ্রহণ করা যায়।[২]

জ্ঞানমজ্ঞানবিরোধি চেৎ স্বয়মেব বিরোধি ভবতীতি নাস্যা ব্রহ্মাশ্রয়ত্ব সম্ভবঃ।—শ্রীভাষ্য, ১৬৭ পৃঃ।

এইরূপ বৈষ্ণববেদান্তীর অনুপপত্তির বিরুদ্ধে স্বীয় সিদ্ধান্তের সমর্থনে অদ্বৈতবাদী বলেন, জ্ঞানের অজ্ঞানবিরোধিতায় জ্ঞানত্বই হেতু নহে, জ্ঞানের বৃত্তিসম্পর্কই হেতু বলিয়া জানিবে। অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিফলনের ফলে জ্ঞানে এক বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং ঐ শক্তির সঞ্চারবশতঃই জ্ঞানে অজ্ঞানবিরোধিতা স্ফূর্তিলাভ করে। এমন কি চরম অদ্বয় ব্রহ্ম-

১। ননু কথং চৈতন্যমজ্ঞানাশ্রয়ঃ; তস্য প্রকাশস্বরূপত্বাৎ, তয়োশ্চ তমঃ প্রকাশবদ্ বিরুদ্ধস্বভাবত্বাদিতি চেন্ন, অজ্ঞানবিরোধি জ্ঞানং হি ন চৈতন্যমাত্রম্, কিন্তু বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতম্; তচ্চ নাবিদ্যাশ্রয়ঃ, যচ্চাবিদ্যাশ্রয়ঃ, তচ্চ নাজ্ঞানবিরোধি।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৭৭ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

২। জ্ঞানস্বরূপংব্রহ্মেতি জ্ঞানমবিদ্যায়া বাধকং, ন স্বরূপভূতং জ্ঞানমিতি চেৎ, উভয়োরপি ব্রহ্মস্বরূপপ্রকাশত্বে সত্যন্যতরস্য অবিদ্যাবিরোধিত্বম্ অন্যতরস্য নেতি বিশেষানবগমাৎ। শ্রীভাষ্য, ১৬৭ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

জ্ঞানের ক্ষেত্রেও 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এই বৃত্তিবোধই ব্রহ্মতিরস্করণী অবিদ্যার বিলয়ের কারণ হইয়া থাকে। অবিদ্যার আশ্রয় এবং ভাসক শুদ্ধচৈতন্য যখন বৃত্তি প্রতিবিম্বিত হয়, তখন তাহাই অজ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটায়। জ্ঞানের অজ্ঞান-নাশকতা-শক্তির সঞ্চার বৃত্তিতে প্রতিবিম্বনের ফলেই আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এইজন্যই অদ্বৈতসিদ্ধান্তে জ্ঞানকে (জ্ঞানত্বকে) অজ্ঞানের নাশক না বলিয়া, জ্ঞানের বৃত্তি সম্পর্ককেই অজ্ঞানের নাশক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। জড় এবং তমঃস্বভাব অজ্ঞানের সহিত স্বপ্রকাশ চৈতন্যের বিরোধ সুস্পষ্ট। যদি মূল ব্রহ্ম চৈতন্যের সহিত অজ্ঞানের বিরোধিতা নাই থাকে, তবে ব্রহ্মচৈতন্য প্রকাশস্বরূপ কি না, এইরূপ আশঙ্কাই স্বাভাবিক নহে কি? প্রতিবাদীর এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে বলিয়াছেন, সূর্যরশ্মি তৃণ তুলা প্রভৃতিকে প্রকাশিত করে। ঐ সূর্যরশ্মি যখন সূর্যকান্ত-মণিতে প্রতিফলিত হইয়া তৃণ তুলা প্রভৃতির উপর পতিত হয়, তখন মণিতে প্রতিফলিত সৌরকিরণ তৃণ, তুলা প্রভৃতিকে দগ্ধ করে। অনুরূপ ভাবেই অজ্ঞানের ভাসক শুদ্ধচৈতন্য যখন অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিফলিত হয়, তখন সেই প্রতিফলিত চৈতন্যই অজ্ঞানকে বিনাশ করে।[১]

জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মশক্তি অবিদ্যার স্বতঃ কোনও বিরোধ নাই। অবিদ্যা বা মায়াই বিশ্বজননী প্রকৃতি। এই অনাদি মায়াশক্তির সহায়তায় নির্গুণ সগুণ হন, সৃষ্টি-সংহার লীলার অভিনয় করেন। শুদ্ধ পরব্রহ্মেরও অজ্ঞান বা মায়াশক্তিযোগ অবশ্য স্বীকার্য। এইরূপ মূলাজ্ঞানের এবং জ্ঞানময় পরব্রহ্মের কোন বিরোধ নাই। বিরোধ তখনই ঘটে, যখন জ্ঞান ও অজ্ঞান অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিফলিত হইয়া দেখা দেয়। মূলাজ্ঞান বস্তুতঃ এক হইলেও, উপাধির ভেদবশতঃ জীবভেদ অদ্বৈতবেদান্তীও স্বীকার করিয়াছেন। জীবভেদে জীবের জ্ঞানভেদও সুতরাং না মানিয়া উপায় নাই। দেবদত্তের ঘটজ্ঞান ঘটসম্পর্কে দেবদত্তের যে অজ্ঞান ছিল তাহাকে নিবৃত্তি করিয়াই উদিত হইয়াছে। ঘটবিষয়ক জ্ঞান ঘটের অজ্ঞানের

১। ন চ তর্হি শুদ্ধচিতোঽজ্ঞানবিরোধিত্বাভাবে ঘটাদিবদপ্রকাশত্বাপত্তিঃ, বৃত্ত্যবচ্ছেদেন তস্যা এবাজ্ঞানবিরোধিত্বাৎ, স্বতস্তৃণতুলাদিভাসকস্য সৌরালোকস্য সূর্যকান্তাবচ্ছেদেন স্বভাস্যতৃণতুলাদিদাহকত্ববৎ স্বতোঽবিদ্যাতৎকার্যভাসকস্য চৈতন্যস্য বৃত্ত্যবচ্ছেদেন তদ্দাহকত্বাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৭৭ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

নিবৃত্তি সাধন করিয়াছে, দেবদত্তের পুস্তকাজ্ঞান প্রভৃতিকে নিবৃত্তি করে নাই। ইহা হইতে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিরোধের সূত্রের সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, জ্ঞান ও অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় এক বা অভিন্ন হইলেই বৃত্তিজ্ঞান অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করিয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করে। জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিরোধে বৃত্তিসম্পর্কই যে কারণ তাহাতে সন্দেহ কি? এই বৃত্তি পর-ব্রহ্মকেও বিষয় করিবে। জীবের শিবভাব দৃঢ় হইলে, 'ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', এইরূপে যে চরম জ্ঞান উদিত হইবে এবং ব্রহ্মাশ্রিত অনাদি মূলাজ্ঞানকে নিবৃত্ত করিবে, সেখানেও ব্রহ্মাকারে অন্তঃকরণবৃত্তির অভ্যুদয় অস্বীকার করা চলিবে না। সকল ক্ষেত্রেই বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটায়—বৃত্তিজ্ঞানেনৈবাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। শতভূষণী, ৩৮ পৃঃ, এই সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতে হইবে। পরব্রহ্মের বৃত্তিব্যাপ্যতা স্বীকার করিলে, শুদ্ধব্রহ্মও ঘটাদির ন্যায় জ্ঞেয়ই হইয়া পড়িবেন নাকি? শ্রুতির উক্তিতে ব্রহ্মকে যে অজ্ঞেয়, অপ্রমেয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহারই বা মূল্য কি থাকিবে? এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম 'বৃত্তিব্যাপ্য' হইলেও ঘটাদির ন্যায় জ্ঞেয় হইবেন না। কারণ, ব্রহ্ম 'ফলব্যাপ্য' নহেন। যাহা 'ফলব্যাপ্য' হইয়া থাকে তাহাই, অস্বপ্রকাশ ও জ্ঞেয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মাশ্রিত অনাদি অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মকে জীবের বৃত্তিজ্ঞানের ব্যাপ্য বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞান-ফল যে বিষয়ের প্রকাশ, যাহাকে 'ফলব্যাপ্যত্ব' বলা হইয়া থাকে, প্রকাশস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষে তাহার আর প্রয়োজন হয় না। জড় ঘটাদির প্রত্যক্ষে জড়ের প্রকাশের আবশ্যকতা আছে। এই জড় ঘটাদি বৃত্তিজ্ঞানের যেমন বিষয় হইবে, অর্থাৎ বৃত্তিব্যাপ্য হইবে, জ্ঞানের ফলে জড় ঘটপ্রমুখ বস্তুর প্রকাশ ঘটে বলিয়া, ঘট প্রভৃতির ফলব্যাপ্যতাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অদ্বৈত-বেদান্তী অতি স্পষ্টভাষায় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্‌ভি র্নিবারিতম্।
ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরুদাহৃতা ॥

এখন কথা এই, মূল ব্রহ্মজ্ঞানে যদি অজ্ঞানবিরোধিতা না থাকে, তবে বৃত্তি-প্রতিফলিত জ্ঞানে অজ্ঞানবিরোধিতা আসে কোথা হইতে? জ্ঞান অজ্ঞানের নিবৃত্তি সাধন করে কি করিয়া? এই প্রশ্নের উত্তরে অ[illegible]

বলেন, পরমেশ্বরের ইচ্ছার অমোঘ শক্তি আছে। সেই শক্তিবশতঃ ঈশ্বরানুগ্রহে জীবের দুষ্কৃতি, অজ্ঞান প্রভৃতির নিবৃত্তি ঘটে, ইহা প্রতিবাদী স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা (অদ্বৈতবাদীরা)ও বলিব, জীবের জ্ঞান যাহা ভূমা ব্রহ্ম বিজ্ঞানেরই উপাধি কল্পিত ভগ্নাংশ, সেই জ্ঞান বৃত্তিতে প্রতিফলিত হইলে বৃত্তিজ্ঞানেও এমন এক বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত হয়, যাহার ফলে কেবল তুলাজ্ঞান বা খণ্ড অজ্ঞানেরই নহে, জীবের অখণ্ডাকার বৃত্তিবশতঃ মূলাজ্ঞানেরও নিবৃত্তি সম্ভবপর হয়। বৃত্তিজ্ঞানের এই শক্তি জ্ঞানের কার্য অর্থাৎ অজ্ঞানের নিবৃত্তি দেখিয়া অর্থাপত্তি প্রমাণবলেই কল্পনা করা যাইতে পারে।[১]

১ম অনুমান—'অজ্ঞানম্ ন জ্ঞানমাত্রব্রহ্মাশ্রয়ম, অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ।'

৪র্থ অনুমান—'ব্রহ্ম, ন অজ্ঞানাস্পদম, জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ ঘটবৎ।'

এইরূপে অনুমানের প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না বলিয়া রামানুজ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, আলোচ্য অনুমান উপাধি-কলুষিত, এইজন্যও উহা গ্রহণের যোগ্য নহে। প্রথম অনুমানে মিথ্যারজতের উপাদান খণ্ড অজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উপন্যাস করা হইয়াছে। ঐ খণ্ড অজ্ঞান যে জীবাশ্রিত তাহা সর্বজ্ঞাত্ম মুনি প্রভৃতিরও অভিপ্রেত। এই অবস্থায় ঐ খণ্ড অজ্ঞানের দৃষ্টান্তে মূলাজ্ঞান ব্রহ্মাশ্রিত নহে, এইপ্রকার অনুমান করা চলে না। ঐরূপ অনুমানে খণ্ড অজ্ঞান (পল্লবাজ্ঞান)ই উপাধি হইবে। জীবাশ্রিত খণ্ড অজ্ঞানে ব্রহ্মাশ্রিতত্বের অভাব সর্বদাই আছে এবং এইরূপে খণ্ড অজ্ঞান সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে, কিন্তু অজ্ঞানত্বহেতুর তাহা ব্যাপক হয় নাই। মূলাজ্ঞানেও অজ্ঞানত্ব আছে, অথচ পল্লবাজ্ঞান বা খণ্ড অজ্ঞানের অভাবই মূলাজ্ঞানে আছে। তারপর, ঐ অনুমান প্রতিপক্ষানুমান-বাধিত বলিয়াও অপ্রমাণ।

"বিবাদাধ্যাসিতম্ অজ্ঞানম্, ব্রহ্মাশ্রিতম্, পল্লবাজ্ঞানত্বাভাবে সতি অজ্ঞানত্বাৎ"।

১। অত্রাপি শক্তিবিশেষঃ কশ্চন কার্যদর্শনান্যথানুপপত্ত্যা কল্প্যতাম্। সর্বথাতু সংবিন্মাত্রাশ্রয়স্যৈবাপ্যজ্ঞানস্য তত্ত্বজ্ঞানেন জীবাশ্রিতেনেশ্বরসংকল্পন্যায়েন নিবৃত্তির্ন বিরুধ্যতে। শতভূষণী, ৩৭ পৃঃ।

বিবাদগোচর অজ্ঞান ব্রহ্মাশ্রিত অর্থাৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই বিরাজ করে, যেহেতু ঐ অজ্ঞানে অখণ্ড অজ্ঞানত্ব আছে এবং খণ্ড অজ্ঞানের অভাবও আছে। খণ্ড অজ্ঞান যাহা শুক্তিরজত প্রভৃতি বিভ্রম উৎপাদন করে, সেই অজ্ঞান যে জীবাশ্রিত তাহা অদ্বৈতবেদান্তীরও অনুমোদিত। এই অবস্থায় প্রদর্শিত প্রতিপক্ষানুমানের বলে মূলাজ্ঞান যে ব্রহ্মাশ্রিত, তাহা অনায়াসেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। চতুর্থ অনুমানে জ্ঞাতৃত্বের অভাবকে হেতু করিয়া ঘটকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ঘট প্রভৃতি দৃশ্য বিষয় যে অজ্ঞানের আশ্রয় হয় না তাহার প্রতি ঘটের জ্ঞাতৃত্বের অভাব প্রকৃত হেতু নহে। প্রকৃত হেতু হইল এই যে, ঘট অজ্ঞানের কার্য, অজ্ঞান ঘটের কারণ। কারণ পূর্বভাবী, কার্য পরভাবী। পরভাবী ঘট প্রভৃতি কার্য, পূর্ববর্তী অজ্ঞানের আশ্রয় হইবে কিরূপে? অতএব ইহা স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে, উক্ত অনুমানের হেতু দৃষ্টান্তে নাই। ফলে, ঐ অনুমানে 'দৃষ্টান্তাসিদ্ধি' হেত্বাভাস অনিবার্যরূপেই দেখা দিবে। এই সকল হেত্বাভাস-কলুষিত অনুমানের দ্বারা পরব্রহ্মের 'অজ্ঞানাশ্রয়ত্বানুপপত্তি' সমর্থন করা চলে না। মূলাজ্ঞানই অবিদ্যাশক্তি বা বিশ্বপ্রসবিনী পরমাপ্রকৃতি। এই মূলাজ্ঞানকে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতের উপাদান খণ্ডঅজ্ঞানের ন্যায় জ্ঞাত্রাশ্রিত বলিয়া গ্রহণ করিলে, মূলাজ্ঞানের কার্য জগৎপ্রপঞ্চও প্রাতিভাসিকই হইয়া দাঁড়াইবে। জগৎ ব্যাবহারিকভাবে সত্য, অদ্বয় ব্রহ্মবিজ্ঞাননাশ্য, এই সকল অদ্বৈতসিদ্ধান্ত বিসর্জন দিয়া মহাযানিক বৌদ্ধ সিদ্ধান্তেরই সেক্ষেত্রে শরণ লইতে হইবে।

রামানুজোক্ত 'ব্রহ্মাশ্রিতত্বানুপপত্তি'র মূলে যে কোন বলিষ্ঠ প্রমাণ নাই, অবিদ্যার আশ্রয় পরব্রহ্ম, এইরূপ অদ্বৈত-সিদ্ধান্তই যে গ্রহণযোগ্য, উপরের আলোচনা হইতে তাহা সুধী সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

পরব্রহ্ম কেবল অবিদ্যার আশ্রয় নহে, বিষয়ও বটে

পরব্রহ্ম কেবল অবিদ্যার আশ্রয় নহে, বিষয়ও বটে। অজ্ঞেয় নির্বিশেষ পরমব্রহ্ম অবিদ্যার বিষয় হইতে পারেন কিরূপে? অবিদ্যা পরব্রহ্মেরই শক্তি। এই শক্তি ভাবরূপা তমঃস্বভাবা, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃই বলিয়াছি। ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্মের আলোকে আলোকিত হইয়াই অবিদ্যা-শক্তি আত্মপ্রকাশ লাভ করে। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মকে সে আবৃতও করে, অর্থাৎ জীবের দৃষ্টির অন্তরাল করিয়া রাখে। শক্তিরূপে এই অবিদ্যা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে আশ্রিত এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিয়া, পরব্রহ্মে

অজ্ঞান-বিষয়ত্বের আরোপ করে। অজ্ঞান জ্ঞাননাশ্য হইলেও, জলনাশ্য বহ্নি যেমন সূক্ষ্মরূপে জলের মধ্যে বিরাজ করতঃ, জলে স্বীয় ধর্ম উষ্ণতার আরোপ করিয়া, জলের স্বাভাবিক শৈত্যকে আবৃত করে। ইহাও সেইরূপ পরব্রহ্মে অজ্ঞান-বিষয়ত্বের আরোপ করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মকে মায়াময়, বিশ্বস্রষ্টা, গুণময় প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত করে, স্বভাবসিদ্ধ নির্বিশেষ ভাবকে আবৃত করে। ব্রহ্মের এই অজ্ঞান-বিষয়তা বাস্তব নহে, কল্পিত। অন্তঃকরণ-বৃত্তির ব্যাপ্তি-বশতঃই ব্রহ্মে কল্পিত আশ্রয়ত্ব, বিষয়ত্ব প্রভৃতির ভাতি হইয়া থাকে; এক অদ্বিতীয় নির্বিশেষ ব্রহ্মে আরোপিত ধর্ম-ধর্মিভাব, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ভাব প্রভৃতি বিভাবের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হইয়া থাকে। জ্ঞানই বস্তুতঃ আত্মা হইলেও, অজ্ঞানবশতঃ জ্ঞান এবং আত্মার মধ্যে এক ভেদের যবনিকার সৃষ্টি হয়। ফলে, জ্ঞান আত্মার ধর্ম, আত্মা ধর্মী; জ্ঞান বিষয়ী, আত্মা বিষয়, এইরূপে জ্ঞানরূপ আত্মায় কল্পিত ধর্ম-ধর্মী, বিষয়-বিষয়ী প্রভৃতি বিভাব জাগরূক হয়। ব্রহ্মসম্পর্কে জীবের অনাদি অজ্ঞান চলিতেছে। এইজন্যই জীব নিজে পরমশিব হইয়াও, নিজের শিবরূপ ভুলিয়া দুঃখের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছে। জ্ঞান ও আত্মার মধ্যে অভেদে ভেদের এই যে কল্পনা, ইহা অজ্ঞানের খেলা। এই খেলার মধ্যে কল্পিত ভেদবুদ্ধির অন্তরালে অজ্ঞান বিরাজ করে; এবং জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে জ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়রূপে উদ্‌ভাসিত করে। জ্ঞানের যাহা বিষয় হয়, অজ্ঞানেরও তাহাই বিষয় হয়। সুতরাং বিশুদ্ধ পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হইলে, ব্রহ্ম যে অজ্ঞানেরও বিষয় হইবেন, তাহা সন্দেহ কি? এই দৃষ্টিতেই অদ্বৈতবেদান্তী পরব্রহ্মকে অজ্ঞানের বিষয়রূপে কল্পনা করিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

অবিদ্যাদ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্ম তিরোহিত হইলেই, পরব্রহ্মে অজ্ঞানের আশ্রয়ত্ব, বিষয়ত্ব প্রভৃতি বিভাব কল্পিত হইতে পারে। অবিদ্যা বিদ্যার বিরোধী পদার্থ। বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যা তিরোহিত হয়। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের মর্ম। এইরূপ অবিদ্যা ব্রহ্মকে আবৃত (তিরোহিত) করে কিরূপে? স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মের তিরোধান সম্ভবই বা হয় কিরূপে? রামানুজ পরব্রহ্মের 'তিরোধানানুপপত্তি'র সমর্থনে শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন, "প্রকাশতিরোধানং নাম প্রকাশোৎপত্তিপ্রতিবন্ধঃ, বিদ্যমানস্য বিনাশো বা"। শ্রীভাষ্য, ১৬৮ পৃঃ, নির্ণয়সাগরসং।

অবিদ্যা-দ্বারা ব্রহ্মের তিরোধান সম্ভবপর কিনা?

ব্রহ্মের তিরোধানানুপপত্তির সমর্থনে রামানুজের বক্তব্য ও তাহার খণ্ডন

প্রকাশের তিরোধান অর্থে প্রকাশের অনুৎপত্তি অথবা প্রকাশের নাশকে বুঝায়। প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম যখন উৎপন্ন বস্তু নহে, তখন প্রকাশ-তিরোধান বলিলে প্রকাশের নাশকেই বুঝাইবে। স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মের বিনাশ অবশ্য কোনমতেই কল্পনা করা চলে না। অতএব প্রকাশের তিরোধানও সম্ভবপর হয় না।

রামানুজের উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে, অদ্বৈতবেদান্তী প্রকাশের তিরোধান বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন, রামানুজাচার্য সেইদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তিরোধান শব্দের স্বেচ্ছানুরূপ দ্বিবিধ অর্থ কল্পনা করিয়া, অদ্বৈত-বাদীর সিদ্ধান্তে অনুপপত্তি প্রদর্শনের ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছেন। প্রকাশের তিরোধান শব্দের প্রকৃত অর্থ, প্রকাশের বিনাশ নহে, প্রকাশের স্ফূর্তি না হওয়া। গাঢ় মেঘের আবরণে সূর্য তিরোহিত হইলে, প্রকাশময় সূর্য বিনষ্ট হইয়াছে, কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপ মনে করেন কি? মেঘের আবরণবশতঃ সূর্য প্রকাশ পাইতেছে না। বায়ুবেগে মেঘ অন্তর্হিত হইলেই সূর্য দৃষ্টিগোচর হইবে, সূর্যের কণককিরণ পৃথিবীর বুকে পড়িয়া, ধরিত্রীকে উদ্ভাসিত করিবে, এইরূপেই লোকে মনে করে। এক্ষেত্রেও অবিদ্যার আবরণে আবৃত ব্রহ্ম জীবের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইতেছে না, প্রকাশ পাইতেছে না, এইরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। ব্রহ্মের এই তিরস্করনী অবিদ্যা বিদ্যার উদয়ে অন্তর্হিত হইলে, জ্ঞানময় ব্রহ্ম পূর্ণসচ্চিদানন্দরূপেই বিরাজ করিবেন। জীব এবং শিবের মধ্যে অজ্ঞানের যবনিকা যে বিভেদের সৃষ্টি করিয়াছে, ঐ যবনিকা সরিয়া গেলে, জীব 'অহংব্রহ্মাস্মি', এইরূপে নিজের শিবভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইবেন।

প্রকাশই যাহার স্বরূপ, তাহার সেই স্বরূপ কোন কারণেই আবৃত হইতে পারে না; আবৃত হইলে তাহার স্বরূপই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং

স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের আবরণ কিরূপে সম্ভবপর হয়? এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদীর বক্তব্য

স্বপ্রকাশের আবরণ কিরূপে সম্ভবপর হয়? প্রতিবাদীর এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের যথার্থ আবরণ হয় না, ইহা সত্য কথা। তবে, স্বয়ং-জ্যোতিঃ ব্রহ্মের কল্পিত আবরণ অসম্ভব নহে। এই কল্পিত অজ্ঞানাবরণবশতঃ 'ব্রহ্ম ন প্রকাশতে', এইরূপ ব্যবহারও সম্ভবপর। সূর্য মেঘের আবরণে আবৃত হইলে, আকাশে সূর্য নাই, সূর্য

দেখা যাইতেছেনা, প্রকাশিত হইতেছে না, এইরূপ ব্যবহার পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই করেন। তমঃস্বভাবা অবিদ্যার আবরণে আবৃত পরিপূর্ণ স্বয়ংজ্যোতিঃ সম্পর্কেও 'ব্রহ্ম ন ভাতি ন প্রকাশতে', এই প্রকার ব্যবহার অজ্ঞানান্ধ জীব করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এই ব্যবহার অবিদ্যার কার্য। স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মে 'ন প্রকাশতে', এইরূপ ব্যবহারের যোগ্যতা সম্পাদনই ব্রহ্মের আবরণ, পরব্রহ্মের তিরোধান প্রভৃতিরূপে অদ্বৈতবেদান্তে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[১] অবিদ্যা অনাদি, ব্রহ্মের অজ্ঞানাবরণও অনাদি। এইজন্যই কল্পিত এই আবরণের মূলে আর অজ্ঞান কল্পনার প্রশ্ন আসে না। অবিদ্যা সাক্ষিভাস্য বিধায়, অবিদ্যার বিকাশে এবং আবরণ সম্পাদনে অপর কিছুরই অপেক্ষা নাই। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অবিদ্যাকে তমঃস্বভাবা বলিলেও, আলোকের সহিত অন্ধকারের যে বিরোধ, পরব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার বিরোধ ঠিক সেইজাতীয় নহে। আলোক থাকিলে সেখানে অন্ধকার থাকে না। 'আলোকে তমঃ', এইরূপ অনুভবও জন্মে না। কিন্তু ব্রহ্মের চিদালোকে আলোকিত অবিদ্যাসম্পর্কে 'ব্রহ্মণ্যজ্ঞানম্', এইপ্রকার অনুভবের উদয়ে কোনরূপ বাধা দেখা যায় না। একটি দীপ যদি ঘটের মধ্যে অবস্থিত থাকে, ঘটের আবরণে আবৃত থাকে, তবে ঐ দীপালোকের সহিত চারিধারে অবস্থিত দৃশ্য বস্তুর সংস্পর্শ না থাকায়, প্রদীপের আলোকে দৃশ্যবস্তু উদ্ভাসিত হয় না। ইহার অর্থ এই যে, দীপালোকের পরিধি সীমিত হওয়ায়, দীপ ঘটের মধ্যেই আলোক বিতরণ করে। দীপালোকের পরিধি সীমিত হইলেও, ঘটাবৃত দীপ প্রকাশিত হয় না, 'দীপো ন প্রকাশতে', এমন কথা কিন্তু বলা যায় না। অবিদ্যার ক্ষেত্রেও এইরূপ জীবের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ শুদ্ধ চৈতন্য প্রকাশিত না হইলেও, 'ব্রহ্মনাস্তি, ন প্রকাশতে', এমন কথা বলা চলে না। মুক্তি অবস্থায় অবিদ্যার বিলয়ে যে পরিপূর্ণ ব্রহ্মচৈতন্য প্রকাশিত হয়, জীবের অবিদ্যাবন্ধন থাকা পর্যন্ত জীবের দৃষ্টিতে ঐ পূর্ণ ব্রহ্মচৈতন্য প্রকাশিত হয় নাই, এইটুকুই মাত্র বলা যায়। অজ্ঞানে প্রমাণ

১। (ক) নাস্তি ন প্রকাশত ইতি ব্যবহার এবাস্তিজ্ঞাদিসাধারণঃ, অস্তি প্রকাশতে ইতি ব্যবহারাভাবো বা আবরণকৃত্যম্। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৮৭ পৃঃ।

(খ) আবরণমহিম্নৈব পরিপূর্ণং ব্রহ্ম নাস্তি ন প্রকাশত ইতি ব্যবহারঃ, অস্তি প্রকাশত ইতি ব্যবহারপ্রতিবন্ধশ্চ। অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৮৭ পৃঃ।

কি? এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, অহম্ অজ্ঞঃ, আমি অজ্ঞ, আমি তোমার কথিত বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানি না, এইপ্রকার প্রত্যক্ষই ভাবরূপ অবিদ্যার প্রমাণ। অজ্ঞানের এই প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ করিলে সুধী পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী। অবিদ্যার অধিষ্ঠান শুদ্ধচৈতন্য কিংবা অজ্ঞানের ভাসক সাক্ষিচৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে (অবিদ্যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের আলোচনা দেখুন)। আলোক থাকিলে সেখানে অন্ধকার থাকে না, আলোকমাত্রই যেমন অন্ধকারের বিরোধী, জ্ঞানমাত্রই সেইরূপ অজ্ঞানের বিরোধী হয় না।[১] বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী। 'অয়ং ঘটঃ' এই প্রকার প্রত্যক্ষাত্মক ঘটাকার অন্তঃকরণ-বৃত্তিই ঘটের আবরক অজ্ঞানের নিবৃত্তি সাধন করতঃ ঘটের প্রত্যক্ষতা উপপাদন করে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্যের সহিত কেবল অজ্ঞানের বিরোধিতা অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত হইলে, 'ন জানামি' এইরূপে জ্ঞানমাত্রের সহিতই অজ্ঞানের বিরোধিতা প্রকাশ পায় কেন? প্রতিবাদী মাধ্বের এই আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, ঘটাভাব কেবল ঘটের বিরোধী হইলেও, উহা দেখিয়া অভাব ভাবমাত্রের (ভাব-সামান্যের)ই বিরোধী, এইরূপে যেমন জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ অজ্ঞান বৃত্তিজ্ঞানমাত্রের বিরোধী হইলেও, জ্ঞানমাত্রের বিরোধীরূপে উহার ভাতি হইতেও কোন বাধা দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, সামান্যরূপে অভাবের পরিচয় দিলে ঘটের অভাব প্রভৃতি বিশেষ বস্তুর অভাবকেও যেমন সামান্যাভাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখান যায়, সেইরূপ কোনও বিশেষ শ্রেণির জ্ঞানকে (বৃত্তিজ্ঞানকে) লক্ষ্য করিয়া, 'ন জানামি', এইরূপে সামান্যতঃ জ্ঞানাভাবের প্রয়োগ করিলেও তাহাতে দোষের কথা কিছু নাই। অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে বৃত্তিপ্রতিফলিত চৈতন্যই 'জানামি' এই প্রকার ব্যবহারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। 'ন জানামি' এক্ষেত্রে যে জ্ঞানের বিরোধিতা প্রকাশ পায়,

---

১। যচ্চোক্তং প্রকাশস্বরূপে চৈতন্যে কথমজ্ঞানম্? নহি আলোকে তম ইতি। তন্ন, অজ্ঞানতমসোর্বিরোধিতায়ামনুভবসিদ্ধবিশেষাৎ। তথাহি 'ত্বদুক্তমর্থং ন জানামী'তি প্রকাশমানে বস্তুনি অজ্ঞানস্য অনুভবাৎ স্বরূপচৈতন্যং সাক্ষী বা না[illegible]বিরোধি, তমসস্তু আলোকে সত্ত্বানুভবাৎ আলোকমাত্রং তদ্বিরোধি।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৮৮ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

সেস্থলে বিচার করিলে দেখা যায় যে, অজ্ঞান অন্তঃকরণ-বৃত্তি এবং তদাশ্রিত চৈতন্য, এই উভয়কেই বিষয় করে। ফলে, অজ্ঞানের বিরোধিতা কেবল চৈতন্যেই থাকে না, জড় বৃত্তিতেও থাকে না, কিন্তু বৃত্তিপ্রতিফলিত যেই চৈতন্য বিষয়কে প্রকাশ করে, সেই বৃত্তি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের সহিতই অজ্ঞানের বিরোধিতা ফুটিয়া ওঠে।[১] এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অদ্বৈতবাদী মুক্তিতেও আত্মগত অবিদ্যার নিবৃত্তির জন্য 'অহমাকার' অন্তঃকরণ-বৃত্তি (বৃত্তিব্যাপ্যতা) স্বীকার করিয়াছেন। শুদ্ধ চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী না হওয়ায়, এইমতে শুদ্ধ চৈতন্যকে অজ্ঞানের আশ্রয় এবং বিষয় বলিতেও আপত্তির কোন কারণ দেখা যায় না।

শুদ্ধ চৈতন্যকে অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয় বলিয়া ব্যাখ্যা করায়, শুদ্ধ চৈতন্য বা বিদ্যার সহিত অবিদ্যার স্বতঃ যে কোনরূপ বিরোধ নাই তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই অবস্থায় অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তির উপায় কি? তাহাও বিচার করা আবশ্যক। অদ্বৈতবাদী বলেন, 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বেদান্ত মহাবাক্যার্থ বিচারের ফলে যে অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান উদিত হয়, তাহাই অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তি সাধন করে। এই নির্বিশেষ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে রামানুজ বলেন, অদ্বৈতবেদান্তোক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বই প্রমাণসিদ্ধ নহে। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি কোন শাস্ত্রই ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলে না। 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। (শ্বেতাশ্বঃ ৩।৮।)। 'তমেববিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। ন্যান্যঃ পন্থা বিদ্যতে-ইয়নায়। (তৈঃ আঃ ৩।১৩।১।), 'তস্য নাম মহদ্‌যশঃ'। 'য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।' (মঃ নাঃ ১।৮—১০-১১) এই সকল শ্রুতি স্পষ্টতঃ পরব্রহ্মকে অনন্তকল্যাণগুণময় সবিশেষ তত্ত্ব বলিয়াই বিবৃত করিয়াছেন,

অবিদ্যা-নিবর্তকানুপপত্তি ও তাহার খণ্ডন

১। ন চ 'ন জানামী'তি জ্ঞপ্তিবিরোধিত্বস্যৈবানুভবাৎ কথং বৃত্তিবিরোধিত্বম্ ?……… মন্মতে বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যং জানামীতি ব্যবহারবিষয়ঃ। তথা চ ন জানামীত্যনেন বৃত্তিচিতোরুভয়োরপ্যজ্ঞানবিরোধিত্বং বিষয়ীক্রিয়তে। এবঞ্চ ন চৈতন্যে অজ্ঞানবিরোধিত্বম্, নাপিবৃত্তৌ, বৃত্ত্যুপারূঢ়চিত্ত এব অর্থপ্রকাশকত্বেন তথাত্বাৎ।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫৯০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

নির্বিশেষ, নির্গুণ বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই অবস্থায় 'তত্ত্বমসি', 'অহং-ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বেদান্ত মহাবাক্যও যে সগুণ, সবিশেষ ব্রহ্মেরই বোধক হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ?

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, শ্রুতি ও স্মৃতি সমুদ্র মন্থন করিলে ব্রহ্মের সবিশেষ এবং নির্বিশেষ এই দ্বিবিধ রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের পরিচয়প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। আমাদের সেই আলোচনা হইতে সুধী পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সবিশেষ ব্রহ্মবাদ বা ভক্তিবাদ নির্বিশেষে পৌঁছিবার সোপান-স্বরূপ। ব্রহ্মের গুণযোগ বা সবিশেষ বিভাব অবিদ্যাকল্পিত। সুতরাং সবিশেষ ব্রহ্মবিজ্ঞান চরম আত্মজ্ঞান নহে। অবিদ্যার খোলস বিদ্যার উদয়ে খসিয়া পড়িলে, ব্রহ্মের অবিদ্যাকল্পিত গুণযোগও খসিয়া পড়িবে। চরম ও পরম নির্বিশেষ তত্ত্বই বিরাজ করিবে। এই নির্বিশেষ তত্ত্ব যে অলীক নহে, তাহাও আমরা নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় তর্কের ভিত্তিতে প্রথম পরিচ্ছেদেই আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। অবিদ্যাবন্ধন খসিয়া পড়ে কাহার ? এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, যাঁহার গুরু আছে, জিজ্ঞাসা আছে, শাস্ত্র আছে, সাধনা আছে, সর্বোপরি বন্ধন-মুক্তির জন্য তীব্রতর প্রচেষ্টা আছে, তাঁহারই অবিদ্যা-বন্ধন খসিয়া পড়ে। অবিদ্যার যবনিকা সরিয়া যাওয়ায়, হৃদয়গগনে বিদ্যা-মার্তণ্ডের ভাতি হয়। সেই আলোকে বন্ধনমুক্ত জীব নিখিলবিশ্বই ব্রহ্মময়, সকলই ঈশ্বরবাসিত, আমিময় এ ত্রিভুবন, আমি ভিন্ন কিছুই নাই, 'অহং ব্রহ্মাস্মি', এইরূপে মুক্ত জীব অহম্ ও ব্রহ্মের অভেদ প্রত্যক্ষ করিয়া, জীবের চরমঋদ্ধি বা মুক্তিলাভ করে।

অবিদ্যা অনুপপত্তি ও তাহার খণ্ডন

নির্বিশেষ ব্রহ্মের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারই অবিদ্যার নিবর্তক। অনাদি অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তিও অসম্ভব নহে।

"অতো নিবৃত্তিরপ্যস্যা অবিদ্যায়া ন দুর্বচা।
অবিদ্যাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা মুচ্যতে কর্ম বন্ধনাৎ ॥"

অবিদ্যার নিবৃত্তি তখনই সম্ভবপর হয়, যখন অবিদ্যাকে অবিদ্যা বলিয়া চেনা যায়। অবিদ্যার স্বরূপ-পরিচিতির ফলে অবিদ্যার পরিণাম এই বিশ্বপ্রপঞ্চে মিথ্যাত্বদৃষ্টি আত্মপ্রকাশ লাভ করে। জীব মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, জীবের জাগতিক বন্ধনও মিথ্যা—অবিদ্যামূলক বলিয়াই বোধ হয়। জ্ঞানী জীব

জাগতিক সুখ দুঃখেরই নামান্তর বলিয়া বুঝিয়া, সুখোপভোগের মৃগতৃষ্ণিকার পিছনে ঘুরিয়া তাঁহার দুঃখের বোঝা ভারী করে না। ফলে, জীবের রাগ, দ্বেষ, প্রবৃত্তি প্রভৃতিরও অভাব ঘটে। জীবের কর্মবন্ধন শিথিল হয় এবং পরিশেষে অদ্বয়ভাবনার দৃঢ়তাবশতঃ কর্মের খোলস, অবিদ্যার খোলস প্রভৃতি সকলই খসিয়া পড়ে। অবিদ্যা, অহম্ অভিমান প্রভৃতি দ্বারা কলুষিত জ্ঞানই বন্ধের কারণ। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', এইরূপ জীব ও ব্রহ্মের নির্বিশেষ অভেদ সাক্ষাৎকারই মুক্তির সোপান। পুরাণকার সত্যই বলিয়াছেন ঃ—

তস্মাদ্দুঃখাত্মকং নাস্তি নচ কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্।
মনসঃ পরিণামোহয়ং সুখদুঃখোপলক্ষণঃ॥
জ্ঞানমেব পরংব্রহ্ম জ্ঞানংবন্ধায় চেষ্যতে।
জ্ঞানাত্মকমিদং বিশ্বং ন জ্ঞানাদ্‌বিদ্যতে পরম্॥

বিষ্ণুপুরাণ, ২।৬।৪৭—৪৮।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জগন্মিথ্যা

জীব ও পরব্রহ্মের অভেদ সাক্ষাৎকার বা অদ্বয়ভাবনা, যাহা মুক্তির সোপান বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তখনই কেবল সম্ভবপর হয়, যখন ভোক্তা জীব, এই ভোগ্য জগৎ প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় হয়। আনন্দময়ের সহিত অধ্যাসের ফলে লীলাময়ী এই বিশ্বপ্রকৃতি আনন্দময়ী বলিয়া মনে হইলেও, বস্তুতঃ এই জগল্লক্ষ্মী সত্য নহে, মিথ্যা।

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা,
জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।"

এক কথায় ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের মর্মবাণী। জগৎ যাহা প্রতিনিয়ত গমনশীল বা পরিবর্তনশীল, তাহা সত্য হইবে কিরূপে? যাহা ধ্রুব স্বপ্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু; তদ্‌ব্যতীত সমস্তই অসত্য। অসত্য বা মিথ্যা বলিতে অদ্বৈতবাদী কি বোঝেন? মিথ্যাত্বের সংজ্ঞা বা পরিচয় (লক্ষণ) কি? জগতের মিথ্যাত্বে প্রমাণই বা কি? তাহা এই প্রসঙ্গে বিচার করা আবশ্যক। অদ্বৈতবেদান্তের বিভিন্নগ্রন্থে মিথ্যাত্বের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। চিৎসুখাচার্য 'তত্ত্বপ্রদীপিকায়' মিথ্যাত্বের ঐরূপ দশটি সংজ্ঞার ইঙ্গিত করিয়াছেন।[১] তাহার একটিও জগতের সত্যতাবাদী নৈয়ায়িক মাধ্ব, রামানুজ প্রভৃতির দুর্বার আক্রমণ বেগ সহ্য করিতে পারে নাই। এইজন্যই চিৎসুখকে পরে মিথ্যাত্বের একটি নির্দোষ সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হইয়াছে। আমরা ক্রমশঃ ঐসকল লক্ষণের যৌক্তিকতা আলোচনা করিব।

১। কিং পুনরিদং মিথ্যাত্বং প্রমাণাগম্যত্বং বা ১, অপ্রমাণজ্ঞানগম্যত্বং বা ২, অযথার্থজ্ঞানগম্যত্বং বা ৩, সদ্বিলক্ষণত্বং বা ৪, সদসদ্বিলক্ষণত্বং বা ৫, অবিদ্যাতৎকার্যয়োরন্যতরত্বং বা ৬, জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং বা ৭, প্রতিপন্নোপাধৌ নিষেধপ্রতিযোগিত্বং বা ৮, বাধ্যত্বং বা ৯, স্বাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণতয়া প্রতীয়মানত্বং বা ১০।

তত্ত্বপ্রদীপিকা, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা; নির্ণয় সাগর সং।

১। "যাহা প্রমাণগম্য নহে, তাহাই মিথ্যা"। এই লক্ষণটি কিন্তু ঠিক হইল না। এই লক্ষণ অনুসারে সর্ববিধ প্রমাণের অগোচর নির্বিশেষ পরব্রহ্ম, যাহাকে অদ্বৈতবাদী একমাত্র সত্য বস্তু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মও মিথ্যাই হইয়া দাঁড়ান নাকি?

১ম লক্ষণ

২। "অপ্রমাণ-জ্ঞানের যাহা বিষয় তাহাই মিথ্যা", এইরূপ মিথ্যাত্বের লক্ষণও দোষাবহ। কারণ, বৌদ্ধদার্শনিক বিশ্বের তাবদ্ বস্তুকেই ক্ষণিক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। 'সর্বং ক্ষণিকম্' ইহাই বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অপর কোন ভারতীয় দার্শনিকেরই অনুমোদন লাভ করে নাই। এই অবস্থায় 'অপ্রমাণ-জ্ঞান' বলিয়া যদি বৌদ্ধোক্ত ক্ষণিকবাদকে গ্রহণ করা হয়, তবে অদ্বৈতবাদীর জীব, জগৎ, ব্রহ্ম প্রভৃতি সমস্তই অপ্রমাণ ক্ষণিক বিজ্ঞানের বিষয় হইয়া মিথ্যাই হইয়া দাঁড়াইবে। অদ্বৈতবেদান্তীর সত্য ব্রহ্মও আলোচ্য মিথ্যা লক্ষণাক্রান্ত হইয়া মিথ্যার পর্যায়ে পড়ায়, (লক্ষণের যেরূপ তাৎপর্য, অদ্বৈতবাদীর অনভিপ্রেত সেইরূপ অর্থ প্রতিপাদন করায়) লক্ষণটি অর্থান্তর[১] দোষে কলুষিত হইয়া পড়িবে।

২য় লক্ষণ

যাহা অযথার্থ জ্ঞানের বিষয়, তাহাই মিথ্যা 'অযথার্থজ্ঞানগম্যত্বং মিথ্যাত্বম্', (চিৎসুখী, ৩২-৩৩ পৃঃ) এইরূপ তৃতীয় লক্ষণে অযথার্থ জ্ঞান বলিয়া যদি পূর্বোক্ত প্রকারে বৌদ্ধোক্ত ক্ষণিকবাদকে ধরা হয়, তবে এই লক্ষণেও দ্বিতীয় লক্ষণের দোষই অবশ্যম্ভাবী হইবে, অর্থাৎ সত্য পরব্রহ্ম প্রভৃতিও মিথ্যাই হইবে।

৩য় লক্ষণ

যাহা সত্যের বিলক্ষণ বা বিসদৃশ তাহাই মিথ্যা—'সদ্বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্', চিৎসুখী, (৩৩ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং) এইরূপ লক্ষণও দোষকলুষিত। এই

১। অর্থান্তরদোষ কাহাকে বলে?

অন্যঅর্থ—অর্থান্তর। যেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কোন তত্ত্ব বা তথ্যের অবতারণা করা হয়, তাহা যদি তদ্‌ব্যতীত কোন অনভিপ্রেত অর্থের সাধক হয়, তবে সেখানে অর্থান্তর দোষ ঘটে। আলোচ্যস্থলে জগতের মিথ্যাত্বের লক্ষণ সত্য পরব্রহ্মের মিথ্যাত্ব সাধন করায়, অদ্বৈতবাদীর অনভিপ্রেত অর্থের প্রতিপাদক হওয়ায়, অর্থান্তর দোষ ঘটিয়াছে।

লক্ষণ অনুসারে অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতিও মিথ্যাই হইয়া দাঁড়ায়।

৪র্থ লক্ষণ

আকাশকুসুম প্রভৃতি অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে বস্তুতঃ মিথ্যার পর্যায়ে পড়ে না; উহারা অলীক। মিথ্যা ঘটাদি প্রপঞ্চ হইতে অলীকের বিভেদ অতিস্পষ্ট। এই জন্যই অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতিতে উল্লিখিত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। ঘটপ্রভৃতি ব্যাবহারিক বস্তু চরমে মিথ্যা হইলেও, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাবহারিক জীবন আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পানীয় আহরণে সমর্থ, প্রত্যক্ষগম্য ঘটপ্রভৃতিকে সত্য স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ ঘট প্রভৃতিকে মিথ্যা বলিলেও, অলীক বলা চলে না। পরিণামে মিথ্যা হইলেও ঘট প্রভৃতির ব্যাবহারিক সত্যতা অবশ্য-স্বীকার্য। অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতি বস্তুই নহে, উহা অবস্তু। পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনে অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতিকে মিথ্যারও নিম্নস্তরে গণনা করিয়া, 'বস্তুশূন্য' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।" যোগদর্শন, ৮ সূত্র। এইরূপ অবস্তু আকাশকুসুম প্রভৃতিতে মিথ্যাত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন সঙ্গতই হইয়াছে। আকাশকুসুম মিথ্যা না হইলে, উহা অবশ্যই অমিথ্যা হইবে। এইরূপে অদ্বৈতবাদে দুইটি অমিথ্যার পরিচয় পাওয়া যাইবে। একটি অমিথ্যা পরমার্থসৎ পরব্রহ্ম, অপরটি অমিথ্যা অলীক আকাশকুসুম। ফলে, অদ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ থাকিবে না। দ্বৈতবাদই হইয়া পড়িবে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, অলীক আকাশকুসুম অমিথ্যা হইলেও, সত্য নহে। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তোক্ত সদদ্বৈতবাদ অর্থাৎ সত্য বস্তু একটি ব্যতীত দ্বিতীয়টি নাই, এইরূপ অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত অব্যাহতই থাকিবে।

যাহা সতেরও বিলক্ষণ, অসতেরও বিলক্ষণ, তাহাই মিথ্যা—"সদসদ্-বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্"। চিৎসুখী, ৩৩ পৃঃ। মিথ্যাত্বের এই লক্ষণটি পঞ্চপাদিকার

৫ম লক্ষণ

রচয়িতা আচার্য পদ্মপাদের অনুমোদিত। মিথ্যাত্বের এইরূপ লক্ষণ যে দোষাবহ নহে, তাহা আমরা মিথ্যাত্বের পাঁচটি সুপ্রসিদ্ধলক্ষণের বিচারপ্রসঙ্গে পরে আলোচনা করিব। এই পদ্মপাদোক্ত লক্ষণের সমালোচকেরা বলেন, এইরূপ লক্ষণ অসম্ভব। দার্শনিক চিন্তারাজ্যে দুইপ্রকার পদার্থের পরিচয় পাওয়া যায়, সৎ এবং অসৎ। দার্শনিক পদার্থ হয় সৎ হইবে, নতুবা অসৎ হইবে। যাহা সৎ নহে, তাহাই অসৎ; আবার

অসৎ না হইলেই তাহা হইবে সৎ বা সত্য। সৎ এবং অসৎ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। পরস্পর বিরোধী দুইটি বস্তুর একটি সত্য হইলেই অপরটি মিথ্যা হইবে; পক্ষান্তরে, একটি মিথ্যা হইলেই অপরটি সত্য হইবে। সতের যাহা বিলক্ষণ তাহাই হইবে অসৎ, এবং অসতের যাহা বিলক্ষণ, তাহাই হইবে সৎ। সৎ ও অসৎ এই উভয়ের বিলক্ষণ কোন বস্তুই নাই বা থাকিতে পারে না। ফলে, এইরূপ লক্ষণও অসম্ভব হইতে বাধ্য।[১]

যাহা অবিদ্যা বা তাহার কার্য, তাহাই মিথ্যা।[২] এইরূপ মিথ্যাত্বের লক্ষণও অচল। কারণ, প্রথমেই প্রশ্ন আসিবে যে, অবিদ্যা বলিয়া এখানে অদ্বৈতবাদী কি বুঝাইতে চাহেন? অবিদ্যা শব্দে তিনি যদি তাঁহার স্বীকৃত অনির্বচনীয় অবিদ্যাকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে, ঐরূপ অনির্বচনীয় অবিদ্যা অদ্বৈতপ্রতিবাদী জগৎসত্যতার সমর্থক মাধ্ব, রামানুজ প্রভৃতির নিকট প্রসিদ্ধ নহে বলিয়া, অপ্রসিদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করার দোষেই লক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইতে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ অবিদ্যা বলিতে যদি বিদ্যাবিরোধী মিথ্যাজ্ঞানকে অথবা মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কারকে অদ্বৈতবাদী বুঝাইতে চাহেন, তবে ঐরূপ অবিদ্যামূলে উৎপন্ন সংসারী জীবের কর্মপ্রবৃত্তি, চেষ্টা বা বিভ্রম-সংস্কার প্রভৃতি তো সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হইবে, অবিদ্যার কার্য বলিয়া তাহা মিথ্যা হইবে কেন?

৬ষ্ঠ লক্ষণ

যাহা জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় তাহাই মিথ্যা—"জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্"। (চিৎসুখী, ৩৩ পৃঃ।) এই লক্ষণও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা পূর্বের জ্ঞান নিবর্তিত হয়, ইহা কে না জানেন? এখন যাহা জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয় তাহাই মিথ্যা হইলে, পরবর্তী জ্ঞানোদয়ে নিবর্তনীয় পূর্বজ্ঞান মিথ্যাই হইয়া পড়ে।[৩] পরবর্তী জ্ঞানের ন্যায় পূর্বজ্ঞানও সত্যই বটে, মিথ্যা নহে। পরবর্তী কালে উৎপন্ন জ্ঞান

৭ম লক্ষণ

১। সৎ ও অসতের অর্থ কি হইবে, তাহার উপরই এই লক্ষণটির তাৎপর্য নির্ভর করিতেছে। আমরা এই লক্ষণের মর্মবিচারপ্রসঙ্গে সৎ ও অসতের অর্থের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, প্রতিবাদীর উক্ত সমালোচনা ভিত্তিহীন। সুধী পাঠক সেই আলোচনা দেখিবেন।

২। অবিদ্যাতৎকার্যয়োরন্যতরত্বম্ মিথ্যাত্বম্। চিৎসুখী, ৩৩ পৃঃ।

৩। মাধবমুকুন্দের পরপক্ষ গিরিবজ্র, ১ম অঃ, ১২১ পৃঃ, বৃন্দাবন সং।

পূর্ববর্তী সুখ-দুঃখ বোধের নিবৃত্তি সাধন করে বলিয়া, ঐ সুখ-দুঃখ প্রভৃতিও মিথ্যাই হইয়া দাঁড়ায়। তারপর, জগৎসত্যতাবাদী মাধ্ব প্রভৃতি যাঁহারা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় প্রভৃতির প্রতি পরমেশ্বর অপ্রতিহত জ্ঞানকে কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে জগতের প্রলয় দশায়, বিশ্বের তাবদ্ সত্য বস্তুই পরমেশ্বরের জ্ঞাননিবর্তনীয় বলিয়া মিথ্যাই হইয়া পড়ে। এইরূপে লক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় বলিয়া আলোচ্য লক্ষণেও 'অর্থান্তর'দোষ অবশ্যম্ভাবী হয়।

যেই বস্তুর যাহা আশ্রয় বলিয়া বুঝা যায়, সেই আশ্রয় বা আধারেই যদি সেই বস্তুর অভাব দেখা যায়, তবে সেই বস্তুকে মিথ্যা বলিয়াই জানিবে।[১]

৮ম লক্ষণ

এখন কথা এই, আলোচ্য লক্ষণে স্বীয় আশ্রয় বা আধারে যে বস্তু-জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কি সত্যজ্ঞান, না মিথ্যাজ্ঞান? ইহা যে সত্যজ্ঞান নহে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। কেননা, বস্তুর আশ্রয় বা আধারে কোন বস্তুর জ্ঞানোদয় হইলে, সেই আধারে সেই বস্তুর নিষেধবুদ্ধি কখনই জন্মিতে পারে না। এই জ্ঞানকে যদি ভ্রমজ্ঞান বলা হয়, তবে ভ্রমজ্ঞানের বিষয় রজতের আধার বলিয়া পরিচিত ঝিনুকখণ্ডে রজতের যে অভাব আছে, তাহা বাদী প্রতিবাদী সকলেরই স্বীকৃত বলিয়া, লক্ষণটি অবশ্যই 'সিদ্ধসাধন'দোষে কলুষিত হইয়া পড়িবে। তারপর, ব্যাবহারিক সত্য বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতীতি শুক্তিরজতের ন্যায় ভ্রমরূপ না হওয়ায়, অদ্বৈতবাদীর অভিমত জাগতিক বস্তুর মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হইবে না।*

যাহা বাধ্য তাহাই মিথ্যা—বাধ্যত্বং মিথ্যাত্বম্। চিৎসুখী, ৩৩ পৃঃ। এখানে প্রশ্ন এই যে, লক্ষণস্থ 'বাধ্য' শব্দের অর্থ কি? যাহা বাধক জ্ঞানের

৯ম লক্ষণ

বিষয় হয়, তাহাই বাধ্য, না, বাধক জ্ঞানের দ্বারা যাহা নিবর্তনীয়, তাহাকেই বাধ্য বলিবে? প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলে সত্য ঝিনুকের খণ্ডও 'ইহা রূপা নহে' এইরূপ বাধক জ্ঞানের বিষয় হইয়া মিথ্যাই হইয়া দাঁড়ায়। বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সাধনের উদ্দেশ্যে কল্পিত লক্ষণের দ্বারা

১। প্রতিপন্নোপাধৌ নিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্।

চিৎসুখী, ৩৩ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

* চিৎসুখীর উদ্ধৃত এই ৭ম এবং ৮ম লক্ষণদুইটি বিবরণকার আচার্য প্রকাশাত্মযতি তদীয় বিবরণে মিথ্যাত্বের যথার্থ লক্ষণ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মিথ্যাত্বের

সত্য ঝিনুকখণ্ডের (শুক্তির) মিথ্যাত্ব সাধিত হওয়ায়, লক্ষণে 'অর্থান্তর' দোষই আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয় কল্পেও পরবর্তী বাধক জ্ঞানের দ্বারা পূর্ববর্তী জ্ঞানের নিবৃত্তি ঘটায় 'অর্থান্তর'দোষই অনিবার্য হয়।

নিজের অত্যন্তাভাবের অধিকরণেই যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহাই মিথ্যা।[১] শুক্তিতে বস্তুতঃ রজত নাই; রজতের অত্যন্তাভাবই আছে। রজতের অত্যন্তাভাবের অধিকরণে (শুক্তিতে)ই রজতের প্রতীতি হইতেছে; সুতরাং রজত মিথ্যা। এইরূপ মিথ্যাত্বের নির্বচনও নির্দোষ নহে। এইরূপে মিথ্যাত্ব ব্যাখ্যা করিলে, সংযোগ, বিভাগ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ একই সময়ে উহাদের আধারের এক অংশে থাকে, অপর অংশে থাকে না, তাহাদেরও মিথ্যাত্বই সিদ্ধি হয়। বৃক্ষের শাখায় বানরটি বসিয়া থাকায়, শাখাংশে বৃক্ষে কপি সংযোগ আছে, আবার বৃক্ষমূলে বানর না থাকায়, মূলাংশে ঐ বৃক্ষেই কপি সংযোগের অভাব আছে। এইরূপে কপিসংযোগ কপিসংযোগের অত্যন্তাভাবের অধিকরণে (বৃক্ষে) প্রতীয়মান হওয়ায়, তাহাও মিথ্যাই হইয়া দাঁড়াইবে। লক্ষণটি সত্য কপিসংযোগকে মিথ্যা প্রতিপাদন করায়, 'অর্থান্তর' দোষেই কলুষিত হইবে।[২] তারপর, এই লক্ষণটিকে মিথ্যাত্বের লক্ষণ না বলিয়া, 'অব্যাপ্য'-বৃত্তি* সংযোগ প্রভৃতির লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও, তাহাতে অসঙ্গতির কোনই কারণ ঘটিবে না।

১০ম লক্ষণ

প্রসিদ্ধ পাঁচটি লক্ষণের ইহা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লক্ষণ। সেই সকল লক্ষণের বিচারপ্রসঙ্গে এই লক্ষণ দুইটি যে দোষাবহ নহে, তাহা আমরা বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া দেখাইব।

১। স্বাত্যন্তাভাব সমানাধিকরণতয়া প্রতীয়মানত্বং মিথ্যাত্বম্। চিৎসুখ, ৩৩ পৃঃ।

২। নাপি স্বাধিকরণনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্, অব্যাপ্যবৃত্তিসদ্রূপসংযোগাদাবতিব্যাপ্তেঃ।

মাধবমুকুন্দকৃত পরপক্ষগিরিবজ্র, ১ম অঃ, ১২১ পৃঃ।

* যাহা একই সময়ে নিজের অধিকরণে অংশ বিশেষে থাকে, অংশ বিশেষে থাকে না, তাহাকে 'অব্যাপ্যবৃত্তি' বলে। আমার টেবিলের উপর এই যে বইখানি আছে, তাহা টেবিলের এই অংশে আছে, অপর অংশে বইখানির অভাব আছে। বইখানিকে যদি সরাইয়া লইয়া অপর অংশে রাখিয়া দেই, তবে টেবিলের যেই অংশে এখন বইখানির সংযোগ আছে, সেই অংশেই সংযোগের অভাব ঘটিবে, যেই

চিৎসুখের উল্লিখিত লক্ষণ ব্যতীত তর্কতাণ্ডব পণ্ডিত ব্যাসরাজ 'ন্যায়ামৃতে' আরও কয়েকটি মিথ্যাত্বের লক্ষণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম লক্ষণটি হইল—যাহা অত্যন্ত অসৎ তাহাই মিথ্যা, "অত্যন্তা-সত্ত্বং মিথ্যাত্বম্", ন্যায়ামৃত। এইরূপ মিথ্যাত্বের লক্ষণ নিতান্তই দোষবহ। কেন না, অদ্বৈতবাদী বিশ্বপ্রপঞ্চকে আকাশকুসুম প্রভৃতির ন্যায় অত্যন্ত অসৎ কখনও বলেন না, বরং অসদ্‌বিলক্ষণই বলেন। এই অবস্থায় প্রদর্শিত মিথ্যাত্বলক্ষণ অদ্বৈতবেদান্তীর অনুমোদিত নহে বলিয়া, কোন প্রকারেই উহা গ্রহণ করা চলে না। 'যাহা অনির্বাচ্য তাহাই মিথ্যা' —"অনির্বাচ্যত্বং মিথ্যাত্বম্", এইরূপ লক্ষণনির্বচনও সঙ্গত নহে। লক্ষণস্থ অনির্বাচ্য পদটির অর্থ (শক্যার্থ) কি, তাহা নির্ণীত না হওয়ায়, এই লক্ষণে 'সাধ্যাপ্রসিদ্ধি' দোষ অবশ্যম্ভাবী। যাহা সত্ত্বের অনধিকরণ তাহাই মিথ্যা, "সত্ত্বানধিকরণত্বং মিথ্যাত্বম্", এইরূপ মিথ্যাত্বের লক্ষণও অচল। কারণ, অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে নির্বিশেষ পরব্রহ্মে কোনরূপ ধর্ম না থাকায়, সত্তা বা সত্যত্বরূপ ধর্মও সদ্‌রূপ পরব্রহ্মে নাই। ফলে, নির্ধর্মক পরব্রহ্ম সত্ত্বের (সত্যত্বরূপ ধর্মের) অনধিকরণ হওয়ায়, উক্ত লক্ষণানুসারে মিথ্যাই হইয়া পড়েন। বিশ্বপ্রপঞ্চের ব্যাবহারিক সত্যতা অদ্বৈতবেদান্তীর অনুমোদিত বিধায়, দৃশ্যমান প্রপঞ্চে সত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বের লক্ষণের অব্যাপ্তিই অপরিহার্য হয়। যাহা ভ্রান্তির বিষয় হয় তাহাই মিথ্যা—'ভ্রান্তি-বিষয়ত্বং মিথ্যাত্বম্'। এইরূপ লক্ষণও দোষকলুষিত। অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে জগদ্‌বিভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপে পরব্রহ্মও ভ্রান্তির বিষয় হইয়া থাকেন বলিয়া উক্ত লক্ষণানুসারে পরব্রহ্মও মিথ্যাই হইয়া পড়েন নাকি?

মিথ্যার এইরূপ বিবিধ লক্ষণ বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা গেলেও, আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার অদ্বৈতসিদ্ধিতে পদ্মপাদ, প্রকাশাত্মযতি, চিৎসুখ প্রভৃতির রচিত যে পাঁচটি অতি প্রসিদ্ধ মিথ্যাত্বলক্ষণের বিচার করিয়াছেন, ব্যাসরাজ, জয়তীর্থ প্রভৃতির আক্রমণ প্রতিহত করিয়া, ঐ সকল লক্ষণের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করিয়াছেন, আমরা সেই পাঁচটি লক্ষণেরই বিচারের সার এখানে আলোচনা করিব। ঐ পাঁচটি লক্ষণের প্রথমটির রচয়িতা হইলেন পঞ্চপাদিকার প্রণেতা আচার্য পদ্মপাদ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়

অংশে সংযোগ ছিল না, সেই অংশই সংযোগের আশ্রয় হইবে। ইহা হইতে সংযোগ যে অব্যাপ্যবৃত্তি তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

লক্ষণটি বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির; চতুর্থ লক্ষণটি চিৎসুখাচার্য বিরচিত। পঞ্চম লক্ষণটির প্রণেতা হইলেন—আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য।[১] এই পঞ্চলক্ষণী আমরা পদ্মপাদ, প্রকাশাত্মযতি, চিৎসুখ প্রভৃতির বেদান্তমতের বিবরণ-প্রদানপ্রসঙ্গে আমাদের বেদান্তদর্শন-অদ্বৈতবাদের 'বেদান্তচিন্তার ইতিবৃত্ত' নামক প্রথম খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি।

বেদান্তের পরবর্তী ইতিহাসে, খণ্ডন-মণ্ডনযুগে তর্কতাণ্ডব পণ্ডিত ব্যাসরাজ, জয়তীর্থ প্রভৃতি জগতের সত্যতার সাধক দ্বৈতবেদান্তিগণের আক্রমণ *এবং আচার্য চিৎসুখ, মধুসূদন সরস্বতী, গৌড় ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির

১। আদ্যং স্যাৎ পঞ্চপাদ্যুক্তং ততো বিবরণোদিতে।
চিৎসুখীয়ং তৃতীয়ং স্যাদন্ত্যমানন্দবোধজম্ ॥

পদ্মপাদের প্রথম লক্ষণটি হইল (১) সদসদ্বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্। বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির লক্ষণ দুইটি হইল (২) প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধ প্রতিযোগিত্বম্ মিথ্যাত্বম্ অথবা (৩) জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্। চিৎসুখের চতুর্থ লক্ষণটি হইল—

স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্।

আনন্দবোধের পঞ্চম লক্ষণটি হইল—

সদ্বিবিক্তত্বং মিথ্যাত্বম্।

উল্লিখিত পাঁচটি লক্ষণের বিরুদ্ধে ব্যাসরাজ ন্যায়ামৃতে বলিয়াছেন—

অনির্বাচ্যোঽপ্রসিদ্ধাদিঃ প্রতীতেঃ প্রতিষেধ্যতা।
স্বাশ্রয়েঽত্যন্তবিরহঃ সদ্‌বিলক্ষণতা তথা ॥
ইতিপক্ষত্রয়েঽত্যন্তাসত্ত্বং স্যাদনিবারিতম।
ধীনাশ্যত্বেঽনিত্যত্বমেব স্যাৎ ন মৃষাত্মতা ॥

ন্যায়ামৃত, মিথ্যাত্বলক্ষণ বিচার

ব্যাসরাজের উক্তির তাৎপর্য এই যে, বস্তু হয় সৎ হইবে, নতুবা অসৎ হইবে সৎ ও অসৎ এই উভয়ের বিলক্ষণ বা বিসদৃশ কোনও বস্তু নাই বলিয়া, প্রথম লক্ষণে অপ্রসিদ্ধ দোষ দেখা দেয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ লক্ষণে দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের অত্যন্ত অসত্ত্বই আসিয়া দাঁড়ায়। পঞ্চম লক্ষণে প্রপঞ্চের অনিত্যত্বই সিদ্ধি হয়, মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হয় না। সুতরাং মিথ্যাত্বের প্রদর্শিত পাঁচটি লক্ষণের কোন লক্ষণই নিঃসন্দেহভাবে অদ্বৈতবেদান্তীর অভিপ্রেত জগতের মিথ্যাত্ব সাধন করিতে পারে না। ব্যাসরাজের এইরূপ আপত্তির সমাধান আমাদের পরবর্তী আলোচনায় সুধী পাঠক দেখিতে পাইবেন।

প্রতি আক্রমণের ফলে অদ্বৈতচিন্তা উপলখণ্ড প্রতিহত স্রোতস্বতীর ন্যায় কিরূপ দুর্বার গতিবেগ লাভ করিয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য পুনরায় এই প্রসঙ্গ আমরা আলোচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। উল্লিখিত মিথ্যাত্বের লক্ষণের আলোচনার মূল উৎস কোথায়, ইহা যদি পরীক্ষা করা যায়, তবে দেখা যায়, ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর তাঁহার অধ্যাসভাষ্যে "অধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্", 'অধ্যাস মিথ্যা হওয়াই উচিত' এইরূপে যে 'মিথ্যা' পদটির প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যায় আচার্য পদ্মপাদ তাঁহার পঞ্চপাদিকায় বলিয়াছেন, মিথ্যাশব্দের দুইটি অর্থ দেখা যায়—একটি অসম্ভব, দ্বিতীয়টি অনির্বচনীয়তা। প্রথম অর্থে 'অধ্যাসো মিথ্যা', অর্থাৎ চিৎ ও অচিতের গ্রন্থিরূপ অধ্যাস সম্ভবপর নহে; দ্বিতীয় অর্থে অধ্যাস অনির্বচনীয়, ইহাই স্পষ্টতঃ বুঝা যায়।[১] অনির্বচনীয়, অর্থাৎ সৎও নহে, অসৎও নহে; সদসৎও নহে; যে বস্তুকে সৎ বা সত্যরূপেও নির্বচন করা চলে না, অসত্যরূপেও নিরূপণ করা যায় না, সত্যাসত্যরূপেও ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় না; এইরূপ বস্তুই অনির্বচনীয় আখ্যা লাভ করে। অনির্বচনীয় বস্তুমাত্রই মিথ্যা। ফলে, 'সদসদ্বিলক্ষণত্ব'ই মিথ্যাত্ব, এইরূপ মিথ্যাত্বের লক্ষণই আসিয়া পড়ে। পদ্মপাদ এই দৃষ্টিতেই তাহার মিথ্যাত্বের লক্ষণ বা পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পদ্মপাদের এই লক্ষণটি চিৎসুখ তাঁহার গ্রন্থে মিথ্যাত্বের পঞ্চম লক্ষণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। প্রতিবাদী দ্বৈতবেদান্তী প্রভৃতি সৎ ও অসৎ, এই উভয়ের অনধিকরণ বস্তু অপ্রসিদ্ধ বলিয়া আলোচ্য লক্ষণের অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদী বলেন, সৎ না হইলেই অসৎ হইবে, অসৎ না হইলেই তাহা সৎ হইবে, কোন বস্তুই সৎ ও অসৎ, এই উভয়ের অনধিকরণ হইবে না, হইতে পারে না। এইরূপে প্রতিবাদী যে আপত্তি তুলিয়াছেন, সেই আপত্তির বিশেষ কিছুই মূল্য নাই। সৎ এবং অসৎ এই উভয়ের অভাব যে একই ধর্মীতে থাকিতে পারে, তাহা নিম্নোক্ত অনুমানের সাহায্যে সহজেই উপপাদন করা চলে। সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই উভয়েরই অত্যন্তাভাব কোন এক ধর্মী বা আশ্রয়ে বর্তমান থাকিবে

পদ্মপাদোক্ত মিথ্যাত্বের লক্ষণ

১। মিথ্যাশব্দো দ্ব্যর্থঃ—অপহ্নব বচনোঽনির্বচনীয়তাবচনশ্চ।

পঞ্চপাদিকা, ৬৭—৬৮ পৃঃ।

(সাধ্য), যেহেতু এই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব কোন-না-কোন বিশেষ্যেরই ধর্ম (হেতু), যেমন রূপ ও রস (সপক্ষ দৃষ্টান্ত)।[১]

রূপ ও রস এই উভয়ই পৃথিবী এবং জলের ধর্ম বটে, অথচ ইহাদের অভাব বায়ুতে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে, রূপ ও রসে ধর্মত্বরূপ হেতু যেমন আছে, সেইরূপ একই ধর্মীতে (বায়ুতে) রূপ ও রসের অত্যন্তাভাব থাকায়, রূপ ও রসে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ সাধ্যও থাকিল। এইরূপে অনুমানাঙ্গ হেতু, সাধ্য এবং হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি প্রসিদ্ধই হইল। আলোচ্য অনুমানের পক্ষ—সত্ত্ব ও অসত্ত্বে ধর্মত্বরূপ হেতু বিদ্যমান থাকায়, হেতুর পক্ষবৃত্তিতাও পাওয়া গেল এবং অনুমানটি যে নির্দোষ তাহাও বুঝা গেল। উক্ত অনুমানবলে সত্ত্ব এবং অসত্ত্বরূপ ধর্মের অত্যন্তাভাবও যে কোন একটি ধর্মী বা বিশেষ্যে পাওয়া যাইবে তাহাও সাব্যস্ত হইল।

প্রতিবাদী হয়ত বলিবেন যে, রূপ ও রসের অভাব বায়ুতে আছে, তাহা কে অস্বীকার করিতেছে? রূপ ও রসের অভাব কোন এক ধর্মীতে থাকিলেও, সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের অভাব কোথায়ও থাকিবে না। ধর্মী বা বিশেষ্য পদার্থটি হয় সৎ হইবে, নতুবা অসৎ হইবে। সৎ না হইলে, বস্তু অসৎ হইবে, অসৎ না হইলে, বস্তু সত্য হইবে। সৎ এবং অসৎ এমনই পরস্পরবিরোধী যে ইহারা কোন এক বস্তুতে কদাচ থাকিবে না, ইহাদের উভয়ের অত্যন্তাভাবও কোন এক স্থলে পাওয়া যাইবে না। এই অবস্থায় অদ্বৈতবাদীর উল্লিখিত অনুমান সত্ত্ব ও অসত্ত্বের একত্র (কোন এক ধর্মী বা বিশেষ্যে) অবস্থানের সহায়ক হইবে কিরূপে?

অদ্বৈতবাদীর উল্লিখিত অনুমানের মর্ম এবং প্রতিবাদী মাধ্বের আপত্তির ভিত্তি কোথায় তাহা জানিতে হইলে, সর্বাগ্রে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব বলিলে বাদী, প্রতিবাদী কে কি বোঝেন, তাহাই স্পষ্টতঃ জানা আবশ্যক। সতের অভাবই অসৎ, অসতের অভাবই সৎ। সৎ ও অসৎ এইরূপ পরস্পরবিরোধী যে, যাহা সৎ নহে, তাহাই অসৎ, আর যাহা অসৎ নহে, তাহাই সৎ। সৎ ও অসতের এইরূপ অর্থ অদ্বৈতবাদী গ্রহণ করেন না। ইহা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে অনির্বচনীয় অবিদ্যার স্বরূপনিরূপণে

১। সদসত্ত্বে একধর্মিনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনী ধর্মত্বাৎ রূপরসবৎ।
চিৎসুখী, মিথ্যাত্বলক্ষণবিচার।

আলোচনা করিয়াছি। অদ্বৈতবাদী বলেন, যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, এই তিনকালের কোন কালেই বাধিত হয় না, তাহাই একমাত্র সৎ বা সত্য বস্তু। পরব্রহ্মই সুতরাং একমাত্র সত্য বস্তু। আর যাহা কোন স্থলেই (কোন আশ্রয়ে বা আধারেই) সদ্‌রূপে প্রতীতির বিষয় হয় না, যাহাতে কোনরূপ বস্তুত্বই নাই, সেইরূপ 'বস্তুশূন্য' অর্থাৎ বাস্তবতার সর্বপ্রকার সংস্পর্শবর্জিত অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতিই 'অসৎ' বলিয়া জানিবে।[১] সদ্‌রূপে কেন? যাহা সত্য বা মিথ্যা কোনরূপ প্রতীতিরই কদাচ গোচর হয় না, তাহাই অসৎ। 'অয়ং বন্ধ্যা পুত্রো যাতি', 'ইদম্ আকাশকুসুমং সুরভি', এইরূপ সত্য বা মিথ্যা কোনরূপ অনুভবই জন্মে না। এইজন্য বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম প্রভৃতিকে অলীক বা অসৎ বলা হইয়া থাকে। শুক্তিরজতের রজত অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে মিথ্যা হইলেও, তাহা অসৎ নহে। সত্যজ্ঞানের তাহা বিষয় না হইলেও, ভ্রমপ্রতীতির তাহা বিষয় হয়। রূপার খণ্ড মনে করিয়া তাহা লইবার জন্য ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহার প্রতি ধাবিতও হয়। এইরূপ রজতকে আকাশকুসুমের মত অসৎ বলা যায় কিরূপে? সৎ ও অসৎ অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে এমন দুইটি বিরুদ্ধ কোটি যে তাহাদের মিলন সম্ভবপর না হইলেও, তাহাদের অন্তরালে মিথ্যা-জগতেরও স্থান আছে।

মিথ্যা—শুক্তিরজত,

দৃশ্যমান ঘটাদি বিশ্বপ্রপঞ্চ

সৎ-ত্রিকালাবাধ্য
পরমসৎ—পরব্রহ্ম,
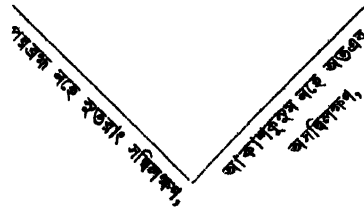
অসৎ—ইদংরূপে
প্রতীতির অযোগ্য
অলীক আকাশকুসুম
প্রভৃতি

এইরূপ জগৎপ্রপঞ্চ অনির্বচনীয়।

১। ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপসত্ত্বব্যতিরেকো নাসত্ত্বম্, কিন্তু কচিদপ্যুপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানাধিকরণত্বম্।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৫০-৫১ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

শুক্তিরজত যতক্ষণ ভ্রম থাকে, ততক্ষণই সৎ বা সত্যরূপে প্রতীতির গোচর হয়। সুতরাং শুক্তিরজতে অসৎ আকাশকুসুম প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য সুস্পষ্ট। শুক্তির জ্ঞানোদয়ে বাধিত হয় বলিয়া, ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্তেরও ইহা বিলক্ষণ বা বিসদৃশ। যাহা সৎ ও অসতের বিলক্ষণ তাহাই মিথ্যা। ফলে, শুক্তিরজত মিথ্যালক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় মিথ্যাই হইল। দৃশ্যমান ঘটাদি বিশ্বপ্রপঞ্চেও শুক্তি-রজতের ন্যায়ই সৎ পরব্রহ্ম এবং অসৎ আকাশকুসুম প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য থাকায়, বিশ্বপ্রপঞ্চেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল।

প্রতিবাদী মাধ্বের মতে যাহা বাধ্য তাহাই অসৎ, আর যাহা বাধ্য নহে, তাহাই সৎ—'বাধ্যত্বম্ অসত্ত্বম্, অবাধ্যত্বং সত্ত্বম্।' শুক্তিরজত প্রভৃতি বাধ্য বলিয়াই তাহা অসৎ। পরব্রহ্ম এবং পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ অবাধ্য বলিয়াই সৎ বা সত্য। সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এইরূপে পরস্পর বিরহ বা অভাবস্বরূপ। এইজন্য মাধ্ব আলোচিত মিথ্যাত্বলক্ষণের বিরুদ্ধে বলেন যে, সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এই উভয়বিধ ধর্মই যদি মিথ্যাত্বের গ্রাহক হেতু হয়, তবে অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বপ্রপঞ্চে যদি সত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকে, তবেই তো প্রপঞ্চে অসত্ত্ব থাকিল, সেক্ষেত্রে প্রপঞ্চে অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিবে কিরূপে? এইভাবে জাগতিক বস্তুরাজিতে যদি অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকে, তাহা হইলেই তো সেখানে সত্ত্ব থাকিল, সত্ত্বের অত্যন্তাভাব সেখানে থাকে কিরূপে?

সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর বিরহরূপ নহে

মাধ্বের এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, এইজন্যই তো সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে আমরা মাধ্ব পণ্ডিতগণের ন্যায় পরস্পরের অভাবরূপ বলি না। সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব যদি পরস্পর অভাবরূপ হয়, তবেই মাধ্ব বলিতে পারেন, যেখানে প্রপঞ্চে সত্ত্বাভাব আছে, সেইখানেই যদি প্রপঞ্চে অসত্ত্বেরও অভাব থাকে, তবে অসত্ত্ব কোন মতেই সত্ত্বের অভাবরূপ হইতে পারে না। এইরূপে যেখানে অসত্ত্বের অভাব থাকে, সেইখানেই যদি সত্ত্বেরও অভাব থাকে, তবে সত্ত্ব অসত্ত্বের অভাবরূপ হয় না। মাধ্বের প্রদর্শিত অনুপপত্তি অদ্বৈতমতের পোষকতাই সম্পাদন করে। কেননা, অদ্বৈতবাদী তো আর সত্ত্ব এবং অসত্ত্বকে পরস্পর বিরহরূপ বলেন না।

সত্ত্ব এবং অসত্ত্বকে পরস্পর বিরহব্যাপকও বলা চলে না। অসত্ত্ব

যদি সত্ত্বাভাবের ব্যাপক হয়, তবে যেখানে যেখানে সত্ত্বাভাব থাকিবে, অসত্ত্বও সেখানে অবশ্যই থাকিবে। নতুবা অসত্ত্ব ও সত্ত্বাভাবের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। শুক্তিরজত শুক্তির জ্ঞানোদয়ে বাধিত হয় বলিয়া, উহা ত্রিকালাবাধ্য সৎ নহে। শুক্তিরজতে সত্ত্বাভাবই আছে। সত্ত্বাভাব থাকিলেও শুক্তিরজত কিন্তু আকাশকুসুম প্রভৃতির ন্যায় অসৎ নহে। সত্ত্বাভাবের ন্যায় অসত্ত্বাভাবও শুক্তিরজতে আছে। ফলে, সত্ত্বাভাব থাকিলেই সেখানে অসত্ত্ব থাকিবে, এইরূপ মাধ্বের ব্যাপ্তি ব্যভিচারী হইতে বাধ্য। অসত্ত্বকে যেমন সত্ত্বাভাবের ব্যাপক বলা যায় না, সেইরূপ সত্ত্বকেও অসত্ত্বাভাবের ব্যাপক বলা চলে না। শুক্তিরজতে অসত্ত্বাভাব থাকিলেও ত্রিকালাবাধ্যরূপ সত্ত্ব সেখানে নাই। এইজন্য সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে পরস্পর বিরহব্যাপকও বলা চলিতে পারে না।

সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর বিরহ-ব্যাপক নহে

সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে পরস্পর বিরহের ব্যাপ্য বলিতে অবশ্য অদ্বৈতবাদীরও আপত্তির কোনই কারণ নাই। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেখানে সত্ত্বাভাব আছে, সেখানেই যদি অসত্ত্বেরও অভাব থাকে, (যেমন অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্তে মিথ্যা শুক্তিরজত প্রভৃতিতে আছে) তবে অসত্ত্ব সত্ত্বাভাবের, সত্ত্ব অসত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য হইবে কিরূপে? সত্ত্ব থাকিলে অসত্ত্ব থাকে না, অসত্ত্ব থাকিলেও সত্ত্ব থাকে না, ইহাই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর বিরহবাপ্য বলিয়া অদ্বৈতবাদী বুঝাইতে চাহেন। পরস্পর বিরহব্যাপ্য এই সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব কোন এক বস্তুতে থাকিবে না। ইহাদের উভয়ের অভাব কিন্তু একই বস্তুতে পাওয়া যাইবে। গোত্ব এবং অশ্বত্ব পরস্পর বিরহব্যাপ্য—গোত্ব অশ্বত্বাভাবের বাপ্য, অশ্বত্বও গোত্বাভাবের ব্যাপ্য। গোত্ব থাকিলেই অশ্বত্বাভাব থাকিবে, অশ্বত্ব থাকিলেই গোত্বাভাবও থাকিবে। ফলে, "অশ্বত্বাভাবাবান্ গোত্বাৎ," "গোত্বাভাববান্ অশ্বত্বাৎ" এই প্রকার অনুমানের প্রয়োগও দোষাবহ হইবে না। পরস্পর বিরহব্যাপ্য গোত্ব এবং অশ্বত্ব কোনও একই ধর্মী বা বিশেষ্যে কদাচ বিরাজ করিবে না। কিন্তু গোত্ব ও অশ্বত্ব, এই উভয়ের অভাব গজ, উট, মহিষ প্রভৃতিতে পাওয়া যাইবে। এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব, এই উভয়ের অভাব দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চে, শুক্তিরজত প্রভৃতিতে দেখা যাইবে। সুতরাং ঐ সকল

শুক্তিরজত বা ঘট প্রমুখ বস্তুকে সদসদ্‌বিলক্ষণ বা মিথ্যা বলিতে আপত্তি কি? জাগতিক বস্তুকে আলোচ্য দৃষ্টিতে 'সদসদ্‌বিলক্ষণ' বা মিথ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করায়, প্রতিবাদী মাধ্ব প্রভৃতি 'সদসদ্‌বিলক্ষণ'রূপ সাধ্য অপ্রসিদ্ধ বলিয়া, পঞ্চপাদিকোক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণে যে 'সাধ্যাপ্রসিদ্ধি' দোষের উদ্ভাবন করিয়াছেন, ঐ দোষও এখন অচল হইয়া দাঁড়াইল।* পঞ্চপাদিকাবিবরণের রচয়িতা প্রকাশাত্মযতি বলেন—যেই বস্তুর যাহা আধার বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই আধার বা আশ্রয়েই যদি সেই বস্তুর অত্যন্তাভাব থাকে, তবে সেই বস্তু অবশ্য মিথ্যাই হইবে।[১]

বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির মতে মিথ্যাত্বের লক্ষণ

* এইরূপে 'সদসদ্বিলক্ষণত্ব'ই মিথ্যাত্ব, এই প্রকার পদ্মপাদাচার্যের লক্ষণ নির্দোষ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, শুক্তি-রজতের রজতকে অদ্বৈতবাদী 'অসৎ' বলেন না, প্রতিভাসিকভাবে সৎ বলেন। উহাকে অসৎ বলেন মাধ্ব। অসৎখ্যাতিবাদী মাধ্বের মতে ভ্রমস্থলে অত্যন্ত অসৎ বস্তুরই খ্যাতি হইয়া থাকে। মাধ্বসম্প্রদায়ের মতে যাহা অবাধ্য, তাহাই সৎ, যাহা বাধ্য তাহাই অসৎ। বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং পরব্রহ্ম-পুরুষোত্তম, এই উভয়ই অবাধ্য, উভয়ই সৎ। শুক্তিরজত এবং আকাশকুসুম ইহারা উভয়েই বাধ্য এবং উভয়েই অসৎ। আকাশকুসুম প্রভৃতি যাহা সত্য বা মিথ্যা কোনরূপ প্রতীতিরই বিষয় হয় না, তাহাদিগকে ভ্রমের ক্ষেত্রে 'শুক্তিরজতং সৎ' এই প্রকারে সত্যরূপে প্রতীয়মান রজতের সহিত এক জাতীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে অদ্বৈতবাদী কোনমতেই প্রস্তুত নহেন। শুক্তিরজত ভ্রমপ্রতীতির বিষয় হয়, আকাশকুসুম সত্য-মিথ্যা কোনরূপ জ্ঞানেই ভাসে না। এইজন্য অত্যন্ত অসৎ অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতিকে শুক্তিরজতের ন্যায় অসৎ বলিতে অসৎখ্যাতিবাদী মাধ্বের আগ্রহ থাকিলেও, অদ্বৈতবাদীর কোনই আগ্রহ নাই। সেই দিক হইতে বিচার করিলে পদ্মপাদের আলোচ্য লক্ষণে মিথ্যাকে 'অসদ্বিলক্ষণত্বম্' বলিয়া ব্যাখ্যা করার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। প্রাচীন অদ্বৈতবেদান্তী নৃসিংহাশ্রম তাঁহার অদ্বৈতদীপিকায় মিথ্যাত্বের লক্ষণে মিথ্যাকে এইজন্যই 'অসদ্বিলক্ষণ' বলিয়া বিবৃত করেন নাই। আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য তাঁহার ন্যায়মকরন্দেও সত্য বা সৎ হইতে যাহা বিবিক্ত বা পৃথক্ তাহাকেই মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ন্যায়মকরন্দের লক্ষণ পরে আমরা বিচার করিয়াছি।

১। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্; অথবা প্রতিপন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিত্বমেব মিথ্যাত্বং নাম। পঞ্চপাদিকা বিবরণ।

আচার্য চিৎসুখও এই মর্মেই তদীয় 'চিৎসুখী'তে নিম্নোক্ত পদ্যে মিথ্যাত্বের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বিবরণের অনুরূপ চিৎসুখের মিথ্যাত্বের লক্ষণ (চতুর্থ লক্ষণ)

সর্বেষামেব ভাবানাং স্বাশ্রয়ত্বেন সম্মতে।
প্রতিযোগিত্বমত্যন্তাভাবং প্রতি মৃষাত্মতা ॥[১]

তত্ত্বপ্রদীপিকা, ৩৯ পৃঃ।

সকল প্রকার ভাব বস্তুরই নিজের আশ্রয় বা আধার বলিয়া যাহা পরিচিত, সেই আধারেই যদি ঐ সকল ভাববস্তুর অত্যন্তাভাব প্রতীতি-গোচর হয়, তবে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঐ সকল ভাববস্তুকে মিথ্যা বলিয়াই জানিবে। চিৎসুখাচার্যের ছন্দে গ্রথিত এই মিথ্যাত্বের লক্ষণটিকে গদ্যে রূপায়িত করিয়া ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাঁহার বেদান্তপরিভাষায় গ্রহণ করিয়াছেন।

বিবরণ ও তত্ত্বপ্রদীপিকার অনুরূপ-বেদান্ত পরিভাষার মিথ্যাত্বের লক্ষণ

মিথ্যাত্বঞ্চ স্বাশ্রয়ত্বেনাভিমতযাবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতি-যোগিত্বম্।

বেদান্তপরিভাষা, ১৬৪ পৃঃ,
কলিঃ বিশ্বঃ বিঃ সং।

যেই বস্তুর আশ্রয় বলিয়া যাহা প্রতীত হয়, সেই আশ্রয়েই যদি ঐ বস্তুর অত্যন্তাভাব পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ বস্তুকে মিথ্যা বলিয়াই বুঝিতে হইবে।
উল্লিখিত তিনটি মিথ্যাত্ব লক্ষণেরই বক্তব্য অনেকাংশে তুল্যরূপ। সেইজন্য তিনটি লক্ষণকে একত্রই আমরা বিচার করিতেছি। প্রকাশাত্মযতি ও চিৎসুখাচার্যের লক্ষণ দুইটির যদি তুলনামূলক বিচার করা যায়, তবে দেখা যায় যে, উভয় লক্ষণেরই বিশেষ্য পদ দুইটি একই অর্থের সূচনা করে। "ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগী" বলিতে যাহা বুঝায়, অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী বলিলেও তাহাই বুঝায়। সদাতন বা নিত্য সংসর্গাভাবকেই অত্যন্তাভাব বলে।[২] নিত্যসংসর্গাভাব বলিতে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালেই

১। চিৎসুখীর লক্ষণটিকে গদ্যে রূপায়িত করিলে লক্ষণটি নিম্নরূপ দাঁড়ায়—স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী 'অদ্বৈত-সিদ্ধি'তে চিৎসুখাচার্যের মিথ্যাত্বের লক্ষণ বলিয়া উল্লিখিত গদ্যে রূপায়িত লক্ষণেরই অবতারণা করিয়াছেন।

২। অভাবস্তু দ্বিধা সংসর্গান্যোন্যাভাবভেদতঃ।
প্রাগভাবস্তথাধ্বংসোঽপ্যত্যন্তাভাব এব চ ॥

যাহার অত্যন্তাভাব পাওয়া যায়, তাহাকে বুঝায়। ফলে, ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী আর অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী একই কথা হইল। লক্ষণের বিশেষ্যাংশ যেমন সমান, বিশেষণাংশও সেইরূপ সমান। বিবরণে প্রকাশাত্মযতি যাহাকে 'প্রতিপন্নোপাধি' (উপাধি বা আশ্রয় বলিয়া যাহা প্রতীত হয়) বলিয়াছেন, তাহাকেই চিৎসুখাচার্য ভাষান্তরে বলিয়াছেন—'স্বাশ্রয়ত্বেন সম্মতে' নিজের আশ্রয় বা আধার বলিয়া যাহা প্রতিভাত হয়। এইরূপে লক্ষণ দুইটির বিশেষ্য এবং বিশেষণ অংশ একই অর্থ প্রকাশ করায়, ইহাদের যে কোনরূপ মৌলিক পার্থক্য নাই তাহা সহজেই বুঝা যায়।[১]

ধৃত লক্ষণে নিজের আশ্রয় বলিয়া অভিমত (প্রতিপন্নোপাধৌ) এইরূপ বলায় অসৎ আকাশকুসুম প্রভৃতিতে মিথ্যাত্বের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না।

এবং ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ সংসর্গাভাব ইষ্যতে।

ভাষাপরিচ্ছেদ, ১২-১৩ কারিকা।

নিত্যসংসর্গাভাবত্বমত্যন্তাভাবত্বম্।

সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, ১২ কারিকা।

১। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির লক্ষণ এবং চিৎসুখের লক্ষণের মধ্যে যদি কোনরূপ পার্থক্য নাই থাকে, তবে আলোচ্য লক্ষণ দুইটি পুনরুক্তিদোষে দূষিত হয় না কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে বলিয়াছেন—চিৎসুখাচার্যের স্বীয় আশ্রয়ে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী—'স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্', এই লক্ষণটিকে নিজের অত্যন্তাভাবের অধিকরণেই প্রতীয়মান—স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণ এব প্রতীয়মানত্বম্, এইরূপে ব্যাখ্যা করিলেই লক্ষণদ্বয়ের সর্বাংশে তুল্যতা থাকে না, পুনরুক্তিরও প্রশ্ন আসে না। অবশ্য এইরূপভাবে চিৎসুখের লক্ষণটিকে ব্যাখ্যা করিলেও, তাহাতে বিশেষ্য ও বিশেষণাংশের পরিবর্তন ব্যতীত মৌলিক কোনও ভেদ সাধিত হইবে না। পূর্বে চিৎসুখের লক্ষণের যাহা বিশেষ্য ছিল, এই পরিবর্তিত অবস্থায় তাহা বিশেষণে রূপান্তরিত হইয়াছে, পূর্বে যাহা বিশেষণ ছিল তাহা বিশেষ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে এইমাত্র। অর্থাৎ বিবরণোক্ত লক্ষণের যাহা বিশেষ্য চিৎসুখের লক্ষণে তাহা বিশেষণ, বিবরণের লক্ষণের যাহা বিশেষণ, চিৎসুখের লক্ষণের তাহা বিশেষ্য। এসম্পর্কে বিশেষ কথা অদ্বৈতসিদ্ধিতে চতুর্থ মিথ্যাত্ব-লক্ষণের বিচার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে। "স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্। তচ্চ স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণ এব প্রতীয়মানত্বম্। অতঃ পূর্ববৈলক্ষণ্যম্"। অদ্বৈতসিদ্ধি ১৮২-৮৩ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং।

কেননা, কোন বস্তুই তো অবস্তু আকাশকুসুম প্রভৃতির আধার বলিয়া প্রতীতি-গোচর হইবে না। আকাশ প্রভৃতি যে সকল বস্তু কদাচ আশ্রিত হয় না, সেইরূপ আকাশ প্রভৃতিতে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হয়। এইজন্য অদ্বৈতবাদী বলেন, মিথ্যা বস্তুমাত্রই আমাদের (অদ্বৈতবাদীর) মতে সদাশ্রিত। ব্রহ্মসত্তাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই নিখিল বিশ্ব সত্য স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে। জগদাধার আত্মাই সকল বস্তুর আশ্রয় এবং অধিষ্ঠান। মিথ্যা কোন বস্তুই অনাশ্রিত নহে। কেবল সর্বাধার আত্মাই অনাশ্রিত। এই অবস্থায় আকাশাদি প্রপঞ্চে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তির প্রশ্নই আসে না। নিত্য সত্য ব্রহ্মই কেবল অনাশ্রিত বলিয়া, অতিব্যাপ্তির প্রশ্নও হয় অবান্তর।

লক্ষণস্থ পদের ব্যাবৃত্তি

এখানে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রকাশাত্মযতির উল্লিখিত লক্ষণে 'প্রতিপন্নোপাধি'[১] বলিয়া, উপাধি বা আশ্রয়ের যে প্রতিপত্তি বা প্রতীতির কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রতীতি কি সত্য? না মিথ্যা? এই প্রতীতি যদি সত্য হয়, অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ে বস্তুটি যদি যথার্থতঃই থাকে, তবে সেই বস্তুর সেখানে অত্যন্তাভাব কোনমতেই থাকিতে পারে না; ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগীও তাহা হয় না। লক্ষণটি এইরূপে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রতীতিকে (প্রতিপত্তিকে) যদি মিথ্যা বলা হয়, তবে লক্ষণে সিদ্ধসাধন দোষ অনিবার্য হয়। কারণ, যেখানে যে বস্তু নাই, সেই ভ্রমজ্ঞানের বিষয় শুক্তিরজত প্রভৃতির ক্ষেত্রে শুক্তিতে রজতের অত্যন্তাভাব তো প্রতিবাদী মাধ্ব প্রভৃতিও স্বীকার করেন। লক্ষণে নূতন কথা তাহা হইলে কি হইল? এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, প্রতিপত্তি বা প্রতীতি বলিতে এখানে সাধারণ প্রতীতিই বুঝাইতেছে। সত্য প্রতিপত্তি বা মিথ্যা প্রতিপত্তি, এইরূপ প্রতিপত্তির কোন বিশেষ রূপ বুঝাইতেছে না। সেইরূপ অর্থ এখানে অভিপ্রেতও নহে। "পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এইরূপ অনুমানে পর্বত পক্ষ, বহ্নি সাধ্য এবং ধূম হেতু। মহানস (চুলা) প্রভৃতিতে ধূম দর্শন আছে; সুতরাং মহানস (চুলা) হইল এই অনুমানের দৃষ্টান্ত। মহানসে ধূম দর্শন আছে বলিয়া, যদি ধূম বলিতে এখানে মহানসীয় ধূমকে লক্ষ্য করা হয়, তবে পর্বতে মহানসীয় ধূম নাই বলিয়া, উক্ত অনুমানে স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস অবশ্যম্ভাবী হয়। এই স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস নিবারণের

আশ্রয় বা আধারে বস্তুর প্রতিপত্তি বা প্রতীতি কি সত্য, না মিথ্যা?

১। প্রতিপূর্বক পদ্ ধাতু কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া প্রতিপন্ন পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রতিপন্ন অর্থ প্রতিপত্তি বা জ্ঞানের বিষয়। উপাধি শব্দের অর্থ আশ্রয়। প্রতিপত্তির বিষয় এইটি আশ্রয়ের বিশেষণ। সুতরাং প্রতিপত্তি বা জ্ঞানের বিষয় হিসাবে যেই উপাধি বা আধারকে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, প্রতিপন্ন উপাধি বলিলে তাহাকেই বুঝায়।

জন্য যদি পর্বতীয় ধূমকেই হেতুরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে অনুমানের দৃষ্টান্ত মহানসে (চুলায়) পর্বতীয় ধূম না থাকায়, দৃষ্টান্তে সাধন বা হেতুর অস্তিত্বই থাকে না, ফলে সাধ্যসিদ্ধিও হয় না। দৃষ্টান্ত—মহানস এইরূপে হেতু এবং সাধ্য এই উভয়বিহীন হওয়ায়, মহানস বা চুলাকে উক্ত অনুমানের দৃষ্টান্তরূপেই গ্রহণ করা চলে না। এই অবস্থায় পর্বতে বহ্নির অনুমানকে দোষমুক্ত করিতে হইলে, অনুমানের হেতু ধূমকে শুধু ধূমরূপেই (সামান্যতঃ ধূমত্বাবচ্ছিন্নরূপেই) গ্রহণ করিতে হইবে। পর্বতীয়, মহানসীয় প্রভৃতি কোন প্রকার বিশেষ ধূম বলিলে চলিবে না। এক্ষেত্রেও সেইরূপ প্রতিপত্তি বলিতে প্রতীতিমাত্রকেই বুঝিতে হইবে; সত্য বা মিথ্যা এইরূপে কোন বিশেষ প্রতিপত্তি বুঝিলে চলিবে না।

প্রতিপত্তি বলিতে এখানে যদি প্রতীতিমাত্রকেই বুঝায়, কোনপ্রকার বিশেষ প্রতিপত্তি বা প্রতীতিকে না বুঝায়, তবে তো আলোচ্য লক্ষণে সিদ্ধসাধনদোষই আসিয়া পড়িবে। কারণ, জগতের সত্যতাবাদী নৈয়ায়িকের মতে আমরা দেখিতে পাই, শুক্তিরজত প্রভৃতি বিভ্রমের স্থলে 'জ্ঞানলক্ষণা'[১] সন্নিকর্ষবশতঃ শুক্তিতে আপণস্থ রজতেরই ভাতি হইয়া থাকে; এবং 'নেদং রজতম্', ইহা রজত নহে, এইরূপ বাধবুদ্ধিদ্বারা শুক্তিতে (ঝিনুকখণ্ডে) কল্পিত মিথ্যারজতের সম্পর্কই ব্যাহত হয়। কল্পিত মিথ্যারজতের আশ্রয় শুক্তিতে প্রতীত ভ্রান্ত রজত ত্রৈকালিক নিষেধের অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হওয়ায়, ঐ রজত যে মিথ্যা হইবে, তাহা তো আমরা

১। জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ কাহাকে বলে? যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, অথচ যাহাকে আমি জানি, যাহা সম্মুখে অনুপস্থিত থাকিয়াও আমার জ্ঞানে ভাসে, ঐরূপ জ্ঞায়মান অনুপস্থিত বস্তুর সম্মুখস্থরূপে প্রতীতি হইয়া যে প্রত্যক্ষজ্ঞানোদয় হয়, তাহাকে জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষ বলা হইয়া থাকে। সম্মুখে অবস্থিত ঝিনুকের খণ্ডে রজত নাই। ঝিনুকের চাকচিক্যের সহিত রজতের সাদৃশ্য থাকায়, ঝিনুক দেখিয়া রজত আমার জ্ঞানে ভাসিল। রজত এখানে নাই, রজত ব্যবসায়ীর দোকানে আছে। সেই দোকানস্থ রজতের "ইদং রজতম্"রূপে সম্মুখস্থ হইয়া যে ভাতি হইল, এবং 'ইহা রজত', এইরূপে দূরস্থ রজতের যে প্রত্যক্ষ হইল, তাহাই জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ জন্য রজতের প্রত্যক্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রত্যক্ষে সর্বত্রই দৃশ্যমান বিষয়ের সম্মুখে উপস্থিতি কারণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, অনুপস্থিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। শুক্তিরজতের ক্ষেত্রে রজতের দ্রষ্টার সম্মুখে উপস্থিতি কোথায়? রজত তো ব্যবসায়ীর দোকানে আছে, এখানে তো নাই। অনুপস্থিত রজতের প্রত্যক্ষ হইল কি করিয়া? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িক "জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ"বশতঃ দূরস্থ রজতের প্রত্যক্ষ উপপাদন করিয়াছেন।

(প্রতিবাদীরা)ও অস্বীকার করি না। তোমরা (অদ্বৈতবাদীরা) মিথ্যাত্বের লক্ষণে নূতন কথা কি বলিলে ? যাহা বাদী প্রতিবাদী উভয়ের নিকটই মিথ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই মিথ্যা শুক্তিরজতের মিথ্যাত্ব সাধন করায় অদ্বৈতবেদান্তোক্ত মিথ্যাত্বের লক্ষণ 'সিদ্ধসাধন'দোষে কলুষিত হইবে নাকি ?

আলোচ্য 'সিদ্ধসাধনতার' খণ্ডনে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, উল্লিখিত মিথ্যাত্ব লক্ষণে যে "অভিমত উপাধি" (প্রতিপন্নোপাধি) বা আশ্রয়ের কথা বলা হইয়াছে, সেই আশ্রয়কে যতপ্রকার আশ্রয় সম্ভবপর, সেই সর্ববিধ আশ্রয় (যদ্ যাবতীয় আশ্রয়) এইরূপে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে। কেবল ভ্রান্তরজতের আশ্রয় ধরিলে চলিবে না; তথাকথিত সত্যরজতের আশ্রয়কেও ধরিতে হইবে; তাহা হইলে আর প্রতিবাদীর প্রদর্শিত সিদ্ধসাধনতার প্রশ্ন উঠিবে না। রজতের আশ্রয়রূপে যাহা যাহা আমাদের জ্ঞানে ভাসে, সেই সকলপ্রকার আশ্রয়ে যদি রজত অত্যন্তাভাবের (ত্রৈকালিক নিষেধের) প্রতিযোগী হয়, তবেই তাহা মিথ্যা হইবে। শুক্তিরজতের রজত উল্লিখিত দৃষ্টিতে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইলেও, আপণস্থিত সত্যরজত তো প্রতিবাদীর মতে রজতের অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী নহে। ঐ আপণস্থ সত্য-রজতেরও মিথ্যাত্ব অদ্বৈতবেদান্তীর অভিপ্রেত। অদ্বৈতবাদীর মতানুসারে রজতের আশ্রয় বা আধার বলিয়া যদি রজতের যতপ্রকার আধার বা আশ্রয় আছে (তাহা সত্যরজতের আশ্রয় আপণ প্রভৃতিই হউক, কিংবা ভ্রান্তরজতের আশ্রয় শুক্তি প্রভৃতিই হউক) সেই সর্বপ্রকার আশ্রয়কেই ধরা যায় এবং সেই সর্ববিধ আশ্রয়েই যদি রজতের অত্যন্তাভাব পাওয়া যায়, তবে তথাকথিত সত্য, মিথ্যা সকল প্রকার রজতেরই মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে। সেইরূপ মিথ্যাত্বের ক্ষেত্রে প্রতিবাদি-প্রদর্শিত 'সিদ্ধসাধনতা'র আপত্তিও চলিবে না।

তারপর, লক্ষণে যে ত্রৈকালিক নিষেধ বা অত্যন্তাভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা কি সত্য নিষেধকে বুঝাইতেছে, না অসত্য, প্রাতিভাসিক বা ব্যাবহারিক নিষেধকে বুঝাইতেছে ? নিষেধ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পর-ব্রহ্ম এবং সত্য-নিষেধ, এই দুইটি সত্য বস্তু স্বীকার করায়, অদ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ থাকে না, দ্বৈতবাদই হইয়া দাঁড়ায়। নিষেধকে যদি প্রাতিভাসিক (নিষেধ) বলা হয়, তবে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজত প্রভৃতির শুক্তিতে অত্যন্তাভাব বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই অনুমোদিত বিধায়, লক্ষণে সিদ্ধসাধনতার দোষই অপরিহার্য হয়,[১] ইহা আমরা ইতঃপূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। শুক্তিরজতে প্রাতিভাসিক রজতের যে প্রতীতি

ত্রৈকালিক নিষেধ বা অত্যন্তাভাব কি সত্য? না অসত্য?

১। নিষেধস্তাত্ত্বিকোঽতাত্ত্বিকো বা নাদ্যঃ অদ্বৈতভঙ্গাৎ ন দ্বিতীয়ঃ সিদ্ধসাধনতাপত্তেঃ।
পরপক্ষ গিরিবজ্র, ১ম অঃ, ১২০ পৃঃ

জন্মে, তাহার মূলে উক্ত প্রত্যক্ষের সত্যতার ব্যাঘাতক আগন্তুক কাচকামলাদি কোন-না-কোন প্রকার দোষ অবশ্যই থাকে, নতুবা শুক্তি (ঝিনুকের খণ্ড) শুক্তি বলিয়া প্রতীতির গোচর হয় না কেন? শুক্তিকে রূপার খণ্ড বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় কেন? ঘটবিশিষ্ট ভূতলে যদি ঘটের অভাবের প্রতীতি হয়, তবে তাহা যেমন ঘটের প্রত্যক্ষের উপাদানের দোষবশতঃই জন্মে, সেইরূপ বিশ্বপ্রপঞ্চের আধার বা আশ্রয় পরব্রহ্মেও প্রপঞ্চের অভাববুদ্ধিও যে কোনরূপ আগন্তুক দোষমূলেই উৎপন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আগন্তুক কোন-না-কোন দোষই প্রাতিভাসিক বস্তু ও তাহার আধারের মধ্যে অধ্যাসের সৃষ্টি করিয়া, আধারের সত্তায় অনুপ্রাণিত প্রাতিভাসিক বস্তুকে সত্য স্বাভাবিক বলিয়া ভ্রান্তদর্শীর গোচরে আনে। ঐরূপ প্রাতিভাসিক বস্তু যে মিথ্যা, তাহা সকলেই জানে। অদ্বৈতবেদান্তীর উল্লিখিত ব্যাবহারিক সত্য বস্তুর মিথ্যাত্বের লক্ষণ যদি শুক্তিরজত প্রভৃতিরই মিথ্যাত্ব সাধন করে, তবে অদ্বৈতবাদীর লক্ষণে কেবল সিদ্ধসাধনতার আপত্তিই উঠে না, 'অর্থান্তর'দোষেও লক্ষণটি কলুষিত হয়।[১]

প্রপঞ্চের নিষেধকে ব্যাবহারিক নিষেধ বলিয়া গ্রহণ করিলেও, অদ্বৈতবেদান্তী দোষের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদী দৃশ্যত্ব হেতুমূলে ব্যাবহারিক বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সাধন করিয়াছেন—'প্রপঞ্চো মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ', ইহাই হইল অদ্বৈতবাদীর অনুমান। ব্যাবহারিক দৃশ্যমাত্রই যদি মিথ্যা বা বাধ্য হয়। তবে ব্যাবহারিক দৃশ্যমান ঘটাদি প্রপঞ্চের ন্যায়, তাহাদের ব্যাবহারিক নিষেধকেও মিথ্যা এবং বাধ্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। নতুবা ব্যাবহারিক বস্তুর মিথ্যাত্বের সাধক পূর্বোক্ত দৃশ্যত্ব হেতু (ব্যাবহারিক 'নিষেধে'র মিথ্যাত্ব সাধন না করায়) অবশ্যই ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে। ফলে, উল্লিখিত অনুমানবলে নিখিল ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বও সিদ্ধি হইবে না।

অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তে জগতের সত্যতা ব্যাবহারিক, পরব্রহ্মের সত্যতা পারমার্থিক। জগৎ এবং ব্রহ্ম এক স্তরের সত্য নহে। এইজন্য ব্যাবহারিক জগৎ প্রপঞ্চের সহিত পরমার্থসৎ ব্রহ্মের কোনরূপ বিরোধের কথাও উঠে না। একই স্তরের ভাব ও অভাব-

১। প্রাতিভাসিকত্ব ইতি, আগন্তুকদোষপ্রযুক্তভানত্বমিত্যর্থঃ। তথাচ ঘটবতি ঘটপ্রতিযোগিকনিষেধ ইব প্রপঞ্চবতি ব্রহ্মণ্যন্যত্র বা তৎপ্রতিযোগিকনিষেধ আগন্তুকদোষপ্রযুক্তভানরূপাধ্যাস এব ভূম্যতে পর্যবসিত ইতি প্রপঞ্চে তাদৃশনিষেধপ্রতিযোগিত্বং সাধয়তস্তব ন তত্র স্বাভিমতমিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ। অতএব প্রপঞ্চসত্যত্ববাদিনা মিথ্যাত্বং সাধয়ন্তং প্রতি সিদ্ধসাধনমর্থান্তরোদ্ঘাটনং বা সুকরমিতি।

অদ্বৈতসিদ্ধির সিদ্ধিব্যাখ্যা টীকা, ৯৪ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

রূপ পদার্থদ্বয়ের মধ্যেই বিরোধ ঘটে এবং বস্তুতত্ত্ব বিচারের ফলে উহাদের একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আলোচ্য স্থলে মিথ্যা জগৎ এবং সত্য পরব্রহ্ম পরস্পরবিরোধী (ভাবাভাবাত্মক) হইলেও, উভয়ের সত্যতা তুল্যরূপ বা এক স্তরের না হওয়ায়, উহাদের মধ্যে বিরোধের প্রশ্ন আসে না; "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা" এইরূপ অদ্বৈতবেদান্তের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হয় না। বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের সমর্থক "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিও অর্থহীন হইয়া পড়ে।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, লক্ষণোক্ত 'ত্রৈকালিক নিষেধ' বা অত্যন্তাভাবকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও, তাহাতে কোনরূপ অসঙ্গতি দেখা যায় না। পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের আশ্রয় বা আধার পরব্রহ্মে প্রপঞ্চের [সত্য] নিষেধ পরব্রহ্মস্বরূপই বটে, তদতিরিক্ত কিছু নহে। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধান্তহানির কোন প্রশ্নই উঠে না। পরব্রহ্মে প্রপঞ্চের নিষেধকে জগদাধার ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কিছু বলিয়া গ্রহণ করিলেই দ্বৈতবাদের আপত্তি আসে। প্রপঞ্চের নিষেধ যদি সত্যই হয়, তবে ঐ সত্য বা তাত্ত্বিক নিষেধের প্রতিযোগী বিশ্বপ্রপঞ্চও সত্য হইবে, প্রতিবাদীর এইরূপ আপত্তিরও কোনই মূল্য নাই। ঝিনুকের খণ্ডে কল্পিত (অধ্যস্ত) রজতের যে অভাব আছে, তাহা তো ব্যাবহারিকভাবে (প্রাতিভাসিক রজতের তুলনায়) সত্যই বটে। কিন্তু তাহা হইলেও, সেই ব্যাবহারিক সত্য অভাবের প্রতিযোগী [শুক্তিতে কল্পিত] অধ্যস্ত রজতখণ্ডকে প্রাতিভাসিক না বলিয়া, আপণস্থ রজতের ন্যায় সত্য বলা চলে কি ?[১]

তারপর, এই নিষেধকে বাস্তব সত্য না বলিয়া, অসত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও তাহাতে অদ্বৈতবেদান্তীর আপত্তির কোনরূপ কারণ দেখা যায় না। তবে, লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রপঞ্চের নিষেধকে অসত্য বলিলেও, ইহাকে প্রাতিভাসিক বলা চলিবে না; ব্যাবহারিক সত্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। শুক্তিতে কল্পিত প্রাতিভাসিক রজত যে মিথ্যা, তাহা কে না জানেন ? লক্ষণোক্ত ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী বিশ্বপ্রপঞ্চকে শুক্তিরজতের ন্যায় অসত্য প্রাতিভাসিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে আলোচ্য লক্ষণ যে সিদ্ধসাধনদোষে কলুষিত হইবে, তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্যাবহারিক বস্তুমাত্রই যখন আলোচিত মিথ্যাত্ব-লক্ষণের লক্ষ্য এবং বাধ্য, তখন দৃশ্যমান ঘটাদিপ্রপঞ্চের নিষেধও দৃশ্য এবং ব্যাবহারিক বিধায় মিথ্যা হইতে বাধ্য। ঘটাদি প্রপঞ্চের অধিকরণে ঘটাদির অত্যন্তাভাব

১। প্রপঞ্চনিষেধাধিকরণীভূতব্রহ্মাভিন্নত্বান্নিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বেঽপি নাদ্বৈতহানিকরত্বম্। ন চ তাত্ত্বিকাভাবপ্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য তাত্ত্বিকত্বাপত্তিঃ; তাত্ত্বিকাভাব-প্রতিযোগিনি শুক্তিরজতাদৌ কল্পিতে ব্যভিচারাৎ।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ৯৬-৯৭ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

বা ত্রৈকালিক নিষেধ যদি মিথ্যা বলিয়াই সাব্যস্ত হয়, তবে ঘটাদিপ্রপঞ্চ সেক্ষেত্রে সত্য হয় না কেন ?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, সেখানেই নিষেধের নিষেধে নিষেধের প্রতিযোগী ঘট প্রভৃতির সত্যতার প্রশ্ন আসে, যেখানে নিষেধের নিষেধের মুখ্য উদ্দেশ্যই হয় প্রতিযোগীর (ঘট প্রভৃতির) সত্যতার সংস্থাপন। যেমন রূপার খণ্ড দেখিয়া, 'নেদং রজতম্' ইহা রূপা নহে, এইরূপ বাধক জ্ঞানোদয়ের পর, 'ইদং ন অরজতম্' ইহা রূপা নহে, তাহা নহে, এইরূপে যদি রজতের অভাবের অভাব-বুদ্ধি আত্মপ্রকাশ লাভ করে, তবে ঐরূপ বুদ্ধি রজতের সত্যতাই সূচনা করে। যেই ক্ষেত্রে নিষেধের একই হেতুবলে প্রতিযোগী এবং তাহার নিষেধ, এই উভয়েরই মিথ্যাত্ব সাধিত হয়, সেক্ষেত্রে আর প্রতিযোগীর নিষেধের নিষেধেও প্রতিযোগী ঘট প্রভৃতির সত্যতা প্রশ্ন আসে না। আলোচ্যস্থলে প্রপঞ্চের নিষেধের মূল হইল দৃশ্যত্ব। সেই দৃশ্যত্ব হেতু ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী ঘট প্রভৃতিতে যেমন আছে, উহাদের ব্যাবহারিক নিষেধেও তেমনই (দৃশ্যত্ব হেতু) আছে। ফলে, এখানে প্রতিযোগীর নিষেধের নিষেধেও প্রতিযোগী ঘট প্রভৃতির সত্যতার আপত্তি চলে না।[১]

পরব্রহ্মরূপ আধার বা আশ্রয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চের যে অভাব আছে, তাহা কি বায়ুতে রূপের অভাবের ন্যায় আত্যন্তিকভাবে আছে ? না, সম্মুখস্থিত ঝিনুকখণ্ডে রজতের অভাবের ন্যায় সাময়িকভাবে আছে ? পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক (বা 'নিরুপাখ্য') নহে। আকাশকুসুম প্রভৃতি অলীক বিধায়, তাহাদের কোন নিজস্ব রূপই নাই। জাগতিক প্রপঞ্চ আমাদের জীবনের বিবিধ প্রয়োজন সাধন করে বলিয়া, প্রপঞ্চের একটা ব্যাবহারিক স্বরূপ আছে। সেই ব্যাবহারিক রূপেই প্রপঞ্চকে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী বলা হইয়াছে ? না, ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ পারমার্থতঃ সত্য না হওয়ায়, পরমসত্যতারূপ যে ব্যধিকরণ ধর্ম প্রপঞ্চে

১। ন চ নিষেধস্য নিষেধে প্রতিযোগিসত্ত্বাপত্তিরিতি বাচ্যম্; তত্র হি নিষেধস্য নিষেধে প্রতিযোগিসত্ত্বমায়াতি, যত্র নিষেধস্য নিষেধ বুদ্ধ্যা প্রতিযোগিসত্ত্বং ব্যবস্থাপ্যতে, ন নিষেধমাত্রং নিষিধ্যতে, যথা রজতে নেদং রজতমিতি জ্ঞানানন্তরম্ ইদং ন অরজতমিতি জ্ঞানেন রজতং ব্যবস্থাপ্যতে। যত্র তু প্রতিযোগি-নিষেধয়োরুভয়োরপি নিষেধস্তত্র ন প্রতিযোগিসত্ত্বম্; যথা ধ্বংসসময়ে প্রাগ-ভাবপ্রতিযোগিনোরুভয়োরপি নিষেধঃ। এবং চ প্রকৃতেঽপি নিষেধবাধকেন প্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য নিষেধস্য চ বাধনান্ন নিষেধস্য বাধ্যত্বেঽপি প্রপঞ্চতাত্ত্বিকত্বম্; উভয়োরপি নিষেধতাবচ্ছেদকস্য দৃশ্যত্বাদেস্তুল্যত্বাৎ।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ২য় পরিচ্ছেদ, ১০৫-১১০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

আছে, সেই ব্যধিকরণ ধর্মের[১] দ্বারাই প্রপঞ্চকে ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী বলিয়া আলোচ্য লক্ষণে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে? প্রথমতঃ বায়ুতে রূপের অভাবের ন্যায় পরব্রহ্মে বিশ্বপ্রপঞ্চের অত্যন্তাভাব ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা, পরব্রহ্ম হইতেই বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি জ্ঞানময়ী শ্রুতি সমর্থন করিয়াছেন। ঘট প্রমুখ বস্তুরাজির জল আহরণ প্রভৃতি কার্য সুধীমাত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। বিশ্বপ্রপঞ্চ অবিদ্যার কার্য এবং তত্ত্বজ্ঞান নাশ্য হইলেও, প্রপঞ্চ এবং প্রাতিভাসিক শুক্তিরজত প্রভৃতি 'ইদম্'রূপে প্রতীতির গোচর হয় এবং জ্ঞানকালে বিদ্যমান থাকে বলিয়া উহাদিগকে (বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং শুক্তিরজত প্রভৃতিকে) ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী বলিয়া কোনমতেই ব্যাখ্যা করা চলে না। প্রতিবাদী মাধ্বের এইরূপ আপত্তির প্রত্যুত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং শুক্তিরজত প্রভৃতিকে স্বরূপতঃ বা স্বভাবতঃই (পরব্রহ্মাশ্রিত) অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী বলিয়া গ্রহণ করিলেও, তাহাতে দোষের কথা কিছুই নাই। শুক্তিরজত বিভ্রমের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, অধিষ্ঠান শুক্তির সাক্ষাৎকার উদিত হইলে রজতবিভ্রম বিলুপ্ত হয়। ভ্রমের স্থলে সাময়িক রজতের প্রত্যক্ষ প্রতীতি থাকিলেও, শুক্তিতে রজতের অত্যন্তাভাব সনাতন বা নিত্যবিধায়, শুক্তিতে রজত কোনকালেই ছিল না, এখনও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না। 'রূপ্যং নাস্তি, নাসীন্ন ভবিষ্যতি' এইরূপে রজতের ত্রৈকালিক নিষেধ যেমন প্রতীতিগোচর হয়, সেইরূপ 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইত্যাদি শ্রুতিমূলে প্রপঞ্চের আশ্রয় পরব্রহ্মেও স্বভাবতঃই বিশ্বপ্রপঞ্চের ত্রৈকালিক নিষেধ জ্ঞানের গোচর

১। যেই ধর্ম যাহাতে নাই বা থাকেনা, সেই ধর্মকেই বলে 'ব্যধিকরণ ধর্ম', যেমন ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ঘট ও পটে থাকিলেও পুস্তকে তাহা থাকেনা, এইজন্য পুস্তকের পক্ষে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ব্যধিকরণ ধর্ম। এই ব্যধিকরণ ধর্মের দ্বারা যেখানে যেই বস্তু আছে, সেখানেও সেই বস্তুর অভাব বুঝা যাইতে পারে। পুস্তকাধারে আমার যে পুস্তকগুলি আছে, সেখানে যদি পুস্তকগুলির অভাব বুঝাইতে চাই, তবে আমি অনায়াসেই বলিতে পারি যে, আমার পুস্তকগুলি পুস্তকে অবৃত্তি ঘটত্ব বা পটত্ব ধর্মবিশিষ্টরূপে পুস্তকাধারে নাই। প্রতিযোগীতে বর্ত্তমান নাই এইরূপ কোন ধর্মের দ্বারা কোনও বস্তুর অভাব ব্যাখ্যা করিলেই, নৈয়ায়িকের পরিভাষায় উহাকে 'ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব' বলে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যাবহারিক ঘটাদি প্রপঞ্চকে প্রপঞ্চের অধিকারে পারমার্থিকত্ব ধর্মবিশিষ্টরূপে প্রপঞ্চ নাই এইরূপে বিবৃত করিলে, তাহা প্রপঞ্চের পক্ষে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাবই হয়। এই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাবরূপে প্রপঞ্চ যেখানে আছে, সেখানেও প্রপঞ্চের অভাব বুঝান যাইতে পারে।

হইয়া থাকে। ঘটাদি ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের সাময়িক অবস্থিতি সত্য পরব্রহ্মে উহাদের ত্রৈকালিক নিষেধের পক্ষে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করে না।[১]

স্ব স্ব উপাধি বা আধারে প্রপঞ্চের নিষেধ বায়ুতে রূপের অভাবের ন্যায় স্বাভাবিক হইলে, শুক্তিরজতের স্থলে শুক্তির সাক্ষাৎকার ঘটিলে রজতের যে অভাব বুদ্ধির উদয় হয়, তাহাও রজতের যে ব্যাবহারিক রজতরূপ সেইরূপেই শুক্তিতে রজতের নিষেধ ব্যাখ্যা কর না কেন? প্রাতিভাসিক রজতের নিষেধ স্বীকারের প্রয়োজন কি? এইরূপ প্রতিবাদীর আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, শুক্তি-রজতের বিভ্রমের ক্ষেত্রে ব্যাবহারিক রজতের নিষেধ স্বীকার করিলে, ভ্রমের বিষয় এবং বাধের বিষয় অভিন্ন না হইয়া, বিভিন্নই হইয়া দাঁড়ায়। শুক্তিরজতে বাধ হয় ব্যাবহারিক রজতের, আর ভ্রম হয় প্রাতিভাসিক রজতের। ব্যাবহারিক সত্য শুক্তির সহিত ব্যাবহারিক রজতের তাদাত্ম্য বা অভেদ বুদ্ধি কোনমতেই উদিত হইতে পারে না। এই অবস্থায় শুক্তিতে ব্যাবহারিক রজতের নিষেধ ব্যাখ্যা করিতে গেলে তাহা হয়, যাহার প্রসক্তিই নাই তাহারই নিষেধ।[২] শুক্তিরজত-বিভ্রমে শুক্তির সহিত রজতের অভেদ সকলেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন; সুতরাং শুক্তিরজতের নিষেধকে ব্যাবহারিক সত্য শুক্তির সহিত ব্যাবহারিক সত্য রজতের নিষেধ বলা কোনমতেই চলে না। উহাকে প্রাতিভাসিক রজতের নিষেধ বলাই যুক্তিসঙ্গত। ঝিনুকের খণ্ডকে রূপার খণ্ড মনে করিয়া রজতার্থী সম্মুখস্থিত ঝিনুক-খণ্ডের প্রতি ধাবিত হয়. ইহা সুধীমাত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সম্মুখস্থ ভাস্বর বস্তুকে প্রাতিভাসিক রজত বলিয়া বুঝিতে পারিলে, রজতার্থীর রজত গ্রহণের জন্য কোনপ্রকার প্রচেষ্টাই দেখা যাইত না। রজতকে অলঙ্কার নির্মাণের উপযোগী ব্যাবহারিক রজত বলিয়া বুঝিয়াই, রজতখণ্ড আহরণে রজতপ্রেমিক প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। রজতার্থীর চেষ্টা যখন ফলপ্রসূ হইল না, সে রূপার বদলে একখানি ঝিনুকের খণ্ড পাইল, তখন সে বুঝিল, ইহা রূপা নহে। রূপা ইহাতে কোন কালেই নাই, ছিল না

১। স্বরূপেণৈব ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য প্রপঞ্চে শুক্তিরূপ্যে চাঙ্গীকারাৎ। তথাহি শুক্তৌ রজতভ্রমানন্তরম্ অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারে রূপ্যং নাস্তি, নাসীন্ন ভবিষ্যতীতি স্বরূপেণৈব, নেহ নানেতি শ্রুত্যা চ প্রপঞ্চ স্বরূপেণৈব নিষেধ প্রতীতেঃ।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ১২০-১২১ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

২। ন চ তত্র লৌকিকপরমার্থরজতমেব স্বরূপেণ নিষেধপ্রতিযোগীতি বাচ্যম্; ভ্রমবাধয়োর্বৈয়ধিকরণ্যাপত্তেঃ, অপ্রসক্তপ্রতিষেধাপত্তেশ্চ।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ১২১ পৃঃ।

এবং থাকিবে না। এইরূপে ভ্রান্তদর্শীর রজতের ত্রৈকালিক নিষেধ বুদ্ধিরই উদয় হইবে। রজতার্থীর ঐরূপ রজতগ্রহণ-প্রবৃত্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রাতিভাসিক মিথ্যারজতকে ব্যাবহারিক সত্য রজত বলিয়া ভুল করাই যে রজতার্থীর রজত-আহরণ প্রচেষ্টার মূল, তাহাতে সন্দেহ কি? সম্মুখে অবস্থিত ঝিনুকখণ্ডের সহিত রজতের তাদাত্ম্য বা অভেদ বুদ্ধি যেমন শুক্তিরজত বিভ্রমের কারণ, সেইরূপ ব্যাবহারিক রজতের সহিত প্রাতিভাসিক রজতের তাদাত্ম্য বা অভেদবুদ্ধিকেও শুক্তিতে রজতবিভ্রমের কারণ বলিয়া অনায়াসেই উল্লেখ করা যাইতে পারে।[১] তত্ত্বদীপিকায় এই শেষোক্ত মতেরই অনুবর্তন করিয়া বলা হইয়াছে যে, সম্মুখে পতিত ভাস্বর বস্তুর অভিমুখে রজতার্থীকে যে ধাবিত হইতে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে আপণস্থ সত্য রজতই শুক্তিতে প্রতীত প্রাতিভাসিক রজতের সহিত অভিন্নভাবে প্রতীতিগোচর হইয়া রজতার্থীকে প্রলুব্ধ করে। অধিষ্ঠান শুক্তির সাক্ষাৎকার উদিত হইলে রজতার্থী বুঝিতে পারেন যে, ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান, এই তিনকালের কোন কালেই ইহা (প্রাতিভাসিক রজত) ব্যাবহারিক সত্য রজত নহে। এইরূপে রজত ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী হইয়া মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়।

একই বিভক্তি যুক্ত পদের দ্বারা যদি ধর্মী বা আশ্রয় এবং অভাবের প্রতিযোগী, এই উভয়কে নির্দেশ করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে 'নঞ্' অন্যোন্যাভাবেরই বোধক হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপে 'ঘটঃ পটো ন ভবতি' এই বাক্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'নঞ্' এখানে অন্যোন্যাভাব বা পরস্পরের ভেদেরই ইঙ্গিত করে এবং 'ঘট পট নহে', ঘটের সহিত পটের বিভেদ আছে, ইহাই এখানে 'নঞ্' পদের দ্বারা সূচিত হয়। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে 'ইদং রজতং ন ভবতি' এই বাক্যেও 'নঞ্' যে অন্যোন্যাভাবেরই বোধক হইবে, তাহতে সন্দেহ কি? ইদংশব্দ-নির্দিষ্ট, সম্মুখে অবস্থিত, প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট প্রাতিভাসিক রজতে ব্যাবহারিক আপণস্থ রজতের ত্রৈকালিক ভেদ (নিষেধ) সাধন করায়, রজত যে মিথ্যা, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই কথাটিকেই যদি ভাষান্তরে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ করিয়া 'নাত্র রজতম্', 'এখানে রূপা নাই' এইভাবে প্রকাশ করা হয়, তবে 'নঞ্'পদ এখানে অন্যোন্যাভাবের বোধক না হইয়া, অত্যন্তাভাবেরই বোধক হইবে, এবং সম্মুখস্থরূপে পরিজ্ঞাত শুক্তি-রজতে ব্যাবহারিক সত্যরজতের অত্যন্তাভাব বা মিথ্যাত্বই 'নঞ্'পদের দ্বারা ধ্বনিত হইবে।[২]

আলোচ্য 'নঞ্'পদ যদি ব্যাবহারিক রজত প্রভৃতির ত্রৈকালিক নিষেধ বা অত্যন্তাভাবই সূচনা করে, তবে বিশ্বপ্রপঞ্চের অত্যন্তাসত্ত্বই আসিয়া পড়ে নাকি?

১। অদ্বৈতসিদ্ধি, ১২৪-২৫ পৃঃ নির্ণয়সাগর, সং।

২। অদ্বৈতসিদ্ধি ১২৮-১৩১ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

শূন্যবাদের সিদ্ধান্তগ্রহণে তবে আর আপত্তি কি? জাগতিক প্রপঞ্চকে অদ্বৈতবাদীর মতে অসদ্‌বিলক্ষণ এবং অনির্বচনীয় বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা অত্যন্ত অসৎ—অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতি এবং অনির্বচনীয় ঘটাদি বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে এক সুস্পষ্ট ভেদের রেখা অঙ্কিত করা হইয়াছে। ঐ ভেদকে বুঝাইবার জন্য অসৎ শব্দের বাচ্যার্থ বা অভিধেয় কি, তাহা এই প্রসঙ্গে বিচার করা আবশ্যক। 'অসৎ'কে সম্পূর্ণ নিরুপাখ্যও বলা যায় না। কেননা, 'নিরুপাখ্য' এইরূপেও যাহার আখ্যা বা খ্যাতি আছে, তাহাকে অত্যন্ত অসৎ বলা যায় কিরূপে? পদজন্য পদার্থের বোধ বা পদশক্তি (অনুভাবকত্বরূপ পদশক্তি) আকাশকুসুম প্রভৃতি অলীকে না থাকিলেও, পাতঞ্জলোক্ত বিকল্প[১]বৃত্তিজন্য এক প্রকার শব্দজ্ঞান আকাশকুসুম প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অনস্বীকার্য। ফলে, অলীককেও আর সর্বপ্রকারে নিরুপাখ্য বলা চলেনা। যাহা প্রতীতির গোচরে আসে না বা কদাচ জ্ঞেয় হয় না, তাহাই অসৎ, এইরূপে অসতের নির্বচন অদ্বৈতবাদী কোনমতেই গ্রহণ করিতে পারেন না। এই প্রকার নির্বচনে অদ্বৈতবেদান্তীর অপ্রমেয় পরব্রহ্মও অসত্যই হইয়া পড়েন। দ্বিতীয়তঃ অসতের যদি কোনরূপ প্রতীতিই না থাকে, তবে অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে অনির্বাচ্য বিশ্বপ্রপঞ্চকে যে 'অসদ্‌বিলক্ষণ' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইযাছে, সেই ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণই অর্থহীন হয় নাকি? অসৎ কাহাকে বলে তাহা না জানিলে, অসদ্‌বিলক্ষণ কি বস্তু তাহা বুঝা যাইবে কিরূপে? যাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণের গোচরে আসেনা তাহাই অসৎ, এইরূপ অসতের লক্ষণ পরব্রহ্মে অতিব্যাপ্ত হয় বলিয়াই ইহাও গ্রাহ্য নহে। এই অবস্থায় অসতের নির্বচন এবং অসৎ আকাশকুসুম প্রভৃতি ও অদ্বৈতবেদান্তোক্ত অনির্বচনীয় বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে সীমারেখা নির্দেশ করা দুরূহ হয়। প্রতিবাদীর এই প্রকার আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতির অসত্তা এবং অনির্বচনীয় বিশ্বপ্রপঞ্চের অসত্তা এক জাতীয় নহে। এই দুইএর অসত্ত্ব বিভিন্ন প্রকারের। যাহা কখনও কোন আধার বা আশ্রয়েই 'সৎ'রূপে প্রতীতির গোচর হয় না, তাহাই অত্যন্ত অসৎ, এবং অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতির অসত্ত্ব এই শ্রেণীরই অসত্ত্ব। আকাশকুসুম এইরূপ শব্দ শুনিবার পর বিকল্পবৃত্তিবশতঃ 'আকাশের কুসুম', এই প্রকার শব্দজবুদ্ধি উদিত হইলেও, 'ইদম্ আকাশকুসুমম্', এইটি খপুষ্প, এইভাবে কোন আধারেই ইদংরূপে আকাশকুসুমের জ্ঞানোদয় হইবে না। অনির্বচনীয় বিশ্বপ্রপঞ্চ কিংবা প্রাতিভাসিক (শুক্তি) রজত প্রভৃতি কিন্তু এইরূপ নহে। উহাদের ত্রৈকালিক নিষেধনিবন্ধন মিথ্যাত্ব নিশ্চয় থাকিলেও, মিথ্যাত্বনিশ্চয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত স্ব স্ব আধারে (পরব্রহ্ম, শুক্তি প্রভৃতিতে) সত্য স্বাভাবিকভাবে প্রতীতি শূন্যবাদী

১। বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ। পাতঞ্জলসূত্র, ১ম পরিঃ।

বৌদ্ধসম্প্রদায় ব্যতীত সকল ভারতীয় দার্শনিকই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতির অসত্তা এবং জলাহরণ প্রভৃতি ব্যাবহারিক প্রয়োজনসাধনে সমর্থ ঘটপ্রমুখ অনির্বচনীয় বস্তুর অসত্তা কিংবা রজতরূপে সম্মুখে প্রতীয়মান শুক্তিরজতের অসত্তাকে একই পর্যায়ের অসত্তা বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিরূপে? প্রতিবাদী নিজে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতকে অলীক আকাশকুসুমের ন্যায় অত্যন্ত অসৎ বলিতে প্রস্তুত আছেন কি? অত্যন্ত অসৎ আকাশকুসুম প্রভৃতি হইতে ব্যাবহারিক বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং প্রাতিভাসিক শুক্তিরজত প্রভৃতি অত্যন্ত বিলক্ষণ বা বিসদৃশ বিধায়, (অসদ্ বিলক্ষণত্বরূপে) উহাদের মিথ্যাত্বের নির্বচন সঙ্গতই হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রতিবাদী মাধ্ব প্রভৃতি বলেন, 'অসদ্‌বিলক্ষণ' ব্যাবহারিক রজত ব্যাবহারিকভাবে এবং প্রাতিভাসিক শুক্তিরজত প্রাতিভাসিক ভাবে সত্য হওয়ায়, অনির্বাচ্যখ্যাতির সমর্থক অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তে রজত ত্রৈকালিক নিষেধের অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে, এই কথা অদ্বৈতবেদান্তী কোন প্রকারেই বলিতে পারেন না। ফলে, অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী রজতকে অদ্বৈতবাদী মিথ্যাই বা বলেন কিরূপে? এইরূপ প্রশ্নে অদ্বৈতবেদান্তীর উত্তর এই যে,—ব্যাবহারিক সত্যরজত এবং প্রাতিভাসিক শুক্তিরজত ব্যাবহারিক এবং প্রাতিভাসিকরূপেই স্বীয় আধারে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে; বাস্তবরূপে তো ঐ রজত সত্য নহে, অসত্যই বটে। বাস্তব বা পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্যাবহারিক সত্যরজত কিংবা প্রাতিভাসিক শুক্তিরজত উহাদের আশ্রয় বা আধার শুক্তি প্রভৃতিতে কোন কালেই নাই বা থাকিবে না। স্বীয় আধারে রজতের সাময়িক প্রতীতি থাকিলেও, পারমার্থিকত্বরূপ রজতের যে 'ব্যধিকরণ ধর্ম'[১] সেই ধর্মবিশিষ্টরূপে রজতের অভাব রজতের আধারে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই তিনকালেই বিদ্যমান থাকায়, রজতের মিথ্যাত্ব উপপাদন অনায়াসেই করা যাইতে পারে।

নিজের আশ্রয় বা আধারে যে সকল বস্তুর অত্যন্তাভাব পাওয়া যায়, তাহাই মিথ্যা, এইরূপ মিথ্যাত্বের লক্ষণে 'নিজের আধার' (প্রতিপন্নোপাধৌ) বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তী কিরূপ আধারের কথা বলিতেছেন? সত্য, না মিথ্যা? যথার্থ, না অযথার্থ? যদি আধার বলিয়া এখানে বস্তুর যথার্থ আধারেরই ইঙ্গিত করা হইয়া থাকে, এবং লক্ষণস্থ প্রতিপন্নপদের দ্বারা আধারের সত্যতাই সূচিত হইয়া থাকে, তবে বস্তুর যথার্থ আধারে সেই বস্তুর অত্যন্তাভাব কখনও থাকে না, থাকিতে পারে না বলিয়া, এইরূপ লক্ষণ 'অসম্ভবই' হইয়া দাঁড়ায়। সংযোগসম্বন্ধে ঘটের আধার ভূতলে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে কি? ফলে, ঘটপ্রভৃতি কোন বস্তুর মিথ্যাত্বও সিদ্ধ

উপাধি বা আশ্রয় সত্য না মিথ্যা?

১। ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাবের বিবরণ পূর্বেই ৪৩৮ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে।

হয় না। শুক্তিরজত যাহাকে মিথ্যা বলিয়া বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়েই নির্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মিথ্যা শুক্তিরজত প্রভৃতির কোন যথার্থ আধার আছে বলিয়াই তো কাহারও জানা নাই। এই অবস্থায় উক্ত লক্ষণ অনুসারে শুক্তিরজতের মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হইবে না। লক্ষণটিও নির্বিষয় হওয়ায় উহা অসম্ভব দোষে কলুষিত হইবে। তারপর, অধিকরণ বলিয়া যদি এখানে মিথ্যা বস্তুর অধিকরণরূপে প্রতীত কোন অযথার্থ অধিকরণকে বুঝায়, তবে উক্ত লক্ষণে 'সিদ্ধসাধন' দোষই অপরিহার্য হইবে। অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকের মতে আমরা দেখিয়াছি যে, ভ্রমস্থলে জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষবশতঃ শুক্তিরজতে আপণস্থ রজতেরই ভাতি হইয়া থাকে। রজতের অযথার্থ বা অতাত্ত্বিক অধিকরণ শুক্তিতে রজতের কাল-ত্রয়েই অভাব আছে। এইরূপে রজতের অযথার্থ বা কল্পিত অধিকরণ শুক্তিতে রজতের অত্যন্তাভাব ন্যায়মতানুমোদিত হওয়ায়, অদ্বৈতবেদান্তীর জগন্মিথ্যাত্বলক্ষণে "সিদ্ধসাধন"দোষ অবশ্যম্ভাবী। মাধ্বপণ্ডিতগণ যাঁহারা শুক্তিরজতের রজতকে অত্যন্ত অসৎ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতেও শুক্তিতে রজতের অত্যন্তাভাব থাকায়, অসৎখ্যাতিবাদী মাধ্বের মতানুসারেও 'সিদ্ধসাধনতা' অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়।

অদ্বৈতোক্ত জগন্মিথ্যাত্বলক্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জগৎসত্যতাবাদী নৈয়ায়িক এবং মাধ্বতার্কিকগণ যে, 'অসম্ভব' ও 'সিদ্ধসাধনতা'র আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার খণ্ডনে অদ্বৈতবাদী বলেন, "স্বীয় আশ্রয়েই যাহার অত্যন্তাভাব পাওয়া যায়", এইরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণের তাৎপর্য ইহাই বুঝিতে হইবে যে, "যাহা কেবল নিজের অত্যন্তাভাবের অধিকরণেই প্রতীয়মান হয়, অন্যত্র প্রতীয়মান হয় না তাহাই মিথ্যা"।[১] আলোচ্য মিথ্যাত্বলক্ষণের তাৎপর্য এই দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করিলে আর কোনও দোষ হয় না। ন্যায়মতে শুক্তিরজতের রজতত্ব ধর্ম যেমন রজতত্বের অত্যন্তাভাবের অধিকরণ শুক্তিতে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ রজতত্বধর্ম সত্য আপণস্থ রজত প্রভৃতিতেও প্রতীয়মান হয়। অতএব রজতত্ব ধর্ম কেবল রজতের অত্যন্তা-ভাবের অধিকরণ শুক্তিতেই প্রতীয়মান হইল না, (সত্যরজতেও প্রতীয়মান হইল)। এইরূপ মাধ্বমতেও রজত স্বীয় অত্যন্তাভাবের অধিকরণ শুক্তিতে যেরূপ ভাসে, আপণস্থ সত্যরজতেও সেইরূপেই ভাসে। এইজন্য "নিজের অত্যন্তাভাবের অধিকরণেই কেবল যাহা প্রতীয়মান হইয়া থাকে" 'স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্বম্', এইরূপ মিথ্যাত্বের লক্ষণ শুক্তিরজতে গেল না। শুক্তিরজত আলোচ্য

১। "স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্" এইরূপ চিৎসুখোক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অর্থ স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণ এব প্রতীয়মানত্বম্; এইরূপ বুঝিতে হইবে।
অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৮২-১৮৩ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং দ্রষ্টব্য।

মিথ্যাত্ব লক্ষণের লক্ষ্যই হইল না বলিয়া, অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক এবং অসৎ-খ্যাতিবাদী মাধ্ব অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধসাধনতার যে আপত্তি তুলিয়াছিলেন, তাহাও অচল হইয়া পড়িল। লক্ষণের মর্ম আলোচ্যরূপে ব্যাখ্যা করিলে, লক্ষণস্থ অধিকরণশব্দেও যথার্থ অধিকরণকেই বুঝাইবে, সেক্ষেত্রে অসম্ভব দোষের কথাই উঠিবে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে সংযোগ, বিভাগ প্রভৃতি যাহাদিগকে 'অব্যাপ্যবৃত্তি'[১] বলা হইয়া থাকে, ঐরূপ অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগ, বিভাগ প্রভৃতির যাহা আশ্রয় হয়, সেই সংযোগের আধার বা আশ্রয়ে অপরাংশে সংযোগ না থাকায়, সংযোগের আধারেই (locus) সংযোগের অভাবও পাওয়া যায়। ফলে, সত্য সংযোগ প্রভৃতি মিথ্যাত্বলক্ষণাক্রান্ত হইয়া মিথ্যাই হইয়া পড়ে এবং লক্ষণে 'অর্থান্তর' দোষ অবশ্যম্ভাবী হয়। প্রতিবাদী মাধ্বের এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, সংযোগ ও সংযোগাভাব পরস্পর বিরোধী পদার্থ। ঐ বিরোধী পদার্থ দুইটি একই আধার বা আশ্রয়ে কোনমতেই থাকিতে পারে না। ভাব ও অভাব যদি একই আধারে বিদ্যমান থাকে, তবে ভাব ও অভাব পরস্পর বিরোধী নহে, ইহাই বুঝিতে হয়। ভাব ও অভাবের মধ্যে যদি কোনরূপ বিরোধই না থাকে, তবে 'বিরোধ' কথাটাই অর্থহীন হইয়া পড়ে—বিরোধস্তু জগতি দত্তজলাঞ্জলিতাপ্রসঙ্গাৎ।

চিৎসুখী ৪০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

দুইটি ভাববস্তুর মধ্যে যেখানে বিরোধ থাকে, সেখানেও বিচার করিলে দেখা যায় যে, ঐ বিরোধের মূলে আছে ভাবাভাবেরই বিরোধ। তদ্ব্যতীত বিরোধের প্রতীতিই সম্ভবপর হয় না। গোত্ব এবং অশ্বত্ব পরস্পর বিরোধী। গোত্ব থাকিলে অশ্বত্ব থাকে না, অশ্বত্ব থাকিলে গোত্ব থাকে না। এই বিরোধের মূল অনুসন্ধান

১। অব্যাপ্যবৃত্তি কাহাকে বলে? যে-বস্তুর স্বীয় আশ্রয় বা আধারে বৃত্তি বা বর্তমানতা সর্বকালীন নহে, সাময়িক মাত্র, তাহাকেই 'অব্যাপ্যবৃত্তি' বলা হইয়া থাকে—স্বাধিকরণবৃত্ত্যভাবপ্রতিযোগিত্বমব্যাপ্যবৃত্তিত্বম্। যেমন পুস্তকাধারে পুস্তকখানির সংযোগ। ঐ পুস্তকসংযোগ এখন পুস্তকাধারে আছে। ঐ পুস্তকখানিকে সরাইয়া লইয়া যদি টেবিলের উপরে রাখা যায়, তবে পুস্তকাধারে পুস্তকের অভাব ঘটে বলিয়া, পুস্তকাধারে পুস্তকসংযোগ হয় অব্যাপ্যবৃত্তি। পুস্তকত্ব জাতির সহিত পুস্তকের যে সম্বন্ধ কিংবা পুস্তকের শুভ্র বর্ণের সহিত উহার যে সম্বন্ধ তাহাকে পুস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, পুস্তকত্বের আধার পুস্তকে, পুস্তকের বিবিধগুণের আশ্রয় পুস্তক দ্রব্যে উহাদের অত্যন্তাভাব থাকেনা বলিয়া, ঐ সকল (সমবায়) সম্বন্ধ অব্যাপ্যবৃত্তি নহে, ব্যাপ্যবৃত্তি।

করিলেও ভাবাভাবের বিরোধই স্পষ্টতর হইবে। গোত্ব এবং গোত্বাভাব পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া, গোত্বাভাবের যাহা ব্যাপ্য, সেই অশ্বত্ব প্রভৃতিতেও গোত্বের বিরোধ সুস্পষ্ট। এখন কথা এই যে, একই বস্তুর একই প্রদেশে বা অংশে কখনও পরস্পরবিরুদ্ধ সংযোগ এবং সংযোগাভাব, এই উভয় বর্তমান থাকিতে পারে না। কোনও প্রদেশে যখন সংযোগ থাকে, তখন সেই প্রদেশে সংযোগাভাব থাকে না। এইরূপ যে অংশে বা প্রদেশে সংযোগাভাব থাকে, সেই অংশেও আর সংযোগ থাকে না। এইজন্য ভাবাভাবের সামানাধিকরণ্যও হয় অসম্ভব পরিকল্পনা। সুতরাং কপিসংযোগের ভাব ও অভাব একই অধিকরণে একই সময়ে বর্তমান থাকে বলিয়া সত্য সংযোগে প্রতিবাদী মাধ্ব যে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তির প্রশ্ন তুলিয়াছেন এবং লক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া (অর্থান্তরতার) যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহারও এক্ষেত্রে কোনরূপ মূল্য দেওয়া যায় না।[১]

মাধ্বোক্ত 'অর্থান্তরতা'র বিরুদ্ধে মধুসূদন সরস্বতী বলেন, আলোচ্য মিথ্যাত্বের লক্ষণটিকে এইভাবে আরও বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে, যে-আধারে যেই বস্তু যেইরূপে যেই সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে, সেই বস্তুর সেই আধারে সেইরূপে সেই সম্বন্ধে অত্যন্তাভাব থাকিলেই (অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইলেই) সেই বস্তু মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হইবে। এক্ষেত্রে কপিসংযোগ শাখাতে থাকায় এবং সংযোগাভাব বৃক্ষমূলে বিরাজ করায়, কপিসংযোগের আধার বা আশ্রয় ভিন্ন হওয়ায়, মূলদেশস্থিত [সংযোগাভাবে প্রতিযোগী] সংযোগ উল্লিখিত মিথ্যাত্বলক্ষণের লক্ষ্যই হইতে পারে না। সুতরাং লক্ষণে অতিব্যাপ্তি, সিদ্ধসাধনতা এবং অর্থান্তরতার আপত্তি ওঠে কি করিয়া?[২]

১। ভাবাভাবয়োরেকাধিকরণত্বাভ্যুপগমে সর্বত্রৈব তথাভাবাপত্তের্বিরোধস্য জগতি দত্তজলাঞ্জলিতাপ্রসঙ্গাৎ। ভাবাভাবয়োঃ সাক্ষাদ্বিরোধস্তন্মুখেনৈবাস্তত্রেতিপরীক্ষক-পরিষদাং সম্মতত্বাৎ প্রদেশোপাধিভেদেন বা তত্র বিরোধসমাধানে ভাবাত্যন্তা-ভাবয়োর্ভিন্নাধিকরণত্বেন লক্ষণস্য তত্র সত্ত্যে কুতঃসম্ভবঃ, কুতস্তরাং চাতিব্যাপ্তিঃ কুতস্তমাং চার্থান্তরতা। চিৎসুখী, ৪০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

২। যেন সম্বন্ধেন যদ্‌যস্যাধিকরণং তেন সম্বন্ধেন তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বমিতি বিবক্ষায়াং অব্যাপ্যবৃত্তিষু সিদ্ধসাধনমিতি চেন্ন. যেন রূপেণ যদধিকরণতয়া যৎপ্রতিপন্নং তেন রূপেণ তন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বস্য প্রতিপন্নপদেন সূচিতত্বাৎ। ....যেন চ সম্বন্ধবিশেষেণ যেন চাবচ্ছেদকবিশেষেণ যদধিকরণতাপ্রতীতির্যত্র ভবিতুমর্হতি, তেনৈব সম্বন্ধ বিশেষেণ তেনৈবাবচ্ছেদক-বিশেষেণ তদধিকরণাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বং তস্য মিথ্যাত্বমিতি পর্যবসিতে ক্ব সিদ্ধসাধনম্। অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৫১ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

মাধ্বপ্রদর্শিত অর্থান্তরতা প্রভৃতি দোষ পরিহারের জন্য ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র তদীয় বেদান্তপরিভাষায় মিথ্যাত্বের লক্ষণে একটি 'যাবৎ' পদের অবতারণা করিয়াছেন।[১] ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলিয়াছেন, বৃক্ষের শাখায় কপিসংযোগ থাকায়, বৃক্ষমূলে কপি-সংযোগ না থাকিলেও, কপিসংযোগের আশ্রয় 'যাবদ্' বৃক্ষে তো আর কপি-সংযোগের অত্যন্তাভাব নাই (যেহেতু শাখায় তো কপির সংযোগই রহিয়াছে)। সুতরাং বৃক্ষমূলস্থ সংযোগাভাবের প্রতিযোগী কপিসংযোগ আলোচ্য মিথ্যাত্বলক্ষণের লক্ষ্যই হইবে না। প্রতিবাদীর অর্থান্তরতার আপত্তি চলিবে কিরূপে? যেই বস্তুর যাহা আশ্রয় বা আধার হয়, সেই আধারে সেই বস্তুর অত্যন্তাভাব থাকে না, থাকিতে পারে না। ফলে, প্রদর্শিত লক্ষণটি 'অসম্ভব' দোষে কলুষিত হয়। সেই কালুষ্য বারণের জন্যই লক্ষণে "স্বাশ্রয়ত্বেন অভিমত", স্ব অর্থাৎ মিথ্যা বস্তুর আধাররূপে প্রতীতির বিষয়, এইরূপে 'অভিমত' পদের অবতারণা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা দ্বারা ভ্রমের বিষয় রজতের শুক্তি প্রভৃতি আধার যে যথার্থ আধার হইবে না, [যথার্থ আধারে যে সেই বস্তুর অত্যন্তাভাব থাকে না] ইহাই ধ্বনিত হইবে।

প্রকাশাত্মযতি মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাও নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

বিবরণোক্ত মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ (তৃতীয় মিথ্যাত্ব লক্ষণ)

'জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং বা মিথ্যাত্বম্'—অদ্বৈতসিদ্ধি, ১০৬ পৃঃ, যাহা জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তিত বা নিবারিত হয়, তাহাই মিথ্যা। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, লক্ষণোক্ত 'জ্ঞাননিবর্ত্য' কথার অর্থ কি? জ্ঞানের দ্বারা যাহা নিবারিত বা বাধিত হয়, তাহাই মিথ্যা হইলে, পরবর্তী জ্ঞানোদয়ে যখন পূর্বজ্ঞান নিবর্তিত হয়, উল্লিখিত লক্ষণ অনুসারে সেই সত্য পূর্বজ্ঞানকেও মিথ্যাই বলিতে হয়। দুইটি জ্ঞান একই সময়ে উদিত হয় না। জ্ঞানদ্বয় বিভিন্ন কালেই উদিত হয়; এবং পরবর্তী জ্ঞান উদিত হইলে পূর্বজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ইহাই জ্ঞানের স্বভাব। প্রথমতঃ আমার পুস্তকাধারের এই পুস্তকখানির জ্ঞান উদিত হইল, পরমুহূর্তে লেখনীটি আমার জ্ঞানে ভাসিল। এক্ষেত্রে লেখনীর জ্ঞান

১। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের মতে মিথ্যাত্বের লক্ষণটি দাঁড়াইল নিম্নরূপ :—
মিথ্যাত্বঞ্চ স্বাশ্রয়ত্বেনাভিমতযাবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বম্।
বেদান্তপরিভাষা।
নিজের আশ্রয় বলিয়া প্রতীত (পরিজ্ঞাত) সকল আধারেই যাহার অত্যন্তাভাব দেখা যায়, সেই সকল বস্তুকে মিথ্যা বলিয়াই জানিবে।

পুস্তকের জ্ঞানের বিলোপ সাধন করিয়াই যে আত্মপ্রকাশ লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ কি? মিথ্যাত্বের আলোচ্য লক্ষণ অনুসারে পরবর্তী জ্ঞানোদয়ে বিলুপ্ত পূর্বজ্ঞানে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি অনিবার্য হয়। দ্বিতীয়তঃ মুগুড়ের আঘাতের ফলে যেখানে ঘটের বিলুপ্তি বা বিনাশ ঘটিয়াছে, সেক্ষেত্রে এই বিলুপ্তি জ্ঞানের সাহায্যে ঘটে নাই বলিয়া, ঘটের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে না। এইজন্য আলোচিত মিথ্যাত্বলক্ষণ অব্যাপ্তি দোষেও কলুষিত হইবে। যদি বল, 'জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তনীয়' এইরূপ উক্তির মর্ম এই যে, জ্ঞান যেখানে জ্ঞানরূপে হেতু হইয়া বস্তুর নিবর্তক হইবে, সে-স্থলেই নিবর্তিত বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে। "জ্ঞানত্বেন জ্ঞান-নিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্"। পরবর্তী জ্ঞানের উদয়ে যেক্ষেত্রে পূর্বজ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে, সেখানে জ্ঞান জ্ঞানত্বরূপে হেতু হয় নাই। পরবর্তী আত্মবিশেষগুণ পূর্বোৎপন্ন আত্মবিশেষগুণের নাশক হইয়া থাকে। জ্ঞান অন্যতম আত্মগুণ হইলেও, পূর্বোৎপন্ন জ্ঞানের নিবর্তকরূপে এখানে জ্ঞানত্ব প্রকাশিত হয় নাই, আত্মবিশেষগুণত্বই নিবর্তক হেতুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং পরবর্তী জ্ঞাননাশ্য পূর্বজ্ঞানে আর লক্ষণের অতিব্যাপ্তির প্রশ্ন আসিল না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে যখন পরভাবী জ্ঞান পূর্বোৎপন্ন জ্ঞানের বিনাশক হইয়াছে; জ্ঞান অন্যতম আত্মগুণও বটে। এই অবস্থায় জ্ঞানকে জ্ঞানরূপে (জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নরূপে) হেতু কল্পনা না করিয়া, আত্মার বিশেষগুণ হিসাবে হেতু কল্পনা করার তাৎপর্য কি? তাহাতে গুরুতর কল্পনারই আশ্রয় লইতে হয় নাকি? প্রতিবাদী মাধ্বের এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতির ক্রমিক উৎপত্তি মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন—"জ্ঞানজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ।" জ্ঞান যখন থাকে, তখন পর্যন্ত ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ লাভ করে না। ইচ্ছা উদিত হইলে, জ্ঞান বিনষ্ট হয়, কৃতি বা চেষ্টার উদয় হইলে, ইচ্ছা আত্মগোপন করে। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্মার বিশেষগুণ (জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতি) একে অপরের বিনাশক হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি বিনাশ্য-বিনাশক আত্মগুণরাজির কার্য-কারণ-ভাবের নির্বচন করিতে হয়, তবে পরবর্তী জ্ঞানের ন্যায় পরভাবী ইচ্ছা দ্বারাও যখন পূর্বে জায়মান জ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়, তখন কেবল

জ্ঞানত্বকে জ্ঞানের নিবর্তক হেতুরূপে উল্লেখ করা সঙ্গত হয় না। জ্ঞান ও ইচ্ছা এই উভয় পদার্থে বিদ্যমান কোন ধর্মকে নিবৃত্তির হেতুরূপে নির্দেশ করাই সেক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত হইবে। জ্ঞান ও ইচ্ছা, এই দুইই আত্মার গুণ এবং বিশেষগুণ। এই অবস্থায় জ্ঞানের নিবর্তক হেতুরূপে (জ্ঞানত্বের উল্লেখ না করিয়া) আত্মবিশেষগুণত্বের উল্লেখই সমধিক যুক্তিসহ। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, পরবর্তী জ্ঞান জ্ঞানত্বরূপে পূর্বজ্ঞানের নিবৃত্তির হেতু না হওয়ায়, (আত্মবিশেষগুণত্বরূপে হেতু হওয়ায়) পূর্বজ্ঞানে 'জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্' এইরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তির আপত্তি উঠে না। এইরূপে অদ্বৈতবেদান্তী আলোচ্য অতিব্যাপ্তির প্রশ্নের কোনরূপ সমাধান করিলেও, মুগুড়ের আঘাতের ফলে বিধ্বস্ত ঘটে মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইতেছে। উক্তলক্ষণ অনুসারে মুগুড়াঘাতে বিনষ্ট ঘটকে মিথ্যা বলিবার কোন হেতু নাই। এই অবস্থায় মুগুড়-বিধ্বস্ত ঘটে মিথ্যাত্বরূপ সাধ্য না থাকায়, "বাধ"-নামক হেত্বাভাসই অবশ্যম্ভাবী হয়।

অধিষ্ঠান বা আশ্রয় শুক্তির সাক্ষাৎকার ঘটিলে, শুক্তিতে রজত-বিভ্রমের নিবৃত্তি হয়, ইহা সকল সুধীই অবগত আছেন। এতকাল পর্যন্ত শুক্তি সম্পর্কে আমার অজ্ঞান ছিল, বিভ্রান্তি ছিল, শুক্তির জ্ঞানোদয়ে সেই অজ্ঞান এবং বিভ্রমের নিবৃত্তি ঘটিয়াছে। এইরূপে যে সর্বজনীন অনুভব হইতে দেখা যায়, সেখানে শুক্তির জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বিভ্রমের বিলুপ্তি সাধিত হওয়ায় (জ্ঞান জ্ঞানত্বরূপে হেতু হইয়াই অজ্ঞান বিভ্রমের নিবর্তক হইয়াছে বলিয়া), শুক্তিরজতের অজ্ঞান ও বিভ্রমের ক্ষেত্রে উল্লিখিত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তিও অনিবার্যরূপেই আত্মপ্রকাশ লাভ করে। যদি বল যে, অজ্ঞান, বিভ্রম প্রভৃতি তো অদ্বৈতবেদান্তোক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের লক্ষ্যই বটে, লক্ষ্যে লক্ষণের সঙ্গতিতে অতিব্যাপ্তির প্রশ্ন উঠে কি করিয়া? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, স্বীয় আধার বা আশ্রয়ে রজত কোন কালেই ছিল না, নাই বা থাকিবে না, এইরূপে (ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগীরূপে) রজতের যেরূপ মিথ্যাত্ব অদ্বৈতবেদান্তীর অভিপ্রেত, শুক্তিরূপ আধারে প্রতীত রজতের ক্ষেত্রে শুক্তিতে রজত কখনও ছিল না, নাই বা থাকিবে না, এইরূপে ত্রৈকালিক নিষেধ কাহারও উদয় হইতে দেখা যায় না। ফলে, শুক্তিরজতের অজ্ঞান, বিভ্রম প্রভৃতিকে

অদ্বৈতবেদান্তীর মিথ্যাত্বলক্ষণের লক্ষ্য বলিয়াই গ্রহণ করা চলে না। মিথ্যাত্বলক্ষণের যাহা লক্ষ্য নহে, এইরূপ শুক্তিরজতের অজ্ঞান, বিভ্রম প্রভৃতিতে আলোচ্য (জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্ এই) লক্ষণের সঙ্গতি ঘটিয়াছে বলিয়াই অতিব্যাপ্তির প্রশ্ন উঠিয়াছে। তারপর, শুক্তিরজতের অজ্ঞান, বিভ্রম প্রভৃতিকে যদি আলোচিত মিথ্যাত্বলক্ষণের লক্ষ্য বলিয়াই গ্রহণ করা হয়, তবে লক্ষণটি যে অর্থান্তর[১] দোষে কলুষিত হয়, তাহাও প্রিয় পাঠক অবশ্য লক্ষ্য করিবেন।[২]

শুক্তিরজতের অধিষ্ঠান শুক্তির সাক্ষাৎকারের ফলে রজতবিভ্রমের নিবৃত্তি হয়, ইহা সত্য কথা। এখানে অধিষ্ঠান শুক্তির সাক্ষাৎকার জ্ঞানত্বরূপে হেতু হয় নাই (সাক্ষাৎকারত্বরূপে হেতু হইয়াছে)। অতএব শুক্তিরজতের ক্ষেত্রে যে আলোচ্য মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ কি? শুক্তিরজত যে মিথ্যা তাহাতে বাদী প্রতিবাদী উভয়েই একমত। এইরূপ উভয়বাদিসিদ্ধ মিথ্যাত্বের দৃষ্টান্ত শুক্তিরজতে প্রদর্শিত মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটিলে, দৃষ্টান্তটি যে 'সাধ্যবিকল' বা সাধ্যশূন্য হওয়ায় অসদ্দৃষ্টান্ত হইবে, তাহা অদ্বৈতবাদী লক্ষ্য করিয়াছেন কি?

প্রতিবাদী মাধ্বের এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, 'জ্ঞান যেখানে জ্ঞানরূপে হেতু হইয়া বস্তুর নিবর্তক হইবে' এই কথার তাৎপর্য এইরূপই বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান জ্ঞানত্বরূপে হেতু না

১। বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসাধন করিবার জন্য অদ্বৈতবেদান্তী মিথ্যাত্বের যে-সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা শুক্তিরজতের অজ্ঞান, বিভ্রম প্রভৃতির (যাহার মিথ্যাত্ব বাদী প্রতিবাদী সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন) মিথ্যাত্ব সাধিত হওয়ায় লক্ষণটি যেই উদ্দেশ্যে অদ্বৈতবাদী প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইয়াছে। ফলে, লক্ষণে যে অর্থান্তরদোষ ঘটিয়াছে সুধী পাঠক তাহা অবশ্য লক্ষ্য করিবেন।

২। (ক) অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৬০ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং।

(খ) এতাবন্তং কালং শুক্ত্যজ্ঞানমাসীৎ ভ্রম আসীদিত্যনুভবেন শুক্তিবৎ সত্যেঽজ্ঞানে ভ্রমাদৌ শুক্তিজ্ঞানেন তদজ্ঞানং নষ্টমিত্যনুভবেন জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বস্য সত্ত্বেন তত্রাতিব্যাপ্ত্যাখ্যো দোষ ইত্যর্থঃ। যদি চ সাধ্যনির্বচনরূপত্বান্নায়ং দোষঃ, তদাঽর্থান্তরম্।

অদ্বৈতসিদ্ধির সিদ্ধিব্যাখ্যা টীকা, ১৬০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

হইয়া, জ্ঞানত্বের কোন ব্যাপ্যধর্মরূপে হেতু হইলেও (জ্ঞানত্বের অন্যতম ব্যাপ্য ধর্মের দ্বারা বস্তুর নিবৃত্তি ঘটিলেও) তাহা জ্ঞাননিবর্ত্য এবং মিথ্যাই হইবে। শুক্তিরজতের ক্ষেত্রে শুক্তির অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারই অপরোক্ষ রজত-বিভ্রমের নিবর্তক হইয়া থাকে, শুক্তির পরোক্ষজ্ঞান অপরোক্ষ রজত-বিভ্রমের নিবর্তক হয় না, হইতে পারে না বলিয়া, অধিষ্ঠান শুক্তির জ্ঞানকে জ্ঞানরূপে হেতু কল্পনা না করিয়া, জ্ঞানত্বের ব্যাপ্য সাক্ষাৎকারত্বরূপেই হেতু কল্পনা করিতে হইবে। অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারও জ্ঞানেরই একপ্রকার বিশেষ রূপ, এবং ঐরূপে উহা জ্ঞানত্বব্যাপ্য জাতিও বটে। ফলে, শুক্তি-সাক্ষাৎকার নিবর্ত্য শুক্তিরজত প্রভৃতিও মিথ্যাই হইবে। শুক্তিরজতে প্রতিবাদীর সাধ্যবৈফল্যের আপত্তিও অচল হইয়া পড়িবে। ভালকথা, জ্ঞানত্বের কোনও ব্যাপ্যধর্মের দ্বারা কোন বস্তুর নিবৃত্তি ঘটিলে তাহাও যদি জ্ঞাননিবর্ত্য এবং মিথ্যাই হয়, তবে জ্ঞানত্বের অন্যতম ব্যাপ্যধর্ম স্মৃতির দ্বারা নিবর্তনীয় সত্য-সংস্কারে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হয় নাকি ?[১]

জ্ঞানমাত্রই ক্ষণিক অর্থাৎ তৃতীয় ক্ষণবিনশ্বর। জ্ঞান প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে অবস্থান করে, তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া আত্মায় সংস্কাররূপে বিরাজ করে। ঐ সংস্কার কালক্রমে উদ্বোধকের সাহায্যে জাগরূক হইয়া স্মৃতিজ্ঞান উৎপাদন করে। এইরূপে জ্ঞান, সংস্কার ও স্মৃতির চক্র আবর্তিত হইতে থাকে। সংস্কারও সুতরাং আত্মারই একপ্রকার বিশেষ গুণ এবং জ্ঞানের উহা চরমাবস্থা বা পরিণতিবিশেষ। বিভু আত্মার যোগ্য গুণমাত্রই পরবর্তী জ্ঞানের উদয়ে বিলীন হইয়া থাকে। পরবর্তী জ্ঞান পূর্বজ জ্ঞানের, পরবর্তী ইচ্ছা, চেষ্টা প্রভৃতি পূর্বতনীন ইচ্ছা, চেষ্টা প্রভৃতির নাশক হইয়া থাকে। কেননা, দুইটি জ্ঞান একই সময়ে থাকে না, থাকিতে পারে না। যে মানস-ক্রিয়ার ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই মন অণু বিধায়, অণুপরিমাণ মনে দুইটি জ্ঞানের দাঁড়াইবার স্থান নাই। এইজন্য পরবর্তী জ্ঞানোদয়ে

১। অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারত্বেন নিবর্ত্যে শুক্তিরজতাদৌ চ জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বা-ভাবাৎ সাধ্যবিফলতা, জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্মেণ জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব বিবক্ষায়াং জ্ঞানত্বব্যাপ্যেন স্মৃতিত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যে সংস্কারে অতিব্যাপ্তিঃ।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৬০ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং।

পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিলুপ্তি অবশ্য স্বীকার্য। এইরূপই জ্ঞানের স্বভাব। জ্ঞানের এই স্বভাববশতঃই জ্ঞান স্মৃতির মূল সংস্কার উৎপাদন করিয়া নিবর্তিত হয়। সংস্কার কালক্রমে স্মৃতি উৎপাদন করিয়া স্মৃতি দ্বারা বাধিত হয়। স্মৃতির মূল ঐ সংস্কারে জ্ঞানত্বের ব্যাপ্য ধর্ম স্মৃতির দ্বারা নিবর্ত্যত্ব থাকায় (আলোচ্য মিথ্যাত্বলক্ষণের লক্ষ্য হওয়ায়) লক্ষণের অতিব্যাপ্তির প্রশ্ন দুর্নিবাররূপেই আত্মপ্রকাশ লাভ করে।

স্মৃতিনিবর্ত্য সংস্কারে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অদ্বৈতবাদী হয়ত বলিবেন যে, 'জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্', এই লক্ষণস্থ জ্ঞানশব্দের দ্বারা জ্ঞানমাত্রকে লক্ষ্য করা হয় নাই, অনুভবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। বুদ্ধি বা জ্ঞান দুই প্রকার—অনুভবরূপ এবং স্মৃতিরূপ—"বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাৎ।" ভাষাপরিচ্ছেদ, প্রত্যক্ষ পরিঃ। অনুভবাত্মক জ্ঞানের যাহা ব্যাপ্য ধর্ম, ঐ ব্যাপ্য ধর্মের দ্বারা নিবর্তিত বা বাধিত হইলেই বস্তু মিথ্যা হইবে, তাহা না হইলে হইবে না। এইরূপে লক্ষণটির মর্ম ব্যাখ্যা করিলে, জ্ঞানত্বব্যাপ্য স্মৃতির দ্বারা নিবর্তনীয় সংস্কারে আর অতিব্যাপ্তির আপত্তি উঠিবে না।

অদ্বৈতবেদান্তীর এইরূপ লক্ষণের ব্যাখ্যাও প্রতিবাদী মাধ্বের অন্তর স্পর্শ করে নাই। প্রতিবাদীর মতে উল্লিখিত ব্যাখ্যাও দোষমুক্ত নহে। অনুভবত্বের যাহা ব্যাপ্যধর্ম তাহা দ্বারা নিবর্তনীয় পদার্থমাত্রই মিথ্যা হইলে, যথার্থ স্মৃতিনিবর্ত্য অযথার্থ স্মৃতিতে আলোচ্য মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটে। ফলে, অযথার্থ স্মৃতিকে আর মিথ্যা বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ তত্ত্বজ্ঞানের সংস্কারের দ্বারা নিবর্তনীয় জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের মিথ্যা অজ্ঞান-সংস্কার প্রভৃতিতেও উল্লিখিত মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তিই অপরিহার্য হয়। এক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদী অবশ্য বলিতে পারেন যে, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের অজ্ঞান-সংস্কার প্রভৃতিও তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের ফলেই নিবর্তিত বা বাধিত হইয়া থাকে, সুতরাং অজ্ঞান-সংস্কারে অব্যাপ্তির প্রশ্নই উঠে না। ইহার উত্তরে প্রতিবাদী মাধ্বের বক্তব্য এই যে, জ্ঞান অজ্ঞানেরই নিবর্তক হইয়া থাকে; অজ্ঞানের সংস্কার তো আর অজ্ঞান নহে, জ্ঞান তাহাকে (অজ্ঞান-সংস্কারকে) নিবর্তিত করিবে কিরূপে? জ্ঞান-সংস্কারই অজ্ঞান-সংস্কারের নিবর্তক, জ্ঞান নহে। যদি বলা যায় যে, অজ্ঞানের সংস্কারের উপাদান তো

অজ্ঞানই বটে। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে বাধ্য-বাধকভাব থাকায়, জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইলে, উপাদানের অভাবে উপাদেয় অজ্ঞান-সংস্কারেরও স্বাভাবিক ভাবেই নিবৃত্তি ঘটিবে। সেক্ষেত্রে অজ্ঞান-সংস্কারে অব্যাপ্তির প্রশ্নই আসে না। এইরূপ অদ্বৈতবাদীর উত্তরের প্রত্যুত্তরে প্রতিবাদী মাধ্ব বলেন যে, অজ্ঞানের সংস্কারের নিবৃত্তিতে একমাত্র অজ্ঞানই কারণ হইবে, জ্ঞান কোনমতেই অজ্ঞান-সংস্কারের নিবর্তক হইবে না। উপাদান উপাদেয়ের হেতু হয়, এবং উপাদানের নাশে উপাদেয়ের বিনাশ হয়। মাটির বিনাশে মৃন্ময় ঘটের বিনাশ হয়, ইহা কে না জানেন? এই অবস্থায় অজ্ঞান-সংস্কারের বিনাশে একমাত্র অজ্ঞানই যে কারণ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? অজ্ঞানের নাশক যথার্থ জ্ঞান সেক্ষেত্রে 'অন্যথাসিদ্ধ' প্রকৃত কারণ নহে। ফলে দেখা যাইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞানের সংস্কার নিবর্তনীয় জীবন্মুক্তের অজ্ঞান-সংস্কার প্রভৃতিতে মিথ্যাত্বের অব্যাপ্তির প্রশ্ন থাকিয়াই যাইতেছে। অদ্বৈতবেদান্তী তাহার (উক্ত অব্যাপ্তির) কোন সমাধানের পথ প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। এই অবস্থায় অজ্ঞান-সংস্কারে জ্ঞান-নিবর্ত্যত্ব সাধনের উদ্দেশ্যে অদ্বৈতবেদান্তী যদি লক্ষণটি আরও ঘুরাইয়া বলেন যে, অজ্ঞান-সংস্কারের উপাদান অজ্ঞানের নিবর্তক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের দ্বারা যাহা নিবর্তনীয়, তাহাই মিথ্যা—"স্বোপাদানাজ্ঞাননিবর্তক জ্ঞান-নিবর্ত্যত্বং বিবক্ষিতম্"। অদ্বৈতসিদ্ধি টীকা-সিদ্ধিব্যাখ্যা, ১৬১ পৃঃ নির্ণয়-সাগর সং। এইরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণের অজ্ঞান-সংস্কারেও সঙ্গতি (ব্যাপ্তি) পাওয়া যায় বলিয়া, অজ্ঞান-সংস্কারে অব্যাপ্তির প্রশ্নই হয় অবান্তর। এই-ভাবে অজ্ঞান-সংস্কারে অব্যাপ্তির প্রশ্নের সমাধান খুঁজিলেও, উক্ত লক্ষণ দোষমুক্ত হয় না। অনাদি অজ্ঞানাধ্যাসের ক্ষেত্রে অজ্ঞানাধ্যাসের মূল অজ্ঞানের অনাদিত্ব নিবন্ধন, তাহার (অনাদি-অজ্ঞানের) উপাদানের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হওয়ায়, অনাদি অজ্ঞানাধ্যাসে উল্লিখিত লক্ষণের অব্যাপ্তিই স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় কথা এই, যাহার মূলে অজ্ঞান উপাদানরূপে বিরাজ করে, তাহাই মিথ্যা, এইরূপ সরল ও সহজবোধ্য লক্ষণের দ্বারাই আলোচ্য লক্ষণের উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্ভবপর হয় বলিয়া, উল্লিখিত গুরুতর লক্ষণ পরিকল্পনার আশ্রয় লইবার স্বপক্ষে কোন উপযুক্ত কারণও দেখা যায় না।[১]

১। ন চ স্বোপাদানাজ্ঞাননিবর্তকজ্ঞাননিবর্ত্যত্বং বিবক্ষিতম্, অতো ন সংস্কারাদাব-

জগৎসত্যতার উদ্‌গাতা প্রতিবাদী মাধ্ব বলেন উপরের আলোচনায় ইহা সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে যে, অদ্বৈতবাদীর জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্', এই লক্ষণান্তর্গত জ্ঞানপদটির (ক) জ্ঞানেরদ্বারা যাহার নিবৃত্তি ঘটে, কিংবা (খ) জ্ঞান জ্ঞানরূপে হেতু হইয়া যাহার নিবৃত্তি ঘটায়, অথবা (গ) জ্ঞানত্বের ব্যাপ্য কোনও ধর্মের দ্বারা যাহা নিবর্তিত বা বাধিত হয় তাহাই মিথ্যা,[১] এইভাবে যেই তাৎপর্যই ব্যাখ্যা কর না কেন, কোনরূপ ব্যাখ্যায়ই লক্ষণটিকে মিথ্যাত্বের নির্দোষ সংজ্ঞা বলিয়া সুধী দার্শনিক গ্রহণ করিতে পারেন না। আলোচ্য মিথ্যাত্বের লক্ষণটি সুতরাং প্রকৃত লক্ষণ না হইয়া 'লক্ষণাভাস'ই (false definition) হইয়া দাঁড়াইবে। প্রতিবাদীর এইরূপ আক্রমণের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, আলোচ্য লক্ষণে নিবর্ত্য' শব্দের অন্তরালে যে নিবৃত্তি কথাটি আছে, তাহা দ্বারা কেবল দৃশ্যমান স্থূল কার্যেরই নিবৃত্তি বুঝাইবে না। স্ব স্ব উপাদানের সহিত স্থূল এবং সূক্ষ্ম, এই উভয়বিধ কার্যের নিবৃত্তিই বুঝিতে হইবে। নিবৃত্তি শব্দের দ্বারা এখানে কার্যের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। স্থূল কার্যের নিবৃত্তি ঘটিলেও, ঐ নিবৃত্তিদ্বারা কার্যের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা বিনাশ ঘটে না। কার্যের নিবৃত্তি বা নাশ শব্দের অর্থ স্থূলরূপ পরিহার করতঃ অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থায় কার্যের উপাদান কারণে উহার (কার্যের) অবস্থিতি—নাশঃ কারণলয়ঃ, সাংখ্যসূত্র। অদ্বৈতবেদান্তী সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদ অনুমোদন না করিলেও, কার্য কারণেরই এক প্রকার বিশেষ অভিব্যক্তি। সেই অভিব্যক্তির বিলয় ঘটিলে কার্য সূক্ষ্মরূপে স্বীয় উপাদান-কারণেই অবস্থান করে। কারণই প্রকৃতপক্ষে কার্যের আত্মা বা স্বরূপ। সাংখ্যোক্ত সৎকার্য-বাদের এই মূলনীতি সৎকারণবাদী অদ্বৈতবেদান্তীও অস্বীকার করেন না। "তদনন্যত্ব-মারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"। ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪, এই সূত্রে এবং এই অধিকরণোক্ত অপরাপর কতিপয় সূত্রে (২।১।১৫—২।১।১৮ সূত্র দ্রষ্টব্য) কার্য যে কারণাত্মক। কারণের সত্তা ব্যতীত কার্যের যে কোনরূপ স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কার্যসত্তা কারণসত্তা দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে, এই সৎকার্যবাদের মূল রহস্যই ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই অবস্থায় কার্যের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে, স্থূল কার্যের ন্যায় স্ব স্ব উপাদান-কারণে নিলীন, সূক্ষ্ম অতীত ও ভাবী কার্যের এবং ঐ কার্যাধার উপাদানের নিবৃত্তিও লক্ষণস্থ নিবৃত্তি শব্দের মর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। উপাদানের নিবৃত্তি না

ব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম্; অজ্ঞানাদেরনাদের্যোঽধ্যাসস্তত্র চোপাদানাসম্ভবেনাব্যাপ্তেঃ, লাঘবেনাজ্ঞানোপাদানকত্বে তস্যৈব লক্ষণত্বাপাতাচ্চেতি।

অদ্বৈতসিদ্ধি টীকা—সিদ্ধিব্যাখ্যা, ১৬৩ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং।

১। কিং জ্ঞাননিবর্ত্যত্বমাত্রম্? উত জ্ঞানত্বেন তন্নিবর্ত্যত্বম্? অথবা জ্ঞানত্বব্যাপ্যধর্মেণ তন্নিবর্ত্যত্বম্? সিদ্ধিব্যাখ্যা, ১৬০ পৃঃ।

ঘটিলে প্রবিলীন অতীত এবং ভাবী কার্য স্বীয় উপাদানে থাকিয়াই যাইবে এবং অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রেত জগতের ত্রৈকালিক নিষেধ বা মিথ্যাত্বও সেক্ষেত্রে সাধিত হইবে না। যেই কার্য অতীত হইয়াছে তাহা যেমন এখন বিদ্যমান নাই, যাহা ভবিষ্যতের গর্ভে আছে. তাহাও এইক্ষণে বর্তমান নাই। এইরূপ অবিদ্যমান অতীত এবং ভবিষ্যৎ কার্যের আবার নিবৃত্তি হইবে কি? বিদ্যমান কার্যেরই নিবৃত্তির কথা উঠিতে পারে, অতীত এবং ভাবী কার্য যাহা নিবৃত্ত হইয়াই আছে. তাহার নিবৃত্তির কথা সম্পূর্ণই অর্থহীন নহে কি? এইরূপ আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে. উপাদানে প্রবিলীন অতীত এবং ভাবী কার্য স্থূল কার্যরূপে বিদ্যমান না থাকিলেও, সূক্ষ্ম অব্যক্তরূপে তাহা স্ব স্ব উপাদানে বর্তমানই আছে। স্থূল কার্যবর্গের এবং স্বীয় উপাদানে অবস্থিত প্রবিলীন অতীত ও ভাবীকার্যের সহিত উপাদানের বিনাশই কার্যের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা 'বাধ' বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। বিশ্বের তাবদ্‌বস্তুর পরিণামী উপাদান অজ্ঞানের এবং স্থূল ও প্রবিলীন কার্যের জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তিকেই প্রকাশাত্মযতি বিবরণে 'বাধ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐরূপ বাধ্যত্বই জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব বলিয়া জানিবে। আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী তদীয় 'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থে এই দৃষ্টিতেই আলোচ্য লক্ষণটির ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"জ্ঞানপ্রযুক্তাবস্থিতিসামান্যবিরহপ্রতিযোগিত্বং হি জ্ঞাননিবর্ত্যত্বম্"। অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৬০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সং। আচার্য মধুসূদনের নিগূঢ় উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া গৌড় ব্রহ্মানন্দ তদীয় 'লঘুচন্দ্রিকা'য় বলিয়াছেন—অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ের যথার্থ জ্ঞানোদয়ের ফলে ঐ আশ্রয়কে ব্যাপিয়া বস্তুর স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ বিভাব এবং তন্মূলক সংস্কারের যে অত্যন্তাভাব পাওয়া যায়, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তুরাজি এবং বস্তুসংস্কার প্রভৃতি সমস্তই জ্ঞাননিবর্ত্য এবং মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে।[১] বস্তুর অবস্থিতি দুইপ্রকার—স্থূল বা ব্যক্ত কার্যরূপে, সূক্ষ্ম অর্থাৎ উপাদান কারণে প্রবিলীনরূপে। সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদের মূলনীতি অনুসরণ করায়, সৎকারণবাদ বা বিবর্তবাদেও বস্তুর নিরন্বয় বিনাশ স্বীকার করা হয় নাই। কার্যের ব্যক্ত স্থূলরূপ বিনষ্ট হইলেও, কার্য নষ্ট হয় না। কার্য সূক্ষ্ম অব্যক্তরূপে স্বীয় উপাদানে অবস্থান করে। উপাদান বিনষ্ট হইলেই কার্য বিনষ্ট হয়। উপাদানের সহিত কার্যের বিনাশই কার্যনাশ কথার মর্ম। মুদ্গরের প্রহারের ফলে ঘটের ব্যক্ত (কম্বুগ্রীবাদিমান্) ঘটরূপ বিধ্বস্ত হইলেও ঘটের প্রকৃত বিনাশ হয় না। ঘট তাহার ব্যক্ত ঘটরূপ পরিত্যাগ করিয়া অব্যক্ত

১। জ্ঞানপ্রযুক্তোঽধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারব্যাপকো যঃ অবস্থিতিসামান্যস্য স্বীয়সংস্কারান্তরস্যাভাবঃ তৎপ্রতিযোগিত্বম্ (জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্)।

অদ্বৈতসিদ্ধিটীকা-লঘুচন্দ্রিকা, ১৬০ পৃঃ।

সূক্ষ্ম প্রবিলীন কার্যরূপে ঘটের উপাদান মাটির মধ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করে। স্বীয় উপাদান মাটির বিনাশ হইলেই কেবল ঘটের বিনাশ সম্ভবপর হয়, নতুবা নহে। স্বীয় উপাদান মাটিতে অব্যক্ত সূক্ষ্মরূপে অন্তর্লীন ঘটে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ বিভাবের অভাব না থাকায়, (অবস্থিতিসামান্যবিরহ না থাকায়) উক্ত বিরহপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব লক্ষণের উহা (মুদ্গরবিধ্বস্ত ঘট) লক্ষ্যই হইবে না; এই অবস্থায় (মুদ্গরবিধ্বস্ত ঘটে) অব্যাপ্তির প্রশ্ন আসিবে কিরূপে? কার্যের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ বিভাবের অভাব আবার জ্ঞানপ্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে কোন বস্তুই মিথ্যা হইবে না। পরিদৃশ্যমান এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ বিভাবের 'জ্ঞানপ্রযুক্ত' অভাব জগদাধার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের ফলেই সম্ভব হইতে পারে। 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ', এইরূপে সর্বত্র জগতে পরব্রহ্মের স্ফুরণ হইলে, ব্রহ্মবিদ্যার উদয়ে "অবিদ্যা সহকার্যেণ নাস্তি নাসীদ্ ভবিষ্যতি" এইরূপে অবিদ্যা এবং অবিদ্যার পরিণাম জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত হইলে, ঘট প্রমুখ বস্তুরাজির স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি বিভাব, ঘটাদির উপাদান মৃত্তিকা প্রভৃতির কোন প্রকার অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ফলে আলোচ্য লক্ষণ অনুসারে ঘট প্রমুখ বস্তুর মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হইবে। পরবর্তী জ্ঞানের উদয়ে নিবর্তনীয় পূর্ব পূর্ব জ্ঞানের ক্ষেত্রে তৃতীয়ক্ষণবিনশ্বর পূর্ব পূর্ব বিজ্ঞান স্বীয় কারণ জীবাত্মায় সংস্কাররূপে বিরাজ করায়, পূর্বোৎপন্ন জ্ঞানের অবস্থিতি সামান্যের অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ বিভাবের অভাব ঘটেনা বলিয়া, আলোচ্য মিথ্যাত্ব লক্ষণের ব্যাপ্তি না থাকায়, অতিব্যাপ্তির কথাই সেখানে উঠে না। বস্তুবর্গের সর্বপ্রকার অবস্থিতির অভাবকে 'জ্ঞান প্রযুক্ত' বলার তাৎপর্য এই যে, আকাশকুসুম, শশবিষাণ প্রভৃতির অলীক বস্তুর সর্ববিধ অভাব (অবস্থিতিসামান্যবিরহ) বিদ্যমান থাকিলেও ঐরূপ অভাব জ্ঞান-প্রযুক্ত নহে বলিয়া, আকাশকুসুম প্রভৃতি তুচ্ছ বস্তুকে আর মিথ্যা বলা চলিল না। শুক্তির জ্ঞানের দ্বারা রূপার বিনাশ ঘটিয়াছে—'শুক্তিজ্ঞানেন রূপ্যং নষ্টম্', এইরূপ অনুভবের কাহারও উদয় হইতে দেখা যায় না। ফলে, শুক্তিরজতে 'জ্ঞাননিবর্তনীয়তা' না থাকায়, মিথ্যাত্বের বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের সম্মত দৃষ্টান্তেই সাধ্য মিথ্যাত্বের অভাব ঘটে এবং দৃষ্টান্তটি 'সাধ্যবিকল', অসদ্দৃষ্টান্ত হয় বলিয়া প্রতিবাদী মাধ্ব যে আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহার উত্তরে অদ্বৈতবাদীর বক্তব্য এই যে, শুক্তিরজত অবিদ্যার সৃষ্টি। ভ্রান্ত ব্যক্তি অবিদ্যাপরিণাম ঐ রজতকে চক্ষুর গোচরে (প্রত্যক্ষতঃ) উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা করিতে হইলেই শুক্তিতে আবিদ্যক রজতের সাময়িক উৎপত্তি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তারপর 'নেদং রজতম্' এই বাধবুদ্ধির উদয় হইলে, অবিদ্যাভ্রান্তি চলিয়া গেলে, অবিদ্যা-পরিণাম রজত অবিদ্যার অন্তরালেই আত্মগোপন করে। ভ্রান্ত ব্যক্তি, যিনি শুক্তিকে রজতরূপে

প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে, শুক্তিতে রজতের প্রত্যক্ষ-প্রতীতি বিভ্রমমাত্র। শুক্তি শুক্তিই বটে, রজত নহে। শুক্তিতে রজত কোনকালেই নাই, ছিল না, থাকিবেও না। যতক্ষণ মিথ্যাসৃষ্টির মূল অবিদ্যা ক্রিয়াশীল থাকে, ততক্ষণই শুক্তিরজতের খেলা ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিমুগ্ধ করে। শুক্তিরজত দেখিয়া এইরূপ অনুভূতিই ভ্রান্তিরহস্যবিৎ সুধীর মনে বিরাজ করে। এই সর্বজনীন অনুভবকে অস্বীকার (অপলাপ) করা চলে না। ফলে, 'নেদং রজতম্', এইরূপ বাধবুদ্ধির দ্বারা রজতের মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হয়। শুক্তিরজতে 'জ্ঞাননিবর্তনীয়তা' নাই, সুতরাং মিথ্যা শুক্তিরজতের দৃষ্টান্তটি 'সাধ্যবিকল' বলিয়া প্রতিবাদী যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহার কোনই ভিত্তি নাই। 'অবিদ্যা সহ কার্যেণ নাস্তি নাসীদ্ ভবিষ্যতি', এই বার্তিকের উক্তি দ্বারা অবিদ্যার এবং অবিদ্যা-পরিণাম শুক্তিরজত প্রভৃতির বাধ কীর্তিত হওয়ায়, শুক্তিরজত এবং উহার মূলীভূত অজ্ঞান, এই উভয়েরই মিথ্যাত্ব অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রেত। সুতরাং শুক্তিরজত প্রভৃতিকে কোন প্রকারেই আলোচ্য মিথ্যাত্বলক্ষণের অলক্ষ্য বলা চলে না। 'সহ কার্যেণ নাসীৎ' এইরূপ উক্তি দ্বারা কারণে অন্তর্লীন কার্যের, এবং 'ন ভবিষ্যতি' এই কথার দ্বারা ভাবীকার্যের নিবৃত্তির ইঙ্গিত করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিবরণাচার্যও অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের পরিণামের নিবৃত্তির ব্যাখ্যায় পূর্বোক্ত বার্তিক মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।[1] ভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় শুক্তি প্রভৃতির তত্ত্ব বা যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে, অবিদ্যা ও অবিদ্যা-পরিণাম রজত প্রভৃতির ত্রৈকালিক নিষেধ বা মিথ্যাত্বই সূচিত হইয়া থাকে।[2]

শুক্তিরজতের ন্যায় ব্যাবহারিক সত্যরজত ও অদ্বৈতবেদান্তীর দৃষ্টিতে মিথ্যাই বটে। এই উভয়বিধ মিথ্যাবস্তুতে মিথ্যাত্বলক্ষণের সঙ্গতি বা ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য অধিষ্ঠানতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বলিতে লক্ষণে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর অধিষ্ঠান পরব্রহ্মের চরম সাক্ষাৎকারকেই বুঝিতে হইবে। ঐ চরম ও পরম ব্রহ্মবিজ্ঞান উদিত হইলে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজত, ব্যাবহারিক সত্যরজত প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। সত্য পরব্রহ্মে অধ্যস্ত বলিয়াই নিখিলবিশ্ব সত্য স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দের সহিত পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের অধ্যাসগ্রন্থি ছিন্ন হইলে তথা কথিত

১। অতএবোক্তং বিবরণাচার্যেণ—অজ্ঞানস্য স্বকার্যেণ প্রবিলীনেন বর্তমানেন বা সহ-জ্ঞানেন নিবৃত্তির্বাধ ইতি।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৬৪ পৃঃ, নির্ণয়সাগর, সং।

২। রূপ্যোপাদানমজ্ঞানং স্বকার্যেণ বর্তমানেন লীনেন বা সহাধিষ্ঠানসাক্ষাকারান্নিবর্ততে ....ইতি ন দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যম্; মুদ্গরপাতানন্তরং ঘটো নাস্তীতি প্রতীতিবদধিষ্ঠানজ্ঞানানন্তরং শুক্ত্যজ্ঞানং তদ্‌গতরূপ্যঞ্চ নাস্তীতি প্রতীতেঃ সর্বসম্মতত্বাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৬৯-৭০, নির্ণয়সাগর সং।

সত্যবস্তুও (ব্যাবহারিক রজত প্রভৃতিও) মিথ্যাই হইয়া পড়ে। এই অনাদি অধ্যাসের উপাদান অনাদি অজ্ঞান। ব্রহ্মবিজ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানের নিঃশেষে নিবৃত্তি ঘটিলে, অজ্ঞান এবং অজ্ঞান-পরিণাম জগৎপ্রপঞ্চ সকলই মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় "জ্ঞাননিবর্তনীয়ত্বং মিথ্যাত্বম্", মিথ্যাত্বের এইরূপ বিবরণোক্ত নির্বচনেও দোষের কথা কিছুই নাই।

আনন্দবোধোক্ত মিথ্যাত্বের লক্ষণ

সচ্চিদানন্দগ্রন্থি ছিন্ন হইলে জগতের সত্যতা থাকে না। ইহা বুঝিয়াই আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য তদীয় 'ন্যায়মকরন্দে' 'যাহা সৎ বা সত্য হইতে বিবিক্ত বা পৃথক্ তাহাই মিথ্যা,' 'সদ্‌বিবিক্তত্বং মিথ্যাত্বম্', এইরূপে মিথ্যাত্বের অপর একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহা সৎ হইতে বিবিক্ত বা বিভিন্ন তাহাই যদি মিথ্যাত্বলক্ষণাক্রান্ত হইয়া মিথ্যা হয়, তবে এই লক্ষণটির ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য হয়। কারণ, যাহাতে সত্তা জাতি আছে তাহাইতো সৎ, এবং তাহাতেই সদ্‌রূপত্ব বা সত্যতা আছে। যাহাতে সত্তা জাতি নাই, তাহা কদাচ সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; সদ্‌রূপের বা সত্যতার অভাবই সেখানে থাকে। অদ্বৈতবেদান্তীর ব্রহ্ম সদ্‌রূপ নির্ধর্মক, সত্তাজাতিশূন্য। সুতরাং তাহাতে সত্যতা বা সত্তাজাতি কোনমতেই থাকিতে পারে না। সত্যতার অভাবই সেখানে আছে। ফলে, পরব্রহ্মেই লক্ষণটি অতিব্যাপ্ত হইবে নাকি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, যাহা সত্তাজাতিবিশিষ্ট তাহাই সৎ, প্রতিবাদীর এই প্রতিজ্ঞাই প্রথমতঃ অসিদ্ধ। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে জাতি বলিয়া কোন পদার্থ নাই। সুতরাং ঐরূপ সত্তাজাতির কল্পনা আমাদের (অদ্বৈতবাদীর) মতে অচল। দ্বিতীয়তঃ, যাহা সত্তাজাতিবিশিষ্ট তাহাই যদি সৎ হয়, তবে সত্তাজাতি নিজেই যখন সত্তাজাতিশূন্য,* তখন তাহাকে তো আর তোমার (প্রতিবাদীর) মতানুসারে সত্য বলা যায় না। সত্তাজাতিকে প্রতিবাদী অসৎ বলিবেন কি? সত্তা স্বরূপতঃ (স্বরূপসম্বন্ধে) সৎ, ইহাই প্রতিবাদী বলিয়া থাকেন। সত্তা যদি সত্তাজাতিশূন্য হইয়াও সদ্‌রূপ হইতে পারে, তবে সত্তা জাতিশূন্য পরব্রহ্মকেই বা সৎস্বরূপ বলিতে আপত্তি কি? এইরূপে ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ হওয়ায়, তাহাতে আর মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তির

* জাতির আর জাতি থাকে না। জাতির জাতি স্বীকার করিলে 'অনবস্থা' দোষ হয়। সামান্যপরিহীনাস্তু সর্বে জাত্যাদয়ো মতাঃ। ভাষাপরিচ্ছেদ, কারিকা ৮।

কথাই ওঠে না। অসৎ আকাশকুসুম প্রভৃতিও সৎ বা সত্যবস্তু হইতে ভিন্ন হওয়ায়, তাহাতে মিথ্যাত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আনন্দবোধ বলেন, লক্ষণস্থ 'সৎ' শব্দে সত্য বা প্রমাণসিদ্ধ পদার্থকে বুঝায়, 'সত্ত্বঞ্চ প্রমাণসিদ্ধত্বম্', অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৫ পৃঃ, নির্ণয়সাগর, সং; যাহা নির্দোষ প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহাই সদ্‌বিবিক্ত বা মিথ্যা আখ্যা লাভ করে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুরাজি নিদ্রাদি দোষবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া তাহা নির্দোষ প্রমাণসিদ্ধ নহে; প্রমাণসিদ্ধ হইতে বিবিক্ত বা পৃথক্, অতএব তাহা মিথ্যা স্বপ্নদৃষ্ট মিথ্যাবস্তু প্রমাণসিদ্ধ না হইলেও, তথাকথিত (ব্যাবহারিক) সত্যবস্তুর ন্যায় প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতি কদাচ কাহারও 'ইদং' রূপে (সম্মুখস্থ বস্তুরূপে) সৎ-প্রতীতির বিষয় হয় না। এইজন্য আলোচ্য লক্ষণে সদ্রূপে প্রতীতির যোগ্য 'সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হম্' এইরূপ একটি বিশেষণপদ জুড়িয়া দিলে, অলীক আকাশ-কুসুম প্রভৃতিতে আর উল্লিখিত লক্ষণের অতিব্যাপ্তির প্রশ্ন আসে না, ব্যাবহারিক সত্যরূপে প্রতীতির যোগ্য স্বপ্নপরিদৃষ্ট বস্তুতে অব্যাপ্তির কথাও ওঠে না। পদ্মপাদোক্ত 'সদসদ্বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্', এইরূপ প্রথম মিথ্যাত্ব-লক্ষণের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতিতে সদ্‌বিলক্ষণত্ব থাকায়, অলীকে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'অসদ্‌বিলক্ষণত্বম্' এই অংশটির লক্ষণে প্রয়োগ করা হইয়াছে। পদ্মপাদোক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের সহিত আনন্দবোধোক্ত লক্ষণের অনেক অংশে সাম্য দেখা যায়। ফলে, পদ্মপাদের লক্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদি-প্রদর্শিত বিবিধ দোষ আনন্দবোধের লক্ষণের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য হইতে পারে। সেক্ষেত্রে ঐ সকল দোষের সমাধানের পথও উভয় লক্ষণে একই প্রকারের বলিয়া বুঝিতে হইবে।* আকাশকুসুম প্রভৃতি স্থলে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য পদ্মপাদ বলেন, মিথ্যা বস্তুকে কেবল সদ্‌বিলক্ষণ হইলেই চলিবে না; তাহাকে অসৎ বা অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতি হইতেও বিলক্ষণ বা বিসদৃশ হইতে হইবে। আনন্দবোধ তাঁহার লক্ষণস্থ 'সৎ' পদের বিবৃতিতে যাহা সত্যরূপে প্রতীতির যোগ্য তাহাকে 'সৎ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐরূপ সদ্‌ভিন্ন যাহা তাহাই সদ্‌বিবিক্ত বা মিথ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সৎ বা সত্যরূপে

---

* সুধী পাঠক পদ্মপাদোক্ত লক্ষণের আলোচনা দেখুন।

প্রতীতির অযোগ্য আকাশকুসুম প্রভৃতি আনন্দবোধের মতে মিথ্যার পর্যায়ে পড়ে না। সুতরাং আলোচিত মিথ্যাত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তির প্রশ্নও সেখানে আসে না।

মিথ্যাত্বের লক্ষণ নির্বচন করা গেল। এখন পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বের মিথ্যাত্বে প্রমাণ কি, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। জাগতিক প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসাধনে প্রধানতঃ অনুমানই প্রমাণ। ঐ অনুমানের প্রয়োগ বাক্যটি (syllogism) কিরূপ, তাহা দেখাইতে গিয়া চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন :—

জগতের মিথ্যাত্বে প্রমাণ

অয়ং পটঃ (পক্ষ), এতত্তন্তু নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী (সাধ্য), দৃশ্যত্বাৎ (হেতু), ঘটবৎ (দৃষ্টান্ত)।

এই পটের অবয়ব এই যে তন্তু বা সূতা, তাহাতে এই পটের অত্যন্তাভাব আছে, এবং এই পট সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীও বটে, যেহেতু ইহা দৃশ্য, যেমন ঘট। তন্তু বা সূতাগুলি তো আর পট বা বস্ত্র নহে। সূতায় বস্ত্রের অত্যন্তাভাব চিরকালই আছে এবং থাকিবে। এইজন্যই আলোচ্য অনুমানে পট বা বস্ত্রকে সাধ্যের আধার অর্থাৎ পক্ষ (subject) করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই পটের উপাদান তন্তুতে এই পটের অত্যন্তাভাব আছে, যেহেতু এই পট দৃশ্য পদার্থ। দৃশ্য পদার্থমাত্রেরই সূক্ষ্ম উপাদানে ঐ সকল স্থূল দৃশ্যবস্তুর অত্যন্তাভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটের উপাদান মাটিতে ঘটের অভাব, কাঞ্চনময় কণ্ঠহারের উপাদান কাঞ্চনে কণ্ঠহারের অভাব, লৌহকুঠারের উপাদান লোহায় কুঠারের অভাব কে না প্রত্যক্ষ করেন? পটে দৃশ্যত্ব থাকায়, দৃশ্যত্ব হেতুর পক্ষ পটে অবস্থিতি (হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব) বুঝা গেল। ঘটেও দৃশ্যত্ব (হেতু) আছে এবং পটের অবয়ব তন্তুতে ঘটের অত্যন্তাভাবও (উক্ত অনুমানের সাধ্যও) আছে। ঘটে এইরূপে নিশ্চিত সাধ্য থাকায়, আলোচ্য অনুমানে ঘটকে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পটের উপাদান তন্তুতে পটের যে অন্যোন্যাভাব, প্রাগভাব এবং ধ্বংসাভাব আছে, তাহা কার্য ও কারণের ভেদবাদী ন্যায়বৈশেষিক মতে তার্কিকগণেরও স্বীকৃতি লাভ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় আলোচ্য অনুমানের সাধ্যকে 'অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী' না বলিয়া কেবল অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে, অনুমানটির

উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয় এবং উহা সিদ্ধসাধনতাও দোষে-কলুষিত হয়। এইরূপ কলুষিত অনুমানের দ্বারা অদ্বৈতবেদান্তীর অভিপ্রেত জগতের মিথ্যাত্বসাধন করা কোন মতেই চলে না। কোন-না-কোন স্থলে (ঘট প্রভৃতিতে) পটের যে অত্যন্তাভাব থাকে, অর্থাৎ পট যে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে তাহা কে অস্বীকার করে? তাহা দ্বারা পট মিথ্যা হইয়া যায় কি? তাহা তো যায় না। সুতরাং উল্লিখিত অনুমানের সাধ্যের অংশে 'তন্তু'পদ না দিলেও অনুমানে অর্থান্তরদোষই আত্মপ্রকাশ লাভ করে; এইজন্যই সাধ্যের অংশে তন্তুপদের অবতারণা করা হইয়াছে। রক্তপটের অবয়ব লাল তন্তুতে নীল পটের অত্যন্তাভাব থাকে এবং তাহা দ্বারা নীল পট মিথ্যা হইয়া যায় না। নীল পটের অবয়ব নীল তন্তুতে নীলপটের অত্যন্তাভাব থাকিলেই নীলপট মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। ইহা বুঝাইবার জন্যই তন্তুর বিশেষণ হিসাবে প্রদর্শিত অনুমানে 'এতৎ' পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

এইপ্রসঙ্গে প্রতিবাদী মাধ্ব বলেন, এই অনুমান তো ঠিক হইতেছে না। এই অনুমানে 'অনৈকান্তিক' হেত্বাভাস দোষই আসিয়া পড়ে। আলোচ্য অনুমানের মৌলিক ব্যাপ্তিটি হইল এই, যাহা যাহা দৃশ্য হইবে, তাহাই হইবে "এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী"। এই সাধ্যটিকে আরও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সাধ্যের অন্তর্গত অত্যন্তাভাব বলিতে এখানে এতত্তন্তুতে পটের অত্যন্তাভাবই বুঝা যাইবে। এতত্তন্তুতে পটের যে অত্যন্তাভাব আছে, তাহাও তো দৃশ্যই বটে। সেখানে দৃশ্যত্ব হেতুমূলে পুনরায় পটের অত্যন্তাভাবের (সাধ্যের) সিদ্ধি করিলে, দাঁড়ায় এই যে, এতত্তন্তুতে এতৎপটই আছে। অত্যন্তাভাবের অভাব যে প্রতিযোগীরই স্বরূপ, তাহা তো কেহই অস্বীকার করেন না। ঘটের অত্যন্তাভাবের অভাব ঘটস্বরূপই বটে। ফলে উক্ত অনুমানের দৃশ্যত্ব হেতুটি সাধ্যসিদ্ধির সহায়ক না হইয়া, সাধ্যের ব্যাঘাতকই হয়, এবং অনুমানটিও হেত্বাভাস দোষে কলুষিতই হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় বাধ্য হইয়াই অদ্বৈতবাদীকে বলিতে হয় যে, আলোচ্য অনুমানের সাধ্যে (এতত্তন্তুনিষ্ঠ পটের অত্যন্তাভাবে) আর এতৎপটের অত্যন্তাভাব নাই। কিন্তু তাহাতেও যে দৃশ্যত্ব হেতু আছে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। হেতু (দৃশ্যত্ব) থাকায়, (এতত্তন্তুতে এতৎপটের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবরূপ) সাধ্য না থাকায়, হেতু যে সাধ্যের ব্যভিচারী হইয়া 'অনৈকান্তিক' হেত্বাভাস হইয়া পড়িবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তারপর, দৃশ্যত্বে দৃশ্যত্বরূপ হেতু আছে। অতএব সেখানেও

অদ্বৈতবাদীর প্রদর্শিত অনুমানের বিরুদ্ধে মাধ্বের আপত্তি

এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বরূপ সাধ্য আছে, ইহা বাদীকে স্বীকার করিতেই হইবে; এবং ইহার অর্থ শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইবে এই যে, এতত্তন্তুতে দৃশ্যত্বের অত্যন্তাভাব অর্থাৎ অদৃশ্যত্বই আছে। এতত্তন্তু যে অদৃশ্য নহে, দৃশ্যই বটে তাহা সকলেই জানেন। এই অবস্থায় দৃশ্যত্ব হেতুর সহিত অদৃশ্যত্বের বা দৃশ্যত্বের অত্যন্তাভাবের ব্যাপ্তি আছে, এরূপ বলা কোনমতেই চলে না। দৃশ্যত্ব হেতু থাকায়, সাধ্য (অদৃশ্যত্ব) না থাকায়, দৃশ্যত্ব হেতু যে সাধ্য অদৃশ্যত্বের ব্যভিচারী হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ?[১]

এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য এই, অদ্বৈতবেদান্তী যে বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেই সকল জাগতিক প্রপঞ্চ কি প্রমাণসিদ্ধ ? না প্রমাণবিরহিত ? প্রপঞ্চ যদি প্রমাণসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদীর পূর্বোক্ত অনুমানে 'অয়ং পটঃ' এইরূপে পটকে পক্ষ করিয়া পটের যে মিথ্যাত্বসাধন করা হইয়াছে তাহা আর চলিবে না। অনুমানের ধর্মী বা বিশেষ্য পট যদি প্রমাণসিদ্ধ এবং সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হয়. তবে তাহাই তো প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসাধক অনুমানের বাধ সাধন করিবে। কেবল পক্ষই নহে, অনুমানের সাধ্য. হেতু দৃষ্টান্তও যদি প্রমাণসিদ্ধ হয়, তবে প্রামাণিক সাধ্য হেতু দৃষ্টান্ত প্রভৃতিতে 'দৃশ্যত্ব' হেতু বিদ্যমান থাকায় এবং প্রমাণসিদ্ধত্বনিবন্ধন অনুমানের সাধ্য মিথ্যাত্ব না থাকায়, হেতু যে সাধ্যের ব্যভিচারী হইবে, তাহাও নিঃসন্দেহ। তারপর, অনুমানের পক্ষটি যদি প্রমাণসিদ্ধ না হয়, তবে, আশ্রয় বা পক্ষ সিদ্ধ না হওয়ায়, অনুমান সেক্ষেত্রে 'আশ্রয়াসিদ্ধ' নামক হেত্বাভাসদোষেই কলুষিত হইবে। এইরূপে অনুমানের উপাদান সাধ্য, হেতু দৃষ্টান্ত প্রভৃতি যদি অপ্রামাণিক হয়, তাহা হইলেও সাধ্যের অসিদ্ধি. হেতুর অসিদ্ধি. দৃষ্টান্তাসিদ্ধি প্রভৃতি বিবিধ হেত্বাভাসই সেখানে অনুমানের মূলে কুঠারাঘাত করিবে। যে উপাদান প্রমাণসিদ্ধ নহে, এইরূপ উপাদানের সাহায্যে কোনরূপ অনুমানই জন্মিতে পারিবে না।[২]

অদ্বৈতবেদান্তীর জগতের মিথ্যাত্বের অনুমানের বিরুদ্ধে প্রদর্শিতরূপে বিবিধ হেত্বাভাস-দোষ উদ্ভাবন করতঃ দ্বৈতবেদান্তী মধ্বাচার্য নিম্নোক্ত

১। (ক) চিৎসুখী, ৩৫ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং।
(খ) নয়নপ্রসাদিনী, ৩৫ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং।

২। প্রপঞ্চপ্রামাণিকত্বে মিথ্যাত্বানুমানানাং ধর্মিগ্রাহকপ্রমাণেন বাধঃ। অপ্রামাণিকত্বে চাশ্রয়াসিদ্ধিঃ। এবং সাধ্যহেতুদৃষ্টান্তানামপি প্রামাণিকত্বে দৃশ্যত্বহেতোস্তত্রানৈকান্তিকতা, অপ্রামাণিকত্বে বা সাধ্যসাধনাভাবাদনুমানাসিদ্ধিঃ।
চিৎসুখী, ৩৫ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং।

প্রতিপক্ষানুমানের সাহায্যে জগতের সত্যতা সাধন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

মাধ্বোক্ত প্রপঞ্চ-সত্যতার অনুমান ও তাহার খণ্ডন

বিবাদাস্পদীভূতঃ প্রপঞ্চঃ (পক্ষ), সত্যঃ (সাধ্য), প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ (হেতু), আত্মবৎ (দৃষ্টান্ত)। চিৎসুখী, ৩৭ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং।)

বিবাদগোচর প্রপঞ্চ সত্য, যেহেতু উহা (প্রপঞ্চ) প্রমাণসিদ্ধ, যেমন আত্মা।

শুক্তিরজত প্রভৃতিও প্রপঞ্চ বটে। ঐ সকল প্রপঞ্চ যে মিথ্যা, তাহা বাদী, প্রতিবাদী সকলেই স্বীকার করেন। এই অবস্থায় কেবল প্রপঞ্চকে পক্ষ করিলে, শুক্তিরজত প্রপঞ্চরূপ পক্ষে অনুমানের সাধ্য সত্যতা না থাকায়, অনুমানটি 'বাধ' নামক হেত্বাভাস দোষে কলুষিত হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, পক্ষে সাধ্য না থাকিলে, সাধ্যশূন্য পক্ষকেই বাধ নামক হেত্বাভাস বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঘটাদিপ্রপঞ্চে যে সত্তা আছে সেই সত্তা যে সত্য পদার্থ তাহা মাধ্বের অনুমোদিতই বটে। সত্তাদি সত্য বস্তুও প্রপঞ্চ বিধায়, সে ক্ষেত্রে আলোচ্য মাধ্বঅনুমান বলে পুনরায় সত্যতা সাধন করিলে, অনুমানটি যে আংশিকভাবে সিদ্ধসাধন-দোষে কলুষিত হইয়া পড়িবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এইজন্যই অনুমানের সাধ্য প্রপঞ্চের অংশে 'বিবাদাস্পদীভূত' এইরূপ একটি বিশেষণ পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রপঞ্চমাত্রকেই পক্ষরূপে নির্দেশ করা আলোচ্য অনুমানের উদ্দেশ্য নহে। যে সকল প্রপঞ্চ সম্পর্কে সত্য-না-মিথ্যা এই বিতর্কের অবকাশ আছে, সেই সকল অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রেত ব্যাবহারিক ঘট প্রভৃতি প্রপঞ্চকেই এই অনুমানে পক্ষরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দৃশ্যমান ঘটাদি বিশ্বপ্রপঞ্চ যে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণসিদ্ধ তাহাতো মাধ্ব তার্কিকগণ স্বীকারই করিয়া থাকেন। ফলে, উক্ত অনুমানের হেতু (প্রমাণসিদ্ধত্ব) পক্ষ প্রপঞ্চে বিদ্যমান থাকায়, হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব সিদ্ধ হইল। প্রমাণসিদ্ধ আত্মায় সত্যতা বিরাজ করায় হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিও নিশ্চিত হইল এবং প্রদর্শিত অনুমানবলে প্রপঞ্চেরও সত্যতা সাধন করা চলিল।

পরিদৃশ্যমান এই ঘটপটাদি বিবিধ বিশ্বপ্রপঞ্চ সত্য হইলে, প্রপঞ্চান্তর্গত পরস্পর ভেদকেও সত্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এইরূপ (ভেদ সত্যতার) সিদ্ধান্ত

জগৎসত্যতাবাদী মাধ্ব, রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব বেদান্ত-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত হইলেও, অদ্বৈতবেদান্তী ভেদের সত্যতা-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, তাহার খণ্ডনই করিয়াছেন। ভেদকে যাঁহারা সত্য বলেন, উঁহারা নিম্নে প্রদর্শিত অনুমানের সাহায্যে ভেদের সত্যতা সাধন করিয়া থাকেন :—

মাধ্বোক্ত ভেদের সত্যতার খণ্ডন

অয়ং ঘটঃ (পক্ষ), এতন্নিষ্ঠ বাধ্য ভেদাতিরিক্ত ভেদাশ্রয়ঃ (সাধ্য), দ্রব্যত্বাৎ (হেতু), পটবৎ (দৃষ্টান্ত)।* চিৎসুখী ৬৭ পৃষ্ঠা। এই ঘটটি এই ঘটে যে বাধ্যভেদ আছে, তাহার অতিরিক্ত আর একটি (অবাধ্য) ভেদের আশ্রয় বটে, যেহেতু ইহা (এই ঘট') দ্রব্য, যেমন পট।

মাধ্ব প্রভৃতি বলেন, এইরূপ অনুমানের সাহায্যেই আকাশ, বায়ু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রপঞ্চের এবং এক আত্মা হইতে অপর আত্মার অবাধ্য বা সত্যভেদ সিদ্ধ হইবে। উল্লিখিত অনুমানে কেবল ভেদের আশ্রয়রূপে সাধ্যের নির্দেশ করিলে, অদ্বৈতমতেও ঘটাদিপ্রপঞ্চের মধ্যে কল্পিত ভেদ থাকায় তাহাতেও ভেদের আশ্রয়রূপ সাধ্য বর্তমান থাকায়, উক্ত অনুমানে সিদ্ধসাধনতা-দোষই আসিয়া পড়ে। এইজন্যই সাধ্যের (ভেদাশ্রয়ের) অংশে 'বাধ্যভেদাতিরিক্ত' এইরূপ একটি বিশেষণ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অদ্বৈতবাদীর মতে ঘট-পট প্রভৃতি প্রপঞ্চে যে ভেদ আছে তাহা কল্পিত ভেদ, অতএব বাধ্যভেদই বটে। এই মতে প্রপঞ্চ বাধ্যভেদাতিরিক্ত ভেদের আশ্রয় হয় না; সিদ্ধ সাধনতার প্রশ্নও সুতরাং আসে না। ভেদমাত্রই বাধ্য বলিয়া,

* উক্ত অনুমানটি একটি মহাবিদ্যানুমান। বৈশেষিক কুলার্ক পণ্ডিত এই অভিনব অনুমানরীতির উদ্‌ভাবক। শব্দের নিত্যতাবাদী মীমাংসকের বিরুদ্ধে শব্দের অনিত্যত্ব-সিদ্ধান্ত সংস্থাপনের জন্য ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য যে সকল অনুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই সকল অনুমানেই মীমাংসক পণ্ডিতগণ হেত্বাভাস প্রভৃতি দোষ প্রদর্শন করিলে, কুলার্ক পণ্ডিত হেত্বাভাস দোষে কলুষিত নহে, এইরূপ অভিনব মহাবিদ্যানুমান প্রণালী উদ্‌ভাবন করিয়া শব্দের অনিত্যত্ব সমর্থন করেন। অনুমান একশ্রেণির বিদ্যা—ইহা ন্যায়বিদ্যা বলিয়া পরিচিত। এই অনুমান বা ন্যায়বিদ্যা অনেক ক্ষেত্রেই হেত্বাভাস প্রভৃতি দোষস্পর্শে কলুষিত হয়। এই মহাবিদ্যা অনুমানে হেত্বাভাস দোষের সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্য ইহাকে মহতী বিদ্যা বা মহাবিদ্যা আখ্যা দেওয়া হয়। কুলার্ক পণ্ডিতের উদ্‌ভাবিত মহাবিদ্যানুমান প্রণালী ভট্টবাদীন্দ্র তাঁহার "মহাবিদ্যাবিড়ম্বন" নামক গ্রন্থে খণ্ডন করেন। ভট্টবাদীন্দ্রের অপূর্ব খণ্ডন-শৈলী তার্কিকগণের মনেও গভীর রেখাপাত করে। সেইজন্য মহাবিদ্যানুমান আর বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। এই প্রকার অনুমানকে বক্রানুমান বলিয়া তর্করসিকগণ ইহাকে উপেক্ষাই করিয়াছেন।

অদ্বৈতবেদান্তীর দৃষ্টিতে বাধ্যভেদের অতিরিক্ত ভেদের প্রসিদ্ধি না থাকায়, বাধ্যভেদের অতিরিক্ত ভেদের আশ্রয়রূপে সাধ্যের নির্দেশ করিলে, অপ্রসিদ্ধ বিশেষণতার আপত্তি আসিতে পারে বুঝিয়াই মাধব বাধ্যভেদের অংশে 'এতন্নিষ্ঠ' এইরূপ আর একটি বিশেষণের প্রয়োগ করিয়াছেন। এক বস্তু অপর বস্তু হইতে বিভিন্ন। পট হইতে ঘট বিভিন্ন, ঘট হইতেও পট বিভিন্ন। পটে ঘটের ভেদ আছে, ঘটেও পটের ভেদ আছে। এই দৃষ্টিতে বস্তুতত্ত্ব বিচার করিলে আলোচ্য অনুমানের দৃষ্টান্ত পটে, ঘটে যে বাধ্যভেদ আছে, তদতিরিক্ত ভেদ অবশ্যই আছে এবং থাকিবে। কেননা, বস্তু মাত্রেই অপর বস্তুর ভেদ থাকে। ঘটে ঘটগত বা ঘটাশ্রিত ভেদ, পটে পটগত ভেদ প্রভৃতি থাকে। পটগত বা পটাশ্রিত এই ভেদ ঘট প্রভৃতি অপরাপর বস্তুর ভেদ হইতে অতিরিক্ত বলিয়া, পটে পটগত বাধ্যভেদের অতিরিক্ত ভেদ অবশ্যই থাকিবে। এইরূপে পটরূপ দৃষ্টান্তে অনুমানোক্ত সাধ্যেরও সিদ্ধি হইবে। অপ্রসিদ্ধ বিশেষণতার আপত্তি অচল হইয়া পড়িবে। পটে দ্রব্যত্ব হেতু থাকায়, হেতু ও সাধ্যের সহচাররূপ ব্যাপ্তিও পটে সহজেই গৃহীত হইবে এবং আলোচ্য মহাবিদ্যানুমানের প্রামাণ্যও নত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

প্রদর্শিত অনুমানের বলে ঘটকে (অনুমানের পক্ষকে) ঘটগত বাধ্য যে ভেদ আছে, তদতিরিক্ত ভেদের আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যসিদ্ধি হইলে অদ্বৈতবেদান্তীকেও অগত্যা একটি অবাধ্য ভেদ ঘটে স্বীকার করিতেই হইবে। ঘটের ভেদ যদি কেবল বাধ্যভেদই হয়, ঘটে যদি বাধ্যভেদের অতিরিক্ত কোনরূপ (অবাধ্য) ভেদ নাই থাকে, তবে ঘটে (পক্ষে) আলোচ্য অনুমানের সাধ্যসিদ্ধি সম্ভবপর হয় না। অনুমানোক্ত হেতুটি পক্ষে বর্তমান আছে। হেতু এবং সাধ্যের ব্যাপ্তিও আছে। এইরূপে অনুমানটি নির্দোষ প্রতিপন্ন হওয়ায়, উক্ত অনুমানবলে পক্ষে যে সাধ্যের সিদ্ধি হইবে, ঘট যে ঘটগত বাধ্যভেদের অতিরিক্ত অবাধ্যভেদের আশ্রয় হইবে তাহা মানিতেই হইবে। আলোচ্য অনুমানই ঘটে পট প্রভৃতির ভেদ যে সত্য তাহা প্রমাণ করিবে।[১]

পরিদৃশ্যমান এই সত্য বিশ্বপ্রপঞ্চ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানোদয়ের ফলেই আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃতিলাভ করে। জীবনের যাত্রাপথ সুগম হয়। বিচিত্র বিবিধ দৃশ্যের আকারে চিত্তবৃত্তির পরিণামের ফলে আমাদের যে জ্ঞানপ্রবাহ প্রতিনিয়ত প্রসারলাভ করে, দৃশ্যভেদ অস্বীকার করিলে, চিত্তের বিচিত্র দৃশ্যাকারে পরিণাম জন্মিতেই পারে না।

১। চিৎসুখী, ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ফলে, জ্ঞানের স্রোত রুদ্ধ হয়। চিত্ত মূকতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। উদয়নাচার্য তদীয় আত্মতত্ত্ববিবেকে সত্য কথাই বলিয়াছেন ঃ—

'ন গ্রাহ্যভেদমবধূয় ধিয়োঽস্তি বৃত্তিঃ'।

বস্তুভেদ অসত্য হইলে, বিবিধ যাগযজ্ঞাদি কর্মভেদের উপপাদক মীমাংসাশাস্ত্র অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। জগতের সত্যতার সমর্থক ন্যায়-বৈশেষিক সাংখ্য-যোগ প্রভৃতি শাস্ত্ররাজির প্রামাণ্য ব্যাহত হয়। এই অবস্থায় বিচিত্র বিবিধ বিশ্বপ্রপঞ্চের পরস্পর ভেদের সত্যতা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত।

ভেদের সত্যতার সাধক মাধ্বোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, বস্তুভেদ সত্য নহে, মিথ্যাই বটে। মিথ্যা বলিয়া দৃশ্য বস্তুরাজি অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বা অসৎ নহে। বস্তুরাজির ব্যাবহারিক সত্যতা অবশ্যই স্বীকার্য। ঘটের সাহায্যে জল আহরণ করতঃ আকণ্ঠ পান করিয়া পিপাসার নিবৃত্তি করিয়া বলিতে পারা যায় কি যে, জল মিথ্যা, ঘট মিথ্যা, পিপাসা মিথ্যা, পিপাসার নিবৃত্তি মিথ্যা। সত্য কথা এই যে, পরিদৃশ্যমান ঘটপ্রমুখ দৃশ্যরাজি আকাশকুসুমের ন্যায় অসৎ নহে, আবার তাহা পরব্রহ্মের ন্যায় ধ্রুব সত্যও নহে। দৃশ্য বস্তুরাজি অনির্বচনীয়। বিশ্বপ্রপঞ্চ অনির্বচনীয় হইলেও 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ', এইরূপে জাগতিক বস্তুবর্গের মধ্যদিয়া এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের স্ফুরণ না হওয়া পর্যন্ত মায়াময় জগতের মায়িক প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক সত্যতা অস্বীকার করা চলে না। ব্যাবহারিক জীবনকে অচলায়তনে পরিণত করাও সম্ভবপর হয় না। কর্মময় এই জগতে কর্মধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই বস্তুভেদের আপেক্ষিক অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য।[১] জাগতিক প্রপঞ্চকে আত্মার ন্যায় ধ্রুব সত্য কোনমতেই বলা চলে না। এইরূপে অদ্বৈতবেদান্তী জগতের সত্যতা ব্যাখ্যা করায়, কর্মমীমাংসা, ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ প্রভৃতি কোন শাস্ত্রেরই অপ্রামাণ্যের প্রশ্ন আসে না। বিষয়ভেদে দ্বৈত, অদ্বৈত

বস্তুভেদ সত্য নহে, মিথ্যা।

১। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত জগতের সত্যতা স্বীকার করায়, অদ্বৈতবাদীর সহিত দ্বৈতবাদীর বিরোধের যে কোনরূপ প্রকৃত হেতু নাই, তাহা সুধীপাঠক অবশ্য এখানে লক্ষ্য করিবেন।

সকল প্রকার মতবাদেরই সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর হয়; "শাস্ত্রং শস্ত্রপ্রঘন-পিশুনম্" করিয়া তুলিবার কোনই কারণ ঘটে না। অদ্বৈতবেদান্তী এইরূপ সমন্বয়ের দৃষ্টিতেই কর্মভেদের প্রতিপাদক শাস্ত্ররাজির মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, ক্ষুণ্ণ করেন নাই। প্রতিবাদী দার্শনিকগণ প্রতিবাদের তমিস্রায় জ্ঞানচক্ষু অন্ধ করিয়া, সামঞ্জস্যের দৃষ্টি খুঁজিয়া পান নাই। সমন্বয়ের পথে বিচরণ করেন নাই। এইজন্য দার্শনিক চিন্তারাজ্যে এত বিরোধ, এত পরমতাসহিষ্ণুতা সত্যের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আচার্য উদয়নের যেই উক্তিটি পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারই অপর অংশে উদয়ন বলিয়াছেন—

'তদ্‌বাধকে বলিনি বেদনয়ে জয়শ্রীঃ'।

গ্রাহ্য বা জ্ঞেয়ভেদ না থাকিলে, চিত্তের বিবিধ পরিণাম ব্যাখ্যা করা যায় না, ইহা অবশ্য সত্য কথা। তবে, বিভিন্ন বিচিত্র চিত্তবৃত্তির ফলে উৎপন্ন ভেদবুদ্ধি চরমজ্ঞান নহে। যাহার ফলে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য দৃক্ ও দৃশ্যের ভেদজ্ঞান প্রভৃতি চিরতরে বিধ্বস্ত হয়, সেই এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম বিজ্ঞানই সত্য ও ধ্রুব। তাহার তুলনায় অধ্রুব জাগতিক জ্ঞান অজ্ঞানেরই নামান্তর। ইহা বুঝিয়াই প্রাচীন ন্যায়গুরু উদয়ন ভেদবাদ অপেক্ষায় অভেদতবাদকে প্রবলতর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞানের বেদীমূলে বিজয়মাল্য অর্পণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন।

মাধ্বোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে জগতের মিথ্যাত্ব অনুমান-বলে সাধন করিবার জন্য অদ্বৈতবেদান্তী বলিয়াছেনঃ—

বিমতঃ পটঃ (পক্ষ), এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী (সাধ্য), অবয়বিত্বাৎ (হেতু), পটান্তরবৎ (দৃষ্টান্ত)।

পটের উপাদান এই তন্তুতে বিবাদাস্পদ এই পটের অত্যন্তাভাব আছে, যেহেতু ইহাও অবয়বী, যেমন অপর পট। অন্য পট অন্য তন্তুদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্য পটে বা পটান্তরে এই পটের তন্তুর অত্যন্তাভাব আছে (অর্থাৎ এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ সাধ্য আছে) এবং অন্য পটও অবয়বী বিধায়, উহাতে অবয়বিত্বরূপ হেতুও আছে। এইরূপে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি সিদ্ধি হইল। বিবাদ-

গোচর এই পটে অবয়বিত্বরূপ হেতু বিরাজ করে। সুতরাং হেতুর পক্ষবৃত্তিতাও পাওয়া গেল। ফলে, পটে আলোচ্য সাধ্যসিদ্ধিও হইল; অর্থাৎ এই পটে এই তন্তুতে বিদ্যমান অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বও থাকিল; এই পটের অবয়বেই এই পটের অত্যন্তাভাব বা মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল। তন্তু পটের উপাদান কারণ এবং আশ্রয়ও বটে। নিজের আশ্রয় উপাদানে আশ্রিত উপাদেয় কার্যের অত্যন্তাভাব থাকিলে, সেই কার্য যে মিথ্যা হইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়।*

আলোচ্য অনুমানে পটকে পক্ষ না করিয়া যদি ঘট প্রভৃতিকে পক্ষরূপে গ্রহণ করা হয়, তবে ঘটপ্রমুখ বস্তুরাজিতে পটের উপাদান তন্তুর যে অত্যন্তাভাব তাহা স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায়, উল্লিখিত অনুমানটি সিদ্ধসাধন দোষে কলুষিত হয়। এইরূপ অনুমানবলে অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রেত

---

* যেই দৃষ্টিতে পটপ্রমুখ কার্যবর্গের মিথ্যাত্ব সাধন করা যায়, সেই দৃষ্টিতেই গুণ, কর্ম, জাতি প্রভৃতির ও মিথ্যাত্ব উপপাদন করা যায় এবং বিশ্বের যাবতীয় বস্তুরই মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়। এই কথাই নিম্নোক্ত শ্লোকের দ্বারা আচার্য চিৎসুখ প্রকাশ করিয়াছেন :—

অংশিনঃ স্বাংশগাত্যন্তাভাবস্য প্রতিযোগিনঃ।
অংশিত্বাদিতরাংশীব দিগেষৈব গুণাদিষু॥

তত্ত্বপ্রদীপিকা, ৪০ পৃষ্ঠা।

এই শ্লোকের "দিগেষৈব গুণাদিষু" এই শেষাংশের ব্যাখ্যায় চিৎসুখ বলিয়াছেন, "এবমেতদ্ গুণকর্মজাত্যাদয়োঽপি তত্তত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনঃ তত্তদ্রূপত্বাদিতর তত্তদ্রূপবদিতি প্রয়োগঃ সর্বত্রৈবোহনীয়ঃ।" চিৎসুখ, ৪১ পৃষ্ঠা।

তাৎপর্য—এই পটের মিথ্যাত্ব সাধনের জন্য যেমন তন্তুতে পটের অত্যন্তাভাবের অনুমান করা হইয়াছে। অনুরূপভাবেই পটের রূপ (গুণ) কর্ম, জাতি প্রভৃতির মিথ্যাত্ব উপপাদনের জন্য তন্তুর রূপ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতিতে উহাদের (পটের রূপ প্রভৃতির) অত্যন্তাভাব অনুমান বলে সাধন করা যাইতে পারে। ফলে, পটের ন্যায়, পটের গুণ, জাতি, ক্রিয়া প্রভৃতিও মিথ্যাই হইয়া দাঁড়ায়। সেই সকল অনুমানের প্রয়োগ বাক্য কিরূপ হইবে, তাহা চিৎসুখীর টীকা নয়নপ্রসাদিনীতে পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে :—এতৎপটরূপম্ এতত্তন্তুরূপনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি রূপত্বাদিতররূপবৎ এবং স্পর্শাদিষ্বপি। এতচ্চলনমেতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি চলনত্বাদন্যচলনবৎ ইত্যাদি।

নয়নপ্রসাদিনী, ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সাধন করা কোনমতেই চলে না। এই প্রকার আপত্তির উত্তরে আচার্য চিৎসুখ বলেন, পটের মিথ্যাত্ব উপপাদন করিবার জন্য পটের উপাদান তন্তু বা সূতায় যেমন পটের অত্যন্তাভাব সাধন করা হইয়াছে, সেই দৃষ্টিতে ঘটের মিথ্যাত্ব সাধন করিতে হইলে, ঘটের উপাদান মাটিতেই ঘটের অত্যন্তাভাব সাধন করিতে হইবে। ইহাই পূর্বোক্ত অনুমানের রহস্য। অনুমানের সাধ্যের অন্তর্গত তন্তুশব্দে উপাদানমাত্রকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। উপাদানে উপাদেয় কার্যের অত্যন্তাভাব থাকে। মাটিতে ঘটের অভাব, সূতাতে বস্ত্রের অভাব থাকে, ইহাতো জানা কথা। এইজন্যই উল্লিখিত অনুমানের ভিত্তিতে বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব উপপাদন করা অদ্বৈত-বাদীর পক্ষে দুরূহ হয় না। অনুমানোক্ত সাধ্যের অন্তর্গত তন্তুশব্দের যে উপাদান-কারণমাত্রই লক্ষ্য, তাহা আচার্য মধুসূদন সরস্বতীও অদ্বৈতসিদ্ধিতে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন :— "তত্র তন্তুপদমুপাদানপরম্। এতেন উপাদান-নিষ্ঠাত্যন্তাভাবলক্ষণমিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ ॥" অদ্বৈতসিদ্ধি, ৩২৩ পৃঃ।

এখন প্রশ্ন এই যে, অনুমানের সাধ্যে যে অত্যন্তাভাবের কথা বলা হইয়াছে, সেই অত্যন্তাভাবটি কি সত্য (প্রামাণিক), না মিথ্যা (প্রাতিভাসিক)। সত্য এবং প্রমাণসিদ্ধ হইলে, পরব্রহ্মের অতিরিক্ত সত্য অত্যন্তাভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ায়, অদ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ থাকিল না, দ্বৈতবাদই হইয়া দাঁড়াইল। তারপর, অত্যন্তাভাবকে তখনই কেবল প্রামাণিক বলা চলে, যখন তাহার প্রতিযোগীটি (যেই বস্তুর অত্যন্তাভাবের কথা বলা হয় সেই বস্তুটি) প্রমাণসিদ্ধ হয়। আলোচ্য স্থলে সত্য অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘটাদি বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রমাণসিদ্ধ হইলে, বিশ্বপ্রপঞ্চকে আর মিথ্যা বলা চলিবে না, সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।[১]

দ্বিতীয়তঃ, অত্যন্তাভাব যদি প্রাতিভাসিক বা মিথ্যাও হয়, তবে সেই প্রাতিভাসিক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী বস্তুটিও যে প্রাতিভাসিকই হইবে, এমন কথাও জোর করিয়া বলা চলে না। রূপাকে সীসা বলিয়া ভ্রম করিলে "ইহা সীসা, রূপা নহে" এইরূপে রজতের যে অভাব বুদ্ধির উদয়

১। অভাবানাং প্রামাণিকত্বে তৈরেব দ্বৈতাপত্তেঃ প্রামাণিকাভাবপ্রতিযোগিত্বে চ ভাবানা-মপি প্রামাণিকতয়া ন মিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ।

চিৎসুখী, ৪১ পৃষ্ঠা।

হয়, সেই জ্ঞান মিথ্যা হওয়ায়, রজতের অত্যন্তাভাব সেখানে প্রাতিভসিকই হইল। ঐ প্রাতিভাসিক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী রজত তো মিথ্যা নহে, সত্যই বটে, যেহেতু রজতেই সীসার ভ্রমজ্ঞানের উদয় হইয়াছে।

প্রতিবাদীর এইরূপ আপত্তির খণ্ডনে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, প্রথমতঃ অত্যন্তাভাব সত্য বা প্রামাণিক হইলেও, তাহাদ্বারা অদ্বৈতবাদ ব্যাহত হইতে পারে না, দ্বৈতাপত্তিরও প্রশ্ন আসে না। কেননা, অনেকে অদ্বৈতবাদ বলিতে "ভাবাদ্বৈতবাদ"ই বুঝিয়া থাকেন। ভাব পদার্থ (Positive category) অদ্বৈতবাদে এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মব্যতীত দ্বিতীয়টি নাই। অভাব পদার্থ দ্বিতীয় থাকিলেও, তাহা দ্বারা ভাবাদ্বৈতবাদ কলুষিত হয় না। অবিদ্যানিবৃত্তিকে যাঁহারা পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না; ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্য বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের মতে এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম জ্ঞানের উদয়েও অবিদ্যা নিবৃত্তি থাকিয়াই যাইবে, বিলুপ্ত হইবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, অদ্বৈতবাদের অদ্বৈতত্ব রক্ষা করার জন্য এই বাদকে 'ভাবাদ্বৈতবাদ' বলা ব্যতীত গত্যন্তর দেখা যায় না। মণ্ডনমিশ্র তদীয় ব্রহ্মসিদ্ধিতে অদ্বৈতবাদ বলিতে 'ভাবাদ্বৈতবাদ'কেই বুঝিয়াছেন এবং অবিদ্যানিবৃত্তিকে পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পারমার্থিক বা সত্য পদার্থ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

"দ্বিবিধা ধর্মা ভাবরূপা অভাবরূপাশ্চেতি। তত্র অভাবরূপা ধর্মা নাদ্বৈতং বিঘ্নন্তি।"

মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধি, ৪ পৃষ্ঠা।

মণ্ডনোক্ত ভাবাদ্বৈতবাদ শঙ্করবেদান্তের অনুমোদন লাভ করে নাই। শঙ্কর-বেদান্তের সিদ্ধান্তে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। সেই পরম সত্যের তুলনায় অপরাপর ভাবাত্মক, অভাবাত্মক বস্তুরাজিই মিথ্যা ও অসত্য। অনুমানোক্ত সাধ্যের অন্তর্গত অত্যন্তাভাবকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলেও, তাহা ব্যাবহারিক প্রমাণসিদ্ধ এবং ব্যাবহারিক দৃষ্টিতেই সত্য। পরব্রহ্মের সত্যতা ব্যাবহারিক নহে, পারমার্থিক। পারমার্থিক সদদ্বিতীয় পরব্রহ্মের সহিত ব্যাবহারিক সত্যবস্তুর বিরোধ কোথায়? সমসত্তাক বস্তুর ক্ষেত্রেই বিরোধের কথা উঠে। শুক্তিতে প্রতীয়মান প্রাতিভাসিক রজতের সহিত ব্যাবহারিক সত্য রজতের যেমন কোন বিরোধ

নাই, সেইরূপ ব্যাবহারিক সত্য বস্তুর সহিত পারমার্থিক সত্য বস্তুরও কোনরূপ বিরোধ নাই। এই অবস্থায় ব্যাবহারিক সত্য অত্যন্তাভাবের দ্বারা পারমার্থিক সদদ্বৈতের ব্যাঘাতের আশঙ্কা করা নিতান্তই অমূলক নহে কি?

অভাব প্রামাণিক হইলে ঐ অভাবের প্রতিযোগী প্রপঞ্চ ও প্রামাণিকই হইবে। এইরূপ প্রতিবাদীর উক্তির অদ্বৈতমতে কোনই মূল্য নাই। শুক্তিকে যখন রজত বলিয়া ভ্রম করা হয়, তখন শুক্তির ধর্ম 'ইদম্' অংশ রজতগত হইয়া, 'ইদং রজতম্' এইরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। 'নেদং রজতম্' ইহা রূপা নহে, এইরূপ বাধক জ্ঞানের উদয় হইলে 'ইদম্' এর রজত সম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 'নেদং রজতম্' এই অত্যন্তাভাব এক্ষেত্রে প্রামাণিকই বটে, কিন্তু এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ইদমংশসম্বলিত ভ্রান্ত রজতকে তো প্রমাণসিদ্ধ বলা চলে না। এই অবস্থায় প্রামাণিক অভাবের প্রতিযোগী প্রামাণিকই হইবে, প্রতিবাদীর এইরূপ কথারও কোনরূপ মূল্য দেওয়া যায় না। প্রাতিভাসিক অত্যন্তাভাব অদ্বৈতবেদান্তী স্বীকারই করেন না। সুতরাং প্রাতিভাসিক অত্যন্তাভাবকে আশ্রয় করিয়া যে দোষের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অদ্বৈতবেদান্তীকে স্পর্শই করে না।

অদ্বৈতবেদান্তীর জগতের মিথ্যাত্বের সাধক—"অয়ং পটঃ এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগী অবয়বিত্বাৎ"—এই অনুমানের পক্ষ পট প্রমাণসিদ্ধ কিনা, তাহাও বিচার করা আবশ্যক। অনুমানে পক্ষ যদি প্রমাণসিদ্ধ না হয়, তবে অনুমান অবশ্য 'আশ্রয়াসিদ্ধ' হেত্বাভাসকলুষিত হইবে। পক্ষান্তরে, প্রমাণসিদ্ধ হইলে পটের সত্যতাই সাধিত হইবে। পটের মিথ্যাত্ব কথার কথা হইয়া দাঁড়াইবে।

অদ্বৈতবাদীর অনুমান হেত্বাভাস দোষদুষ্ট নহে

অদ্বৈতসিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের প্রামাণ্যও যেমন ব্যাবহারিক, ঐরূপ ব্যাবহারিক প্রমাণমূলে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানও ব্যাবহারিক। জ্ঞেয় ঘট-পটাদি প্রপঞ্চের সত্যতাও ব্যাবহারিক। কিছুই পারমার্থিক নহে। এইরূপে অনুমানের পক্ষ পটের ব্যাবহারিক সত্যতা স্বীকৃত হওয়ায়, 'আশ্রয়াসিদ্ধি'র প্রশ্নই আসে না। পট যে সাবয়ব—তাহা বাদী ও প্রতিবাদী সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং আলোচ্য অনুমানের 'অবয়বিত্ব' রূপ (অবয়বিত্বাৎ এইরূপ) হেতুটি যে স্বরূপাসিদ্ধ নহে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। ইহা (এই অনুমানটি) বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসকলুষিতও নহে। কারণ, একমাত্র পরমাত্মা পরব্রহ্ম ব্যতীত নিখিল

বিশ্বপ্রপঞ্চই মিথ্যা হওয়ায়, পরমাত্মাই কেবল এই অনুমানের বিপক্ষ বটে। পরমাত্মা নিরংশ এবং নিরবয়ব; উহাতে অংশিত্ব বা অবয়বিত্বরূপ হেতু নাই। সুতরাং বিরুদ্ধহেত্বাভাসের উদয় হইবে কিরূপে? 'অবয়বিত্ব' হেতু বিপক্ষ আত্মায় বিদ্যমান না থাকায়, 'সাধারণ অনৈকান্তিক' হেত্বাভাসেরও কোনরূপ সম্ভাবনা এই অনুমানে নাই। আপত্তি হইতে পারে যে, অদ্বৈতবেদান্তীর জগতের এই মিথ্যাত্বের অনুমান প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ সুতরাং অপ্রমান এবং ইহা 'বাধ' নামক হেত্বাভাস কলুষিত। অনুমানের দ্বারা তন্তুতে পটের অভাব সিদ্ধ হইলেও, তন্তু হইতে পটের উৎপত্তি হইতে দেখিয়া 'এই তন্তুতে পট আছে' এইরূপ প্রত্যক্ষ তন্তুতে পটের অস্তিত্বই প্রমাণিত করে। ফলে, পক্ষ পটে আলোচিত সাধ্যসিদ্ধি না হইয়া, সাধ্যের বিরুদ্ধ তথ্য (তন্তুতে পটের সত্তা) সাধিত হওয়ায়, 'বাধ' নামক হেত্বাভাসেরই উদয় হইবে নাকি? প্রতিবাদী মাধ্ব তার্কিকগণের এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, প্রত্যক্ষ বাধিত হইলেই অনুমান দোষকলুষিত হইবে, এমন কথা বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে অনুমান বাধিত প্রত্যক্ষও অপ্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। আকাশ নীল—'নীলমাকাশম্', ইহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করি, এবং ইহাও জানি যে আকাশের কোন রূপ নাই, আকাশ পরমাত্মা পরব্রহ্মের ন্যায়ই ভূমা বা পরমমহৎ। এই জানাটা কিন্তু আসে অনুমান বা আগমের সাহায্যে। আকাশ অরূপ, ইহার কোন রূপ নাই, যেহেতু উহা আত্মার ন্যায় বিভু বা ভূমা।[১] এই ভূমার রূপ কল্পনা করা যায় না। কল্পনা করিলেও তাহা মিথ্যা বলিয়াই গণ্য হয়। রাকা-করোজ্জ্বল রজনীতে রাকা শশীর যে পরিধি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, ঐ পরিধি প্রত্যক্ষ যে সত্য নহে, তাহা জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে নিঃসংশয়ে জানিতে পারা যায়। এই অবস্থায় শুধু সেই প্রত্যক্ষকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে, যাহার প্রামাণ্য সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয় হইতে পারি। প্রত্যক্ষের দ্বারা বর্তমানকেই কেবল জানা যায়, বর্তমানে যাহা অবাধিত এবং সত্য বলিয়া প্রতীতি গোচর হইতেছে, অনাগত ভবিষ্যতেও যে তাহা বাধিত হইবে না, ইহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? প্রত্যক্ষকে যদি নির্দোষ অনুমান এবং আগমের সাহায্যে যাচাই করিয়া লওয়া সম্ভব হয়, তবেই প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যের নিশ্চয় হইতে পারে। যেইক্ষেত্রে প্রত্যক্ষবিরোধী অনুমান এবং আগম জাগরূক থাকিবে, সেইক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নিশ্চয় করাও সম্ভবপর হইবে না। প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নিশ্চয় না হইলে, ভ্রম-শঙ্কাকলঙ্কিত প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম প্রভৃতি প্রমাণের বাধকও হইবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রেও অনুমান বাধিত—'এই তন্তুতে পট আছে'—এই প্রকার প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। কার্য ও

১। আকাশম্ অরূপি বিভুত্বাৎ আত্মবৎ

নয়নপ্রসাদিনী, ৪৩ পৃঃ।

কারণের 'অনন্যত্ব' বিচারের ফলে কার্য মিথ্যা এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসহ এবং বেদান্তসূত্রানুমোদিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে।[১] এই অবস্থায় 'বাধ' নামক হেত্বাভাসের আপত্তি চলে না।

অদ্বৈতবাদীর অনুমানে সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস প্রদর্শনের জন্য প্রতিবাদী মাধ্ব নিম্নোক্ত বিরুদ্ধ অনুমান উদ্‌ভাবন করিয়াছেন।

(ক) প্রপঞ্চঃ সত্যঃ প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ, আত্মবৎ। প্রপঞ্চ সত্য যেহেতু প্রপঞ্চ সকল আত্মার ন্যায় প্রমাণসিদ্ধ।

(খ) প্রপঞ্চঃ তত্ত্বাবেদকপ্রমাণবিষয়ঃ ধর্মিত্বাৎ আত্মবৎ। প্রপঞ্চ পারমার্থিক প্রমাণেরই বিষয়, যেহেতু উহাও আত্মার ন্যায়ই ধর্মী বটে। এই সকল প্রতিপক্ষানুমান যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যায় যে, এই সকল অনুমানের পক্ষে হেতুর সিদ্ধি এবং সাধ্যসিদ্ধি সম্ভবপর হয় না। ফলে, অনুমান এক্ষেত্রে হেত্বাভাস দোষদুষ্টই হয়। উপাধি দোষেও অনুমানগুলি কলুষিত হয়। প্রথম (ক) চিহ্নিত প্রতিরোধানুমানে প্রপঞ্চ যে অভ্রান্ত প্রমাণসিদ্ধ তাহা নিশ্চিত হয় নাই। সুতরাং প্রমাণসিদ্ধত্বরূপ হেতু প্রপঞ্চে (পক্ষে) নাই। দ্বিতীয় (খ) চিহ্নিত অনুমানের পারমার্থিক প্রমাণের বিষয় (তত্ত্বাবেদক প্রমাণবিষয়ঃ) এই সাধ্যই প্রপঞ্চরূপ পক্ষে সিদ্ধ হইবে না। ফলে, উল্লিখিত দুইটি অনুমানই যে 'বিরুদ্ধ' এবং 'বাধ' হেত্বাভাস দোষদুষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আলোচ্য অনুমানদ্বয়ে আত্মত্ব যে উপাধি হইবে, তাহাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে। আত্মত্ব ধর্মটি অনুমানের দৃষ্টান্ত আত্মায় আছে, সেখানে সত্যত্বরূপ সাধ্যও আছে, এইরূপে আত্মত্ব ধর্মটি সাধ্য সত্যত্বের ব্যাপক হইয়াছে। অনুমানে পক্ষ প্রপঞ্চে আত্মত্ব নাই কিন্তু প্রমাণসিদ্ধত্ব বা ধর্মিত্বরূপ হেতু সেখানে অবশ্যই আছে। হেতু পক্ষে বর্তমান না থাকিলে (হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব না থাকিলে) কোনরূপ অনুমানেরই সেক্ষেত্রে উদয় হইতে পারে না। প্রপঞ্চঃ "সত্যত্বাভাববান্ আত্মত্বাভাবাৎ", এইরূপ প্রতিরোধ অনুমান করাও এরূপ ক্ষেত্রে অসম্ভব হয় না। ফলে, জগতের সত্যত্ববিরুদ্ধ মিথ্যাত্বের অনুমান করা সহজসাধ্য হয়।[২] ভেদ এবং ভেদবিশিষ্ট প্রপঞ্চের সত্যতা সাধন করিবার উদ্দেশ্যে ঘটকে পক্ষ করিয়া দ্রব্যত্ব হেতুমূলে ঘটে বাধ্যভেদের অতিরিক্ত অবাধ্য বা সত্যভেদ আছে বলিয়া যে "মহাবিদ্যানুমান" প্রদর্শিত হইয়াছে,

১। তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ইত্যাদি আরম্ভনাধিকরণ-সূত্র-ভাষ্য এবং আমাদের আলেচিত কার্য-কারণভাব বিচার দ্রষ্টব্য।

২। জগতের সত্যতার সাধক মাধ্বোক্ত প্রতিরোধ অনুমান যে অচল, তাহা আমরা মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব-নিরূপণ-প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, সুধী পাঠক সেই আলোচনা দেখিবেন।

অদ্বৈতবাদীর অনুমান এবং বিবিধ শ্রুতিবাধিত বলিয়া, ঐরূপ বাঁকা অনুমানেরও কোনরূপ মূল্য দেওয়া চলে না। মধ্বাচার্য অবশ্য সত্য ভেদ উপপাদন করিবার জন্য "সত্যং ভিদা, সত্যং ভিদা, সত্যো জীবঃ", এইরূপ ভাল্লবেয় শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। ঐরূপ শ্রুতির কোন মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐরূপ শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়াও গ্রহণ করা দুরূহ হয়। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" প্রভৃতি বিবিধ শ্রুতিতে স্পষ্টবাক্যে নানাত্বের নিষেধ ধ্বনিত হওয়ায়, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা" এই সকল শ্রুতিতে আত্মার সত্যতা প্রতিপাদিত হওয়ায়, জগতের মিথ্যাত্ব এবং আত্মার সত্যত্বসিদ্ধান্তই অদ্বৈতবেদান্তী অনুসরণ করিয়াছেন। জাগতিক প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক' সত্যতা স্বীকার করায়, কর্মভেদের প্রতিপাদক মীমাংসা, ভক্তিবাদ, উপাসনাবাদ প্রভৃতির সমর্থক শাস্ত্ররাজির যে অপ্রামাণ্যের কোনরূপ আশঙ্কা নাই তাহা আমরা পূর্বেই বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছি।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা অবয়বিত্ব বা অংশিত্ব হেতুমূলে চিৎসুখাচার্যের মতানুসারে জগতের মিথ্যাত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছি। অদ্বৈতসিদ্ধিতে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী "চিৎ-সুখীয় মিথ্যাত্বনিরুক্তি" নামে স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদ লিখিয়া চিৎসুখের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। অংশিত্বের ন্যায় দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব এবং পরিচ্ছিন্নত্ব, এই তিনটি হেতুর উপন্যাস করিয়াও আচার্য মধুসূদন জগতের মিথ্যাত্ব উপপপাদন করিয়াছেন। ঐ হেতুগুলির উপর অদ্বৈতসিদ্ধিতে এক একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ রচনা করিয়া আচার্য মধুসূদন ঐ সকল হেতুর যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। "বিমতং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ" এইরূপ অনুমানের প্রয়োগবাক্যের উপন্যাস করিয়া মধুসূদন ব্যাসরাজের ন্যায়ামৃতের যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন এবং জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। আমরা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তর্কতাণ্ডবপণ্ডিত ব্যাসরাজ ও আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর সূক্ষ্ম তর্কের কণ্টকবনে প্রবেশ করিলাম্ না। জিজ্ঞাসু সুধী পাঠক বিশেষ জানিবার জন্য ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধি দেখিবেন।

মিথ্যাত্ত্ব মিথ্যাত্ত্ব নিরুক্তি

জগৎ মিথ্যা ইহা বুঝা গেল। এখন প্রশ্ন এই, মিথ্যা জগতে যে মিথ্যাত্ব আছে, সেই মিথ্যাত্বধর্মটি কি সত্য, না মিথ্যা? মিথ্যাত্বকে সত্য বা মিথ্যা যাহাই বল না কেন, কোনমতেই অদ্বৈতবাদকে সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা চলে না, দ্বৈতবাদেরই আপত্তি উঠে। ফলে, অদ্বৈতবেদান্তের মিথ্যাত্ব নির্বচনের যাহা উদ্দেশ্য তাহা ব্যাহত হয়। অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাই বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নির্বচনের লক্ষ্য। এখন জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে, নিম্নে প্রদর্শিত

মিথ্যা জগতের মিথ্যাত্ব ধর্মটি সত্য, না মিথ্যা?

মাধ্বোক্ত অনুমান বলে জগতের সত্যতাই সূচিত হইবে এবং অদ্বৈতবাদের পরিবর্তে দ্বৈতবাদেরই প্রতিষ্ঠা হইবে। জগতের মিথ্যাত্ব সত্য হইলেও, সত্য এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম ব্যতীত বিচিত্র বিবিধ বিশ্বপ্রপঞ্চের সত্যতা স্বীকার করায়, দ্বৈতবাদই জয়যুক্ত হয়।

অদ্বৈতবাদী জগতের মিথ্যাত্বকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না, মিথ্যা বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় জগতের মিথ্যাত্বকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে যে সকল দোষ ঘটে, তাহা অদ্বৈত-বেদান্তীকে স্পর্শ করে না। কেননা, মিথ্যাত্বের 'মিথ্যাত্বই অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রেত, সত্যতা নহে। প্রতিবাদী মাধ্ব বলেন, জগতের মিথ্যাত্বকে মিথ্যা বলিলে (অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিলে), নিম্নোক্ত তিনটি দোষ অনিবার্যরূপেই দেখা দেয়। প্রথমতঃ, জগতের মিথ্যাত্ব যে মিথ্যা, ইহা দ্বৈতবেদান্তী মাধ্বসম্প্রদায়েরই অভিমত. অদ্বৈতবাদী সেই মাধ্বানুমোদিত সিদ্ধান্তের অনুমোদন করায়, অদ্বৈতবেদান্তের ব্যাখ্যায় 'সিদ্ধ-সাধনতা' দোষ দুর্নিবাররূপেই আত্মপ্রকাশ লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা বা বাধ্য হইলে, জগতের মিথ্যাত্বের প্রতিপাদক শ্রুতি সকল পরিজ্ঞাত অর্থের বোধক হওয়ায় 'অনুবাদক' -মাত্রেই পর্যবসিত হয়। ফলে, শ্রুতি সম্পর্কে সুধী দার্শনিকগণের যে অভ্রান্ত প্রামাণ্য বুদ্ধি আছে, তাহা কলুষিত হয়। তৃতীয় কথা এই যে, জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে, তাহা দ্বারা জগতের সত্যতাই অনুমিত হইয়া থাকে।

জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা, সত্য নহে

জগতের সত্যতার সাধক মাধ্বোক্ত অনুমানের প্রয়োগবাক্যটি (syllogism) দাঁড়ায় নিম্নরূপ :—

জগৎ (পক্ষ) সত্যম্ (সাধ্য)......................প্রতিজ্ঞা,

মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্বাৎ...............................হেতু,

আত্মবৎ...............................দৃষ্টান্ত।

জগৎ সত্য, যেহেতু জগতের যে মিথ্যাত্ব তাহা মিথ্যা, যেমন আত্মা।

প্রযুক্ত অনুমানের রহস্য এই যে, কোনও বস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হইলে, ঐরূপ নিশ্চয়ের দ্বারা সেই বস্তুর সত্যতা বিলুপ্ত বা ব্যাহত হইয়া থাকে। এরূপক্ষেত্রে বস্তুর সত্যতার অপহারক মিথ্যাত্বও যদি মিথ্যা বলিয়াই সাব্যস্ত হয়, তবে সেই বস্তুর সত্যতাই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যায় যে, চার্বাকপন্থী যাঁহারা নিত্য সৎ আত্মাকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐ মত (অর্থাৎ আত্মার মিথ্যাত্ব) ন্যায়-বৈশেষিক, বেদান্তী, মীমাংসক প্রভৃতি দার্শনিকগণ কর্তৃক মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায়, আত্মার সত্যতাই যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়, জগতের মিথ্যাত্বের ক্ষেত্রেও ঐ মিথ্যাত্ব মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায়, জগতের সত্যতাই সংস্থাপিত হইবে বৈকি ?

মাধ্বের উল্লিখিত জগৎ সত্যতার অনুমানে অদ্বৈতবাদী কর্তৃক 'উপাধি' উদ্‌ভাবন

মাধ্বের উল্লিখিত অনুমানের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদী বলেন মাধ্বোক্ত অনুমানটি 'উপাধি' দোষে কলুষিত। ঐরূপ উপাধি কলুষিত অনুমানের দ্বারা জগতের সত্যতা সংস্থাপিত হইতে পারে না। আলোচ্য অনুমানে 'আত্মত্ব' উপাধি হইবে। যাহা (যে পদার্থ) সাধ্যের ব্যাপক হয়, অর্থাৎ সাধ্য যেখানে যেখানে থাকে, সেই সকল স্থলেই থাকে, কিন্তু হেতুর অব্যাপক হয়, অর্থাৎ হেতু যেখানে যেখানে থাকে, সেই সকল স্থলেই থাকে না। তাহাকে উপাধি বলা হইয়া থাকে। প্রদর্শিত অনুমানে আত্মাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উপন্যাস করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত আত্মায় আত্মত্ব ধর্ম আছে, অনুমানের সাধ্য সত্যত্ব ও আত্মায় আছে। কেননা, যাহাতে নিশ্চিতই সাধ্য আছে (যাহা নিশ্চিত সাধ্যবান্), তাহাই দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। ফলে, অনুমানের দৃষ্টান্ত আত্মায় অবস্থিত আত্মত্ব ধর্মটি অনুমানের সাধ্য সত্যত্বের ব্যাপক হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অনুমানের পক্ষ যে জগৎ তাহাতে আত্মত্ব নাই, কিন্তু 'মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্ব'রূপ হেতু যে পক্ষ জগতে আছে, তাহাতো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেননা, হেতুর পক্ষে অবস্থিতি (পক্ষবৃত্তিত্ব) 'ব্যাপ্তির' ন্যায়ই অনুমানের অবশ্যম্ভাবী পূর্বাঙ্গ। পর্বতে ধূমদর্শন না হইলে পর্বতে বহ্নির অনুমান হইবে কিরূপে ? হেতু পক্ষে না থাকিলে পক্ষে সাধ্যসিদ্ধি কোনমতেই সম্ভবপর হয় না; সুতরাং হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। এই অবস্থায় মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্ব (হেতুটি) যে জগতে (পক্ষে) আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। জগতে (পক্ষে) আত্মত্ব নাই, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ফলে, 'আত্মবৎ' এই দৃষ্টান্তে সাধ্য সত্যত্বের ব্যাপক আত্মত্ব ধর্মটি যে সাধনের অর্থাৎ মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্বের অব্যাপক হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? আত্মত্ব ধর্মটি এইরূপে উপাধি লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায়, উল্লিখিত অনুমানে 'আত্মত্ব' যে উপাধি হইবে, তাহা কোন সুধীই অস্বীকার করিতে পারেন না।[১]

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, অনুমানে উপাধি উদ্‌ভাবিত হইলে, তাহার

[১] সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতুরব্যাপকস্তথা স উপাধিঃ।

—ভাষাপরিচ্ছেদ, কারিকা ১৩৮।

ফলে হেতু সাধ্যের ব্যভিচারী হইয়া থাকে, অর্থাৎ হেতু থাকিলেও সাধ্য থাকে না, ইহাই প্রদর্শিত (অনুমিত) হইয়া থাকে, এইজন্যই অনুমানের প্রয়োগে উপাধি দোষ বলিয়া গণ্য হয়।[১] অনুমান উপাধিকলুষিত হইলে, সেই অনুমানের হেতু যে সাধ্যের ব্যভিচারী হয়, ইহা অবশ্য সত্য কথা। কিন্তু আলোচ্য মাধ্ব-অনুমানে অদ্বৈতবেদান্তীর প্রদর্শিত (আম্নত্ব) উপাধি উদ্ভাবনের দ্বারা মাধ্বোক্ত অনুমানের হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারের অনুমান করা চলেনা। কারণ, এস্থলে মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্ব হেতু, আর সত্যত্ব সাধ্য। এই (মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্ব) হেতুটি সাধ্য সত্যত্বের ব্যভিচারী নহে, সাধ্যের অব্যভিচারী, ইহা সুধী অবশ্য লক্ষ্য করিবেন। উপাধি দ্বারা হেতুর ব্যভিচার উদ্ভাবন করিতে হইলে, হেতুটি সাধ্যের ব্যাপক উপাধির ব্যভিচারী বলিয়া, উপাধির ব্যাপ্য সাধ্যেরও উহা ব্যভিচারী হইবে—ইহাই দেখাইতে হইবে। যে ব্যাপকের ব্যভিচারী হয়, সে ব্যাপ্যেরও ব্যভিচারী হয়—ইহা কে না জানেন? এই অবস্থায় হেতুটি যদি উপাধির

মাধ্ব কর্তৃক উপাধি শঙ্কার নিরাকরণ

১। ব্যভিচারস্যানুমানমুপাধেস্তু প্রয়োজনম্।

—ভাষাপরিচ্ছেদ, কারিকা ১৪০।

যাহা (যে পদার্থ) সাধ্যের ব্যাপক হয়, অর্থাৎ সাধ্য যে সকল স্থলে আছে, সেই সকল স্থলেই বর্তমান থাকে, এবং হেতু যে সকল স্থলে থাকে, সেই সকল স্থানেই থাকে না, এইরূপে হেতুর অব্যাপক হয়, তাহাকেই উপাধি বলে। উপাধি শব্দের ইহা রূঢ়ার্থ। এতদ্‌ব্যতীত উপাধি শব্দের যোগার্থও আছে। উপশব্দের অর্থ সমীপবর্তী। সমীপে অবস্থিত অন্য পদার্থে যাহা নিজ-ধর্মের আধান বা আরোপ জন্মায়, তাহাকেই উপাধি বলে। উপ সমীপবর্তিনি আদধাতি স্বং ধর্মমিত্যুপাধিঃ।—দীধিতি-উপাধিবাদ। ইহাই উপাধি শব্দের যোগার্থ। জবাকুসুম উহার সমীপে অবস্থিত স্বচ্ছ শুভ্র কাচখণ্ডে নিজের ধর্ম রক্তিমার আরোপ করে। এইজন্য উপাধি শব্দের যোগার্থ অনুসারে জবাকুসুমকে উপাধি বলা হইয়া থাকে। উপাধি শব্দের রূঢ়ার্থ বা যোগার্থ, যেই অর্থই গ্রহণ কর না কেন, উভয় অর্থেই অনুমানের হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারের উদ্ভাবন করতঃ উপাধি অনুমানকে দূষিত করিবে। এইজন্যই উপাধি হেত্বাভাসের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে।

'সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতুরব্যাপকস্তথা স উপাধিঃ'। ভাষাপরিঃ ১৩৮ কাঃ। এই ভাষাপরিচ্ছেদ প্রভৃতির উক্তিদ্বারা উপাধি শব্দের রূঢ়ার্থই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আলোচ্য যোগার্থেও যে কোনরূপ অনুপপত্তি নাই, তাহাও সুধী পাঠক এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবেন। "যেমন বহ্নিহেতুক ধূমের অনুমান স্থলে (ধূমবান্ বহ্নেঃ) আর্দ্র-ইন্ধনসম্ভূত বহ্নি উপাধি। উহা ধূমরূপ সাধ্যের সমনিয়ত অর্থাৎ ব্যাপ্য ও

ব্যভিচারী না হয়, তবে উপাধির ব্যাপ্য সাধ্যেরও সে ব্যভিচারী হইতে পারে না। এস্থলে সত্যত্ব সাধ্য, তাহার ব্যাপক আত্মত্ব উপাধি। মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব হেতুটি এই আত্মত্বের ব্যভিচারী নহে। কারণ, মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্ব শব্দদ্বারা মিথ্যাভূত হইয়াছে মিথ্যাত্ব যাহার, তাহাকে বুঝায়। প্রপঞ্চ মিথ্যা, তাহার যে মিথ্যাত্ব তাহাও মিথ্যা। দৃষ্টান্ত যে আত্মা তাহাতেও মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্ব অবশ্যই আছে, নতুবা তাহা দৃষ্টান্তই হইতে পারে না। কেননা, অনুমানে সাধ্য যেখানে নিশ্চিতই আছে, তাহাই দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। আত্মাকে যদি সত্য বলা যায়, তাহা হইলে তাহার সেই মিথ্যাত্বও মিথ্যাই হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

মাধ্বের মতে আলোচ্য উপাধিমূলে অদ্বৈতবাদীর ব্যভিচারের অনুমান যুক্তিসহ নহে

এই অবস্থায় অদ্বৈতবেদান্তী যদি (মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্বরূপ) হেতুটিকে সাধ্য-সত্যত্বের ব্যভিচারী বলিতে চাহেন, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদীকে নিম্নোক্ত অনুমান প্রয়োগেরই আশ্রয় লইতে হয় :—

মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্বম্ (পক্ষ) সত্যত্ব ব্যভিচারী (সাধ্য)···প্রতিজ্ঞা,
আত্মত্বব্যভিচারাৎ ··· ··· ··· হেতু,
যথাশুক্তিরজতম্ ··· ··· ··· দৃষ্টান্ত।

যে বস্তুর মিথ্যাত্ব মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হয়, সেখানে সত্যতা থাকে না। কেননা, সেখানে 'আত্মত্ব' থাকে না। সত্যত্ব এবং আত্মত্ব ইহারা সমব্যাপ্ত ধর্ম। ইহাদের একটি থাকিলে অপরটি থাকিবেই।

দৃষ্টান্ত হিসাবে শুক্তিরজতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শুক্তিরজতে আত্মত্ব নাই, অতএব শুক্তিরজতে সত্যতাও নাই। আত্মাতে যে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব আছে; মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব হেতু যে আত্মত্বের ব্যভিচারী নহে, তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রদর্শিত ব্যভিচারানুমানে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বকে পক্ষ, আত্মত্বের

ব্যাপক এবং উহা বহ্নিরূপ হেতুর অব্যাপক। কারণ, বহ্নিযুক্ত স্থানমাত্রেই আর্দ্র-ইন্ধনসম্ভূত বহ্নি থাকে না। পূর্বোক্ত স্থলে আর্দ্র-ইন্ধনসম্ভূত বহ্নিতে ধূমের যে ব্যাপ্তি আছে, তাহাই বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসামান্যে আরোপিত হয়। অর্থাৎ বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসামান্য যাহা, সেখানেও জ্ঞানের বিষয় হইয়া নিকটবর্তী, তাহাতে ধূমের ব্যাপ্তি না থাকিলেও আর্দ্র-ইন্ধনসম্ভূত বহ্নিতে ধূমের যে ব্যাপ্তি আছে, তাহারই বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসামান্যে ভ্রম হয়, সেই ভ্রমাত্মক ব্যাপ্তি-নিশ্চয়বশতঃ বহ্নিত্বরূপে বহ্নিহেতুর দ্বারা ধূমের ভ্রম অনুমিত হয়। তাহা হইলে ঐস্থলে আর্দ্র-ইন্ধনসম্ভূত বহ্নি বহ্নিসামান্যে নিজধর্ম ধূমব্যাপ্তির আরোপ জন্মাইয়া, জবাপুষ্পের ন্যায় উপাধিশব্দবাচ্য হইতে পারে"।

দ্রঃ মঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশের ন্যায়দর্শনের টিপ্পনী, ন্যায়সূত্র ২।১।৩৮। উপাধির বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকের দ্বিতীয়খণ্ডে অনুমান পরিচ্ছেদে দেখুন।

আত্মত্বকে হেতুরূপে উপন্যাস করা হইয়াছে। অনুমানের পক্ষ মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকতে আত্মত্বই আছে; আত্মত্বের ব্যভিচার নাই। আত্মত্বের ব্যভিচার নাই বলিয়া, সত্যতার ব্যভিচাররূপ সাধ্যও সেখানে (পক্ষে) নাই। ফলে, দেখা যায় যে, উল্লিখিত ব্যভিচারানুমানের আত্মব্যভিচারিত্ব হেতুটি প্রকৃত হেতু নহে, উহা 'স্বরূপাসিদ্ধ' হেত্বাভাস। মাধ্ব বলেন যে, ঐরূপ স্বরূপাসিদ্ধ হেতুর দ্বারা সত্য ব্যভিচারিত্বের অনুমান করা কোনমতেই চলে না।

ব্যভিচারানুমান মাধ্বের দৃষ্টিতে এইরূপে অসম্ভব প্রতিপন্ন হওয়ায় অদ্বৈতবেদান্তী প্রদর্শিত উপাধির সাহায্যে মাধ্বোক্ত জগৎসত্যতার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত সৎপ্রতিপক্ষানুমানের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। উপাধি পদার্থ নিজের অভাবরূপ হেতুর দ্বারা পক্ষে সাধ্যাভাবের অনুমাপক হইয়াই অনুমানের দূষক হয়। অর্থাৎ উপাধি পদার্থ হেতুতে 'সৎপ্রতিপক্ষ' নামক দোষের উদ্‌ভাবন করে, ইহাই তাহার দূষকতা। যেমন বহ্নিহেতুক ধূমের অনুমানস্থলে (ধূমবান্ বহ্নেঃ) আর্দ্র-ইন্ধন (ভিজাকাঠ) উপাধি ধূমরূপ সাধ্যের ব্যাপক পদার্থ, সুতরাং উক্ত উপাধির (আর্দ্র ইন্ধনরূপ উপাধির) অভাব থাকিলে, ঐ উপাধির সেখানে ব্যাপ্য ধূমের অভাবও নিশ্চিতই থাকিবে। কারণ, ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকিলে, সেখানে উহার ব্যাপ্য পদার্থের অভাব অবশ্যই থাকে। এই জন্যই ব্যাপক পদার্থের অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, উহার ব্যাপ্য পদার্থের অভাবকে অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। আলোচ্যক্ষেত্রে আর্দ্র-ইন্ধনের অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, ধূমের অভাব অনুমানের দ্বারা বুঝিলে, ধূমের অভাবের ক্ষেত্রে আর ধূমের অনুমান চলিতে পারে না।[১] ধূমের অভাব থাকিলে তো ধূম থাকিতে পারে না, ইহাতো স্বতঃসিদ্ধ কথা। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে আত্মত্বাভাবকে হেতু করিয়া সহজেই সত্যত্বাভাবের অনুমান করা যাইতে পারে। আলোচিত সৎপ্রতিপক্ষানুমানের প্রয়োগ-বাক্যটি দাঁড়াইবে এইরূপ :—

জগৎ (পক্ষ) সত্যত্বাভাববৎ (সাধ্য) ... ... প্রতিজ্ঞা,

আত্মত্বাভাবাৎ ... ... হেতু,

যথা শুক্তিরজতম্, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা আত্মা······দৃষ্টান্ত। জগৎ মিথ্যা যে হেতু জগতে আত্মত্বের অভাব আছে। যেমন শুক্তিরজত। শুক্তিরজতে আত্মত্ব নাই, সুতরাং তাহাতে সত্যতারও অভাব আছে, অর্থাৎ শুক্তিরজত মিথ্যা। যেখানে সত্যতার অভাব থাকে না, সেখানে আত্মত্বেরও অভাব থাকে না। ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত হিসাবে আত্মারই উল্লেখ করা যাইতে পারে। আত্মা সত্যও বটে, আত্মত্ববিশিষ্টও বটে। এইরূপ সৎপক্ষ অনুমানের দ্বারা জগতের মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হয়। 'জগৎ সত্যম্' এই

অদ্বৈত বেদান্তীর সৎপ্রতিপক্ষানুমান

১। মঃ মঃ ৺ফণীভূষণের ন্যায়দর্শনের ২।১।৩৮ সূত্রের টিপ্পনী।

সাধ্য প্রতিজ্ঞা দুর্বল হইয়া পড়ে। সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানের উদয় হইলেই পক্ষে সাধ্যের সন্দেহ [illegible] দেখা দেয়। জগতের সত্যতার সাধক সাধ্য অনুমান এবং সত্যত্বাভাবের সমর্থক অদ্বৈতবেদান্তীর অনুমান পরস্পরবিরুদ্ধ। একই পক্ষকে (জগৎকে) আশ্রয় করিয়া এইরূপ বিরুদ্ধ অনুমানদ্বয়ের উদ্ভব হওয়ায়, জগৎ সত্য, না মিথ্যা, এই প্রকার সন্দেহ স্বাভাবিক ভাবেই উদিত হয়। সন্দেহ আত্মপ্রকাশ লাভ করিলে, জগৎ সত্য, না মিথ্যা কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যাইবে না। ফলে, পক্ষে সাধ্য-সিদ্ধিও সম্ভবপর হইবে না। এই জন্যই 'সৎপ্রতিপক্ষ'কে অন্যতম হেত্বাভাস বলিয়া ন্যায়শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সৎপ্রতিপক্ষের উদয় হইলে অর্থাৎ একই পক্ষে বিভিন্ন হেতুমূলে বিরুদ্ধ সাধ্যের সিদ্ধির সম্ভাবনা ঘটিলে, সেক্ষেত্রে কোনরূপ অনুমানই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না, যে পর্যন্ত না অনুকূল এবং প্রতিকূল তর্কের সাহায্যে কোন একটি অনুমানের প্রাবল্য বা দুর্বলতা ধরা পড়ে। তর্কই এইরূপ পথের অপরিহার্য পাথেয়। ইহা বুঝিয়াই ন্যায়গুরু গোতম তাঁহার ষোড়শ পদার্থের মধ্যে তর্কের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। সত্যজিজ্ঞাসার অনুকূল তর্কের ফলে হেতু ও সাধ্যের ব্যভিচারের আশঙ্কার উপর যবনিকাপাত হয় এবং পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয় হয়।

তর্কের স্বরূপ

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেইরূপ তর্কের দ্বারা হেতু ও সাধ্যের ব্যভিচারের আশঙ্কা নিবারিত হয়, সেইরূপ তর্কও ব্যাপ্তিমূলক। তর্কের মূল ব্যাপ্তিতে ব্যভিচারের আশঙ্কার উদয় হইলে, তর্কজ্ঞান সেক্ষেত্রে জন্মিতেই পারে না। তর্কের মূল ব্যাপ্তির ব্যভিচার-শঙ্কার নিবৃত্তির জন্য অপর তর্কের আশ্রয় লইলেও, সেই তর্কের মূলে যে ব্যাপ্তি বিরাজ করিবে, সেই ব্যাপ্তিতে ব্যভিচারের আশঙ্কা অনিবার্যরূপেই আত্মপ্রকাশ লাভ করিবে। ঐ ব্যভিচার-সংশয়ের নিবৃত্তির জন্য পুনরায় অন্যপ্রকার তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, 'অনবস্থা' দোষই দেখা দিবে। এই অবস্থায় তর্ক কোথায়ও সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, তর্কের সাহায্যে অনুমানের হেতু ও সাধ্যের ব্যভিচারের আশঙ্কার নিবৃত্তি সাধন করা কোনমতেই চলে না; অনুমানের প্রামাণ্য উপপাদনও সম্ভবপর হয় না। ধূম বহ্নির ব্যভিচারী নহে, যেহেতু ধূম বহ্নিজন্য। যাহা বহ্নির ব্যভিচারী পদার্থ, তাহা বহ্নিজন্য হইতে পারে না। ধূম যখন বহ্নিজন্য পদার্থ, তখন তাহা কদাচ বহ্নির ব্যভিচারী হইবে না, এইরূপে যে অনুমান হইবে, তাহাতে বহ্নিজন্যহেতুতে বহ্নির ব্যভিচারিত্বাভাবের ব্যাপ্তিনিশ্চয় আবশ্যক। ঐ ব্যাপ্তিনিশ্চয় ব্যতীত "ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, তবে ধূম বহ্নিজন্য হইতে পারে না," এইরূপ তর্ক জন্মিতেই পারে না। বহ্নিজন্য হইলেই সেই পদার্থ বহ্নির ব্যভিচারী হয় না, হইতে পারে না। ইহা সিদ্ধ না হইলে, আলোচ্য তর্ক সেক্ষেত্রে জন্মিতেই পারে না। সুতরাং ব্যভিচারশঙ্কার নিবর্তক তর্কও যখন ব্যাপ্তিমূলক, তখন ব্যভিচারের সংশয়বশতঃ ব্যাপ্তির নিশ্চয় অসম্ভব হইলে,

তন্মূলক ঐ তর্কও অসম্ভব হইবে। এইজন্যই 'ধূম বহ্নিজন্য', ইহার নিশ্চয় না হইলে, তন্মূলক ঐরূপ তর্ক অসম্ভবই হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু ধূম ও বহ্নির কার্যকারণভাবের ব্যভিচার শঙ্কা করিলে, তাহাও যদি তর্ক বিশেষের দ্বারা নিবৃত্ত করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিনিশ্চয় আবশ্যক হইবে। সেখানেও ব্যভিচার শঙ্কাপ্রযুক্ত ব্যাপ্তিনিশ্চয় অসম্ভব হইলে, তন্মূলক ঐ তর্কও অসম্ভব হইবে। ফল কথা, সর্বত্র ব্যভিচার-সংশয় উপস্থিত হইয়া ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক ঘটিলে, কোন স্থলেই ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইতে পারে না এবং ঐ ব্যাপ্তিমূলক তর্কও উদিত হইতে পারে না। ব্যভিচার সংশয় নিবৃত্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন তর্কের আশ্রয় লইলে 'অনবস্থা' দোষই আসিয়া পড়ে; তর্কের সাহায্যে অনুমানের প্রামাণ্যসাধন সুদূরপরাহত হয়।

প্রতিপক্ষ অনুমানদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তর্ক যদি সেই বিরোধের অবসান ঘটাইতে না পারে, তবে পথ কি? (কঃ পন্থাঃ)?—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে উদয়নাচার্য তদীয় 'কুসুমাঞ্জলি'তে বলিয়াছেন :—

> শঙ্কা চেদনুমাস্ত্যেব ন চেচ্ছঙ্কা ততস্তরাম্।
> ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ ॥

উদয়ন-কৃত কুসুমাঞ্জলি, ৩।৭।

তাৎপর্য এই যে, (অনুমানের হেতু ও সাধ্যের ব্যভিচারের) শঙ্কা বা সংশয় যদি থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিতই অনুমানও আছে। আর, (হেতু সাধ্যের ব্যভিচার) শঙ্কা যদি না থাকে, তাহা হইলে তো অনুমান আছেই। আশঙ্কা ততক্ষণ পর্যন্তই জাগরূপ থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ প্রবৃত্তি বা কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে বিরোধ না দেখা দেয়। স্বীয় প্রবৃত্তির বিরোধ দেখা দিলে, তর্কই সেই বিরোধের অবসান ঘটায়। তর্ক ব্যভিচার শঙ্কার নিবৃত্তি সাধন করে বলিয়া, শঙ্কাকে কোন মতেই নিরবধি বলা চলে না। তর্কের প্রয়োগই শঙ্কার অবধি বা সীমা। এইজন্যই উল্লিখিত শ্লোকে আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন—'ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা'। উদয়নোক্ত ব্যাঘাত কথাটির অর্থ কি তাহা বিচার করা আবশ্যক। ব্যাঘাত কথা দ্বারা সহজ কথায় বিরোধকে বুঝায়। সেই বিরোধই এখানে ব্যাঘাত শব্দের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে ঐ বিরোধের স্বরূপটি কি? তাহা বুঝাইবার জন্য উদয়ন বলিয়াছেন; ধূম বহ্নির ব্যভিচারী হইলে, অর্থাৎ বহ্নিকে ছাড়িয়াও ধূম থাকিলে, ধূমকে আর সেক্ষেত্রে বহ্নিজন্য বলা চলে না। বহ্নি যেখানে নাই, সেইখানেও যদি ধূম জন্মে, তবে বহ্নিকে কোনমতেই ধূমের কারণ বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যায় না। এখন কথা এই যে, বহ্নি ধূমের কারণ না হইলে, যিনি ধূম পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি বহ্নির অভিমুখে ধাবিত হন কেন? বহ্নি ব্যতীতও ধূম জন্মিতে পারে, এইরূপ সংশয় জাগরূক থাকিলে, ধূমের জন্য ধূমার্থী ব্যক্তির বহ্নির অভিমুখে নিঃশঙ্ক প্রবৃত্তিকে কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না;

সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, পূর্বোক্তরূপ সংশয় না থাকাতেই ধূমার্থী ব্যক্তি বহ্নির অভিমুখে ধাবিত হইতেছেন।

ধূম থাকিলে বহ্নি নিশ্চিতই থাকে (অন্বয়), ধূমের কারণ বহ্নি না থাকিলে ধূম সেখানে থাকে না (ব্যতিরেক), এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক দেখিয়াই ধূম বহ্নিজন্য ইহা নিশ্চয় করিয়া, ধূমার্থী ধূমের জন্য বহ্নি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। ধূমার্থী ব্যক্তি ধূমের জন্য বহ্নি গ্রহণ করেন, আবার বহ্নি ধূমের কারণ নহে, এইরূপ আশঙ্কাও করেন, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। সুতরাং যাহা আশঙ্কা করিলে শঙ্কাকারীর প্রবৃত্তি বা চেষ্টা ব্যাহত হয়, সেইরূপ আশঙ্কা কোন সুধীই করেন না।[১] অতএব দেখা যাইতেছে যে, শঙ্কাকারীর আশঙ্কার নিবৃত্তির পক্ষে তর্কই প্রধান সহায়। ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হইত অর্থাৎ বহ্নিকে ছাড়িয়া ধূম থাকিত, তবে ধূমকে বহ্নিজন্য বলা চলিত না—"ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাত্তদা বহ্নিজন্যো নস্যাৎ"। এইরূপ তর্কই ধূম ও বহ্নি প্রভৃতির ব্যভিচার শঙ্কার নিবর্তক হইয়া থাকে। তর্কের উদয়ে সংশয় দূরীভূত হয়। এইজন্যই উদয়নাচার্য বলেন—'তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ।' তর্কই হেতু ও সাধ্যের ব্যভিচারের আশঙ্কার অবধি বা শেষ সীমা। তর্ক স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটাইলেই শঙ্কা দূরীভূত হইবে। শঙ্কা উদয়নের মতে নিরবধি না হওয়ায়, (তর্কের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত) অনবস্থার প্রশ্নও ওঠে না।

শ্রীহর্ষকর্তৃক উদয়নোক্ত সিদ্ধান্তের খণ্ডন

আলোচ্য উদয়ন-সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' নামক গ্রন্থের রচয়িতা মহামনীষী শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন :—

"তস্মাদস্মাভিরপ্যস্মিন্নর্থে ন খলু দুষ্পঠা।
ত্বদ্গাথৈবান্যথাকারমক্ষরাণি কিয়ন্ত্যপি॥
ব্যাঘাতো যদি শঙ্কাস্তি ন চেচ্ছঙ্কা ততস্তরাম্।
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধিঃ কুতঃ॥"

খণ্ডনখণ্ডখাদ্য—৬৯৩ পৃঃ, চৌখাম্বা সং।

এবিষয়ে আমরাও (অদ্বৈতবেদান্তীরা) তোমার গাথাকেই (উদয়নের কারিকাকেই) কয়েকটি মাত্র অক্ষর বা পদের পরিবর্তন করিয়া পাঠ করিতে পারি। অর্থাৎ তোমার (উদয়নের) কারিকাটিরই একটু পাঠভেদ করিয়া তোমার উক্তির প্রতিবাদ করিতে পারি। সেই পাঠভেদটি হইবে নিম্নরূপ :—উদয়ন বলিয়াছেন "শঙ্কাচেদনুমাস্ত্যেব।" শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন—"ব্যাঘাতো যদি শঙ্কাস্তি"। উদয়ন বলিয়াছেন—"তর্কঃশঙ্কাবধির্মতঃ।" শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন—"তর্কঃ শঙ্কাবধিঃ কুতঃ।" শ্রীহর্ষোক্ত দ্বিতীয় শ্লোকটির তাৎপর্য এই যে, 'ব্যাঘাতো যদি', অর্থাৎ যদি ব্যাঘাত থাকে, তবে 'শঙ্কাঽস্তি' শঙ্কা অবশ্যই থাকিবে।

১। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশকৃত বাৎস্যায়ন ভাষ্যের টিপ্পনী ২।১।৩৮ সূত্র দ্রষ্টব্য।

শঙ্কাকে বাদ দিয়া 'ব্যাঘাত' দাঁড়াইতেই পারে না। নচেৎ (ব্যাঘাতঃ) অর্থাৎ ব্যাঘাত যদি না থাকে, তাহা হইলে তো শঙ্কা আছেই। শঙ্কার প্রতিবন্ধক না থাকিলে. শঙ্কা সেক্ষেত্রে অবশ্যই থাকিবে। এই অবস্থায় ব্যাঘাত শঙ্কার প্রতিবন্ধক 'ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা,' ইহা কিরূপে বলা যায়? তর্ক শঙ্কার প্রতিবন্ধক ইহারই বা কিরূপে উপপাদন সম্ভবপর হয়? ব্যাঘাত থাকিলেই শঙ্কা অবশ্যই থাকিবে। শঙ্কা ছাড়িয়া ব্যাঘাত থাকিতেই পারে না। সুতরাং ব্যাঘাত কোন প্রকারেই শঙ্কার নিবর্তকও হইতে পারে না। শঙ্কার নিবৃত্তি না ঘটিলে, শঙ্কাবশতঃ তর্ক জন্মিতেই পারে না। তর্ক না জন্মিলে (অজাততর্ক) শঙ্কার নিবর্তকও হইতে পারে না। ব্যাঘাত শব্দের অর্থ বিরোধ, ইহা পুর্বেই বলা হইয়াছে। বিরোধস্থলে দুইটি পদার্থ আবশ্যক। একটিমাত্র পদার্থকে আশ্রয় করিয়া বিরোধ দাঁড়াইতে পারে না। দুইটি পদার্থের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিলে, ঐ পদার্থদ্বয়ই সেই বিরোধের আশ্রয় হয়। পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি পদার্থের একটি না থাকিলে, বিরোধও সেখানে থাকিবে না। আলোচিত শঙ্কা এবং প্রবৃত্তির যে বিরোধ, (যাহাকে উদয়ন ব্যাঘাত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন) তাহা যেখানে আছে, সেখানে ঐ বিরোধের আশ্রয় (বা প্রতিযোগী) যে শঙ্কা তাহাও অবশ্যই থাকিবে। বিরোধের প্রতিযোগী বা আশ্রয় শঙ্কাকে ছাড়িয়া বিরোধ থাকিতে পারে না। যাহার সহিত বিরোধ তাহা অর্থাৎ সেই বিরোধের আশ্রয় না থাকিলে, বিরোধ সেখানে থাকিবে কিরূপে? সুতরাং শঙ্কা ও প্রবৃত্তির বিরোধের ক্ষেত্রে শঙ্কা অবশ্যই থাকিবে। ইহাই মহামনীষী শ্রীহর্ষ 'ব্যাঘাতো যদি শঙ্কাঽস্তি" এই কথা দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্যাঘাত থাকিলেই শঙ্কাও থাকে। নতুবা (শঙ্কাকে ছাড়িয়া) বিরোধরূপ ব্যাঘাত জন্মিতেই পারে না। এই অবস্থায় ব্যাঘাতকে কোনমতেই শঙ্কার প্রতিবন্ধক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। শঙ্কা বিরাজ করায় (শঙ্কার উচ্ছেদ না ঘটায়) তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তির নিশ্চয় সম্ভবপর হয় না। ফলে, তর্কও অসম্ভব হয়। এই অবস্থায় তর্ক শঙ্কার প্রতিবন্ধক হইবে কিরূপে? তাহা অসম্ভব কথা। এই রহস্যই আলোচ্য গাথার (শ্লোকের) শেষে 'তর্কঃ শঙ্কাবধি কুতঃ,' এই সংক্ষিপ্ত উক্তির দ্বারা প্রকাশ করিয়া আচার্য শ্রীহর্ষ উদয়নের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়াছেন।[১]

শ্রীহর্ষের ব্যাঘাতের ব্যাখ্যায় গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের বক্তব্য

শ্রীহর্ষের উল্লিখিত ব্যাঘাতের বিবরণ নব্যন্যায়গুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায় অনুমোদন করেন নাই। তিনি তাঁহার 'তর্ক' নামক গ্রন্থে শ্রীহর্ষের দ্বিতীয় শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া, শ্রীহর্ষোক্ত ব্যাখ্যার দোষ বা অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। গঙ্গেশ বলিয়াছেন, ধুম বহ্নিজন্য কিনা, এইরূপ সংশয় উদিত হইলে, ধুমার্থী ধুমের জন্য নিঃশঙ্কচিত্তে বহ্নির অভিমুখে যে ধাবিত হয়, তাহা হইতে পারে না। ধুমার্থীর নিঃশঙ্ক প্রবৃত্তিই শঙ্কার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। শঙ্কা বা সংশয়কে আশ্রয় করিয়া যে বিরোধ আত্মপ্রকাশ

১। মঃমঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশের ন্যায়দর্শনের ২।১।৩৮ সূত্রের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

লাভ করে, শঙ্কা কদাচ তাহার প্রতিবন্ধক হয় না। আচার্য উদয়ন তাহা বলেনও নাই। শঙ্কা থাকিলে ধূমার্থীর ধূমগ্রহণে যে প্রবৃত্তি বা চেষ্টা দেখা যায়, সেই প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। সুতরাং স্বীয় প্রবৃত্তি বা কর্মপ্রচেষ্টার ব্যাঘাতকেই শঙ্কার প্রতিবন্ধক বলিয়া বুঝিতে হইবে। উদয়নাচার্য 'ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা', এইরূপ উক্তি-দ্বারা এই রহস্যই প্রকাশ করিয়াছেন। শঙ্কাশ্রিত বিরোধের ক্ষেত্রে শঙ্কাকে বিরোধরূপ ব্যাঘাতের প্রতিবন্ধক বলিয়া আচার্য উদয়নও গ্রহণ করেন নাই। যদি শঙ্কা ও প্রবৃত্তির বিরোধরূপ ব্যাঘাতকে শঙ্কার প্রতিবন্ধক বলা হইত, তাহা হইলে ব্যাঘাত থাকিলে শঙ্কা থাকিবেই এইরূপ কথা বলা যাইত। কিন্তু তাহা কেহই বলে নাই। উদয়নেরও তাহা বক্তব্য নহে। উদয়নের কথা এই যে, তাহাই আশঙ্কা করা যায়, যাহা আশঙ্কা করিলে নিজ প্রবৃত্তি বা কর্মপ্রচেষ্টার বিরোধ না ঘটে। উদয়ন পরে 'ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা' এই কথার বিবরণে বলিয়াছেন, যেখানে শঙ্কা থাকিলে শঙ্কাকারীর প্রবৃত্তিই ব্যাহত হয়, সেখানে বস্তুতঃ শঙ্কাই হয় না। সেখানে শঙ্কার অন্তকারণের অভাবেই হউক, অথবা কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়াতেই হউক, শঙ্কাই জন্মে না। ইহাই উদয়নের উক্তির তাৎপর্য। উদয়ন যে ঐ ব্যাঘাতকেই শঙ্কার প্রতিবন্ধক বলিয়াছেন তাহা নহে। শ্রীহর্ষ উদয়নের কথা না বুঝিয়াই ঐরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন।

গঙ্গেশ দ্বিতীয় কথা বলিয়াছেন, ব্যাঘাত শঙ্কার প্রতিবন্ধক ইহা বলিলেও কোন ক্ষতি নাই, তাহাতেও শ্রীহর্ষোক্ত দোষ হয় না। বিশেষ দর্শন যেমন শঙ্কার নিবর্তক হয়, তদ্রূপ ব্যাঘাতও শঙ্কার নিবর্তক হইতে পারে। গঙ্গেশের কথার তাৎপর্য এই, পূর্বোক্ত প্রকার শঙ্কা ও প্রবৃত্তির বিরোধরূপ যে ব্যাঘাত, তাহা শঙ্কাশ্রিত, সুতরাং শঙ্কা না থাকিলে তাহা (ব্যাঘাত) থাকিতে পারে না। যাহা থাকিলে যাহা থাকিবেই, তাহা তাহার নিবর্তক হইতে পারে না। ইহাই শ্রীহর্ষের মূল কথা। কিন্তু প্রশ্ন এই যে তাহা হইলে বিশেষ দর্শন শঙ্কার নিবর্তক হয় কিরূপে? ইহা কি স্থাণু (গাছের গুড়ি), না একটি মানুষ? এইরূপ সংশয় হইলে, যদি সেখানে স্থাণু কিংবা মানুষ বলিয়া নিশ্চয় জন্মে, তবে আর সেখানে ঐরূপ সংশয় জন্মিতেই পারে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশেষ দর্শন বিরোধি-দর্শন। এই জন্যই উহা (বিশেষদর্শন) ঐ সংশয়ের নিবর্তক হয়। পূর্বোক্ত ইহা কি স্থাণু, না মানুষ? এই প্রকার সংশয়ের সহিত স্থাণু বা মানুষের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের বিরোধ আছে বলিয়াই, তাহা (স্থাণু বা মানুষ, এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) ঐরূপ সংশয়ের বিরোধি-দর্শন। পূর্বোক্ত সংশয় ও বিশেষদর্শনরূপ নিশ্চয়ের যে বিরোধ তাহা না থাকিলে, ঐ বিশেষ দর্শন বিরোধি-দর্শন হয় না; এবং উহা ঐ সংশয়ের নিবর্তকও হয় না। কিন্তু পূর্বোক্ত সংশয় ও নিশ্চয়ের যে বিরোধ, তাহা থাকিলেও (শ্রীহর্ষের কথানুসারে) ঐ সংশয় সেখানে থাকা আবশ্যক। কারণ, যে-বিরোধ শঙ্কাশ্রিত

তাহা (সেই শঙ্কাশ্রিত বিরোধ) থাকিলে, শঙ্কা বা সংশয় সেখানে থাকিবেই, ইহা শ্রীহর্ষই বলিয়াছেন। শঙ্কা ছাড়িয়া যখন শঙ্কাশ্রিত বিরোধ কিছুতেই থাকিতে পারে না, তখন শঙ্কার বিরোধী বিশেষ দর্শন থাকিলেও শঙ্কা সেখানে অবশ্যই থাকিবে। শঙ্কা থাকিলে আর ঐ বিশেষদর্শন শঙ্কার নিবর্তক হইতে পারে না। যেই বিশেষদর্শন থাকিলে শঙ্কা সেখানে থাকিবেই, সেই বিশেষদর্শন ঐ শঙ্কার নিবর্তক হইবে কিরূপে? তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। তাহা হইলে বলিতে হয়, বিশেষদর্শন কোন স্থলেই শঙ্কার নিবর্তক হয় না। স্থাণু কিংবা পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইলেও ইহা কি স্থাণু না পুরুষ? এইরূপ সংশয় থাকিয়াই যায়, নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু তাহা কি বলা যায়? সত্যের অপলাপ করিয়া, অনুভবের অপলাপ করিয়া, শ্রীহর্ষও কি তাহা বলিতে পারেন? সুতরাং উদয়ন যদি 'ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা' এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত শঙ্কাশ্রিত বিরোধকে শঙ্কার নিবর্তক বলিয়া থাকেন, তাহাতেই বা দোষের কথা কি আছে?[১]

এইরূপে নব্যন্যায়গুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায় উদয়ন ও শ্রীহর্ষের ব্যাঘাতের ব্যাখ্যায় বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যের সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

অনুমানে উপাধি দেখা দিলেই, ঐ উপাধির অভাবকে হেতুরূপে উপন্যাস করিয়া, পক্ষে সাধ্যাভাবের অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। এইরূপে 'উপাধি' সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাসের উদ্ভাবক হয় বলিয়াই, উপাধিকে অনুমানের দোষ হিসাবে গণনা করা হইয়া থাকে। সৎপ্রতিপক্ষের ক্ষেত্রে অনুমানের বলাবল নির্ণয়ের জন্য তর্কের সাহায্য অপরিহার্য, ইহা পূর্বেই তর্কের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করিয়াছি।

জগতের সত্যতার সাধক মাধ্ব-অনুমান জগৎ (পক্ষ), সত্যম্ (সাধ্য), মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বাৎ (হেতু), আত্মবৎ (দৃষ্টান্ত)।

এই মাধ্ব অনুমানের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবেদান্তী আত্মত্ব উপাধি উদ্ভাবন করিয়াছেন। ঐ উপাধি আত্মত্বের অভাবকে হেতু করিয়া, জগৎ সত্যম্, এই অনুমানের সাধ্য সত্যত্বের অভাবকে সাধ্য করিলে প্রতিপক্ষ অনুমানটি নিম্নরূপ দাঁড়াইবে:—

জগৎ (পক্ষ), সত্যত্বাভাববৎ (সাধ্য), আত্মত্বাভাবাৎ (হেতু). যথা শুক্তিরজতম্ (অন্বয়িদৃষ্টান্ত), যন্নৈবং তন্নৈবম্ (ব্যতিরেক ব্যাপ্তি) যথা আত্মা (ব্যতিরেকি উদাহরণ)।*

১। বাৎস্যায়ন ভাষ্যের মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশকৃত টিপ্পনী ২।১।৩৮ সূত্র দেখুন।

* মাধ্বোক্ত জগৎসত্যতার অনুমান এবং [illegible] প্রতিপক্ষানুমান সম্পর্কে আমরা 'মিথ্যাত্বমিথ্যাত্বনিরুক্তির প্রারম্ভেই আলোচনা করিয়াছি। উপাধির ও তর্কের স্বরূপ আলোচনা করিতে গিয়া আমরা কিছু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম। এখন পূর্বের আলোচনার সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইবার জন্যই এখানে অনুমানের প্র[illegible] পুনরুল্লেখ করিলাম।

এই প্রতিপক্ষ অনুমানটিকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে

অদ্বৈতবাদীর সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানের বিরুদ্ধ মাধ্বের বক্তব্য

'জগৎ' এখানে পক্ষ। 'জগৎ'কে পক্ষ করায়, জাগতিক সমস্ত বস্তুই পক্ষান্তর্ভুক্ত বা পক্ষসম হইবে। দৃষ্টান্ত শুক্তিরজতও জগৎ ছাড়া নহে; সুতরাং শুক্তিরজতও পক্ষসম বা পক্ষান্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে। এই অবস্থায় সত্যত্বাভাব (প্রতিপক্ষ অনুমানের যাহা সাধ্য) শুক্তিরজতেও নিশ্চিত নহে, সন্দিগ্ধ। কেননা, পক্ষে সর্বত্রই সাধ্যের সন্দেহই আছে। ঐ সন্দেহ নিরাসের জন্যই অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যসিদ্ধির জন্যই অনুমান বাক্যের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এই শ্রেণির অনুমানে অন্বয়ব্যাপ্তি এবং অন্বয়িদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা সম্ভবপর হয় না। ব্যতিরেক ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকি দৃষ্টান্তই এ সকল স্থলে প্রযোজ্য। আলোচ্য অনুমানে 'যন্নৈবং তন্নৈবম্' কথার দ্বারা ব্যতিরেক ব্যাপ্তিই প্রদর্শিত হইয়াছে। ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে, হেতু থাকিলে সাধ্য থাকে, ইহা অন্বয় ব্যাপ্তি। বহ্নির অভাব হইলে, হেতু ধূমেরও অভাব ঘটে, সাধ্যের অভাব ঘটিলে, হেতুরও অভাব হয়, ইহা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। উক্ত প্রতিপক্ষানুমানে সত্যত্বাভাবের (সাধ্যের) অভাব ঘটিলে, আত্মত্বাভাবেরও সেখানে অভাব ঘটিবে, ইহাই (এই ব্যতিরেক ব্যাপ্তিই) 'যন্নৈবং তন্নৈবম্' এই সংক্ষিপ্ত উক্তি দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আত্মত্বাভাব বা অনাত্মত্ব (জগতের সত্যতার সাধক মাধ্ব অনুমানের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত আত্মত্ব উপাধির যাহা অভাবস্বরূপ) সত্যত্বাভাবের ব্যাপ্য নহে। কোন পদার্থ যদি আত্মভিন্ন হইয়াও সত্য হয়, তবে তাহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? এইরূপে আত্মভিন্ন হইয়াও বস্তু সত্য হইলে, আত্মত্বাভাবকে আর সত্যত্বাভাবের ব্যাপ্য বলা চলিবে না। উপাধির অভাবের সহিত সাধ্যের অভাবের ব্যাপ্তি না থাকিলে, 'উপাধি' কদাচ সাধ্যের ব্যাপক হইতে পারে না। ফলে, মাধ্ব প্রদর্শিত জগতের সত্যতানুমানে আত্মত্ব উপাধি হইতে পারে না। আত্মত্ব উপাধি এরূপ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজক হইতে বাধ্য। আত্মভিন্ন হইয়াও বস্তু সত্য হউক, এইরূপ বলিলে কোন অনিষ্ট প্রসঙ্গ দেখা যায় না। এইজন্য উল্লিখিত প্রতিপক্ষানুমানে স্বক্রিয়াবিরোধ বা ব্যাঘাতরূপ তর্কের উপন্যাস করিবারও কোনরূপ অবকাশ নাই।

জগতের সত্যতার সাধক মাধ্ব-অনুমানে স্বক্রিয়া বিরোধরূপ ব্যাঘাতের উদয় হইয়া থাকে বলিয়া, ঐরূপ অনুমানের মূলে অনুকূল তর্ক থাকায়, তাহা দ্বারা অদ্বৈতবাদীর প্রতিপক্ষানুমানই বাধিত হইবে এবং জগতের সত্যতাই সিদ্ধ হইবে। মাধ্ব-অনুমানে সত্যত্বকে সাধ্য এবং মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্বকে হেতু করা হইয়াছে। মিথ্যাভূত হইয়াছে মিথ্যাত্ব যাহার, এই কথার দ্বারা সত্যতারই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্ব হেতুর দ্বারা সত্যতার সাধন করাইয়া, মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্ব হেতুটি থাকুক, সত্যতা (সাধ্য) না থাকুক, এইরূপ কোনমতেই বলা চলিবে না।

এইরূপ বলিলে স্বক্রিয়াবিরোধরূপ ব্যাঘাতই সেক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ লাভ করিবে। মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্ব হেতুর জগতের সত্যতাসাধনে অপ্রয়োজকত্ব শঙ্কা করিবারও কোন কারণ ঘটিবে না। কেননা, স্বক্রিয়াবিরোধ বা ব্যাঘাতই সেইরূপ শঙ্কার নিবৃত্তি সাধন করিবে, "ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা", এই উদয়নের উক্তির ব্যাখ্যায় ইহা আমরা পূর্বেই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি।

মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্ব এবং অসত্যত্ব যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম, ইহাদের একটি স্বীকার করিয়া আর একটি স্বীকার করিলে ব্যাঘাত (বিরোধ) হয়, তদ্রূপ অনাত্মত্ব ও সত্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম নহে। সুতরাং ইহাদের একটি স্বীকার করিয়া আর একটি স্বীকার করিলেও, সেখানে (পরস্পর বিরোধরূপ) ব্যাঘাত হয় না। এখন ইহাতে যদি অদ্বৈতবেদান্তী বলেন যে, অনাত্মত্ব এবং সত্যত্বও পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম, ইহা এক ধর্মীতে স্বীকার করিলে ব্যাঘাতই হয়, যেহেতু অসত্যত্বই অনাত্মত্ব, আর সত্যত্বই আত্মত্ব। সুতরাং অনাত্মত্ব স্বীকার করিলে অসত্যত্বই স্বীকার করা হইল। তাহাতে আবার সত্যত্ব স্বীকার করিতে গেলে স্বক্রিয়াবিরোধরূপ ব্যাঘাতই হইবে; তাহা হইলে আমরা প্রতিবাদীরা বলিব—অদ্বৈতবেদান্তীর এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে। "কারণ, অসত্যত্বই অনাত্মত্ব নহে। কিন্তু অজ্ঞাতৃত্বই অনাত্মত্ব। আর আত্মত্বই সত্যত্ব নহে, কিন্তু অবাধ্যত্বই সত্যত্ব।"[১] সুতরাং অনাত্মত্ব ও সত্যত্ব, সত্যত্ব এবং অসত্যত্বের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধরূপ হইল না। এইজন্য এরূপ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধরূপ ব্যাঘাতেরও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

মাধ্ব-অনুমানে ব্যভিচার শঙ্কা

জগতের সত্যতা সাধন করিবার জন্য "জগৎ সত্যং মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্বাৎ", এইরূপ মাধ্ব পণ্ডিতগণ যে অনুমানের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেখানে শুক্তি রজতও জগতের (পক্ষের) মধ্যে পড়ে বলিয়া, পক্ষান্তর্ভুক্ত শুক্তিরজতের যে মিথ্যাত্ব তাহাও মিথ্যা বিধায় মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্ব হেতু সেখানে আছে, কিন্তু সাধ্য যে সত্যত্ব তাহা শুক্তিরজতে নাই। শুক্তিরজত সত্য নহে, মিথ্যাই বটে। এই অবস্থায় প্রদর্শিত অনুমানের হেতু শুক্তিরজতের দৃষ্টান্তে সাধ্যের ব্যভিচারী হইয়া, উক্ত মাধ্ব-অনুমানকে অবশ্যই কলুষিত করিবে নাকি?

প্রদর্শিত ব্যভিচার শঙ্কার মাধ্বোক্ত সমাধান

এইরূপ ব্যভিচার শঙ্কার উত্তরে মাধ্ব-তার্কিকগণ বলেন, শুক্তিরজতের মিথ্যাত্ব ধর্মটি যদি মিথ্যা হয়, তবে ঐ রজতে মিথ্যাত্ব বিরুদ্ধ সত্যত্ব ধর্মটি সেখানে সত্যই হইবে। কেননা, একই ধর্মী বা বিশেষ্যপদার্থে প্রসক্ত বিরুদ্ধ দুইটি ধর্মের একটি মিথ্যা হইলে, অপরটি অবশ্য সত্যই হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে মনে রাখা আবশ্যক যে, একই পদার্থে বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের প্রসক্তি ঘটিলে, সেইরূপ প্রসক্তি বস্তুর ধর্মসম্পর্কে সংশয়ই

১। মঃ মঃ ডাঃ ৺যোগেন্দ্রনাথ কৃত অদ্বৈতসিদ্ধির অনুবাদ দ্বিতীয় ভাগ, ৮৯৮ পৃঃ।

জাগাইয়া তোলে, কদাচ নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান জন্মায় না। সেই সংশয় ভঞ্জনের জন্য পুনরায় নিম্নোক্ত অনুমানের প্রয়োগ করা আবশ্যক হয় :—

শুক্তিরজতম্ (পক্ষ) মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বাধিকরণং ন ভবতি (সাধ্য)······প্রতিজ্ঞা
সত্যভূত (মিথ্যাত্ব বিরুদ্ধ) সত্যত্বানধিকরণত্বাৎ ······হেতু।
যথা গৌঃ ··· ··· ··· ······উদাহরণ।

প্রদর্শিত অনুমানের "ব্যাপ্তি হইল এই যে, যাহা সত্যভূত (মিথ্যাত্ব বিরুদ্ধ) সত্যত্বের অধিকরণ হয় না, তাহা মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বেরও অধিকরণ হয় না। সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব যে পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং শুক্তিরজত• যখন সত্যভূত সত্যত্বের অধিকরণ নহে, অর্থাৎ শুক্তিরজতের সত্যত্বটী যখন সত্য নহে, তখন তাহার মিথ্যাত্বটীও মিথ্যা হইতে পারিবে না।"[১] দৃষ্টান্তস্বরূপে গোর উল্লেখ করা যাইতে পারে। গোত্ব এবং গোত্বাভাব পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ ধর্ম। ইহারা একই গোশরীরে কোন মতেই থাকিতে পারে না। সত্যভূত গোত্বাভাবের অনধিকরণ গো মিথ্যাভূত গোত্বের অধিকরণ হয় না। এইরূপ সত্যভূত সত্যত্বের অনধিকরণ শুক্তিরজত ও মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বের অধিকরণ বা আশ্রয় হয় না। রজতের মিথ্যাত্ব সত্য, সুতরাং মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব (ব্যভিচারানুমানের সাধ্য) রজতে নাই, এই অবস্থায় রজতে মাধ্বের জগৎ সত্যতা সাধক অনুমানের ব্যভিচার প্রদর্শন করাও চলে না।

যদি বল যে, শুক্তিরজত সত্যভূত সত্যত্বের অনধিকরণ বটে অর্থাৎ সত্যভূতসত্যত্ব শুক্তিরজতে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও শুক্তিরজত সত্যভূতমিথ্যাত্বের অধিকরণ নহে, মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বেরই অধিকরণ। যে হেতু ধর্মী যে শুক্তিরজত, তাহা নিজেই মিথ্যা। সুতরাং যে নিজেই মিথ্যা সে সত্যভূত-মিথ্যাত্বের অধিকরণ হইবে কিরূপে? ধর্মী বা বিশেষ্য বস্তুটি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, ঐরূপ মিথ্যা ধর্মীর সত্য ও মিথ্যা উভয়বিধ ধর্ম যে মিথ্যাই হইবে তাহাও নিম্নোক্ত অনুমানের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে :—

শুক্তিরজতগতত্বেন উচ্যমানে সত্যত্বমিথ্যাত্বে (পক্ষ)
মিথ্যা (সাধ্য)··················প্রতিজ্ঞা।
মিথ্যাত্বোপেতধর্মিকত্বাৎ (হেতু),
স্বপ্নদৃষ্টগজাস্তিত্বনাস্তিত্ববৎ··················দৃষ্টান্ত।[২]

মিথ্যারজতে প্রতীত সত্যত্ব এবং মিথ্যাত্ব, এই উভয় প্রকার ধর্মই মিথ্যা, যেহেতু ঐ সকল ধর্মের আশ্রয় বা অধিকরণ রজতরূপ ধর্মী বিশেষ্যই মিথ্যা। ধর্মী

১। মঃ মঃ ডাঃ ৺যোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের অদ্বৈতসিদ্ধির টিপ্পনী, ৮৯৯ পৃঃ।
২। মঃ মঃ ৺যোগেন্দ্রনাথ কৃত অদ্বৈতসিদ্ধির অনুবাদ দ্বিতীয় ভাগ, ৯০০ পৃঃ।

মিথ্যা হওয়ায়, মিথ্যাভূত রজতধর্মীর ধর্মও মিথ্যাই হইবে। স্বপ্নে পরিদৃষ্ট গজের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, উভয়ই মিথ্যাই হইয়া থাকে। জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা বলিয়া জগৎ সত্যই হইবে, এইরূপে মাধ্ব পণ্ডিতগণ যে অনুমান প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, সেখানে মিথ্যা শুক্তিরজতের যে মিথ্যাত্ব তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায়, অর্থাৎ শুক্তিরজতে "মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্ব"রূপ হেতু থাকায়, অনুমানের সাধ্য সত্যত্বও শুক্তিরজতে থাকিবে না এবং মাধ্ব-অনুমানটি শুক্তিরজতের ক্ষেত্রে ব্যভিচারী হইবে সন্দেহ নাই।

এইরূপে শুক্তিরজতের অন্তর্ভাবে মাধ্বের জগতের সত্যতানুমানের ব্যভিচারের শঙ্কা করিলে, মাধ্ব বলেন যে, ধর্মী মিথ্যা হইলে ঐ মিথ্যাধর্মীর সত্যত্ব এবং মিথ্যাত্ব, এই উভয়বিধ ধর্মই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। এইরূপে অদ্বৈতবেদান্তী যে অনুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন সেই অনুমানটি পূর্বে প্রদর্শিত মাধ্বোক্ত অনুমানের "সৎপ্রতিপক্ষ" বিধায়, প্রমাণ বলিয়াই গণ্য হইবে না। মাধ্ব-প্রদর্শিত অনুমানটির ব্যাপ্তি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, সত্যত্ব এবং মিথ্যাত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম; ঐরূপ দুইটি পরস্পর ধর্ম একই ধর্মীতে কদাচ থাকিতে পারে না। যে পদার্থ মিথ্যাত্ববিরুদ্ধ সত্যত্বের অনধিকরণ হয়, তাহা মিথ্যাভূত-মিথ্যাত্বের অধিকরণ হয় না। আরও সহজ ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয় যে শুক্তিরজতের সত্যত্ব ধর্মটি যখন সত্য নহে, তখন তাহার (শুক্তিরজতের) মিথ্যাত্ব ধর্মটিও মিথ্যা হইবে না। শুক্তিরজতের মিথ্যাত্বটি মিথ্যা না হইলে, শুক্তি-রজতে "মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বকত্ব"রূপ হেতু থাকিবে না; মিথ্যা শুক্তিরজতে সত্যত্বরূপ সাধ্যও থাকিবে না। এই অবস্থায় শুক্তিরজতের দৃষ্টান্তে মাধ্ব-অনুমানের ব্যভিচারের প্রশ্ন উঠিবে কেমন করিয়া?

মাধ্বের উত্তর

একই ধর্মীতে (বিশেষ্য পদার্থে) প্রসক্ত পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি ধর্মের মধ্যে একটির অভাব ঘটিলেই, অপরটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে। এইরূপ সামান্য ব্যাপ্তিমূলে, গোত্ব এবং গোত্বাভাবের দৃষ্টান্ত উপন্যাস করিয়া, শুক্তিরজত মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বের অধিকরণ হয় না, শুক্তিরজতের মিথ্যাত্ব ধর্মটি যদি মিথ্যা হয়, তবে শুক্তিরজতে মিথ্যাত্ববিরুদ্ধ সত্যতাও সত্য হয়, এইরূপে যে অনুমানের প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেই অনুমানের মৌলিক ব্যাপ্তিটি ধর্ম ও ধর্মীর সমানসত্তা স্থলেই প্রযোজ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। ধর্মী শুক্তিরজত মিথ্যা, সুতরাং তাহাতে সত্যভূত মিথ্যত্বধর্ম থাকিতেই পারে না। ধর্মী মিথ্যা শুক্তিরজত হইতে উহার ধর্মের অধিক সত্যতা কোনমতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। গরুর দৃষ্টান্তটিও এক্ষেত্রে সঙ্গত হয় নাই। গরুর দৃষ্টান্ত অনুসারে আলোচ্য অনুমানটিও উপাধিদোষে কলুষিত হইবে। 'অমিথ্যাত্ব'ই হইবে এই অনুমানে উপাধি। 'অমিথ্যাত্ব' উপাধিটি দৃষ্টান্ত গোতে আছে বলিয়া, উহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে, পক্ষ মিথ্যা

অদ্বৈতবেদান্তীর বক্তব্য

শুক্তিরজতে নাই বলিয়া, হেতুরও অব্যাপক হইয়াছে। 'অমিথ্যাত্ব' উপাধি হওয়ায়, মাধ্বোক্ত অনুমান অবশ্য হীনবল হইয়া পড়িবে। ঐরূপ উপাধিকলুষিত হীনবল অনুমানের দ্বারা অদ্বৈতবেদান্তীর মিথ্যা শুক্তিরজতের সত্যত্ব এবং মিথ্যাত্ব এই উভয়বিধ ধর্মই মিথ্যা, এই অনুমানকে বাধা দেওয়া চলিবে না। এইরূপে শুক্তি-রজতের 'মিথ্যাভুত-মিথ্যাত্বকত্ব' সিদ্ধ হইলে, শুক্তিরজতের সত্যতা নাই বলিয়া জগতের সত্যতার সাধক মাধ্বোক্ত 'মিথ্যাভুত-মিথ্যাত্বকত্ব' হেতুটি সত্যত্বের ব্যভিচারীই হইয়া দাঁড়াইল।

তারপর, একই ধর্মীতে প্রসক্ত পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি ধর্মের একটি মিথ্যা হইলে, অপরটি সত্য হয়। এই নিয়মও অব্যভিচারী নহে। ঐরূপ নিয়ম বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে ব্যভিচারদুষ্ট তাহা প্রতিবাদী মাধ্ব লক্ষ্য করিয়াছেন কি? বন্ধ্যাপুত্র মিথ্যা, মিথ্যা বন্ধ্যাপুত্রের শ্যামত্ব এবং গৌরত্বও মিথ্যা। শ্যামত্ব এবং গৌরত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম। পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম হইলেও অলীক বন্ধ্যাপুত্রের ক্ষেত্রে উভয়ই মিথ্যাই হইবে; একের অভাবে অপরের সত্যতা সিদ্ধ হইবে না। মাধ্বোক্ত অনুমানের মূলীভূত ব্যাপ্তির ব্যভিচারও স্পষ্টতঃ দেখা দিবে।

ইহার উত্তরে মাধ্ব বলেন, পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম বলিয়া আমরা সহ-অনবস্থান-রূপ বিরোধ বুঝিব না, পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ বিরোধই বুঝিব। গৌরত্ব এবং শ্যামত্ব একই সময়ে একই ধর্মী বা বিশেষ্যে থাকিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে সহ-অনবস্থানরূপ বিরোধ অবশ্য আছে। কিন্তু গৌরত্বের অভাবই শ্যামত্ব নহে, কিংবা শ্যামত্বের অভাবই গৌরত্ব নহে। সুতরাং গৌরত্ব এবং শ্যামত্ব পরস্পর বিরুদ্ধরূপ নহে। গৌরত্ব এবং শ্যামত্বের সহ-অবস্থান না থাকিলেও, পীত, রক্ত প্রভৃতিতে উভয়েরই অভাব পাওয়া যায়। এই অবস্থায় গৌরত্ব এবং শ্যামত্বকে গোত্ব এবং গোত্বাভাবের ন্যায় পরস্পর অত্যন্তাভাবস্বরূপ বলিয়া কোনমতেই ব্যাখ্যা করা চলে না। পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের একটি সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা হয়, এই মাধ্বোক্ত ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া মাধ্ব তার্কিকগণ গোত্ব এবং গোত্বাভাবকেই দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। গৌরত্ব এবং শ্যামত্ব ইহাদের মতে পরস্পর বিরহরূপ নহে বলিয়া, বন্ধ্যাপুত্রের ক্ষেত্রে মাধ্বোক্ত ব্যাপ্তির যে ব্যভিচার অদ্বৈতবাদী উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার কোনই মূল্য নাই।

স্বপ্নাবস্থায় পরিদৃষ্ট গজ এবং গজাভাব এই উভয়ই যেমন মিথ্যা, সেইরূপ মিথ্যা-শুক্তিরজতের সত্যত্ব এবং মিথ্যাত্ব এই দুইই মিথ্যা, এইরূপে অদ্বৈতবেদান্তী অনুমানমূলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে মাধ্ব বলেন, "যে বস্তুর যাহা আশ্রয় বলিয়া প্রতীত হয়, সেই আশ্রয় বা আধারে যাহার অত্যন্তাভাব থাকে, তাহাকেই মিথ্যা বলে"—প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্।" ইহাই অদ্বৈতবেদান্তোক্ত অন্যতম মিথ্যাত্বলক্ষণ। এই প্রতিযোগিত্ব

ধর্মটি ধর্মীর সত্যতাকে অপেক্ষা করে না। ধর্মী মিথ্যা হইলেও ধর্মীর সত্তানিরপেক্ষ যে ধর্ম, তাহা সত্যও হইতে পারে। এই অবস্থায় শুক্তিরজতরূপ মিথ্যা ধর্মীর সত্য এবং মিথ্যা এই উভয়প্রকার ধর্মই, স্বপ্নদৃষ্টগজের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের ন্যায় মিথ্যাই হইবে. এইরূপ অনুমান করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। মিথ্যা ধর্মীর ধর্ম— "মিথ্যাত্বোপেতধর্মিকত্বাৎ" [পূর্বোক্ত অনুমানের হেতু দেখুন ৪৮৭ পৃঃ.] এই হেতুটি শুক্তিরজতের সত্যত্ব এবং মিথ্যাত্ব এই উভয়বিধ ধর্মের মিথ্যাত্বসাধনে অপ্রয়োজকই হইয়া দাঁড়াইবে। দ্বিতীয়তঃ, স্বপ্নপরিদৃষ্ট গজের দৃষ্টান্তটি এক্ষেত্রে অচল। কেননা স্বপ্নদৃষ্টগজের অস্তিত্ব মিথ্যা হইলেও স্বপ্ন অবস্থায় গজ না থাকায়, গজের অত্যন্তাভাব তো মিথ্যা নহে. সত্যই বটে। পণ্ডিতগণ সত্য কথাই বলিয়া থাকেন :—

'ন স্বপ্নেঽপি দ্বয়ং মিথ্যা'. তত্রৈকং সত্যমেব হি।' অতএব আলোচিত অনুমানের 'স্বপ্নগজাস্তিত্ব-নাস্তিত্ববৎ' এই দৃষ্টান্তে গজের নাস্তিত্বের ক্ষেত্রে অনুমানের সাধ্য 'মিথ্যাত্ব' না থাকায়, দৃষ্টান্তটি অবশ্যই সাধ্যবিকল হইয়া পড়িবে।

অদ্বৈতবাদীর জগন্মিথ্যাত্বের অনুমান এইরূপে হীনবল বলিয়া প্রতিভাত হওয়ায়, জগতের সত্যতার সাধক "জগৎ সত্যং মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বাৎ" এইরূপ মাধ্ব অনুমানই জয়যুক্ত হইবে। প্রত্যক্ষতঃও পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের সত্যতাই অনুভূত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ পরিপুষ্ট মাধ্ব অনুমানও সুতরাং জগতের সত্যতাই সাধন করিবে।

জগতের মিথ্যাত্ব সত্য, না মিথ্যা, এই বিতর্কের উত্তরে মাধ্ব তার্কিকগণ বলেন :—

মিথ্যাত্বং যত্ত্ববাধ্যং স্যাৎ সদদ্বৈতমতক্ষতিঃ।
মিথ্যাত্বং যদি বাধ্যং স্যাৎ জগৎসত্যত্বমাপতেৎ॥

মিথ্যা বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বধর্মটি যদি অবাধ্য বা সত্য হয়, তবে পরব্রহ্মও সত্য, জগতের মিথ্যাত্বও সত্য, এইরূপে দুইটি সত্য বস্তু স্বীকার করায়, অদ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ থাকে না, দ্বৈতবাদই হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা বা বাধ্য হইলে, জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা, অর্থাৎ জগৎ সত্য, এই মাধ্বসিদ্ধান্তই আসিয়া পড়ে।

আলোচ্য মাধ্বসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, জগতের সত্যতা সাধনের উদ্দেশ্যে মাধ্বতার্কিকগণ "জগৎ সত্যং মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বাৎ আত্মবৎ," এইভাবে যে অনুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন, ঐ মাধ্ব-অনুমানের মূলে "একই ধর্মীতে (বিশেষ্য পদার্থে) পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি ধর্মের একটি মিথ্যা হইলে অপরটি অবশ্য সত্য হইবে" এইরূপ যে ব্যাপ্তি আছে, সেই ব্যাপ্তিটি ব্যভিচারী। ঐরূপ ব্যভিচারী ব্যাপ্তিমূলে মাধ্ব কোনমতেই জগতের সত্যতা সাধন করিতে পারেন না। একই বিশেষ্যে বা ধর্মীতে কল্পিত গোত্ব

মাধ্বোক্ত জগৎ-সত্যতার বিরুদ্ধে জগন্মিথ্যাত্ববাদী অদ্বৈতবেদান্তীর বক্তব্য

এবং অশ্বত্ব এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম দুইটির একটি (গোত্ব ধর্মটি) মিথ্যা হইলে অপরটি অশ্বত্ব ধর্মটি সত্য হইবে কি? গরু না হইলেই উহা যে ঘোড়া হইবে, উট, মহিষ প্রভৃতি হইবে না, তাহা কিরূপে নিশ্চয় করা যাইবে? 'গোত্বাভাববান্ অশ্বত্বাৎ' এইরূপ অনুমান করা চলিলেও, 'অশ্বত্ববান্ গোত্বাভাবাৎ' এইরূপ অনুমান তো চলিবে না। গরু না হইলে তাহা ঘোড়া না হইয়া, হাতী মহিষ প্রভৃতি অন্য যে কোন প্রাণীই তো হইতে পারে। মাধ্ব অনুমানের মৌলিক ব্যাপ্তিটি এইরূপে ব্যভিচারী বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায়, মাধ্বোক্ত জগতের সত্যত্বের অনুমান অচল হইয়া পড়িবে নাকি? যদি উল্লিখিত সামান্য ব্যাপ্তি স্বীকার না করিয়া, একই বস্তুতে (ধর্মীতে) সত্যত্ব এবং মিথ্যাত্ব এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের প্রসক্তি ঘটিলে, উহার একটি মিথ্যা ও অপরটি সত্য হইবে, এইরূপ বিশেষ ব্যাপ্তি স্বীকার করা যায়। তাহা হইলেও প্রদর্শিত মাধ্ব অনুমানে যে আত্মত্ব উপাধি হয় তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। মাধ্ব-অনুমানে জগতের সত্যতা সাধনে আত্মাকে যে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। কেননা, পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ সত্য হইলেও তাহা কোনমতেই আত্মার ন্যায় পরমার্থসৎ হইতে পারে না। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রপঞ্চেরই সমান সত্যতাবিশিষ্ট। এই অবস্থায় প্রপঞ্চের সত্যতাকে আত্মার ন্যায় পারমার্থিক বলা কোন প্রকারেই শোভন হয় না। তারপর, শুক্তিরজত প্রভৃতির মিথ্যাত্বকে মিথ্যা বলিয়া মাধ্বও স্বীকার করেন। শুক্তিরজতে মিথ্যাভূত-মিথ্যাত্বকত্বরূপ হেতু থাকায় এবং উক্ত অনুমানের সাধ্য যে সত্যত্ব তাহা মিথ্যা শুক্তিরজতে না থাকায়, শুক্তিরজতের ক্ষেত্রে মিথ্যাভূত-মিথ্যাত্বকত্বরূপ হেতু যে সাধ্য সত্যত্বের ব্যভিচারী হইবে; এবং তন্মূলে "মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্বং সত্যত্ব-ব্যভিচারি", এইরূপ ব্যভিচারানুমান করাও যে সম্ভবপর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? শুক্তিরজতরূপ ধর্মী মিথ্যা। সুতরাং তাহার সত্য মিথ্যা উভয়বিধ ধর্মই, স্বপ্নে পরিদৃষ্ট গজের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের ন্যায় মিথ্যাই হইবে। ফলে, "রজতমিথ্যাত্বং মিথ্যা, মিথ্যাভূতধর্মিকত্বাৎ, স্বপ্নপরিদৃষ্টগজাস্তিত্ব-নাস্তিত্ববৎ", এইরূপ অনুমান করাও চলিবে। এইরূপ অনুমানের ফলে শুক্তিরজতে মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব হেতুর সিদ্ধি হইবে বটে, কিন্তু মিথ্যা শুক্তিরজতের সত্যত্ব নাই বলিয়া, সাধ্য সত্যত্বের সিদ্ধি হইবে না। মিথ্যাভূত-

মিথ্যাত্বকত্ব হেতু যে সাধ্য সত্যত্বের ব্যভিচারী, তাহাই নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে। শুক্তিরজতরূপ ধর্মীর সত্যত্ব এবং মিথ্যাত্ব, এই উভয়বিধ ধর্মই মিথ্যা বলিয়া পূর্বোক্ত অনুমান বলে সাব্যস্ত হইলে, এক ধর্মীতে প্রসক্ত বিরুদ্ধ দুইটি ধর্মের একটি মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইবে, এইরূপ মাধ্বোক্ত জগৎসত্যত্বানুমানের মূল ব্যাপ্তিই অসিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। ঐরূপ অসিদ্ধ ব্যাপ্তিমূলে মাধ্ব জগতের সত্যতা কোন প্রকারেই সাধন করিতে পারিবেন না। জগৎ যে আত্মার ন্যায় সত্য নহে, ইহাই মাধ্ব-তার্কিকগণকে অগত্যা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

মাধ্বপ্রদর্শিত ব্যাপ্তির পরীক্ষা করিতে গিয়া আচার্য মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে বলিয়াছেন—"পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি ধর্মের একটি মিথ্যা হইলে অপরটি সত্য হইবে", এইরূপ ব্যাপ্তি কেবল সেরূপ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর যেখানে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের [নিষেধের মূলীভূত] ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হইবে এবং কোন এক ধর্মীতে তাহা বিরাজ করিবে না। 'শুক্তিতে রজত নাই' এইরূপে শুক্তিতে রজতের নিষেধ করিলে, সেখানে [নিষেধের মূলীভূত] ধর্ম হইবে রজতত্ব ; সেই শুক্তিতেই রজতত্বের অভাব নাই, এইরূপে রজতত্বের অভাব ব্যাখ্যা করিলে, সেইস্থলে নিষেধের মৌলিক ধর্ম হইবে রজতের অভাবত্ব। রজতত্ব এবং রজতত্বাভাব এই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম দুইটি কোন এক ধর্মীতে কদাচ থাকিবে না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে একের নিষেধে অপরের সত্যতা অবশ্যম্ভাবী। রজত না হইলে, সেখানে অবশ্য রজতের অভাবই থাকিবে ; পক্ষান্তরে, অরজত না হইলে, তাহা রজতই হইবে। রজতত্ব এবং রজতত্বাভাবের ন্যায়, রজতত্ব এবং রজতভিন্নত্বের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত যুক্তিরই প্রয়োগ করা চলিবে। একের (রজতের বা রজতভিন্নত্বের) নিষেধে অপরের সততাও সাধন করা চলিবে। পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থেরও নিষেধের মূলীভূত ধর্ম যদি বিভিন্ন না হয়, উভয়ের ক্ষেত্রে কোন একটি নিষেধের মৌলিক ধর্মের পরিকল্পনা যদি সম্ভবপর হয় এবং পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের অভাব কোন এক ধর্মীতে পাওয়া যায়, তবে সেক্ষেত্রে একতরের নিষেধ অপরের সত্যতা সাধন করা চলে না। গোত্ব এবং অশ্বত্ব, এই উভয়ই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম বটে। কিন্তু এই বিরুদ্ধ দুইটি ধর্মেরই অভাব গজে দেখিতে পাওয়া যায়। গজের

অত্যন্তাভাবস্বরূপ ধর্ম—গরু এবং অশ্ব এই উভয় ধর্মীতেই বিরাজ করে। এই অবস্থায় একের নিষেধে অপরের সত্যতা কল্পনা করা চলে না। গরু না হইলেই তাহা যে ঘোড়া হইবে, কিংবা ঘোড়া না হইলেই তাহা যে গরু হইবে, হাতী, মহিষ, উট প্রভৃতি অন্য কোন প্রাণী হইবে না, তাহা কে বলিল? অদ্বৈতবেদান্তের মতে জগৎ যেমন মিথ্যা, মিথ্যা জগতের মিথ্যাত্বও তেমনই মিথ্যা। এই মিথ্যাত্বের হেতু হইল দৃশ্যত্ব। 'দৃশ্যত্ব' হেতুমূলে অদ্বৈতবাদী জগতের মিথ্যাত্বের অনুমান করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। জগতের মিথ্যাত্বের অবচ্ছেদক (determinant) এই দৃশ্যত্ব ধর্মটি জগতেও আছে এবং তাহার মিথ্যাত্বেও আছে (অর্থাৎ মিথ্যাত্বের অবচ্ছেদক ধর্মটি উভয়বৃত্তি হইয়াছে), এইজন্যই জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও, জগতের সত্যতার প্রশ্ন আসে না।[১] জগতের সত্যত্ব এবং মিথ্যাত্ব রজতত্ব এবং রজতত্বাভাবের ন্যায় পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ নহে; কিংবা রজতত্ব এবং রজতভিন্নত্বের ন্যায় পরস্পর বিরহব্যাপকও নহে। সুতরাং জগতের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের একতরের নিষেধে অপরের সত্যতা কল্পনা করাও সম্ভবপর নহে।

আরও কথা এই যে, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও তাহা দ্বারা বিশ্বপ্রপঞ্চের সত্যতা সাধন করা যায় না। কেননা, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বও প্রপঞ্চের ন্যায়ই মিথ্যা [সামানসত্তাক]। প্রপঞ্চ থাকিতে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের নিবৃত্তিও সুতরাং অসম্ভব কথা। যাহার ফলে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের নিবৃত্তি হইবে, তাহার বলে প্রপঞ্চেরও নিবৃত্তি ঘটিবে। সেই অবস্থায় ধর্মী প্রপঞ্চ না থাকিলে, প্রপঞ্চের সত্যতা থাকিবে কোথায়? প্রপঞ্চই থাকিবে না, তাহার ধর্ম থাকিবে কিরূপে? ফলে, মাধ্বোক্ত 'মিথ্যাভূতমিথ্যাত্বকত্ব' হেতুটি জগতের সত্যতাসাধনে অপ্রয়োজকই হইয়া দাঁড়াইবে। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের ন্যায় প্রপঞ্চের সত্যতাও প্রপঞ্চের তুল্যই ব্যাবহারিক বটে। প্রপঞ্চের

১। মিথ্যাত্বমিথ্যাত্বেঽপি প্রপঞ্চসত্যত্বানুপপত্তেঃ। তত্র হি বিরুদ্ধয়োর্ধর্ময়োরেকতর-মিথ্যাত্বে অপরসত্যত্বং, যত্র নিষেধ্যতাবচ্ছেদকমুভয়বৃত্তি ন ভবেৎ; যথা চ পরস্পর-বিরহরূপয়োঃ রজতত্বতদভাবয়োঃ শুক্তৌ, যথাবা পরস্পরবিরহব্যাপকয়োঃ রজতভিন্নত্বরজতত্বয়োঃ তত্রৈব; তত্র নিষেধ্যতাবচ্ছেদকভেদনিয়মাৎ, প্রকৃতে তু নিষেধ্যতাবচ্ছেদকমেকমেব দৃশ্যত্বাদি, যথা গোত্বাশ্বত্বয়োরেকস্মিন্ গজে নিষেধে গজাত্যন্তাভাবব্যাপ্যত্বং নিষেধ্যতাবচ্ছেদকমুভয়োস্তুল্যমিতি নৈকতরনিষেধে অন্যতর-সত্যত্বং তদ্বৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি, ২১২-২১৩ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং।

তুল্যসত্তাক ঐরূপ সত্যত্ব এবং মিথ্যাত্ব এই উভয়েরই অভাব অলীক আকাশকুসুম প্রভৃতিতে দেখা যাইবে। আকাশকুসুম অলীক, তাহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে। সুতরাং প্রপঞ্চের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বকে (রজতত্ব ও তদভাবের ন্যায়) পরস্পর বিরহরূপ বলিয়া কোন মতেই ব্যাখ্যা করা যাইবে না। এইজন্য প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও জগতের সত্যতার প্রশ্ন উঠিবে না। একই বাধক জ্ঞানের দ্বারা যাহা বাধিত হয়, তাহাদিগেরই সত্যতা সমান বলিয়া বুঝা যায়। এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম বোধের উদয় হইলে, বিশ্বপ্রপঞ্চ ও উহার মিথ্যাত্ব, সত্যত্ব প্রভৃতিরও বাধ হইয়া যাইবে; অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই বিরাজ করিবে। তখন জগৎই থাকিবে না; জগতের ধর্ম সত্যতাও থাকিবে না।[১]

দৃশ্যমান বস্তুমাত্রকে অদ্বৈতবেদান্তী মিথ্যা বলেন। 'জগৎ মিথ্যা-দৃশ্যত্বাৎ', ইহাই অদ্বৈতবাদীর জগতের মিথ্যাত্বের সাধক অনুমান। এই অনুমানের যৌক্তিকতা আমারা পূর্বেই বিশদভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছি। এই মিথ্যা জাগতিক বস্তুরাজি সত্য নহে, আবার ইহারা আকাশকুসুম প্রভৃতির ন্যায় অত্যন্ত অসৎও নহে। সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব, এই দুইটি ধর্ম অদ্বৈতবেদান্তের মতে পরস্পারের অভাবস্বরূপ নহে। সত্ত্বের অভাবই অসত্ত্ব, অসত্ত্বের অভাবই সত্ত্ব, সত্ত্ব ও অসত্ত্বের এইরূপ অর্থ অদ্বৈতবেদান্তীর অভিপ্রেত নহে। যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিনকালের কোন কালেই বাধিত হয় না, তাহাই সত্য; পরব্রহ্মই সুতরাং একমাত্র সত্য; এবং যাহা কদাচ সত্য বলিয়া প্রতীতির গোচর হয় না, তাহাই অসত্য; আকাশকুসুম প্রভৃতিকেই অত্যন্ত অসৎ বলিয়া জানিবে। জাগতিক বস্তুসকল মিথ্যা হইলেও তাহা 'ইদংরূপে' প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে বলিয়া, মিথ্যা জাগতিক বস্তু আকাশকুসুম প্রভৃতির ন্যায় অত্যন্ত অসৎ নহে; অসৎ আকাশকুসুম হইতে তাহা বিলক্ষণ বা বিসদৃশ। নশ্বর বলিয়া অবিনশ্বর পরব্রহ্ম হইতেও বিশ্বপ্রপঞ্চ বিলক্ষণ। এইরূপ 'সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব'ই বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব, ইহা আমরা পদ্মপাদোক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের বিচার প্রসঙ্গেই বিস্তৃতভাবে

১। একবাধকবাধ্যত্বং চ সমসত্তাকত্বে প্রয়োজকম্‌……অস্তি চ প্রপঞ্চ তন্মিথ্যাত্বয়োরেক-ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্যত্বম্‌। অতঃ সমানসত্তাকত্বান্মিথ্যাত্ববাধকেন-প্রপঞ্চস্যাপি বাধান্নাদ্বৈত-ক্ষতিরিতি।

অদ্বৈতসিদ্ধি, ১২১-২২ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং।

আলোচনা করিয়াছি। মিথ্যাত্বের উভয়বাদিসম্মত দৃষ্টান্ত শুক্তিরজতও সম্মুখস্বরূপে প্রতীতিগোচর হয় বলিয়া শশবিষাণ প্রভৃতির ন্যায় অসৎ নহে, পরব্রহ্মের ন্যায় উহা অত্যন্ত সৎও নহে। সৎ ও অসৎরূপে নির্বচনের অযোগ্য শুক্তিরজত যেমন 'অনির্বচনীয়', ঘটাদি বিশ্বপ্রপঞ্চও সেইরূপই অনির্বচনীয়। আর ইহারই অপর নাম মিথ্যা।[১]

জগৎ মিথ্যা, জাগতিক বিভেদ ও মিথ্যা

অদ্বৈতবেদান্তী কেবল জগৎকে মিথ্যা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি জাগতিক সর্ববিধ ভেদকেই মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। মাধ্ব বস্তুভেদের সত্যতাই সমর্থন করিয়া থাকেন। ফলে, উভয়ের সিদ্ধান্ত বিপরীত খাতে প্রবাহিত হইয়া জনচিত্ত প্লাবিত করিয়াছে। জগতের ব্যাবহারিক সত্যতাও সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করিলে যে উভয় মতের মধ্যে সামঞ্জস্যের সূত্র আবিষ্কার করা যায়, তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। গতিশীল ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল জগৎ যে ধ্রুব-সত্য হইতে পারে না, তাহা মনীষিমাত্রেই অনুভব করেন। এই অবস্থায় গতিশীল জগৎকে ব্যাবহারিক ভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করাই তো স্বাভাবিক। অদ্বৈতবেদান্তীও তাহাই করিয়াছেন। দৃশ্যমান বিশ্বকে মরীচিকা বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। প্রাতিভাসিক অপেক্ষা ব্যাবহারিক বস্তুরাজির সত্যতাও যুক্তিবলে সমর্থন করিয়াছেন।

ফলে, জগতের সত্যতাবাদী দার্শনিকের সহিত অদ্বৈতবাদের যে কোনরূপ গুরুতর মতবিরোধ দেখা দেয় নাই, সুধী পাঠক তাহা অবশ্য লক্ষ্য করিবেন।

১। আলোচ্য মিথ্যাত্বমিথ্যাত্বের নির্বচনে আমরা মঃ মঃ পণ্ডিত ৺যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থমহাশয়ের অদ্বৈতসিদ্ধির 'তাৎপর্য' হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শঙ্করবেদান্ত ও বৌদ্ধমতের তুলনা

অদ্বৈতবেদান্তোক্ত মায়াবাদ ও মায়াময় জগতের স্বরূপ আমরা আলোচনা করিলাম এবং দেখিলাম মায়া বিশ্বজননী কল্যাণী প্রকৃতি হিসাবে ভারতীয় সকল শ্রেষ্ঠ দার্শনিকেরই অনুমোদন লাভ করিয়াছে। মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে জগৎ-প্রসূতি মায়ার বিরুদ্ধে নহে; তাহা হইল মায়াকে যে অদ্বৈতবেদান্তে 'অনির্বচনীয়' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেই অনির্বাচ্যতাবাদেরই বিরুদ্ধে। এই অনির্বাচ্য মায়াবাদ রামানুজ, মাধ্ব, মাধবমুকুন্দ প্রভৃতির দুর্বার আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রীহর্ষ, চিৎসুখ, মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ ধুরন্ধর অদ্বৈতাচার্যগণ তর্কের ভিত্তিতে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদেই দেখিয়া আসিয়াছি। এখন প্রশ্ন এই, যেই অনির্বাচ্যবাদের উপর শঙ্করদর্শনের ভিত্তি সেই অনির্বাচ্যবাদ কি শঙ্করেরই নিজস্ব সিদ্ধান্ত, না তিনি ইহা ধার করিয়াছেন মহাযান বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে? প্রতীচ্য এবং প্রাচ্যের অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি মনে করেন—আলোচ্য অনির্বাচ্য মায়াবাদ

অনির্বাচ্য মায়াবাদ বৌদ্ধদর্শন হইতে আহৃত কি না?

বৌদ্ধ দার্শনিকগণেরই নিজস্ব অবদান। 'লঙ্কাবতার সূত্র' প্রভৃতি সুপ্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে অনির্বাচ্যবাদের মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই সূত্রকে অবলম্বন করিয়াই আচার্য শঙ্কর স্বীয় দর্শনে অনির্বাচ্য মায়াবাদের চিন্তা-কুসুমদাম রচনা করিয়াছেন। কেবল এই অনির্বাচ্য মায়াবাদ সম্পর্কেই নহে, প্রপঞ্চ মিথ্যাত্ব প্রভৃতি মতবাদ সম্পর্কেও মহাযান বৌদ্ধের নিকট শঙ্‌করের ঋণ অপরিশোধ্য। এই শ্রেণির সমালোচকগণ এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন যে, তাঁহাদের মতে আচার্য শঙ্‌করের কোন নিজস্ব দর্শন নাই। শঙ্‌কর-দর্শন বাস্তবিকপক্ষে বৌদ্ধদর্শনেরই প্রচ্ছন্নরূপ। আচার্য শঙ্‌করও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

"মায়াবাদমসৎশাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।"

এই পদ্মপুরাণের উক্তিতেও ঐরূপ মতবাদেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

দার্শনিক চিন্তার রত্নভাণ্ডারে আচার্য শঙ্করের কোন নিজস্ব দান আছে কি না? উল্লিখিত সমালোচনার মূল্য কতটুকু তাহা যাচাই করিবার জন্য প্রথমেই শঙ্করদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন, এই উভয় দর্শনের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব কি? তাহার তুলনামূলক আলোচনা অবশ্য কর্তব্য।

শঙ্করদর্শন ও বৌদ্ধদর্শনের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব

বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যগণকে যে চারিটি আর্য সত্যের উপদেশ করিয়াছিলেন, যাহার উপরে বৌদ্ধদর্শনের বিরাট চিন্তাসৌধ দাঁড়াইয়া আছে তাহা হইল :—

বৌদ্ধদর্শনের পটভূমিকা

(১) "সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং (২) দুঃখং দুঃখং
(৩) স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং (৪) শূন্যং শূন্যম্"।

শূন্যতাই দেখা যাইতেছে বৌদ্ধদর্শনের শেষ কথা। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যগণের অধিকার, রুচি এবং ধীশক্তির তারতম্য উপলব্ধি করিয়াই শিষ্যমণ্ডলীকে ভিন্নরূপ দেশনা বা উপদেশ প্রদান করেন। অদ্বিতীয় শূন্যতাই একমাত্র তত্ত্ব, ইহাই ভগবান্ বুদ্ধের তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি চরম ও পরম উপদেশ।[১] এই শূন্যবাদ মাধ্যমিকসম্প্রদায় বিবৃত করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদী যোগাচার সম্প্রদায় ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদই বুদ্ধদেবের অভিমত তত্ত্ব বুঝিয়া সাকার বিজ্ঞানবাদই বৌদ্ধসিদ্ধান্তরূপে প্রচার করিয়াছেন।[২] এই কল্যাণী জগল্লক্ষ্মীকে যাঁহারা একান্তশূন্য বা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে ভয় পান, সেই সকল স্থূলধী শিষ্যগণের অভিরুচি অনুসারে তাঁহাদের নিকট রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময়ী বিচিত্রা এই ধরিত্রীর সত্যতা বুদ্ধদেব অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞেয়বিষয়ের অস্তিত্ব বৌদ্ধোক্তির রহস্য বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং সর্বপ্রকার বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ায়, তাঁহারা উভয়েই 'সর্বাস্তিবাদী' বলিয়া

১। দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগা।
ভিন্নাঽপি দেশনাঽভিন্না শূন্যতাদ্বয়লক্ষণা॥
বোধিচিত্তবিবরণ।

২। তত্রার্থশূন্যং বিজ্ঞানং যোগাচারাঃ সমাশ্রিতাঃ।
তত্রাপ্যভাবমিচ্ছন্তি যে মাধ্যমিকবাদিনঃ॥
শ্লোকবার্ত্তিক, নিরালম্বনবাদ

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।[১] সৌত্রান্তিকের মতে বাহ্যপদার্থ প্রত্যক্ষগম্য নহে, জ্ঞানের বৈচিত্র্য দেখিয়া ঐ বৈচিত্র্যের সাধন বাহ্যবস্তুর অনুমান-জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। বৈভাষিকের মতে বাহ্য বস্তুসকল পরমাণুপুঞ্জমাত্র হইলেও, উহাদিগকে প্রত্যক্ষতঃই জানা যায়। বৈভাষিক তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বাহ্যপদার্থের প্রত্যক্ষতাবাদী, সৌত্রান্তিক বাহ্যবস্তুর অনুমেয়তাবাদী। সর্বাস্তিবাদী সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক বৌদ্ধসম্প্রদায় 'হীনযান' আখ্যা লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদী যোগাচার এবং শূন্যবাদী মাধ্যমিক 'মহাযান' বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত। সর্বাস্তিবাদী হীনযান বৌদ্ধসম্প্রদায় বর্তমানে হীন-প্রভ হইলেও, এক সময়ে ইঁহারা বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়া সর্বাস্তিবাদই বৌদ্ধসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় ভারতীয় বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে এবং প্রাথমিক যুগে ইঁহাদের বিশেষ অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল বলিয়াও জানা যায়। সেই যুগে ইঁহারা নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ভারতের বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভারতের বাহিরেও ইঁহাদের প্রভাব লক্ষিত হইত। কিন্তু কালক্রমে মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিশেষ অভ্যুদয় ঘটিলে, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, নাগার্জুন, দিঙ্‌নাগ, স্থিরমতি, ধর্মকীর্তি, শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতি বৌদ্ধতার্কিকগণের অসামান্য পাণ্ডিত্যপ্রভাবে বিজ্ঞানবাদ এবং শূন্যবাদেরই বিশেষ প্রচার এবং প্রসার ঘটে। মহাযানসম্প্রদায়ের সঙ্ঘর্ষে হীনযান হীনপ্রভ হয়। হীনযান সম্প্রদায়ের কোন কোন আচার্য স্বীয় মত ও পথ পরিত্যাগ করিয়া মহাযান-মতের অনুসরণ করেন। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য অসঙ্গের কনিষ্ঠ সহোদর বসুবন্ধু প্রথমে হীনযান-বৌদ্ধমতেরই অনুগামী ছিলেন এবং সর্বাস্তিবাদী বৈভাষিকের মতই সমর্থন করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর অসঙ্গ কর্তৃক বিজ্ঞানবাদী যোগাচারমতে দীক্ষিত হইয়া মহাযান-সম্প্রদায়ের পথই বাছিয়া লন এবং অন্যতম দিক্‌পাল বিজ্ঞানবাদী আচার্য বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সর্বাস্তিবাদ যে প্রকৃত বৌদ্ধসিদ্ধান্ত নহে তাহা বসুবন্ধু তৎকৃত বিংশিকা এবং ত্রিংশিকা কারিকায় অসংকোচে

১। রূপাদ্যায়তনাস্তিত্বং তদ্‌বিনেয় জনং প্রতি।
অভিপ্রায়বশাদুক্তমুপপাদকসত্ত্ববৎ॥

বসুবন্ধুর বিংশিকা কারিকা, ৮।

ঘোষণা করিয়াছেন। বৌদ্ধতার্কিক দিঙ্‌নাগ প্রথম জীবনে হীনযান-সম্প্রদায়ের আচার্য নাগদত্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সর্বাস্তিবাদী হীনযান-মতেরই পোষকতা সম্পাদন করেন। পরে মহাযান-মতের ক্রমিক অভ্যুদয়ের ফলে হীনযান-পথের দৌর্বল্য দেখা দিলে, বসুবন্ধুর পাণ্ডিত্যের প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া দিঙ্‌নাগ বসুবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বিজ্ঞানবাদের প্রচারেও প্রসারে যত্নশীল হন। এইরূপে আচার্যগণের মত ও পথত্যাগে হীনবল হীনযান-সম্প্রদায় প্রাচীন কালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিলেও পরবর্তী কালে বিজ্ঞানবাদের সঙ্ঘর্ষে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। তাঁহাদের সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হয়। মতের পরিপোষক গ্রন্থরাজি বিলুপ্ত হইয়া যায়। শুনা যায়, হীনযান বৌদ্ধমতের আঠারটি সম্প্রদায় ছিল। ঐসকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমানে স্থবিরবাদী (থেরাবাদী) সম্প্রদায়েরই এখন কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য সম্প্রদায় প্রায় সকলই মহাকালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। সর্বাস্তি-বাদী "সাংমতীয়"সম্প্রদায়ের সাহিত্যসম্পদ্ বিলুপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদের মতের মূল বক্তব্য কি ছিল তাহা এখন আর জানিবার উপায় নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ সম্প্রদায়ের অনুমোদিত ধর্ম অনেকাংশে বৈদিক ধর্মের তুল্য ছিল এবং তাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন।*

সর্বাস্তিবাদী সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য বাহ্যপদার্থকে "পরমাণুপুঞ্জ"মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিরবয়ব পরমাণুর পুঞ্জ সমর্থন করিয়াও উহারা ন্যায়-বৈশেষিকের দৃষ্টিতে পুঞ্জের অতিরিক্ত স্থির অবয়বী সমর্থন করেন নাই, ইহা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় ব্যক্ত হইবে। বহির্বিশ্বের তাবদ্‌বস্তুকে "পরমাণু-পুঞ্জ"মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করায়, তাঁহাদের সহিত বিজ্ঞান-বাদী বসুবন্ধু প্রভৃতির তুমুল তর্কযুদ্ধ চলিতে থাকে। আচার্য বসুবন্ধু 'বিংশিকা' এবং 'ত্রিংশিকা কারিকা'য় বৈভাষিকোক্ত পুঞ্জমাত্রবাদ খণ্ডন করিয়া, বিজ্ঞানবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য স্থিরমতি বসুবন্ধুর কারিকার

বাহ্যপদার্থ পরমাণু-পুঞ্জমাত্র এই মতের সমর্থন ও খণ্ডন

* মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশের ন্যায়দর্শনের টিপ্পনী, ৫ম খণ্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধদেব যে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন তাহা আমরা এই পুস্তকের ১ম পরিচ্ছেদে বৌদ্ধোক্ত নৈরাত্ম্যবাদের আলোচনায় প্রকাশ করিয়াছি।

উপর ভাষ্য রচনা করিয়া বসুবন্ধুর গূঢ় উক্তির ব্যাখ্যা করেন এবং এইরূপে বিজ্ঞানবাদের ভিত্তি দৃঢ় করেন। পরমাণুপুঞ্জের খণ্ডনে বসুবন্ধু বিংশিকা কারিকায় বলিয়াছেন, বহির্বিশ্বকে বৈশেষিকের দৃষ্টিতে অবয়বিরূপ একও বলা যায় না, অনেক পরমাণুও বলা যায় না, পরমাণুর সমষ্টি বা পুঞ্জও বলা যায় না। কেননা, সর্বাস্তিবাদীর নিরবয়ব পরমাণুপদার্থই সিদ্ধ হয় না—'পরমাণুর্নসিধ্যতি'। বিংশিকা কাঃ ১১। নিরবয়ব পরমাণুই অসিদ্ধ হইলে, ঐরূপ পরমাণুর সমষ্টি বা পুঞ্জ সম্ভব হইবে কিরূপে? নিরবয়ব পরমাণুর অসিদ্ধি ঘোষণা করিয়া বসুবন্ধু বলিয়াছেন :—

পরমাণুপুঞ্জের খণ্ডনে বিজ্ঞানবাদীর বক্তব্য

ষট্‌কেন যুগপদ্‌যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা।
ষণ্ণাং সমানদেশত্বাৎ পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ ॥

বসুবন্ধুকৃত বিংশিকা কারিকা ১২।

তাৎপর্য এই—একটি পরমাণু মধ্যস্থলে অবস্থিত আছে। এমন সময় উহার আকর্ষণে মধ্যস্থিত পরমাণুটির বামে ও দক্ষিণে আরও দুইটি পরমাণু আসিয়া সংযুক্ত হইল এবং এইরূপে মধ্যবর্তী পরমাণুর ব্যবধান রচনা করিল। ইহার দ্বারা এইরূপ অনুমান করা অসম্ভব নহে যে, বাম এবং দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত পরমাণু দুইটি মধ্যে অবস্থিত পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হওয়ায়, উহারা মধ্যবর্তী পরমাণুর অবয়ব হিসাবেই গণ্য হইবে। এই ভাবে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ, ঊর্ধ্ব এবং অধোদেশে অবস্থিত পরমাণুর সহিত মধ্যবর্তী পরমাণুর যোগ ঘটায়, পরমাণুর ছয়প্রকার অবয়ব আছে, পরমাণু ষড়্‌বিধ-অবয়ববিশিষ্ট একটি অবয়বী এই সিদ্ধান্তই আসিয়া দাঁড়ায়; পরমাণু নিরবয়ব ইহা কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ছয়টি পরমাণুর সংযোগ ছয়প্রকার বিভিন্ন প্রদেশে ঘটিয়াছে বলিয়া সর্বপ্রকার পরমাণুই সাবয়ব এবং ষড়ংশশালী এইরূপ সিদ্ধান্তই নির্বিবাদে মানিয়া লইতে হয়। ইহাতে পরমাণুর পরম-অণুত্বই ব্যাহত হয় নাকি? এই অবস্থায় মধ্যে অবস্থিত পরমাণুর কোনরূপ প্রদেশভেদ স্বীকার না করিয়া মধ্যবর্তী পরমাণুর সহিত অপরাপর ছয়টি পরমাণুর একই সময়ে সংযোগ স্বীকার করিতে গেলে, ঐ সাতটি পরমাণুর যোগে যে পরমাণু-পুঞ্জ (বা পিণ্ড) উৎপন্ন হইবে, তাহা পরমাণু-পরিমাণই হইবে—"পিণ্ডঃস্যাদণুমাত্রকঃ।" কোনপ্রকারেই তাহা স্থূল

বা দৃশ্য হইবে না। পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থাকিলেই বিভিন্ন প্রদেশের সহিত অপরাপর পরমাণুর সংযোগবশতঃ উৎপন্ন দ্রব্যের স্থূলত্ব, বিস্তৃতি প্রভৃতি ঘটিতে পারে। পরমাণুর প্রদেশভেদ না থাকিলে, উৎপন্ন দ্রব্যের প্রথিমা জন্মিতেই পারে না। একই প্রদেশে বহু পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করিলেও তাহাদ্বারা বস্তুর স্থূলত্ব ব্যাখ্যা করা যায় না। সত্য কথা এই যে, একই প্রদেশে বহু পরমাণুর সংযোগ জন্মিতেই পারে না। বিভিন্ন প্রকার সংযোগের জন্য পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশই আবশ্যক হয়। ফলে, অণুর সহিত অপর কোনও অণুর সংযোগ ব্যাখ্যা করিতে হইলে, পরমাণুকে সাবয়ব বলিয়াই সেরূপ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত করিতে হয়, নিরবয়ব বলা কোনমতেই চলে না।

আচার্য শঙ্কর তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ভাষ্য, ২।২।১২) ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত 'পরমাণুকারণবাদে'র খণ্ডনেও এই কথাই বলিয়াছেন। বৈশেষিক আচার্যগণ দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক নামক নবীন অবয়বীর উৎপত্তি ঘটে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। পরমাণুর সহিত পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করায়, বৈশেষিকমতেও পরমাণুকে সাবয়ব বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। কারণ, নিরবয়ব পরমাণুর সহিত নিরবয়ব অপর পরমাণুর সংযোগই জন্মিতে পারে না। সংযোগ হইতে গেলেই কোনও বিশেষ অবয়ব বা প্রদেশের সহিতই অন্য একটি পরমাণুর সংযোগ ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে। পরমাণু নিরবয়ব হইলে অর্থাৎ পরমাণুর কোনরূপ অবয়ব বা অংশ না থাকিলে, সংযোগ সেখানে জন্মিতেই পারে না। ফলে, দুইটি পরমাণুর যোগে দ্ব্যণুক প্রভৃতির উৎপত্তিও অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। পরমাণুর সহিত পরমাণুর সংযোগ আছে বলিয়াই পরমাণু যে সাবয়ব, নিরবয়ব নহে, এই সিদ্ধান্ত না মানিয়া উপায় নাই। যদি পরমাণুর প্রদেশভেদ না মানিয়া এক পরমাণুর অপর পরমাণুর সহিত সংযোগ স্বীকার করা যায়, তবে সংযুক্ত পরমাণুও অণুপরিমাণই হইবে, স্থূল দৃশ্যপদার্থ হইবে না—ইহাই বসুবন্ধুর ন্যায় আচার্য শঙ্করেরও বক্তব্য বুঝা যায়।[১]

১। সংযোগশ্চাণোরণ্বন্তরেণ সর্বাত্মনা বাস্যাদেকদেশেন বা। সর্বাত্মনা চেদুপচয়ানুপপত্তেরণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গো দৃষ্টবিপর্যয়প্রসঙ্গশ্চ; প্রদেশবতো দ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগস্য দৃষ্টত্বাৎ। একদেশেন চেৎ সাবয়বত্বপ্রসঙ্গঃ।

ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য, ২।২।১।

কাশ্মীরদেশীয় বৈভাষিক আচার্যগণ অসংহত প্রত্যেক পরমাণুতে সংযোগ অস্বীকার করিয়াও, পরমাণুপুঞ্জে সংযোগ স্বীকার করিয়া স্বীয় মত সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ প্রচেষ্টা যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া আচার্য বসুবন্ধু তাহা অনুমোদন করেন নাই, খণ্ডনই করিয়াছেন। বসুবন্ধু বলিয়াছেন, প্রত্যেক পরমাণুতে সংযোগ অসম্ভব হইলে, পরমাণুর পুঞ্জ বা সমষ্টিতেও সংযোগ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। কেননা, ঐ পুঞ্জ বা সমষ্টি তো নিরবয়ব প্রত্যেক পরমাণু হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নহে; ব্যষ্টিরই তাহা কল্পিত সামগ্রিক্ রূপমাত্র। নিরবয়ব ব্যষ্টিতে সংযোগ না থাকিলে, ঐরূপ পরমাণুর সমষ্টি বা পুঞ্জের কল্পনাই তো সম্ভবপর নহে।[১] এই অবস্থায় পরমাণুর পুঞ্জের কল্পনা করিতে হইলে, পরমাণুর প্রদেশভেদেরও কল্পনা না করিয়া উপায় নাই। ফলে, পরমাণু সর্বাস্তিবাদী বৈভাষিক প্রভৃতির সিদ্ধান্তে সাবয়ব পদার্থই হইয়া দাঁড়াইবে, নিরবয়ব বস্তু হইবে না। পূর্ব ও অপর প্রভৃতি দিগ্‌ভেদ ও প্রদেশভেদ থাকায়, 'পরমাণু এক' এইরূপ পরমাণুর একত্বের কল্পনাও অসম্ভব হইবে। পরমাণু এক এবং নিরবয়ব হইলে, তাহার (পরমাণুর) কোনরূপ দিগ্‌দেশভেদ না থাকিলে, সূর্যোদয়ে পরমাণুর একাংশে আলোকপাত, অপর অংশে ছায়া প্রভৃতি কোনমতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। পরমাণুপুঞ্জ বা সমষ্টি সম্ভব হইলেই ঐ সংহত বা পুঞ্জীভূত পরমাণুর আংশিক আলোকসম্পাত, অংশতঃ ছায়া প্রভৃতি সম্ভবপর হয়। কিন্তু নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগই যে নিরবয়বত্বনিবন্ধন সম্ভব হইবে না—

নহি পরমাণবঃ সংযুজ্যন্তে নিরবয়বত্বাৎ। বসুবন্ধুকৃত বৃত্তি।

এই সকল রহস্যই বসুবন্ধু তদীয় কারিকায় উল্লেখ করিয়াছেন:—

দিগ্‌ভাগভেদো যস্যাস্তি তস্যৈকত্বং ন যুজ্যতে।
ছায়াবৃতী কথং বাঽন্যো ন পিণ্ডশ্চেন্ন তস্য তে॥

বসুবন্ধুর বিংশিকা কারিকা, ১৪ কাঃ।

বসুবন্ধুর উল্লিখিত অভিমত সমর্থন করিতে গিয়া বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য শান্তরক্ষিত তদীয় 'তত্ত্বসংগ্রহে' বলিয়াছেন—

।বিভিন্নদিক্ অবস্থিত পরমাণুসমূহ যদি একই মধ্যবর্তী পরমাণুর প্রতি

১। পরমাণোরসংযোগে তৎসংঘাতোঽস্তি কস্য কঃ।
নচানবয়বত্বেন তৎসংযোগো ন সিধ্যতি॥ ১৩।

বসুবন্ধুকৃত বিংশিকা কারিকা।

আকৃষ্ট ও বাধিত হইয়া পরস্পর সংহতভাবে অবস্থান করতঃ পরমাণু-পুঞ্জের সৃষ্টি করে, তবে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ ও দেশ হইতে আগত পরমাণু সকল মধ্যে অবস্থিত পরমাণুর বিভিন্ন প্রদেশেই সংযুক্ত হইবে। এই অবস্থায় পরমাণুর নিরবয়বত্ব ও একত্ব ব্যাহত হইবে এবং স্থূলত্ব এবং সাবয়বত্বই প্রতীতিগোচর হইবে। পক্ষান্তরে, পরমাণুর একই প্রদেশে বিভিন্ন কোণ হইতে আগত পরমাণুসমূহের সংযোগ স্বীকার করিলে, পরমাণু-পুঞ্জের প্রথিমা বা স্থূলত্ব জন্মিতেই পারে না। সেরূপ ক্ষেত্রে দিগন্তবিসারী হিমগিরি প্রভৃতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা যাইবে কিরূপে?[১] সুতরাং পরমাণুকে একও বলা যায় না। অনেকও বলা যায় না। যাহা একও নহে, অনেকও নহে, তাহা সৎ পদার্থ হইতে পারে না। উহা আকাশকুসুমের ন্যায় অসৎ পদার্থ। আকাশকুসুম যেমন অলীক, এক ও অনেকস্বভাবরহিত পরমাণুও সেইরূপ অলীকই হইয়া দাঁড়ায়। আচার্য শান্তরক্ষিতের এই যুক্তি তদীয় শিষ্য কমলশীল 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকায়' বিবিধ দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া সমর্থন করিয়াছেন। 'তত্ত্বসংগ্রহে'র টীকাকার কমলশীল তদীয় 'তত্ত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা'য় পরমাণুবাদী বৈভাষিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও পরমাণুর পুঞ্জ প্রভৃতি সম্পর্কে যে নানাপ্রকার মতভেদ ছিল তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত পঞ্জিকাপাঠে আমরা বৈভাষিকসম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত তিনটি প্রধান মতের পরিচয় পাই।

(১) কোনও বৈভাষিকের মতে পরমাণুসমূহ পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই অবস্থান করে। (২) কেহ কেহ বলেন, পরমাণুসকল একত্রিত হইয়া পুঞ্জের সৃষ্টি করিলেও, পুঞ্জের অন্তরালবর্তী পরমাণুসকল একে অপরকে স্পর্শ করে না। কাছাকাছি থাকিলেও এক পরমাণুর সহিত অপর পরমাণুর যোগ ঘটে না, পরস্পর ব্যবধান থাকিয়াই যায়। (৩) কাহারও কাহারও মতে পরমাণু-

১। সংযুক্তং দূরদেশস্থং নৈরন্তর্যব্যবস্থিতম্।
একাণ্বভিমুখং রূপং যদণোর্মধ্যবর্তিনঃ॥
অণ্বন্তরাভিমুখ্যেন তদেব যদি কল্প্যতে।
প্রচয়োভূধরাদীনামেবং সতি ন যুজ্যতে॥
অণ্বন্তরাভিমুখ্যেন রূপচ্ছেদস্তদিষ্যতে।
কথং নাম ভবেদেকঃ পরমাণুস্তথা সতি॥
শান্তরক্ষিত-তত্ত্বসংগ্রহ, গাইকোয়াড্ ওরিয়েণ্টাল্ সিরিজ্, ৫৫৬ পৃঃ।

সমূহ মিলিত হইয়া পুঞ্জের সৃষ্টি হইলে, পুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত, পরস্পর অতিসন্নিহিত পরমাণুর মধ্যে আর কোনরূপ ব্যবধান থাকে না; পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন বা স্পর্শ করিয়াই বিরাজ করে।

উল্লিখিত তিনটি মতের মধ্যে প্রথম মতটি ভদন্ত শুভগুপ্তের অনুমোদিত বলিয়া জানা যায়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মতটি কোন্ বৈভাষিকসম্প্রদায়ের অভিপ্রেত তাহা এখন নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কমলশীল তাঁহার তত্ত্ব-সংগ্রহ পঞ্জিকায়ও এসম্পর্কে স্পষ্টতঃ কিছু বলেন নাই। তবে এই ত্রিবিধ মতেরই তিনি অপূর্ব সমালোচনা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। পরমাণুসমূহ পরস্পর সংযুক্ত থাকে; ভদন্ত শুভগুপ্তের এই মতের সমালোচনায় কমলশীল বলিয়াছেন, পরমাণুসমূহের যে সংযুক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা কি সর্বাত্মক সংযোগ, না এক দেশে (প্রদেশবিশেষে) সংযোগ (সর্বাত্মনা একে দেশেন বা) বুঝাইতেছে? সর্বাত্মক সংযোগ হইলে তাহাদ্বারা পরিদৃশ্যমান বস্তুর স্থূলত্ব ব্যাখ্যা করা যায় না, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। পরমাণুর প্রদেশভেদ স্বীকার করিলে তাহার আর পরমাণুত্ব থাকে না, স্থূলত্বই প্রকাশ পায়। পরমাণুবাদিদিগের মতে বস্তুর অতি সূক্ষ্মতম ভাগই পরমাণু। এইরূপ পরমাণুর কোনরূপ অংশ বা অবয়ব নাই। পরমাণু নিরবয়ব। সূক্ষ্মতম পরমাণুর অবয়ব থাকিলে তাহাও অতি সূক্ষ্মই হইবে এবং তাহারও অবয়ব-কল্পনার পথে কোনও বাধা থাকিবে না। ফলে, পরম-অণুর পরমাণুত্বই সেক্ষেত্রে ব্যাহত হইবে। সুতরাং পরমাণুর কোনরূপ অংশ নাই, পরমাণু নিরবয়ব, এইরূপ সিদ্ধান্তই স্বীকার্য। পরমাণুসম্পর্কে বৈভাষিকসম্প্রদায়ের উল্লিখিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মতবাদসম্পর্কে বক্তব্য এই যে, পরমাণুপুঞ্জের অন্তরালবর্তী পরমাণুসকল পরস্পরকে স্পর্শ করুক, আর নাই করুক, একথা বৈভাষিকের স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, পুঞ্জের মধ্যবর্তী পরমাণু বিভিন্ন দিক হইতে আগত পরমাণুসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে, পরমাণু সাবয়বই হইয়া দাঁড়ায়—(নিরবয়ব থাকে না)। পরমাণু সাবয়ব না হইলে পরমাণুপুঞ্জে এবং ঐ পুঞ্জের দ্বারা সৃষ্টবস্তুতে স্থূলত্ব জন্মিতে পারে না, ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা—

প্রচয়ো ভূধরাদীনামেবং সতি ন যুজ্যতে।

শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহ, ৫৫৬ পৃঃ, গাইকোয়াড্ সিরিজ্।

শান্তরক্ষিতের উল্লিখিত কারিকার ব্যাখ্যায় কমলশীল তদীয় 'পঞ্জিকায়' বৈভাষিকোক্ত পরমাণুর সাবয়বত্ব সমর্থনে এবং নিরবয়ব পরমাণুর অসিদ্ধি সাধনে আচার্য বসুবন্ধুর বিংশিকা কারিকার শ্লোকার্ধও উদ্ধৃত করিয়াছেন—

দিগ্‌দেশভেদো যস্যাস্তি তস্যৈকত্বং ন বিদ্যতে।

বসুবন্ধুকৃত বিংশিকা কাঃ ১৪।

যাহার বিভিন্ন দিক ও দেশভেদে বিভেদ আছে, তাহাকে নিরবয়ব, নিরংশ ও একরূপ (বা একস্বভাব) বলিয়া কোনমতেই ব্যাখ্যা করা চলে না। পরমাণু পরম-অণু বিধায়ই অনেকরূপ বা অনেকস্বভাব হইতে পারে না। ইহা সকল পরমাণুবাদীরই স্বীকৃত সিদ্ধান্ত। যাহা একস্বভাবও নহে, অনেকস্বভাবও নহে অর্থাৎ একও নহে, অনেকও নহে, ঐরূপ বস্তু কদাচ সিদ্ধ হইতে পারে না। উহা গগন-নলিনীর ন্যায় অত্যন্ত অসৎ বা অলীক সন্দেহ নাই। সর্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিশ্বপ্রকৃতির মূল পরমাণুও সুতরাং সিদ্ধ হইতে পারে না। ঐপ্রকার অসিদ্ধ পরমাণুর সমষ্টি বা পুঞ্জের পরিকল্পনার সম্ভাবনা কোথায় ?

বসুবন্ধু তদীয় কারিকায় স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন ঃ—

ন তদেকং ন চানেকং বিষয়ঃ পরমাণুনঃ।
ন চ তে সংহতা যস্মাৎ পরমাণুর্ন সিধ্যতি ॥

বিংশিকা কাঃ ১১।

আচার্য বসুবন্ধুর নিগূঢ় উক্তির ব্যাখ্যায় শান্তরক্ষিত তদীয় তত্ত্বসংগ্রহে বলিয়াছেন ঃ—

অসন্নিশ্চয়যোগ্যোঽতঃ পরমাণুর্বিপশ্চিতাম্।
একানেক স্বভাবেন শূন্যত্বাদ্ বিয়দজবৎ ॥

তত্ত্বসংগ্রহ, গাইকোয়াড্ সিরিজ্ ৫৫৮ পৃষ্ঠা।

এইরূপে আচার্য বসুবন্ধু, শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতি ধুরন্ধর বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্যগণ বৈভাষিকোক্ত পরমাণুর অসিদ্ধি ঘোষণা করিয়া, হীনযান-সম্প্রদায়োক্ত পরমাণুবাদ ও সর্বাস্তিত্ববাদ খণ্ডন করিয়াছেন, এবং বৌদ্ধবিজ্ঞান-বাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আলোচ্য বৌদ্ধপরমাণুবাদের খণ্ডনে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্যগণের সহিত উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ও হাত মিলাইয়া-

ছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং খুব সঙ্গতকারণেই একটা প্রশ্ন আসে এই যে, বৈভাষিকোক্ত পরমাণুবাদের খণ্ডনে প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ যে তর্কশরজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই শরজাল তাঁহাদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়া বৈশেষিকোক্ত পরমাণুপুঞ্জবাদ, এবং অবয়বিবাদকেই ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিবে নাকি? [ভবদীয় বাণো ভবন্তমেব প্রহরেৎ ?]

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, প্রাচীন ন্যায়াচার্যগণ বিজ্ঞানবাদিদিগের সহিত হাত মিলাইয়া বৈভাষিকোক্ত পরমাণুপুঞ্জমাত্রবাদ এবং 'সর্বমভাবঃ' (ন্যায় সূঃ ৪।১।৩৭), এই সর্বাভাববাদের খণ্ডন করিলেও, পরমাণুবাদের খণ্ডনে বিজ্ঞানবাদীর যুক্তি নৈয়ায়িকের হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। প্রাচীন ন্যায়াচার্য উদ্দ্যোতকর তাঁহার ন্যায়বার্তিকে—

ন্যায়বৈশেষিকোক্ত পরমাণুবাদ ও সর্বাস্তিত্ববাদীর পরমাণুবাদের সাম্য ও বৈষম্য

'ষট্‌কেন যুগপদ্‌যোগাৎ পরমাণো ষড়ংশতা'

বিংশিকা কাঃ ১২।

'দিগ্‌দেশভেদো যস্যাস্তি তস্যৈকত্বং ন বিদ্যতে'।

বিংশিকা কাঃ ১৪।

বসুবন্ধুর উল্লিখিত কারিকাংশ উদ্ধৃত করিয়া পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া, ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত নিত্য, নিরবয়ব পরমাণুবাদ সমর্থন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের অভিমত বাচস্পতি, উদয়নাচার্য, বৈশেষিকোপস্কার প্রণেতা শঙ্কর মিশ্র, এবং নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকাচার্যগণেরও অনুমোদন লাভ করিয়াছে। বসুবন্ধু প্রভৃতির যুক্তির খণ্ডনে উদ্দ্যোতকর বলেন, মধ্যবর্তী পরমাণুর সহিত চতুষ্পার্শ্বে, ঊর্ধ্বে এবং অধোদেশে অবস্থিত ছয়টি পরমাণুর যে সংযোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহার রহস্য যদি স্থিরভাবে বিচার করা যায়, তবে দেখা যায় যে, পূর্বদেশস্থ পরমাণুর সহিত মধ্যবর্তী পরমাণুর সংযোগে পশ্চিমস্থ পরমাণুর কোনই যোগ নাই। এইরূপে অপরাপর পরমাণুর ক্ষেত্রেও বিচার করিলে সুধী দেখিতে পাইবেন যে, পরমাণুর যোগ (মধ্যস্থ পরমাণু এবং অপর কোনও দেশে অবস্থিত পরমাণু এই) উভয় পরমাণুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং সেই সংযোগ-প্রদেশও বিভিন্ন। এই অবস্থায় ছয়টি পরমাণুর সংযোগকে সমানদেশস্থ বলিয়া বসুবন্ধুর কারিকায় যে আপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা অচল।

তারপর, তর্কের খাতিরে মধ্যবর্তী পরমাণুর সহিত একই সময়ে (যুগপৎ) বিভিন্ন দিগ্‌দেশাগত ছয়টি পরমাণুর যোগ স্বীকার করিলেও তাহাদ্বারা মধ্যস্থ পরমাণুর বিভিন্ন প্রদেশ বা অবয়ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, ঐরূপ যুগপৎ সংযোগের ক্ষেত্রে ছয়টি পরমাণুর যোগ একই স্থানে স্বীকার করায়, সংযোগের সমানদেশত্ব সিদ্ধ হইলেও, পরমাণুসমূহের সমানদেশত্ব সিদ্ধ হয় না, পরমাণুর সাবয়বত্বও তাহাদ্বারা প্রমাণিত হয় না। এই অবস্থায় বসুবন্ধুর শ্লোকে পরমাণুর ছয়টি অংশ বা অবয়ব (ষড়ংশতা) আছে বলিয়া যে আপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে নৈয়ায়িকের দৃষ্টিতে তাহার কোনই মূল্য দেওয়া চলে না। ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণু নিরবয়ব। নিরবয়ব পরমাণুর কোনরূপ প্রদেশ নাই বা থাকিতে পারে না। পরমাণুর ছয়দিকে সংযোগ স্বীকার করিয়া নিরবয়ব পরমাণুর কল্পিত প্রদেশ স্বীকার করিলেও তাহাদ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হয় না। পরমাণুর দিগ্‌দেশবিভাগ নাই, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই বসুবন্ধুর 'দিগ্‌দেশভেদো যস্যাস্তি' ইত্যাদি কারিকার্ধ উদ্ধৃত করিয়া, ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ পরমাণুর দিগ্‌দেশবিভাগ এবং সাবয়বত্ব খণ্ডন করতঃ নিরবয়বত্বসিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। উল্লিখিত কারিকার ব্যাখ্যায় বসুবন্ধু বলিয়াছেন—পরমাণুর পূর্বদিগ্‌ভাব, অপর দিগ্‌ভাব প্রভৃতি বিভিন্ন দিগ্‌ভাগ আছে। ভিন্ন ভিন্ন দিগ্‌ভাব থাকার দরুণই পরমাণুর একত্ব (অর্থাৎ পরমাণু নিরবয়ব একরূপ ইহা) সিদ্ধ হইতে পারে না, পরমাণু সাবয়ব, ইহাই প্রমাণিত হয়। যদি পরমাণুর দিগ্‌দেশ-ভেদ না থাকে, তবে সূর্যোদয়ে পরমাণুর কোথায়ও ছায়া, কোথায়ও আলোক-পাত কেন হয়? অংশতঃ ছায়া এবং আলোকসম্পাত দেখিয়া পরমাণু সাবয়ব, বিভিন্ন দিক্ ও দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন, এইরূপ সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতে হয়। প্রত্যেক পরমাণুরই যদি ছয়দিকে সংযোগ থাকার দরুণ ভেদ স্বীকার করিতে হয়, তবে উহাকে দেশভেদে বিভিন্ন ছয়টি পরমাণুই বলিতে হয়। এইরূপে কোন পরমাণুরই একত্ব সিদ্ধ হয় না—"তস্যৈকত্বং ন যুজ্যতে"।

বসুবন্ধুর উল্লিখিত উক্তির প্রতিবাদ করিয়া উদ্দ্যোতকর বলেন, "আমরা (ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যেরা) পরমাণুর দিগ্‌দেশভেদ স্বীকার করি না। পরমাণুর পূর্ব্বদিকে এক প্রদেশ, পশ্চিম দিকে অপর প্রদেশ, ইত্যাদিরূপে পরমাণুতে দিগ্‌দেশভেদ নাই। দিকের সহিত পরমাণুর সংযোগ থাকায়

ঐসমস্ত সংযোগকেই পরমাণুর দিগ্‌দেশভেদ বলিয়া কল্পনা করিয়া পরমাণুর দিগ্‌দেশভেদ বলা হয়। কিন্তু মুখ্যতঃ পরমাণুর দিগ্‌দেশভেদ নাই। দিকের সহিত পরমাণুর সংযোগ থাকিলেও পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, উহাতে অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই"।[১] ছায়া এবং আবরণকেও পরমাণুর সাবয়বত্বের সাধক হেতুরূপে উল্লেখ করা যায় না। কেননা, দেখা যায়, যেই বস্তুকে স্পর্শ করা যায় এবং যাহার কোনরূপ মূর্তি আছে, ঐরূপ দ্রব্যই অপর দ্রব্যকে আবৃত করে। ঐ আবরণে উহার অবয়ব প্রযোজক নহে। এই অবস্থায় বৌদ্ধ-তার্কিকগণ দিগ্‌দেশভেদ এবং ছায়া ও আবরণকে হেতুরূপে উল্লেখ করিয়া তন্মূলে পরমাণুর যে সাবয়বত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত নিরবয়ব পরমাণুবাদী ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ অনুমোদন করেন নাই। পরমাণুতে সংযোগ স্বীকার করিতে হইলেই পরমাণুকে সাবয়ব বলিতে হইবে, নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগ সম্ভবপর নহে বলিয়া বৌদ্ধাচার্যগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, প্রাচীন নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের মতে ঐরূপ সিদ্ধান্তের কোনই মূল্য নাই। নিরবয়ব আত্মা ও মনের ন্যায়মতে সংযোগ হইয়া থাকে। সুতরাং নিরবয়ব দ্রব্যদ্বয়েরও পরস্পর সংযোগে কোন বাধা দেখা যায় না। এই অবস্থায় নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগ হইতে আপত্তি কি? নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগ সমর্থন করিয়া উদয়নাচার্য তদীয় 'আত্মতত্ত্ব-বিবেকে' বলিয়াছেন :—

"সংযোগব্যবস্থাপনেনৈব ষট্‌কেনযুগপদ্‌যোগাদ্‌দিগ্‌দেশভেদাচ্ছায়াবৃতিভ্যা-মিত্যাদয়ো নিরস্তাঃ।"

উদয়নকৃত আত্মতত্ত্ববিবেক।

তাৎপর্য এই, ন্যায়-সিদ্ধান্তে নিরবয়ব পরমাণুতে সংযোগ ব্যবস্থা করার ফলেই একই সময়ে ছয়টি পরমাণুর সহিত সংযোগ, দিক্ ও দেশভেদ, ছায়া, আবরণ প্রভৃতি হেতুদ্বারা পরমাণুকে সাবয়ব বলিয়া সিদ্ধান্ত করার প্রচেষ্টা ব্যাহত (নিরস্ত) হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

নব্যন্যায়গুরু রঘুনাথ শিরোমণিও উদয়নকৃত আত্মতত্ত্ব বিবেকের দীধিতি টীকায় উদয়নাচার্যের মতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, বসুবন্ধু তাঁহার বিংশতিকা কারিকায় যে সকল হেতুর উল্লেখ করিয়া পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে চাহেন, ঐ সকল হেতুর দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ হয় না। পরমাণুর সাবয়বত্ব সাধনে

১। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশের ন্যায়দর্শনের টিপ্পনী, ৪।২।২৫ সূত্র

বসুবন্ধুক্ত হেতু প্রকৃত নহে, উহা হেত্বাভাস। নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগ-সাধনে রঘুনাথ শিরোমণি বলেন—"যে দ্রব্যে সংযোগ জন্মে, সেই দ্রব্যের স্বরূপই অর্থাৎ সেই দ্রব্যই ঐ সংযোগের সমবায়ি-কারণ. উহার (ঐ সমবায়ি-কারণ দ্রব্যের) অংশ বা অবয়ব উহাতে কারণই নহে। সুতরাং সংযোগ দ্রব্যের অংশকে অপেক্ষা করে না। সুতরাং নিরবয়ব পরমাণুতেও সংযোগ জন্মিতে পারে। যুগপৎ অনেক মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগও ভিন্ন ভিন্ন দিগ্‌বিশেষে হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, সংযোগমাত্রই অব্যাপ্যবৃত্তি, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতে অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই। কারণ, যে দিগ্‌বিশেষে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ জন্মে, সেই দিগ্‌বিশেষাবচ্ছিন্ন হওয়াতেই ঐ সংযোগের অবাপ্যবৃত্তিত্ব উপপন্ন হয়। কোন প্রদেশ বা অবয়ব বিশেষাবচ্ছিন্ন না হইলেই যে সংযোগ ব্যাপ্যবৃত্তি হইবে, ইহা ত বলা যাইবে না। তবে আর নিরবয়ব দ্রব্যে সংযোগ হইতে পারে না, ইহা কোন্ প্রমাণে বলা যাইবে?"[১] অতএব সাবয়ব দ্রব্যের ন্যায় নিরবয়ব পরমাণুরও সংযোগ স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই।

এইরূপে ন্যায়-বৈশেষিক বৌদ্ধসিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাদের নিত্য নিরবয়ব পরমাণুবাদ সমর্থন করিয়াছেন। নিরবয়ব পরমাণুর সমর্থনে ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণের উক্তির সারমর্ম এই যে, "প্রমাণ দ্বারা নিরবয়ব পরমাণু সিদ্ধ হওয়ায় উহার সংযোগও সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, জন্যদ্রব্যের বিভাগ করিতে করিতে যেস্থানে ঐ বিভাগের নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে, তাহাই পরমাণু। তাহাতে সংযোগ সম্ভব না হইলে বিভাগ থাকিতে (জন্মিতে) পারে না। কারণ, যে দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগই হয় নাই, তাহার বিভাগ হইতে পারে না। সুতরাং পরমাণুদ্বয়ের সংযোগও অবশ্যই স্বীকার্য্য। ঐ সংযোগ কোন প্রদেশাবচ্ছিন্ন না হইলেও দিগ্‌বিশেষাবচ্ছিন্ন হওয়ায় উহাও অব্যাপ্যবৃত্তি। সংযোগমাত্রই অব্যাপ্যবৃত্তি, এইরূপ নিয়ম সত্য। কিন্তু সংযোগমাত্রই কোন প্রদেশাবচ্ছিন্ন, এই নিয়ম সত্য নহে। কারণ, নিরবয়ব আত্মা ও মনের পরস্পর সংযোগ অবশ্য স্বীকার্য্য। কোন পরমাণুর চতুষ্পার্শ্ব এবং অধঃ ও ঊর্ধ্ব, এই ছয়দিক্ হইতে ছয়টি পরমাণুর সহিত যুগপৎ সংযোগ হইলেও ঐ সংযোগ সেই সমস্ত দিগ্‌বিশেষাবচ্ছিন্ন

১। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণের ন্যায়দর্শনের টিপ্পনী, ৪।২।২৫ সূত্র।

হইবে। তদ্দ্বারা পরমাণুর ছয়টি অবয়ব সিদ্ধ হয় না এবং ঐ স্থলে সেই সাতটি পরমাণুর যোগে কোন দ্রব্যবিশেষেরও উৎপত্তি হয় না। কারণ, বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদান কারণ হয় না। সুতরাং 'পিণ্ডঃস্যাদণুমাত্রকঃ' এই কথাদ্বারা বসুবন্ধু যে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও করা যায় না। কারণ, ঐস্থলে কোন দ্রব্যপিণ্ডই জন্মে না। দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগে যে ত্রসরেণু নামক পিণ্ড জন্মে, তাহাতে ঐ দ্ব্যণুকত্রয়ের বহুত্ব সংখ্যাই মহৎ পরিমাণ উৎপন্ন করে। কারণ, উপাদান কারণের বহুত্ব সংখ্যাও দ্রব্যের প্রথিমা অর্থাৎ মহৎ পরিমাণের অন্যতম কারণবিশেষ। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন দ্ব্যণুকনামক দ্রব্যে ঐ মহৎপরিমাণের কোন কারণই না থাকায় উহা জন্মে না। সুতরাং ঐ দ্ব্যণুকও অণু বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হইলেও তজ্জন্য দ্রব্যের প্রথিমা (স্থূলত্ব) হইতে পারে না, এই কথাও অমূলক। প্রত্যেক পরমাণুরই দিগ্‌ভাগভেদ আছে, সুতরাং কোন পরমাণুই এক হইতে পারে না, এই কথাও অমূলক। কারণ, প্রত্যেক পরমাণুর সম্বন্ধে ছয়দিক্ থাকিলেও তাহাতে পরমাণুর ভেদ হইতে পারে না। অর্থাৎ তদ্দ্বারা প্রত্যেক পরমাণুই ষট্‌পরমাণু, ইহা কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না। বস্তুতঃ প্রত্যেক পরমাণু একও নহে, অনেকও নহে, ইহা বলিয়া গগনপদ্মের ন্যায় উহার অলীকত্ব সমর্থন করা যায় না"।[১]

উপরের আলোচনা হইতে সুধী পাঠক দেখিতে পাইবেন, কিরূপে বসুবন্ধু, শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতির আক্রমণের বিরুদ্ধে বৈভাষিক ও ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ তাঁহাদের নিরবয়ব পরমাণুবাদ সমর্থন করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের গোচর রূপ-রস-স্পর্শময় বহির্বিশ্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও, দৃশ্যমান বিশ্বকে বৈভাষিক 'পরমাণুপুঞ্জমাত্র' বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিরবয়ব পরমাণুপুঞ্জের অতিরিক্ত অবয়বী সমর্থন করেন নাই। ন্যায়-বৈশেষিক পণ্ডিত-মণ্ডলী স্বতন্ত্র অবয়বী সমর্থন করিয়াছেন। এইখানেই বৈভাষিক ও ন্যায়-বৈশেষিক মতের পার্থক্য স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিক তর্কের ধারায় পরিপুষ্ট পরমাণু-কারণবাদ দার্শনিক চিন্তা জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিলেও, এই মত বিজ্ঞানবাদীর হৃদয় স্পর্শ করে নাই।

১। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণের টিপ্পনী, ৪।২।২৫ সূত্র।

বি…নবাদী ক্ষণিক বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বহির্বিশ্বের অস্তিত্বই আদৌ স্বীকার করেন নাই। জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, কর্তৃ-কর্ম-ক্রিয়া প্রভৃতি বিভাবের তাঁহার মতে কোনই মূল্য নাই। ঐ সকল মিথ্যা বিভাব ক্ষণিক বিজ্ঞানেরই বিলাসমাত্র। তাঁহার বক্তব্যের মূলসূত্র এই যে, ক্রিয়া ও কারকের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদ নাই।—

বিজ্ঞানবাদের মূল বক্তব্য

"ভূতির্যেষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈবচোচ্যতে।"

যাহা উৎপত্তি, তাহাই ক্রিয়া এবং তাহাই কারক। যোগদর্শনের ভাষ্যে ব্যাসদেবও বিজ্ঞানবাদীর উল্লিখিত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন।

"ক্ষণিকবাদিনো যদ্ভবনং, সৈব ক্রিয়া, তদেব চ কারকমিত্যভ্যুপগমঃ।"

যোগদর্শন ভাষ্য, ৪।২০।

এই বিজ্ঞান ক্ষণিক এবং স্বপ্রকাশ। ইহার অন্য কোনও প্রকাশক নাই। কেননা, প্রকাশ্য, প্রকাশক এবং প্রকাশ-ক্রিয়া এই মতে অভিন্ন পদার্থ। বিজ্ঞান ভিন্ন বুদ্ধিদ্বারা অনুভাব্য বা জ্ঞেয় অন্য কোনও পদার্থ নাই। বুদ্ধি বা বিজ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারে এমন কোন অনুভবও নাই। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের, প্রকাশ্য ও প্রকাশের কোনরূপ পৃথক অস্তিত্ব না থাকায়, আলোচ্য বুদ্ধি বা বিজ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশিত হয় (অপর কোনও প্রকাশকের সাহায্যে প্রকাশিত হয় না। অতএব উহা স্বপ্রকাশ)।

নান্যোঽনুভাব্যো বুদ্ধ্যাস্তি তস্যানানুভবোঽপরঃ।
গ্রাহ্য-গ্রাহক বৈধুর্যাৎ স্বয়ং সৈব প্রকাশতে॥

ধর্মকীর্তির প্রমাণ বিনিশ্চয়, ১ম অঃ।

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের উপরই বিজ্ঞানবাদের ভিত্তি। প্রকাশ, প্রকাশ্য ও প্রকাশকের, জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের, কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া প্রভৃতির অভেদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে বিজ্ঞানবাদ স্থাপন করাই অসম্ভব হয়। যে 'সহোপলম্ভ নিয়ম'কে বিজ্ঞানবাদে দৃঢ়ভিত্তি বলিয়া নিম্নোক্ত কারিকায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেখানে 'সহোপলম্ভ' বলিতে বিজ্ঞানবাদী কি বুঝাইতে চাহেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে বিচার করা আবশ্যক।

"সহোপলম্ভনিয়মাদভেদোনীলতদ্ধিয়োঃ।
ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে॥"

ধর্মকীর্তির প্রমাণ বিনিশ্চয়, ১ম অঃ।

এই কারিকাটি বিজ্ঞানবাদের বিবরণে মধ্বাচার্য, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অনেকেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় এই কারিকার প্রতিপাদ্য তত্ত্বের গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। এইজন্য বিজ্ঞানবাদের সমর্থক এবং সমালোচক সকলেই এই কারিকার রহস্যোদ্ধারে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদীর সিদ্ধান্তে নীল ও নীল-জ্ঞানের মধ্যে কোনরূপ ভেদ নাই। নীল এবং নীলধী অভিন্ন পদার্থ। জ্ঞানের যাহা বিষয় বলিয়া পরিচিতি লাভ করে, তাহা জ্ঞানেরই এক বিশেষ আকার। এই মতে বিজ্ঞান সাকার, নিরাকার নহে। জ্ঞানের বিষয়ই জ্ঞানকে রূপায়িত করে। বিজ্ঞেয় ঘট এবং ঘটের জ্ঞান অভিন্ন তত্ত্ব। নীলাকার বিজ্ঞানবিশেষই নীল; ঘটাকার বিজ্ঞানবিশেষই ঘট। জ্ঞান হইতে বিষয়ের কোন পৃথক্ সত্তা নাই। জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞেয় অসৎ। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের এই অভেদ সিদ্ধান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানবাদী 'সহোপলম্ভ নিয়মকে' [সহোপলম্ভ নিয়মাৎ] হেতুরূপে উপন্যাস করিয়া ঐরূপ হেতুমূলে অনুমান প্রয়োগের সাহায্যে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের নীল এবং নীল-জ্ঞানের অভেদ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের এই অভেদ সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে আলোচ্য সহোপলম্ভ নিয়মকে (সহোপলম্ভ নিয়মাৎ এই অনুমানোক্ত হেতুটিকেই) পরিষ্কার করিয়া বোঝা আবশ্যক। প্রদর্শিত হেতুতে যে 'সহ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে সেই সহ শব্দের এখানে অর্থ কি? 'নিয়মাৎ' এই নিয়ম শব্দের দ্বারা কিরূপ নিয়মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাই এখানে সর্বাগ্রে বিচার করা আবশ্যক। জ্ঞানের সহিতই জ্ঞেয় বিষয়ের (নীলাদির) উপলব্ধি হয়, জ্ঞানের উপলব্ধি ব্যতীত জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, ইহাই উল্লিখিত হেতুর অন্তর্গত 'সহ' শব্দের অর্থ হইলে, ঐরূপ হেতু 'বিরুদ্ধ' হেতুই হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, সহ শব্দের স্বাভাবিক অর্থ হইল সাহিত্য। এই সাহিত্য ভিন্ন পদার্থে সম্ভবপর হয়, অভিন্ন পদার্থে সাহিত্য সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ না থাকিলে, 'সহ' শব্দের প্রতিপাদ্য সাহিত্যের উপলব্ধি সে-ক্ষেত্রে কিরূপে সম্ভবপর হয়? সুতরাং সাহিত্য-হেতু জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদের সাধক হওয়ায় (অভেদের সাধক না হওয়ায়) জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ সাধনে ঐরূপ হেতু যে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? বৈভাষিক আচার্য ভদন্ত শুভগুপ্ত বিজ্ঞানবাদে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ

সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে গিয়া উক্ত হেতুকে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। সর্বদর্শনপরমাচার্য বাচস্পতি মিশ্রও ন্যায়বার্তিক তাৎপর্যটীকা, 'ন্যায়কণিকা', ভামতী প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে সহ শব্দের সাহিত্য অর্থ গ্রহণ করিলে আলোচ্য হেতু যে বিরুদ্ধ হয়, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ সাধন করে না, ইহাই স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয়, এইজন্যই আচার্য শান্ত রক্ষিত তদীয় "তত্ত্বসংগ্রহে" বিজ্ঞানবাদীর মতানুসারে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ সাধনে সহশব্দের প্রয়োগ করেন নাই। শান্তরক্ষিত সহশব্দের প্রয়োগ না করিয়া, প্রকারান্তরে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদসিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। শান্তরক্ষিত বলেন, "নীলজ্ঞানের উপলব্ধি ও নীলের উপলব্ধি একই পদার্থ"। ঐ এক বা অভিন্ন উপলব্ধিই 'সহোপলম্ভ'। সর্বত্রই জ্ঞানের উপলব্ধিই বিষয়ের উপলব্ধি। জ্ঞানের উপলব্ধি ব্যতীত জ্ঞেয় বিষয়ের পৃথক্ উপলব্ধি নাই, ইহাই "সহোপলম্ভ নিয়ম"।[১] ইহার দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যে কোনরূপ ভেদ নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। চন্দ্র বস্তুতঃ এক হইলেও নেত্ররোগ বশতঃ একই চন্দ্রকে যেমন দুই চন্দ্র বলিয়া লোকে দেখিয়া থাকে; অভেদে যেমন ভেদ দর্শন হয়, সেইরূপ জ্ঞান ও বিষয়ের প্রকৃতভেদ না থাকিলেও সেক্ষেত্রেও মানুষের ভেদদৃষ্টি প্রসার লাভ করে। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের এই অভিন্ন উপলব্ধিকেই (একোপলব্ধিকেই) সহোপলম্ভ বলিয়া শান্তরক্ষিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সহ শব্দের অর্থ এক বা অভিন্ন, সাহিত্য নহে। এই ঐক্যের দৃষ্টিতেই কমলশীল তদীয় তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকায় সহোপলম্ভের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

যৎ সংবেদনমেব স্যাদ্ যস্য সংবেদনং ধ্রুবম্।
তস্মাদব্যতিরিক্তং তৎ ততো বা ন বিভিদ্যতে॥

তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা, ৫৬৭ পৃঃ।

শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহের উক্তির ব্যাখ্যায় কমলশীল তদীয় পঞ্জিকায়

১। যৎসংবেদনমেব স্যাদ্‌যস্য সংবেদনং ধ্রুবম্।
তস্মাদব্যতিরিক্তং তৎ ততো বা ন বিভিদ্যতে॥
যথা নীলধিয়ঃ স্বাত্মা দ্বিতীয়ো বা যথোড়ুপঃ।
নীলধীবেদনঞ্চেদং নীলাকারস্য বেদনাৎ॥

শান্তিরক্ষিতকৃত "তত্ত্বসংগ্রহ", ৫৬৭ পৃষ্ঠা।

জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ বা ঐক্যই যে 'সহ' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ (সাহিত্য নহে) তাহা স্পষ্টবাক্যেই প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের কোন কোন প্রাচীন সম্প্রদায় আলোচ্য 'সহ' শব্দের 'এককাল' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অভেদ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। একই সময়ে জ্ঞেয়ের উপলব্ধির কথাই শ্লোকোক্ত 'সহোপলম্ভ' শব্দে বুঝা যায়। যুক্তি হিসাবে ইঁহারা বলেন, কালভেদ বস্তুভেদের ব্যাপ্য—

কালভেদস্য বস্তুভেদেন ব্যাপ্যত্বাৎ। তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, ৫৬৮ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ কালভেদ থাকিলেই কালভেদে যে বস্তুর ভেদ হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কালভেদ না থাকিলে বস্তুভেদও সেখানে থাকিবে না। জ্ঞান ও জ্ঞেয় সেক্ষেত্রে ভিন্নও হইবে না, অভিন্নই হইবে। বিভিন্ন কালের উপলব্ধি ভিন্ন ভিন্ন হইবে বৈ কি? উহা এক এবং অভিন্ন হইবে কিরূপে? এখানে দেখা যাইতেছে যে, সহ শব্দের 'অভেদ' অর্থ না করিয়া, 'এককাল' অর্থ করিলেও জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ উপলব্ধিই শেষ পর্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং সহ শব্দের 'এককাল' অর্থেও দোষের কথা কিছুই নাই।

নীল ও নীলবিজ্ঞান অভিন্ন। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে কোনরূপ ভেদ নাই। জ্ঞানের উপলব্ধিই জ্ঞেয় বিষয়েরও উপলব্ধি, জ্ঞেয় বিষয়ের কোন পৃথক্ উপলব্ধি হয় না। জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞেয় বিষয়ের কোনরূপ পৃথক্ সত্তাও নাই। এইরূপ সিদ্ধান্তের উপরই বিজ্ঞানবাদের ভিত্তি। এই ভিত্তি নিতান্তই শিথিল। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ সিদ্ধান্তকে (যাহাকে সহোপলম্ভনিয়মাৎ ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে) আচার্য উদয়ন তদীয় ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে ও আত্মতত্ত্ববিবেকে, উদ্দ্যোতকর ন্যায়বার্তিকে, বাচস্পতি মিশ্র ভামতীতে, ন্যায়কণিকায়, ভট্ট কুমারিল শ্লোকবার্তিকের নিরালম্বনবাদ, শূন্যবাদ প্রভৃতি পরিচ্ছেদে, আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে, শবরস্বামী মীমাংসাদর্শনে, ব্যাসদেব যোগ্য ভাষ্য প্রভৃতিতে

উল্লিখিত বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন

১। নহ্যত্রৈকেনৈবোপলম্ভ একোপলম্ভ ইত্যয়মর্থোঽভিপ্রেতঃ। কিং তর্হি? জ্ঞান-জ্ঞেয়য়োঃ পরস্পরমেকএবোপলম্ভো ন পৃথগিতি। য এব হি জ্ঞানোপলম্ভঃ স এব জ্ঞেয়স্য, য এব জ্ঞেয়স্য স এব জ্ঞানস্যেতি যাবৎ।

কমলশীল—তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, ৫৬৮ পৃষ্ঠা।

অতিসূক্ষ্ম বিচারশৈলীর অবতারণা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ঐ খণ্ডন প্রক্রিয়ার বিস্তৃত আলোচনা এইরূপ স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে সুতরাং আমরা প্রতিবাদী দার্শনিকগণের মূল বক্তব্য সম্পর্কে দিক্‌দর্শন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। যাঁহারা বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখা যায়, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ সিদ্ধান্তেরই ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন। নীল জ্ঞানের উপলব্ধি এবং নীলের উপলব্ধি একই তত্ত্ব। জ্ঞেয় জ্ঞানেরই এক বিশেষ আকার। এইরূপ বিজ্ঞানবাদীর যুক্তি প্রতিবাদীর হৃদয় স্পর্শ করে নাই। উদ্দ্যোতকর তদীয় ন্যায়বার্তিকে—

"ভূতির্যেষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে।"

এই বিজ্ঞানবাদীর উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—

"নহি কর্ম চ ক্রিয়া চ একং ভবতীতি।"

কর্ম এবং ক্রিয়া কদাচ এক হয় না। দর্শন ও দৃশ্য বিষয় এক ও অভিন্ন নহে। জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ও সুতরাং অভিন্ন নহে; উহারা বিভিন্ন। 'সহোপলম্ভনিয়মাৎ' এইরূপ হেতুমূলে নীল ও নীল বিজ্ঞানের অভেদ সাধনের যে প্রচেষ্টা বিজ্ঞানবাদে দেখিতে পাওয়া যায়, দর্শন এবং দৃশ্য ঘট-প্রমুখ বস্তুরাজির ভেদ প্রসিদ্ধ থাকায়, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদসাধনে ঐরূপ হেতু প্রকৃত হেতুই হইবে না। উহা হইবে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস। আলোচ্য হেতুর অন্তর্গত সহ শব্দের অর্থ অভেদই হউক, কি এককালই হউক, ঐ উভয় প্রকার অর্থই জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট ভেদবুদ্ধির দ্বারা বাধিত বলিয়া, প্রদর্শিত হেতু যে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? শঙ্কর, বাচস্পতি, কুমারিল, উদয়নাচার্য, শবরস্বামী প্রভৃতি সকলেই বিজ্ঞানবাদীর জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদের সাধক হেতুকে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈভাষিক বৌদ্ধাচার্য ভদন্ত শুভগুপ্তও বিজ্ঞান-বাদের খণ্ডনে হেতুর বিরোধের কথা উল্লেখ করিয়া, নৈয়ায়িক, মীমাংসক, বৈদান্তিক প্রভৃতির সহিতই হাত মিলাইয়াছেন। তারপর, জ্ঞান ও জ্ঞেয় যে অভিন্ন, তাহা কোথায়ও নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত না হওয়ায়, বিজ্ঞানবাদীর প্রদর্শিত হেতু যে 'সন্দিগ্ধাসিদ্ধ' হেত্বাভাস হইবে, নিশ্চিত হেতু হইবে না, ইহা বিজ্ঞানবাদী লক্ষ্য করিয়াছেন কি?

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় যে অভিন্ন

এবিষয়ে বিজ্ঞানবাদীর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। তাঁহার অনুমান হেত্বাভাস-কলুষিত সুতরাং গ্রহণের যোগ্য নহে। প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের ভেদই দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানের উপলব্ধি হইতে জ্ঞেয়ের পৃথক্ উপলব্ধিই হইয়া থাকে। জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্নাকারেই জ্ঞানক্রিয়ার কর্মরূপে জ্ঞেয় বিষয় প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ও প্রকাশ্য, জ্ঞানক্রিয়া ও তাহার কর্মকারক (জ্ঞেয় জগৎ) কদাচ এক এবং অভিন্ন পদার্থ হয় না। ছেদন ক্রিয়া এবং ছেদ্য বস্তু এক নহে। জ্ঞেয় বিষয়ই জ্ঞানকে রূপায়িত করে। জ্ঞেয় বিষয় না থাকিলে জ্ঞানের অস্তিত্বও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেননা, নির্বিষয়ক জ্ঞান কদাচ কাহারও জন্মে না। বিজ্ঞানবাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে জ্ঞেয় বিষয় সকল জ্ঞানেরই বিশেষ বিশেষ আকার। নীলাকার বিজ্ঞানই নীল, বিশেষাকার বিজ্ঞান ব্যতীত বিষয়ের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। জ্ঞানব্যতিরেকে জ্ঞেয় বিষয় অসৎ। জ্ঞানের আকার ছাড়িয়া দৃশ্যমান বিশ্বরূপে বিষয়ের কোন সত্তা নাই। জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞেয়ও দ্রষ্টার অন্তরের, মনোজগতেরই জিনিষ, বাহিরের নহে। বহির্বিশ্ব অলীক। অলীক বহির্বিশ্বই আমাদের জ্ঞানে ভাসে। পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ বস্তুতঃপক্ষে মনোরাজ্যের বস্তু হইলেও, দৃশ্যমান বিশ্বকে আমরা বাহিরের বস্তু বলিয়াই মনে করি।

যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তদ্বহির্বদবভাসতে। ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ২।২।২৮।

এখন কথা এই যে, জ্ঞেয় বস্তুমাত্রই আন্তর-পদার্থ হইলে, বহির্বিশ্ব-রূপে উহাদের সত্তা না থাকিলে, বাহিরে আমরা যাহা দেখি তাহা নাই, তাহাদের কোনরূপ সত্যতা নাই, বহির্বিশ্ব অলীক, ইহাই প্রকারান্তরে বলা হয় না কি? বাহিরের জগৎ অলীক হইলে, সেই অলীক বস্তুকে উপমান হিসাবে ব্যবহার করিয়া বাহিরের ন্যায় প্রকাশিত হয়--"বহির্বদবভাসতে" ইহা বিজ্ঞানবাদী কিরূপে বলিতে পারেন? বহির্দৃষ্ট বস্তু আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক হইলে, তাহাতো উপমানই হইতে পারে না। 'আকাশকুসুমের মত দেখা যায়' এইরূপ কথা যেমন বলা যায় না, সেইরূপ 'বহির্বৎ প্রকাশতে' এইরূপ কথাও বিজ্ঞানবাদী বলিতে পারেন না। বিজ্ঞানবাদী বহির্বিশ্বের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বহির্বিশ্বকে আকাশকুসুম প্রভৃতির ন্যায় অলীক বলেন, আবার অন্তরে অবস্থিত জ্ঞেয় বস্তু সকল বাহিরের বস্তুর ন্যায়

প্রকাশিত হয়, একথাও বলেন। তাঁহার ঐরূপ বিরুদ্ধ উক্তিদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? আচার্য শঙ্করও বিজ্ঞানবাদের খণ্ডনে ব্রহ্মসূত্রে (দ্বিতীয় অঃ ২য় পাদে ২।২।২৮ সূত্রে) বিজ্ঞানবাদের এই অসামঞ্জস্যের কথাই স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়াছেন। তারপর, জ্ঞেয় বিষয়ই জ্ঞানকে রূপ দিয়া থাকে বলিয়া, জ্ঞেয় বিষয়ের স্বতন্ত্র সত্তা ব্যতীত জ্ঞানের বৈচিত্র্য কোনমতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞানবাদী অনাদিকালসঞ্চিত সংস্কারের বৈচিত্র্যবশতঃ জ্ঞানের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেখানে প্রশ্ন এই যে, সংস্কারে বৈচিত্র্য আসে কোথা হইতে? বিষয়ের বৈচিত্র্যবশতঃ বিষয়জাত সংস্কারে বৈচিত্র্য জন্ম লাভ করে। বিষয়ে বৈচিত্র্য না থাকিলে, তজ্জাত সংস্কারেও বৈচিত্র্য জন্মিতে পারে না। সুতরাং বিষয়জাত সংস্কারের বৈচিত্র্য উপপাদনের জন্যই বিষয়ের বৈচিত্র্য অবশ্যই স্বীকার্য। বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ জ্ঞানের বৈচিত্র্য স্বীকার করিতে গেলেও, সেই একই প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। বাসনার বৈচিত্র্য কেন জন্মে? নিশ্চিতই জ্ঞানের বৈচিত্র্যনিবন্ধনই—জ্ঞানমূলে উৎপন্ন বিবিধ বিচিত্র বাসনার উদ্ভব হইয়া থাকে। জ্ঞানের বৈচিত্র্যও জ্ঞেয় বিষয়ের বৈচিত্র্যনিবন্ধনই আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এই অবস্থায় বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্যপদার্থের সত্যতা অস্বীকার করিলে, বাসনার বৈচিত্র্য কোনমতেই ব্যাখ্যা করা চলে না।[১] বাহ্যপদার্থ স্বতন্ত্র না থাকিলেও বিজ্ঞানেরই প্রতিক্ষণে বিবিধ বিচিত্র বাহ্যপদার্থের আকারে পরিণাম জন্মে, এরূপ কথাও ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বলিতে পারেন না। কেননা, ক্ষণিক বিজ্ঞান স্বীকার করায়, বিজ্ঞানবাদী ক্ষণিক বিজ্ঞানের বিষয়ের আকারে পরিণাম কেন হয়, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও তিনি (বিজ্ঞানবাদী) কল্পনা করিতে পারেন না। যেই বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা অপর কোন পরভাবী বিজ্ঞানের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। বিজ্ঞানের উপাদান-কারণতা স্বীকার করিতে গেলেই কারণরূপে উহার কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তিতাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে সেরূপ সম্ভাবনা কোথায়?

১। অর্থোপলব্ধিনিমিত্তা হি প্রত্যর্থং নানারূপা বাসনা ভবন্তি।
অনুপলভ্যমানেষু ত্বর্থেষু কিং নিমিত্তা বিচিত্রা বাসনা ভবেয়ুঃ॥
ব্রঃ সূঃ শং ভাষ্য ২।২।৩০।

'ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ'। ব্রঃ সূঃ ২।২।৩০ এবং ঐ সূত্রের শং ভাষ্য ও ভামতী দ্রষ্টব্য।

এই রহস্যই "উত্তরোৎপাদেচ পূর্বনিরোধাৎ"। ব্রঃ সূঃ ২।২।২০। এই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর ব্যক্ত করিয়াছেন। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে যে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতির অনুপপত্তি হয়, তাহাও শঙ্করাচার্য "অনুস্মৃতেশ্চ"। (ব্রঃ সূঃ ২।২।২৫) এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

আরও কথা এই যে, বিজ্ঞান হইতে পৃথক বিষয়ের সত্তা না থাকিলে, সকল ক্ষেত্রেই জ্ঞানেরই জ্ঞান জন্মিতেছে ইহাই বিজ্ঞানবাদীকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে জ্ঞানের পরে "আমি জ্ঞানকে জানিলাম,' এইরূপ বোধ কেন জন্মে না? আমি ঘটপ্রমুখ বিষয়কে জানিলাম, এইরূপ জ্ঞান কেন জন্মে? তাহার যুক্তিসঙ্গত উপপাদন বিজ্ঞান-বাদীকে অবশ্যই করিতে হইবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বত্র কল্পিত বাহ্যপদার্থে জ্ঞানাকার বা অন্তর্জ্ঞেয় বস্তুরই বাহিরের তথাকথিত সত্যবস্তুর ন্যায় (বহির্বৎ) ভাতি হইয়া থাকে, এইরূপ বলিলেও, কল্পিত বাহ্যপদার্থের কাল্পনিক সত্তা বিজ্ঞানবাদীকে মানিতেই হইবে। কিন্তু তাহা হইলেই বিজ্ঞানবাদী কল্পিত বাহ্যপদার্থকে আর সত্য বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন বলিয়া ব্যাখা করিতে পারিবেন না। কেননা, সত্য ও মিথ্যার, কাল্পনিক ও পারমার্থিক বস্তুর অভেদ হয় না, হইতে পারে না।

তারপর, বিজ্ঞানবাদী স্বপ্ন জ্ঞানকে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করিয়া, জ্ঞানত্বহেতুর দ্বারা জাগরিত অবস্থার ব্যাবহারিক সত্যজ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ঐরূপ কোন সিদ্ধান্ত যে গ্রহণের অযোগ্য তাহা আচার্য শঙ্কর—

নাভাব উপলব্ধেঃ। ব্রঃ সূঃ ২।২।২৮।
বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ। ব্রঃ সূঃ ২।২।২৯।

এই সকল সূত্রভাষ্যে নিঃসংশয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। শঙ্কর বলেন, দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ জ্ঞান হইতে পৃথকরূপেই প্রত্যক্ষের গোচর হয়। সেই সকল প্রত্যক্ষকে ভ্রম বলিয়া সাব্যস্ত করার অনুকূলে কোন কারণও দেখা যায় না। সুতরাং অবাধিত প্রত্যক্ষমূলে উৎপন্ন বিশ্বসত্তাকে প্রত্যক্ষবাধিত অনুমানের সাহায্যে স্বপ্নপরিদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় বিভ্রমাত্মক বলিয়া বিজ্ঞানবাদী কিরূপে অনুমান করিতে পারেন? মোট কথা, বিজ্ঞানবাদীর জগদ্‌বিভ্রমের অনুমানের সাধ্য এবং দৃষ্টান্ত উভয়ই অসিদ্ধ বিধায়, ঐরূপ হেত্বাভাস কলুষিত অনুমান

কোন সুধী দার্শনিকই গ্রহণ করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানবাদের সিদ্ধান্তে কোন বস্তুই সত্য নহে। ফলে, প্রমাণেরও এইমতে কোনরূপ সত্যতা নাই। প্রমাণ-প্রমেয়ভাব প্রভৃতি সমস্তই কল্পিত এবং মিথ্যা। এইরূপ মিথ্যা প্রমাণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট বহির্বস্তুরাজির মিথ্যাত্ব এবং একমাত্র ক্ষণিকবিজ্ঞানের সত্যতা বিজ্ঞানবাদী প্রমাণিত করিবেন কিরূপে? এই বিজ্ঞান তাঁহার (বিজ্ঞানবাদীর) মতে স্বতঃপ্রকাশ। অনাদি সংস্কার বা বাসনার বৈচিত্র্য বশতঃই বিবিধ বিচিত্র বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জলস্রোতের ন্যায় বিজ্ঞানপ্রবাহ চলিতেছে। সমস্ত বিজ্ঞানই ক্ষণস্থায়ী 'সর্বং ক্ষণিকম্'। পূর্বজাতবিজ্ঞান অপর বিজ্ঞান উৎপাদন করিয়া পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়। এইরূপে বিজ্ঞানের ধারা চলিতে থাকে। তন্মধ্যে 'অহম্', 'মম', আমি, আমার, এইরূপ বিজ্ঞানধারার নাম আলয়বিজ্ঞান—এই আলয়বিজ্ঞানই আত্মা বলিয়া পরিচিতি লাভ করে। এতদ্‌ব্যতীত নীল, পীত, ঘট, পট প্রভৃতি বিজ্ঞানমাত্রই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। পূর্বোক্ত আলয়বিজ্ঞান হইতেই প্রবৃত্তি বিজ্ঞানতরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আলয়বিজ্ঞান প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ধারার মূল উৎস। এইজন্যই ঐ উৎসকে আলয়বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে।

"ওঘান্তরস্থানীয়াদালয়বিজ্ঞানাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানতরঙ্গ উৎপদ্যতে।"

লঙ্কাবতার সূত্র, ৪৪ পৃষ্ঠা।

জলাধার স্থানীয় আলয়বিজ্ঞান হইতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান-তরঙ্গসমূহ জন্মলাভ করিয়া থাকে। এই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান-তরঙ্গমালার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়া লঙ্কাবতার বলিয়াছেন ঃ—

"তরঙ্গাহ্যুদধের্যদ্বৎ পবনপ্রত্যয়েরিতাঃ।
নৃত্যমানাঃ প্রবর্তন্তে ব্যুচ্ছেদশ্চ ন বিদ্যতে॥
আলয়ৌঘ স্তথা নিত্যং বিষয়পবনেরিতঃ।
চিত্রৈস্তরঙ্গবিজ্ঞানৈর্নৃত্যমানঃ প্রবর্ততে॥
উদধেঃ পরিণামোঽসৌ তরঙ্গাণাং বিচিত্রতা।
আলয়ং হি তথা চিত্রং বিজ্ঞানাখ্যং প্রবর্ততে॥

লঙ্কাবতার ২য় অধ্যায়, ৪৬ পৃঃ, ৯৯, ১০০ ও ১০৩ কারিকা।

তাৎপর্য এই, মহাবারিধির বীচিমালা যেমন বায়ুবেগে চালিত হইয়া নাচিতে

নাচিতে অগ্রসর হয়, আলয়বিজ্ঞান-উদধিও সেইরূপ বিষয়-পবনবেগে সঞ্চালিত হইয়া বিবিধ বিচিত্র প্রবৃত্তি-তরঙ্গমালা উৎপাদন করতঃ নৃত্যের ছন্দে অবিরাম গতিতে চলিতে থাকে। তরঙ্গলহরী মহাবারিধিরই পরিণাম, প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান-তরঙ্গমালাও ঐসকল তরঙ্গলহরীর উৎস আলয়বিজ্ঞান-মহোদধিরই পরিণাম বলিয়া জানিবে।

এই আলয়বিজ্ঞানই বিজ্ঞাতা আত্মা। 'বিজানাতীতি বিজ্ঞানম্'। স্থিরমতি-কৃতভাষ্য। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবাদী আচার্য বসুবন্ধু তদীয় "ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তি-কারিকা"য় উল্লিখিত বিজ্ঞানের 'বিপাক', 'মনন' ও বিষয়বিজ্ঞপ্তি নামে তিনপ্রকার পরিণাম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলয়বিজ্ঞান বসুবন্ধুর মতে বিপাক, পরিণাম এবং কল্পিত সর্বধর্মের, সর্বপ্রকার বিজ্ঞানের মূল স্থান—'সর্ববীজকম্'[১] এইভাবেই বসুবন্ধু এবং লঙ্কাবতার বিজ্ঞানবাদ সমর্থন করিয়াছেন।

জগদ্‌ভ্রমের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানবাদী আত্মখ্যাতিবাদী। বিজ্ঞানবাদী বলেন, জ্ঞানব্যতীত কোন বিষয়েরই সত্তা প্রমাণ করা যায় না। জ্ঞানে ভাসিলে তবেই জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত এবং সমর্থিত হয়। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, জ্ঞানই বস্তুতঃ জ্ঞেয়। অন্তরের অবস্থিত জ্ঞানই জ্ঞেয়াকারে রূপায়িত হইয়া থাকে। বাহ্যবস্তু বলিয়া কিছুই নাই। কল্পিত বাহ্যশুক্তিতেই অন্তর্জ্ঞেয় রজতের ভ্রম হইয়া থাকে। অন্তর্জ্ঞেয় ঐ জ্ঞান বা বুদ্ধিই আত্মা। কল্পিত বাহ্য-পদার্থে প্রকৃতপক্ষে আত্মারই ভ্রম হয়। এইজন্যই এই মত 'আত্মখ্যাতি' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।[২]

আত্মখ্যাতিবাদ ও তাহার খণ্ডন

১। (ক) বিপাকো মননাখ্যশ্চ বিজ্ঞপ্তি বিষয়স্য চ।
তত্রালয়াখ্যং বিজ্ঞানং বিপাকঃ সর্ববীজকম্‌॥

বসুবন্ধুকৃত ত্রিংশতি বিজ্ঞপ্তি কারিকা।

উক্ত কারিকার ব্যাখ্যায় আচার্য স্থিরমতি তদীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন—

আলয়াখ্যমিত্যালয়বিজ্ঞানসংজ্ঞকং যদ্ বিজ্ঞানং স বিপাক পরিণামঃ। তত্র সর্ব-সাংক্লেশিকধর্মবীজস্থানত্বাদালয়ঃ। আলয়ঃ স্থানমিতি পর্যায়ৌ। অথবা আলীয়ন্তে উপনিবধ্যন্তেঽস্মিন্‌ সর্বধর্মাঃ কার্যভাবেন ইত্যাদি ভাষ্যাংশ দ্রষ্টব্য।

২। যদন্তর্জ্ঞেয়রূপন্তু বহির্বদবভাসতে।
সোঽর্থো বিজ্ঞানরূপত্বাত্তৎপ্রত্যয়তয়াপি চ॥

—কমলশীলকর্তৃক তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকায় (৫৮২ পৃঃ) উদ্ধৃত দিঙ্‌নাগের কারিকা।

বিজ্ঞানবাদী বাহ্যশুক্তিতে জ্ঞানাকার রজতের বিভ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐ বাহ্যশুক্তিও বিজ্ঞানবাদীর মতে বস্তুতঃ জ্ঞানহইতে কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। উহা জ্ঞানেরই আকারবিশেষ। তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে একটি জ্ঞানপদার্থে অপর জ্ঞানপদার্থেরই ভ্রম হইয়া থাকে ইহাই বলিতে হয়। এইরূপ বিভ্রমে কোন-রূপ বাহিরের বস্তুর সম্পর্ক নাই বা থাকিতে পারে না। এই অবস্থায় 'বহির্বৎ প্রকাশতে' বাহিরের বস্তুর ন্যায় প্রকাশিত হয়, এইরূপ উপমার সার্থকতা কোথায়? ভ্রমস্থলে সর্বত্র জ্ঞানরূপ সৎপদার্থই অপর জ্ঞানস্বরূপ সৎপদার্থের বিভ্রমের অধিষ্ঠান, এইরূপ সিদ্ধান্তই বিজ্ঞানবাদীকে স্বীকার করিতে হয়। বিজ্ঞানবাদী কিন্তু তাহা করেন না। তিনি অন্তরের বাহিরে বিরাজমান এই দৃশ্যমান বিশ্বের প্রতীতির অপলাপ বা নিষেধ করিতে না পারিয়া, কল্পিত বাহ্য পদার্থেই আন্তর বিজ্ঞানের আরোপ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কল্পিত বাহ্যশুক্তি প্রভৃতি জ্ঞানহইতে ভিন্নরূপেই অসৎ। ঐরূপ অসৎ কল্পিত রজতেই রজতাকার জ্ঞান বা জ্ঞানাকার রজতের বাহ্যবৎ প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু কথা এই যে, বাহ্যস্বরূপে বাহ্যবস্তু যদি একেবারেই অসৎ বা অলীক হয়, তবে 'বাহ্যবৎ প্রকাশতে', ইহা কিছুতেই বলা যায় না। বাহ্যবস্তুর ন্যায় প্রকাশিত হয় ইহা বলিতে গেলেই, বাহ্যবস্তুর সত্তা অবশ্যই বিজ্ঞানবাদীকে মানিয়া লইতে হয়। সেই অবস্থায় বিজ্ঞানবাদীর নিজের বাণে নিজেরই অপমৃত্যু ঘটিবে নাকি?

ঐ মতের সমালোচনা

আর এক কথা এই, বিজ্ঞানবাদী ভ্রমের ক্ষেত্রে সর্বত্রই কল্পিত বাহ্য পদার্থে অন্তর্জ্ঞেয় বস্তুর, জ্ঞানাকার রজত প্রভৃতিরই ভ্রম স্বীকার করেন। জ্ঞানরূপ আত্মাই তাঁহার (বিজ্ঞানবাদীর) মতে অন্তর্জ্ঞেয়। সকল ভ্রমের ক্ষেত্রে অন্তর্জ্ঞেয় আত্মারই খ্যাতি বা প্রকাশ হইয়া থাকে বলিয়া, এই মত 'আত্মখ্যাতি' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রশ্ন এই, সর্বত্র অন্তর্জ্ঞেয় আত্মারই খ্যাতি হইলে, 'আমি রজত' এইরূপ জ্ঞান না হইয়া, 'ইহা রজত' এইরূপ জ্ঞান হয় কেন? ইহা সাপ এইরূপ জ্ঞান না হইয়া, আমি সাপ এইরূপ জ্ঞানোদয় হইতেই বা বাধা কোথায়? ভ্রমের স্থলে অন্তর্জ্ঞেয় জ্ঞানেরই ভ্রম হইলে, তাহাতে অবশ্য জ্ঞানরূপ আত্মাই প্রকাশিত হইবে। আত্মা 'অহম্'রূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতএব আলোচ্য আত্মখ্যাতি-

বাদেও আত্মা 'অহম্' আকারেই প্রকাশ পাইবে। 'আমি রজত', আমি সাপ, এইরূপেই আত্মার প্রকাশ ঘটিবে। এইরূপে আত্মার প্রকাশ বিজ্ঞানবাদীও স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহার আত্মখ্যাতিবাদকেও নির্বিবাদে মানিয়া লওয়া যায় না। শঙ্করোক্ত অধ্যাসভাষ্যের ভামতীতে বিভিন্ন খ্যাতিবাদের খণ্ডনপ্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্রও উল্লিখিত যুক্তিবলেই আত্মখ্যাতিবাদের অসারতা প্রদর্শন করিয়াছেন।[১] আত্মখ্যাতিবাদ, অসৎখ্যাতিবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন খ্যাতিবাদের পরিবর্তে অদ্বৈতবেদান্তী অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। পরিদৃশ্যমান এই ঘটাদি জগৎপ্রপঞ্চ এবং শুক্তিরজত প্রভৃতি প্রাতিভাসিক বস্তুরাজি সকলই সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে। জগৎপ্রপঞ্চকে সৎ, অসৎ প্রভৃতি কোনরূপেই নির্বচন করা চলে না, সুতরাং উহা অনির্বচনীয়। অনাদি অবিদ্যাবশে সত্য সনাতন পরব্রহ্মে ঐ অনির্বচনীয় জগতের ভ্রম হইয়া থাকে। এইজন্যই এই বিভ্রম 'অনির্বচনীয়-খ্যাতি' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শুক্তিতে যে রজতের ভ্রম হয় তাহার মূল অবিদ্যা। অবিদ্যা স্বয়ং অনির্বচনীয়, সুতরাং অবিদ্যার কার্যমাত্রই অদ্বৈতবেদান্তে অনির্বচনীয় আখ্যা লাভ করে। তবে শুক্তিরজতের শুক্তি অসৎ নহে, উহা ব্যাবহারিক ভাবে সৎ। জাগতিক ঘটাদি বস্তুও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সত্য, পারমার্থিকভাবে নহে। শুক্তিতে প্রতীয়মান রজতও অলীক নহে, উহা প্রাতিভাসিক সৎ। আত্মখ্যাতিবাদী জগৎপ্রপঞ্চকে স্বপ্নপ্রপঞ্চের ন্যায় প্রাতিভাসিক বা প্রতীতিকালীন সৎ বলিয়া গ্রহণ করিলেও, অদ্বৈতবাদী আত্মখ্যাতিবাদীর সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন নাই। ইহা আমরা "বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ"। ব্রঃ সূঃ ২।২।২৯। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অদ্বৈতবেদান্তী তাঁহার অনির্বচনীয়খ্যাতির সমর্থনে ও অপরাপর

১। বিজ্ঞানাকারতা রজতাদেরনুভবাদ্বা ব্যবস্থাপ্যেতানুমানাদ্বা। অনুভবোঽপি রজতপ্রত্যয়ো বা স্যাদ্ বাধকপ্রত্যয়ো বা। ন তাবদ্ রজতানুভবঃ; সহীদং-কারাস্পদং রজতমাবেদয়তি, ন ত্বান্তরম্, অহমিতি হি তদা স্যাৎ, প্রতিপত্তুঃ প্রত্যয়াদব্যতিরেকাৎ।

অধ্যাসভাষ্য-ভামতী ২৬ পৃষ্ঠা, নির্ণয়সাগর সং।

মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট তদীয় ন্যায়মঞ্জরীতে বাচস্পতির উল্লিখিত যুক্তির অনুরূপ যুক্তিবলেই আত্মখ্যাতিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। সুধীপাঠক ন্যায় মঞ্জরীর আলোচনা দেখিবেন।

খ্যাতিবাদের খণ্ডনে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের প্রারম্ভে আচার্য শঙ্কর অধ্যাসের স্বরূপের ব্যাখ্যায় আত্মখ্যাতি, অন্যথা-খ্যাতি প্রভৃতি বিভিন্ন খ্যাতিবাদের উল্লেখ ও খণ্ডন করতঃ অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদই সিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ভাষ্যোক্তির বিশ্লেষণে সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র তদীয় ভামতী টীকায় বিভিন্ন খ্যাতিবাদের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া ঐ সকল মতের অসারতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং শঙ্করোক্ত অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ সমর্থন করিয়াছেন।[১]

বিজ্ঞানবাদে জ্ঞানের জ্ঞেয়বিষয়াকারে পরিণতি এবং বিজ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞেয়বিষয়ের অস্বীকৃতি প্রতিবাদী দার্শনিকগণের অন্তর স্পর্শ করে নাই।

জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয়াকারে পরিণতি অসম্ভব পরিকল্পনা

বিজ্ঞানবাদীর সিদ্ধান্তে বিভিন্ন ক্ষণিকবিজ্ঞান প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জ্ঞেয়বিষয়ের আকারে পরিণতি লাভ করে। বিজ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞেয় বিষয় বলিয়া কিছুই নাই। ঘট প্রমুখ জ্ঞেয় বিষয়মাত্রই বিজ্ঞানের পরিণাম। বিজ্ঞানের ঐরূপ বিষয়াকারে পরিণাম বিজ্ঞানবাদীর মতে স্বভাবসিদ্ধ। বিজ্ঞানের স্বভাব অনুসারেই বিজ্ঞান দৃশ্যমান বিশ্বের আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের স্বভাব-বশতঃই শুক্তি-রজতাদি বিভ্রমের ক্ষেত্রে শুক্তি-বিজ্ঞান রজতাকারে পরিণত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের এইরূপ বিষয়াকার পরিণামে বিজ্ঞানের স্বভাব বা শক্তিবিশেষই কারণ, অন্যকোনও কারণ নাই। এজন্য জিজ্ঞাস্য এই, বিজ্ঞানের ঐরূপ স্বভাব বা শক্তিটি কি বস্তু? বিজ্ঞানের ঐ স্বভাব বা শক্তির নিয়ামক অপর কোনও বস্তু আছে কি না? না থাকিলে, বিজ্ঞানের সর্বদা জ্ঞেয় বিষয়ের আকারে পরিণাম ঘটিতেই বা আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? সেরূপ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বহির্বিশ্ব হইতে বিমুক্তি বা বিরতি এবং শুদ্ধ বিজ্ঞানরূপে অবস্থিতি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় নাকি? বিজ্ঞানের ঐরূপ (বিষয়াকারে পরিণতি) স্বভাব যদি অপর বিজ্ঞানস্বরূপ হয়, তবে সেই বিজ্ঞানও সতত পরিণামশীল বলিয়া, তাহারও নিয়ামক অপর বিজ্ঞান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে বিজ্ঞানবাদীর মতে অনন্ত বিজ্ঞানের

১। অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদের সমর্থনে বাচস্পতির আলোচনার সহিত পরিচিতিলাভের জন্য জিজ্ঞাসু পাঠককে আমরা অধ্যাসভাষ্যের ভামতী, কল্পতরু, পরিমল প্রভৃতি দেখিতে অনুরোধ করি।

অনন্ত স্বভাব বা শক্তির পরিকল্পনা না করিয়া গত্যন্তর থাকিবে না। অনন্ত শক্তিকল্পনার আশ্রয় লইতে হয় বলিয়াই, সাকারবিজ্ঞানবাদ অচল হইয়া দাঁড়ায়।

শূন্যবাদী মাধ্যমিকও বিজ্ঞানবাদীর সাকারবিজ্ঞান কল্পনা সমর্থন করেন নাই। শূন্যবাদই সমর্থন করিয়াছেন। মাধ্যমিক বৌদ্ধ শূন্যবাদ বলিয়া কি বলিতে চাহেন তাহা এই প্রসঙ্গে বিচার করা আবশ্যক। আমরা "অভাববাদ" বলিয়া এক নাস্তিত্ববাদের পরিচয় পাই। তাহাই শূন্যবাদ কি? ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতম "সর্বমভাবঃ।" ন্যায় সূঃ ৪।১।৩৭। সূত্রে অভাববাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহাকে বাৎস্যায়ন, বাচস্পতি প্রভৃতি দার্শনিকগণ শূন্যবাদীর মত বলিয়া ন্যায়-ভাষ্য, ন্যায়বর্তিক-তাৎপর্যটীকা প্রভৃতিতে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যানুসারে "সর্বং নাস্তি", এই নাস্তিত্ববাদ বা সর্বাভাববাদই শূন্যবাদ বলিয়া পরিচিতি লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধতার্কিক নাগার্জুন তদীয় মাধ্যমিককারিকা, বৃত্তি প্রভৃতিতে শূন্যবাদের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কিন্তু গৌতমোক্ত সর্বাভাববাদ নহে। সর্বাভাববাদীর মতে সমস্ত পদার্থই অসৎ। সর্বাভাববাদী অসৎখ্যাতিবাদী। তাঁহাদের মতে ভ্রমস্থলে সর্বত্র অসতের উপরই অসৎ পদার্থের আরোপ হইয়া থাকে। জ্ঞেয়ও অসৎ, জ্ঞানও অসৎ। সর্বাংশে অসতের ভ্রম স্বীকার করায় সর্বশূন্যতাবাদী অসৎখ্যাতিবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সর্বশূন্যতাবাদী আকাশকুসুম প্রভৃতি অলীক বস্তুর প্রত্যক্ষাত্মক বিভ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্বপ্রকার ভাবপদার্থকেই সর্বশূন্যতাবাদী নাস্তিকসম্প্রদায় আকাশকুসুম প্রভৃতির ন্যায় অলীক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন—

শূন্যবাদীর মত ও তাহার খণ্ডন

আকাশং শশশৃঙ্গঞ্চ বন্ধ্যায়াঃ পুত্র এব চ।
অসন্তশ্চাভিব্যজ্যন্তে তথা ভাবেষু কল্পনা॥

নাগার্জুনের মাধ্যমিকা কারিকা, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

সমস্ত ভাবপদার্থকেই নাগার্জুন চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান মশালের (অলাতচক্রের) ন্যায়, স্বপ্নে পরিদৃষ্ট মায়াকল্পিত বস্তুর ন্যায়, নির্মল জলাধারে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রবিম্বের ন্যায়, মরীচিজলের ন্যায় অসৎ বলিয়াই বর্ণনা

করিয়াছেন।[১] ভাববস্তুর কোন স্বকীয় স্বভাব নাই, সুতরাং তাহাদের কোনরূপ সত্তাও নাই—

"ভাবানাং নিঃস্বভাবত্বান্ন সত্তা বিদ্যতে যতঃ।

মাধ্যমিকা বৃত্তিঃ, ২৩ পৃষ্ঠা।

নিঃস্বভাব ভাবসকল সৎ নহে, অসৎ। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নাগার্জুনের শূন্যবাদ কিন্তু সর্বাভাববাদ বা পূর্ণ নাস্তিত্ববাদ নহে। তাঁহার চরম ও পরম তত্ত্বের বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, 'সর্বং নাস্তি', এইরূপ সর্বশূন্যতাবাদ তাঁহার অনুমোদিত নহে। পরমতত্ত্বকে নাগার্জুন বলিয়াছেন—

"নির্বিকল্প মনানার্থমেতত্তত্ত্বস্য লক্ষণম্।"

মাধ্যমিকা বৃত্তি, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

যাহা নির্বিকল্প এবং নানাপ্রকার নহে, তাহাই তত্ত্ব বলিয়া জানিবে। এই তত্ত্বের ব্যাখ্যায় নাগার্জুন বলেন—

"যাহার নিরোধ নাই, উৎপত্তি নাই, উচ্ছেদ নাই; যাহার আগমনও নাই, নির্গমনও নাই, যাহা একরূপ নহে, অনেকরূপও নহে, সর্ববিধ প্রপঞ্চের উপরতি বা নিবৃত্তি যেখানে আছে, সেই পরমশিবকে শূন্যবাদীর শূন্য বলিয়া বুঝিবে।"[২] শূন্য কিরূপ তত্ত্ব? এই প্রশ্নের উত্তরে নাগার্জুন বলেন,

"সদসৎ সদসচ্চেতি নোভয়ং বেতি কথ্যতে।"

মাধ্যমিকা কাঃ ১৩২ পৃষ্ঠা।

শূন্য বস্তুতঃ "(১) সৎও নহে, (২) অসৎও নহে, (৩) সৎ ও অসৎ, এই উভয় প্রকারও নহে, (৪) সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন কোন প্রকারও নহে। "সর্বদর্শনসংগ্রহে" মাধবাচার্যও উক্ত শূন্যবাদের ব্যাখ্যায় পূর্বোক্ত চতুষ্কোটি

১। অলাতচক্রনির্মাণস্বপ্নমায়াম্বুচন্দ্রকৈঃ।
ধূমিকান্তঃ প্রতিশ্রুৎকা মরীচ্যভ্রৈঃ সমোভবঃ॥
নাগার্জুন মাধ্যমিক কারিকা, ২০৬ পৃঃ।

২। অনিরোধমনুৎপাদমনুচ্ছেদমশাশ্বতম্।
অনেকার্থমনানার্থমনাগমমনির্গমম্।
যঃ প্রতীত্য সমুৎপাদং প্রপঞ্চোপশমং শিবম্॥
নাগার্জুনকৃত মাধ্যমিকাবৃত্তি, ৪ পৃষ্ঠা।

বিনির্মুক্ত শূন্যকেই "তত্ত্ব" বলিয়াছেন।[১] উক্ত শূন্যবাদের ব্যাখ্যায় "সমাধিরাজ সূত্রে" স্পষ্ট ভাষায় উক্ত হইয়াছে—"অস্তীতি নাস্তীতি উভেঽপি মিথ্যা" অর্থাৎ পদার্থের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, উভয়ই মিথ্যা। "মাধ্যমিক কারিকা"য়ও দেখা যায়,—"আত্মনোঽস্তিত্বনাস্তিত্বে ন কথঞ্চিচ্চ সিধ্যতঃ।" (মাঃ কাঃ তৃতীয় খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) "আত্মার অস্তিত্বও কোন প্রকারে সিদ্ধ হয় না, নাস্তিত্বও কোন প্রকারে সিদ্ধ হয় না। সুতরাং নাস্তিতাই শূন্যতা নহে। অতএব উক্তমতে সকল পদার্থই অসৎ বলিয়া নির্ধারিত না হওয়ায় শূন্যবাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায়কে কিরূপে অসৎখ্যাতিবাদী বলা যায়?"[২] নাগার্জুনোক্ত শূন্যবাদের ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, আলোচ্য চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত 'শূন্য'ই একমাত্র তত্ত্ব। আমরা যে-সকল বিশ্বপ্রপঞ্চকে সত্য বলি, তাহা পরমার্থতঃ সত্য নহে, উহা কাল্পনিক সত্য। এই কাল্পনিক সত্যেরই অপর নাম 'সংবৃতি' সত্য বা আবিদ্যক সত্য। সংবৃতি শব্দের অর্থ অজ্ঞান বা অবিদ্যা।[৩] বৌদ্ধগ্রন্থে সংবৃতি, বা সাংবৃত এই উভয় শব্দেরই ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে লৌকিক কল্পনা পরমার্থ তত্ত্বকে আবৃত করিয়াছে, সেই কাল্পনিক সত্যকেই বৌদ্ধ-গ্রন্থে সংবৃতি সত্য বা সাংবৃতিক সত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শূন্যবাদী মাধ্যমিক সাংবৃতিক বা কল্পিত সত্য এবং পারমার্থিক সত্য, এই দুই প্রকার সত্যই স্বীকার করিয়াছেন :—

(ক) দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশনা।
লোকে সংবৃতি সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ॥

মাধ্যমিক কারিকা।

(খ) সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং স্মৃতম্।
বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সংবৃতিরুচ্যতে॥

শান্তিদেবকৃত বোধিচর্যাবতার।

১। অতত্ত্বত্বং সদসদুভয়ানুভয়াত্মক চতুষ্কোটি বিনির্মুক্তং শূন্যমেব।
—সর্বদর্শনসংগ্রহে—বৌদ্ধদর্শন।

২। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশের ন্যায়দর্শনের টিপ্পনী, ৪অঃ ২য় আঃ ৩৭ সূত্র।

৩। সমন্তাদ্ বরণং সংবৃতিঃ। অজ্ঞানং হি সমন্তাৎ সর্বপদার্থতত্ত্বাবচ্ছাদনাৎ সংবৃতি রুচ্যতে। চন্দ্রকীর্তির মাধ্যমিকাবৃত্তি, ১ম পরিঃ, ১৮০ পৃষ্ঠা।

আলোচ্য সংবৃতি সত্য ও পারমার্থিক সত্যকে যদি অদ্বৈতবেদান্তোক্ত ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক সত্য দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা যায়, তবে এই মত এই অংশে যে অদ্বৈতবেদান্তের কাছাকাছি পৌঁছিবে তাহাতে সন্দেহ কি ?

অদ্বৈতবেদান্তীর ব্রহ্ম চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত শূন্য নহেন, ক্ষণিকও নহেন। ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, অক্ষর ও ভূমা। পরমার্থতত্ত্বের ব্যাখ্যায় একজন ক্ষণিকবাদী, আর একজন নিত্য সত্যব্রহ্মবাদী। সুতরাং শূন্যবাদীর শূন্যই ব্রহ্ম, এইরূপ অভিনব সিদ্ধান্ত কিরূপে গ্রহণ করা যায় ? আচার্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মবাদে বিজ্ঞানবাদেরই ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনাও উদ্ভট। শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ এইরূপ যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারা সত্যের অপলাপই করিয়া থাকেন। নাগার্জুন চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত শূন্যতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার সহিত অদ্বৈতবেদান্তীর মায়াবাদের সাদৃশ্য পরিস্ফুট। মায়াও যেমন সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে, সদসদ্ ভিন্নও নহে, নাগার্জুনের শূন্যতাও সেইরূপ সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসৎ এই উভয় প্রকারও নহে। সদসদ্ ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারও নহে।

'চতুষ্কোটি বিনির্মুক্তং শূন্যমিত্যভিধীয়তে'।

ইহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। অনেকে মনে করেন শঙ্করের মায়াবাদ বৌদ্ধোক্ত মায়াবাদ বা চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত শূন্যবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। অনির্বাচ্যবাদ শঙ্করের উদ্ভাবিত নহে। 'লঙ্কাবতারসূত্রে' 'প্রজ্ঞা-পারমিতা' প্রভৃতি গ্রন্থে অনির্বাচ্য মায়াবাদের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ হইতেই আচার্য শঙ্কর মায়াবাদ এবং জগন্মিথ্যাত্ববাদ গ্রহণ করিয়া, তাঁহার অদ্বৈতবেদান্তমত প্রচার করিয়াছেন, অদ্বৈতদর্শনের ব্যাখ্যায় শঙ্করের নিজস্ব কোনও দান নাই। আমরা এই প্রসঙ্গে শঙ্করমত ও বৌদ্ধ মতের তুলনামূলক যে আলোচনা করিলাম, সেই আলোচনা হইতে ভারতীয় দর্শনচিন্তায় শঙ্করের অবদান কতখানি তাহা সুধী পাঠক বুঝিতে পারিবেন। স্বীকারই করিলাম যে অনির্বাচ্য মায়াবাদ শঙ্করের উদ্ভাবিত নহে। কিন্তু তাহার জন্য বৌদ্ধের নিকট ধার করিতে হইবে কেন ? ঋগ্বেদীয় প্রসিদ্ধ 'নাসদীয় সূক্তে'ই অনির্বাচ্যবাদের মূল সূত্র নিহিত আছে দেখা যায়।

"নাসদাসী[illegible]-দানীম্" ॥ ঋগ্বেদ ১০মঃ, ১৩৯ সূক্ত, ১ম মন্ত্র।

আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্নপরং কিঞ্চনাস। ঐ ২য় মন্ত্র।

উল্লিখিত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির ঊষায় জাগতিক বস্তুসকল সত্যরূপেও নির্ধারণের যোগ্য ছিল না, আবার আকাশকুসুমের ন্যায় অসৎও ছিল না। সমস্ত বস্তুরাজিই তখন অনির্বাচ্য ছিল—"উভয়বিলক্ষণমনির্বাচ্যমাসীৎ" সায়নভাষ্য। আলোচ্য শ্রুতিতেই অনির্বাচ্যবাদের স্পষ্টতঃ নির্দেশ আছে। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী উল্লিখিত শ্রুতিদ্বয়কেই অনির্বাচ্যের শ্রৌত প্রমাণরূপে 'অদ্বৈতসিদ্ধিতে' উল্লেখ করিয়াছেন।

শূন্যবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহাও অবশ্য লক্ষনীয় যে, প্রাচীনকালে সর্বপ্রকার পদার্থের নাস্তিত্ব বা সর্বাভাববাদও শূন্যবাদ আখ্যা লাভ করিয়াছিল। ঐ মতবাদ যাঁহারা সমর্থন করিতেন, তাঁহারা অভাব হইতে তথাকথিত ভাব জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতেন এবং সর্বাভাববাদী বা সর্বশূন্যতাবাদী বলিয়া অভিহিত হইতেন। ঐরূপ নাস্তিক্যবাদ সুধী দার্শনিকের হৃদয় স্পর্শ করে নাই, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। উপরে আচার্য নাগার্জুনের ব্যাখ্যাত শূন্যবাদের যে পরিচয় দেওয়া গেল, ঐরূপ শূন্যবাদই মাধ্যমিক দার্শনিকসম্প্রদায়ের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' যে শূন্যবাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও সর্বাভাববাদ নহে। তিনি চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত শূন্যবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা আমরা ইতঃপূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। বৌদ্ধদর্শনের পরিসমাপ্তিতে মাধবাচার্য 'বোধিচিত্তবিবরণের' যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নোক্ত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

আকার সহিতা বুদ্ধির্যোগাচারস্য সম্মতা।
কেবলাং সংবিদং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ॥

সাকার বিজ্ঞানই যোগাচার দর্শনের অভিপ্রেত; নিরাকার বিজ্ঞান মাধ্যমিক শূন্যবাদীর অভিলষিত তত্ত্ব। নাগার্জুনের বিশ্লেষণের সহিত উক্ত শ্লোকের আলোচনা করিলে শূন্যবাদ যে সর্বাভাববাদ নহে তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। শূন্যবাদ সম্পর্কে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা সুধী চিত্তকে আবিল করিতেছে। সুতরাং এই মতের গভীর আলোচনা আবশ্যক। আমরা এখানে দিগ্দর্শনমাত্র করিয়াই বিরত রহিলাম।

বৌদ্ধোক্ত শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের সহিত অদ্বৈতবেদান্তের কোন কোন অংশে সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। বহির্জগতের পারমার্থিক সত্যতা খণ্ডনপ্রসঙ্গে এই সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শূন্যবাদী মাধ্যমিক এবং বিজ্ঞানবাদী যোগাচারদর্শনের সহিত পরমতত্ত্বে (Final Metaphysical stand) অদ্বৈতবেদান্তের বিপুল বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও, যে যুক্তিতর্কের দ্বারা অদ্বৈতাচার্যগণ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-প্রপঞ্চের পারমার্থিক সত্যতা খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার পিছনে নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যগণের সুনিপুণ বিচারশৈলী নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। অদ্বৈতচিন্তা-জগতের অপ্রতিদ্বন্দী সম্রাট্ আচার্য শঙ্কর তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে যথেষ্ট তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা সুধীমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আচার্য শঙ্করের সমসাময়িককালে ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করভাষ্য প্রণেতা আচার্য ভাস্কর, পরবর্তীকালে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজাচার্য, দ্বৈতবেদান্তী মধ্বাচার্য, সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি আচার্য শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। এই অভিযোগটি এতই ব্যাপক যে ইহাকে সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে অনেক মনীষীই দ্বিধাবোধ করিবেন। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান প্রবন্ধে বৌদ্ধদর্শন ও অদ্বৈতদর্শনের কোথায় কোন্ অংশে ঐক্য, আর কোথায় অনৈক্য, তাহার তুলনামূলক বিচার ও বিশ্লেষণ আমরা বিশেষ প্রয়োজন এবং প্রাসঙ্গিক বলিয়াই মনে করি।

অদ্বৈতবেদান্তমত ও বৌদ্ধমতের তুলনা

অদ্বৈতদর্শন মাধ্যমিক ও যোগাচারদর্শনের ছায়ামাত্র; উহা বৌদ্ধ-দর্শনেরই একটি প্রচ্ছন্ন রূপ—এই অভিযোগ সম্পর্কে অদ্বৈত দার্শনিকগণ সচেতন। এসম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্যও পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। অদ্বৈত-বেদান্তী বলেন, রামানুজ, মধ্ব, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি প্রতিবাদী দার্শনিকগণ বৌদ্ধদর্শন ও অদ্বৈতদর্শনের কেবলমাত্র একটা দিক্ দেখিয়াই একটি অনভিপ্রেত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সেই দিক্‌টি হইল 'নেতিবাচক' দিক্। মাধ্যমিক, যোগাচার ও অদ্বৈতবেদান্তে পরিদৃশ্যমান বিশ্বের বাস্তব সত্যতা স্বীকৃত হয় নাই, ইহা অবশ্য সত্য কথা। এই নিষেধাত্মক (negative) দিক্‌টিতে মহাযান বৌদ্ধমত ও অদ্বৈতবেদান্ত-মতের অংশতঃ মিল দেখিয়াই, বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত দুইটি দার্শনিক চিন্তাধারাকে এক ও

অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বিভ্রান্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। নিরপেক্ষ, সংস্কারমুক্ত পরিচ্ছন্ন মন লইয়া বস্তুতত্ত্ব বিচার করিতে গেলে, দুইটি বিশিষ্ট দার্শনিকমত কোন্ তত্ত্ব অস্বীকার করিল, শুধু তাহা দেখিলেই চলিবে না; কোন্ তত্ত্ব স্বীকার করিল তাহাও আলোচনা করিতে হইবে। অস্বীকারের ক্ষেত্রে মিল থাকিলেও, স্বীকারের ক্ষেত্রে যদি গুরুতর পার্থক্য দেখা দেয়, তবে দুইটি ভিন্নপথগামী দর্শনকে মূলতঃ এক বলিয়া অভিযোগ উত্থাপন করা নিতান্তই অসমীচীন। 'নেতিবাচক' ও 'ইতিবাচক' (Negative and Positive) দুইটি দিক্ সমানভাবে বিচার করিয়াই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইবে। অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বিজ্ঞেয় জগতের কোনরূপ বাস্তব সত্তা নাই; কিন্তু এই বিজ্ঞান এক অদ্বিতীয় শাশ্বত ও ধ্রুব। এই বিজ্ঞান বিশেষ্য-বিশেষণ, জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয় প্রভৃতি সর্বপ্রকার সম্বন্ধের অতীত, কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপ। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে বিজ্ঞানই একমাত্র সৎ হইলেও, এই বিজ্ঞান ক্ষণিক। 'উৎপদ্য বিনশ্যতি', ইহাই বৌদ্ধোক্ত বিজ্ঞানের স্বভাব। সততচঞ্চল ক্ষণিক বিজ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহকেই স্থির মনে করিয়া মানুষ ভুল করে। গতিচঞ্চল দীপশিখায় অনন্ত বহ্নিকণিকার স্রোত বহিয়া চলে। একের পর এক আলোর কণাগুলি উৎসারিত হইয়া মুহূর্তে মিলাইয়া যায়, তবু মনে হয়, একটি দীপ, একটি শিখা। এই একত্ব বা স্থিরত্ববোধ বিভ্রমমাত্র। বৌদ্ধসিদ্ধান্তে সৎ বা সত্তামাত্রই ক্ষণিক এবং ক্ষণিক অর্থই অনিত্য; সুতরাং সৎ বা অস্তিত্বের অর্থই দাঁড়াইতেছে অনিত্য। নিত্যবস্তুর এইমতে কোনরূপ অস্তিত্বই নাই।[১] অদ্বৈতমত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অস্তিত্ব অর্থই নিত্য। অনিত্য বস্তুর কোনপ্রকার বাস্তব অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না। যাহা বাস্তবিকই সৎ, তাহার বিলোপ, বিকার বা বিবর্তন ঘটিতে পারে না। এই অবস্থায় দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের তাত্ত্বিক অস্তিত্ব অস্বীকার করায় এবং একমাত্র ভূমা বিজ্ঞানেরই

১। যৎসত্তৎক্ষণিকং যথা জলধরঃ সন্তশ্চভাবা অমী
সত্তাশক্তিরিথার্থকর্মণি মিতেঃ সিদ্ধেষু সিদ্ধা ন সা।
নাপ্যেকৈব বিধান্যথা পরকৃতেনাপি ক্রিয়াদির্ভবেৎ
দ্বেধাপি ক্ষণভঙ্গ সঙ্গতিরতঃ সাধ্যে চ বিশ্রাম্যতি ॥
সর্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য কর্তৃক উদ্ধৃত বৌদ্ধাচার্য জ্ঞানশ্রীর কারিকা।

সত্যতা স্বীকার করায় যদি অদ্বৈতবাদীকে বিজ্ঞানবাদী বলিয়া ধরিয়াই লই, তথাপি একথা মানিতেই হইবে যে, বিজ্ঞানবাদীবৌদ্ধ অদ্বৈতবাদী নহেন, তাঁহারা বহুত্ববাদী। অপরপক্ষে, অদ্বৈতবাদীরাই কেবল অবিমিশ্র একত্ববাদী—যাহা বৌদ্ধসম্মত বহুত্ববাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। অদ্বৈতবাদী Monist, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ Pluralist। শূন্যবাদের সহিত অদ্বৈতবাদের বৈসাদৃশ্য আরও পরিস্ফুট। শূন্যবাদীর মতে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞেয় (Subject and Object) কাহারও কোনরূপ বাস্তব সত্তা নাই। বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বিজ্ঞেয় ,(দৃশ্য) বস্তুর অস্তিত্ব যেমন প্রমাণ করা যায় না, সেইরূপ বিজ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কব্যতীত বিজ্ঞানের কোন ধারণাই করা যায় না। বিজ্ঞেয় বিষয়ই জ্ঞানকে রূপ দিয়া থাকে। বিজ্ঞেয় বিষয় না থাকিলে বা বিজ্ঞেয় মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইলে, বিজ্ঞান দাঁড়াইবে কাহার ভিত্তিতে ? একদিকে প্রমাণ অসম্ভব, আর অন্যদিকে ধারণাই অসম্ভব। সুতরাং প্রমাণের অসম্ভাব্যতা ও স্বরূপের অসম্ভাব্যতা, এই দুই মিলিয়া যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয় তাহা হইল এই—পারমার্থিক তত্ত্ব বলিয়া কিছুই নাই ; কোন তত্ত্বই নাই। তত্ত্বের রাজ্যে মহাশূন্যতাই বিরাজ করে। এই শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব। এই Absolute negation বা সর্বাত্মক নিরঙ্কুশ নিষেধকে শুধু আমরা Bradleyর ভাষাতেই Metaphysics বলিতে পারি—"A man who is ready to prove that Metaphysics is impossible is a brother Metaphysician with a rival theory of his own."*

কোন Metaphysical Reality বা পরমার্থতত্ত্ব না মানাটাও এক প্রকার Metaphysics বা বিশেষ তত্ত্ব কিনা, এই প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করিব। এখানে এইটুকু অবশ্য বলিয়া রাখা ভাল যে, 'তত্ত্ব' কথাটি দুইটি বিভিন্ন অর্থে আমাদের দর্শনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া, ঐ দুইটি বিভিন্ন অর্থসম্পর্কে আমাদের বিভ্রান্তি উপস্থিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কোনও বস্তুর যথাযথ অস্তিত্বকেই 'তত্ত্ব' বলা হয়। পক্ষান্তরে, সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা উপস্থাপিত কোনও দার্শনিক মতবাদকেও

---

*Professor A. J. Ayer—Language, Truth and Logic—p.p. 34.

অধ্যাপক Ayer এখানে নিজের ভাষায় Bradleyর বক্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থিত করিয়াছেন—

Bradley—Appearance and Reality—Introduction দ্রষ্টব্য।

'তত্ত্ব' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কোনও বস্তুর অস্তিত্ব এবং সেই বস্তু-সম্পর্কিত কোন মতবাদের অস্তিত্ব এক কথা নহে। বস্তুর সত্তা বা সত্যতাই বস্তুতত্ত্ব। সেই তত্ত্বে পৌঁছিবার পথ হইল দার্শনিক মতবাদ। সুতরাং মতবাদ হইল তত্ত্বের আলোচনা ও বিশ্লেষণের সারসংকলন। শূন্যবাদী বলেন যে, বিজ্ঞান বা বিজ্ঞেয় বিশ্বপ্রপঞ্চ কাহারও পারমার্থিক সত্যতা নিরূপণ করা যায় না। সুতরাং metaphysics is impossible. তত্ত্বনিরূপণ দুরূহ। শূন্যবাদীর ঐরূপ মতবাদে পারমার্থিকতত্ত্বের কোন স্থান নাই। পারমার্থিক-তত্ত্ব নাই, শূন্যবাদীর এই উক্তিও পরমার্থ কিনা; সকলই শূন্য, 'সর্বংশূন্যম্', এই মতবাদও শূন্য কিনা? বৌদ্ধতার্কিক নাগার্জুন তাঁহার 'বিগ্রহব্যাবর্তনী' গ্রন্থে উল্লিখিত প্রশ্নের সুনিপুণ সমাধান প্রদর্শন করিয়াছেন।[১] শ্রীহর্ষ প্রমুখ অদ্বৈতাচার্যগণ নাগার্জুনের যুক্তি ও বিচারশৈলী হইতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা ও সাহায্যলাভ করিয়াছেন। কারণ, অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধেও অনুরূপ প্রশ্নই উঠিয়াছে—'জগৎ মিথ্যা', এই উক্তিটিও মিথ্যা কিনা? এই উক্তি মিথ্যা হইলে জগৎ সত্যই হইয়া দাঁড়ায়; সত্য হইলেও জগৎ সত্যই হয়। কেননা, ঐরূপ উক্তিটিও তো জগতেরই অন্তর্গত, জগতেরই অংশ, জগতের বাহিরে নহে। ফলে, জগৎ যে অন্ততঃ অংশতঃ সত্য হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? জগতের এই অংশটিই কেবল সত্য হইবে, আর বাকী সব মিথ্যা হইবে, এইরূপ কোনও খামখেয়ালী নিয়ম বা অনুশাসন তর্কের ভিত্তিতে সুগঠিত দর্শনের রাজ্যে অচল। শব্দাদ্বৈতবাদী মহাবৈয়াকরণ ভর্তৃহরি তাঁহার 'বাক্যপদীয়'গ্রন্থে, শ্রীহর্ষ 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে', আচার্য মধুসূদন সরস্বতী 'অদ্বৈত-সিদ্ধিতে' আলোচ্য প্রশ্নেরউত্তর দিয়াছেন।* তাঁহাদের উত্তর ও বিচারের ধারা, বিশেষতঃ খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থে শ্রীহর্ষের বিচারপদ্ধতি নাগার্জুনের তর্কলহরীর কথাই সুধী পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীহর্ষের খণ্ডনরীতি যে অনেকাংশে নাগার্জুনের খণ্ডনশৈলীরই অনুরূপ, এবং শ্রীহর্ষ যে বৌদ্ধতার্কিক নাগার্জুনের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদরূপে অভিযুক্ত করার পিছনে ইহাও একটা কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়। সুনির্দিষ্ট বিচারাংশে শূন্যবাদ

১। নাগার্জুনের বিগ্রহব্যাবর্তনী দ্রষ্টব্য।

*এই সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জগতের মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্ব-নিরুক্তি পর্যায়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সুধী পাঠক সেই আলোচনা দেখিবেন।

ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে পদার্থবিশ্লেষণের পদ্ধতিতে (Logical method) মিল থাকিলেও, পরমার্থতত্ত্বের ধারণা ও ভাবনার ক্ষেত্রে উভয়মতের বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়। শূন্যবাদের সিদ্ধান্তে বস্তুতত্ত্বের সত্যতা (Metaphysical Reality) অসম্ভব পরিকল্পনা। আমরা শুধু বস্তুর ব্যবহারিক (Conventional) অস্তিত্বকেই মানিতে পারি। ইহার পিছনে কোনও নিরঙ্কুশ, নিরপেক্ষ স্বাধীন বস্তুসত্তা স্বীকার করিতে পারি না। যুক্তির ক্ষেত্রে তাহা অচল। অদ্বৈতবাদে পরমার্থ সত্যতা (Metaphysical Reality) শুধু সম্ভব তাহাই নয়। ইহা স্বয়ংভব, স্বয়ংজ্যোতিঃ, ধ্রুব, নিত্য এবং আনন্দঘন। ইহাই বিজ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হইল—Logical Positivism। এই মতবাদেরও সার সংকলন করিলে দাঁড়ায় এই যে, তত্ত্ববিজ্ঞান অসম্ভব—Metaphysics is impossible। Philosophy বা দর্শনের একমাত্র কর্তব্য হইল আমাদের ধারণা ও ভাবনাকে বিচার ও বিশ্লেষণের (Logical analysis) মাধ্যমে যাচাই করা এবং সংশোধন করা। যেখানে তর্কের আলোকপাত সম্ভবপর হয় না, এমন কোন তত্ত্ব নাই বা থাকিতে পারে না। এই সর্বাত্মক নিষেধের পূজারী পাশ্চাত্য দার্শনিকবৃন্দ (Absolute negativists) তাঁহাদের মূল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ১৮ শত বৎসর পূর্বের ভারতীয় দার্শনিক নাগার্জুনের নিকট দর্শনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করিতে পারেন। মাধ্যমিক বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুনও তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বিচার ও বিশ্লেষণের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে চাহেন নাই। তর্কের বাহিরে তত্ত্ব নাই, ইহাই তাঁহারও অভিমত। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে তত্ত্ব তর্কের সীমার বাহিরে। তর্কের দ্বারা তত্ত্বের নিরূপণ ও মীমাংসা সম্ভবপর নহে।[১] তর্কের পটভূমিতে সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে বলিয়াই, অদ্বৈতবেদান্তী দৃশ্যমান অনির্বচনীয় বিশ্বপ্রপঞ্চের আধাররূপেও এক অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ বিজ্ঞানময় তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ঐ বেদান্তবেদ্য তত্ত্ব তর্কের অগম্য। তর্কের যেখানে শেষ, তত্ত্বের সেখানেই প্রকাশ। বহির্মুখ ইন্দ্রিয়রাজির সাহায্যে দৃশ্যমান প্রপঞ্চের কথঞ্চিৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভবপর হইলেও, ইন্দ্রিয়ের অগম্য, অবাঙ্মনসগোচর জগদাধার সচ্চিদানন্দ তত্ত্বকে তর্কের

১। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।
ব্রঃ সূঃ ২।১।১১। এই সূত্রের ভাষ্য ও ভামতী দ্রষ্টব্য।

পথে জানিবার সম্ভাবনা কোথায়? তর্ক হইতে তত্ত্বে পৌঁছিবার পথ তার্কিকসুলভ নহে। তত্ত্ববিজ্ঞানের পথ উপলব্ধি বা অনুভূতির পথ। [From Logic to Metaphysics, the step is not logical but Alogical.]

দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানের মধ্যে কোন কোন সিদ্ধান্তে আংশিক সাদৃশ্য থাকিলেই যদি দুইটি দর্শন এক হইয়া যাইত, তবে পৃথিবীর সকল দার্শনিক মতবাদই মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যাইত। দার্শনিক চিন্তারাজ্যে এমন কোনও দুইটি দার্শনিক প্রস্থান দেখান সম্ভবপর নহে, যাহাদের মধ্যে কোনও ক্ষেত্রে কোনও রূপেই কোন মিল নাই। সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য প্রকাশাত্মযতি তাঁহার 'পঞ্চপাদিকা বিবরণ' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন—দুইটি দার্শনিক মতবাদের মধ্যে কোন অংশে সাম্য থাকিলেই যদি মৌলিক দুইটি দার্শনিক সিদ্ধান্ত এক ও অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে প্রভাকর, কুমারিল, জৈন, বৌদ্ধ, চার্বাক প্রভৃতি সকল দর্শনই একাকার হইয়া মিলিয়া যাইবে। চার্বাক সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর মানেন না। পূর্বমীমাংসকেরাও বিশ্বস্রষ্টা সর্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকার করেন না। চার্বাক স্বর্গ, দেবতা, পরলোক মোক্ষ স্বীকার করেন না। প্রভাকরও শরীরী দেবতা, স্বর্গ ও মোক্ষ স্বীকার করেন না। চার্বাক বেদের প্রামাণ্য মানেন না, পূর্বমীমাংসকগণ বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিধিবাক্যসমূহের স্বাধীন প্রামাণ্য মানেন বটে, কিন্তু বৈদিক মন্ত্রসংহিতার স্বতন্ত্র প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। যজ্ঞীয় বিধিব্যবস্থায় বিনিযুক্ত হয় বলিয়াই বৈদিকমন্ত্রসমূহের গৌণ প্রামাণ্য মীমাংসক আচার্যগণ সমর্থন করিয়া থাকেন। প্রভাকরের মতে অনুভূতিই প্রমাণ। বৌদ্ধ এবং জৈনমতেও জ্ঞানই প্রমাণ। অনুভূতি ক্ষণিক, সুতরাং প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি সম্পূর্ণই ক্ষণিক। জৈনগণ ভেদাভেদবাদী, কুমারিলও ভেদাভেদবাদী।* অতএব যেই

---

* শ্লোকবার্তিক অভাব পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

স্বরূপ পররূপাভ্যাং নিত্যং সদসদাত্মকে।
বস্তুনি জ্ঞায়তে কিঞ্চিদ্রূপং কৈশ্চিৎকদাচন॥

শ্লোক বাঃ শূন্যবাদ ১২ শ্লোক।

নহ্যত্যন্তমভেদোঽস্তি রূপাদিবদিহাপি নঃ। শ্লোক বাঃ, শূন্যবাদ, ১৯ কাঃ।
অত্যন্ত ভিন্নতাপ্যস্তি নৈব কস্যচিদিষ্যতে।
সর্বং হি বস্তুরূপেণ ভিদ্যতে ন পরস্পরম্॥ শ্লোক বাঃ শূন্যবাদ ১০৫ শ্লোক।

যুক্তিতে অদ্বৈতবেদান্তদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন এক। সেই একই যুক্তিতে প্রভাকর অর্ধেক চার্বাকপন্থী এবং অর্ধেক বৌদ্ধপন্থী। কুমারিল অর্ধেক জৈনপন্থী ও অর্ধেক চার্বাকপন্থী। এইরূপে প্রতিবাদীর যুক্তির অসারতা প্রদর্শন করিয়া, যাঁহারা অদ্বৈতমতবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রকাশাত্মযতি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়াছেন।

প্রকাশাত্মযতি বলিয়াছেন—

প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, বিজ্ঞানের আধারে বিশ্বপ্রপঞ্চকল্পিত। সুতরাং বহির্জগতের অস্তিত্ব বাস্তবিক নহে, কাল্পনিক। এইরূপ অভিমত বিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধ এবং অদ্বৈতবেদান্তী তুল্যভাবেই পোষণ করেন। অতএব এই অংশে উভয় মতের সাম্য সুধী দার্শনিক অস্বীকার করিতে পারেন না, ইহা সত্য কথা। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই, আপনারা অদ্বৈতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বৈতবাদীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞানে বিজ্ঞেয় বিষয় প্রতিভাসিত হয়। সুতরাং আপনারা (দ্বৈতবাদীরা)ইবা বিজ্ঞানবাদী হইবেন না কেন? আপনারা অবশ্য বলিতে পারেন যে, আমাদের (দ্বৈতবাদিগণের) মতে বিজ্ঞানে বিজ্ঞেয় বিষয় প্রতিভাসিত হয় ঠিকই, তবে এই প্রাতিভাস কখনও হয় সত্য, কখনও বা হয় মিথ্যা। ফলে, আমরা (দ্বৈতবাদীরা) সত্যজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের পার্থক্য ব্যাখ্যা করিতে পারি। কিন্তু আপনাদের (অদ্বৈতবাদী এবং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের) সিদ্ধান্তে জাগতিক সর্ববিধ জ্ঞানই যখন স্বপ্নতুল্য, তখন সত্য ও মিথ্যা জ্ঞানের প্রভেদ আপনারা করিবেন কেমন করিয়া? জগৎসত্যতাবাদীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে আমরা বলিব—জাগতিক বস্তুজ্ঞানের ব্যাপারে আপনারা দ্বৈতবাদীরা যেরূপে সত্য ও মিথ্যার তফাৎ করেন, আমরাও অনুরূপভাবেই সত্য ও মিথ্যা-জ্ঞানের তফাৎ করিয়া থাকি। আপনারা ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সত্য ও মিথ্যার প্রভেদের রেখা টানিয়া থাকেন। যে সকল ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আপনাদের অভীষ্ট ফল লাভ হয়, সেই জ্ঞানকে আপনারা সত্য বলেন, অভীষ্ট ফল লাভ না হইলেই জ্ঞানকে মিথ্যা সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। ফলের দ্বারা জ্ঞানের যাচাই করিয়াই মানুষকে লৌকিক জগতে চলিতে হয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং জ্ঞানের অর্থ ক্রিয়াকারিত্ব—[illegible] জীবনে আপনাদের (দ্বৈতবাদিগণের)

স্তায় আমরা অদ্বৈতবাদীরাও মানিয়া চলি।[১] তবে, আমরা শুধু এইটুকু বলি যে, সত্য ও মিথ্যার এই ধারণা কেবল ব্যবহারিক জগতের জ্ঞানগরিমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অনাদিকাল প্রচলিত এই লৌকিক ব্যবহারপদ্ধতির ভিতর দিয়াই জাগতিক জীবনের দৈনন্দিন কাজকর্ম চলিয়া যায়। সমাজ ও সংসারজীবনে চলার পথে কোনরূপ বাধাই উপস্থিত হয় না। এইজন্যই ফলের দ্বারা যাচাই করিয়া সংসারী জীব সত্যকে বলে সত্য, মিথ্যাকে বলে মিথ্যা। জ্ঞানের এইরূপ সত্য ও মিথ্যার ব্যাখ্যা দার্শনিকের যুক্তি-তর্ক, বিচার ও বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে জীবনের গতির উপর। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা বিরাট কল্পনার বিলাস বলিয়া ধরিয়া লইলেও ব্যবহারিক সত্য ও মিথ্যার ক্ষেত্রে কোনও প্রকার ইতরবিশেষ ঘটে না। সত্য ও মিথ্যার এই লৌকিক ধারণা কল্পিত বিশ্বের একটা কাল্পনিক রীতিমাত্র। যুক্তির দ্বারা এই রীতিকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করাও যেমন সম্ভবপর নহে, আবার অনাদিকাল সঞ্চিত এই কল্পনার সূত্রকে সহজে ছিন্ন করাও কষ্টসাধ্য। সংসারজীবনে কাজ চলাইবার একটি চিরাচরিত প্রথা হিসাবেই ইহা মানিয়া লওয়া সম্ভবপর। অদ্বৈতীরাও সেই হিসাবেই ইহা মানিয়া লইয়াছেন। এই মুহূর্তে আমার জ্ঞানের পরিধিতে যাহা রূপা বলিয়া প্রতিভাসিত হইল, পরমুহূর্তে তাহাই আবার একখণ্ড ঝিনুক হিসাবে প্রতিভাত হইল। প্রথম জ্ঞানটিকে বলিলাম মিথ্যা, দ্বিতীয়টিকে বলিলাম সত্য। কিন্তু কেন? যাহাকে এতদিন ঝিনুক বলিয়া ধারণা করিয়াছি, ইহার দ্বারা সেই ধরণের কাজ চলে বলিয়াই তো? আর দশজনেও ইহাকে ঝিনুক হিসাবে দেখিয়া থাকে বলিয়াই তো? অনন্ত কালের মাপকাঠিতে অনন্তব্রহ্মাণ্ডে ইহাই চিরন্তন সত্য, একথা শপথ করিয়া কে বলিতে পারে? অসীম বিশ্বের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবী নামক একটি বিন্দুতে ততোধিক ক্ষুদ্র মানুষনামক কয়েকটি প্রাণী সত্য ও মিথ্যার যে ধারণা লইয়া সংসারের হাটে বেচা কেনার কারবার চালাইতেছে, নিখিল-বিশ্বও সেইমতে চলিয়াছে, চলিতেছে এবং চলিবে, ইহা কি রাজার আদেশ? আমার জ্ঞানে রূপা ও ঝিনুক যেইরূপ যেইক্রমে প্রতিভাসিত হইল, এই প্রতিভাসের বাহিরের রূপা বা ঝিনুক, কে সত্য, কে মিথ্যা, ইহাদের

১। পঞ্চপাদিকা বিবরণ—Lazarus Edition p. 84, তত্ত্বদীপন p. 296 দ্রষ্টব্য।

বাস্তবরূপই বা কি, তাহা আমি কি করিয়া বলিব? ইহাদের প্রাতিভাসিক সত্তাসম্পর্কে আমি নিঃসংশয়। এই প্রতিভাসের বাহিরের কোন স্বতন্ত্র বস্তুরূপকে আমি সত্য বা মিথ্যা কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। রূপার রূপে রূপায়িত ঝিনুক সত্তার খণ্ডিত অভিজ্ঞতাকে যখন সামগ্রিকভাবে জগতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, তখন আমরা ব্যবহারিক সত্তার রাজ্যেই বিচরণ করি। ঝিনুকে রূপার জ্ঞান নিছক আমার ব্যক্তিগত বিভ্রম। ব্যবহারিক সত্তার ব্যাপারে তফাৎ এই যে, আরও দশজন আমার মতই ঝিনুককে রূপা বলিয়া ভ্রম করে, আমিও আরও দশজনের মতই ভুল করি। এইরূপে ব্যক্তিগত বিভ্রম সামগ্রিক ভ্রমে পরিণত হইলে, প্রাতিভাসিক সত্তা ব্যবহারিক সত্তায় রূপান্তরিত হয়। ভ্রম যেখানে ব্যাপক ও সামগ্রিক রূপ পরিগ্রহ করে সেখানে একের অভিজ্ঞতা দশের অভিজ্ঞতার সহিত মিলিয়া যায়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার মিলনের ফলে ভ্রম সত্যে পরিণত হয় না। ভ্রম ভ্রমই থাকে। (That an error is collective does not make it true)। সুতরাং পারমার্থিকভাবে জগৎ সৎ কি অসৎ তাহা বলিবার উপায় নাই। এইজন্যই অদ্বৈতমতে জগৎকে বলা হয় অনির্বচনীয়। কেবলমাত্র জগতের ব্যবহারিক সত্যতাই এই মতে স্বীকৃত হইয়া থাকে। দ্বৈতবাদীও এই ব্যবহারিক সত্তার বাহিরে যাইতে পারেন না। আর, ব্যবহারিক সত্তাতো প্রাতিভাসিক সত্তারই সামগ্রিক উন্নততর সংস্করণমাত্র। (The collective elevation of an individual illusion)। এই অবস্থায় বিজ্ঞানে বিজ্ঞেয় বিষয়ের প্রাতিভাসিক সত্তা দ্বৈতবাদীকেও নত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রাতিভাসিক সত্তার ক্ষেত্রে তাহা হইলে দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ প্রভৃতি সকলেই একমত। বিজ্ঞেয় বিষয়ের প্রাতিভাসিক সত্তার অতিরিক্ত পারমার্থিক সত্তার প্রশ্নে দ্বৈতবাদের সহিত অদ্বৈত ও বৌদ্ধ মতের মতদ্বৈধ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে (প্রাতিভাসিক সত্তার ব্যাখ্যায়) তো সকল মতেরই অনুমোদন রহিয়াছে দেখা গেল। অতএব বিজ্ঞানের আধারে জগৎ-কল্পিত, এই সিদ্ধান্তের জন্য অদ্বৈতবেদান্তবাদ ও বিজ্ঞানবাদ যদি অভিন্ন হয়, তবে বিজ্ঞানে জ্ঞেয় বিষয়ের প্রাতিভাসিক সত্তা আছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করারজন্য দ্বৈতবাদীকেও বিজ্ঞানবাদী বলিতে আপত্তি কি?

দ্বৈতবাদীর অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রকাশাত্মযতি তদীয় 'বিবরণে' যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, ইহাই তাঁহার (প্রকাশাত্মযতির) নিগূঢ় রহস্য বলিয়া মনে হয়।[১] প্রকাশাত্মযতির বক্তব্যের সহিত আমরা আরও একটু যোগ করিয়া বলিতে পারি—বহির্জগতের বস্তুসত্তা অস্বীকার করারজন্য যদি বিজ্ঞানবাদ ও অদ্বৈতবাদ এক হইয়া যায়, তবে পরিদৃশ্যমান বিশ্বের বাস্তব সত্তা স্বীকার করার জন্য চার্বাকদর্শন ও দ্বৈতদর্শন এক বা অভিন্ন হইয়া যায় না কেন? দ্বৈতবাদীরা কি নিজেদের চার্বাকপন্থী বলিতে রাজী হইবেন?

এই প্রসঙ্গে আমরা আরও একটি গুরুতর প্রশ্নের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে আচার্য শঙ্কর বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিতে সযত্ন তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে অসতর্ক পাঠকের বিভ্রান্তি সৃষ্টিরও যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

'নাভাবউপলব্ধেঃ'। ব্রঃ সূঃ ২।২।২৮।
'বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ'। ব্রঃ সূঃ ২।২।২৯।

এই দুইটি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন প্রসঙ্গে যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে দ্বৈতবাদীর যুক্তিতর্কেরই অনুরূপ। বহির্বিশ্বের পারমার্থিক অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য দ্বৈতবাদীর মুখেও ঐ সকল কথাই আমরা শুনিতে পাই। ইহা কেবল মুখবদল মাত্র। অদ্বৈতবাদী যদি বলেন, বিজ্ঞানাতিরিক্ত স্বতন্ত্র বিজ্ঞেয় বস্তুর ব্যবহারিক সত্যতা প্রদর্শন করিবার জন্যই আমরা (অদ্বৈতবাদীরা) ঐ সকল সূত্র-ভাষ্যোক্ত যুক্তিবিন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইলে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও বলিতে পারেন, আপনারা (অদ্বৈতবেদান্তীরা) যাহাকে ব্যবহারিক সত্তা বলেন, আমরা (বিজ্ঞানবাদীরা) তাহাকেই সাংবৃতিক বা সাংব্যবহারিক সত্তা বলি। দুইটি শব্দের অর্থ একই। আমরা যাহাকে সাংব্যবহারিক বলিয়াছি, আপনারা তাহাকেই ব্যবহারিক বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। শুধু কথার ঘোর-ফের ছাড়া আমাদের ও আপনাদের অভিমতের মধ্যে বাস্তবভেদ

১। ননু বিজ্ঞানে প্রপঞ্চস্য কল্পিতত্বং তব তস্য চ তুল্যম্। সত্যম্। বিজ্ঞানে প্রতিভাস্য-মানত্বং চ তব তস্য চ তুল্যমিতি বিজ্ঞানবাদস্তদীয়ং দর্শনং কিং ন স্যাৎ?

পঞ্চপাদিকা বিবরণ, ৮৪ পৃঃ ন্যাজারাস্ সং।

তো কিছুই নাই। এই অবস্থায় আমাদের মত (বিজ্ঞানবাদ) খণ্ডন করিয়া আপনাদের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইল? বিজ্ঞানবাদীর পক্ষ হইতে এইরূপ সম্ভাব্য প্রত্যুত্তর সম্পর্কে আচার্য শঙ্কর সম্পূর্ণ সচেতন। আচার্যের বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডনের এই আপাতবিরোধী প্রচেষ্টার তাৎপর্য অন্যদিক দিয়া বিচার করিতে হইবে। সেখানেই বিজ্ঞানবাদ ও অদ্বৈতবাদের মৌলিক প্রভেদ পরিস্ফুট হইয়াছে। 'নাভাব উপলব্ধেঃ'। ব্রঃ সূঃ ২।২।২৮। এই সূত্রভাষ্যের উপসংহারে ভাষ্যকার নিজেই বলিতেছেন—বিজ্ঞানবাদী অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—আমরা (বিজ্ঞানবাদীরা) যাহাকে স্বয়ংসিদ্ধ স্বপ্রকাশ বিজ্ঞান বলি, আপনারা (অদ্বয়ব্রহ্মবাদীরা) তাহারই স্থানে স্বয়ংভব জ্যোতিঃস্বরূপ সাক্ষি-চৈতন্যকে আনিয়া দাঁড় করাইলেন। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্তই তো আপনারাও (অদ্বৈতবাদীরাও) গ্রহণ করিতেছেন। বলার ভঙ্গিটুকুই আলাদা। শুধু নাম লইয়া বিবাদ করিতেছেন কেন? উত্তরে বলিব, না; শুধু কেবল কথার তফাৎই নহে। বস্তুতত্ত্বের বিচারেও উভয় মতের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান। আপনাদের বিজ্ঞান ক্ষণিক; উৎপত্তি ও বিনাশ উহার স্বভাবধর্ম। কাজেই উহা এক নহে, বহু। আমাদের ব্রহ্মবিজ্ঞান এক অদ্বিতীয় শাশ্বত চৈতন্যস্বরূপ। ভাষ্যের নিগূঢ় উক্তির ব্যাখ্যায় ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র বলিতেছেন—"আপনারা (বিজ্ঞানবাদীরা) বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশরূপ ধর্ম স্বীকার করেন। তাহা হইলেই বিজ্ঞান ফল বা কার্য হইয়া দাঁড়ায়। যে নিজেই ফলস্বরূপ, তাহার জ্ঞাতৃত্ব থাকিতে পারে না; অর্থাৎ ক্ষণিক বিজ্ঞান কোনমতেই জ্ঞাতা হইতে পারে না, উহা স্বপ্রকাশ এবং স্বয়ংসিদ্ধও হইতে পারে না। বাচস্পতির উক্তির তাৎপর্য এই যে, ক্ষণিক বিজ্ঞানে বিজ্ঞেয় বহির্জগতের সামগ্রিক অধ্যাসের কল্পনা সম্ভবপর নহে। সেরূপক্ষেত্রে বিজ্ঞেয় জগতের বস্তুসত্তাই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ভাষ্যকার শঙ্কর এই কথা বিচার করিয়াই বলিলেন—প্রদীপ যেমন অন্য জ্ঞাতার জ্ঞানে ভাসে এবং প্রকাশিত হয়, বৌদ্ধোক্ত ক্ষণিক বিজ্ঞানও সেইরূপ অপরের জ্ঞানে ভাসিবে এবং প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞান স্বপ্রকাশ নহে, পরপ্রকাশ; জ্ঞানস্বরূপ নহে জ্ঞেয়। এইরূপ বিজ্ঞান অদ্বৈতবেদান্তীর ব্রহ্মবিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করিতে পারে কি করিয়া?[1]

১। নাভাব উপলব্ধেঃ। ব্রঃ সূঃ ২।২।২৮ এই সূত্রের ভাষ্য, ভামতী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য

শূন্যবাদের খণ্ডন প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র ভামতীতে এই সম্পর্কে আরও স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। প্রমাণ-প্রমেয়াদি ব্যবস্থাও মূলতঃ ব্যবহারিকমাত্র। প্রামাণ্য বলিয়া কোনও পারমার্থিক ধর্ম নাই, এবিষয়ে শূন্যবাদী ও অদ্বৈতবাদী একই মত পোষণ করেন। কিন্তু কোন একটা সুস্থির বা ধ্রুব তত্ত্ব না থাকিলে, কাহার ভিত্তিতে কল্পনা রূপায়িত হইবে? দিকে দিকে প্রসারিত এই কল্যাণময়ী বিচিত্র ধরিত্রী একটা নিরংকুশ সর্বাত্মক নিষেধের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলে, 'নাই নাই' ইহাই বস্তুতত্ত্ব হইলে, সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠিতে পারে; কি নাই? কোথায় নাই? নিষেধের যেমন একটা বিষয় থাকা প্রয়োজন, সেইরূপ একটা আধার থাকাও প্রয়োজন। ইহা রূপা, ঝিনুক নহে; ইহা সূর্যকিরণ, জল নহে। এক্ষেত্রে শুক্তিতে ভ্রান্ত রজতের, সৌর কিরণমালায় ভ্রান্ত জলের নিষেধ করা হইতেছে। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, কোনও প্রকার স্থায়ী ভিত্তি (Positive background) না থাকিলে, নিষেধের (Negationএর) ধারণাই জন্মিতে পারে না। নিষেধকে (negationকে) প্রমাণ করিবার জন্যই ভিত্তির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। শূন্যবাদীর দর্শনে ভ্রমের বা নিষেধের কোনও প্রকার নিশ্চিত ভিত্তি বা Positive background নাই। সবই শূন্য; সুতরাং এইমতে 'সংবৃতি'ও শূন্য। অতএব শূন্যবাদে বস্তুর সাংবৃতিক সত্যের কল্পনাও অচল। নাম-জাতি-গুণ-ক্রিয়া প্রভৃতি বিকল্পের উৎপত্তি, স্থিতিরও শূন্যবাদে কোন স্থান নাই। এই অবস্থায় অসৎখ্যাতিবাদে বা শূন্যবাদে ভ্রমের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদর্শ করা সম্ভব হইবে কিরূপে? অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তে এইরূপ দোষের কোনই সম্ভাবনা নাই। কারণ, অদ্বৈতবেদান্তী ভ্রমের অধিষ্ঠানরূপে এক অদ্বিতীয় ভূমা বিজ্ঞানসত্তা স্বীকার করিয়াছেন। সেই শাশ্বত সচ্চিদানন্দেই জগৎ অধ্যস্ত হইয়া থাকে এবং তাহারই ফলে জগদাধার পরব্রহ্মের সত্তায় অনুপ্রাণিত বিশ্বের জীবের দৃষ্টিতে ভাতি হইয়া থাকে। এই ভাতি তথাকথিত সত্য

বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ। ব্রঃ সূঃ ২।২।২৯।

এই ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্যও এইদিক হইতেই বিচার করিতে হইবে। পরব্রহ্মে অধ্যস্ত ব্রহ্মসত্তায় অনুপ্রাণিত জগতের ব্যবহারিক সত্যতা থাকিলেও ক্ষণিক বিজ্ঞান-বাদীর সিদ্ধান্তে ক্ষণিক বিজ্ঞানে বিজ্ঞেয় জগতের সামগ্রিক অধ্যাস কল্পনা অসম্ভব বিষয়, জগতের ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ ও ক্ষণিক বিজ্ঞানের বৈষম্য অবশ্য

ও মিথ্যা, এই উভয় ক্ষেত্রেই তুল্য। অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ের সত্তা জ্ঞানোদয়ে ঐ ভ্রান্তির বিলোপও অবশ্যম্ভাবী। প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহারের ফলে উৎপন্ন সত্য ও মিথ্যা এই উভয়বিধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, মিথ্যাজ্ঞান অল্পকাল স্থায়ী, সত্যজ্ঞান কিছু অধিককাল স্থায়ী। এই কালিক তফাৎ বাদ দিলে ব্যবহারিক সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ভেদের রেখাটানা দুষ্কর। জ্ঞান সত্যই হউক, কি মিথ্যাই হউক, জ্ঞেয় বিষয়ের আপেক্ষিক সত্য অধিষ্ঠান যে আবশ্যক, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কোনও আধার না থাকিলে কোথায় কাহার আরোপ করিবে? শুক্তি না থাকিলে রজতের আরোপ হইবে কোথায়? 'নেতি'বাচক আরোপের অধিষ্ঠানে 'ইতি'বাচক তত্ত্বের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।[১] ক্ষণিক বিজ্ঞানকে তত্ত্ব বলিয়া ধরিয়া লইলেও এই সমস্যার সমাধান হইবে না। একটি ক্ষণিক বিজ্ঞানে একটি ক্ষণিক বিষয় শুধু এককক্ষণের জন্যই প্রতিভাত হইতে পারে—একথা মানিয়া লইলেও, অনন্ত দেশ-কালপরিব্যাপ্ত সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চের ভ্রান্তির অধিষ্ঠানে একটি নিরবচ্ছিন্ন সমগ্র তাত্ত্বিক সত্তার আবশ্যকতা অস্বীকার করা চলে না। তাহা না হইলে, অসংখ্য ক্ষণিক বিজ্ঞানে অসংখ্য ক্ষণিক বিষয় অসংখ্য ক্ষণে অসংখ্য আকারে প্রতিভাসিত হইবে, এক ক্ষণের বিজ্ঞানবিধৃত বিষয়ের সহিত অন্যক্ষণের বিষয় প্রতিভাসের কোনরূপ মিল থাকিবে না। এক ব্যক্তির জ্ঞানের সহিত অন্য ব্যক্তির জ্ঞানের কোনও সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া না গেলেও তাহাতে বিস্ময়ের কিছু থাকিবে না। আমার প্রত্যক্ষে যাহা চন্দ্র-সূর্য, অন্যের কাছে তাহা দুইটি নিস্প্রভ ধূলিকণা বলিয়া প্রতিভাত হইতেও কোন বাধা থাকিবে না। আমার একমুহূর্ত পূর্বের নীরব পুস্তকাধারটি পরমুহূর্তে কুকুরের মত শব্দ করিয়া ধাবিত হইলেও আশ্চর্যান্বিত হইবার কোনও কারণ ঘটিবে না। কিন্তু বহুদেশের বহুকালের বহুমানুষের অভিজ্ঞতার বিবিধ বৈচিত্র্য থাকিলেও, অনস্বীকার্য সাদৃশ্যও রহিয়াছে। উপলব্ধির এই সাদৃশ্যকে বাদ দিলে, ব্যবহারিক জগতের সকল কার্যধারা একদিনে বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। নিখিল বিশ্ব একটা উন্মাদাগারে পরিণত হইত। ব্যবহারিক জগতের এই সাদৃশ্য, সামঞ্জস্য, নিয়ম ও

১। আরোপশ্চ তত্ত্বাধিষ্ঠানো দৃষ্টো যথা শুক্তিকাদিষু রজতাদেঃ। নচেৎ কিঞ্চিদপি তত্ত্বং কস্য কস্মিন্নারোপঃ। তস্মান্নিষ্প্রপঞ্চং পরমার্থসদ্‌ব্রহ্মানির্বাচ্যপ্রপঞ্চাত্মনা-রোপ্যতে·····ইতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। ভামতী—ব্রঃ সূঃ ২।২।৩২।

শৃঙ্খলাকে ব্যাখ্যা করিতে হইলে, ইহার পশ্চাদ্‌ভূমিতে একটি ঐহিক সামগ্রিক তত্ত্বের স্বীকৃতি অপরিহার্য। এক বহুরূপে প্রতিভাত হয়। এই বহুত্বের সত্তা ব্যবহারিক, কিন্তু এই বহুত্বের ভিতর দিয়া যে ঐক্যের সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাই বহুত্বের পটভূমিতে অধিষ্ঠানরূপে একটি সামগ্রিক সত্তার ইঙ্গিত বহন করিয়া আনে। অগণিত ক্ষণিক বিজ্ঞানের অসংখ্য উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহের দ্বারা ব্যবহারিক জগতের সুষম সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করা চলে না।

এখন খুব সঙ্গত কারণেই একটি অনিবার্য প্রশ্ন আসিয়া পড়িবে—পরমার্থ তত্ত্বের ক্ষেত্রে Metaphysical দৃষ্টিভঙ্গিতে অদ্বৈতমত ও বৌদ্ধ মতের মধ্যে যখন এতবড় একটা বিরাট প্রভেদ রহিয়াছে; শুধু প্রভেদই নহে, দুইটি মত যখন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধগামী, তখনও দ্বৈতাচার্যগণ অদ্বৈত-মতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া অভিযুক্ত করিতেছেন কেন? তাঁহারা কি এতবড় একটা মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য না করিয়াই তাঁহাদের অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে অদ্বৈতবাদ ও বৌদ্ধবাদের মধ্যে যতটা মিল রহিয়াছে, তাহার গুরুত্ব কতখানি তাহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। দ্বৈতাচার্যগণ অন্ধ অবিবেচক নহেন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ অদ্বৈতমত ও বৌদ্ধমতের মধ্যে যতখানি সাদৃশ্যের সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার উপর তাঁহারা অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। উভয়মতের সাদৃশ্যাংশের উপর এইরূপ অসীম গুরুত্ব আরোপের কারণ কি?

সকল দার্শনিক মতবাদের পিছনেই দুইটি প্রধান জিজ্ঞাসাসূত্র বর্তমান রহিয়াছে—একটি হইল মানুষের মনোজগতের সহিত দৃশ্যমান্ এই বহির্বিশ্বের সম্পর্ক কি? দ্বিতীয়টি হইল, অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ ইহাদের পটভূমিতে কোনও সুস্থির বস্তুতত্ত্বের ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত কিনা? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধোক্ত শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের সহিত অদ্বৈত-বাদের অত্যাশ্চর্য সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য রহিয়াছে। অথচ দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে রহিয়াছে অলঙ্ঘনীয় বৈপরীত্য বা অসামঞ্জস্য। দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণের মতে এই বৈপরীত্য অবাঞ্ছনীয়। কারণ, দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর বহুলাংশে প্রথম প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভরশীল। প্রথম প্রশ্নটি হইল Epistemology

বা প্রামাণ্যবাদের প্রশ্ন। দ্বিতীয়টি হইল পরমার্থতত্ত্ব বা Metaphysics-এর প্রশ্ন। জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ সুষ্ঠু নিরূপিত না হওয়া পর্যন্ত, পরমার্থতত্ত্বের যথার্থ নিরূপণ সম্ভবপর হয় না। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, দার্শনিক চিন্তাজগতে চিন্তানায়কগণ সমগ্র দার্শনিকচিন্তাকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করিবার পক্ষপাতী—বিজ্ঞানবাদ ও বস্তুবাদ—Idealism and Realism। যে-শ্যামলা ধরিত্রীর রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ মাতৃ-গর্ভ হইতে মৃত্তিকাশয়ন পর্যন্ত আমাদের জীবননদের সত্তা ও গতিধারা নিয়ন্ত্রিত করে। হিমগিরি-কিরীটিনী জগল্লক্ষ্মীর যে বিরাট বৈচিত্র্য প্রতি-মুহূর্তে আমাদিগকে বিপুল বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত করে, সেই বিশ্ব-বৈচিত্র্যের মৌলিক অস্তিত্বকে যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যে চিন্তার অপরাপর ক্ষেত্রে শত সূক্ষ্ম মতভেদ থাকিলেও, তাঁহারা সকলেই বস্তুবাদী বা Realist. আর, দৃশ্যমান্ বিশ্বপ্রপঞ্চের অস্তিত্বকেই যাঁহারা সন্দেহ করেন, অথবা অস্বীকার করেন, সেই সকল দার্শনিকগণের নিজেদের মধ্যে মতভেদ সত্ত্বেও তাঁহারা সকলেই একই পথের পথিক। তাঁহাদের মৌলিক দার্শনিক চিন্তাকুসুম একই সূত্রে গ্রথিত। তাই তাঁহারা সকলেই বিজ্ঞানবাদী বা Idealist. বিজ্ঞানের এক অখণ্ড চিরন্তন সত্তাই স্বীকার করুন, অথবা খণ্ড খণ্ড ক্ষণিক বিজ্ঞানধারাই স্বীকার করুন, কিংবা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় বিশ্বপ্রপঞ্চের অস্তিত্বকেই আদৌ অস্বীকার করুন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। তবুও বলিব আপনাদের যাত্রাপথ এক এবং অভিন্ন। আপনাদের দার্শনিক চিন্তার প্রকৃতি এবং গতি একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—আপনারা কেহই এই সুন্দরী জগল্লক্ষ্মীর তাত্ত্বিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সর্বকালের সর্বলোকের অভিজ্ঞতায় আরূঢ় এই বহির্বিশ্বকে আপনারা (বিজ্ঞানবাদীরা) কোন্ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তাহাই হইবে আপনাদের দার্শনিক দলানুগত্যের মাপকাঠি। যেহেতু আপনারা সকলেই অগণিত জন-সাধারণের অনাদিকাল সঞ্চিত দৃঢ়মূল বিশ্বাসের পরিপন্থী তত্ত্ব প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, সেইজন্য আপনাদের মধ্যে নানা বিষয়ে বিবিধ মতভেদ সত্ত্বেও আপনাদিগকে একই দার্শনিকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিলে, তাহাতে অসঙ্গতির কথা কিছুই নাই। অদ্বৈতবেদান্তকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া প্রতিপন্ন করার পিছনে দ্বৈতাচার্যগণের ইহাই অন্যতম প্রধান যুক্তি বলিয়া মনে হয়।

সম্ভবতঃ তাঁহারা (দ্বৈতবাদী আচার্যেরা) আরও মনে করেন যে, বৌদ্ধমতের প্রতি আনুগত্যকে সুকৌশলে আড়াল করিবার জন্যই অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ বিজ্ঞানবাদীর অসংখ্য ক্ষণিক বিজ্ঞানের স্থানে এক অখণ্ড বিজ্ঞানসত্তাকে দাঁড় করাইবার প্রয়াস করিয়াছেন।

পরিদৃশ্যমান বিশ্বের অস্তিত্বখণ্ডনের বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ একটি কৌশলপূর্ণ যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ যুক্তি একই ভঙ্গিতে শূন্যবাদী এবং অদ্বৈতবাদী এই উভয়েরই মূল প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। শূন্যবাদীর প্রতিজ্ঞা হইল—সবই শূন্য। অদ্বৈতবাদীর প্রতিজ্ঞা হইল—জগৎ মিথ্যা। এই দুইটি প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদীর প্রশ্ন হইল—'সব শূন্য' শূন্যবাদীর এই উক্তিটিও শূন্য কিনা? অদ্বৈতবেদান্তীর 'জগৎ মিথ্যা' এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যটি মিথ্যা কিনা? আমরা এখানে প্রথম প্রশ্নটির রহস্যই সর্বাগ্রে আলোচনা করিতেছি। মাধ্যমিক আচার্য নাগার্জুন তাঁহার 'বিগ্রহ-ব্যাবর্তনী' গ্রন্থে এই প্রশ্নটি লইয়াই সুগভীর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ক্ষুরধার মনীষা, অপূর্ব বিচার ও বিশ্লেষণী শক্তির দ্বারা বিরুদ্ধবাদীর সর্বপ্রকার যুক্তি খণ্ডন করতঃ শূন্যবাদীর সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন। আচার্য নাগার্জুন তদীয় 'বিগ্রহব্যাবর্তনী'র প্রথম বিশটি কারিকায় ও তাহাদের ব্যাখ্যায় বিরুদ্ধবাদীর (দ্বৈতবাদী ও জগৎসত্যতাবাদীর) বক্তব্য ও যুক্তিলহরী অতি প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রতিবাদীর যুক্তিকে তিনি নিজের প্রয়োজনে বিন্দুমাত্রও কলুষিত করেন নাই। বিরুদ্ধ-বাদীর সমগ্র প্রতিরোধশক্তিকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, প্রতিবাদীর প্রত্যেকটি প্রশ্নের তিনি অপূর্ব সমাধান করিয়াছেন।

অদ্বৈতমত ও বৌদ্ধমতের যুক্তির সাদৃশ্য

প্রতিবাদীর (দ্বৈতবাদীর) প্রশ্নের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই—'সব শূন্য' শূন্যবাদীর এই উক্তিটি শূন্য কিনা? 'সব শূন্য' এই প্রতিজ্ঞাটিই যদি শূন্য হয়, তবে শূন্যবাদী কাহার দ্বারা কোন্ প্রমাণের সাহায্যে তাঁহার সর্বশূন্যতার প্রতিজ্ঞা উপপাদন করিবেন? প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি সবকিছুই তো এই মতে (সর্বশূন্যতাবাদী মাধ্যমিকের মতে) শূন্য। শূন্যের দ্বারা শূন্যের প্রতিষ্ঠা হইবে কিরূপে? যে নিজেই নাই, সে কি করিয়া পরিদৃশ্যমান্ এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের প্রতিষেধ করিবে? দ্বিতীয়তঃ সবই শূন্য হইলে, 'সব শূন্য' শূন্য-

বাদীর এইরূপ উক্তিও শূন্য হইতে বাধ্য। কারণ, উহাও তো 'সকলের'ই অন্তর্ভুক্ত। যদি বল যে, 'সব শূন্য' এই কথাটি শূন্য নহে, এতদ্‌ব্যতীত বাকী সকলই শূন্য, তাহা হইলে বলিব যে, তোমার (মাধ্যমিকের) 'সব-শূন্য' এইরূপ প্রতিজ্ঞাই মিথ্যা। 'সকল' হইতে একটি বাদ পড়িলেও 'সকল' আর সেক্ষেত্রে 'সকল' রহিল না। 'কিছু শূন্য, কিছু শূন্য নয়' এইরূপ অর্থই আসিয়া দাঁড়াইল। এক্ষেত্রে শূন্যবাদী যদি বলেন, বেশ তাহাই হউক, আমার কথার উহাই অর্থ। তবে আমরা (প্রতিবাদীরা) বলিব, কেবল মুখে বলিলেই তো চলিবে না। এইরূপ অর্থ করার অনুকূলে কি যুক্তি বা প্রমাণ আছে তাহা দেখাইতে হইবে। প্রত্যক্ষ অসম্ভব হইলে অনুমানের আশ্রয় লইতে হইবে। অনুমানের হেতু, সাধ্য, পক্ষ, দৃষ্টান্ত প্রভৃতির উপন্যাস করিতে হইবে। কিন্তু কোথায় হেতু, কোথায় দৃষ্টান্ত? যেখানে হেতু এবং দৃষ্টান্ত খুঁজিবে, সেই বহির্বিশ্বই তো নাই। সারা দুনিয়ার মধ্যে কেবল 'সব শূন্য' এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যটিই শুধু আছে। দীন দুনিয়ার আর তো কিছুই অবশিষ্ট নাই। এই অবস্থায় প্রতিবাদী মাধ্যমিকের প্রতিজ্ঞা-বাক্যটি অর্থহীন প্রলাপের মতই শুনাইবে। উহাকে সিদ্ধান্তের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা কোনমতেই সম্ভবপর হইবে না।

তারপর, আলোচ্য শূন্যবাদে কোনরূপ প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার সম্ভাবনাই বা কোথায়? সবই যদি শূন্য হয়, তবে প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা, প্রামাণ্য প্রভৃতিও শূন্যই হইবে। শূন্যের দ্বারা শূন্য প্রমাণিত হইতে পারে কি?

তৃতীয়তঃ 'সব শূন্য' এই কথার দ্বারা কে কাহার প্রতিষেধ করিতেছে? সর্ব কালে সর্ব দেশে যে বস্তু অসৎ, তাহার নিষেধ করা চলে কি? যেই বস্তুর নিষেধ বুঝায়, সেই বস্তু যদি কদাচ কোথায়ও না থাকে, তবে উহার নিষেধের ধারণাই জন্মে না, নিষেধেরও কোন অর্থ হয় না। 'মাটিতে ঘট নাই' বলিলে ঘটের মাটিরূপ একটি আধার থাকা চাই, এবং ঘট নামক একটি বস্তু এখানে এই মুহূর্তে না থাকিলেও, কোনও দেশে কোনও কালে ঘটের সত্তা একান্ত আবশ্যক। ঘটকে না জানিলে ঘটের অভাবকে জানা যায় না। আর অভাবের প্রতিযোগী ঘট সর্ব দেশে এবং সর্ব কালে অসৎ হইলে, ঘটের অভাবের ধারণাই কাহারও জন্মিতে পারে না। শুক্তি ও রজত

বলিয়া যদি কোন বস্তু না থাকিত, তবে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির শুক্তিতে রজতের ভ্রম সম্ভবপরই হইত না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, আকাশ-কুসুম বলিয়া তো কোন বস্তু কেহ কখনও দেখে নাই, আকাশ-কুসুম অত্যন্ত অসৎ বস্তু। কিন্তু আকাশ-কুসুম বলিলে আমাদের একটা অর্থের ধারণা তো জন্মে।[১] তাহা কি করিয়া সম্ভবপর হয়? এই আপত্তির উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, আকাশ ও কুসুমের জগতে অস্তিত্ব আছে বলিয়াই, আকাশ-কুসুম শব্দ শোনামাত্রই একটা শব্দার্থবোধ উদিত হইয়া থাকে। আকাশ-কুসুম নামে কোন বস্তু আছে কি না? আকাশের সহিত কুসুমের সম্পর্ক কি? এই সকল কথা তখন শব্দার্থের জ্ঞানোদয়ের মুহূর্তে শ্রোতার মনের মধ্যে ভাসে না। পরবর্তী সময়ে বস্তুবিচারের ক্ষেত্রেই আকাশ-কুসুম বলিয়া কোন বস্তু আছে কি না, এই সকল প্রশ্ন সুধী শ্রোতার মনে জাগরূক হয় এবং সুধী বুঝিতে পারেন, ঐরূপ শব্দজন্য একটা অর্থবোধ সাময়িকভাবে উদিত হইলেও আকাশ-কুসুম বলিয়া কোনও বস্তু নাই। আকাশ-কুসুম অসৎ, অলীক বিকল্পমাত্র—'শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্প'। যোগসূত্রঃ—১।৮। এইরূপ শশকের শৃঙ্গ না থাকিলেও, শশক ও শৃঙ্গের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই শশশৃঙ্গ প্রভৃতি কথার অর্থবোধ হইয়া থাকে। কিন্তু কোনদিন কোথায়ও যখন কিছুই নাই, সবই শূন্য, সবই ফাঁকা, এই অবস্থায় 'সর্বং শূন্যম্' এই শূন্যবাদীর প্রতিজ্ঞা নিরর্থক, কথার কথামাত্র হইয়া দাঁড়ায় নাকি?

জগতের সত্যতাবাদী দ্বৈতাচার্যগণের উল্লিখিত আপত্তি আপাতদৃষ্টিতে দুর্বার বলিয়া মনে হইলেও, আচার্য নাগার্জুন ঐ সকল প্রশ্নের যে সমাধান করিয়াছেন, যুক্তির দৃঢ়তায়, ভাবের গভীরতায়, এবং চিন্তার সাবলীল গতিতে তাহা অনবদ্য হইয়াছে। নাগার্জুনের উক্তির সুগভীর তাৎপর্য অদ্বৈতবাদীর হৃদয় জয় করিয়াছে। অদ্বৈতাচার্যগণ নাগার্জুনের সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত উক্তিতে আরও বিস্তৃততর করিয়া বিরুদ্ধবাদীর সর্বপ্রকার আপত্তির সুসমঞ্জস সমাধানের পথের নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা আমাদের ক্রমিক আলোচনায় প্রকাশ পাইবে। দ্বৈতবাদীর আক্রমণের বিরুদ্ধে নাগার্জুন বলিয়াছেন :—

নাগার্জুনের উত্তর ও সমাধান

যেই অর্থে আমি (নাগার্জুন) সব কিছুই শূন্য বলিতেছি, সেই অর্থে

১। অত্যন্তমসতি হ্যর্থে জ্ঞানং শব্দঃ করোতি হি। ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়।

'সব শূন্য' এই প্রতিজ্ঞাবাক্যটিও নিঃসন্দেহে শূন্য। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সবই শূন্য বলিয়া, আমার পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাও শূন্য হইতে বাধ্য। জগতের কোন তাত্ত্বিক সত্তা নাই বলিয়াইতো আমার কথাটিরও তাত্ত্বিক সত্যতা নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তাহা দ্বারা জগতের অস্তিত্ব কিরূপে প্রমাণিত হইল? যদি আমার কথাটির তাত্ত্বিক সত্যতা থাকিত এবং জগতের শূন্যতা আমার কথার উপরে নির্ভর করিয়া সিদ্ধ হইত, তবেই আপনাদের (দ্বৈতবাদী আচার্যগণের) আপত্তির অর্থ বুঝিতাম। জগতের সত্যতা আমার কথার উপরেই নির্ভরশীল কি? তাহা তো নহে। এই অবস্থায় আমার কথাটি নিরর্থক হইলেই বা জগৎ নিরর্থক বা শূন্য হইবে কেন? আমি বলিতেছি 'সব শূন্য', সব নিরর্থক, আমার কথাও শূন্য, কথাও নিরর্থক। আমার এই কথায় জগতের কি আসে যায়? জগৎ যাহা আছে তাহাই। আমার কথায় জগতের কিছুই আসে যায় না। বালকেরা শব্দ করিয়া গোলমাল করে, বয়োবৃদ্ধেরা শব্দ করিও না, গোলমাল করিও না বলিয়া বালকগণকে নিঃশব্দ করিয়া দেন। শব্দ করিয়া শব্দের নিষেধ করেন। কিন্তু আমি নাগার্জুন তো শব্দ করিয়াই জগতের নিষেধ করিতেছি না।[১] জগতের কোন ভাবস্বভাব নাই—এই বিষয়টি আমি কথা দ্বারা জ্ঞাপন করিতেছি মাত্র। আসল কথা, বস্তুবাদী আপনারা দৃশ্যমান বিশ্বের পারমার্থিক অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়া তর্কে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমি কোন কিছুই ধরিয়া লইয়া বিচার করিতেছি না। কোন কিছু ধরিয়া লওয়া অর্থই বিশ্বের শূন্যতা স্বীকার করা। প্রশ্ন হইতে পারে, কোন কিছু ধরিয়া না লইয়া লোকে কিভাবে তর্ক করিতে পারে? উত্তরে আমি বলিব, যাহা কিছু চারিদিকে দেখিতেছি তাহার ব্যবহারিক অস্তিত্বই শুধু ধরিয়া লইতেছি। ব্যবহারিক অস্তিত্বের ক্ষেত্রে আপনাদের সহিত আমার কোনরূপ বিবাদ নাই। জগতের ব্যবহারিক সত্তা আমিও মানি। কেবল বাস্তব সত্যতা জগতের যাহা আপনারা ধরিয়া

১। মা শব্দবদিতি নায়ং দৃষ্টান্তো যস্ত্বয়া সমারব্ধঃ।
শব্দেন তচ্চ শব্দস্য বারণং, নৈবমেবৈতৎ॥ বিগ্রহ ব্যাবর্তনী, ২৫ পৃঃ।

যথা কশ্চিন্মা শব্দং কার্ষীরিতি ব্রুবন্ শব্দমেব করোতি, শব্দঞ্চ প্রতিষেধয়তি, তদ্বৎ তচ্ছূন্যং বচনং ন শূন্যতাং প্রতিষেধয়তি।

নাগার্জুনকৃত বিগ্রহ ব্যাবর্তনী, ২৫ পৃঃ।

লইয়াছেন, তাহাই আমি মানি না। 'সবই শূন্য' আমার এই প্রতিজ্ঞা-ব্যাকটিরও ব্যবহারিক সত্যতাই শুধু আছে, বাস্তব সত্যতা কিছু নাই। আলোচ্য প্রতিজ্ঞার ব্যবহারিক সত্যতা পর্যন্ত অস্বীকার করিলে শূন্যবাদীর শূন্যতত্ত্বের উপদেশ দেওয়াও অসম্ভব হইয়া পড়ে নাকি?[1] এখানে আচার্য নাগার্জুন বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া না বলিলেও 'বিগ্রহব্যাবর্তনী'র আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি যে, নাগার্জুনের ব্যবহারিক সত্তা এই কথাটির ভিতরে দুইটি সত্তা মিশ্রিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল প্রকৃত ব্যবহারিক সত্তা অর্থাৎ Pragmatist or Conventional existence. বহির্জগত, ও মনোজগতের যেই সত্তা বা অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়া বিশাল মানবগোষ্ঠীর ব্যবহারিক জীবন প্রবাহ, লৌকিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়টি হইল—অভিধেয় সত্তা বা Logial existence. পরবর্তী যুগে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তি এবং শব্দাদ্বৈতবাদী মহাবৈয়াকরণ ভর্তৃহরি এই অভিধেয় সত্তার বিবরণ আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। ধর্মকীর্তির মতে "স্বলক্ষণ"রূপ ক্ষণিকবস্তু বা বস্তু-বিজ্ঞানই একমাত্র পরমার্থ-সত্য তত্ত্ব। ইহা কোন শব্দবাচ্য নহে। শব্দের দ্বারা স্বলক্ষণকে স্পর্শ করা যায় না। শব্দ বা শব্দসমষ্টি দ্বারা গ্রথিত বাক্যের অর্থ বিকল্পমাত্র—অর্থাৎ শব্দার্থের Logical existence বা ন্যায়ানুগ সত্তা আছে ইহা আমাদের মানসিক এক প্রকার বোধমাত্র। গো-শব্দের অর্থ গোসামান্য (Cow in general)—উহা যে-কোন গরুতেই সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু গো-সামান্য বলিয়া পৃথিবীতে কোন বস্তু নাই। যাহা আছে তাহা বিশেষ বিশেষ গোব্যক্তি, individual cow. তাহাও আবার প্রতিক্ষণে উৎপত্তি বিনাশশীল ভিন্ন ভিন্ন স্বলক্ষণের প্রবাহমাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই স্বলক্ষণকে ধরিয়া

১। অপি চ ন বয়ং ব্যবহারিক সত্যত্বমনভ্যুপগম্য, ব্যবহারসত্যং প্রত্যাখ্যায় কথয়ামঃ 'শূন্যাঃ সর্বভাবা' ইতি। নহি ব্যবহারিক সত্যত্বমনাগম্য শক্যা ধর্মদেশনাং কর্তুম্।

নাগার্জুনকৃত বিগ্রহব্যাবর্তনী, ২৮ পৃঃ।

শ্রীহর্ষ তদীয় 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে'র প্রারম্ভে জগতের বাস্তব সত্যতার সমর্থক ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি দ্বৈতবাদীর প্রশ্নের উত্তরে নাগার্জুনের অনুরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া তাহারই বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। সুধী পাঠক শ্রীহর্ষের আলোচনা দেখিবেন।

রাখিবার কোনও সামর্থ্য শব্দের নাই বা থাকিতে পারে না।[১] এইজন্যই বলিতে হয় যে, শব্দার্থ বস্তুতপক্ষে বিকল্পমাত্র। ইহা শুক্তিরজত বিভ্রমের ন্যায় বিপর্যয়ও নহে। বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি তাঁহার 'বাক্যপদীয়'গ্রন্থে এবং ভর্তৃহরির মতানুবর্তী নাগেশভট্ট তদীয় 'লঘুমঞ্জুষা'য় শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া যেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার (সেই সিদ্ধান্তের) সহিত বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুন প্রভৃতির সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য আছে। নাগার্জুনের ন্যায় ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন, মুখ্য সত্তা বা পারমার্থিক সত্তা শব্দের অর্থ নহে; শব্দের প্রকৃত অর্থ ঔপচারিক সত্তা,, গৌণসত্তা বা অভিধেয় সত্তা। এই অভিধেয় সত্তা বুদ্ধ্যারূঢ় সত্তা; এই বুদ্ধ্যারূঢ় সত্তাই শব্দের বাচ্য। কোনও শব্দ বা বাক্য প্রয়োগ করিলে আমাদের মনের মধ্যে একটা অর্থ জাগরূক হয়। ঐ অর্থবোধ্য বস্তু না থাকিলেও মানস অর্থবোধে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে না। ঐরূপ বস্তু বাস্তবজগতে থাকুক বা নাই থাকুক তাহাতে শব্দের অভিধেয় সত্তার কিছুই আসে যায় না।[২] শিশুদের ব্যাকরণে বাক্যের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—'বালিকাটি দৌড়াইতেছে'। যাহার সাধারণ শব্দার্থজ্ঞান আছে এমন বালকই ঐ বাক্যটির অর্থ বুঝিতে পারিবে, যদিও তখন সে কোন বালিকাকেই দৌড়াইতে দেখিতেছে না। মুখ্য সত্তানিরপেক্ষ এই যে মানসিক অর্থবোধ ইহাকেই অভিধেয় সত্তা বা

১। তস্মাদ্ বিশেষবিষয়া সর্বৈবেন্দ্রিয়জা মতিঃ।
ন বিশেষেষু শব্দানাং প্রবৃত্তাবস্তি সম্ভবঃ॥ ১২৭।
অনন্বযাদ্ বিশেষাণাং সংকেতস্যাপ্রবৃত্তিতঃ।
বিষয়ো যশ্চ শব্দানাং সংযোজ্যতে স এব তৈঃ॥ ১২৮।

ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্তিক প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ, ১২৭-১২৮ কাঃ।

ধর্মকীর্তির উক্ত কারিকার উপর মনোরথ নন্দীর টীকাও প্রজ্ঞাকর গুপ্তের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২। ব্যপদেশে পদার্থানামন্যা সত্তৌপচারিকী।
সর্বাবস্থাসু সর্বেষামাত্মরূপস্য দর্শিকা॥ ৩৯
প্রবৃত্তিহেতুং সর্বেষাং শব্দানামৌপচারিকীম্। ৫০
এতাং সত্তাং পদার্থো হি ন কশ্চিদতি বর্ত্ততে॥ ৫১

ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়, ৩য় কাণ্ড, সম্বন্ধ সমুদ্দেশ পরিচ্ছেদ (১১৫-১১৬, ১২১-১২২ পৃষ্ঠা) এবং হেলারাজের টীকা দেখুন।

Logical existence বলা যাইতে পারে। পাণিনি মতাবলম্বী গৌড়ীয় বৌদ্ধ বৈয়াকরণ পুরুষোত্তম তাঁহার 'কারকচক্রে' এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই বলিয়াছেন—সত্তা দুইপ্রকার বস্তুসত্তা এবং অভিধেয়সত্তা। ভূত, ভবিষ্যৎ বা অত্যন্ত অসৎ বস্তু ও অভিধেয়সত্তাকে অতিক্রম করে না।[১]

এই অভিধেয় সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে নাগার্জুনের অভিপ্রায় আমরা আরও সহজে বুঝিতে পারি। নাগার্জুনের 'সর্বংশূন্যম', 'সবই শূন্য', এই প্রতিজ্ঞা বাক্যটির দুইটি দিক আছে। একটি শুধু শারীর ব্যাপার (Physical fact), অর্থাৎ কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি বাগ্যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বায়ুর অভিঘাতের ফলে উৎপন্ন শব্দ-তরঙ্গ। কানন-কুন্তলা, গিরিকিরীটিনী এই ধরণীর যেমন ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু পারমার্থিক সত্যতা নাই, বাগ্যন্ত্রের বায়ুর অভিঘাতের ফলে সমুৎপন্ন শব্দতরঙ্গেরও সেইরূপ ব্যবহারিক সত্যতাই আছে, তাত্ত্বিক সত্যতা নাই। ঐ শব্দ-তরঙ্গও শূন্যস্বরূপই বটে। শব্দতত্ত্বের এই দিকটির কথা নাগার্জুন উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার আর একটি দিক তিনি উহ্য রাখিয়াছেন। 'সর্বংশূন্যম্' এই কথাটির একটি সামগ্রিক অর্থ আছে। বাক্যটি উচ্চারণ করিলেই আমাদের সেই সামগ্রিক বাক্যার্থের বোধ জন্মে। এইরূপ বাক্যার্থই বাক্যটির অভিধেয় সত্তা। এই বাক্যার্থেরও কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, তাহাও শূন্য। এখন কথা এই, জগতের বাস্তব সত্যতাবাদী কোন্ সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন—'সর্বং শূন্যম্' শূন্যবাদীর এই উক্তিটি শূন্য কিনা? যদি পারমার্থিক সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তবে উত্তরে আমরা (শূন্যবাদীরা) বলিব—হ্যাঁ, সবই শূন্য, এই উক্তিটিও শূন্য বৈ কি? কেননা, জগতে কোন বস্তুরই কোনরূপ পারমার্থিক সত্যতা নাই। যদি অভিধেয় সত্তা বা ব্যবহারিক সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্নটি উঠিয়া থাকে, তদুত্তরে বলিব 'সর্বং শূন্যম্' এই প্রতিজ্ঞারও ব্যবহারিক সত্যতা এবং অভিধেয়-সত্যতা অবশ্যই আছে। কিন্তু বাস্তব সত্যতা নাই। বাস্তব দৃষ্টিতে জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, অভিধা, অভিধাতা, অভিধেয় প্রভৃতি কিছুই নাই। সবই শূন্য। এই তাত্ত্বিক সত্যতার অভাবই মহাশূন্যতা বলিয়া জানিবে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বহির্জগতের শূন্যতা

১। সত্তা হি দ্বিবিধা বস্তুসত্তা অভিধেয় সত্তা চ......ভূতং ভবিষ্যদ্ অত্যন্তমসদ্ বা বস্তু অভিধেয়সত্তাং ন ব্যভিচরতি।

পুরুষোত্তমকৃত কারকচক্র, ১০২ পৃঃ বরেন্দ্ররিসার্চ সোসাইটি।

কোনমতেই ব্যাখ্যা করা যায় না ; তাহাতে আমাদের ব্যবহারিক জীবন অচল হইতে বাধ্য। সুতরাং জগতের মহাশূন্যতা তাত্ত্বিক দৃষ্টিতেই বুঝিতে হইবে।

শূন্যবাদীর 'জগৎ শূন্য' এই প্রতিজ্ঞা বাক্যটি শূন্য হইলে, জগৎ পূর্ণ হইয়া যাইবে, দ্বৈতবাদীর ইহা কি ধরণের যুক্তি ? জগৎ শূন্য, এইরূপ প্রতিজ্ঞাও শূন্য, ইহার অর্থ কি এইরূপ দাঁড়াইবে যে, জগৎ শূন্য নহে, পরিপূর্ণ। দ্বৈতবাদীর এইরূপ যুক্তির তো কোন মূল্য দেওয়া যায় না। 'আকাশকুসুম নাই' এইরূপ একটি কথা যদি না থাকিত, তবে কি প্রমাণ হইয়া যাইত যে, আকাশকুসুম আছে ? 'আকাশকুসুম নাই' এই বাক্যটির অভিধেয় সত্তা আছে। কারণ, 'আকাশকুসুমং নাস্তি' ইহা শুনিয়া আমাদের একটি সুস্পষ্ট বাক্যার্থ বোধের উদয় হইয়া থাকে। এখন যদি বলা যায় যে, 'আকাশকুসুম নাই' এই বাক্যটির অভিধেয় সত্তা আছে। অতএব আকাশকুসুমের তাত্ত্বিক সত্তা আছে, তবে রামচন্দ্র বনবাসে যাইবার ফলে বেহুলার বিধবা হইতে আপত্তি কোথায় ?

আমরা এখানে নাগার্জুনের বক্তব্য সম্প্রসারিত করিলাম এবং দেখিলাম, এই সম্প্রসারণের সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন সুপ্রাচীন অদ্বৈতাচার্য মহাবৈয়াকরণ ভর্তৃহরি। ভর্তৃহরি তাঁহার 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থের তৃতীয়কাণ্ডে, সম্বন্ধসমুদ্দেশ পরিচ্ছেদে প্রতিবাদীর এই জাতীয় বহু ছল-কলাপূর্ণ যুক্তি জালের সন্ধান দিয়াছেন এবং তাহাদের সমাধানের পথের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ন্যায়োক্ত সমবায়-সম্বন্ধ খণ্ডন করিতে গিয়া ভর্তৃহরি বলিলেন—সমবায় অবাচ্য। ইহা শুনিয়া প্রতিবাদী ছল প্রয়োগ করিলেন—আপনি যে সমবায়কে 'অবাচ্য' বলিলেন, এখন বলুন দেখি আপনার কথিত 'অবাচ্য' শব্দটির কোন বাচ্য আছে কিনা ? ভর্তৃহরি এই প্রসঙ্গে আরও একটি ছলের উল্লেখ করিলেন—'কোন লোক বলিল, 'আমি যাহা বলি সবই মিথ্যা।' তখনই প্রশ্ন হইবে 'সবই মিথ্যা' এই কথাটি মিথ্যা কিনা ? এই কথাটিও তো 'সবে'রই অন্তর্গত। তারপর, এই কথাটি মিথ্যা হইলে সবই সত্য হইবে কিনা ? এই জাতীয় ছল-কলার অপূর্ব সমাধান কৌতূহলী পাঠক ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়গ্রন্থে এবং ঐ গ্রন্থের উপর হেলারাজের যে সুগভীর ব্যাখ্যা আছে তাহাতে দেখিতে পাইবেন।[১]

১। অবাচ্যমিতি যদ্বাচ্যং তদবাচ্যতয়া যদা ।
বা[illegible]ত বাচ্যমেব তদা ভবেৎ ॥
বাক্যপদীয়, তৃতীয়কাণ্ড, সম্বন্ধসমুদ্দেশ পরিঃ ২০ কাঃ

অদ্বৈতসিদ্ধির মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্বনিরুক্তি পরিচ্ছেদে মহামনীষী মধুসূদন সরস্বতী প্রতিবাদী দ্বৈতবেদান্তীর জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা কি না? জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে জগৎ সত্য হইবে কি না? এইরূপ কূট প্রশ্নের সুন্দর সমাধান করিয়াছেন।* দ্বৈতবেদান্তী ব্যাসরাজ প্রভৃতির আক্রমণের বিরুদ্ধে মধুসূদন সরস্বতীর সমাধানের পদ্ধতি পর্যালোচনা করিলে, সুধী পাঠকের এইরূপ মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে মধুসূদনের সমাধান পথের মূলসূত্র বৌদ্ধতার্কিক নাগার্জুন ও প্রাচীন শব্দাদ্বৈতবাদী বৈয়াকরণ ভর্তৃহরির বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। শ্রদ্ধাশীল গবেষক তুলনামূলক বিচার করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, মধুসূদন সরস্বতী নব্যন্যায়ের বাচনভঙ্গীতে যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহার মৌলিক তাৎপর্য নাগার্জুন ও ভর্তৃহরির বক্তব্য হইতে পৃথক্ কিছু নহে। নাগার্জুন ও ভর্তৃহরির আলোচিত অভিধেয় সত্তা বা ঔপচারিক সত্তার দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে মধুসূদনের বক্তব্য আরও সহজে বুঝা যাইবে।

দ্বৈতবাদীর ঐরূপ ছল-কলার প্রয়োগ সম্পর্কে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আমরা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে করিতেছি। দ্বৈতবাদীরা নিজেদের বিরুদ্ধে এই জাতীয় ছল ও চাতুর্যের প্রয়োগকে অন্যায় বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন। অথচ তাঁহারাই আবার প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ছলের প্রয়োগ করিতেছেন কোন্ যুক্তিতে? নৈয়ায়িকেরা এক প্রকার জাতির (a type of fallacy) উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নাম "নিত্য সম"। নৈয়ায়িকের একটি প্রতিজ্ঞা হইল—শব্দ অনিত্য। এখানে প্রশ্ন হইল, শব্দের যে অনিত্যত্ব তাহা কি নিত্য, না অনিত্য? শব্দের অনিত্যত্ব এই বিশেষণটি কি শব্দে সর্বদাই বর্তমান থাকে, না থাকে না? যদি হ্যাঁ বলা যায়, অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বরূপ বিধেয় বিশেষণটি নিত্য বলিয়া সাব্যস্ত হয়,

সর্বং মিথ্যা ব্রবীমিতি নৈতদ্‌বাক্যং বিবক্ষ্যতে।
তস্য মিথ্যাভিধানে হি প্রক্রান্তোঽর্থো ন গম্যতে। উল্লিখিত গ্রন্থের ২৫ কাঃ
এই কারিকার উপর হেলারাজের টীকা দেখুন।
বর্তমানকালের বিখ্যাত দার্শনিক মনীষী Bertrand Russel ও দ্বিতীয় ছলটির সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন।

* আমরা এই পুস্তকের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্বনিরুক্তি'তে এই প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেই আলোচনা দেখিবেন।

তবে শব্দ নিত্যই হইয়া পড়ে। কারণ, ধর্মী নিত্য না হইলে তাহার ধর্ম নিত্য হইবে কিরূপে? ধর্মের সর্বদা সত্তাবশতঃ ধর্মী শব্দেরও সত্তা সর্বদা স্বীকার্য। অতএব শব্দ নিত্য ইহাও স্বীকার্য। যদি না বলা যায়, অর্থাৎ অনিত্যত্ব সর্বদা শব্দে থাকে না, শব্দের অনিত্যত্ব নিত্য নহে, অনিত্য, এইরূপ বলা যায়, তবে শব্দের অনিত্যত্ব অনিত্য হওয়ায় শব্দ যে সেক্ষেত্রে নিত্যই হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? উভয় প্রকারেই শব্দের নিত্যত্বই সিদ্ধ হয়, ইহাই ন্যায়োক্ত নিত্যসম জাতি।[১] অদ্বৈতসিদ্ধির লঘুচন্দ্রিকা টীকায় ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—"জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা কি না? প্রতিবাদী দ্বৈতবেদান্তী প্রভৃতির এই শ্রেণির প্রশ্নও ন্যায়োক্ত "নিত্যসম" জাতি অর্থাৎ ছল-কলাপূর্ণ fallacy বা যুক্ত্যাভাসেরই অন্তর্গত। এই জাতীয় প্রশ্নের দ্বারা দ্বৈতবাদী যদি জগৎপ্রপঞ্চের বাস্তবসত্তা প্রমাণ করিতে চাহেন, তবে এই একই যুক্তিতে দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতিকেও শব্দকে নিত্য বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে। নৈয়ায়িক তাহা মানিবেন কি? যে অপকৌশল দ্বৈতবাদীরা নিজেরা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন, সেই অপকৌশল তাঁহারা অপরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হন কোন্ যুক্তিতে? কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই, দ্বৈতবাদীর ঐজাতীয় প্রশ্নকে দ্বৈতবাদীর মতেও fallacy বা যুক্ত্যাভাস বলিব কেন? দ্বৈতবাদীরা ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহারাও ইহার গভীর দার্শনিক রহস্য বিচার এবং বিশ্লেষণ করেন নাই। নাগার্জুন, ভর্তৃহরি, শ্রীহর্ষ এবং মধুসূদন সরস্বতী তাঁহাদের গ্রন্থে ইহার দার্শনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে সুধী পাঠক বুঝিয়াছেন যে, অভিধেয় সত্তা ও পারমার্থিক সত্তাকে Logical existence ও Metaphysical existenceকে একাকার করিয়া মিলাইয়া

১। নিত্যমনিত্যভাবাদনিত্যে নিত্যত্বোপপত্তের্নিত্যসমঃ। ন্যায়সূত্র, ৫।১।৩৫। অনিত্যঃ শব্দ ইতি প্রতিজ্ঞায়তে। তদনিত্যং কিং শব্দে নিত্যমনিত্যম্? যদি তাবৎ সর্বদা ভবতি, ধর্মস্য সদাভাবাদ্ ধর্মিণোঽপি সদাভাব ইতি নিত্যঃ শব্দ ইতি। অথ ন সর্বদা ভবতি, অনিত্যত্বস্যাভবান্নিত্যঃ শব্দঃ। এবং নিত্যত্বেন প্রত্যবস্থানং নিত্যসমঃ। ন্যায়ভাষ্য, ৫।১।৩৫ সূত্র।

এইরূপ কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ছলের আশ্রয় লইতে হয় বলিয়া এই শ্রেণির যুক্তিকে নৈয়ায়িক যুক্ত্যাভাস বা fallacy বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ফেলিবার ফলেই ঐ জাতীয় বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের অবতারণা সম্ভব হইয়াছে। ব্যবহারিক সত্তাকে শেষ পর্যন্ত অভিধেয় সত্তার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর। আচার্য ভর্তৃহরিও তাহাই করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তবে পারমার্থিক সত্তা যে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তত্ত্ব, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

এবার আমরা নাগার্জুনের মূল বক্তব্যে ফিরিয়া যাই। বস্তু না থাকিলে আপনি (নাগার্জুন) প্রতিষেধ করিতেছেন কাহার ? আর, সকল ভাববস্তুর প্রতিষেধ যদি পূর্ব হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আপনার (নাগার্জুনের) 'সব শূন্য', এই বাক্যটি বলারইবা প্রয়োজন কি ? উত্তরে নাগার্জুন বলিতেছেন —যিনি প্রতিষেধ বা নিষেধ করিতেছেন, যেই বস্তুর প্রতিষেধ করা হইয়াছে এবং যেই উক্তি দ্বারা প্রতিষেধ ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহার কোন কিছুই বস্তুতঃ নাই। বস্তুর নাস্তিত্ব যে আমার 'সর্বং শূন্যম্' এই কথা হইতেই প্রমাণিত হইয়া থাকে, তাহা নহে।[১] আমার কথা শুধু পূর্বসিদ্ধ নিষেধ (প্রতিষেধ) জ্ঞাপন করে মাত্র। দেবদত্ত গৃহে না থাকিলেও যদি কেহ বলে, 'দেবদত্ত গৃহে আছে', তখন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন যে, 'না, দেবদত্ত গৃহে নাই'। এখানে দ্বিতীয় ব্যক্তির কথার উপরে দেবদত্তের গৃহে থাকা না থাকা নির্ভর করে না, কেবল দেবদত্তের গৃহে অনুপস্থিতি বিজ্ঞাপিত হয় মাত্র।[২] এই প্রসঙ্গে আবার আমরা ভর্তৃহরির সাহায্য লইয়া বলিতে পারি যে, দেবদত্তের গৃহে অভাব বা ভাব (নাস্তিত্ব বা অস্তিত্ব) উভয়ই বক্তার (দ্বিতীয় ব্যক্তির) বুদ্ধ্যারূঢ়। অভিধেয় সত্তার আকারে উপস্থিত অস্তিত্বকে অভিধেয় অভাববুদ্ধির দ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে। একমাত্র অভিধেয় সত্তা বা ঔপচারিক সত্তার ক্ষেত্রেই এইপ্রকার ভাব ও অভাবরূপ বিপরীতের মিলন সম্ভবপর।[৩]

১। প্রতিষেধয়ামি নাহং কিঞ্চিৎ প্রতিষেধ্যমস্তি ন চ কিঞ্চিৎ। তস্মাৎ প্রতিষেধয়সীত্যধিলয় এষ ত্বয়া ক্রিয়তে। নাগার্জুনকৃত বিগ্রহব্যাবর্তনী, ৬৩ পৃঃ।

২। যচ্চাহতে বচনাদসতঃ প্রতিষেধ বচনাসিদ্ধিরিতি
তত্র জ্ঞাপয়তে বাগসদিতি তন্ন তচ্চ ন প্রতিনিহন্তি।
বিগ্রহব্যাবর্তনী, ৬৪ পৃঃ।

নাগার্জুনের স্বকীয় বৃত্তি দেখুন।

৩। এবঞ্চ প্রতিষেধ্যেষু প্রতিষেধ প্রক্লিপ্তয়ে।
আশ্রিতেষূপচারেণ প্রতিষেধঃ প্রবর্ততে॥
ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়, ৩য় কাণ্ড, সম্বন্ধসমুদ্দেশপ্রকরণ, ৪২ কাঃ।

নাগার্জুন, ভর্তৃহরি ও মধুসূদনের উক্তির তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। ন্যায়শাস্ত্রের অমোঘ মূলসূত্র বলিয়া স্বীকৃত দুইটি নিয়ম—The Law of Excluded middle এবং Law of Contradiction—সম্পর্কে নূতন করিয়া চিন্তা করিতে হইবে।[১] হয়তোবা এই নিয়ম দুইটির বহুলাংশে সংস্কারসাধন করাও প্রয়োজন হইবে। সমসাময়িক পাশ্চাত্য দার্শনিক ও নৈয়ায়িকদিগের ভিতরে যাঁহারা এই পথে চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের নাগার্জুন, ভর্তৃহরি প্রমুখ প্রাচীন আচার্যগণের নিকট হইতে এই সম্পর্কে প্রভূত সাহায্য লাভ করিতে পারেন।

প্রতিবাদীর আরও একটি প্রশ্ন এই, সবই যদি শূন্য হয়, তবে প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয় প্রভৃতিও শূন্যবাদীর মতে শূন্যই হইবে। এই অবস্থায় আপনি (শূন্যবাদী) আপনার সর্বশূন্যবাদ প্রমাণ করিবেন কিরূপে? অন্ততঃ প্রমাণের সত্তা তো মানুন, নতুবা কিসের জোরে আপনি সবই শূন্য, এই শূন্যবাদ প্রমাণ করিবেন? আমরা (জগৎ সত্যতাবাদীরা) কি ধরিয়া লইতে পারিনা যে, আপনি প্রমাণের প্রামাণিক সত্তা মানিয়াই বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন? উত্তরে শূন্যবাদী বলেন, আপনারা প্রমাণের কিরূপ সত্তা মানিতে বলিতেছেন? পারমার্থিক সত্তা কি? প্রমাণ ও প্রমেয়ের পারমার্থিক সত্তা পূর্ব হইতে ধরিয়া লইলে, প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয় সিদ্ধির প্রয়োজন কি? শুধু তাহাই নয়, প্রমাণ না হইলে প্রমেয় সিদ্ধ হইবে না;

ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়ের উপর হেলারাজের টীকা ১১৭ পৃঃ দেখুন :—

"তদুক্তং ন সতাং চ নিষেধোঽস্তি সোঽসংস্তুচ ন বিদ্যতে।
জগত্যনেন ন্যায়েন নঙর্থঃ প্রলয়ং গতঃ। বাক্যপদীয়

যদাতুপচারসত্তাসমাবিষ্টঃ শব্দার্থ স্তদা সামান্যেন ভাবাভাবসাধারণতয়া……… তস্যাপি বুদ্ধ্যাকারভাবস্য ভাবৈকনিয়তত্বাৎ বুদ্ধিসত্তৈব সত্তা……তস্য যেয়ং বহীরূপতা ব্যাবহারিকৈ দূর্শ্যবিকল্পৈরাকারাদধ্যবসিতা তত্রৈব নিষেধঃ ফলতি"।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক ভর্তৃহরি ও হেলারাজের এই দৃষ্টিকোণ হইতে অদ্বৈতসিদ্ধির মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্ব নিরুক্তির আলোচনা করুন।

১। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য ন্যায়ের উল্লিখিত দুইটি মূলসূত্রের উল্লেখ করিয়া তদীয় কুসুমাঞ্জলিতে বলিয়াছেন :—

পরস্পর বিরোধে হি ন প্রকারান্তরস্থিতিঃ।
নৈকতাপি বিরুদ্ধানামুক্তিমাত্রবিরোধতঃ॥

আবার, প্রমেয় না থাকিলেও প্রমাণ সিদ্ধ হইবে না। প্রমাণ সিদ্ধ করিবে কাহাকে ? প্রমেয় থাকিলেই প্রমেয়ের সিদ্ধির জন্য প্রমাণের আবশ্যকতা। প্রমেয় না থাকিলে প্রমাণ কাহার সিদ্ধি সম্পাদন করিবে ? প্রমাণের প্রামাণ্যই বা সিদ্ধ হইবে কোথা হইতে ? অন্য প্রমাণের দ্বারা কি ? সেই অন্য প্রমাণের সিদ্ধি হইবে, তৃতীয় প্রমাণের সাহায্যে, তৃতীয় চতুর্থ প্রমাণের সাহায্যে, এইরূপে 'অনবস্থা' দোষ অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকার 'অনবস্থা'র ভয়ে প্রমাণের প্রামাণ্য যদি স্বতঃসিদ্ধ বল, তাহা হইলে আমিও বলিব যে, আমার শূন্যত্বও স্বতঃসিদ্ধ। সত্য কথা এই যে, প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতির কিছুরই পারমার্থিক সত্তা নাই; ব্যবহারিক সত্যতাই আছে। প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি ব্যবহার ও ব্যবহারিক জগতেরই অন্তর্গত। ব্যবহারিক জগতে প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতির ব্যবহার আমরা (বাদী ও প্রতিবাদী) সকলেই মানি। এখানে আমাদের Common ground বা মিল আছে। এইজন্য প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতির ব্যবহারিক সত্যতার ভিত্তিতে আমাদের উভয়েরই বাদযুদ্ধে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর। ইহার জন্য প্রমাণের পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। আচার্য শ্রীহর্ষ তাঁহার 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যে'র প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম অংশে প্রতিবাদীর এই জাতীয় প্রশ্নের অনুরূপ সমাধান করিয়াই দ্বৈতবাদীর সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীহর্ষের সূক্ষ্ম বিচারশৈলী নাগার্জুনের সিদ্ধান্ত সূত্রের সম্প্রসারণ বলিয়া মনে করিলে তাহাতে আপত্তির কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।[১] শ্রীহর্ষ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—প্রতিবাদীর প্রমাণাদির সত্যতা মানিয়া লইয়া বাদে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, এইরূপ কথা কেন বলিতেছেন ? প্রমাণাদির সত্যতা না মানিলে, বাদী ও প্রতিবাদী বস্তু বিচারের চিরাচরিত ব্যবহার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। কারণ, যখনই ব্যবহার মানিতে হয়, তখনই প্রমাণাদির সত্তা স্বীকার করিতে হয়, এইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ইহাই প্রতিবাদীর বক্তব্য কি ? প্রতিবাদীর এইরূপ অভিপ্রায় হইলে

১। দ্বাভ্যামপি বাদিভ্যাং বিচার প্রবৃত্ত্যাভিলষ্যমাণ তত্ত্বব্যবস্থা জয়মূলত্বেন ব্যবহারনিয়মস্ত স্বেচ্ছয়ৈব পরিগৃহীতত্বাৎ..........অবিদ্যমানাদিপারম্পর্যায়াতস্ত লোকব্যুৎপত্তি-সংগৃহীতসংবাদস্ত তস্ত অন্যথাভাবাসম্ভাব্য লক্ষণ স্বতঃসিদ্ধিপরিশুদ্ধত্বাৎ। তাদৃশ ব্যবহার নিয়মমাত্রেণৈব কথাপ্রবৃত্ত্যাপত্তেঃ।

শ্রীহর্ষ—খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, ৩২-৩৫ পৃঃ, চৌখাম্বাসং।

তাহার উত্তরে আমরা বলিব, ব্যবহার মানিতে হইলেই প্রমাণাদির সত্তা স্বীকার করিতে হইবে, ইহা কি রাজার আদেশ যে মানিতেই হইবে? চার্বাক, মাধ্যমিক প্রভৃতি তো তাঁহাদের দর্শনের যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শনের জন্য প্রতিপক্ষের সহিত যথেষ্ট বিচার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা তো প্রমাণাদির সত্যতা স্বীকার করেন নাই। প্রমাণাদির সত্যতা না মানিলে যদি বিচার অসম্ভব হয়, তবে আপনারা (প্রমাণের সত্যতাবাদীরা) চার্বাক মাধ্যমিক প্রভৃতির পক্ষ খণ্ডন করিতেছেন কি করিয়া? যদি বাগ্‌ব্যবহার (বাক্যের প্রয়োগ) অসম্ভব হয়, তবে বলিব যে, আপনারা বড় চমৎকার বাক্‌স্তম্ভন মন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার আর তুলনা নাই। আপনাদের এই মন্ত্রপ্রয়োগের ফলে মনে হয়, দেবগুরু বৃহস্পতি রুদ্ধবাক্ হইয়া গিয়াছেন। তিনি কোনদিন লোকায়ত দর্শন রচনা করেন নাই। ভগবান্ তথাগত মাধ্যমিক তত্ত্বের উপদেশ দেন নাই। ভগবৎপাদ শঙ্করও ব্যাসসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন নাই। শ্রীহর্ষের এই উক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীহর্ষের কথানুসারে লোকায়ত, মাধ্যমিক ও অদ্বৈতবাদ, এই তিন মতেই প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতির পারমার্থিক সত্যতা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু চার্বাক তো প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদী। তাঁহাকে মাধ্যমিক প্রভৃতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হইল কেন? এইরূপ আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই, কোন কোন চার্বাক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষপ্রমাণও মানেন নাই; সর্বাত্মক সন্দেহবাদ বা Universal agnosticismই প্রতিপাদন করার চেষ্টা করিয়াছেন। জয়রাশি ভট্টের "তত্ত্বোপপ্লবসিংহ" গ্রন্থ আবিষ্কার হইবার পর এই ধারণা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীহর্ষ প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতির অভাব সাধন করিবার জন্য শূন্যবাদীর যুক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, একথা অনস্বীকার্য। আবার জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞেয় পদার্থের অস্তিত্ব খণ্ডন করিবার জন্য, এবং জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব উপপাদনের জন্য তিনি (শ্রীহর্ষ) বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের যুক্তিসমূহেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। ধর্মকীর্তির বিখ্যাত কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন—"অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি।"[১] (ধর্মকীর্তির প্রমাণ লক্ষণ)।

জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব প্রতিপাদনে আচার্য ধর্মকীর্তি প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদের স্বসংবেদন অংশে অতলস্পর্শী গভীরতার নিদর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন। জ্ঞানের

১। খণ্ডনখণ্ড খাদ্য, ৮৮ পৃঃ, খণ্ডনের বিদ্যাসাগরী টীকা ৮৯ পৃষ্ঠা, চৌখাম্বাসং দেখুন।

স্বপ্রকাশত্বের এই সুগভীর বিচার পদ্ধতি অদ্বৈতাচার্যগণকে নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে শ্রীহর্ষ বৌদ্ধাচার্যদিগের নিকট ঋণ স্বীকারে কুণ্ঠিত হন নাই, বৌদ্ধমনীষিদের প্রতি অসহিষ্ণুতাও প্রদর্শন করেন নাই। জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব উপপাদন করার পর তিনি যেন অনুভব করিলেন, কোনও অসতর্ক পাঠক অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ও বৌদ্ধসিদ্ধান্ত এক ও অভিন্ন বলিয়া ভ্রম করিতে পারে। এইজন্য শ্রীহর্ষ অল্প কয়েকটি কথাতেই অদ্বৈতমত ও বৌদ্ধমতের প্রভেদ প্রতিপাদন করিতে যত্নশীল হইলেন। এবিষয়ে আর অধিক অগ্রসর না হইয়া বিশ্বপ্রপঞ্চের অনির্বাচ্যত্ব-সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। এই অনির্বাচ্যবাদের মুখবন্ধে আচার্য শ্রীহর্ষ সংক্ষিপ্তাকারে বৌদ্ধবাদ ও অদ্বৈত বেদান্তবাদের প্রভেদ কোথায়, তাহা প্রকাশ করিলেন।

সৌগত ও ব্রহ্মবাদীর প্রভেদ এই যে, সৌগতেরা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় সবকিছুকেই অনির্বাচ্য বলিয়া থাকেন। এইজন্য লঙ্কাবতারে ভগবান্ বলিয়াছেন :—

বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধার্যতে।
তস্মাদনভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাবাশ্চ দর্শিতাঃ॥

লঙ্কাবতার, ২য় অঃ ১১৬ পৃঃ, Bunyiu-edition

বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিলে কোন বস্তুরই স্বভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দৃশ্যমান বস্তুরাজি শব্দের দ্বারা প্রকাশের অযোগ্য, অনির্বচনীয় এবং স্বভাবশূন্য। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, বিজ্ঞেয় মিথ্যা হইলেও বিজ্ঞান সত্য, স্বয়ংজ্যোতিঃ এবং ধ্রুব। বিজ্ঞানসত্তায় অনুপ্রাণিত জগৎপ্রপঞ্চ সৎও নহে অসৎও নহে, উহা সদসদ্ বিলক্ষণ অনির্বাচ্য।

এই পর্যন্ত আমরা Epistemology বা জ্ঞানবাদের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধবিচারে অদ্বৈতমত ও বৌদ্ধমতের সাদৃশ্য লইয়া আলোচনা করিলাম। Epistemology, অর্থাৎ জ্ঞানবাদ ও প্রমাণবাদ দর্শন চিন্তার রাজতোরণ। দর্শনশাস্ত্রসমূহ এই তোরণ অতিক্রম করিয়াই পরমার্থ তত্ত্ব বিচারে অগ্রসর লইয়া থাকে। তত্ত্বের সাদৃশ্য অনেক অংশে Epistemology বা প্রমাণবাদের সাদৃশ্যের উপরই নির্ভরশীল। জ্ঞানবাদের প্রতিপাদ্য বা Corollary হিসাবেই তত্ত্ব (Metaphysics) উপস্থিত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে, তত্ত্বকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিবার জন্যই প্রমাণবাদ (Epistimology) দর্শনের প্রারম্ভেই আলোচিত হইয়া থাকে।

দর্শনচিন্তা-জগতে সমস্তই কার্যকারণ শৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত। প্রমাণ এবং প্রমেয়ের সম্পর্কও এই কার্য-কারণসূত্রেই গ্রথিত দেখিতে পাই। সুতরাং কোনও দর্শনচিন্তার মর্ম উপলব্ধি করিতে হইলেই কারণ ও কার্যের, প্রমাণের সহিত প্রমেয়ের সম্পর্ক প্রভৃতির আলোচনা অবশ্য কর্তব্য। শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, অদ্বৈতবাদ ও লোকায়ত মতবাদে আমরা দেখিতে পাই যে, উল্লিখিত কোন মতেই কার্য-কারণভাবের পারমার্থিক সত্তা কিছু নাই। কার্য-কারণ-সম্পর্কের বাস্তবতার খণ্ডনে উহাদের যুক্তিও অনেকটা একই প্রকার। ন্যায়োক্ত অনুমানের খণ্ডন-প্রসঙ্গে শ্রীহর্ষ তাঁহার 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে' যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাকে চার্বাকোক্ত যুক্তির বিস্তৃততররূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে কিছুই অন্যায় হয় না। ব্যাপ্তিজ্ঞানে ব্যভিচারের আশঙ্কা দূর হইবার নহে, ইহাই শ্রীহর্ষের প্রধান বক্তব্য। লোকায়ত দর্শনেও অনুমানের মূল ব্যাপ্তিজ্ঞানে ব্যভিচারের শঙ্কা অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়াই চার্বাক অনুমান-প্রমাণ খণ্ডন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য এই যে, অনুমানের মূল ব্যাপ্তিতে মানসিক ঘটনা হিসাবে (as a psychological events) ব্যভিচারের শঙ্কা আছে কিনা, তাহাই বড় কথা নয়। ঐ আশঙ্কা দূর করিবার কোন ন্যায়ানুগ ভিত্তি বা পথ (Logical ground) আছে কিনা, তাহাই প্রধানতঃ বিচার্য বিষয়। শ্রীহর্ষ দেখাইয়াছেন যে; অব্যভিচার নির্ণয়ের (বা ব্যভিচারের আশঙ্কা বিদূরিত করার) কোন ন্যায়সিদ্ধ পদ্ধতি নাই। নৈয়ায়িকসম্মত সামান্য প্রত্যাসত্তি তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। এক ধূমব্যক্তিদ্বারা ধূমত্ব সামান্যের জ্ঞান হয়, ধূমত্ব সামান্যের জ্ঞানের মারফতে ধূমত্বাবচ্ছিন্নরূপে সকল ধূমের জ্ঞানোদয় হয়। অনুরূপভাবে এক অগ্নিব্যক্তি দ্বারা অগ্নিত্ব সামান্যের মধ্য দিয়া সকল অগ্নির জ্ঞানগত উপস্থিতি সম্ভবপর হয়। ইহাই ন্যায়োক্ত সামান্য প্রত্যাসত্তি প্রত্যক্ষের মূল কথা। তর্কের খাতিরে গৌরবদোষ কলুষিত এইরূপ একটি অলৌকিক সম্বন্ধ যদি মানিয়াও লওয়া যায়, তথাপি তাহাদ্বারা নৈয়ায়িকের অভীষ্ট সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। অগ্নিত্ব সামান্যের মারফত সকল অগ্নির এবং ধূমত্ব সামান্যের মারফত সকল ধূমের উপস্থিতি হইলেইবা

কার্য ও কারণের সম্পর্ক

কি হইল? ইহাকেইতো আর ব্যাপ্তি বলে না। প্রত্যেক ধূমব্যক্তির সহিত প্রত্যেক বহ্নিব্যক্তির সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে হইবে। এই সম্বন্ধেরই অপর নাম ব্যাপ্তি। এই সর্বব্যাপক ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধের জ্ঞান আসিবে কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য নৈয়ায়িককে তাঁহার সামান্য-প্রত্যাসত্তির ধারণাটিকে রবারের মত টানিয়া আরও লম্বা করিতে হইবে এবং বলিতে হইবে যে, সামান্য প্রত্যাসত্তিরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা কেবল সকল ধূম এবং সকল বহ্নিরই উপস্থিতি হয় না, ঐ সঙ্গে উহাদের বিশেষণ হিসাবে প্রত্যেক ধূমের সহিত প্রত্যেক বহ্নির ব্যভিচার শঙ্কানির্মুক্ত (অব্যভিচরিত) সম্বন্ধেরও জ্ঞানোদয় হয়। ফলে, ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিরও সিদ্ধি হয়। এইরূপ স্বীকৃতি নৈয়ায়িকের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এইরূপ স্বীকৃতির ফলে কোনও সময়ে যে-কোন দুইটি বস্তু (যাহাদের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকসম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না) একই সঙ্গে দেখিলে আলোচ্য সামান্যলক্ষণা-প্রত্যাসত্তি বলে সেই জাতীয় সকল বস্তুর জ্ঞানোদয় হইতে এবং তাহাদের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধের ভাতি হইতেও কোন বাধা থাকিবে না। ধূম ও গর্দভ একসঙ্গে দেখিলে প্রত্যক্ষ ধূমব্যক্তির সহিত গর্দভের অব্যভিচারিত সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতেও নৈয়ায়িকের আপত্তি করার কিছু থাকিবে না। এইরূপে একত্র পরিদৃষ্ট সকল বস্তুর সহিতই সকল বস্তুর ব্যাপ্তিবোধ অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সেরূপ ক্ষেত্রে যেখানে ধূম, সেখানেই বহ্নি এবং যেখানে বহ্নি সেখানেই ধূম; ধূম ও বহ্নির এই সম্বন্ধদ্বয়ের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ বুঝা যাইবে না। সমব্যাপ্তি ও বিষমব্যাপ্তির পার্থক্য অন্তর্হিত হইবে। এই সকল কারণেই ন্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে সামান্যলক্ষণ-প্রত্যাসত্তির বলে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিনির্ণয়ের পদ্ধতিকে শ্রীহর্ষ নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। শ্রীহর্ষের মতে ন্যায়ের অনুসরণ করিলে অনুমানের মূলব্যাপ্তিতে ব্যভিচার শঙ্কার নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডনে চার্বাকও এই কথাই বলিয়াছেন।

'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে উদয়নাচার্য ন্যায়ের মত সমর্থন করিয়া, শ্রীহর্ষ, চার্বাক প্রভৃতির প্রতিবাদের উত্তরে বলিয়াছেন :—

'শঙ্কাচেদনুমাস্ত্যেব'
"তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ"। কুসুমাঞ্জলি, ৩।৭।

উদয়নাচার্যের উক্তির তাৎপর্য এই যে, অনুমানের হেতু ও সাধ্যের ব্যভিচারের আশঙ্কা যদি থাকে অর্থাৎ পর্বতে বহ্নির অনুমানের হেতু ধূম, বহ্নিকে ছাড়িয়া অন্যত্রও থাকিতে পারে এইরূপ সন্দেহ করিবার যদি উপযুক্ত কারণ থাকে, তবে নিশ্চয়ই অনুমানও আছে। কারণ, ঐরূপ সন্দেহও অনুমানমূলক। বর্তমানে মহানস (চুলা) প্রভৃতিতে ধূম ও বহ্নির ব্যভিচার না দেখা গেলেও কোন দেশে কোন কালেই যে উহা (ব্যভিচার) দেখা যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? হয়তো ভবিষ্যতে অনন্ত দেশ ও কালে এমন হইতে পারে যে ধূম আছে, বহ্নি নাই। এই অবস্থায় হেতু-ধূম প্রভৃতিতে সাধ্য-বহ্নি প্রভৃতির ব্যভিচারের সংশয় অবশ্যম্ভাবী। অনন্ত ভাবী দেশ ও কাল তো প্রত্যক্ষগম্য নহে; অনুমানগম্য। সুতরাং অনন্ত দেশে ও কালে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারের আশঙ্কা করিলে, অনুমানমূলেই তাহা করিতে হইবে। এইজন্যই উদয়ন কারিকায় বলিয়াছেন—'শঙ্কা চেদনুমাস্ত্যেব'। অনন্ত দেশ ও কালে ঐ শঙ্কার উপপত্তির জন্য যেমন অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া প্রয়োজন হয়; সেইরূপ হেতু ও সাধ্যের ব্যভিচারের আশঙ্কা বর্তমান আছে বলিয়াই অনুমানের প্রামাণ্যসাধনও অসম্ভব হয়। এই সমস্যার মীমাংসার পথ কি, তাহা নির্দেশ করিতে গিয়া উদয়ন বলিয়াছেন :— "তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ"।

অনুমানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই যে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারের আশঙ্কা দেখা দেয় তাহা নহে। যেখানে ব্যভিচারসংশয় জাগরূক হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে তর্কের সাহায্যেই ঐ সংশয়ের নিবৃত্তিসাধন সম্ভবপর হয়। তর্কের দ্বারা ব্যভিচার শঙ্কার নিবৃত্তি ঘটিলে, হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তির নিশ্চয়ে কোন বাধা দেখা যায় না। ফলে, ব্যাপ্তিজ্ঞানমূলে অনুমানের প্রামাণ্যও সুস্থির হয়। ধূমে বহ্নির ব্যভিচারের আশঙ্কা উদিত হইলে, অর্থাৎ বহ্নি যেখানে নাই, সেখানেও ধূম আছে কি না ? এইরূপ সন্দেহ দেখা দিলে, "ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে ধূম বহ্নিজন্য হয় না," এই প্রকার তর্কের সাহায্যে ধূমে বহ্নির ব্যভিচারের আশঙ্কা দূরীভূত হয়; এবং ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইয়া পর্বতে বহ্নির অনুমান জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে।

উদয়নাচার্যের উল্লিখিত উক্তির প্রতিবাদ করিয়া শ্রীহর্ষ খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে বলিয়াছেন :— তর্কঃ শঙ্কাবধিঃ কুতঃ ?

আলোচ্য তর্কও তো ব্যাপ্তিমূলক। ব্যাপ্তি থাকিলেই ঐ ব্যাপ্তির মূলে হেতু ও সাধ্যের ব্যভিচারের শঙ্কাও অবশ্যই বিরাজ করিবে। এই অবস্থায় ব্যাপ্তিমূলক "তর্ক" ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তি করিবে কিরূপে? বহ্নি হইতে ধূমরাশি নির্গত হইতে দেখিয়া ধূমের প্রতি যে বহ্নি কারণ এবং ধূম বহ্নির কার্য, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। "বহ্নি হইতে যে সকল ধূমের উৎপত্তি দেখা যায়, সেই সকল ধূম বিশেষের প্রতি বহ্নি কারণ, ইহাই মাত্র নিশ্চয় করা যায়। ধূমমাত্রে বহ্নি কারণ, ইহা নিশ্চয় করা যায় না।" অতএব ধূমমাত্রই বহ্নিজন্য কি না, এইরূপ সংশয় অবশ্যম্ভাবী। ঐ প্রকার সংশয় দেখা দিলে, 'ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, তবে ধূম বহ্নিজন্য হয় না' এইরূপ তর্কই জন্মিতে পারে না। এইরূপে তর্ক অসম্ভব হওয়ায়, ধূমে বহ্নির ব্যভিচার শঙ্কার নিবর্তকরূপে তর্ককে গ্রহণ করা যায় কিরূপে?[১]

ন্যায়োক্ত তর্কও চার্বাকোক্ত ব্যভিচারশঙ্কার নিরাকরণে সমর্থ নহে বুঝিয়াই বৌদ্ধ ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া ব্যাপ্তির নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধ বলেন :—

কার্যকারণ ভাবাদ্ বা স্বভাবাদ্ বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মোঽদর্শান্ন ন দর্শনাৎ ॥

ধূম ও বহ্নির সহচারের দর্শন এবং ব্যভিচারের অদর্শনই ব্যাপ্তির নিশ্চায়ক নহে। কার্য-কারণভাবের জ্ঞানের দ্বারা কিংবা স্বভাব বা তাদাত্ম্য সম্বন্ধবশতঃ অনায়াসেই ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইতে পারে। সর্বদেশে এবং সর্বকালে ধূম ও বহ্নি প্রভৃতির সহচারদর্শন ও ব্যভিচারের অদর্শন দেখা বা বোঝা কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর নহে বলিয়া, ন্যায়ের পদ্ধতিতে ব্যাপ্তির নির্ণয় সম্ভবপর হয় না। কিন্তু প্রদর্শিত বৌদ্ধপথ অনুসরণ করিলে ব্যাপ্তির নিশ্চয় অসম্ভব হয় না। যেই দুইটি পদার্থের মধ্যে কার্য-কারণসম্পর্ক আছে, তাহাদের মধ্যে কার্যপদার্থটি যেখানে থাকিবে, তাহার কারণও সেখানে থাকিবেই। কারণ ব্যতীত কার্য জন্মিতে পারে না; কারণশূন্যস্থানে কার্য

১। এই পুস্তকের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'মিথ্যাত্বমিথ্যাত্বনিরুক্তি'তে তর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যায় ও অনুমানের প্রামাণ্যস্থাপনে উদয়নের বক্তব্য ও শ্রীহর্ষের প্রতিবাদের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে, সুধী পাঠক সেই আলোচনা দেখিবেন।

থাকিতেও পারে না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং কার্য-কারণ-ভাবের জ্ঞানের দ্বারাই কার্যবস্তুতে কারণের ব্যাপ্তির নিশ্চয় সহজসাধ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ পদার্থদ্বয়ের তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধের জ্ঞানের দ্বারাও ব্যাপ্তির নিশ্চয় করা যাইতে পারে। শ্লোকোক্ত 'স্বভাব'শব্দে এখানে তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধই বুঝায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে, শিংশপাও (শিশু গাছ) এক শ্রেণির বৃক্ষ বিধায় শিংশপা ও বৃক্ষে কোনরূপ ভেদ নাই, ইহারা অভিন্ন। শিংশপা এবং বৃক্ষ অভিন্ন পদার্থ হইলে, শিংশপা হইলে তাহা যে একজাতীয় বৃক্ষই হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? উক্তরূপ অভেদবশতঃ শিংশপায় বৃক্ষের ব্যাপ্তির নির্বচন এবং শিংশপাকে হেতু করিয়া, শিংশপায় বৃক্ষের অনুমান—(অয়ং বৃক্ষঃ শিংশপায়াঃ) অনায়াসেই করা যাইতে পারে। এইজন্যই বৌদ্ধ তার্কিকগণ কার্য-কারণভাবের ন্যায় 'স্বভাব' অর্থাৎ তাদাত্ম্য বা অভেদকেও ব্যাপ্তির নিশ্চায়ক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[১]

ব্যাপ্তির ঐরূপ বৌদ্ধোক্ত নির্বচন নৈয়ায়িকদিগের অনুমোদন লাভ করে নাই। বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য, শ্রীধরাচার্য, জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি ধুরন্ধর তার্কিকগণ বৌদ্ধোক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের খণ্ডনই করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—"বৌদ্ধ সম্প্রদায় ব্যাপ্তিমূলক তর্ককে আশ্রয় না করিলে কার্য-কারণভাব নিশ্চয় করিতে পারেন না। বহ্নিই ধূমের কারণ, সন্নিহিত থাকিয়াও গর্দভ প্রভৃতি ধূমের কারণ নহে, ইহা বুঝিতে হইলে যে তর্ক আশ্রয়ণীয়, তাহা ব্যাপ্তিমূলক, সুতরাং ব্যাপ্তিনিশ্চয়ে ব্যাপ্তির নিশ্চয়ের অপেক্ষা নিয়ত হইলে আত্মাশ্রয় ও অনবস্থাদোষ অনিবার্য"।[২] তারপর, যেখানে কার্য-কারণভাব নাই, স্বভাব বা তাদাত্ম্য (অভেদ)ও নাই, এমন স্থলেও ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইয়া অনুমানের উদয় হইতে দেখা যায়। যেমন রসের

১। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তার্কিক ধর্মকীর্তি তাঁহার 'ন্যায়বিন্দু' গ্রন্থে কার্য-কারণভাব এবং স্বভাবের ন্যায় অনুপলব্ধিকেও ব্যাপ্তির নিশ্চায়ক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে ধূম নাই, যেহেতু তাহা উপলব্ধিগোচর হইতেছে না। এইটিই ধর্মকীর্তির মতে অনুপলব্ধি-ব্যাপ্তির উদাহরণ। এই অনুপলব্ধি (১) স্বভাবানুপলব্ধি (২) কার্যানুপলব্ধি (৩) ব্যাপকানুপলব্ধি প্রভৃতি একাদশ প্রকার বলিয়া ধর্মকীর্তি তাঁহার ন্যায়বিন্দুতে উল্লেখ করিয়াছেন। সুধী পাঠক ন্যায়বিন্দু দেখুন।

২। মঃ মঃ ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশের ন্যায়দর্শনের টিপ্পনী, ২।১।৩৮ সূত্র দ্রষ্টব্য।

উপলব্ধি হইলে রসাল ফলাদিতে অন্ধেরও রূপের অনুমান জ্ঞানোদয় হইতে দেখা যায়। যেই সকল দ্রব্যে রস আছে, সেই সকল দ্রব্যে রূপও আছে। এইরূপে রসাল ফলাদিতে রূপের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইয়া পূর্বসংস্কারবশতঃ ঐ ব্যাপ্তির স্মরণ হইলে, 'ইদং রূপবৎ রসবত্ত্বাৎ', এই প্রকারে অন্ধেরও রসাল ফলে রূপের অনুমান জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। রস রূপের কার্য নহে, রূপ এবং রস অভিন্নও নহে, বিভিন্ন। এই অবস্থায় বৌদ্ধোক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণানুসারে রসে রূপের ব্যাপ্তি নিশ্চয় সম্ভবপর না হওয়ায়, ঐরূপ অনুমান জন্মিতেই পারে না। ঐ প্রকার অনুমান উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়াই বৌদ্ধোক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণ যে অসম্পূর্ণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৌদ্ধসিদ্ধান্তে বস্তুমাত্রই ক্ষণিক বিধায়, ক্ষণিক বাদে কার্য-কারণভাব, তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধের উপপাদন যে কতদূর যুক্তিসহ, তাহাও সুধী দার্শনিক এই প্রসঙ্গে বিচার করিবেন।

ধূম ও বহ্নির কার্য-কারণসম্পর্কের নির্ণয় যে সম্ভবপর নহে, তাহা শ্রীহর্ষ তাঁহার খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থে বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে বহ্নি ছাড়াও যে ধূমের উৎপত্তি দেখা যাইবে না, তাহা কে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারে? অনেক অভূতপূর্ব নূতন নূতন আবিষ্কার তো হইতেছে। এমন কোনও নূতন জিনিষ আবিষ্কৃত হইতে পারে যাহা বস্তুতঃ অগ্নি নহে, কিন্তু অগ্নির ন্যায় ধূম উদ্গীরণ করে। এমনটি যে হইবে না তাহার ন্যায়ানুগ নিশ্চয় বা Logical guarantee কে দিতে পারে? কেবল ধূম ও বহ্নিরই নহে; কার্য-কারণ-শৃংখলায় নিবদ্ধ যে কোন বস্তুদ্বয় সম্পর্কেই এইরূপ সংশয় আত্মপ্রকাশ লাভ করিবে। ফলে, কার্য-কারণ-শৃংখলাকে ব্যাপ্তির নিয়ামক বলিয়া গ্রহণ করা কোন মতেই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। শ্রীহর্ষ খণ্ডনখণ্ডন-খাদ্যের শেষের অংশে নানা যুক্তিতে কার্য-কারণসম্বন্ধ খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীহর্ষের ঐ খণ্ডনপদ্ধতি স্বভাবতই বৌদ্ধাচার্যদিগের কথা পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেয়। খণ্ডনের শৈলী বিভিন্ন হইলেও অদ্বৈতবেদান্তের ধারক ও বাহক শ্রীহর্ষ যে শূন্যবাদী নাগার্জুন প্রভৃতির খণ্ডনের পদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, এবং কোন কোন অংশে শূন্যবাদীর সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। অবৈদিক সম্প্রদায়ের সাহায্য এবং অনুপ্রেরণাকে অঙ্গীকার করিয়া লইবার মত উদারতা আচার্য শ্রীহর্ষের আছে দেখিয়া সুধী সন্তুষ্টই হইবেন।

আচার্য ধর্মকীর্তির টীকাকার মনোরথ নন্দী, কর্ণকগোমী ও প্রজ্ঞাকর গুপ্ত প্রভৃতি যেই পদ্ধতিতে কার্য-কারণভাব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে অনেক অংশে পাশ্চাত্য দার্শনিক Hume,. Bradley ও Bertrand Russell এর বিচারশৈলীর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

"কার্যকারণভাবাদ্ বা স্বভাবাদ্ বা নিয়ামকাৎ," এই বৌদ্ধোক্ত ব্যাপ্তির গ্রাহক শ্লোকে আচার্য ধর্মকীর্তি যে কার্য-কারণভাবের কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উদ্ভূত। ধর্মকীর্তির মতে শুধু কার্য-কারণ-সম্বন্ধের কেন? কোনরূপ সম্বন্ধেরই কোনও প্রকার পারমার্থিক সত্তা বা অস্তিত্ব নাই। সম্বন্ধমাত্রই বিকল্প। সম্বন্ধ পরীক্ষাপ্রকরণে আচার্য ধর্মকীর্তি সর্বপ্রকার সম্বন্ধেরই পারমার্থিক সত্তা খণ্ডন করিয়াছেন। এই মূল সিদ্ধান্ত মনে রাখিয়াই ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্তিকের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। জৈনদার্শনিক প্রভাচন্দ্র তদীয় "প্রমেয় কমলমার্তণ্ডে" ধর্মকীর্তির 'সম্বন্ধ পরীক্ষা' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁহার প্রজ্ঞাকর-ভাষ্য সংস্করণের ভূমিকায় তিব্বতী হইতে সম্বন্ধপরীক্ষার বাইশটি শ্লোক পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তিব্বতী ভাষা হইতে পুনরুদ্ধৃত শ্লোকগুলি এবং প্রভাচন্দ্রের 'প্রমেয় কমলমার্তণ্ডে উদ্ধৃত কারিকাসমূহ অবিকল এক। 'সম্বন্ধপরীক্ষা'য় ধর্মকীর্তি বলিতেছেন[১] :—

সম্বন্ধ অর্থই পারতন্ত্র্য। দুইটি সম্পূর্ণ স্বয়ংসিদ্ধ পদার্থের ভিতরে কোনরূপ সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। কারণ, সম্বন্ধ থাকিলে বস্তু দুইটি স্বতন্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে না। সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়া বস্তু দুইটি সিদ্ধ হইবে, আবার দুইটি বস্তু সিদ্ধ না হইলে কাহার ভিতরে সম্বন্ধ হইবে? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সম্বন্ধ পদার্থদুইটির স্বাতন্ত্র্য এবং পারতন্ত্র্য উভয়ই থাকা চাই। কিন্তু ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ কথা। বিশেষতঃ সম্বন্ধ বলিতে বাদী প্রতিবাদী উভয়েই পারতন্ত্র্য বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে যখন পারতন্ত্র্যও সম্ভব নহে, তখন বুঝিতে হইবে মূলতঃ সম্বন্ধ বলিয়া কিছুই নাই। উহা বস্তুজগৎ ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমাদের বুদ্ধি কল্পিত একটা কৌশল বা হাতিয়ার মাত্র। কাজেই সম্বন্ধ হইল বিকল্প বা Logical

১। আমরা এখানে ধর্মকীর্তির কারিকাগুলির সংক্ষিপ্তসারমাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম, অনুবাদ নহে।

construction। উক্তরূপ বিরোধের সমন্বয় কেবল Logical construction এর ভিতরই সম্ভবপর। কারণ, দুই বিরুদ্ধ কোটিকে সমন্বিত করিয়াই সম্বন্ধের ধারণা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। পারমার্থিক বস্তুতে এইরূপ স্ববিরোধ কল্পনা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে আমরা আচার্য ভর্তৃহরি-প্রদর্শিত অভিধেয় সত্তা বা ঔপচারিক সত্তার দিকে সুধী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। আচার্য ধর্মকীর্তির পক্ষে একথা বলিবার আর যুক্তি আছে। বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তে ক্ষণিক স্বলক্ষণই মূলতত্ত্ব।

স্বলক্ষণ কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য ধর্মকীর্তি তাঁহার "ন্যায়বিন্দু" গ্রন্থে স্বলক্ষণের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন :—

"যস্য অর্থস্য সন্নিধানাসন্নিধানাভ্যাং জ্ঞানপ্রতিভাস ভেদ স্তৎ স্বলক্ষণম্"। যেই বস্তুর সন্নিধান (নিকটে অবস্থিতি) এবং অসন্নিধান বা দূরবর্তিতার ফলে জ্ঞান পরিস্ফুট কিম্বা অপরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পায়, তাহাকেই স্বলক্ষণ বলে। আলোচ্য লক্ষণের ব্যাখ্যায় ধর্মোত্তর বলিয়াছেন—জ্ঞানের বিষয় যে পদার্থ নিকটবর্তী হইলে জ্ঞান পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পায়, অসন্নিহিত বা দূরবর্তী হইলে জ্ঞান অস্ফুট আকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই স্বলক্ষণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। সমস্ত বস্তুই সমীপস্থ হইলে স্পষ্টরূপে, দূরবর্তী হইলে অস্পষ্ট-রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই পরিস্ফুট, প্রকাশশীল বস্তুই 'স্বলক্ষণ' বলিয়া জানিবে।[১]

ধর্মকীর্তির উল্লিখিত স্বলক্ষণের লক্ষণ কিন্তু প্রকৃত লক্ষণ নহে। একটু প্রণিধানসহকারে আলোচনা করিলেই সুধী পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, উহা বিষয়পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের লক্ষণমাত্র। আলোচ্য লক্ষণের দ্বারা বৌদ্ধোক্ত 'স্বলক্ষণে'র অর্থগত বৈশিষ্ট্য কিছুই প্রকাশ পায় নাই। যে সকল দার্শনিক স্বলক্ষণপদার্থ স্বীকার করেন না, তাঁহারাও জ্ঞানের বিষয়রূপে অবস্থিত বহির্বস্তুরও ঐরূপ লক্ষণ অনায়াসেই করিতে পারেন। বৌদ্ধোক্ত স্বলক্ষণের সহিত অপরাপর দার্শনিকগণের স্বীকৃত যথার্থ জ্ঞানের বিষয়বস্তুর পার্থক্য কোথায়, তাহা ধর্ম-কীর্তির উল্লিখিত লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ পায় নাই। আপাতদৃষ্টিতে এইরূপই মনে হয়।

১। যো হি জ্ঞানবিষয়ঃ সন্নিহিতঃ সন্ স্ফুটাভাসং জ্ঞানস্য করোতি, অসন্নিহিতস্তু অস্ফুটং করোতি, তৎ স্বলক্ষণম্। সর্বাণ্যেব বস্তূনি দূরাদস্ফুটানি দৃশ্যন্তে, সমীপে স্ফুটানি। তান্যেব স্বলক্ষণানি। ধর্মোত্তরকৃত টীকা।

ধর্মোত্তরের টীকাকার দুর্বেকমিশ্র তাঁহার 'ধর্মোত্তরপ্রদীপে' এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

এই প্রসঙ্গে এখানে এইরূপ নিরূপণ করা আবশ্যক যে, যেই বস্তুর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ফলে জ্ঞানের ভাতি (প্রকাশ) সুস্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই 'স্বলক্ষণ' বলিয়া জানিবে। প্রশ্ন হইতে পারে, এইরূপ স্বলক্ষণের নির্বচনে স্পর্শ এবং রসবোধ স্বলক্ষণ হইতে পারে না। কেননা, স্পর্শ এবং রসবোধ সন্নিহিত না হইলে, অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের অথবা রসনেন্দ্রিয়ের সহিত বস্তু সংযুক্ত না হইলে, কোনরূপ জ্ঞানই সেক্ষেত্রে জন্মিতে পারে না। এই অবস্থায় স্পর্শ এবং রসবোধের স্ফুটতা বা অস্ফুটতার কোনই অর্থ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ লক্ষণ আত্মঘাতী হয়। এই লক্ষণ অনুসারে বৌদ্ধোক্ত ক্ষণিক বিজ্ঞানই 'স্বলক্ষণ'সংজ্ঞা লাভ করে না। অপর কথায়, স্বলক্ষণ-বৌদ্ধবিজ্ঞানেই উল্লিখিত লক্ষণের অব্যাপ্তি অপরিহার্য হয়। ক্ষণিক বিজ্ঞানের দূর-নিকট (সন্নিধান-অসন্নিধান) বলিয়া কিছুই নাই। কারণ, তাহার কোনরূপ দেশ সংস্পর্শ নাই (অদেশত্বাৎ) ; দেশ প্রভৃতি বৌদ্ধোক্ত স্বলক্ষণ ক্ষণিক বিজ্ঞানকে স্পর্শই করিতে পারে না। দেশসম্পর্ক থাকিলে জ্ঞানের ক্ষণিকত্বই থাকে না। এইরূপ গুরুতর অব্যাপ্তি ঘটে বলিয়াই স্বলক্ষণের প্রদর্শিত লক্ষণকে প্রকৃত লক্ষণ বলিয়া কোন প্রকারেই গ্রহণ করা যায় না। এখন কথা এই, উল্লিখিত লক্ষণ যদি অব্যাপ্তি কলুষিতই হয়, তবে আচার্য ধর্মকীর্তি স্বলক্ষণের ঐরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিলেন কেন ? ধর্মোত্তর এইরূপ দুষ্ট লক্ষণের ব্যাখ্যাই বা করিতে গেলেন কেন ? তাঁহাদের কি বুদ্ধিভ্রম হইয়াছিল ? ইহার উত্তরে ধর্মকীর্তির অনুগামীরা বলেন—বৌদ্ধতার্কিক ধর্মকীর্তির স্বলক্ষণের লক্ষণটি যেভাবে ধর্মোত্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদ্বারা ধর্মকীর্তির লক্ষণের আশয় পরিস্ফুট হয় নাই। লক্ষণটি যেই ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে সহজ কথায় ধর্মোত্তরের ব্যাখ্যার কথাই মনে আসে সত্য, কিন্তু ধর্মকীর্তির অভিপ্রায় এখানে অন্যরূপ।

যেই বস্তুর সন্নিধান ও অসন্নিধানের ফলে জ্ঞানের প্রকাশ পরিস্ফুট বা অস্ফুট হয় (জ্ঞানের ভাতিতে ভেদ দেখা দেয়), তাহাই স্বলক্ষণ বলিয়া জানিবে, এইরূপে স্বলক্ষণের যে লক্ষণ করা হইয়াছে তাহাদ্বারা বৌদ্ধোক্ত 'স্বলক্ষণ' ও 'সামান্যলক্ষণে'র মধ্যে যে প্রভেদ বিদ্যমান আছে, তাহারই

ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাহা নাম, জাতি, ক্রিয়া প্রভৃতি সর্ববিধ বিকল্পগ্রস্ত তাহাকে 'সামান্যলক্ষণ', আর, যাহা সর্বপ্রকার বিকল্পের অতীত অসাধারণ বিষয়, তাহাকে স্বলক্ষণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—

"অসাধারণবিষয়ং স্বলক্ষণ বিষয়মিতি।" হেতুবিন্দু টীকা, ২৫ পৃঃ।

বৌদ্ধমতে স্বলক্ষণই হইল পরমার্থতত্ত্ব। 'সামান্য' বিকল্পমাত্র। সামান্য-লক্ষণ হইতে স্বলক্ষণের পার্থক্য দেখাইবার জন্যই ধর্মকীর্তি যাহা ব্যক্ত্যন্তর ও বিবিধ বিকল্পের সংস্পর্শরহিত এইরূপ অসাধারণকে স্বলক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] অব্যাপ্তি দোষের ঝক্কি লইয়াও ধর্মকীর্তি উপরোক্তভাবে স্বলক্ষণের নির্বচন করিয়াছেন। এখানে বৌদ্ধদর্শনের প্রখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক সার্বেত্স্কি (Scherbatsky) আচার্য ধর্মকীর্তির উল্লিখিত লক্ষণটির যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার দার্শনিক নিপুণতা সুধী মাত্রেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সার্বেত্স্কির অনুবাদ নিম্নরূপ—

"*When* the mental image varies according as the object is near or remote the object *then* is the parlicutar" Stcherbatsky—Buddhis Logic—vol II p. 35.

উক্ত অনুবাদের ভিতরে মূলের যস্য এবং তৎশব্দের স্থানে when এবং then এই শব্দ দুইটির প্রয়োগ লক্ষণীয়। সার্বেত্স্কির মতে ও প্রত্যক্ষের বিষয় স্বলক্ষণ, সামান্যলক্ষণ নহে, ইহা প্রতিপাদন করাই আচার্য ধর্মকীর্তির উক্ত লক্ষণপ্রণয়নের উদ্দেশ্য। প্রত্যক্ষের বিষয় অসাধারণ। উপরোক্ত লক্ষণবাক্যের পরের বাক্যটিতেই ধর্মকীর্তি বলিতেছেন—'যাহা অসাধারণ তাহাই পরমার্থসৎ; স্বলক্ষণই একমাত্র পরমার্থসৎ। সামান্যের পরমার্থ সত্তা নাই।

ধর্মকীর্তির লক্ষণটির আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে পূর্বোক্ত অব্যাপ্তিদোষ অপরিহার্য হয় এবং স্বলক্ষণ-বিজ্ঞানকে আর সেক্ষেত্রে স্বলক্ষণ বলা চলে না।

১। যদেকার্থসমবেতমসাধারণ্যং ব্যক্ত্যন্তরানসুযায়িত্বং তদুপলক্ষিতম্। যতো হেতুবিন্দুঃ— 'তত্রাত্তমসাধারণবিষয়মিতি' (হেতুবিন্দু প্রকরণ—৫৩ পৃঃ)। অতএব অসাধারণ-বিষয়ং স্বলক্ষণবিষয়মিতি (হেতুবিন্দুটীকা, ২৫ পৃঃ) ভট্টার্চটোব্যাচষ্টে।

দুর্বেকমিশ্রকৃত ধর্মোত্তর প্রদীপ দ্রষ্টব্য।

সুতরাং দুর্বেকমিশ্রের ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত; এই লক্ষণটি 'অসাধারণ্যে'র উপলক্ষণমাত্র। লক্ষণবাক্যটির পূর্ব বাক্যটিতেই ধর্মকীর্তি বলিতেছেন—"তস্য বিষয়ঃ স্বলক্ষণম্," অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় স্বলক্ষণমাত্র। এই 'স্বলক্ষণ' কথাটির ধর্মোত্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন—

"স্বম্ অসাধারণং লক্ষণং তত্ত্বং স্বলক্ষণম্। বস্তুনো হি অসাধারণং চ তত্ত্বমস্তি সামান্যং চ। তত্র যদসাধারণং তৎপ্রত্যক্ষস্য গ্রাহ্যম্"।

প্রমাণের বিষয় দুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার হইল গ্রাহ্য, দ্বিতীয় অধ্যবসেয় বা প্রাপণীয়। যেইরূপে প্রমাণের বিষয়বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাকে গ্রাহ্য বলে—"গ্রাহ্যশ্চ যদাকারমুৎপদ্যতে"। যেইরূপে উহা জানা যায় তাহাকে বলে অধ্যবসেয় বা জ্ঞেয়। ক্ষণধারা বা সন্তানই জ্ঞেয়। এই জ্ঞেয়ই সামান্য লক্ষণ; আর বিজ্ঞানের উৎপত্তি ক্ষণ যাহা 'অসাধারণ' বলিয়া পরিচিত, তাহাই বিজ্ঞানবাদীর স্বলক্ষণ তত্ত্ব।

The difference between গ্রাহ্য and অধ্যবসেয় corresponds to the difference between the sense-datum and the percept in Western philosophy. In the stage of গ্রাহ্য there must be a form. The Buddhist, it should be noted, does not admit a formless consciousness. The Buddhist is সাকার-বিজ্ঞানবাদী। In the stage of pure sensation there is a form but no interpretation. But in the stage of perception or অধ্যবসেয়, the pure form of sensation undergoes a transformation with some interpretative additions like universal, name etc.

Quoted from an Essay of the present writer.

আলোচিত ধর্মোত্তরের উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দুর্বেক মিশ্র বলিতেছেন—

যাহা যাহা নিজের স্বভাব, তাহা তাহারই, অন্যের নহে। এই অর্থে স্বলক্ষণ শব্দের অন্তর্গত স্বশব্দে বস্তুর অসাধারণ স্বকীয় ভাবকেই বুঝায়। লক্ষণ শব্দের অর্থ হইল 'তত্ত্ব' বা স্বরূপ। সুতরাং স্ব এবং লক্ষণ শব্দের কর্মধারয় সমাসের ফলে (স্বমসাধারণং চ তল্লক্ষণং স্বরূপং চেতি) বস্তুর বা বিজ্ঞানের অসাধারণ স্বরূপকেই "স্বলক্ষণ" কথা দ্বারা বুঝা যায়[১]।

১। স্বস্য স্বং স্বং তত্ত্বং তস্যৈব নান্যস্যেতি লক্ষণয়া স্বশব্দেন অসাধারণমুক্তম্। লক্ষণ শব্দেন

স্বলক্ষণ বলিতে তাহা হইলে আমরা বুঝিব—"The pure particular of the moment." বিজ্ঞানবাদী যোগাচার মতে এই স্বলক্ষণ হইল বিজ্ঞানক্ষণ যাহা গ্রাহ্য-গ্রাহককল্পনা, নাম-জাতি প্রভৃতি কল্পনা-রহিত (অপোঢ়)।

"The moment of the pure sense-impression—which is absolute particular, completely free from the touch of the name, the universal and such other constructions. It is an absolute moment in the stream of consciousness, because in it the difference between the subject and the object has not yet emerged. This difference emerges in the stage of perception (অধ্যবসেয়) which constructs a seeming unity and continuity out of the fleeting moments."

Queted from an Essay of the present writer.

যোগাচার সিদ্ধান্তে এই স্বলক্ষণ-ক্ষণিক বিজ্ঞানই হইল একমাত্র পরমার্থতত্ত্ব। প্রজ্ঞাকরগুপ্ত তাঁহার 'প্রমাণবার্তিকভাষ্যে' এই স্বলক্ষণকে 'অদ্বৈত' বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভাষ্যে দ্বিবিধ অর্থে 'অদ্বৈত' কথাটির প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ (i) 'অসাধারণ' অর্থে—অর্থাৎ বিভিন্ন স্বলক্ষণ ক্ষণে অনুগত এক সাধারণ 'সামান্য' বলিয়া কিছুই নাই। এক একটি স্বলক্ষণ ক্ষণ স্বয়ংসম্পূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ (ii) স্বসংবেদন অর্থেও প্রজ্ঞাকরগুপ্ত 'অদ্বৈত' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। এই অর্থে তাঁহার মতে বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্য বিষয়ের কোনরূপ পারমার্থিক সত্তা নাই। প্রথম অর্থে ব্যবহৃত অদ্বৈত শব্দটি অদ্বৈতবেদান্তের বিপরীত অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। কারণ, ইহা এক সর্বানুগ, সর্বব্যাপী অদ্বৈততত্ত্বের বিরোধী (One universal conscious principle-এর বিরোধী)। প্রত্যেক বিজ্ঞানক্ষণ স্বলক্ষণ, অসাধারণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অদ্বৈত। কেননা, পূর্বাপর ক্ষণসমূহের সহিত আলোচ্য স্বলক্ষণ ক্ষণের কোন সম্পর্ক নাই।

চ তত্ত্বং স্বরূপং বিবক্ষিতম্। স্বশব্দ লক্ষণ শব্দয়োরর্থমভিধায় তয়োঃ সমস্তং পদমাহ—স্বলক্ষণমিতি। অনেন স্বমসাধারণং চ তল্লক্ষণং স্বরূপং চেতি কর্মধারয়ো দর্শিতঃ।

দুর্বেক মিশ্রকৃত ধর্মোত্তরপ্রদীপ, ৭০-৭৫ পৃঃ।

প্রজ্ঞাকরের দ্বিতীয় অর্থটি আ[illegible]র অনুরূপ। পরমার্থসৎ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মবিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্য বিষয়ের বাস্তব সত্যতা অদ্বৈতবেদান্তীও অস্বীকার করিয়াছেন।

প্রজ্ঞাকর গুপ্ত বলিতেছেন—

পরমার্থতত্ত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বপ্রকাশ এবং স্বসংবেদন বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহা স্বলক্ষণ এবং 'অদ্বৈত'ই হইয়া দাঁড়ায়। স্বলক্ষণ অদ্বৈত না হইলেই তাহা হইবে সামান্যলক্ষণ। এই স্বলক্ষণ-অদ্বৈতই সর্বত্র যথার্থ জ্ঞানে ভাসে, সামান্যলক্ষণ যথার্থ জ্ঞানে ভাসে না। এইজন্য স্বয়ংসংবেদন প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অপর সকলই অপ্রমাণ—

"স্বসংবেদনমেবৈকং প্রত্যক্ষং প্রমাণং নাপরম্। নাদ্বৈতাদপরং তত্ত্বমস্তি।"

প্রজ্ঞাকরগুপ্তকৃত প্রমাণবার্তিক ভাষ্য, ৩১ পৃঃ।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'স্বলক্ষণ' প্রত্যক্ষই যদি একমাত্র প্রমাণ হয়, তবে ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার দেশনায় (উপদেশ) ভেদাবলম্বী সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির উপদেশ করিলেন কেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, শিষ্যদিগের ধীশক্তির তারতম্য লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ বিনেয়দিগকে ঐরূপ উপদেশ দিয়াছেন বুঝিতে হইবে। যেসকল স্থূলধী শিষ্যকাননকুন্তলা হিমগিরিকিরীটিনী এই ধরণী মিথ্যা শুনিয়া ভয় পান, তাঁহাদের জন্যই ভেদমূলক সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে। সামান্যের ঊর্ধ্বে উঠিলে জানা যায়, স্বলক্ষণ অদ্বৈতই একমাত্র তত্ত্ব—নাদ্বৈতাদপরং তত্ত্বমস্তি। এই চরম ও পরম উপদেশ সুধী শিষ্য গ্রহণ করিতে পারেন। সেই অদ্বৈততত্ত্বে পৌঁছিবার সোপান হিসাবেই 'সামান্যে'র উপদেশ করা হইয়াছে, চরম তত্ত্ব হিসাবে নহে।[১]

১। স্বসংবেদনেন তু গ্রহণে স্বলক্ষণমেব তদিতি স্বলক্ষণ বিষয়মেব প্রমাণম্। যদা তু পুনরদ্বৈতং তদা ন সামান্যম্।······স্বলক্ষণমেবাত্র জ্ঞানে প্রতীয়তে। নচ ভেদ ইতি। কিমর্থং তর্হি প্রত্যক্ষানুমানভেদো বাহ্যবিজ্ঞানভেদশ্চ ভগবতা নির্দিষ্টঃ·· ·· স্বসংবেদনমেবৈকং প্রত্যক্ষং প্রমাণং নাপরম্। প্রপঞ্চবিনেয়ানুরোধাদ্ যথা যথা বিনেয়ানাং তত্ত্বমার্গানুপ্রবেশঃ সম্ভবী তথা তথা ভগবতো দেশনেতি ন বিরোধঃ। কুত এতৎ "স্বলক্ষণ বিচারতঃ।" বিচার্যমাণং হি সকলমেবাবশীর্যতে। নাদ্বৈতাদপরং তত্ত্বমস্তি। তদেব ক্রমেণ ভগবতা বিচার্যতে। অক্রমেণ বিচারয়িতুমশক্যত্বাৎ।

প্রজ্ঞাকরগুপ্তকৃত প্রমাণবার্তিক ভাষ্য, ৩১ পৃষ্ঠা।

প্রজ্ঞাকরগুপ্ত নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানবাদী। প্রমাণের সিদ্ধান্ত লক্ষণে ধর্মকীর্তি তদীয় প্রমাণবার্তিকে বলিয়াছেন—

অজ্ঞাতার্থপ্রকাশো বা স্বরূপাধিগতেঃ পরম্।
প্রাপ্তং সামান্যবিজ্ঞানমবিজ্ঞাতে স্বলক্ষণে ॥

ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্তিক, প্রমাণসিদ্ধি পরিঃ ৫ম কাঃ।

বস্তুর স্বরূপের বা যথার্থ তত্ত্বের জ্ঞানোদয় হইলে পরমার্থ অদ্বৈত তত্ত্বেরই জ্ঞানোদয় হয়। যে-পর্যন্ত পরমার্থ তত্ত্বের জ্ঞানোদয় না হয়, সেই পর্যন্তই সামান্যজ্ঞান আত্মপ্রকাশ লাভ করে। কারিকোক্ত 'অজ্ঞাতার্থপ্রকাশঃ,' এই পদটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রজ্ঞাকরগুপ্ত বার্তিকের ভাষ্যে বলিতেছেন—

"অর্থ শব্দেন পরমার্থ উচ্যতে। অজ্ঞাতার্থপ্রকাশ ইতি পরমার্থপ্রকাশ ইত্যর্থঃ। পরমার্থশ্চ অদ্বৈতরূপতা। তৎপ্রকাশনমেব প্রমাণম্।"

ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্তিকের ৫ম কারিকার প্রজ্ঞাকর গুপ্তকৃত ভাষ্য।

আলোচ্য পঞ্চম কারিকার পূর্ববাক্যে 'প্রামাণ্যং ব্যবহারেণ', এবং চতুর্থ কারিকার স্বরূপস্য স্বতোগতিঃ', এই বাক্য দুইটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রজ্ঞাকর বলিতেছেন— ধর্মকীর্তির 'প্রামাণ্যং ব্যবহারেণ', এইরূপ উক্তির দ্বারা সাংব্যবহারিক প্রামাণ্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই সাংব্যবহারিক প্রামাণ্য পরমার্থ অদ্বৈততত্ত্বের জ্ঞানোদয়ে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং স্বসংবেদন, স্বলক্ষণ প্রত্যক্ষই যে একমাত্র প্রত্যক্ষ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।[১]

বস্তুতঃ বৌদ্ধোক্ত নৈরাত্ম্যবাদ ও নিরালম্বনবাদ, এই উভয়বাদের সমন্বিত অর্থে প্রজ্ঞাকর 'অদ্বৈত' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন—

"আত্মদর্শনন্তু মোহঃ। স নৈরাত্ম্যভাবাৎ সাক্ষাদেব নিবর্ততে। অদ্বৈত-দর্শনেতু সুতরামেব রাগনিবৃত্তি বিষয়াভাবাৎ ॥"

প্রমাণবার্তিক ভাষ্য, ১১৬ পৃঃ।

আত্মদর্শনই মোহ বা অজ্ঞান বটে। নৈরাত্ম্যের জ্ঞানোদয়ে আত্মদর্শন-মোহের সাক্ষাদ্ভাবেই নিবৃত্তি হয়। ফলে, বিষয় না থাকায় রাগ-দ্বেষেরও নিবৃত্তি

১। প্রামাণ্যং ব্যবহারেণ সাংব্যবহারিকস্যৈতদিতি প্রতিপাদিতম্। সংব্যবহারশ্চ বিচার্যমাণো বিশীর্যত এব।......সাংব্যবহারিকং প্রামাণ্যং প্রতিপাদয়তা পরমার্থত একমেব স্বসংবেদন প্রত্যক্ষমিত্যুক্তং ভবতি।

ধর্মকীর্তির বার্তিকের ৫ম কারিকার প্রজ্ঞাকরকৃত ভাষ্য।

ঘটে। এখানে প্রজ্ঞাকরের বক্তব্য অতি পরিষ্কার। আত্মার পারমার্থিক অস্তিত্ব থাকিলেই রাগ-দ্বেষের অস্তিত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। পরমার্থতঃ আত্মা বলিয়া কিছুই নাই, এই নৈরাত্ম্যদৃষ্টির উদয় হইলে নিরাধার রাগ-দ্বেষ বিলীন হইয়া যায়।

"আত্মনি উপকারিণি অপকারিণিচ রাগ-দ্বেষৌ, তৌ আত্মাভাবাৎ ন স্তঃ।"

প্রমাণবার্ত্তিক ভাষ্য, ১১৬ পৃঃ।

প্রজ্ঞাকরগুপ্তের ভাষ্যে স্থলবিশেষে নিরালম্বন-বিজ্ঞান অর্থেও অদ্বৈত কথাটির ব্যবহার হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বসংবেদনমাত্রেচ প্রত্যক্ষেঽর্থাপ্রসিদ্ধিতঃ।
ভেদস্তু চ ন কিঞ্চিৎ স্যাদদ্বৈতমবশিষ্যতে॥

প্রজ্ঞাকরের কারিকা, ২১৯ পৃঃ; এই প্রসঙ্গে প্রজ্ঞাকরকৃত ভাষ্যের
১৩১, ১৩৪, ২৯৩, ৩৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এইজন্যই আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি যে প্রজ্ঞাকর নৈরাত্ম্যবাদ এবং নিরালম্ববাদ এই উভয় অর্থেই তাঁহার ভাষ্যে 'অদ্বৈত' কথাটির প্রয়োগ করিয়াছেন।

এই আলোচনার শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে 'স্বলক্ষণ' কথাটির প্রকৃত অর্থ হইল নিরালম্বন বিজ্ঞানক্ষণ। 'স্বলক্ষণ' অর্থ যে Pure particular of the moment —এ বিষয়ে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ ও বাহ্যার্থবাদী বৌদ্ধ একমত। প্রজ্ঞাকর-গুপ্ত তাঁহার সুবিপুল ভাষ্যগ্রন্থে ধর্মকীর্তির 'প্রমাণ বার্তিকে'র বিজ্ঞানবাদ-সম্মত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মনোরথ নন্দীর বৃত্তি সৌত্রান্তিক মতানুযায়ী। ধর্মকীর্তির 'ন্যায়বিন্দু'ও সৌত্রান্তিক মতানুসারী বলিয়া মনে হয়। এইরূপ মনে হইবার কারণ এই যে, 'ন্যায়বিন্দু' ন্যায়ের গ্রন্থ। Logicএর বিষয়বস্তু সাংব্যবহারিক জগতের অন্তর্ভুক্ত। বাহ্য জগতের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের 'বেদান্ত-পরিভাষা'য় যেমন Logic ও Metaphysics (তর্ক ও পরমার্থতত্ত্ব) পরস্পর বিজড়িত হইয়া গিয়াছে, ন্যায়বিন্দুতে তাহা হয় নাই। 'ন্যায়বিন্দু', 'হেতুবিন্দু' ও 'বাদন্যায়ে' ধর্মকীর্তি পরমার্থতত্ত্বকে (Metaphysical considerationকে) যথাসম্ভব বাদ দিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তর্কের মানদণ্ডকেই ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছেন। প্রজ্ঞাকর গুপ্তের বার্ত্তিকালঙ্কারকে (প্রমাণবার্ত্তিকভাষ্যকে) প্রমাণবার্ত্তিকের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক

ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলিয়া ধরিলে, ধর্মকীর্তিকে মূলতঃ বিজ্ঞানবাদী বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

ধর্মকীর্তির 'সম্বন্ধপরীক্ষা'ও বিজ্ঞানবাদকেই সুদৃঢ় করে। সার্বেত্স্কি বলেন—দিঙ্‌নাগের সংপ্রদায় আংশিকভাবে সৌত্রান্তিক মতাবলম্বী। ধর্মকীর্তির বার্তিক দিঙ্‌নাগের প্রমাণসমুচ্চয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও বস্তুতপক্ষে ধর্মকীর্তির বার্তিক একখানি যুগান্তকারী স্বতন্ত্র গ্রন্থ। উহা দিঙ্‌নাগের মতের সম্প্রসারণমাত্রই নহে। তবুও দিঙ্‌নাগকৃত প্রমাণসমুচ্চয়ের ব্যাখ্যা বলিয়া, ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্তিকের অনেক স্থলে সৌত্রান্তিক মতের ছায়াপাত আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক নহে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আচার্য ধর্মকীর্তি 'প্রমাণবার্তি'কে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন নাই। অধিকন্তু প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদের এক বিরাট অংশ জুড়িয়া বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

'স্বলক্ষণ' কথাটির অর্থ pure particular হইলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পদটির প্রয়োগে অর্থের যে সূক্ষ্ম তারতম্য ঘটিয়াছে তাহা অধ্যাপক সার্বেত্স্কিও লক্ষ্য করিয়াছেন (Buddhist Logic Vol. II pp. 34-35 footnote দ্রষ্টব্য)। সার্বেত্স্কিও স্বলক্ষণ কথাটি কখনও কখনও 'Thing-in-itself' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। এইরূপ অনুবাদ দুইটি কারণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতে পারে। Kantএর সময় হইতে 'Thing-in-itself' কথাটি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু Kantএর 'Thing-in-itself' জ্ঞানগম্য বা জ্ঞানের বিষয় নহে। বৌদ্ধসিদ্ধান্তে 'স্বলক্ষণ' শুধু যে জ্ঞানগম্য তাহাই নহে; এই মতে স্বলক্ষণের জ্ঞানই হইল একমাত্র প্রামাণিক জ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞান-ক্ষণরূপ যে স্বলক্ষণ তাহা Kantএর 'Thing-in-itself' নহে। আমাদের মনে হয়, তথাকথিত Neo-realistরা যাহাকে 'sense-datum' বলেন, স্বলক্ষণ অনেকটা তাহারই কাছাকাছি। একমাত্র অনুমেয় বাহ্যার্থবাদী সৌত্রান্তিকের স্বলক্ষণের সহিত Kantএর 'Thing-in-itself'এর (বাহ্য জগতের অংশে) আংশিক সাদৃশ্য থাকিতে পারে। এক্ষেত্রেও মনে রাখিতে হইবে যে, Kant তাঁহার Thing-in-itselfকে ক্ষণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন নাই। সৌত্রান্তিকমতে বাহ্য স্বলক্ষণও ক্ষণিক পদার্থ। কিন্তু সৌত্রান্তিকও যখন বাহ্য স্বলক্ষণকে প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া অভিহিত করেন,

তখন এই স্বলক্ষণও Sense-datumএ পর্যবসিত হয়। বিজ্ঞানের content ও object হিসাবে এই Sense-datum বা স্বলক্ষণকে বিজ্ঞান হইতে বিভক্ত করা যে দুরূহ হয়, তাহা অনুসন্ধিৎসু পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন। আমরা দেখিয়াছি যে প্রত্যেকটি স্বলক্ষণই স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইহা Leibnizএর গবাক্ষবিহীন আত্মসম্পূর্ণ স্বয়ম্ভূ Monadএর মত। তফাৎ এই, Leibnizএর monad চিরস্থির, বৌদ্ধোক্ত স্বলক্ষণ সতত চঞ্চল ও ক্ষণিক। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষণ আর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষণিকের সহিত সম্বন্ধ রাখিবে কি করিয়া? কোনরূপ সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখিলেই স্বয়ংসম্পূর্ণতার হানি ঘটিতে বাধ্য। এইজন্য অসংখ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষণের সন্তান বা প্রবাহও আমাদের বুদ্ধিকল্পিত একটা ধারণা বা বিকল্পমাত্র। আমরা ক্রমপ্রবাহী ক্ষণগুলিকে কল্পনার সূত্রে একত্র গাঁথিয়া একটি প্রবাহ বা সন্তানের সৃষ্টি করি। বস্তুতপক্ষে সূক্ষ্মতম স্বলক্ষণ ক্ষণের সন্তান বা প্রবাহ বলিয়া কিছুই নাই।*

বৌদ্ধসম্মত স্বলক্ষণতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা আমরা উপরে প্রদর্শন করিলাম, তাহার সহিত বৌদ্ধোক্ত কার্য-কারণসম্পর্কের প্রশ্নটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কার্য-কারণসম্বন্ধের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, বৈকল্পিক সত্তামাত্র আছে। আচার্য ধর্মকীর্তি তাঁহার 'সম্বন্ধপরীক্ষা' গ্রন্থে এইরূপে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আলোচ্য স্বলক্ষণ তত্ত্বেরই ন্যায়সঙ্গত পরিণতি। দুইটি স্বলক্ষণক্ষণ স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্বয়ংসম্পূর্ণ দুইটি ক্ষণের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ কল্পনা করিলে উহাদের (ক্ষণদ্বয়ের) স্বাতন্ত্র্য বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা বজায় থাকে না। দুইটি বস্তুই অসম্পূর্ণ হইলে তাহাদের ভিতরে বিরাজমান সম্বন্ধনামক পৃথক্ পদার্থটিও অসম্পূর্ণ পদার্থই হইবে। দুইটি বস্তুর মধ্যে যদি সম্বন্ধনামক একটি পারমার্থিক পদার্থ কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে 'অনবস্থা'দোষ অনিবার্যরূপেই দেখা দেয়। কারণ, ঐ সম্বন্ধ পদার্থের সহিত প্রত্যেকটি সম্বন্ধীর পুনরায় সম্বন্ধকল্পনা প্রয়োজন হইবে। এইরূপে অনন্ত সম্বন্ধের স্রোত বহিয়া চলিবে। ইহার শেষ সীমায় পৌঁছান সম্ভবপর হইবে

* শ্রদ্ধাশীল পাঠক এই প্রসঙ্গে বৈয়াকরণকেশরী ভর্তৃহরির ক্রিয়া লক্ষণের তুলনা করুন—

গুণভূতৈরবয়বৈঃ সমূহঃ ক্রমজন্মনাম্।
বুদ্ধ্যা প্রকল্পিতাভেদঃ ক্রিয়েতি ব্যপদিশ্যতে॥

ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় ৩য় খণ্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা

না। অথচ শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত দুইটি সম্বন্ধীর সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করাও চলিবে না। এইজন্যই বলি, সম্বন্ধের কল্পনা করিতে হইলেই অনবস্থার রজ্জুতে বাঁধা না পড়িয়া উপায় নাই।[১] সম্বন্ধকে অতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করিলেও এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না। সম্বন্ধ নিজেই সেখানে সম্বন্ধীর স্থান অধিকার করিবে। সুতরাং অনবস্থার কবল হইতে নিষ্কৃতি কোথায়? কাজেই সম্বন্ধকে বিকল্পমাত্র বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই।[২]

যদি বল যে, অন্য সম্বন্ধ বাদ দিলেও কার্য-কারণসম্বন্ধ মানুন না কেন? তদুত্তরে বলিব, না, তাহাও মানা যায় না। সম্বন্ধ দ্বিষ্ঠ অর্থাৎ দুইএতে বর্তমান থাকে। কার্য ও কারণ উভয়ই ক্ষণিক। যে বস্তু এখন বিলুপ্ত হইয়াছে কিংবা যে বস্তু এখনও উৎপন্নই হয় নাই, তাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ স্থাপন করিবে? যখন কারণ আছে, তখন কার্য নাই; যখন কার্য আছে, তখন কারণ নাই। এই অবস্থায় কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ হইবে? যে নাই তাহার সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ হয় কি? সেখানে শুধু কল্পনা করিয়াই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়। এইজন্যই বলি কার্য-কারণসম্বন্ধও কল্পনামাত্র।[৩] বহ্নি দেখিয়াছি, ধূমও দেখিয়াছি; বহ্নি দেখি নাই ধূমও দেখি নাই। এই দেখা না দেখার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কার্য-কারণসমূহের কল্পনা করা হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ তো এই দুইটি বস্তুর ক্রমিক দর্শন ও অদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে উৎপাদন করিল, একটি বস্তু হইতে আর একটি বস্তু উৎপন্ন

১। সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ। ব্রহ্মসূত্র, ২।২।১৩।

এই সূত্রে ন্যায়-বৈশেষিকোক্ত 'সমবায়' সম্বন্ধের খণ্ডনে ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর যে অনবস্থার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, সেই আপত্তি কেবল সমবায়ের বিরুদ্ধেই নহে, আলোচ্য দৃষ্টিতে বিচার করিলে সর্বপ্রকার সম্বন্ধের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে, সুধী ইহা লক্ষ্য করিবেন।

২। (ক) দ্বয়োরেকাভিসম্বন্ধাৎ সম্বন্ধো যদি তদ্দ্বয়োঃ।
কঃ সম্বন্ধোঽনবস্থা চ ন সম্বন্ধমতিস্তদা॥
প্রমাণবার্তিক, সম্বন্ধপরীক্ষা, ৪ কাঃ।

৩। কার্যকারণভাবোঽপি তয়োরসহ ভাবতঃ।
প্রসিধ্যতি কথং দ্বিষ্ঠোঽদ্বিষ্ঠে সম্বন্ধতা কুতঃ।
ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্তিক, সম্বন্ধ পরীক্ষা ৭ কাঃ।

Bradleyর Appearance and Realityর Relation chapter তুলনীয়।

হইল—এইরূপ উৎপাদ্য-উৎপাদকভাব বা জন্য-জনকভাব আপনি কবে কোথায় দেখিলেন? জন্য-জনকসম্বন্ধ যদি কোথায়ও কোনদিন আপনি প্রত্যক্ষ করিতেন, তবেই তো আপনি পূর্বতন প্রত্যক্ষের-ভিত্তিতে কার্য-কারণভাবের অনুমান করিতে পারিতেন। যাহা কদাচ প্রত্যক্ষতঃ দেখেন নাই, তাহার ভিত্তিতে তো অনুমান চলে না। এই অবস্থায় দেখা ও না-দেখার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আপনি আপনার বুদ্ধিতে একটি কার্য-কারণভাবের কল্পনা করুন, আপত্তি করিব না। কিন্তু বলিব যে, ইহা ব্যাখ্যাতৃজনের ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য বুদ্ধির বিকল্পমাত্র। বস্তুতঃ কার্য-কারণসম্বন্ধ বলিয়া কিছুই নাই।

ইহা যে বুদ্ধির বিকল্পমাত্র তাহা ধর্মকীর্তি তৎকৃত প্রমাণবার্তিকের প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

'মতা সা চেৎসংবৃত্যা২স্তু যথা তথা।'

প্রমাণ বাঃ, প্রত্যক্ষ পরিঃ ৪ কাঃ।

এই কারিকাংশের উপর মনোরথ নন্দীর ব্যাখ্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মনোরথ নন্দী বলেন,—কার্য-কারণভাব কেবল ব্যবহারিক দিক হইতেই সিদ্ধ, পরমার্থতঃ সিদ্ধ নহে। প্রত্যক্ষের দ্বারা কখনও কার্য-কারণভাবের জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। বীজের প্রত্যক্ষ ও অঙ্কুরের প্রত্যক্ষ বিভিন্ন ক্ষণে পৃথক্‌ভাবে শুধু বীজ ও অঙ্কুরকেই গ্রহণ করে। 'বীজ থাকিলে অঙ্কুর হয়', এইরূপ একটি সামগ্রিক অন্বয়, অথবা 'বীজ না থাকিলে অঙ্কুর হয় না', এইরূপ একটি সামগ্রিক ব্যতিরেক প্রত্যক্ষের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। যখন বীজ দেখি, তখন বীজই দেখি; যখন অঙ্কুর দেখি, তখন অঙ্কুরই দেখি। অন্বয়-ব্যতিরেকরূপ কোন সম্বন্ধ চক্ষুদ্বারা দেখি না। বীজ ও অঙ্কুর একই সময়ে উপস্থিত থাকে না। সুতরাং একটি সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞানের দ্বারা বীজ, অঙ্কুর এবং উহাদের মধ্যে বিরাজমান সম্বন্ধকে গ্রহণ করাও সম্ভবপর নহে। বীজের প্রত্যক্ষজ্ঞানক্ষণ ও অঙ্কুরের প্রত্যক্ষজ্ঞানক্ষণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই অবস্থায় বীজ ও অঙ্কুরকে একত্র করিয়া, অন্বয় ও ব্যতিরেক সম্বন্ধের জ্ঞান প্রত্যক্ষের দ্বারা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি বলা যায় যে, বীজের পরে অঙ্কুর দেখি, এই ক্রমিক পৌর্বাপর্যের জ্ঞানকেই কার্য-কারণভাব বলিব? না, তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, ক্রমও প্রত্যক্ষগম্য নহে। পূর্বাপর জ্ঞানকে

ক্রম বলা হইয়াছে। যখন অঙ্কুর দেখি, তখন তাহার অপেক্ষায় অধুনালুপ্ত বীজকে পূর্ববর্তী বলিয়া চিন্তা করি। কিন্তু তখন তো বীজ নাই, তবে পূর্বত্বরূপ ধর্মটি কোথায় থাকিবে? একমাত্র কল্পনাতেই থাকিতে পারে। না হইলে পূর্বত্বরূপ ধর্মের অনুরোধেই বীজকে আবার বাচিয়া উঠিতে হইবে। ইহা মৃত ব্যক্তির আরোগ্যলাভের সামিল। আর তাহা না হইলে যখন বীজ দেখিতাম, তখনই পূর্বত্বও দেখিতাম। কিন্তু পরভাবী অঙ্কুরের অপেক্ষায়ই তো পূর্বত্বের জ্ঞান হইবে। অঙ্কুরের জ্ঞান এখনও জন্মে নাই। সেরূপ-ক্ষেত্রে তাহার অপেক্ষামূলক পূর্বত্বের জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? যদি বল যে, বর্তমান কালের পূর্বে থাকার নামই পূর্বত্ব, তবে পূর্বত্ব দিয়া পূর্বের লক্ষণ করা হইল এবং কিছুই বোঝা গেল না। অথচ বর্তমানের তুলনায়ই পূর্বত্ব ব্যাখ্যা করিতে হইবে, সুতরাং পূর্বত্ব বর্তমান কালের সহিতও যে সম্বন্ধ তাহা অস্বীকার করা চলে না। এই অবস্থায় পূর্বসম্বন্ধ বর্তমান আর বর্তমান রহিল না, অতীতই হইয়া গেল। পক্ষান্তরে, বর্তমানসম্বন্ধ অতীতও আর অতীত রহিল না। অতীত ও বর্তমান সমকালীনই হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং দেখা যায় যে, পূর্বত্বের কোন বাস্তব আধার খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কল্পনাই উহার একমাত্র আধার হয়। পরত্বসম্পর্কেও অনুরূপ যুক্তিই দেওয়া যাইতে পারে। কাজেই পূর্বাপরগ্রাহী ক্রম বা আনন্তর্য বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই। ইহাও বিকল্পমাত্র। প্রতিবাদী যদি বলেন যে, যখন অঙ্কুর আছে তখন বীজ নাই সত্য, কিন্তু বীজের স্মৃতি তো আছে। সেই স্মৃতির সাহায্যে অঙ্কুর অপেক্ষা বীজকে পূর্ববর্তী বলিয়া ধরিয়া লইব। প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তরেও কোন লাভ হইবে না। কেননা, পূর্বত্বের কোনরূপ স্মৃতির উদয় হওয়াই সম্ভবপর নহে। কারণ, দেখা যাইতেছে যে বীজজ্ঞানের সময় পূর্বত্বের জ্ঞান হয় নাই। পরবর্তী অঙ্কুরের সহিত তুলনা করিয়াই বীজকে পূর্ব বলা হইয়াছে। অঙ্কুরের জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত বীজকে পূর্ব বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। বীজজ্ঞানের সমকালে বীজের সহিত পূর্বত্বের জ্ঞানোদয় হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। এই অবস্থায় [illegible] সহিত পূর্বত্বের যোগ ঘটিবে কেমন করিয়া? পূর্বত্বের যোগ না থাকিলে তাহার (পূর্বত্বের) স্মৃতিইবা জন্মিবে কেমন করিয়া? অঙ্কুর অপেক্ষায় বীজের পূর্বত্বের অনুমানও এরূপক্ষেত্রে অচল। কার্য-কারণভাব কদাচ কাহারও প্রত্যক্ষ

হইলে তবেই অনুমানের অবকাশ থাকিত। জন্য-জনকভাব এবং ক্রমিকত্ব কখনও কাহারও প্রত্যক্ষগোচর হয় না। এই অবস্থায় কার্য-কারণভাবের অনুমানের সম্ভাবনা কোথায়? প্রজ্ঞাকর গুপ্ত তাঁহার বার্তিকভাষ্যে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। আমরা প্রত্যক্ষ করি, পূর্বে বীজ এবং পরে অঙ্কুর। কিন্তু "পূর্বে বীজ থাকিলে পরে অঙ্কুর হইবে, পূর্বে বীজ না থাকিলে পরে অঙ্কুর হইবে না", এইরূপ কোন নিয়ম কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে না। সুতরাং কার্য-কারণভাব অনুমানগম্য[1], এইরূপ সিদ্ধান্তও যুক্তিসহ নহে। ইহাতে 'ইতরেতরাশ্রয়'দোষ অনিবার্যরূপেই দেখা দেয়। কোনরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ না হইলে, তাহার ভিত্তিতে অনুমান জন্মিতেই পারে না। নিয়ম বা ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষগম্য না হইলে, সেক্ষেত্রে অনুমানের সাহায্যেই ব্যাপ্তির নিশ্চয় করিতে হইবে। এইরূপে ব্যাপ্তি অনুমানকে অপেক্ষা করে, অনুমানও ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা করে। উভয়ে উভয়কে অপেক্ষা করায়, কাহারই প্রামাণ্য নির্ণীত হইতে পারে না। বীজের যেখানে প্রত্যক্ষ করি, সেখানে যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়াও লই যে, 'বীজ হইতে অঙ্কুর হইয়াছে,' এতখানিই আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি*, তবুও বীজ ও অঙ্কুরের কার্য-কারণভাব সিদ্ধ হইবে না। কেননা, সর্বদেশে এবং সর্বকালে 'বীজ হইতেই অঙ্কুর হইবে, অন্য কিছু হইতে অঙ্কুর জন্মিবে না', এইরূপ কোন অবশ্যম্ভাবী নিয়ম বা ব্যাপ্তি তো কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।[2] ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ না হইলে অনুমান হইবে কিরূপে?

এইরূপে কার্য-কারণভাব প্রমাণসহ নহে বুঝিয়াই, কার্য-কারণসম্পর্ককে বৌদ্ধ-

১। অঙ্কুরঃ বীজজন্যঃ তদন্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িত্বাৎ।

* মনোরথ নন্দী তদীয় টীকায় দেখাইয়াছেন যে, বীজ ও অঙ্কুর পৃথক্‌ভাবেই প্রত্যক্ষগোচর হয়। বীজ হইতে অঙ্কুর হওয়া প্রত্যক্ষগম্য নহে। 'বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিয়াছে' এতখানিকে প্রত্যক্ষ বলিয়া তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলেও বীজ ও অঙ্কুরের কার্য-কারণভাব ব্যাখ্যা করা যায় না, ইহাই এখানে মনোরথ নন্দীর বক্তব্য বলিয়া বুঝা যায়।

২। ন চ নিয়মেন ততো ভাব ইতি কুতশ্চিৎ প্রতীতিঃ। তাবৎকালস্যৈব তদ্ভাবস্য গ্রহণাৎ। ন চাসৌ কার্যকারণভাবঃ।

প্রমাণবার্তিকের মনোরথ নন্দীর টীকা ১৮৩-১৮৪ পৃষ্ঠা ও কর্ণকগোমীর টীকা. ৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

তার্কিকগণ কল্পনাবিলাস বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কার্য-কারণসম্বন্ধকে বৌদ্ধসিদ্ধান্তে "প্রতীত্যসমুপাদ" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। 'প্রতীত্য' শব্দের অর্থ প্রাপ্ত হইয়া বা অবলম্বন করিয়া (প্রতি—√ই + ল্যপ্), সমুৎপাদ অর্থে সম্যক্ বা নিয়ত উৎপত্তিকে বুঝায়। সুতরাং কারণকে প্রাপ্ত হইয়া বা অবলম্বন করিয়া কার্যের যে নিয়ত উৎপত্তি ইহাই লইল 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' কথাটির আক্ষরিক অর্থ।* কার্য-কারণসম্পর্ক যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা সকলেই এবিষয়ে একমত যে, কারণ ব্যতীত কার্য জন্মে না। তাহা হইলে কার্য-কারণসম্পর্ক বুঝাইবার জন্য 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' এই নবীন পারিভাষিক শব্দটির সৃষ্টি করার পিছনে বৌদ্ধদার্শণিকগণের কি বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, এই শব্দটির বিশেষ তাৎপর্যই বা কি? এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসুর মনে জাগরূক হওয়া খুবই স্বভাবিক।

বৌদ্ধোক্ত প্রতীত্যসমুৎপাদ বা পটীচ্চসমুপ্পাদের বিবরণ

১। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, 'প্রতীত্য' শব্দটির দ্বারা কারণের উপর কার্যের একান্ত নির্ভরশীলতাই সূচিত হইতেছে। কার্য-কারণসম্পর্কের মূল কথাটি কি—প্রতীত্য শব্দটি তাহাই স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতেছে। অতএব 'প্রতীত্যসমুপাদ' এই পারিভাষিক শব্দটি সম্পূর্ণ সার্থক সন্দেহ নাই।

২। দ্বিতীয়তঃ, সমুদয় কারণসামগ্রী উপস্থিত হইলেই কার্যের উৎপত্তি সুনিশ্চিত। ইহাই জগতের স্বাভাবিক রীতি। দৃশ্যমান বিশ্বের এই স্বাভাবিক কার্য-কারণসম্পর্ককে অতিক্রম করিয়া, কোন অতিপ্রাকৃত ঈশ্বর বা শাশ্বত চৈতন্যময় সত্তাকে জগতের স্থির কারণরূপে কল্পনা করার অনুকূলে কোন বলিষ্ঠ যুক্তি নাই।

৩। তৃতীয়তঃ, জগতের কোন স্থির সত্তা নাই। ইহা এক অনন্ত গতিশীল কার্য-কারণপ্রবাহমাত্র। পূর্ববর্তী কারণ তাহারও পূর্ববর্তী কারণের

---

* (ক) হেতূন্ প্রত্যয়ান্ প্রতীত্য সমাশ্রিত্য যঃ স্কন্ধাদীনামুৎপাদঃ স প্রতীত্যসমুৎপাদঃ।
কমলশীলের তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা, ১৫ পৃষ্ঠা।

(খ) প্রতীত্য অন্যোঽন্যং হেতূকৃত্য তাং তাং সামগ্রীমাশ্রিত্য হেতুপ্রত্যয়ভাবেন যস্মিন্ সংঘাতেভ্যঃ সংঘাতাঃ প্রভবন্তি প্রধা[illegible]ণনিরপেক্ষাঃ স প্রতীত্য-সমুৎপাদঃ। ন্যায়কুমুদচন্দ্র, ৩৯০ পৃষ্ঠা।

কার্যস্বরূপ, আবার পরবর্তী কার্যও তাহার পরবর্তী কার্যের কারণস্বরূপ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, কার্য ও কারণ এই শব্দ দুইটি এখানে আপেক্ষিক (Relative) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্বক্ষণের কারণ এবং পরবর্তীক্ষণের কার্য সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ক্ষণব্যক্তির প্রবাহ ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর কিছুই নহে। বহির্বিশ্বের ন্যায় অন্তর্জগতেও স্থির আত্মা বলিয়া কিছুই নাই। সম্পূর্ণ বিভিন্ন পূর্বাপর বিজ্ঞানক্ষণসমূহের সন্তান বা প্রবাহই হইল চিত্ত বা আত্মা। এইভাবে সমুদয় বিশ্বজগৎ কার্য-কারণপ্রবাহের একটি স্বাভাবিক সুশৃঙ্খল নিয়মে গ্রথিত ও বিধৃত রহিয়াছে। একদিকে এই নিয়মের বিধাতা হিসাবে যেমন আত্মা বা পরমাত্মার স্বীকৃতি নিষ্প্রয়োজন, অন্যদিকে আবার উচ্ছৃঙ্খল আকস্মিকতা বা উৎকেন্দ্রিক নৈরাজ্যবাদের আশঙ্কাও সম্পূর্ণ অমূলক। সুতরাং পরস্পর বিচ্ছিন্ন নিরন্তর ক্ষণসমূহের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। বৌদ্ধদর্শনের এই মূল মতবাদের সহিত 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' কথাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

উপরে বর্ণিত ২য় ও ৩য় অনুচ্ছেদে 'প্রতীত্যসমুৎপাদে'র দুইটি রূপ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ আমরা বৌদ্ধোক্ত কার্য-কারণ-সম্বন্ধকে দুইদিক হইতে বিচার করিতে পারি। একদিকে কারণ ও কার্য এই পূর্বাপর দুইটি ক্ষণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিতে হইবে। অপরদিকে কার্য-কারণসম্পর্ককে ক্রমাগত অনন্ত ক্ষণপরম্পরারূপে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রথম চরিত্রটিকে আমরা Harizontal causal relation বলিতে পারি। ইহারই পারিভাষিক নাম—"প্রত্যয়োপনিবন্ধ," দ্বিতীয় চরিত্রটিকে আমরা Vertical causal relation বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি। তাহার পারিভাষিক আখ্যা হইল—"হেতূপনিবন্ধ।"

প্রত্যয়োপনিবন্ধ কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রত্যয়শব্দের অর্থ এখানে হেতুসমূহের সমষ্টি বা সমবায় (Combination of causal conditions)। ইহারই অপর নাম হেতুসামগ্রী।

প্রত্যয়োপনিবন্ধ

কোন একটি কার্যের একটি ব্যক্তি বিশেষই কারণ নহে। হেতু-সমুদয় বা সামগ্রীই কারণ। আচার্য ধর্মকীর্তি "প্রমাণবার্তিকে" এই হেতু-সামগ্রীবাদ বলিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতে স্পষ্টতঃ উপপাদন করিয়াছেন। বৌদ্ধ-

দার্শনিকগণ কার্যোৎপাদনে কারণের কোনও বিশেষ শক্তি আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনে করেন না যে, কোনও কারণদ্রব্যে কার্য-জননী শক্তি বলিয়া পৃথক্ কোনও বৈশিষ্ট্য বা পদার্থ স্বীকারের কোনরূপ আবশ্যকতা আছে। একই কারণব্যক্তি হইতে যদি পৃথক্ পৃথক্ কার্যোৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তবে সেই কারণে ভিন্ন ভিন্ন কার্যোৎপত্তির বিভিন্ন মৌলিক শক্তিও স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ফলে, একই কারণ হইতে বিভিন্ন কার্যোৎপত্তির দৃষ্টান্তই কারণে কার্যজননী শক্তির ভিন্নতায় প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়। শক্তিবাদীর এইরূপ মতবাদের খণ্ডনে বৌদ্ধদার্শনিকগণ বলেন— জগতে কোথায়ও একটি কারণ হইতে একটি কার্যের উৎপত্তি হইতে দেখা যায় না। আর তাহা সম্ভবপরও নহে। ঘটের কারণ মাটি, দণ্ড, চক্র, সলিল, সূত্র, প্রভৃতি। এই কারণগুলির কোন একটিই স্বতন্ত্রভাবে ঘট উৎপাদন করিতে পারে না। কারণগুলি মিলিতভাবেই ঘট উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং কারণসমষ্টিই ঘটের কারণ। ইহাদের কোন একটিই ঘটের কারণ নহে। সকলের সম্মিলিত অবস্থাই ঘটের কারণ। আলোচ্য হেতু-সমষ্টির কোন একটির অভাব ঘটিলেই ঘট জন্মিতে পারে না, ইহা অবশ্য সত্য কথা। অতএব কারণসমষ্টির প্রত্যেকটি কারণই ঘটের হেতু হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন একটিমাত্র হেতুই কার্যোৎপাদনে সমর্থ নহে বলিয়া, কোন একটিকেই ঘটের কারণ বলা চলিবে না। কারণসমষ্টিকেই কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যাহার পরে কার্যোৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী তাহাই ভাবী কার্যের কারণ আখ্যা লাভ করে। সমস্ত হেতুর সমষ্টি বা হেতুসামগ্রী সম্মিলিত হইলেই কার্য জন্মলাভ করে। অতএব মিলিত হেতু বা হেতু-সামগ্রীই কার্যের কারণ। কোন একটি হেতু নহে। মাটি হইতে ঘট হয়, শরা হয়, পুতুল হয়, দেয়াল হয়। কিন্তু এই প্রত্যেকটি কার্যের হেতুসামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন। এই সামগ্রীমধ্যে মাটি হেতুসমষ্টির একটি সাধারণ অঙ্গমাত্র (common factor)। কিন্তু আমাদের বাস্তব প্রয়োজনে আমরা সাধারণতঃ কোন একটি হেতুর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করি এবং উহাকেই প্রধান বলিয়া কল্পনা করি। অপরাপর হেতুগুলিকে উহার সহকারী বলিয়া ধরিয়া লই। যেমন অঙ্কুরের কারণহিসাবে বীজের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া, মাটি, জল, বায়ু ও উত্তাপকে বীজের সহকারী বলিয়া ব্যাখ্যা

করি। ইহা লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি, দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নহে। দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বীজ, মৃত্তিকা, জল, বায়ু, আলোক, উত্তাপ, মুক্তস্থান (আকাশ) প্রভৃতির সমবায় বা সমষ্টিই অঙ্কুরের কারণ।[১]

ধর্মকীর্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বখণ্ডনপ্রসঙ্গে এই হেতুসামগ্রীবাদ বা প্রত্যয়োপনিবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। জাগতিক নিয়মে কোন একটি হেতুর স্বতন্ত্র বা এককভাবে কোনও কার্যোৎপাদনের সামর্থ্য নাই, সম্মিলিত হেতুসামগ্রীরই সেই সামর্থ্য আছে। আমাদের কল্পনা এই জাগতিক নিয়মকে অতিক্রম করিয়া অবাধে বিচরণ করিলে তাহা হইবে অবৈধ বিহার। প্রত্যক্ষব্যভিচারী অনুমান যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। 'দৃষ্টানুসারিণী কল্পনা' এই নীতি অনুসারে একক ঈশ্বরের জাগতিক বিবিধ বিচিত্র কার্যাবলীর উৎপাদনের সামর্থ্য নাই বা থাকিতে পারে না। পরিদৃশ্যমান জগতে কোন একক হেতুর যে বৈশিষ্ট্য (বা সামর্থ্য) নাই, একক পরমেশ্বরের সেই বৈশিষ্ট্য স্বীকার করা যায় কেমন করিয়া? সুতরাং কোনও সর্বশক্তিমান্ জগন্নির্মাতা একক পরমেশ্বরের কল্পনা সম্পূর্ণ ই যুক্তিবিরুদ্ধ।[২]

এই হেতুসামগ্রীবাদ প্রকারান্তরে অপরাপর দার্শনিক সম্প্রদায়ও স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য বৌদ্ধতার্কিকগণ যেমন ইহাকে পরমেশ্বরের অস্তিত্বখণ্ডনে প্রয়োগ করিয়াছেন, ঈশ্বরবাদী আস্তিক দার্শনিকগণ তাহা করিতে পারেন না—ইহা বলাই বাহুল্য। পূর্বে আমরা "বেদান্তপ্রমাণ-পরিক্রমা"য়, (বেদান্তদর্শন-অদ্বৈতবাদ, দ্বিতীয়খণ্ডে) প্রমাণের সংজ্ঞা এবং স্বরূপের বিশ্লেষণে ন্যায়মঞ্জরী-রচয়িতা জয়ন্তভট্টের মতের বিবরণে প্রমাণ-সামগ্রীবাদ আলোচনা করিয়াছি। এই প্রমাণ-সামগ্রীবাদ হেতুসামগ্রীবাদেরই একটি বিশেষ সংস্করণমাত্র। বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যের সুপ্রাচীন টীকাকার ব্যোমশিবাচার্য তাঁহার

১। ন কিঞ্চিদেকমেকস্মাৎ সামগ্র্যাঃ সর্ব্বসম্ভবঃ।
এরুং স্যাদপি সামগ্র্যোরিত্যুক্তং তদনেককৃৎ ॥
ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্তিক, ৩।৫৩৬ কাঃ।

২। পৃথক্ পৃথগশক্তানাং সভানাতিশয়েঽসতি।
সংহতাবপ্যসামর্থ্যং স্যাৎসিদ্ধোঽতিশয়স্ততঃ ॥
তস্মাৎ পৃথগশক্তেষু যেষু সম্ভাব্যতে গুণঃ।
সংহতৌ হেতুতা তেষাং নেশ্বরাদেরভাবতঃ ॥
প্রমাণ বার্তিক, ২।২৮-২৯ কাঃ।

ব্যোমবতী বৃত্তিতে উল্লিখিত প্রমাণ-সামগ্রীবাদ সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়াছেন।[১] সুপ্রসিদ্ধ জৈন নৈয়ায়িক আচার্য প্রভাচন্দ্র তাঁহার 'প্রমেয়কমলমার্তণ্ড,'[১] এবং "ন্যায় কুমুদচন্দ্র" নামক গ্রন্থে সামগ্রী-প্রমাণবাদের উল্লেখ করিয়া, ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন।[২] কিন্তু ঐ প্রভাচন্দ্রই ঐ দুইটি সুবিখ্যাত গ্রন্থে পরমেশ্বর-বাদের খণ্ডন প্রসঙ্গে আংশিকভাবে হেতুসামগ্রীবাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।[৩] আচার্য প্রভাচন্দ্র বলেন—সকল কার্য একজন কর্তাই সম্পাদন করিবেন এমন কোনও নিয়ম নাই। জগতের কার্য-কারণশৃঙ্খলা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, কখনও এক কর্তা একটি কার্য সম্পাদন করেন, আবার কখনও বা একক কর্তা অনেক কার্য সম্পাদন করেন। কখনও অনেক কর্তা এক কার্য, কখনও বা অনেক কর্তা অনেক কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় বহুবিধ কার্যে বিভক্ত বিচিত্র এই ধরিত্রীর সৃষ্টির জন্য একজন সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে, এমন কথা বলা যায় না। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এখানে ধর্মকীর্তিকর্তৃক সুস্পষ্টরূপে নির্ধারিত হেতুসামগ্রীবাদ অনেকাংশে সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রতীত্যসমুৎপাদের 'প্রত্যয়োপনিবন্ধ' নীতি অনুসারে সর্বত্র বহুহেতুর সম্মেলনের ফলেই কার্যের উৎপত্তি হয়, ইহাই আচার্য ধর্মকীর্তির মত। প্রভাচন্দ্র এক হইতে অনেক কার্যের, অনেক হইতে এক বা একাধিক কার্যের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করায়, প্রভাচন্দ্র যে কার্য-কারণের ব্যাখ্যায় কোনরূপ ধরাবাঁধা নিয়মের পক্ষপাতী নহেন, তাহাই স্পষ্টতঃ বুঝা যায়।

"ন কিঞ্চিদেকমেকস্মাৎ সামগ্র্যাঃ কার্যসম্ভবঃ।" প্রমাণবার্তিক, ৩।৫৩৬ কাঃ, ইত্যাদি ধর্মকীর্তির কারিকায় কারণ হইতে কার্যোৎপত্তির বিশ্লেষণে প্রজ্ঞাকরগুপ্ত প্রাথমিক ব্যাখ্যায় বলিলেন, কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তিতে কোনরূপ ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। কিন্তু পরবর্তী সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যায় প্রজ্ঞাকরগুপ্ত বলিতেছেন—অনেক হেতুর সম্মেলন হইতেই কার্যের উৎপত্তি হয়, ইহাই নিয়ম। বৃত্তিকার মনোরথ নন্দী প্রজ্ঞাকরগুপ্তের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া বলিলেন, পূর্বোক্ত দুইটি হেতুসামগ্রী বা হেতুসমষ্টির মধ্যে একটি সাধারণ অংশ (Common element) থাকা খুবই স্বাভাবিক। অনেক সময় সেই সাধারণ অংশটিকে প্রধানরূপে এবং

১। ব্যোমবতী বৃত্তি ৫৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। প্রমেয় কমলমার্তণ্ড, ৭-১৩ পৃঃ ; ন্যায়কুমুদচন্দ্র, ৩৩-৩৯ পৃষ্ঠা।

৩। প্রমেয় কমলমার্তণ্ড, ২৮২ পৃঃ ; ন্যায়কুমুদচন্দ্র, ১০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অন্য হেতুগুলিকে সহকারীরূপে কল্পনা করিয়া আমরা এক হেতু হইতে অনেক কার্য উৎপন্ন হয় এইরূপ বলিয়া থাকি। প্রজ্ঞাকর গুপ্ত বলেন, ইহা নিছকই কল্পনা; অর্থাৎ অনেকের মিলিত কাজ আমরা একের উপর আরোপ করিয়া থাকি। যেমন অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জ্বালাইলে গৃহের মধ্যে অবস্থিত জনগণ অনেক জিনিষ দেখিতে পায়। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা বলি, ঐ প্রজ্বালিত প্রদীপই বহু লোকের বিচিত্র বিবিধ দর্শনের কারণ। বস্তুতঃ কিন্তু প্রদীপ অন্যতম হেতুমাত্র (one of the causal conditions)। দর্শকদিগের নির্দোষ চক্ষু, মনঃসংযোগ, দ্রষ্টব্য বস্তুসমূহের অনাবৃত উপস্থিতি, এই সবগুলিই একযোগে বস্তুদর্শনের হেতু। কিন্তু প্রদীপ-হেতুটির উপস্থিতি না থাকা পর্যন্ত হেতুসম্মেলন পূর্ণাঙ্গ হয় না, প্রদীপ-হেতুটি উপস্থিত হইবামাত্রই হেতুযোগ পরিপূর্ণাঙ্গ হইল, বস্তুদর্শনও সম্ভবপর হইল। এইভাবে প্রতীত্য-সমুৎপাদের প্রত্যয়োপনিবন্ধ নীতি হইতেই হেতুসামগ্রীবাদের উদ্ভব হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

২। বৌদ্ধোক্ত প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রত্যয়োপনিবন্ধ নীতি আলোচনা করা গেল। এখন আমরা প্রতীত্যসমুৎপাদের দ্বিতীয় নীতি অর্থাৎ হেতূপনিবন্ধনীতির আলোচনা করিব। আমরা একথা সকলেই জানি যে, বৌদ্ধসিদ্ধান্তে নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চই ক্রমাগত অনন্তক্ষণ বা ক্ষণিক বস্তুর নিরন্তর প্রবাহমাত্র। এই প্রবাহকে আমরা দুইটি দিক হইতে বিশ্লেষণ করিতে পারি। আমরা আমাদের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই ক্রমবর্তী অনন্তক্ষণসমূহ হইতে কতকগুলি ক্ষণপরম্পরা বাছিয়া লইয়া, পূর্বোত্তরপ্রসারী পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডপ্রবাহ (vertical series of moments) সৃষ্টি করি। সৃষ্টি করি কথার অর্থ এখানে এই যে, আমরা মানবচিন্তার চিরাচরিত প্রণালী অনুসারে বস্তুজগৎকে একটা বিশেষ ধরণে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছি। সেই অভ্যাসবশে সততচঞ্চল খণ্ড ক্ষণপ্রবাহকেও স্থির অচঞ্চল বলিয়াই উপলব্ধি করিয়া থাকি। এই খণ্ড প্রবাহও দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। আলঙ্কারিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, কোথায়ও কোথায়ও যেন নিরন্তর ক্ষণগুলি জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে এবং স্থির ও স্থায়ী বস্তুসত্তায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। যেমন পাথর, বাড়ী, ঘর, মানুষ, গাছপালা ইত্যাদি। ইহারা ক্ষণিক বা ক্ষণপরিবর্তনশীল হইলেও লৌকিক দৃষ্টিতে ঐ

সকল বস্তুরাজি ক্ষণিক নহে, স্থির এবং স্থায়ী। বৈনাশিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তথাকথিত ঐ স্থির বস্তুগুলির কোনটিই স্থির এবং স্থায়ী নহে। সম্মুখে পতিত ঐ পাথরের খণ্ডখানি স্থির নহে, প্রতিক্ষণেই নূতন। উহা আসলে একও নহে। অনেক সদৃশ ক্ষণসমূহেরই সৃষ্টি। পূর্বক্ষণের ন্যায় অব্যবহিত পরক্ষণেও নূতন নূতন প্রস্তরখণ্ডই জন্মলাভ করিতেছে। পূর্বক্ষণ এবং পরক্ষণ সম্পূর্ণ সদৃশ বিধায়, এবং ঐ উভয়ক্ষণের মধ্যে ক্ষণিকেরও ব্যবধান না থাকায়, প্রস্তরখণ্ডের অস্থির ক্ষণপ্রবাহকে আমরা ধরিতে পারি না। প্রস্তর-খণ্ডকে স্থির স্থায়ী বলিয়া ভুল করি। অস্থির প্রস্তরখণ্ডের পূর্ব ও উত্তর ক্ষণের মধ্যে যে কারণ-কার্য-সম্পর্ক বিরাজ করিতেছে তাহাও আমাদের অবৈজ্ঞানিক স্থূল দৃষ্টিতে ভাসে না। ইহাকে বৌদ্ধেরা বলেন, সদৃশক্ষণ-প্রবাহ। যাহাকে স্থির ও স্থায়ী বলিয়া মনে হয়, তাহাই বৌদ্ধসিদ্ধান্তে অস্থির সদৃশক্ষণ-প্রবাহমাত্র। পক্ষান্তরে, বিশ্বের অসংখ্য ক্ষণধারা হইতে আমরা এমনভাবেও কতকগুলি ক্ষণধারা বাছিয়া লইতে পারি যাহাতে একটি বিসদৃশ ক্ষণপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই বিসদৃশ ক্ষণপ্রবাহকেও আমরা বিশৃঙ্খলভাবে সাজাইব না। কার্য-কারণ-সম্পর্কের শৃঙ্খলা অনুসরণ করিয়া সাজাইয়া লইব। পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রত্যয়োপনিবন্ধ বা হেতুসামগ্রীবাদের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, আমরা আমাদের সাজাইবার ব্যাপারে কোন একটি বিশেষ হেতুকে প্রাধান্য দিব এবং তাহার পরভাবী বিসদৃশ খণ্ড ক্ষণপ্রবাহকে অর্থাৎ বিসদৃশ বস্তুটিকে ঐ বিশেষ প্রধানহেতুর কার্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিব। সেই কার্যটিও আবার উহার পরবর্তী একটি বিসদৃশ বস্তু উৎপাদন করতঃ তাহার কারণের মর্যাদা লাভ করিবে। সেই পরভাবী বস্তুটিও বিসদৃশ অপর একটি পরভাবী বস্তুর কারণ হিসাবেই দেখা দিবে। এইরূপে একটি বিসদৃশ ক্ষণপ্রবাহ-বিধৃত বিসদৃশ কার্য-কারণ-পরম্পরার সৃষ্টি হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলা যায়—বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদিরূপে পুনরায় আমরা বীজে ফিরিয়া যাইতে পারি এবং পরবর্তীকালে অনুরূপ আর একটি বিসদৃশ ক্ষণপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়া অঙ্কুরাদির উৎপত্তি সাধন করিতে পারি। ইহাই জাগতিক কার্য-কারণ-প্রবাহের ধারা। এই সকল ক্ষেত্রে পূর্বোত্তর ক্ষণ দুইটি বিসদৃশ বলিয়া, বীজ ও অঙ্কুর ভিন্ন বস্তুরূপে আমাদের জ্ঞানের গোচর হয়, প্রস্তরখণ্ডের মত স্থির ও দীর্ঘস্থায়ী

এক বস্তু বলিয়া জ্ঞানে ভাসে না। এইজন্য বীজ ও অঙ্কুরাদির ক্ষেত্রে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ সুস্পষ্টরূপে আমাদের বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে।[১] এইরূপ বিসদৃশ ক্ষণপ্রবাহের অন্তরে বিরাজমান কার্য-কারণ-সম্পর্ককেই বলা হয়—"হেতুপনিবন্ধ"।

প্রতীত্যসমুৎপাদের উল্লিখিত হেতুপনিবন্ধ-নীতি অনুসারে প্রাচীন বৌদ্ধ পালি গ্রন্থসমূহে নিখিল বিশ্বপ্রক্রিয়ার সামগ্রিকভাবে ও ব্যাপকভাবে যে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহারই পারিভাষিক সংজ্ঞা হইল "দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুৎপাদ।" ইহা মূলতঃ বৌদ্ধদর্শনের প্রাচীন থেরাবাদ (স্থবিরবাদ) ও সর্বাস্তিবাদের মতহিসাবে সুবিখ্যাত। ইহা ঠিক বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের বিষয় নহে। কিন্তু অধ্যাত্মশাস্ত্রের (Metaphysicsএর) ইহা অন্যতম মুখ্য বিষয়। এইজন্য পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ধর্মীয় মতহিসাবে এবং নির্বাণ লাভের জন্য অনুধাবনীয় বিষয়হিসাবে আলোচ্য দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুৎপাদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতানুসারে নিখিল বিশ্বের কার্য-কারণ-প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্তরূপে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্য সমুৎপাদ"

সংসারের মূল কারণ (১) অবিদ্যা, অবিদ্যা হইতে (২) সংস্কার, সংস্কার হইতে (৩) বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে (৪) নামরূপ, নামরূপ হইতে (৫) ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে (৬) স্পর্শ, স্পর্শ হইতে (৭) বেদনা, বেদনা হইতে (৮) তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে (৯) উপাদান, উপাদান হইতে (১০) ভব, ভব হইতে (১১) জাতি, জাতি হইতে (১২) জন্ম-মরণ। এই হইল আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদের—হেতুপনিবন্ধ বা দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্য-সমুৎপাদ।[২]

১। প্রমাণবার্তিকের কর্ণকগোমীর টীকা, ৯২ পৃষ্ঠা ;

২। শিক্ষা সমুচ্চয়, ২১৯-২২৩ পৃঃ ; বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকা, ৩৮৬ পৃঃ ;
মধ্যান্তবিভাগসূত্রভাষ্য টীকা, ২৯-৩৪ পৃঃ ; ন্যায়কুমুদচন্দ্র (পূর্ববঙ্গগ্রন্থ) ৩৯০-৩৯২ পৃঃ ;
ভামতী, ২।২।১৯ সূত্র।

সিংহলের প্রসিদ্ধ থেরাবাদী বৌদ্ধদার্শনিক অশ্বঘোষ তাঁহার বিশুদ্ধি মগ্‌গ নামক সুবিখ্যাত পালিগ্রন্থে দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুৎপাদের বিস্তৃত ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেই আলোচনা দেখিবেন।

পরবর্তীকালে মহাযানিক বৌদ্ধসম্প্রদায় অর্থাৎ শূন্যবাদী মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদী যোগাচার দার্শনিকেরা কার্য-কারণ-সম্পর্কের যে পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করিতে পারেন নাই, তাহা আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায়ই স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়াছি। 'মধ্যান্তবিভাগসূত্রভাষ্য' টীকায় আচার্য স্থিরমতি আলোচিত দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্য সমুৎপাদকে ক্লেশস্বরূপ, অযৌক্তিক এবং অভূতপূর্ব পরিকল্পনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :—

"সংক্লেশলক্ষণঃ দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্য সমুৎপাদঃ...... ।
এষ সর্বঃ সংক্লেশোঽভূতপরিকল্পাৎ প্রবর্ততে।"

মধ্যান্তবিভাগ সূত্রভাষ্যের স্থিরমতিকৃত টীকা, ৩৪-৩৭ পৃঃ।

সুতরাং একদিকে বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের ভিত্তিতে সুগঠিত মতবাদে বিশ্বাসী মহাযানিক দার্শনিকেরা যেমন কার্য-কারণভাবের পারমার্থিক সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেও প্রতীত্য সমুৎপাদকে অবিদ্যা কলুষিত, বিকল্প-কল্পিত এবং সাংসারিক ক্লেশনিদান রূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। শূন্যতা ভাবনাদ্বারা এই প্রতীত্যসমুৎপাদের ঊর্ধ্বে উঠিয়া পরিনির্বাণ লাভ করিতে হইবে, ইহাই বৌদ্ধাচার্যদিগের অদ্বৈতভাবনাভাবিত আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বা পরম ও চরম আত্মদর্শন।

কার্য-কারণ সম্পর্কে অদ্বৈতমত ও বৌদ্ধমতের তুলনা

আমরা কার্য-কারণ-ভাবসম্পর্কে বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত যেরূপ আলোচনা করিলাম, অদ্বৈতবেদান্তীরও ইহার বিরুদ্ধে কোন মৌলিক আপত্তির কারণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ, সম্বন্ধখণ্ডনে সাধারণভাবে ধর্মকীর্তি যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, অদ্বৈতবাদীরাও অনুরূপ যুক্তিরই অনুসরণ করিয়াছেন। অবয়বীর খণ্ডনে, সংযোগ-সমবায় প্রভৃতির খণ্ডনে অদ্বৈতবেদান্তীর যুক্তিলহরীও বৌদ্ধোক্তযুক্তির সহিত একই খাতে প্রবাহিত হইয়াছে দেখিতে পাই। কার্য-কারণভাবের পারমার্থিক সত্যতার খণ্ডনে শ্রীহর্ষের যুক্তির সহিত বৌদ্ধপ্রদর্শিত যুক্তির সাদৃশ্যের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কার্য-কারণসম্বন্ধের মূল কথা যে, নিয়ম বা necessity তাহা কখনও প্রত্যক্ষতঃ জানা যায় না। কারণ, necessity বলিয়া বাস্তবে কিছুই নাই। বৌদ্ধদিগের এই বক্তব্য হইতে পাশ্চাত্য Hume পন্থীরা নিশ্চতই অনুপ্রেরণা লাভ করিবেন। Humeও বলিয়াছেন—কোন বস্তুর সহিত কোন

বস্তুর necessary relation বা আবশ্যক সম্পর্ক নাই। Necessity বা আবশ্যকতা হইল দর্শকের কল্পনা বা মানসসৃষ্টি। এসম্পর্কে বৌদ্ধ-তার্কিকদিগের আলোচনার গভীরতা ও অন্তর্দৃষ্টি Hnmeকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আর একবার Logical construction ও বাস্তব সত্তার প্রভেদ আমরা বুঝিতে পারিলাম। অদ্বৈতবেদান্তের কার্য-কারণভাবকে Logical construction বলিয়াই মানিতে এবং বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মসূত্র-শঙ্কর-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অদ্বৈতবেদান্তোক্ত কার্য-কারণভাবের আলোচনা-পদ্ধতি যে স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে, তাহার কারণ এই যে, ঐ আলোচনায় অদ্বৈত পরমার্থতত্ত্ব Metaphysicsএর প্রভাব পরিস্ফুট। অদ্বৈতবাদী বলেন, একমাত্র বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য, কার্যজগৎ মিথ্যা অর্থাৎ অনির্বচনীয়। মিথ্যা বা অনির্বচনীয় কার্য, কারণ হইতে পৃথক্ কোনও তত্ত্ব নহে।[1] কার্য ও কারণের ভিন্নত্ব বোধ অজ্ঞান কল্পিত এবং মিথ্যা।* এই মিথ্যা ভিন্নতাবোধ কার্যের পারমার্থিক সত্যতার ভ্রান্তি হইতে উদ্ভূত। মূলতঃ কার্য-কারণভাব বলিয়া কিছু নাই। নির্গুণ-নির্বিশেষ পরব্রহ্ম সম্পর্কে কারণ শব্দটির ব্যবহারও একটা কাল্পনিক ব্যপদেশ বা প্রয়োগমাত্র। মিথ্যা কার্যবর্গের মিথ্যাভূত সম্পর্কের আভাস প্রদর্শনের জন্যই অকারণ ব্রহ্মে কল্পিত কারণত্বের আরোপ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে অদ্বৈত ও বৌদ্ধমতের বৈসাদৃশ্য ও পরবর্তী অংশে সাদৃশ্য লইয়া আলোচনা করিয়াছি। আলোচনার ভিতরে আমরা এই কথাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, অদ্বৈত ও বৌদ্ধমতের মধ্যে Epistemology বা প্রামাণবাদের ক্ষেত্রে যেমন অত্যাশ্চর্য মিল, Metaphysics বা তত্ত্ববিচারের ক্ষেত্রে তেমনই অতি বিস্ময়কর প্রভেদ। পরমার্থতত্ত্বের দিক হইতে অদ্বৈতবেদান্তের বক্তব্য পূর্বেই আমরা উপস্থাপিত করিয়াছি। অদ্বৈতবাদীর মূল কথা এই, দৃশ্যমান জগৎ বিকল্পই হউক, আর বিপর্যই হউক, একটা তাত্ত্বিক অধিষ্ঠান না থাকিলে কোন প্রকার

১। তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ। ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪ ইত্যাদি সূত্র-ভাষ্য-ভামতী দ্রষ্টব্য।

* এই পুস্তকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে জগতের মিথ্যাত্ব ব্যাখ্যায় আমরা [illegible] কার্য ও কারণের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

ভ্রান্তিই সম্ভবপর নহে। অদ্বৈতবেদান্তী বহুক্ষেত্রে বিকল্প ও বিপর্যয়কে একই পর্যায়ে (পংক্তিতে) ফেলিয়াছেন। "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।" (যোগসূত্র ১।১।১১) এই যোগসূত্র-প্রদর্শিত বিকল্পের লক্ষণ সর্বত্র অদ্বৈতবাদী কঠোরভাবে অনুসরণ করেন নাই। [illegible] শেষ-পর্যন্ত সর্বত্র 'অধ্যাস' বা আরোপই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। শুক্তিতে যেমন রজত আরোপিত হয়, সেইরূপই বিকল্পের ক্ষেত্রেও অবস্তুতে বস্তুত্ব আরোপিত হয়। বস্তু জগতে না থাকিলেও যাহা শুধু আমাদের মানসিক ধারণা বা Logical conception মাত্র, তাহারও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার জন্য তাহাতে আমরা বস্তুত্ব আরোপ করি। এইভাবে সামান্য, সমবায়-সম্বন্ধ, কার্য-কারণভাব প্রভৃতি সকল Logical constructionই দ্বৈতবাদী ও নৈয়ায়িকদিগের হাতে পড়িয়া বস্তুসত্তায় রূপান্তরিত হইয়াছে। অবস্তুকে বস্তুতে পরিণত করার এই ঝোঁক বা Hypostatization মূলতঃ অধ্যাস হইতেই উদ্ভূত। বৌদ্ধাচার্যগণ বিকল্প কথাটির বিশেষ অর্থের প্রতি সর্বদাই নজর রাখিয়াছেন। তাঁহারা সামান্য, সম্বন্ধ, কার্য-কারণভাব প্রভৃতিকে, এক কথায় জাতি, গুণ, ক্রিয়া, নাম, দ্রব্য প্রভৃতিকে ঠিক শুক্তিতে রজত ভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তি বলেন না। রজত নাই বলিলে রজতের ভ্রান্তি হয় না। কিন্তু জাতি, গুণ প্রভৃতির পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই জানিলেও, উহাদের ধারণার প্রয়োজন হয়। সম্বন্ধ, সামান্য, কার্য-কারণভাব প্রভৃতির বস্তুসত্তা না থাকিলেও, আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে সচল রাখিবার জন্যই, উহাদের ধারণার আবশ্যকতা অপরিহার্য। রাম ও লক্ষণের ভিতরে সহোদরত্বের সম্বন্ধ আছে, ইহা শুনিয়া সাধারণ লোক দার্শনিকদিগের জটিল বিচারে বিহ্বল হইয়া ভাবিবে—এ আবার কেমন কথা? রাম ও লক্ষণ দুই ভাই। রাম-লক্ষণ এই দুইজন ছাড়া তৃতীয় সহোদরত্ব বলিয়া একটা আলাদা বস্তু আবার কোথায় থাকিবে? প্রশ্ন হইতে পারে, সহোদরত্ব বলিয়া তৃতীয় যদি কিছু নাই থাকে, তাহা হইলে রাম-লক্ষণ বলিলেই পার, আবার সহোদর বল কেন? অর্থ কিছু আলাদা নাই, তবে আলাদা শব্দ ব্যবহার কর কেন? দার্শনিকের এইরূপ মন্তব্য শুনিয়া আমাদের সাধারণ লোকটি অবশ্য ধমক খাইয়া হতবাক হইয়া যাইবে। কিন্তু সে সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছ, তাহা ঠিকই বুঝিয়াছ। শুধু বিকল্প বা Logical construction কাহাকে বলে

তাহা সে জানে না। জানিলে বলিত, এরূপ অনেক শব্দ আছে, যাহা শোনামাত্র মনের মধ্যে একটা অর্থবোধ জাগে, কিন্তু বাহিরের জগতে ঐ অর্থের অনুরূপ কোন বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐরূপ শব্দার্থের মানসিক বোধ থাকিলেও, কোনরূপ বাস্তব সত্তা নাই। কিন্তু জীবনের গতিপথে প্রতিপদক্ষেপে যাহাদের বাস্তব সত্তা নাই ঐ জাতীয় শব্দ আমরা ব্যবহার করি। ঐ শব্দগুলি আমাদের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ধারণার প্রতীক; যে-ধারণাসমূহ মানসলোক হইতে আমদানী করিয়া আমরা আমাদের চতুর্দিকে বিরাজমান এই জগল্লক্ষীকে বুঝিতে চেষ্টা করি, দার্শনিক ব্যাখ্যা করি এবং নিজেদের উপযোগী করিয়া ব্যবহার করি। এই শ্রেণির ব্যাখ্যামূলক ধারণা বা interpretative fictionকে আমরা শব্দের ভিতরে নির্দিষ্ট করিয়া ধরিয়া রাখি। তাই বস্তু নাই, কিন্তু শব্দার্থের একটা জ্ঞান আছে, ইহাই বিকল্পের রহস্য। Logical constructionএর বাহাদুরী এইখানে যে, ইহা যেন এক প্রকার সজ্ঞানে সচেতনভাবে ভুল করা। কিন্তু অনেক সময় সাধারণ লোক যেখানে সচেতনভাবে ভুল করেন, দার্শনিকগণ সেখানে অচেতনভাবে ভুল করেন। এইজন্যই দ্বৈতবাদীরা বস্তুহীন বিকল্পগুলিকে বস্তুসত্তায় পরিণত করিয়া পরমার্থসত্তার পরিধি অকারণে ফাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। Logical construction ও Illusionএর ভিতরে যে প্রভেদ বিকল্প এবং বিপর্যয়ের মধ্যেও সেই প্রভেদ। আমাদের মনে হয়, বৌদ্ধাচার্যেরা জগৎকে বলিতে চাহিয়াছেন বিকল্প বা Logical construction, অদ্বৈতাচার্যেরা বলিয়াছেন অধ্যাস বা Illusion. এই তফাৎটি উভয়মতের সামগ্রিক আলোচনা-দ্বারা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টিতে স্পষ্টতঃই ধরা পড়িবে।*

অদ্বৈত ও বৌদ্ধ প্রমাণতত্ত্বের (Epistemology) বিচারে এই যে

* Russel কর্তৃক উদ্ভাবিত Logical construction কথাটিতে অনেকে আপত্তি তুলিবেন জানি। বিকল্প বুঝাইতে অন্য কোনও সমীচীন শব্দের যদি কেহ প্রয়োগ করেন, তাহাতে আমাদের আপত্তির কোনও কারণ থাকিবে না। কারণ, আমরা এ বিষয়ে সচেতন যে Russellএর Logical construction অপেক্ষা আমরা বিকল্প কথাটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করিতেছি। কেহ যদি ইহাকে (বিকল্পকে) Interpretative fiction বলেন তথাপি আমরা আপত্তি করিব না। শুধু এইটুকুই বলিব যে, যেরূপ ব্যাখ্যাই করুন না কেন, আমাদের 'বিকল্পের' সব অর্থ টুকু যেন এখানেও প্রকাশ পাইল না।

সূক্ষ্ম প্রভেদ আমরা দেখিলাম, ইহার মূলে উভয় মতেই তত্ত্ব বিদ্যা (Metaphysics) যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সন্দেহ নাই। মাধ্যমিক মতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞেয় সবই শূন্য—আমাদের ধ্যান-ধারণা সব কিছুই নিরালম্বন, নিরাশ্রয়। এই শূন্যবাদে অধ্যাস অপেক্ষা বিকল্পের ধারণা অত্যধিক উপযোগী বলিয়া মনে হয়। আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ভামতীপতি বাচস্পতি মাধ্যমিকোক্ত শূন্যবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—কোনরূপ অধিষ্ঠান ব্যতীত জগদ্‌বিভ্রমের কল্পনা করা যায় না। অতএব সর্বাত্মক শূন্যবাদ মানিতে পারা যায় না। মাধ্যমিকের হয়তো ধারণা যে, শুক্তিরূপ কোনও অধিষ্ঠানে মিথ্যা রজতভ্রান্তির দৃষ্টান্তদ্বারা যদি আমরা (শূন্যবাদীরা) জগতের শূন্যতা বুঝাইতে চাহিতাম, তবেই অদ্বৈতোক্ত দোষের অবকাশ থাকিত। কিন্তু মাধ্যমিকের বিকল্প ঠিক শুক্তি-রজত ভ্রান্তির মত নহে যে শুক্তির ন্যায় একটি অধিষ্ঠানের প্রয়োজন হইবে। শুক্তি যেমন রজতরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ কোন প্রকৃত বস্তু বিকল্পরূপে প্রতিভাত হয় না। মনোজগতে শব্দের মাধ্যমে উহা (বিকল্প) উপস্থাপিত হয়মাত্র। এইরূপ বিকল্পের ক্ষেত্রে শুক্তির ন্যায় অধিষ্ঠানের প্রয়োজন নাই সত্য, তবে অন্যদিক হইতে তাহারও (বিকল্পেরও) অধিষ্ঠানের আবশ্যতা আছে। বিজ্ঞাতা যদি কেহ না থাকে, তবে বিকল্পাত্মক মানস বোধ জন্মিবে কাহার? বিকল্পের বাস্তব কোন বিষয় না থাকিলেও, ঐ প্রকার মানসবোধের তো একটা আশ্রয় বা আধার থাকিবে। সুস্থির আত্মস্বরূপ বিজ্ঞাতা না থাকিলেও ক্ষণিক বিজ্ঞান তো থাকিবে? ইহার উত্তরে শূন্যবাদী বলিবেন, যুক্তি-বিচারের দ্বারা যদি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় কাহারও কোনরূপ স্বভাব খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, তবে বিকল্পের একটা আশ্রয়ের তাগিদে যুক্তিবিরুদ্ধ জ্ঞেয় বা জ্ঞাতা প্রভৃতি স্বীকার করার অর্থ কি? ক্ষণিক বিজ্ঞান মানিলেও দেখা যায় কোন লাভ নাই। একই ক্ষণে বিজ্ঞান ও বিকল্পের তফাৎ করিবে কে? সেইক্ষণে বিজ্ঞানের আকারই বিকল্প। সুতরাং ঐরূপ বিজ্ঞান ও বিকল্পের আশ্রয়াশ্রয়িভাবের পরিকল্পনাও বিকল্পমাত্র। চিরস্থির নিত্য আত্মা যে নাই, তাহা আমরা শূন্যবাদীরা পূর্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। বিজ্ঞানও নাই, বিজ্ঞেয়ও নাই, বিজ্ঞাতাও নাই। সবই শূন্য। কাহারও স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত শূন্যতা সিদ্ধান্তেই পৌঁছাইতে হয়। অদ্বৈতবেদান্তী কখনও এইমতে সায় দিতে পারেন না। অদ্বৈতবাদী মনে করেন যে, নিরধিষ্ঠান ভ্রম সম্ভব নহে, নিরালম্বন বিকল্পও সম্ভবপর নহে। অদ্বৈতবাদীর এই যুক্তি সকল বিরুদ্ধ যুক্তির তুলনায় অধিকতর বলশালী। অদ্বৈতবেদান্তের জ্ঞেয় বহির্জগৎ শূন্য নহে, অনির্বচনীয়। প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতও অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয় শুক্তি-রজতের ব্যবহারিকভাবে সত্য শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানের ন্যায়, দৃশ্যমান বিশ্বভ্রান্তির একটা সুস্থির পরমার্থসৎ অধিষ্ঠান মানিতেই হইবে। কেননা, নিরধিষ্ঠানে কোনরূপ ভ্রম হয় না, হইতে পারে না। সেই বিভ্রম বিপর্যয়রূপই হউক, কিংবা বিকল্পরূপই হউক, তাহার আলম্বন অবশ্য স্বীকার্য। সেই আলম্বনই নিত্য বিজ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম। বৌদ্ধোক্ত ক্ষণিক বিজ্ঞানের দ্বারা যে এই আলম্বনের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তাহা বৌদ্ধমতের খণ্ডনে ভামতীর আলোচনায় আমরা পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি।

এখন আমাদিগকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। বিরুদ্ধবাদী জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনাদের ব্রহ্ম কি প্রমেয়? আপনি (অদ্বৈতবাদী) তো ভ্রমের একটি অধিষ্ঠান প্রয়োজন, এই যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মকে প্রমাণ করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আপনাদের মতে পরমার্থসত্তা তো প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহারের ঊর্ধ্বে। নিজসিদ্ধান্ত হইতে আপনারা অসতর্ক মুহূর্তে বিচ্যুত হইয়াছেন নাকি? অসীম ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র কোণে মানুষ নামক কয়েকটি প্রাণী যেভাবে চিন্তা করে, পরমার্থসত্তাকে সেই যুক্তি অনুসারেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে, এই দাবীর পিছনেইবা কি যুক্তি আছে? কোনও অজ্ঞাত গ্রহান্তরে যদি মানুষের মত বা উন্নততর কোন প্রাণী থাকে, তবে তাঁহাদের চিন্তা, ধারণা, যুক্তিপ্রণালী হয়তো আমাদের যুক্তিতর্কের নিয়মপদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে অগ্রসর হইবে। তাঁহাদের Logic হয়তো সম্পূর্ণ আলাদা পথ বাছিয়া লইবে। আমরা আলোচনা করিতেছি, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে কি পরমার্থতত্ত্ব আছে তাহা লইয়া। এই পৃথিবীর কয়েকটি প্রাণীর ন্যায়সিদ্ধ (Logical) ধারণা অনুযায়ী বিশ্বচক্র আবর্তিত হইতেছে, পরমার্থ নির্ধারিত হইতেছে, ইহাইবা কি করিয়া বলা যায়? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে শুধু এইটুকুই বলা যায়—এখন পর্যন্ত আমরা মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান বা ধারণা লইয়াই চলিতেছি। পৃথিবীর ঊর্ধ্বে গ্রহান্তরে

অবস্থিত উন্নততর প্রাণিকুলের সহিত দর্শন-বিজ্ঞান আলোচনার সুযোগ এখনও আমরা পাই নাই। যদি বিজ্ঞানের কৃপায় কোনদিন সেই সুযোগ আসে, তবে তখন সেই আলোকে আমাদের অভিজ্ঞতা ও ধারণা যাচাই করিয়া দেখিব।

আপনারা (প্রতিবাদীরা) যে বলিলেন, অদ্বৈতবেদান্তের পরব্রহ্ম প্রমেয় হইয়া গেল, ইহার উত্তরে আপনাদের ভাষায়ই বলিব—ব্রহ্মের প্রমেয়ত্বও বিকল্পমাত্র। যখন আমরা তর্ক করি, তখন একটা বিষয় শুধু theory বা মতবাদ হিসাবেই জানিবার বা বুঝিবার চেষ্টা করি। এখানে যেই বিচারের দ্বারা পরব্রহ্মকে বুঝিবার প্রয়াস করিলাম, ইহা শুধু theoretical বা Logical জ্ঞানমাত্র। ইহাকে আপনারা Logical Construction বলুন, আপত্তি করিব না। কোনও বিচার্য বিষয় বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ ঐ theoretical জ্ঞানেরই আশ্রয় লইতে হয়। এইরূপ বিচারের দ্বারা পরমার্থতত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না, তবে সন্দেহ দূর করিতে সাহায্য করে এইমাত্র। তত্ত্বের স্বরূপ বুঝিতে হইলে Theory বা মতবাদের ঊর্ধ্বে উঠিতে হয়। সে তর্কের অগম্য আলাদা সাধনার জগৎ। তর্কে যাহা বুঝিলাম, অন্তরে তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি জাগরূক করার জন্য সুকঠোর সাধনপদ্ধতির আশ্রয় লইতে হইবে। মননের ঊর্ধ্বে নিদিধ্যাসনের দুর্গম পথে যাত্রা করিতে হইবে। সেই যাত্রাপথের সন্ধান দিয়াছে বেদান্ত। বেদান্তের পথ ব্যতীত অন্য পথ নাই—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" বৌদ্ধোক্ত নাস্তিকের আলোচনার ফলে সন্দেহবাদের যে তমিস্রা জিজ্ঞাসুর হৃদয়াকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, সেই তমিস্রা দূর করতঃ সত্য-শিব-সুন্দরের আলোকোজ্জ্বল পথের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছে সর্ববিদ্যার সার ব্রহ্মবিদ্যা। এইজন্যই ব্রহ্মবিদ্ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—আমিই ব্রহ্ম।

'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি'।*

সমাপ্ত

ওঁ শান্তিঃ।

* বাসনার উচ্ছেদ, অবিদ্যার বিলয়, মহোদয় বা পরিনির্বাণ, জন্মান্তর প্রভৃতি বিষয়ে বেদান্ত-মত ও বৌদ্ধমতের যে অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে তাহা অনস্বীকার্য। সেই সকল সম্পর্কে আমরা এখানে বিস্তৃত আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম। বিষয়টি অতি ব্যাপক ও তথ্য-বহুল। এইরূপ ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে ঐ সকল বিষয়ের পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নহে। সময় ও সুযোগ ঘটিলে এ-বিষয়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করার ইচ্ছা রহিল।

নির্ঘণ্ট বা সূচিপত্র

গ্রন্থকার সূচি

গ্রন্থসূচি

শব্দসূচি

আ